উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬৯তম বর্ষ

(১৩৭৩-মাঘ হইতে ১৩৭৪-পৌষ

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য ৬৲ প্রতি সংখ্যা ৬০ প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৭৩ হইতে পৌষ—১৩৭৪)

লেখক লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

দিব্য বাণী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

—কঠোপনিষদ্, ২।১।১

(জাগতিক কিছু লইয়া থাকিতে ভালবাসে সদা মন
সাগ্রহে চায় বহির্বিষয়ে থাকিতেই সদা লিপ্ত,)
বিধি সৃজিলেন বহির্মুখীন করিয়া ইন্দ্রিয়েরে
ইন্দ্রিয় তাই বহির্বিষয় লইয়াই থাকে তৃপ্ত—
অন্তরে যে আছে অন্তরতম দেখিতে চায় না তারে—
বাহিরেই শুধু ঘুরে ঘুরে মরে, দেখেনাকো আপনারে।

জ্ঞান-অভিলাষী অমিয়-পিয়াসী কোন কোন ধীর জন
আবৃত করি ইন্দ্রিয়দ্বার—বহির্বিশ্ব হতে
গুটাইয়া মন, ফিরাইয়া তারে নিজ অন্তর পানে—
আপন স্বরূপ পরমাত্মারে দেখেছেন হৃদয়েতে।
(স্বতঃচঞ্চল মানসখানিরে অন্তরে যেই জন
করে একাগ্র, শ্রীভগবানের পায় সেই দরশন।)

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় উদ্বোধন ৬৯তম বর্ষে পদার্পণ করিল। যে "নব যুগধর্ম সমগ্র জগতের বিশেষতঃ ভারতের কল্যাণের নিদান", স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া তাঁহারই বার্তা সকলের নিকট পৌছাইয়া দিবার কার্যে 'উদ্বোধন' সুদীর্ঘকাল ব্রতী রহিয়াছে এবং সকলের সহযোগিতায় যথাসাধ্য উহা করিয়া আসিতেছে। নববর্ষে যাত্রারম্ভে লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা সকলেরই আন্তরিক সহযোগিতা এবং সর্বোপরি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ তাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

বর্তমান সমস্যা

যাহা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে ও জাতীয় জীবনকে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে, যাহা জীবনকে সর্বোত্তম লক্ষ্য দেখাইতে ও সে লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম, যাহা বর্তমান যুগের জীবনাদর্শের বহুবিধ বিভ্রান্তিকর আপতমনোরম আদর্শগুলির মধ্য হইতে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের পক্ষে নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর আদর্শকে বাছিয়া লইবার কাজে বুদ্ধি এবং হৃদয়কে সহায়তা করে—আধুনিক যুগের মানুষের গ্রহণোপযোগী করিয়া ভারতের সেই চিরন্তন জীবনাদর্শের কথা পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। জাগতিক উন্নতির জন্য আলস্য ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যের শিল্পবিজ্ঞানাদি জ্ঞানার্জনের বহুল প্রসারের কথা বার বার বলিয়া গিয়াছেন তিনি। শুধু বলিয়াছেন সেই সঙ্গে ভারতীয় আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সব করিতে, ধর্মকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া অগ্রসর হইতে। সমাজ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য সমাজের ভাল জিনিসগুলির সঙ্গে ভারতের ধর্মকে মিশাইয়া গ্রহণ করিতে।

কেবল ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রচেষ্টাই যে মানুষের জীবনাদর্শ হইতে পারে না, সমষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সে জড়িত বলিয়া সমষ্টির কল্যাণসাধনও তাহার জীবনাদর্শ হওয়া চাই-ই—ইহা জড়বাদী জীবনাদর্শেরও মূলকথা; সমষ্টির কল্যাণেই ব্যষ্টির কল্যাণ, এই আদর্শানুগ হইয়াই বহু জড়বাদী আদর্শনিষ্ঠ রাষ্ট্র তাই অনেক সময় ব্যষ্টিকে অমানুষিকভাবে সমষ্টির চরণে জোর করিয়া বলি দেয়। জড়-বাদের দৃষ্টিতে দেখিলে সে জীবনগুলি ব্যষ্টিগত ভাবে ব্যর্থ, শূন্য হইয়া যায়।

সমষ্টির চরণে নিজেকে বলি দেওয়া অধ্যাত্ম-বাদী ভারতেরও আদর্শ—কিন্তু তফাৎ হইল, তাহা স্বেচ্ছায়, এবং তাহা ব্যষ্টিরও কল্যাণের কারণ, তাহা ত্যাগ ও সেবা—রাষ্ট্রের বজ্রমুষ্টির চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া কিছু করা নহে। একই কার্য স্বেচ্ছায় করা ও বাধ্য হইয়া করায় তফাৎ অনেক; বাধ্য হইয়া করিতেছি, এভাব মানুষকে অশান্তিতে আচ্ছন্ন করে, তাহার অন্তরাত্মাকে অবনমিত করে। নিজের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় করিলে সেই একই কার্য আনে জীবনে তৃপ্তি, মানুষকে করিয়া তোলে উন্নততর। নিজের কল্যাণ বলিতে সেখানে নিজের স্বল্পস্থায়ী অবশ্য-মৃত্যু দেহেন্দ্রিয়-বিধৃত অস্তিত্বের তৃপ্তিসাধন মাত্র নহে—দেহাতীত অবিনাশী আনন্দময় আসল মানুষটির আবরণ-উন্মোচনও। ভারতীয়

জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি এটি। আমরা যদি ভারতীয় জাতির যথার্থ কল্যাণকামী হই, আমাদের সব কিছু করিতে হইবে এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া।

স্বেচ্ছায় করিতে হইলে চাই আদর্শটির প্রতি অনুরাগ, চাই উহাকে বরণ করিবার জন্য আন্তরিকতা। চিন্তায় ও আচরণে সংযম ছাড়া ইহার কোনটিই আসে না। আবার সৎ চিন্তার পরিবেশন এবং সুষ্ঠু পথনির্দেশ ছাড়া জাতিকে ইহাতে উদ্বুদ্ধ করা যায় না; শুভ বিষয়ের মনন ছাড়া মন সংযত হইবার শক্তি লাভ করিতে পারে না।

আজ সারা দেশে ছাত্রসমাজ হইতে সুরু করিয়া প্রায় সর্বত্রই সংযত আচরণের এত অভাব কেন? নিজের কল্যাণের পথ আমরা চিনিতে পারিতেছি না কেন? অন্নের জন্য, অর্থের জন্য আজ আমরা পরমুখাপেক্ষী; অথচ এই অতীব লজ্জাকর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই কেন? পরাধীনতার লজ্জা যেমন অতীতে একদিন দেশের যুবকগণের, দেশবাসীর অন্তরকে বিপুলভাবে আলোড়িত করিয়াছিল, আজ অসংযম ও দৈন্যের লজ্জাবোধ যদি তাহা করিত, তাহা হইলে সকলেরই আচরণ হইত অন্যরূপ। যে ভারতীয় জীবনাদর্শ, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, আজ তাহার একান্ত অভাব কেন? ইহার একমাত্র কারণ, আদর্শানুগ চিন্তার পরিবেশনের অভাব, দেশের বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীগণকে সে চিন্তাধারায় পরিস্নাত হইবার সুযোগদানের অভাব। এক কথায়, সৎশিক্ষার অভাব। আর অভাব তীব্র দেশাত্মবোধের।

অথচ স্বাধীনতালাভের পর এতদিন হইয়া গেল, সেদিকে আমাদের কার্যকরী দৃষ্টি এখনো পড়িতেছে না! মহাত্মাজীর জয়ধ্বনি দিতে আমাদের উৎসাহের অভাব নাই, সুভাষচন্দ্রের কথায় যুবকগণ পঞ্চমুখ, অথচ তাঁহাদের জীবনের ভিত্তি যে সংযমের, যে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার দিকে দৃষ্টি কাহারো পড়ে না। অগ্নিযুগের ত্যাগনিষ্ঠ সেবাপরায়ণ স্বদেশপ্রেমিকদের পূজা আমরা করি কাগজ-কলম-ভাষণের মাধ্যমে। তাঁহাদের জীবনের মূল ভিত্তির কথা, সাধারণকে সে ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার প্রচেষ্টার কথা আমরা বিস্মৃত। ভারত যে নিজস্ব আদর্শের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পরাধীনতার গ্লানি হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছে, আজ স্বাধীন ভারতের লজ্জা, অভাব-অনটন, দুর্বলতা সব কিছু কাটাইয়া প্রসারিতবক্ষে, গৌরবোজ্জ্বল শিরে জাতি হিসাবে দৃপ্তপদে দাঁড়াইতে হইলে সেই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আমাদের দাঁড়াইতে হইবে।

আমাদের ভিতর যথাযথ ভাবে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন হইলেই এবং জাতীয় আদর্শানুগ জীবনগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভূত হইলেই আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে পারিব। জাতীয় শক্তির সম্ভাবনা অজস্র পরিমাণে রহিয়াছে। পাকিস্থান ও চীনের আক্রমণের সময় কয়েকবার আমরা দেশব্যাপী এই জাতীয়তার জাগরণ, দেশবাসীর একবদ্ধতা ও ত্যাগনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছি। উহা আমাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন আছে। যে কারণগুলি উহার প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, সেগুলি অপসারণ করিতে পারিলেই উহা আবার ফুটিয়া উঠিবে।

ভারতীয় আদর্শানুগ শিক্ষার দিকে, ধর্মমূলক শিক্ষার দিকে আমাদের দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নতুবা দেশের উন্নতির সব পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। যে-

কোন পরিকল্পনার মূল সম্পদ মানুষ। মানুষ-তৈরীর কাজ যদি ঠিকমত না হয়, তাহা হইলে সবই ব্যর্থ হইবে। স্বামীজী বলিয়াছেন মানুষই হইল দেশের অন্য সব সম্পদের চেয়ে বড় সম্পদ; শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই মানুষকে গড়িয়া তুলিবার কাজে আমরা কি করিতেছি? পাশ্চাত্যের যে জড়বাদভিত্তিক সভ্যতাকে স্বামীজী সাবধানবাণী শুনাইয়াছিলেন যে উহাকে আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক না করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, পাশ্চাত্যের সেই জড়বাদভিত্তিক জীবনাদর্শই তাহাকে দিতেছি। তা-ও আবার তাহার বহু সদ্‌গুণ বাদ দিয়া। আধ্যাত্মিকতায় আমাদের জন্মগত অধিকার; সে অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে আমরা যেন তাহা সর্বপ্রযত্নে ভুলিবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছি!

স্বদেশবাসীর কল্যাণের জন্য যিনি আত্মাহুতি দিয়া মৃতপ্রায় জাতিকে জাগাইয়া তাহাকে উন্নতির পথ ধরাইয়া দিয়াছেন, সেই বিবেকানন্দের চরণে আজ প্রার্থনা করি, ভারতীয় জাতি স্বাধীনতালাভের পূর্বে যেভাবে নিজস্ব আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, উন্নতি-পথযাত্রায় আবার তাহার ভিতর নিজস্ব আদর্শের প্রতি সেই অনুরাগ ফিরিয়া আসুক, গভীরতর হউক।

"নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না হইলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।...

"যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহু-কালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে।"

"স্বার্থত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ। এই আদর্শ অনুযায়ী ভারতের সাধনা তীব্রতর করিয়া চল, বাকী যাহা কিছু আপনা হইতে আসিবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শুরবে নমঃ

আলমবাজার মঠ

১৬ই জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় গঙ্গাধর,

তোমার ১৩ই জুলাই-এর পত্র পাইয়া সমুদায় অবগত হইলাম। আমি এবং মঠস্থ আমরা সকলেই তোমার কার্যে সন্তুষ্ট আছি। তুমি নিজে যেরূপ বুঝিবে সেইরূপ ভাবে চাউল, কাপড় প্রভৃতি বিতরণ করিবে। তুমি যেরূপ উৎসাহের সহিত কাজ চালাইতেছ, তোমার কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও যেরূপ সহৃদয়তা তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। তোমার করুণ হৃদয়, সর্বসাধারণের দুঃখে সহানুভূতি, অদম্য অধ্যবসায় আমাদিগকে শ্রদ্ধা দিতেছে। গুরুদেবের কৃপায় তুমি আরও উৎসাহের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত থাক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পূর্বে তোমার নিকট যে টাকা পাঠান হইয়াছে তাহা দ্বারা এই জুলাই মাসে চালাইবে। Mr. Sevier ৫০৲ টাকা ও যতীন্দ্র মুন্সী ২৫৲ টাকা পাঠাইয়াছেন শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। পূর্বে যে টাকা পাঠাইয়াছি তাহা দ্বারা এই জুলাই মাস চালাইয়া দিয়া বাকি টাকা সব রাখিয়া, ও ১৫০৲ টাকা শীঘ্র পাঠাইব—তাহা দ্বারা August মাস চালাইবে। অতঃপর বোধ হয় আর আমরা Mahabodhi Society-র অর্থসাহায্য লইব না। সারদাকে Goalonda না পাঠাইয়া তোমার নিকট পাঠাইব মনে করিয়াছি। তুমি সুরেন্দ্র ও সারদাকে মহুলায় রাখিয়া নিকটবর্তী অন্য কোন্ স্থানে (যে) Centre করিবে, (সেখানে) নিজে একবার যাইলে ভাল হয়। আর Government যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত লিখিয়াছ তাহা লইয়া ঐ স্থানে relief কার্য করিতে থাক। আমরা এখানে সকলে ভাল আছি। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। আমার ও মঠস্থ সকলের নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

Afftly Yours
Brahmananda.

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

17th July, '97

My dear Gangadhar,

গতকাল স্বামীজীর এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিতেছেন—famine-relief-এর সঙ্গে সঙ্গে preaching যেন হয়, কোন মতে অন্যথা না হয়। আমাকে পূর্বেও লিখিয়াছিলেন। তুমি এবিষয় খুব করিবে। যাহাতে পরমহংসদেবের life and teachings প্রচার হয় তাহার যত্ন সর্বদা করিবে। তিনি আরও লিখিতেছেন যে এক স্থানে কেন, অন্য অন্য স্থানে Ganga-

dhar-রা কেন না যাইতেছে? সে বিষয় তুমি আমাকে লিখিয়া পাঠাইলে আমি তাঁহাকে লিখিব। C.-বাবুর ব্যবহারে আমরা জবাব দিয়াছি যে, Society হইতে টাকা লইব না। তাহাকে আর ...... অন্য কিছু পাঠাইবে না। ইতি—

দাস

Brahmananda.

(৩)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

আলমবাজার মঠ,

২৬শে জুলাই, ১৮৯৭

My Dear Gangadhar,

তোমার পত্র পাইয়াছি, কল্য পঞ্চাশখানি নূতন কাপড় H. Miller Co.-র জাহাজে পাঠাইতেছি, পৌঁছান সংবাদ লিখিবে। শুক্রবার দিবস তোমরা Steamer Station-এ লোক-সহিত উপস্থিত থাকিয়া delivery লইবে। রবিবার একসঙ্গে বেশ distribute করিবে। ওখানকার লোকাল লোকেরা যাহা কিছু সাহায্য করে আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইও। সমুদায় এখান হইতে acknowledge করা হইবে।

Newspaper-এ circulate করিলে তোমাদের উপর খুশী হইবে, এইরূপ... নিকট শুনিলাম। তোমরা এখান হইতে যাহা পাইতেছ এবং অন্যে যে যে টাকা দিবে তাহাও ... কাগজে দিতে হইবে।...... Fact is fact. যে যাহা দিবে acknowledge কর এবং আমরা যাহা subscription-এ পাই তাহা acknowledge করি, এই কথা বলা হইয়াছে। ... তুমি এইবার হইতে সাবধানে কাজ করিবে। ... ৩৪ মাস কাজ চালাইতে হইবে। তুমি আমাকে কত খরচে চলে তাহা লিখিবে।

Swamiji ক্রমাগত পত্রে লিখিতেছেন যাহাতে preaching হয়... এবং কার্য করা হয়। Trigunatitaকে ওখানে পাঠাইতেছি, তাহা হইলে তুমি আলাহিদা centre খুলিতে পারিবে কোন স্থানে, এবং preaching-কার্য ভাল হইবে। Sarada বোধ হয় ২।৪ দিনে তোমার নিকট পৌঁছাইবে। তুমি যে টাকা receive কর লিখিবে; আমরা যাহা পাঠাইয়াছি তাহার account আছে।

...Levinge Shahebকে thanks দিতে পার তো ভাল হয়। Tea-party proposal—অতি উত্তম স্থানে সাজাইয়া decorated with flowers যদ্যপি হয় তো ভাল। আমার health ভাল যাচ্ছে না। আমার dysentery হয়েছে সেজন্য বেশী লিখিতে পারিলাম না। ইতি—

With namaskar & love

yours affly

Brahmananda.

ভগবৎপ্রসঙ্গ

স্বামী মাধবানন্দ

(বেলুড় মঠ, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩)

শাস্ত্র গুরুকরণের কথা বলেছেন। সদ্গুরু কৃপা করে শিষ্যকে ইষ্টমন্ত্র দিয়ে সাধন-পদ্ধতি বলে দেন। 'ইষ্ট' কথার মানে, প্রিয়। ভগবানের প্রিয় যে রূপ—সেই আমার ইষ্টমূর্তি। আর তাঁর প্রিয় যে নাম—আমার ইষ্ট-মন্ত্র। গুরু শিষ্যকে তাই বলে দেন।

ভগবান কৃপা করে মন্ত্রের মধ্যে সব শক্তি দিয়েছেন। নিষ্ঠা অধ্যবসায় ও আগ্রহের সঙ্গে ঐ মন্ত্র জপ করে যেতে হয়। অনেকে মনে করেন, মন্ত্র নিলেই সব হয়ে গেল, কাজেই আর কিছু করতে হবে না। এটি একেবারে ভুল ধারণা। মন্ত্র পাওয়া মানে প্রথম পৈঠাতে পা দিলে। যত পথ চলবে—পথের দূরত্ব তত কমে আসবে। মন্ত্রে বিশ্বাস রেখে সাধন করে যেতে হয়। মনে রাখতে হবে সচ্চিদানন্দই আসল গুরু। আবেদন-নিবেদন যা কিছু তাঁর কাছেই করতে হয়। ছোট ছেলেমেয়ের মত তাঁর কাছে আবদার করতে হয়, জোর করতে হয়। প্রাণের ভেতর থেকে ডেকে যাও, চিন্তা কি? ছেলে যখন খেলা করতে করতে মাকে ডাকে, মা তখন আসেন না। কিন্তু সব ছেড়ে যখন মাকেই ডাকে—মা তখন দৌড়ে আসেন। একটুও দেরি করেন না।

আমাদের মনে আরও পাঁচটা বাসনা-কামনা আছে বলেই তাঁকে পাই না। ভগবানকে আমরা কজন ঠিক ঠিক চাই! তিনি এলেও আমরা তাঁকে না চেয়ে অন্য জাগতিক জিনিস চেয়ে বসব। বুড়ীর মাথায় ঝুড়ি তুলে দেওয়ার গল্প জান ত?

এক বুড়ী মাথায় বোঝা নিয়ে যেতে যেতে খুবই ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে বসে পড়ে। শেষে আর ঝুড়িটি মাথায় তুলতে পারে না। এদিকে দেরিও হয়ে যাচ্ছে। যেতেও হবে অনেক দূর। তখন সে খুব করে ভগবানকে ডাকতে থাকে। তার ডাক শুনে ভগবান তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কি চাও? বুড়ী তখন আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে বললে, 'ঠাকুর, দয়া করে তুমি যখন এসেছ তখন এই ঝুড়িটি আমার মাথায় তুলে দাও।' বোঝ কাণ্ড!

পত্রের মাধ্যমে

১

(বেলুড় মঠ, ২৯শে মে, ১৯৬৩)

মন স্বভাবতই চঞ্চল। আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সেই-সকল মনকে বিক্ষিপ্ত করে। কাজেই নিরন্তর চেষ্টা করিয়া বশে না আনিলে সে ত অশান্ত থাকিবেই। মন স্থির হউক বা না হউক তুমি নিয়মিত জপধ্যানে বসিতে ছাড়িবে না। ঐরূপ করিতে করিতে মন ধীরে ধীরে বশে আসিবে।

তুমি যে সরলভাবে মনের চাঞ্চল্যের কথা জানাইয়াছ,—উহা শুভ লক্ষণ। চারিদিকে উত্তেজনার বস্তু রহিয়াছে। বিশেষতঃ অল্প বয়স হইতে যদি সংযমের দিকে ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকে তাহা হইলে যত বেশী বয়স হয় তত ইন্দ্রিয়াসক্ত মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আর কুচিন্তা ত আপনা-আপনি আসে না! আমরা প্রশ্রয় দিই বলিয়াই আসে। সুতরাং উহা উঁকি ঝুঁকি মারিবেই। জোর করিয়া

কোন বিরুদ্ধ চিন্তা অর্থাৎ পবিত্র চিন্তা করা উচিত; যেমন ঠাকুরের নিষ্পাপ জীবনের চিন্তা করা। নিজের মনকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য নহে বরং সাবধানে তাহার মোড় ফিরাইয়া লওয়া উচিত।

ঠাকুর ও মায়ের চরণে তুমি মনে মনে প্রত্যহ আন্তরিক প্রার্থনা জানাইবে, যাহাতে তাঁহারা ঐ সকল মানসিক দুর্বলতা দূর করিয়া দেন।··· অসৎ চিন্তাকে যেন খুব relish করিয়া হৃদয়ে স্থান না দেওয়া হয়। সকল বদ অভ্যাস Control করিতে প্রথম প্রথম যত কষ্ট হয়, কিন্তু দৃঢ়ভাবে দমন করিতে চেষ্টা করিলে ক্রমে মন বশে আসে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখ যে কার্যতঃ নীতিবিরুদ্ধ কিছু করিবে না।

নিজেকে অত পাপী ও অধম কখনও মনে করিবে না। বরং স্বামীজীর আদেশ অনুসারে তোমার মধ্যে সব শক্তি রহিয়াছে শুধু প্রকাশের অপেক্ষা, এইরূপই মনে করিতে চেষ্টা করিবে। গীতার এই শ্লোকটি বিশেষভাবে চিন্তা করিবে :

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥"

২

(বেলুড় মঠ, ২৯শে আগষ্ট, ১৯৬৪)

তোমার পত্র পাইয়াছি। পত্র পড়িয়া তোমার প্রতি গভীর সহানুভূতি হইতেছে। তুমি প্রাণপণে মনে জোর আনিবার চেষ্টা কর। স্বামীজী ঐরূপই চাহিতেন। আমরা মনে প্রাণে চেষ্টা করিনা বলিয়া পুরা ফল অনেক সময় পাই না। ঠাকুর তোমার হৃদয়ে বল দিন যাহাতে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পার।

৩

(বেলুড় মঠ, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৪)

···শীঘ্র শীঘ্র যদি সারিতে চাও তো মনে সর্বদা সচ্চিন্তা জাগরূক রাখিও। 'কুকুরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে,'—অসৎ চিন্তা সম্বন্ধেও সেই কথা।···

ঠাকুরকে যেরূপ ডাকিতেছ ডাকিয়া যাও। তবে আন্তরিক ভাবে ডাকা চাই, তাহা হইলেই ফল হইবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন,

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥"

এই শ্লোকটি বার বার আওড়াইবে, মনে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিবে।

"জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা।······

"প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে—কিভাবে আঘাত করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে বিশ্বপ্রকৃতি স্বীয় রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত। সেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা আসে একাগ্রতা হইতে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; উহা যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয়—ইহাই রহস্য।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—যুগপ্রবর্তন

স্বামী গম্ভীরানন্দ

কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর প্রাথমিক অভ্যর্থনাদির কার্য শেষ হইয়া গেলে স্বামীজীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল গুরুভ্রাতৃগণকে স্বমতে আনয়ন করা এবং শ্রীগুরুর বাণীকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রূপপ্রদানের জন্য তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা। কার্যটি খুব সহজ ছিল না। গৃহী ভক্তদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তপ্রমুখ বয়স্ক অনেকে মঠাদি স্থাপনের প্রয়োজন পূর্বে স্বীকার করেন নাই ; এখনও ধর্মজীবনে স্বমুক্তির চেষ্টায় সর্বতোভাবে নিরত থাকাকেই তাঁহারা সর্বোত্তম আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন, এবং এই চেষ্টাও গতানুগতিক পথে পরিচালিত হওয়া উচিত বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা ছিল। অধিকন্তু তাঁহারা স্বামীজীর প্রচারিত 'কার্যে পরিণত বেদান্তবাদ'-এর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেন না। সন্ন্যাসীদের অনেকেও স্বামীজীর নবীন চিন্তাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। স্বামীজীর এই কর্মপ্রচেষ্টার সহিত বৈরাগ্যপ্রবণ, সমাজ-বিমুখ সন্ন্যাসের মিলন কোথায়—সংসার-অস্বীকারকারী বেদান্তবাদের সম্বন্ধই বা কি? স্বামীজী কিন্তু কোন অসামঞ্জস্য দেখেন নাই; তিনি সোজা কথায় বলিলেন, "যে জ্ঞানে ভব-বন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়।" তাঁহার স্মরণ ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, "খালি-পেটে ধর্ম হয় না", "কলিতে অন্নগত প্রাণ"। আর ইতিহাসবেত্তা তিনি জানিতেন, বৌদ্ধ-ধর্মের অবনতিকালে স্বানুভূতির প্রতি সমুচিত দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু বাহ্যিক ত্যাগের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে অনধিকারীরাও সন্ন্যাসকেই ধর্মলাভের একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহার ফলে কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত ও ভারতের অবনতি ক্রমবর্ধমান হইয়া বর্তমান চরম দুর্দশা ঘটিয়াছে। কথায় বলে, সাপের বিষ সাপই তুলিয়া লইতে পারে। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসি-কর্তৃক এই বিপথে পরিচালনের ফলে সমাজে যে অব্যবস্থা ঘটিয়াছে, হিন্দু-সন্ন্যাসীকে আজ তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; তাঁহাকে স্বীয় জীবন দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে কর্মও ভগবদুপাসনায় পরিণত হইতে পারে। শ্রীরাম-কৃষ্ণ জীব-কল্যাণার্থ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, এই যুগে শিবজ্ঞানে জীবসেবার বাণী তাঁহারই মুখে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, হাজরা মহাশয় তাঁহাকে ভক্তদের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া ধ্যান-সমাধি লইয়া থাকিবার পরামর্শ দিলেও তিনি কলিকাতার লোকের দুরবস্থা ভাবিয়া তাহা করিতে পারেন নাই এবং দেওঘর ও রাণাঘাটে তিনি স্বহস্তে সেবাব্রতের বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন। বিরাট সমাজের জীবনে বেদান্তকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার উপায়রূপে তাই স্বামীজী সেবাব্রতকে স্বীয় সঙ্ঘের আবশ্যিক অঙ্গ বলিয়া বাছিয়া লইলেন। স্বদেশবাসীকে তিনি যেমন সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষের পূজায়[১] আহ্বান করিলেন, তমোগুণ ছাড়িয়া বীরপদ-ক্ষেপে স্বদেশের সেবায় ব্রতী হইতে বলিলেন, সন্ন্যাসীদিগকেও তেমনি বুঝাইয়া দিলেন,

---

১। সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
—গীতা ১৩।১৩

নিঃস্বার্থভাব লইয়া জীবরূপী শিবের সেবায় অগ্রসর হইলে উহাই হইবে সর্বোত্তম ধর্মসাধন এবং উহাই ক্রমে হইবে মুক্তির কারণ। অতএব ভয় নাই; সন্দেহও বৃথা। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ? আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি; কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজা। ইহাদের পূজা করিতে হইবে, সেবা নহে। সেবা বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, পূজা শব্দেই ঐ ভাব ঠিক প্রকাশ করা যায়।" স্বদেশপ্রেমিক দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবে কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া?—মহামায়ার শরীররূপী স্বদেশের সেবাদর্শ বরণ করিয়া। সমাজের প্রতিটি অঙ্গ অপরের সম্মুখে দাঁড়াইবে কোন সম্বন্ধ মানিয়া লইয়া?—সমাজরূপী বিরাটের দেবদেহের সেবায় ব্রতী হইয়া। সন্ন্যাসী অধ্যাত্মমার্গে পা বাড়াইবেন কাহার আহ্বান স্বীকার করিয়া?—সর্বব্যাপী ভগবানের পূজার উদ্দীপনা পাইয়া।

স্বামীজী এ যাবৎ সকলকে বুঝাইতেছিলেন যে, আত্মাভিমানজনিত বা যশোলিপ্সাপ্রসূত কার্য সব সময়েই হেয়; কিন্তু অহঙ্কারবর্জিত ও সেবাভাবপ্রণোদিত কর্ম অতীব প্রশংসনীয় এবং উহা চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বভাব ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন সাধারণ লোক যতক্ষণ পর্যন্ত রজোগুণকে অতিক্রম করিয়া সত্ত্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হন, ততক্ষণ ধ্যান-ধারণা বা জ্ঞান-বিচারাদির পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন না। অনেকের বিশ্বাস, ভগবানলাভের পর তাঁহারই আদেশ-ক্রমে—বা 'চাপরাশ পাইয়া'—লোককল্যাণে নিযুক্ত হওয়া উচিত, তৎপূর্বে নহে। কিন্তু এই কথা শুধু আচার্যদের পক্ষেই প্রযোজ্য; যাঁহারা অপরকে ভগবৎপথে চলিবার উপদেশ দিবেন, তাঁহাদের নিজেদের অনুভূতি থাকা একান্ত আবশ্যক। পরন্তু যাঁহারা ঈশ্বরলাভের উপায়রূপে তাঁহারই আরাধনা-জ্ঞানে ভক্তিভাবে সেবাব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে। আবার সাধনা হিসাবে এই পথকে অন্যান্য সুপরিচিত পথ অপেক্ষা নিম্নতর স্থান দেওয়াও চলে না—কারণ সেবার সহিত ভক্তি, বিচার, ত্যাগ, একাগ্রতা প্রভৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত।

স্বামীজী উপযুক্ত কর্মী প্রস্তুত করিবার জন্য এইভাবে সকলকে প্রোৎসাহিত করিতে থাকিলেও তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিল না যে, দেশের লোকের মানসিক সহানুভূতি পাইলেও ভারতবর্ষে কাজ গড়িয়া তোলার একটি প্রধান অন্তরায় অর্থাভাব। শ্রীযুক্তা ওলি বুল ও শ্রীমতী মার্গারেট নোবলকে (ভগিনী নিবেদিতাকে) লিখিত ৫ই মে (১৮৯৭) তারিখের দুইখানি পত্রে স্বামীজী এই অসুবিধার কথাই লিখিয়াছিলেন। প্রথম পত্রে আছে: "এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না—যদিও সমস্ত জাতটা একযোগে আমাকে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মতো হয়েছিল! কোন বিষয়ে কার্যকারিতার দিকটা ভারতবর্ষে আদৌ দেখতে পাবে না।...ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।" দ্বিতীয় পত্রে আছে অন্য প্রকারে ইহারই পুনরাবৃত্তি: "দুঃখ হয় এই জন্য যে, আমার আদর্শগুলি কার্যে পরিণত হবার কিছুমাত্র সুযোগ পেল না। আর তুমি

তো জানই, অন্তরায় হচ্ছে অর্থাভাব। হিন্দুরা শোভাযাত্রা এবং আরও কত কিছু করছে; কিন্তু তারা টাকা দিতে পারে না।"

অর্থাভাবে স্বীয় আদর্শকে দ্রুত কার্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হইলেও স্বামীজী চুপ করিয়া থাকিলেন না। তিনি ঐ জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বনে তৎপর হইলেন। ভারতে অর্থ না থাকিলেও এখানে ত্যাগের মহিমা স্বীকৃত হয় এবং স্বল্পসংখ্যক হইলেও তখনও ঐ আদর্শে মানুষ উদ্বুদ্ধ হইত; আর স্বামীজী জানিতেন, টাকায় মানুষ গড়ে না, মানুষই টাকা তৈরী করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে উদ্বুদ্ধ কয়েকজন যুবক স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানকাল হইতেই মঠে যাতায়াত করিতেছিলেন এবং কেহ কেহ মঠে যোগদানও করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর কালীকৃষ্ণ, কানাই, সুশীল ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হইলেন ও তাঁহাদের নাম হইল যথাক্রমে বিরজানন্দ, নির্ভয়ানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নিত্যানন্দ।[২] ইহা সম্ভবতঃ মার্চ (১৮৯৭) মাসের কথা, কারণ মার্চ মাসে মাদ্রাজ চলিয়া যাইবার পূর্বে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই ঘটনাকালে আলমবাজার মঠে উপস্থিত ছিলেন ('বাণী ও ও রচনা', ৯।৫১; স্বামীজীর ২০।৩।৯৭-এর পত্র; 'স্বামী অখণ্ডানন্দ', ১১৮ পৃঃ দ্রঃ)। এই চারি জনের মধ্যে "একজনকে যাহাতে সন্ন্যাস না দেওয়া হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বহু অনুরোধ করেন। স্বামীজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমরা যদি পাপী-তাপী

২। বর্ণনার সুবিধার জন্য এই কয় বৎসর মধ্যে অপর যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কথাও এখানেই বলিয়া রাখি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান পূজ্যপাদ হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মঠে যোগ দেন ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্বক বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন। সুশীলের দাদা সুধীর চক্রবর্তী স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা ও ব্রহ্মচর্যদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দের নিকট সন্ন্যাস লইয়া (১৮৯৭) শুদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হন। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী নির্মলানন্দ ও সদানন্দের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। স্বামীজীর বাকি সন্ন্যাসী শিষ্যদের পূর্ব নাম, গৃহত্যাগ-কাল, সন্ন্যাসের কাল ও সন্ন্যাসের নাম এই.:

পূর্ব নাম	গৃহত্যাগ-কাল	সন্ন্যাসের কাল	নূতন নাম
গোবিন্দচন্দ্র শুকুল	১৮৯৬	১৮৯৮-৯৯	আত্মানন্দ
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮৯৭	১৮৯৭	বিমলানন্দ
অজয়হরি ব্যানার্জি	১৮৯৭	২৯।৩।১৮৯৮	স্বরূপানন্দ
সুরেন্দ্রনাথ বসু		ঐ	সুরেশ্বরানন্দ
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	১৮৯৬	১৮৯৮	বোধানন্দ
মতিলাল মুখার্জি		১৮৯৯	সচ্চিদানন্দ (২)
কৃষ্ণলাল মুখার্জি		নভেম্বর, ১৮৯৯	ধীরানন্দ
কৃষ্ণমূর্তি নাইডু		মে, ১৮৯৯	সোমানন্দ
দক্ষিণারঞ্জন গুহ	১৮৯৮	জুন, ১৮৯৯ (?)	কল্যাণানন্দ
আশুতোষ মিত্র		মার্চ, ১৯০০	সত্যকামানন্দ
সুরজ রাও	১৯০১	১৯০১	নিশ্চয়ানন্দ
সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা	১৯০০	জানুয়ারি, ১৯০২	পরমানন্দ
কেদারনাথ মৌলিক	১৯০০	মে, ১৯০২	অচলানন্দ

দীনদুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তাহ'লে কে আর তাকে দেখবে? তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না'।” (‘বাণী ও রচনা’, ৯।৪৭)। স্বামীজী আরও বলিলেন, “ও ব্যক্তি যখন মঠে আশ্রয় নিয়েছে তখন এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ওর মন বদলে গেছে। আর তোমরা যদি অসৎ ব্যক্তিদিগকে সংশোধন করতে পারবে না মনে কর তবে গেরুয়া ধারণ করেছ কেন, আর আচার্য হতে যাচ্ছ কি বলে?” (বাঙ্গলা জীবনী, ৬৪৮)। স্বামীজীর ইচ্ছাই ফলবতী হইল, তিনি করুণাবিগলিত অন্তঃকরণে একটি মুমুক্ষু শরণার্থীকে ভবসাগর উত্তীর্ণ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই নীরব হইলেন।

দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুগণ পূর্বদিন মস্তকমুণ্ডনপূর্বক উত্তরীয় ধারণান্তে আত্মশ্রাদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র দুই দিন যাবৎ মঠেই ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, “তুই তো ভটচায বামুন; আগামী কাল তুইই তাদের শ্রাদ্ধ করিয়ে দিবি, পরদিন এদের সন্ন্যাস দেবো। আজ পাঁজি-পুঁথি সব পড়ে-শুনে দেখে নিস।” বেদমতে যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা সন্ন্যাসের পূর্বেই নিজে নিজের শ্রাদ্ধ সমাপন করেন, কারণ সন্ন্যাসের পর আর তাঁহাদের বৈদিক কর্মে অধিকার থাকে না এবং বংশ লুপ্ত হওয়ার পরে পিণ্ডদানের সম্ভাবনাও থাকে না। শিষ্য স্বামীজীর আদেশ পালন করিয়াছিলেন। “শ্রাদ্ধান্তে যখন ব্রহ্মচারি-চতুষ্টয় নিজ নিজ পিণ্ড অর্পণপূর্বক পিণ্ডাদি লইয়া গঙ্গায় চলিলেন, তখন স্বামীজী শিষ্যের মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘এসব দেখে শুনে তোর মনে ভয় হয়েছে—না রে?’ শিষ্য নতমস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, ‘সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হল; কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—এরা ব্রহ্মবীর্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলন্ত পাবকের মতো অবস্থান করবে। ‘ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব-মানশুঃ’।” কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারি-চতুষ্টয় এই অবসরে গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজীর পাদবন্দনা করিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, ‘তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয়েছ, ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।’

“সেইদিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী কেবল সন্ন্যাসধর্ম-বিষয়েই কথা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসব্রত-গ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হ'লে কেউ কখন ব্রহ্মজ্ঞও হ'তে পারে না—এ কথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা করছে। যারা বলে এ সংসারও ক'রব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদপেই শুনবিনি। ওসব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে, এতটুকু কামনা যার রয়েছে, ও কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয় হয়; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য ব'লে বেড়ায়—‘একুল ওকুল দুকুল রেখে চলতে হবে।’ ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্ত্রীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ। ‘নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়’।”

এই ধারায়ই কথা চলিতে লাগিল। স্বামীজী সন্ন্যাসের মহিমা কীর্তন ও ব্রহ্মচারীদিগকে উৎসাহপ্রদানের উদ্দেশ্যে আবেগভরে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। শিষ্য শরৎবাবু মৃদু-

ভাবে গৃহস্থজীবনের ভাল দিকটা দেখাইলেও তখন তাঁহার সেদিকে মন দিবার অবকাশ ছিল না—মন তখন সন্ন্যাসের উচ্চ পরদায় চড়িয়া আছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও সে রাত্রের আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। পরিশেষে স্বামীজী এই বলিয়া শেষ করিলেন: "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা এই উচ্চ লক্ষ্য ভুলে যায় 'বৃথৈব তস্য জীবনম্'। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"

আবার গুরুভ্রাতাদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন: "'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আমাদের জন্ম; কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ্—জাগ্, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্, নরজন্ম সার্থক ক'রে চলে যা। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।"

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে স্বামীজী ব্রহ্মচারীদিগকে বলিলেন, "খুব ভেবে-চিন্তে এপথে এগুবে; পুরাতন জীবনে ফিরে যাবার এখনও সময় আছে। তোমরা কি আমার আদেশ অম্লান-বদনে মানতে পারবে? আমি যদি তোমাদের বাঘের সামনে বা বিষধর সাপের সামনে যেতে বলি, যদি বলি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমীর ধরে আন, যদি বাকি জীবন আসামের চা-বাগানে কুলী হিসাবে কাজ করার জন্য বেচে দিই, অথবা যদি না খেয়ে মরতে বলি বা তুষানলে পুড়ে মরতে বলি—এই ভেবে যে এতে তোমাদের মঙ্গল হবে—তবে তোমরা আমার কথা তখনি মানতে রাজী আছ কি?" ব্রহ্মচারীরা অবনত-মস্তকে স্বীকৃতি জানাইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিলেন।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বামীজী বিদেশ হইতে ফিরিয়া শুধু সকলকে কাজে লাগাইবারই জন্য ব্যস্ত ছিলেন না; উপদেশ, শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির সাহায্যে সকলের সাধুজীবন সুগঠিত করিতেও বিশেষ যত্নপর ছিলেন। তিনি কিরূপে ধ্যান শিক্ষা দিতেন, এই বিষয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিয়াছেন: "স্বামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া সাধনভজন শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'প্রথমে সকলে আসন ক'রে বস, আর ভাব্,—আমার আসন দৃঢ় হোক, এই আসন অচল অটল হোক, এর সাহায্যেই আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হবো।' এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন, 'এইরূপ ভাব্ যে, আমার নিকট হ'তে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর হতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে- সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক। এইরূপ ভাবনার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি; অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের ইষ্ট-মূর্তির চিন্তা ও মন্ত্রজপ—এইটি আধঘণ্টা আন্দাজ করবি।' সকলেই স্বামীজীর উপদেশমত চিন্তাদির চেষ্টা করিতে লাগিল। এইভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশে নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া বহুকাল যাবৎ 'এইবার এইরূপ চিন্তা কর, তারপর এইরূপ কর' বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান

করিয়া স্বামীজী-প্রোক্ত সাধনপ্রণালী অভ্যাস করাইয়াছিলেন।” (‘বাণী ও রচনা’, ৯।৩৫০-৫১)।

স্বামীজী তখন নবাগত ব্রহ্মচারীদের জীবন-গঠনের প্রতি কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন তাহা স্বামী শুদ্ধানন্দ-লিখিত একটি ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। বরাহনগরে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বামীজী একবার আমেরিকা হইতে ঐ আশ্রমের জন্য কিছু টাকাও পাঠাইয়াছিলেন। আলোচ্য সময়ে আলমবাজার মঠে দৈনিক একখানি ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ কাগজ আসিত; কিন্তু পিয়ন অতদূরে না আসিয়া কাগজখানি বিধবাশ্রমে রাখিয়া যাইত ও স্বামী নির্ভয়ানন্দ উহা লইয়া আসিতেন। তখন নির্ভয়ানন্দের অনেক কাজ; তাই তিনি ভাবিলেন কাগজ আনার ভার ব্রঃ সুধীরের (শুদ্ধানন্দের) উপর দিলে বেশ হয়। সুধীরও রাজী হইলেন। জায়গাটা চিনিয়া লইবার জন্য যখন সুধীর অপরাহ্ণে নির্ভয়ানন্দের সঙ্গে ঐ দিকে যাইতেছিলেন, তখন স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়া শাস্ত্রপাঠের জন্য ডাকিলেন কিন্তু সুধীর বলিলেন, তিনি কাগজ রাখার জায়গা দেখিতে বিধবাশ্রমে যাইতেছেন; এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু একজন ব্রহ্ম-চারী এভাবে শাস্ত্রপাঠ ফেলিয়া বিধবাশ্রমে কাগজ আনিতে যাইবে, ইহা স্বামীজীর মনঃপূত ছিল না, তাই অপরদের সহিত কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ইহাই যথেষ্ট ছিল। সুধীর ফিরিয়া আসিয়া যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন সেখানে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। (ঐ, ৯।৩৫২-৫৩)।

সর্বতোভাবে শিষ্যদের জীবনগঠনের প্রতি দৃষ্টি থাকিলেও স্বামীজীর মূল উদ্দেশ্য ঠিকই ছিল—জগদ্ধিতায় সাধুদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে হইবে। কাজেই শিষ্যদের প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরুভ্রাতাদিগকেও কাজে নামাইতে যত্নপর হইলেন। গুরুভ্রাতারা সকলে স্বামীজীর এই নবীন উদ্যমের সহিত একমত না হইলেও এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ধারার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে কিনা এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ থাকিলেও ভালবাসার টানে অনেকেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিলেন। ইহার প্রথম ফল ফলিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাদ্রাজ গমনে। তিনি এতদিন বরাহনগর ও আলমবাজারের মঠে থাকিয়া একনিষ্ঠভাবে ঠাকুরের পূজাদি করিতেছিলেন। বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু নেতা যাই আদেশ করিলেন যে, তাঁহাকে প্রচারের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ যাইতে হইবে, অমনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি সেখানে চলিলেন (১৮৯৭ মার্চ মাসে)। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাকে নেতার আসনে বসাইয়াছেন, তাঁহার আদেশ মানিয়া চলাই তো অপরের কর্তব্য। স্বামীজী মাদ্রাজ ত্যাগের প্রাক্‌কালে বলিয়া আসিয়াছিলেন, “আমি তোমাদের কাছে এমন একজনকে পাঠাইব, যে তোমাদের সবচেয়ে গোঁড়ার চেয়েও গোঁড়া এবং তোমাদের পণ্ডিতদের চেয়েও বেশী পণ্ডিত।” আজ তাঁহার সেই সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার সহকারী স্বামী সদানন্দের সহিত মাদ্রাজে পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত বিলিগিরির ভবন ক্যাসল কার্নানের একাংশে আশ্রয় পাইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শাস্ত্র-প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। শীঘ্রই তিনি ট্রিপ্লিকেনে আইস হাউস রোডের উপর একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া আশ্রম স্থাপন করিলেন ও

উহার নাম রাখিলেন 'রামকৃষ্ণ হোম'। তিন মাস পরে শ্রীযুক্ত বিলিগিরির আগ্রহে আশ্রমটি ক্যাসল কার্নানেই স্থানান্তরিত হইল। এই আশ্রম আলমবাজার মঠেরই নিয়মানুসারে পরিচালিত হইত।

এই কালে স্বামীজীর সেবাব্রতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া, তাঁহারই পরিকল্পনানুসারে এবং তাঁহারই অর্থানুকূল্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যে অবতীর্ণ হইলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বেই স্বামীজী আবু পর্বতের সন্নিকটে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, "আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমঘাট ঘুরিয়া আসিতেছি। কিন্তু হায়, স্বচক্ষে দেশবাসীর যে দুর্দশা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এখন আমি বেশ বুঝিতেছি যে, দেশের এই হীনতা ও দারিদ্র্য না ঘুচাইতে পারিলে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা। এই জন্যই অর্থাৎ ভারতের মুক্তির উপায়বিধানের জন্যই বর্তমানে আমি আমেরিকা যাত্রা স্থির করিয়াছি।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৬৪৬)। স্বামী অখণ্ডানন্দ যে উভয় গুরু-ভ্রাতার মুখে এই কথা শুনিয়াছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দেরই পরামর্শে রাজপুতানায় গিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর আদর্শানুসারে কাজে ব্রতী হইয়া সেখানে কিছুকাল কাটাইয়া-ছিলেন—ইহা তিনি স্বীয় 'স্মৃতি-কথা'য় স্বীকার করিয়াছেন। রাজপুতানায় অবস্থানকালে তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, তিনি গরীবদের শিক্ষার জন্য কিছু করেন এবং এই বিষয়ে আমেরিকায় স্বামীজীকে পত্র লিখিয়া ও উত্তরে তাঁহার উৎসাহ পাইয়া ঐ কার্যে ব্রতী হন। অধুনা মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি দেখিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিল এবং তিনি কিছু করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তখন স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে স্বামীজী মার্চ মাসের মাঝামাঝি দার্জিলিং গিয়াছিলেন; সেখান হইতে মঠে ফিরিয়া যখন স্বামী অখণ্ডানন্দের খোঁজ করিলেন তখন স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে জানাইলেন যে, মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দুঃখে বিষাদগ্রস্ত অথচ নিরুপায় হইয়া তিনি কোন উপায়ে তাহাদিগকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাহাদেরই মধ্যে দিন কাটাইতেছেন; প্রেমানন্দজী স্বামীজীকে অখণ্ডানন্দের তিনখানি পত্রও দেখাইলেন। স্বামীজী দুঃস্থদের দুঃখে বিচলিত ও অখণ্ডানন্দের সঙ্কল্পে হর্ষান্বিত হইয়া তখনই তাঁহাকে উৎসাহ-পূর্ণ পত্র লিখিলেন :—১৫ই জুন ১৮৯৭। "সাবাস বাহাদুর! ওয়া গুরুজীকী ফতে!! কাজ করে যাও, যত টাকা লাগে আমি দেবো।" স্বামীজী নিজ তহবিল হইতে দেড়শত টাকা দিলেন ও দুইজন সহকারীও পাঠাইলেন—সুরেন্দ্র (সুরেশ্বরানন্দ) ও নিত্যানন্দ। এইভাবেই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম প্রণালীবদ্ধ সেবাকার্য আরম্ভ হইল। ('স্মৃতিকথা', ২৪০—৪১ পৃঃ)।

ইহারই কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও ব্রহ্মচারী সুধীরের (স্বামী শুদ্ধানন্দের) মন্ত্রদীক্ষা হইল (১৯শে বৈশাখ, ১৩০৪ বা ১লা মে, ১৮৯৭)।[৩] সন্ন্যাসের পূর্বে স্বামীজী ব্রহ্মচারী-

৩। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড' ৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল, ১৮৯৬) ভুল বলিয়া মনে হয়; কারণ তখন স্বামীজী বিদেশে ছিলেন। তাই ১৮৯৭ এর ১লা মে আলমবাজার মঠে দীক্ষা হইয়াছিল এবং ঐ দিনই বিকালে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য (১লা মে, ১৮৯৭) আলমবাজার হইতে বলরামবাবুর বাটীতে গিয়াছিলেন বলিতে হইবে। অথচ উক্ত গ্রন্থের বর্ণনাতে আছে, "স্বামীজী কয়েকদিন বাগবাজারের বলরামবাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।" এই কথার পরেই মিশন প্রতিষ্ঠার কথার (১লা মে) ও উহার কার্যাবলী স্থিরীকরণের কথায় (৫ই মে) অবতারণা করা হইয়াছে। আমাদের ধারণা শরৎবাবু ঐ স্থলে প্রধানতঃ ৫ই মের ঘটনাবলী লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে ১লা মের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ না মানিলে সামঞ্জস্য পাওয়া দুষ্কর।

দিগকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, দীক্ষাকালে শরচ্চন্দ্রকেও তেমনি বলিলেন, "আমি তোকে যখন যে কাজ করতে বলব, তখনি তা যথাসাধ্য করবি তো? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তাহলে তাও নির্বিচারে করতে পারবি তো? এখনও ভেবে দেখ। নতুবা সহসা গুরু বলে গ্রহণ করতে এগোস নি।" শিষ্য নতশিরে 'পারিব' বলিয়া উত্তর দিলেন; তাঁহার দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষান্তে স্বামীজী গুরুদক্ষিণা চাহিলেন। শিষ্য বলিলেন, "কি দিব?" স্বামীজী কহিলেন, "যা, ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়।" শরৎবাবু দশ-পনরটি লিচু আনিয়া স্বামীজীর হস্তে দিলেন। ইহার পর ব্রহ্মচারী সুধীর দীক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বামীজী তাঁহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।

অর্থাভাব না মিটিলেও কাজ কিছু কিছু আরম্ভ হইয়া গেল, লোকও প্রস্তুত হইতে থাকিল। এখন আবশ্যক হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যাহা প্রণালীবদ্ধরূপে কার্য পরিচালনা করিবে। কর্মব্যপদেশে কলিকাতায় থাকার প্রয়োজন ঘটিলে স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতারা ৺বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহে (৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রীট, বাগবাজার) উঠিতেন এবং ঐ ভক্ত-পরিবারের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। ঐ পরিবার অন্যত্র চলিয়া গেলেও গৃহদ্বার সর্বদা সাধুদের জন্য উন্মুক্ত থাকিত আলমবাজারে পূর্ববর্ণিত দীক্ষাকার্য সমাপনান্তে স্বামীজী ঐ বাটীতে আসেন এবং কিছুদিন সেখানেই থাকেন। ঐ সময়ে তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি রূপ পরিগ্রহ করে; ঐ বাটীতেই ১লা মে (১৮৯৭) 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন'-এর সূত্রপাত হয়। ঐ দিন ৩টার পর বৈকালে বহু ভক্ত ঐ বাটীর দ্বিতলে সমবেত হইলেন। সকলে উপবেশন করিলে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন: "নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। তবে আমাদের মতো দেশে প্রথম হ'তে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরী করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক ব'লে মনে হয় না। ওসব দেশের (পাশ্চাত্ত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মতো দ্বেষপরায়ণ নয়। তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। এই দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদরযত্ন করেছে! এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্র-মতে সঙ্ঘের কাজ চালাতে পারবে। সেইজন্য এই সঙ্ঘে একজন ডিক্টেটর বা প্রধান একনায়ক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে।

"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ ক'রে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কাজে সহায় হোন।" ('বাণী ও রচনা', ৯।৬০-৬১)।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত সকলে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল, এবং পরবর্তী ৫ই মে তারিখের দ্বিতীয় সভায় কার্যপ্রণালী প্রভৃতি আলোচিত ও গৃহীত হইল। উহার নাম হইল 'রামকৃষ্ণ-প্রচার' সমিতি বা 'রামকৃষ্ণ মিশন' অ্যাসোসিয়েশন। স্থিরীকৃত কার্যপ্রণালী এই:

উদ্দেশ্য—মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রত—জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তরমাত্র-জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।

কার্যপ্রণালী—মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য—ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রতগ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রম স্থাপন, এবং যাহাতে তাঁহারা দেশদেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্যবিভাগ — ভারতবহির্ভূত প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রম-সকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি বর্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপন।

স্বামীজী স্বয়ং উক্ত 'প্রচার' সমিতির সাধারণ সভাপতির পদ অলংকৃত করিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ যথাক্রমে কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি ও উপ-সভাপতি হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্নী মহোদয় হইলেন ইহার সেক্রেটারী এবং ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার হইলেন সহকারী সেক্রেটারী। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সাধারণ শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মও বিধিবদ্ধ হইল যে, বলরামবাবুর ঐ ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটের বাটীতেই প্রতি রবিবারে চারিটার পর উক্ত সমিতির অধিবেশন বসিবে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় বার বিদেশগমন পর্যন্ত স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে যথারীতি সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিতেন এবং উপদেশ দিয়া কিংবা কিন্নরকণ্ঠে গান শুনাইয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেন। এই সাপ্তাহিক সভার অধিবেশন কিছুকাল পর্যন্ত ঠিক ঠিক চলিয়াছিল। কিন্তু বেলুড় মঠ স্থাপনের কিছু পরে সমিতির কার্য বন্ধ হইয়া যায়, অনেক পরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আইনানুসারে (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ অ্যাক্ট) 'রামকৃষ্ণ মিশন'-নামে রেজেস্ট্রী হইয়া পুনর্জীবন ও স্থায়িত্ব লাভ করে

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' উদ্ধৃত না হইলেও সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে আরও দুইটি অংশ সংযুক্ত ছিল:

"মিশনের লক্ষ্য ও আদর্শ যেহেতু কেবল আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক, অতএব রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।

"উপযুক্ত উদ্দেশ্যগুলির সহিত যাঁহার সহানুভূতি আছে বা যিনি বিশ্বাস করেন শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব জগতে কোন বিশেষ কার্যসাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি এই সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিবেন।" (ইংরেজী জীবনী ৫০১-২ পৃঃ।)

(ক্রমশঃ)

‘প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্’

ডক্টর শ্রীমুরলীমোহন বিশ্বাস

‘প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্’-এর কারণ রচয়িতার মনে যাই থাকুক, শাস্ত্রীয় অর্থ টীকাকার যাই করুন, বিজ্ঞানের জ্ঞানেও এর ব্যাখ্যা করে প্রণাম জানাবার ভাষ্য দেওয়া যায়।

‘জবাকুসুমসঙ্কাশ’ কেবল উদয়াস্তে। সূর্যের গা থেকে বহু বিভিন্ন রূপের কিরণ বিকিরিত হয়। কশমিক রশ্মি, গামা রশ্মি, এক্স্ রশ্মি, আলট্রা-ভাইওলেট রশ্মি, আলোক-রশ্মি, ইনফ্রারেড তরঙ্গ, রেডিও তরঙ্গ। কিরণের অঙ্গ বলে কিছু নাই, বিভিন্ন বিকিরণ শুধু বিভিন্ন আকারের তরঙ্গ। লম্বায় সবচেয়ে ছোটো তরঙ্গ কশমিক রশ্মি, এক মিটারের কোটি কোটি ভাগের ভাগ। সবচেয়ে বড়ো রেডিও তরঙ্গ, এক একটি হাজার হাজার মিটার। চোখে দেখা যায় কেবল আলোক-রশ্মি। আলোর সাদা রঙ আসলে সাতটি রঙের খিচুড়ি। রঙ সাতটি—বেগুনি, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। এর অকাট্য প্রমাণ রামধনুতে সাতটি রঙের মেলা। প্রতি রঙ একটি করে নির্দিষ্ট মাপের তরঙ্গ। ওরই মধ্যে লাল তরঙ্গ বড়ো, বেগুনি তরঙ্গ ছোটো। সকাল-সন্ধ্যে সূর্যকে পৃথিবীর একদম কোল ঘেঁষে দেখায়। তখন পৃথিবীঘেরা বায়ুস্তরের ভিতর দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে শুধু লালতরঙ্গ পৃথিবীতে পৌঁছয়। বাকী ছ’টি বায়ুমণ্ডল থেকে ছিটকে ছিটকে পিছু হ’টে ছাকা হয়ে যায়। তাই সাঁঝসকালের সূর্য টকটকে লাল।

সূর্যের জন্মতথ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্রে রয়েছে এক তত্ত্ব। এ তত্ত্বকথা অ্যাসট্রোলজির নয়, অ্যাসট্রোনমির। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির এমন এক আখ্যান রয়েছে যা থেকে সূর্যের জন্মের উপাখ্যানটি জানা গেছে। রাত্রে আকাশ জুড়ে কত জ্যোতিষ্কের উঁকিঝুঁকি। এ-রকম কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে সূর্যসমেত আমাদের এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এমনটি কিন্তু সৃষ্টির আদি হতেই ছিল না। সে কোনো-এক কাল ছিল যখন ব্রহ্মাণ্ডে কোনো সূর্যের নামগন্ধ ছিল না। ছিল শুধু একটানা গ্যাস। তাও খুব ফাঁক ফাঁক হয়ে। গ্যাসে ছিল কেবল হাইড্রোজেন-পরমাণু। এ হল ব্রহ্মাণ্ডের সবে-মাত্র ভ্রূণ-অবস্থা। আদিম একটানা গ্যাস-রাজ্য বহুকোটি বছর ধরে ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি মাইল জায়গা জুড়ে ভেসেছে। তাপ ছিল ১০,০০০ থেকে ২৫,০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড। পরমাণুর পরস্পর টানে বিস্তৃত গ্যাসের মধ্যে সামগ্রিকভাবে মাধ্যাকর্ষণের সৃষ্টি হয়। ফলে ছড়ানো গ্যাস জড়ো হয়ে কিছু ঘন হয়। ঘন-গ্যাসমহল থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে থাকে। শেষে তাপ দাঁড়ায় ১০,০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড। এক পর্যায়ে অবিরল গ্যাসব্রহ্মাণ্ড ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতো ভাগ হয়ে যায়। প্রতি ভাগ আবার মাধ্যা-কর্ষণে জড়ো হয়ে ঘন থেকে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। সাইজে কমে, আরো তপ্ত হয়। ক্রমে জায়গায় জায়গায় খুব ঘন হয়ে চারপাঁচ ভাগ হয়ে যায়। এদের আবার দফায় দফায় সংকোচন ও বিভাজন চলতে থাকে। থামে এসে শেষ পরিচ্ছেদে। তখন এক-একটি

গ্যাসসমুদ্র খুব ঠাসা আর খুব গরম। ক্রমে এরা ভেসে ওঠে নক্ষত্ররূপে। এ-রকম করে কোনো-এক কালের একটানা-বিছানো মহাকায় গ্যাসসমুদ্র বহুবার ভাগ হয়ে জন্ম দিয়েছে হাজার হাজার মাইল ব্যাস জুড়ে প্রচণ্ড চাপযুক্ত ও অসম্ভব তাপবিশিষ্ট গোলাকার গ্যাসপিণ্ডের—কোটি কোটি নক্ষত্রের। সৃষ্টির সুরু হতে ভাস্কররূপে উদ্‌ভাসিত হতে এগুলির সময় লাগে কোটি কোটি বছর। এরা আদিম বা প্রাচীন। প্রাচীনদের বয়স ৪,০০০,০০০,০০০ থেকে ৮,০০০,০০০,০০০ বছর। পরস্পর দূরত্ব বহু কোটি কোটি মাইল। এ জায়গায়ও নক্ষত্রদের গা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া ধুলোমেশানো গ্যাসরাজ্য ভেসেছে, এখনো ভাসছে। কালে কালে এ-ধুলিমিশ্রিত গ্যাস-সমুদ্র মাধ্যাকর্ষণে জড়ো হয়ে ঘন ও গরম হয়েছে। ক্রমে তা ভেঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে আরো কত নক্ষত্র। আমাদের অলক্ষ্যে এখনো কোথাও-না-কোথাও চলছে এ সৃষ্টিক্রিয়া। এরা তরুণ। আমাদের সূর্য তরুণদেরই একজন। তবুও ইতিমধ্যে তার বয়স হয়ে গেছে ৫,০০০,০০০,০০০ বছর। এ হল সূর্যের জন্ম-বৃত্তান্ত। সূর্য সম্পর্কে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ, দূরত্বে সবচেয়ে নিকট; এরোপ্লেনে গেলে ২১ বছরের রাস্তা। কোনো যাত্রী যথেষ্ট পরিমাণ রসদ নিয়ে প্লেনে ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে পাড়ি দিলে ৯,৩০০,০০০ মাইল দূরে সূর্যে পৌছবে একুশ বছর পরে। আলো সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে সূর্য হতে পৃথিবীতে পৌছয় আট মিনিটে। সবচেয়ে কাছের দ্বিতীয় নক্ষত্র প্রক্‌সিমা-সেন্‌টরি। আকারে-প্রকারে সূর্যেরই সমকক্ষ। সবচেয়ে কাছে হলেও এতদূরে যে, সেন্‌টরি-রশ্মির সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীতে আসতে লাগে চার বছরেরও বেশি। দূরত্বটি কত? কাছাকাছি আরেকটির নাম ৬১-সিগনি। এর যে-ছটা যে-মুহূর্তে টেলিস্‌-কোপে এসে পৌছয় সে এর গা হতে যাত্রা সুরু করেছিল সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে তার এগারো বছর আগে। ১০০,০০০,০০০,০০০ নক্ষত্র রয়েছে আমাদের এ-ব্রহ্মাণ্ডে। ব্রহ্মাণ্ডটির নাম ছায়াপথ, বৈজ্ঞানিক নাম গ্যালাক্‌সি। এ-গ্যালাক্‌সি ছেড়ে গিয়েও বহুদূরে স্থানে স্থানে রয়েছে কত কোটি কোটি তারকা নিয়ে এক-একটি গ্যালাক্‌সি। আবার এ-রকম কত কোটি গ্যালাক্‌সি আছে।

আদিত্য 'মহাদ্যুতি'। তার গায়ের তাপ ৬,০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড, কেন্দ্রের ২০,০০০,০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড। ব্যাস ৮৬৪,০০০ মাইল, পৃথিবীর প্রায় ১০৯ গুণ। বস্তুর পরিমাণ ২,২৫০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন, পৃথিবীর ৩৩২,০০০ গুণ। আমাদের মতো আদার ব্যাপারীর কাছে এসব জাহাজের খবর হলেও জ্যোতিষ্কসমাজে এ খুব সাধারণ। সূর্যের গায়ের প্রতি বর্গসেনটিমিটার জায়গা থেকে ৬,০০০ ওয়াট শক্তি বের হচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য যে-তাপ ছেড়ে দিচ্ছে তুলনা করলে তা পাওয়া যায় সেকেণ্ডে ১১৫,০০০,০০০,০০০ টন কয়লা পুড়িয়ে। এর ছিটেফোঁটা পৃথিবীর পিঠে এসে পড়ে। আসে সমস্ত বিকিরিত শক্তির প্রায় ২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীতে এমন কোনো হদিস জানা নাই যা দিয়ে সূর্যের যুগযুগ ধরে যোগানো এত তাপ আর আলোর হিসেব মেলানো যায়। পৃথিবীর বুকে প্রাণের আস্তানা হয়েছে ৫০০,০০০,০০০ বছর আগে হতে। কমসে কম এত বছর আগে থেকে সূর্য ঠিক সমানে কিরণ দিয়ে আসছে। একটি সাধারণ বোমা (অ্যাটম-বোমা বা হাইড্রোজেন-বোমা ছাড়া) ফাটলে বা কাঠ কি

কয়লা বা তেল পুড়লে যে-তাপ আর যে-আলো দেখা যায়, তা রাসায়নিক দহনপ্রণালী দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। পদার্থের পোড়নকে বিজ্ঞানের ভাষায় দহন বলে। সূর্যে এ-রকম কোনো বস্তুর দহন চললে কবে এতদিন পুড়ে ছাই হয়ে যেত। সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন ভীষণ তাপে জোড়া লেগে হীলিয়ম হচ্ছে। ছোটো দুটি করে পরমাণু প্রচণ্ড তাপে জোড়া লেগে তৃতীয়-একটি বড়ো পরমাণু হওনকে বলে পরমাণুর ফিউসন। হাইড্রোজেন-পরমাণু সবচেয়ে ছোটো, পরের-বড়ো পরমাণু হীলিয়ম। ফিউসনের সঙ্গে তাপ জন্মায়। সূর্য ও তারকায় দিনরাত্রি চলছে ফিউসন। সৃষ্টি হচ্ছে অসীম তাপ। জ্যোতিষ্কদলের মহাদ্যুতি পরমাণুর ফিউসন-জনিত পরমাণুশক্তির প্রকাশ। হাইড্রোজেনবোমা বিস্ফোরণে একই ব্যাপার ঘটে। এর মশলা হাইড্রোজেন-পরমাণু। এ বোমা ফাটলে হাইড্রোজেনের ফিউসন হয়ে হীলিয়ম হয়। সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব তাপ ওঠে। তাই হাইড্রোজেনবোমা এত বিভীষণ। সূর্য অফুরন্ত বস্তুর রাশ। প্রতি সেকেণ্ডে ৮০০,০০০,০০০ টন হাইড্রোজেন-বস্তু হীলিয়ম হচ্ছে। তার মধ্যে ৬,০০০,০০০ টন বস্তু একদম বদলে তাপ রূপ নিচ্ছে।

সূর্য 'ধ্বান্তারি'। তার উদয়ে আঁধার ঘুচে আলো আসে। বিশ্রামের ছেদ টানা হয়ে শ্রমের সাড়া পড়ে। এমন কি সূর্য ডুবে ডুবেও আলো পাঠায়। সে আলো তো আলো নয়, ছাঁকা আনন্দ। চাঁদ হচ্ছে ঠকঠকে শুকনো মাটি। চাঁদের হাসি হল তার মেটে গা থেকে ঠিকরে-আসা সূর্যের কিরণরাশি

মন বস্তু নয়, বস্তুর ভিতর মন নাই। কিন্তু মনের যতকিছু অনুভূতি জেগে ওঠে সাকার বস্তুকে দেখে বা বস্তুর কোনো-না-কোনো রূপকে মনে করে। সমুদ্র, পর্বত, নীল আকাশ মনকে কত ভাবে ভাবিত করে। অসহায়ের আর্তনাদ-মূর্তি সৃষ্টি করে করুণা, বীরের হুংকাররূপ দেয় বীরত্ব, শান্তসৌম্যমূর্তি আনে শান্তি। শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রেমপ্রীতি, স্নেহমমতা, সুখদুঃখ, লজ্জাঘৃণা সবই বস্তুসাপেক্ষ। আবার মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পায় বস্তুকে বাহন করে। ড্রইংডিজাইন, আর্ট আর্কিটেক্চার থেকে সুরু করে দেবদানবের মূর্তির মধ্যে মনের ভাবই ফুটে ওঠে। মন বস্তুর রূপ দেয়, তৈরি হয় বস্তুজগৎ। বস্তু মনকে ভাব জোগায়, সৃষ্টি হয় দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য। মনের রাজ্যে পাপ, বস্তুরাজ্যে বীজাণু একই গোত্রীয়। মন ও বস্তুর সম্বন্ধ যেমন অচ্ছেদ্য, পাপ ও বীজাণুর সম্বন্ধও তেমনি। দেহবস্তুতে মন কাজ করে। মনের দুর্বলতায় আসে আধি, দেহের দুর্বলতায় আসে ব্যাধি। মনের দুর্বলতা পাপ, দেহের দুর্বলতা রোগ। মন ও দেহ—একটি আরেকটি নয়। অথচ একটির সঙ্গে আর একটির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এ-রকম পাপের সঙ্গে রোগের। সম্পর্ক না থেকেও রয়েছে ঘনিষ্ঠতা। দুর্বল মন দেহকে রোগগ্রস্ত করে, আবার রুগ্ণ দেহের মন দুর্বল হয়ে যায়। তাই মনের পীড়ার সঙ্গে দেহের পীড়ার ঘনিষ্ঠ যোগ। একটি আরেকটিকে টেনে আনে। যে দেহের রোগ-বীজাণু বিনাশ করে, সে একহিসেবে মনকে পাপবিমুক্ত করে। সূর্যতেজ বহু রোগবীজাণু নষ্ট করে। এ দিক থেকেও প্রকারান্তরে সূর্য 'সর্বপাপঘ্ন'।

আজকের দুনিয়ায় জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই চলে মেসিন দিয়ে। মেসিন সচল রাখার উপায় পাওয়ার-সাপ্লাই। এ-সাপ্লায়ের আদি উৎস সৌরশক্তি। কাঠ, কয়লা বা পেট্রোল উপলক্ষমাত্র। উদ্ভিদের সবুজ অংশ বায়ু হতে কারবন ডাই-অকসাইড আর মাটি

থেকে জল শুষে সৌরশক্তির সাহায্যে কারবনকে আটকে কারবনযুক্ত পদার্থ ভিয়েন করে, অকসিজেন ছেড়ে দেয়।

কারবন ডাইঅক্সাইড + জল + সৌরশক্তি→
কারবনযুক্ত পদার্থ + অকসিজেন।

সূর্যকিরণ গাছকে যে-শক্তি দেয় তা দিয়ে কাঠ তৈরি হয়। কাঠ মজুত সৌরশক্তির ডিপো। কয়লা ও পেট্রোল তো কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর গর্ভে কবর-পাওয়া উদ্ভিদ। কাঠ, কয়লা ও পেট্রোলের দহনে কাঠে-জমানো সৌরশক্তি ফিরে পাওয়া যায়। সৌরশক্তি তাপ ও আলো হয়ে ফেরত আসে। কয়লা বা পেট্রোল জ্বালিয়ে যে-তাপ আর যে-শক্তি মেলে তার ডেরা ছিল সে কোন এক যুগে আমাদের কাছ হতে ন-কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে— সূর্যে। এমন-কি জলের তোড়ে তৈরী হাইড্রো-ইলেকট্রিক-পাওয়ার সূর্যেরই ক্রিয়া। সমুদ্র হতে শোষিত জল মেঘের রূপ নিয়ে বৃষ্টিধারায় নদনদীর বুক বেয়ে জলশক্তি সৃষ্টি করে সমুদ্রে মেশে। প্রাণীর দেহযন্ত্র চলে সৌরশক্তির শক্তিতে। আমাদের খাদ্য আসে উদ্ভিদরাজ্য আর প্রাণি-জগৎ হতে। এ-প্রাণী জীবনধারণ করে হয় কোন উদ্ভিদ না-হয় দ্বিতীয় কোন প্রাণীকে আহার ক'রে। এমন করে যত প্রাণীকেই টেনে আনা যাক, ঘুরে ফিরে আসবে সবুজ উদ্ভিদ। সবুজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় সৌরশক্তির সাহায্যে।

এ অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মহাকায়ার একটু ঠাঁই-এ সূর্য সজোরে পৃথিবীকে আটকে রেখে যুগ যুগ ধরে আলো, তাপ ও শক্তি যুগিয়ে প্রাণকে জাগিয়ে রেখেছে। ধ্বান্তারি, সর্ব-পাপঘ্ন বলে সূর্য আমাদের শুধু মনের পাওয়ার-হাউস নয়, আমাদের দেহযন্ত্রেরও পাওয়ার-হাউস, জীব-জগতেরও (Material world) পাওয়ার-হাউস। এসব কথা মনে হলে মনে স্বতই জেগে ওঠে, "প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।"

"পুঁতিপাতড়া, বিদ্যেসিদ্যে, যোগধ্যান-জ্ঞান— প্রেমের কাছে সব ধুলসমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো, নরনারী শরীরধারী প্রভুর পুজো। আর যা কিছু "নেদং যদিদমুপাসতে।"

"তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ
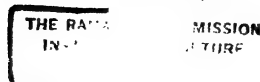
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে লিখিত
রমঁ্যা রলঁ্যার একখানি পত্র*

ভিলেনিউভ. (ভউড) সুইস.
ভিলা ওল্‌গা
১২-৯-১৯২৭

প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় স্বামী শিবানন্দ,

শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য আপনার হইয়াছিল; শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগী একজন ফরাসী আমি, আপনার নিকট এই পত্র লিখিবার অনুমতি চাহিতেছি।

এক বৎসর পূর্বে আমি ও আমার ভগিনী ম্যাডলিন রলঁ্যা অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িয়াছি। প্রেম ও জ্যোতির সেই দিব্য উৎসের কথা পাশ্চাত্য জগৎকে জানাইতে চাই। সর্বধর্ম-সমন্বয় ও ঐক্যের এই অভিব্যক্তির—বহুরূপে প্রকাশিত অথচ অরূপ এবং সর্বান্তরাত্মা ঈশ্বরের উপলব্ধির বিষয় আধুনিক যুগের মানবজাতির নিকট প্রচার করা এখন সর্বাধিক প্রয়োজন।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এমন মৌলিক ভারতীয় ভাবাপন্ন পুরুষকে একখানি পাশ্চাত্য গ্রন্থে অনূদিত (অর্থাৎ স্থানান্তরিত) করা অতিশয় দুরূহ কাজ। কারণ তাঁহার কোন কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি ইউরোপের জনসাধারণের প্রায় সকলের নিকটই দুর্বোধ্য হইবে এবং তাঁহার জীবন ও ভাবধারার অত্যাবশ্যক গুণরাজি অজ্ঞাত থাকিবার আশঙ্কা সতত বিদ্যমান থাকিবে; অথচ এইগুলিই তাহাদের প্রভূত উপকার বা সাহায্য করিবে। এজন্যই আমি এই কাজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি—যে পর্যন্ত অভীপ্সিত গ্রন্থ-রচনার কাজের একটা জীবন্ত ও যথার্থ সামঞ্জস্য আমার মধ্যে উপস্থিত না হয়, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি।

এই অলোকসামান্য পুরুষকে আপনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন; অতএব আপনার সহিত সরাসরি পত্রালাপ করিতে সমর্থ হওয়ার সুযোগ আমার কাছে অতিশয় মূল্যবান। আমাদের এই যুগ অত্যন্ত বুদ্ধিসর্বস্ব; ইতিহাসের যাবতীয় অতিমানবদের লৌকিক সত্তা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করার একটা প্রবণতা এই যুগের আছে। উচ্চ আদর্শের জ্বলন্ত পতাকাবাহী এইসব অতিলৌকিক পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের ভান করিতে গিয়াও এই যুগের বুদ্ধি-বাদীরা তাঁহাদিগকে একটা জাতি ও একটা যুগের ভাবপ্রসূত আদর্শসমূহের প্রতীক মাত্র বলিয়াই মনে করেন; যীশু বা বুদ্ধ কোনকালে জন্মিয়াছিলেন কিনা তাহা অস্বীকার করিবার লোকও আজকাল দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণকে অস্বীকার করিতেও লোকে দ্বিধা বোধ করিবে না, যদি তাঁহার জীবিত প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁহার পার্থিব জীবনের প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া না যান। আপনার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের কথা আমি ইউরোপের জনসাধারণকে জানাইতে চাই।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোক-সম্পাত করিবার জন্যও আপনাকে অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি; সেটি হইতেছে—জীবদুঃখের সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের মনোভাব। সম্প্রতি আমি 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক মাসিক পত্রে 'সেবা' সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মনোভাব-বিষয়ক একটি চমৎকার প্রবন্ধ পড়িয়াছি। প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে যে, মহান্ শিষ্য বিবেকানন্দ তাঁহার

* অনুবাদক : শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"-রূপ শিক্ষা-উদ্ভূত ভাবেরই অভিব্যক্তি শুধু দিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের অধিকতর মূলগত বৈশিষ্ট্য হইতেছে সর্বজীবের দুঃখক্লেশের প্রতি তাঁহার সমব্যথাতুর ও বীরত্বব্যঞ্জক মনোভাব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রামশীল অথবা সান্ত্বনাদায়ক মনোভাব। যে বিশ্বজনীন ঈশ্বরানুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় দিব্যানন্দে ও নিত্য পরম সত্যের প্রতি গভীর বিশ্বাসে পূর্ণ রাখিত—সেই দিব্য দর্শন হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ অথচ সমকেন্দ্রিক ভাব নয় কি?

প্রকৃতি ও সমাজের নিষ্ঠুর অবিচারের প্রতি হতভাগ্য নরনারী এবং নির্যাতনকারী বা নিপীড়কদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের কি মনোভাব ছিল? তিনি কি তাহাদিগকে শুধু ভালবাসিয়াই তৃপ্ত ছিলেন? তিনি কি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে চান নাই? তিনি কি তাঁহার মহান শিষ্য বিবেকানন্দকে সেই কাজ করিতে সুনিশ্চিতরূপে নির্দেশ প্রদান করেন নাই?*

প্রিয় স্বামী শিবানন্দ, আপনার বিশ্বস্ত,

আপনার স্নেহভাজন

রমঁ্যা রলঁ্যা

---

*ফরাসী মনীষী রমঁ্যা রলঁ্যা এই পত্রের উত্তরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের নিকট হইতে 'ঈশ্বরানুভূতির সহিত মানুষের দুঃখ ও তন্নিবারণের সম্পর্ক' বিষয়ে একটি দীর্ঘ তত্ত্বপূর্ণ পত্র পান। রলঁ্যা-লিখিত 'রামকৃষ্ণ-জীবনী'তে ঐ পত্রখানি আছে।

"সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না, কায়মনোবাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোকও পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যতই হবে ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নাই, সিদ্ধিও নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের বাংলা গদ্য

অধ্যাপক শ্রীঅমিয় দত্ত

একটি ছবি:—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ। চারিদিক ঘিরে তার চাঞ্চল্যের তরঙ্গ। এই তরঙ্গকে সৃষ্টি করেছে নবজাগরণ। এই তরঙ্গের আঘাতে ভেঙে পড়েছে প্রাচীন অন্ধ কুসংস্কার; জন্ম নিচ্ছে অনেক কিছু নতুন। জাতীয় জীবন এখন আর মজা দীঘি নয়। তার সর্বাঙ্গে এখন সামুদ্রিক চঞ্চলতার শিহরণ। সমুদ্রের অসীমতা ও নিত্য নবত্বের সম্ভাবনায় উদ্বেলিত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-চিত্ত।

উনিশ শতকে নতুন করে ভেবেছে বাঙালী, নতুন করে কথা বলেছে,—সব কিছুই নতুন করে গড়তে চেয়েছে। কি সাহিত্য-শিল্প, কি ধর্ম-বিজ্ঞান এবং কি সমাজ-জীবনের নিয়ম-কানুন—সমস্ত বিষয়ই নতুনের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছে—বিচিত্র-মধুর রূপ ধরেছে। বিবেকানন্দের আবির্ভাব এই শতকেরই দ্বিতীয়ার্ধে। উনিশ শতকীয় নবজাগৃতির সর্বশেষ উত্তরাধিকারীদের তিনি একজন। তাই তাঁর চিন্তা-ভাবনায়, তাঁর ধ্যানে এবং মননেও নতুনের অস্তিত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভারতীয় ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে দুই অবিস্মরণীয় মহাপুরুষ, সে কথা সকলেরই জানা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সে কথাটা আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছেই অজ্ঞাত থেকে গেছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাই বাংলা গদ্যে বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে দু-চার কথা বলব।

বাংলা গদ্যের সৃষ্টি উনিশ শতকের সুরুতে। তারপর এই গদ্য রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পর্যায়ক্রমে তার বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণ-গুলিকে অতিক্রম করেছে। তারপরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর হাতে বাংলা গদ্য যৌবনের প্রাণোন্মাদনায় উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। তাঁরই সাহায্যে মানবজীবনের ধুলো-মুঠিকে সোনা-মুঠিতে পরিণত করে বাংলা গদ্য তার কনিষ্ঠ সন্তান ছোটগল্পের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে;—আমরা পেয়েছি 'গল্পগুচ্ছ'কে। কিন্তু তবু বাংলা গদ্যে কিসের যেন একটা অভাব থেকে গেছে। যেন সাধারণের সঙ্গে একটা দূরত্ব তখনো অনুভূত হয়েছে। বাংলা গদ্য যেন তার যৌবনের প্রাথমিক গাম্ভীর্যকে দূরীভূত করে তখনো ঘরোয়া ভাবের সহজ-স্বাভাবিক রূপ নিয়ে সকলের সঙ্গে নিকট আত্মীয়তার মেল-বন্ধনে বাঁধা পড়েনি।

কিন্তু কি সেই অভাব? বিবেকানন্দের বাংলা গদ্য পাঠ করার পর তা হৃদয়ঙ্গম করা গেছে। বুঝতে পেরেছি, আমরা যে ভাষায় কথা বলি, মনের ভাব প্রকাশ করি, সেই ভাষাকেই অবিকৃতভাবে সাহিত্যের মধ্যে বসিয়ে দিতে পারলে সাহিত্যকে, অনেক দ্রুত পাঠকের মনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিবেকানন্দের আগে বাংলা গদ্যের চলিত রূপ নিয়ে সচেতনভাবে বিশেষ কেউই চিন্তা করেন নি। তাঁর পূর্বে 'হুতোম প্যাচার নক্সা'য়, রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী'তে এবং অন্যান্য দুয়েকটি রচনায় বাংলা গদ্যের কথ্য রূপের সন্ধান মিললেও সেই সমস্ত রচনার মধ্যে চলিত ভাষার অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির স্বপক্ষে সবল

কোন বক্তব্য শোনা যায়নি। বিবেকানন্দই প্রথম দ্বিধাহীন ভাবে সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন: "চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?···যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভুতকিমাকার উপস্থিত কর?···স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি আমরা জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তেই পারে না;···ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনওকালে হবে না।···আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক-চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে।"

কিন্তু কথ্য ভাষা আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। কোন্ ভাষাটিকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত? এ বিষয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন: "কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতের বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিত্‌ছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাংলা দেশের ভাষা হ'য়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।" আজকের দিনে সাহিত্যের সর্ব শাখায় কলকাতার ভাষার অপ্রতিহত প্রভাব ও প্রাধান্য দেখে স্পষ্টতই আমাদের প্রতীতি জন্মে যে, আধুনিক বাংলা গদ্যের মুক্তিপথ-প্রদর্শক বিবেকানন্দই। বাংলা চলিত গদ্যের সম্পর্কে বিবেকানন্দের এই চিন্তাই পরবর্তীকালে সবুজ-পত্র-গোষ্ঠীর চলিত ভাষান্দোলনকে জোরদার করে তুলেছিল। প্রচণ্ডশক্তিসম্পন্ন বাংলা চলিত গদ্যের রূপ-গঠনই বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

অথচ বিবেকানন্দ সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কলম ধরেননি কখনো। প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁকে কিছু না কিছু লিখতে হয়েছে। মাত্র পাঁচখানি বই [ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, পত্রাবলীর কিছু চিঠি] তিনি বাংলা গদ্যে রচনা করেছেন। পরিমাণগত বিচারে বিবেকানন্দের গদ্য রচনা স্বল্প হ'লেও গুণগত উৎকর্ষে এই সমস্ত রচনার স্থান অনেক উঁচুতে। বিবেকানন্দের গদ্য আবেগ ও মননের অপূর্ব সমন্বয়। বিবেকানন্দ বাংলা গদ্যের বেগ ও বলিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম অগ্রদূত।

বিবেকানন্দের গদ্য-রীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর গদ্য-ভাষার চাল লঘু ও গুরু দুইরকমের। কেবল কথ্য বা চলিত ভাষা তাঁর সমস্ত রচনার বাহন হয়নি। 'ভাববার কথা' গ্রন্থের বেশ কিছু প্রবন্ধে এবং 'বর্তমান ভারতে'র সমগ্র অংশে সাধু ভাষাই স্থান পেয়েছে। পুরোপুরি চলিত গদ্যে রচিত হয়েছে 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। আর চিঠিপত্রের মধ্যে সাধু-চলিত উভয়েরই মিশেল ঘটেছে। বিবেকানন্দের আন্তরিক টান ছিল চলিত ভাষার প্রতি ও-কথা ঠিকই। কিন্তু তাই বলে সাধু গদ্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ নন মোটেই। 'বর্তমান ভারতে' সাধু রীতির ক্লাসিক রূপ, ধ্বনি-গাম্ভীর্যের অটল মহিমা, বাক্যে ক্রিয়াপদহীনতা এবং সমাসবদ্ধ পদ-প্রাচুর্যের অন্তরালে এক দুর্দমনীয় আশ্চর্য গতিবেগ অনুভব করা যায়। কিছু পরে এর প্রমাণ আমরা উপস্থাপিত করব।

'ভাববার কথা' গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি কাল এবং বিষয় ভেদে রচিত বলে একটি রচনার সঙ্গে অন্য রচনার ভাষা ও ভাবগত তারতম্য ঘটেছে। এই গ্রন্থের প্রথম দিকের দুটি প্রবন্ধের ['হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'] গদ্যে কিছুটা আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তখনো বিবেকানন্দের গদ্য যেন বাঁধা পথে চলতে অভ্যস্ত হয়নি। প্রবন্ধদুটিতে চোখ বুলিয়ে গেলেই একাধিক দীর্ঘ বাক্য পাঠকের চোখে পড়বে। পনের পঙ্‌ক্তিতে সমাপ্ত হয়েছে এমন বাক্যও সুদুর্লভ নয় [উদা: "কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন...... লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"—স্বামীজীর বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড। পৃ:—৪-৫]। অথচ আবার এই প্রবন্ধ-দ্বয়েরই মাঝে-মধ্যে কথ্য ঢঙ্ সাধু ভাষার ছদ্মবেশ পরে যেন বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছে: "হরি! হরি! 'একটু মদ খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না'—এই না অর্থ? দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁ-র সুরে কেন কথা কহিতেন না! আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ—আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন করিলেন না!!!" [ঐ, পৃ:—১৩-১৪]। আবার এই একই রচনায়, বিবেকানন্দের গদ্যের প্রাণশক্তি তাঁর যে direct approach-এর গভীরে নিহিত সেই direct approach-কেও খুঁজে পাওয়া যায়: "তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান মহাশক্তির খেলা......।"

আলোচ্য গ্রন্থের 'ভাববার কথা' নামক অংশে পরিহাস-প্রিয় ও হাস্যরসিক বিবেকানন্দের সাফল্য মেলে। মিঠে-কড়া রসিকতায়, রহস্যে, রঙ্গে ও ব্যঙ্গে এই রচনাটির গদ্য উজ্জ্বল-মধুর হাস্যময় রূপ যে ধারণ করেছে একটুখানি অংশ তুলে ধরলেই তা বোধগম্য হবে: "চোবেজী মন্দিরের পূজারী, পহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণশালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণ-কালের জন্য চোবেজীর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' হইল। তরুণ-অরুণ-কিরণ-বর্ণ ঢুলু-ঢুলু দুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবত-গুষ্টির সপিণ্ডীকরণ করিতেছে।" [ঐ, পৃ:—৪২]

বিবেকানন্দের মধ্যে একটা তাজা তরুণ মন ছিল। তারুণ্যের উচ্ছল আবেগের কবোষ্ণ স্পর্শ তাই তাঁর রচনাগুলিকেও সহাস্য প্রসন্নতায় মৃদু ও মধুর করে তুলেছে। কৌতুকপ্রবণ একটি তরুণ মন বিবেকানন্দের লেখার মধ্যে বারে বারেই উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে। অনেক সময়ই তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীর তিনি নিক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আশ্চর্য জীবন-রস-রসিকতার গুণে সে তীর হয়েছে হিউমারিস্টের হাতের—স্যাটায়ারিস্টের নয়। 'পরিব্রাজকে'র মধ্যে চলতি ভাষায় রচিত জীবন্ত হিউমারের অজস্র নিদর্শন যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম। এ-প্রসঙ্গে গঙ্গা-মাকে পাঁঠা মানার ব্যাপারে ভু-তায়াকে বলা বিবেকানন্দের গল্প [যে গল্পে, এক কলকাতার ছেলে গঙ্গাহীন দেশ তার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে তার শ্বশুরের দুধেগোলা

অস্থি-চূর্ণ শাশুড়ীর অনুরোধে নিজের অজান্তে গলাধঃকরণ ক'রে শ্বশুরের গঙ্গাপ্রাপ্তিতে (!) সহায়তা করেছিল—ঐ, পৃঃ ৬৮—৬৯]—সুয়েজ-খালের হাঙ্গরশিকারের অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস্‌ মজাদার বর্ণনা (ঐ, পৃঃ ১০০—১০৪)—উচ্চবর্ণের প্রতি বিবেকানন্দের ধিক্কারবাণী ["আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন তোমরা 'ডম্মম্‌' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি!!"] এবং অতীতজীবী আভিজাত্য সম্পর্কে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য ["এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল—লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট্‌ সব একসঙ্গে।... ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্‌।"] ইত্যাদির উল্লেখ করা চলে।

'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে'র মধ্যেও অনেক জায়গাতেই অনাবিল রসিকতা ও হাস্যরসের ঢেউ উথলে উঠেছে। প্রবন্ধের অল্পায়তনের কথা ভেবে একটা দৃষ্টান্তই তুলছি। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষের হীনমন্যতাকে পরিহাস করে বিবেকানন্দ লিখেছেন: "ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, জিহোবাও আসেননি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশী-ধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন।... ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু-চারজনের জন্য দেশসুদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হ'তে হবে বুঝি? চরে খাওগে না কেন?...ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমকহারামি করবেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি!!"

আশ্চর্য এক আবেগপ্রবণ ও সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি-দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি বিশাল দুটি আয়ত ও স্বচ্ছ-সুন্দর চোখ নিয়ে পৃথিবীকে দেখেছিলেন—ভালোবেসে-ছিলেন প্রকৃতিকে। তাঁর এই আত্মমুগ্ধ রোমান্টিক কবি-সত্তা তাঁর গদ্যরচনায় স্থানে স্থানেই সহজ সরল ভাষার বাঁধনে ধরা পড়েছে। দুটি উদাহরণ তুলে দিই: (১) "প্রশস্ত নদী দীপ্ত সূর্যালোকে নাচিতেছে; শুধু কচিৎ দু-একখানি মালবাহী নৌকার দাঁড় ফেলিবার শব্দে সে স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভঙ্গ হইতেছে।... সর্বত্র সবুজ ও সোনার ছড়াছড়ি। ঘাসগুলি যেন ভেলভেটের মতো।" [পত্রাবলী-১ম]।

(২) "সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি-ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল-পালা আর দেখা যাচ্চে না,...! সেই ঘাস, যতদূর চাও—সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেছে;" [পরিব্রাজক]—বাংলাদেশের শ্যামচ্ছবির এমন জীবন্ত ও বর্ণধ্বনিময় রূপ-চিত্রণ খুব কম গদ্য-শিল্পীর হাতেই সম্ভব হয়েছে।

চলিত ভাষার গদ্যে স্থানে স্থানে লঘু ও গুরু শব্দের একত্র স্বচ্ছন্দ সন্নিবেশনা বিবেকানন্দের গদ্যরীতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ হিসেবে "কত পাহাড়,

নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গ-কল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম, ডিঙ্‌লুম, পার হলুম" [পরিব্রাজক] ইত্যাদি অংশের উল্লেখ করা চলে।

প্রায় যুক্তাক্ষর-বর্জিত শব্দ-সমাবেশের মাধ্যমে তেজোদ্দীপক ভাবধ্বনি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দ অশেষ পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। নীচের উদ্ধৃতাংশটি তার সার্থক দৃষ্টান্ত: "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" [পরিব্রাজক]।

বিবেকানন্দের গদ্যে কোথাও কোথাও একই বাক্যে বিশেষ কোন একটি বা একাধিক শব্দের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়: "কলম্বো থেকে যত এগুনো যায়, ততই ঝড় বাড়ে, ততই আকাশ পুকুর, ততই বৃষ্টি, ততই বাতাসের জোর, ততই ঢেউ; সে বাতাস, সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে?" [পরিব্রাজক]। এই ধরনের পুনরাবৃত্তি বিবেকানন্দের গদ্যের গতিবেগ-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিবেকানন্দের রচনায় directness, intimate style বা অন্তরঙ্গ রীতি এবং বৈঠকী ভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করেছে। নীচের তিনটি উদ্ধৃতির মধ্যেই এই উক্তির যাথার্থ্য নিহিত আছে:

(১) "কথন আলথাল্লা-ঝোলানো—পশমের গোছা দড়ি দিয়ে একখানা মস্ত রুমাল মাথায় আঁটা—বদ্দ আরব দেখেছ?" [পরিব্রাজক]।

(২) "এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে! কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হ'য়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ!!" [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য]।

(৩) "আর এক কথা বোঝ দাদা, অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে,…'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র" [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য]।

এই সমস্ত লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় লেখক ও পাঠক যেন একই জায়গায় অবস্থিত রয়েছেন। মনে হয়, লেখক যেন সামনে দাঁড়িয়েই পাঠকদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে কথার ফোয়ারা উৎসারিত হচ্ছে মজলিসী বৈঠকের গল্প-বলিয়ের মত লেখকের মুখ-গহ্বর থেকেই—পাঠকের নয়। লেখক-পাঠকে এই ধরনের অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির জন্যে বিবেকানন্দের লেখায় কোথাও কোথাও ঘটনার বর্ণনার ক্ষেত্রে পাঠকেরা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার ভূমিকা-লাভেও সমর্থ হয়েছেন। যেমন,—"ঐ ষ্টীমার মক্কা হ'তে আসছে—যাত্রীভরা; ঐ দেখ—ইউরোপী পোশাক-পরা তুর্ক…।" [পরিব্রাজক]। এখানে পাঠক যেন রেড-সীতে বিবেকানন্দেরই সহযাত্রী।

বিবেকনন্দের বাংলা গদ্যে ছড়া, প্রবচন এবং বাগ্‌ধারার বহুল সার্থক প্রয়োগ তাঁর রচনায় একই সঙ্গে চটুলতা, ওজস্বিতা ও নতুনত্বের স্বাদ এনেছে। ভাষার মুদ্রাদোষ-

গুলিকেও অবিকৃতভাবে তিনি লেখার মধ্যে স্থান করে দিয়েছেন। প্রমাণ-হিসেবে তাদের কয়েকটিকে মাত্র উপস্থাপিত করছি :

(১) ''এক গোলার ঘায়ে, যত বড় জাহাজই হন না, ফেটে ফুটে চৌচাকলা! তবে এই 'লুয়ার বাসরঘর', যা নকিন্দরের বাবা স্বপ্নেও ভাবেনি ;…।"

(২) "পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কবুলা।"

(৩) "সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।"

(৪) "ছুঁচোর গোলাম চামচিকে তার মাইনে চোদ্দ সিকে।"

(৫) "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।"

(৬) "ঘসে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয় ?"

নতুন বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি ও কথ্য চলতি বুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ অভিনবত্বের দাবিদার। তাঁর গদ্য রচনা থেকে কিছু বিচিত্র শব্দের নমুনা সঙ্কলিত করছি : ওছলপাছল, মোদ্দা কথা, টালমাটাল, বেস্কোমো, গুষ্টির পিণ্ডি, ছাঁদি ভাষা, ক্ষিপ্র বিক্রয়, লাথির হুড়োহুড়ি, ডম্‌ম্‌ম্‌ বলে ডম্ফ, আদাড়ে, আঁটকুড়ির বেটা, চেঙ্গারামো, কচুপোড়া খাও, উড়ধামরা, পাকড়া, গাড়ীগাড়ী মেয়ে, খিচুড়ি জাত, মনিষ্যি, বাক্যি-চচ্চড়ি, চিত্রি, বরফান, নড়ে-ভোলা, বদ্দি, মেছো, কোপো [কপি থেকে], আলুয়ো [আলু থেকে] ইত্যাদি।

মোট কথা বাংলা চলিত গদ্যের ইতিহাস-আকাশে বিবেকানন্দ ধ্রুব নক্ষত্র হয়ে রইলেন। পথহারা গদ্য-লেখকেরা সঠিক পথের সন্ধান তাঁর কাছ থেকেই পেতে পারবেন। আর সাধু ভাষা ? সেখানেও বিবেকানন্দ কম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেননি। পূর্বেই সে সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত আমরা দিয়েছি। তাঁর 'বর্তমান ভারতে'র সংহত ও ওজস্বী গদ্য থমথমে মেঘের মত ;— বজ্র-বৃষ্টি-বিদ্যুতের অজস্র শক্তি-সম্ভাবনাকে বুকে করে যে মেঘ স্থির অচঞ্চল হয়ে আছে।

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটির গদ্যের মধ্যে দু-ধরনের বাক্‌রীতির সাক্ষাৎ মেলে। একটি ছোট ছোট উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ ছাঁদের বাক্‌রীতি ; অন্যটি সমাস-সন্ধি-বদ্ধ শব্দ ও তৎসম শব্দের সাহায্যে গঠিত দীর্ঘকায় বাক্য-বিশিষ্ট বাক্‌রীতি। মাঝে মাঝে আবার 'বর্তমান ভারতে'র সাধুগদ্য লেখকের আবেগানুভূতির চরম শিখরকেও স্পর্শ করেছে। গ্রন্থটির শেষাংশ এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। সেখানে আবেগের সঙ্গে ভাষা মিশে যেন বজ্র-বিদ্যুতের জন্ম দিয়েছে : "হে ভারত,……ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারত-বাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ;"—এই অংশের গদ্য-ভাষা আপন পৌরুষ ও শক্তির সাহায্যে বেদ-মন্ত্রে পরিণতি লাভ করেছে যেন! এখানে বিবেকানন্দের দ্যুতিময় প্রখর ব্যক্তিত্বের আলোক-শিখা ঝলসিত হয়েছে। এবং আমরা জানি, লেখার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনের মাধ্যমেই মহৎ স্টাইলের সৃষ্টি সম্ভব হয়ে ওঠে। লেখার মধ্যে প্রাণ-শক্তি-সঞ্চারও

উচ্চস্তরের স্টাইল সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উপায়। আর এই অসামান্য প্রাণশক্তি থাকার ফলেই পূর্বোদ্ধৃত অংশটি গদ্য হয়েও স্বদেশ-হিতৈষণার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মনে কবিতার সুর-স্পন্দন তুলে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। অংশটি তাই অধিকাংশ বাঙালীরই কণ্ঠস্থ হয়ে আছে। গদ্য-শিল্পী হিসেবে বিবেকানন্দের এইখানেই চরম সার্থকতা।

মৃত্যুরূপা

শ্রীবিশ্বেশ্বর গোস্বামী

মৃত্যুরূপা মা গো, তোর নূপুর-নিক্কনে
মৃত্যুর তরঙ্গ খেলে উদ্দাম উত্তাল।
ভীষণ-লোচনা ভীমা কালী দিগম্বরী,
মৃত্যুর বিজলী তোর কালো এলোকেশে।

'মৃত্যুকে যে বাঁধে বাহু-পাশে' এ-ধরায়—
তার কাছে—স্বার্থহীন বাসনা-বিহীন
বিশালহৃদয় মৃত্যু-পূজারীর কাছে—
সতত প্রত্যাশা কর মৃত্যু-উপাসনা।
দুর্বলের কাছে তোর অমৃত-করুণা
কোনকালে বিতরিত হয়নি জননী!
ভোগমত্ত যেই জন উন্মত্ত অস্থির—
কৃপা অকল্যাণ সেথা, মৃত্যু ভয়ঙ্কর।

অনিত্য অশ্রেয় জানি এ ভোগ্য সংসার
বিবেক-বৈরাগ্য-দীপ্ত মুমুক্ষু সাধক
সত্যানুসন্ধানী-বুদ্ধি ভক্তিনম্র চিতে
মৃত্যুরূপা মাকে যিনি করেন আশ্রয়
তাঁরি কাছে বরাভয়া স্মিতহাস্যমুখী
অপারকরুণাময়ী তুমি দাও দেখা!
সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় বিষয়-বিরাগী
বিশ্বজননীরে দেখি অন্তরে বাহিরে
মৃত্যুনাশা মহাকালী মায়ের কৃপায়
জ্ঞান-প্রেম-সুধাপানে হন মৃত্যুঞ্জয়।

সেণ্ট পল ও স্বামী বিবেকানন্দ

ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য

হিমশৈলের গতি মন্থর। এই হিমশৈল যখন উষ্ণতাপে গলে যায় তখন তীব্র খরস্রোতা নদীতে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন দেশ ও জনপদকে প্লাবিত করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্রোতস্বিনীর জীবন যেমন গতিশীলতার দ্বারা নিরূপিত হয় মানুষের জীবনও তাই। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ধর্মস্থাপনকারী আধ্যাত্মিকতার জমাটবাঁধা-মূর্তি যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষগণের দ্বারা বেশী প্রচার সম্ভব ছিল না। কিন্তু জগতের দুঃখকষ্টরূপ তাপে তাপিত হয়ে ঐ সব ঘনীভূত আধ্যাত্মিক মূর্তিগুলি যখন করুণায় গলতে শুরু করেন তখনই উহাদের তরলরূপ সেণ্টপল, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহামানবের আবির্ভাব হয়। বেগবতী নদীর ন্যায় তাঁরা দেশের পর দেশ ঐ আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যান। গতিশীল টাইটানিক জাহাজের সহিত হিমশৈলের সংঘর্ষ এবং উহার ফলে সেই প্রসিদ্ধ বাষ্পীয়যানেরঅতলস্পর্শী সাগরে নিমজ্জন; তেমনি টাইটানিকসদৃশ 'ক্ষিপ্রবার্তাবহ' সেণ্টপল ও 'সাইক্লোনিক হিন্দু' স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আধ্যাত্মিক হিমশৈল সদৃশ যীশু ও শ্রীরামকৃষ্ণের সংঘর্ষ এবং উহার ফলে তাঁদের পরস্পরের অপার্থিব সত্তায় মিলন—এ সবই ঐতিহাসিক সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও তা স্বীকার করে বলেছেন, "এইরূপ কোমল থাকের লোকেরাই নূতন ভাব সৃষ্টি করেন; আর 'হাঁক-ডেকে' থাকের লোক ঐ ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। সেণ্টপল এই শেষ থাকের ছিলেন—তাই তিনি সত্যের আলোক চতুর্দিকে বিস্তার করেছিলেন। সেণ্ট পলের যুগ আর এখন নেই, আমাদেরই এ যুগের নূতন আলোকস্বরূপ হতে হবে।"

আলোচ্যমান প্রবন্ধে যে দুই মহামানবের জীবনের উপর আমরা আলোকপাত করব উহা শুধু ঐতিহাসিক সত্যই নয়—উহার ভিতর রয়েছে বিশ্বের সমস্ত গতিশীল মানবের মর্মকথা, সমান পদক্ষেপ। কি অদ্ভুত মিলন—ঠিক যেন ধ্বনির প্রতিধ্বনি, ছবির প্রতিচ্ছবি। তাই এই তুলনা কল্পনামঙ্গিল নয়, উহা সত্যের বেদীতে গ্রথিত। এ তুলনা মনীষী রোঁলাও করেছেন—তিনি তাঁর চিহ্নিত ভারতীয় মনীষীদের পাশ্চাত্যের মনীষীদের দর্পণে ফেলে দেখতে চেষ্টা করেছেন—সেণ্ট ফ্রান্সিসের মধ্যে গান্ধীকে, নিজের ভিতর রবীন্দ্রনাথকে, যীশুখ্রীষ্টের ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং সেণ্টপলের ভিতর স্বামী বিবেকানন্দকে। এ তুলনা স্বামীজী নিজেই করে গেছেন। লণ্ডনে একদিন তিনি মিঃ ফক্সকে বললেন, "সেণ্টপল ছিলেন একজন শিক্ষিত ধর্মোন্নত ব্যক্তি; আমিও শিক্ষিত ধর্মোন্নত ব্যক্তি। এবং আমি একদল পণ্ডিত ধর্মোন্মাদ তৈরী করিতে চাই। দেখ, যারা শুধু ধর্মোন্মাদ তারা কোন কাজের নয়—ও হচ্ছে মস্তিষ্কের রোগ, ওতে বড় অনিষ্ট করে। পণ্ডিত ধর্মোন্মাদ হলে কাজ হয়।...পল ছিলেন পণ্ডিত ধর্মোন্মাদ তাই তিনি গ্রীকদর্শন ও রোমান সভ্যতাকে উল্টিয়ে ছিলেন।"

"আমি ইহুদী কিলিকিয়াস্থ টার্সাসের লোক"—পল বলতেন। টার্সাস ছিল প্রাচীন পৃথিবীর একটি বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং উহা

তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া ও এথেন্সের সমকক্ষ ছিল। ইহা ছিল পাশ্চাত্যের গ্রীক-রোমান এবং প্রাচ্যের সেমিটিক-ব্যাবিলোনিয়ান কৃষ্টির সঙ্গমস্থল। বিভিন্ন বিদেশীয় বণিক এখানে আসত কাঠ ও উলের ব্যবসা করতে। বালক পল ঐ সব বিদেশীদের হাবভাব, পোষাক, অপরিচিত কথাবার্তা সব লক্ষ্য করত। দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতি তার তরুণমনের একটা দুর্বার আকর্ষণ ছিল। কিলিকিয়ার সমুদ্রের ও পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং ইস্রায়েলদের সুমধুর প্রার্থনাসঙ্গীত তাকে ভাবুক করে তুলেছিল। যাহোক, এই শহরের উপর হেলেনীয় কৃষ্টির আধিপত্য ছিল বেশী। নূতন বাইবেলে পলের পত্রাদিতে আমরা দেখতে পাই গ্রীকদর্শন ও গ্রীকসভ্যতার ছাপ কতখানি। পল হিব্রুভাষা জানতেন গ্রীক ছিল তাঁর মাতৃভাষা। গ্রীকদের ন্যায় পলের ক্রীড়াপ্রীতি ও দেহসৌষ্ঠবের প্রতি ঝোঁক ছিল; তিনি কুস্তী করতে জানতেন এবং সেনাবাহিনীর মতো কুচকাওয়াজ করতে ভালবাসতেন। পলের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি একদিকে যেমনি সাধারণ রাস্তার লোকদের ভাষায় ও ভাবে কথা বলতেন আবার তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছেও তাদের ভাবানুযায়ী কথা বলতে পারতেন। তিনি ভাবুক ছিলেন সত্য কিন্তু উদাসীন ছিলেন না; কারণ রোমীয়দের নিকট যে পত্র তিনি লিখেছেন উহাতে পৌত্তলিক জগতের খুঁটিনাটি সবকিছু প্রকাশ পেয়েছে। পলের জীবনের যে জিনিসটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে তা হচ্ছে—বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর তুলনীয় ঐশ্বর্য এবং ভগবান তাঁর অপার কৃপা ঢেলে দিয়ে এই দুরন্ত মানুষটিকে গড়েছিলেন। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের ন্যায় পলের মনেও প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয়ের ভাব প্রবল হয়েছিল এবং ম্যাথু-লিখিত এই সুসমাচারটি তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল: অনেকে পূর্ব ও পশ্চিম হতে আসবে এবং অ্যাব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্য একত্র বসবে।

"আমি ভারতবাসী" এ গর্ব স্বামী বিবেকানন্দেরও ছিল; তবে "গর্ব আমার নিজের জন্য নয়, আমার পূর্বপুরুষদের জন্য।" ভগিনী কৃষ্টিন লিখেছেন, "স্বামীজী যখন ভা-র-ত-ব-র্ষ এই পাঁচটি অক্ষর উচ্চারণ করতেন তখন তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বরে ভেসে উঠত কতকগুলি ভাবের মূর্চ্ছনা—আর ঐগুলি ছিল—প্রেম, অনুরাগ, গর্ব, গভীর আগ্রহ, শ্রদ্ধা, ব্যথা, বীর্য, আকর্ষণ আবার প্রেম।" পলের ন্যায় স্বামীজীরও দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতি বাল্যাবধি একটা ঝোঁক ছিল। তাই পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, "অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলুম, নৈলে কি নিঃসম্বলে দুনিয়া ঘুরে আসতে পারতুম রে!" তিনি 'ভাবরাজ্যের লোক', 'কল্পনা-প্রবণ', 'স্নায়ু-প্রধান' প্রভৃতি উদ্ধৃতির দ্বারা নিজেকে বিশেষিত করলেও আমরা জানি তাঁর কল্পনা নিছক কল্পনা ছিল না, উহা ছিল ভবিতব্যতার ইঙ্গিত, যাকে বলে ঋষিদৃষ্টি।

স্বামীজী বিভিন্ন ভাষা জানতেন এবং পলের ন্যায় তাঁর খুব ক্রীড়াপ্রীতি ছিল এবং মাদ্রাজে তিনি 'পালোয়ান স্বামী' আখ্যাও পেয়েছিলেন। লোকচরিত্র তিনি বুঝতেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে তাদের ভাবে কথা বলতেন। একদিকে পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শনচর্চা করছেন, আবার ভাঙ্গীকে বলছেন, 'ভেইয়া তোমারা ছিলামটো দেও'; একদিকে সাহেবদের সঙ্গে, রাজারাজড়াদের সঙ্গে মিশছেন আবার এডেনে দেশোয়ালী হিন্দুস্থানীর সঙ্গে জমাট গল্প জুড়ে বসলেন। চরিত্রের অদ্ভুত

সংমিশ্রণ। পল যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীভাবের স্বপ্ন দেখতেন তেমনি স্বামীজীও একইসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন সমগ্র পৃথিবীকে। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, "আমার পাশ্চাত্যের প্রতি একটি বাণী আছে, যেমন প্রাচ্যের প্রতি বুদ্ধের ছিল।"

পলের জন্মকাল নিয়ে মতভেদ আছে; তবে এক থেকে পাঁচ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, ইহাই অধিকাংশ গ্রন্থের অভিমত। পলের মায়ের সম্বন্ধে বেশী জানা যায় না। তবে তাঁর বাবা খুব ধার্মিক ছিলেন এবং প্রাচীন অনুশাসন দৃঢ়ভাবে পালন করতেন ও পুত্র পলকে শেখাতেন। কিন্তু দুরন্ত পলকে ঐ গতানুগতিক ভাবে বাঁধা সহজ ছিল না। দুর্দমনীয় জেদী ছেলে পলের দুরন্তপনার কাহিনী আমরা পরে উল্লেখ করব। সনাতন-পন্থী ও উদার-পন্থীর বিবাদ এবং প্রাচীনমনা পিতামাতার সঙ্গে আধুনিকমনা ছেলেমেয়েদের পার্থক্য তো থাকবেই। পলের বাবা ছিলেন ধনী বস্ত্রব্যবসায়ী। পল পিতার কাজে সাহায্য করতেন। সন্ধ্যায় পল যখন ছোট বোনটির সঙ্গে ছাদে যেয়ে বসত তখন বাবা এসে তাদের ইস্রায়েলদের ইতিবৃত্ত, করুণাময় ভগবানের কাহিনী বলতেন। বাড়ীর বাইরের লোকেরা পলকে 'পল' (little one বা খোকা) বলেই ডাকত; কিন্তু ইহুদীদের রীতি অনুযায়ী তার একটি ধর্মীয় নাম ছিল—উহা হচ্ছে 'সল' (desired one বা বাঞ্ছিত মানুষ)। ছয় বছর বয়সে পলকে Vineyard-এ (কিণ্ডারগার্টেন স্কুল) পাঠান হল। স্কুলটি ছিল চার্চের সংলগ্ন। কি আশ্চর্য! বাল্যেই পল পবিত্র পুরানো বাইবেল দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে পড়ে ফেলল। একদিন শিক্ষক তাকে বললেন—ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যেদিন সমগ্র বিশ্ব জেরুসালেমকে পূজা করতে আসবে। দশ বছর বয়সে পলের শিক্ষার দ্বিতীয় ক্রম শুরু হল। এই শিক্ষা তার মনঃপূত ছিল না। রোজ তাকে মৌখিক পড়া বলতে হত এবং একটি পাপের সূচী তৈরী করতে হত। (মোসাইক কোডে ২৪৮টি বিধি এবং ৩৬৫টি নিষেধ আছে এবং ইহা ছাড়া বহু মৌখিক উপদেশ আছে, যেগুলি প্রাচীন-পন্থীদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করত)।

পরবর্তীকালে পল তাই লিখেছেন: "'লোভ করিও না' এই কথা যদি ব্যবস্থা (commandment) না বলত, তবে লোভ কি তা জানতুম না। কিন্তু পাপ সুযোগ পেয়ে সেই আদেশ দ্বারা আমার অন্তরে লোভ সৃষ্টি করল। কেন না ব্যবস্থা ব্যতিরেকে পাপ মৃত থাকে। আর আমি এক সময়ে ব্যবস্থা ব্যতিরেকে জীবিত ছিলুম; কিন্তু আদেশ এল এবং পাপও জীবিত হয়ে উঠল আর আমার মরণ হল। জীবনদায়ী আজ্ঞা মৃত্যুদণ্ডরূপে দেখা দিল।" স্মরণ রাখতে হবে যে অনুশাসনের প্রতিটি অক্ষর বালক পলের কাছে পবিত্র এবং শ্রদ্ধাপ্লুত ছিল আর উহাই কালে তার কাছে বিভীষিকার মত দেখা দিল। তিনি বলতে বাধ্য হলেন, 'আমি মরলাম'। ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে দেখা যাবে—খ্রীষ্টের প্রেম-ভক্তি-রসের বন্যা ভেঙ্গে দিয়েছে ইহুদীদের কঠোর আচার, নিয়মের দুর্ভেদ্য নিগড়, কঠিন শাস্ত্রবন্ধন। সমস্ত মত, প্রথা ও অনুষ্ঠানের পারে সেই স্বাধীনতা, সেই ভগবান—এ-বোধ পলের ছিল কিন্তু প্রথম জীবনে ঐ বিধি-নিষেধগুলি তিনি যথাযথভাবে পালন করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। স্বামীজীর মা ছিলেন ভক্তিমতী এবং অসম্ভব স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী। বাল্যে মায়ের কাছে তিনি শুনেছেন রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদির কত কাহিনী। বালক

নরেন্দ্রনাথের কৈশোরের স্মৃতি পুষ্ট করেছে তার সমগ্র জীবন। বাবা বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় ছিলেন বাস্তববাদী লোক। পলের বাবা গোঁড়াপন্থী ছিলেন কিন্তু স্বামীজীর বাবা ছিলেন উদার-পন্থী। মুসলমানের হুঁকায় তামাক খেতে দেখে এবং 'জাত যায় কিনা—পরীক্ষা করে দেখছি' নরেন্দ্রনাথের মুখ থেকে একথা শুনে বিশ্বনাথ বাবু হেসেছিলেন, পুত্রকে মারেননি। নেশা-খোরকে পয়সা দেবার অভিযোগ শুনে পিতা বালক পুত্রের কাছে জীবনরহস্যের মায়াজাল উদ্ঘাটিত করে বলেছিলেন, "জীবন যে কত দুঃখের তা তুই এখন কি করে বুঝবি? যখন বড় হবি, তখন দেখবি—কি গভীর দুঃখের হাত থেকে, জীবনের শূন্যময় ব্যর্থতার গ্লানি থেকে ক্ষণিক নিষ্কৃতির জন্য তারা নেশাভাঙ্গ করে; আর এ যখন জানবি তখন তাদের ওপর তোরও দয়া হবে।" একথা নরেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল। পলের ন্যায় নরেন্দ্র-নাথের (নরেন্দ্র=নর অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ইন্দ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) ধর্মীয় ডাক নাম ছিল 'বিলে' (বীরেশ্বর শব্দের অপভ্রংশ) কারণ বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদে তার জন্ম।

অসাধারণ প্রতিভা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, অটুট স্বাস্থ্য, অদ্ভুত মানসিক একাগ্রতা নিয়ে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং স্কুল-জীবন ও কলেজ-জীবন তাঁর কাছে খুব সহজই ছিল এবং তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তির বহু দৃষ্টান্ত আছে। পলের মত প্রাচীন ধর্মীয় ব্যবস্থা তাঁর কাছে বিভীষিকা সৃষ্ট করতে পারেনি তবে প্রাণহীন ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না। ইহা তাঁর জীবনকে তোলপাড় করে তুলেছিল। তিনি পাপ স্বীকার করেননি। পরিষ্কার বলেছেন: "বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন, সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এই—আপনাকে দুর্বল পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা।...মানুষকে পাপী বলাই পাপ।" পলের শিক্ষক বলেছিলেন, 'বিশ্ববাসী জেরুসালেমকে পূজা করতে আসবে।' স্বামীজী বলেছেন যে ভারতের আধ্যাত্মিকতার প্রতি গোটা বিশ্ব চেয়ে রয়েছে। কলম্বোর বক্তৃতায় আছে—'বন্ধুগণ, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাবে।' 'নেতিমূলক'-ব্যবস্থা পলের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল এবং তিনি উহাকে মৃত্যু আখ্যা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রিয়তম গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল উহা 'ইতিমূলক'। ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। যে নিজেকে দীনহীন পাপী মনে করে সে তাই হয়ে যায়। "যদি কোন ব্যক্তি দিবারাত্র নিজেকে দীন দুঃখী হীন ভাবে, সে হীনই হয়ে যায়; যদি তুমি বল 'আমার মধ্যেও শক্তি আছে' তোমার ভিতর শক্তি জাগবে। আর যদি তুমি বল 'আমি কিছুই নই' তবে তুমিও কিছু না হয়ে দাঁড়াবে।" পলের ন্যায় স্বামীজীও বারবার বলেছেন: ধর্ম অনুষ্ঠানে নয়—উহা অনুরাগে। গড়নের মুখে আইন-শৃঙ্খলা ভাল; কিন্তু তারপর? "কোন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু কোন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মরা—সে ভয়ঙ্কর।" "আমাদের সমস্ত আইনের পারে যেতে হবে।...আমরা আজাদ আর্থাৎ মুক্ত, আমাদের এইটি উপলব্ধি করতে হবে।"

গোঁড়া ফ্যারিসি সম্প্রদায়ভুক্ত পিতা পনের বছরের বালক পলকে জেরুসালেমে অধিক পড়াশুনার জন্য পাঠালেন। কারণ কৃষ্টিকেন্দ্র জেরুসালেমের প্রতি তখন সকলেরই একটা ঝোঁক ছিল। সম্মাননীয় শিক্ষক গ্যামালিয়েলের কাছে শিক্ষা শুরু হল। পুরানো বাইবেলের প্রতি ছত্র তন্ন তন্ন করে পড়ান হত—দুটি

ভাষায়—হিব্রু ও অ্যারামাইকে। পল ডিগ্রী পাস করলেন। প্রাচীন ধর্মশিক্ষা ও হেলেনীয় কৃষ্টি পলের শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পুরানো বাইবেলকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং দুটি ভাষাতেই উহা তাঁর মুখস্থ ছিল। পরবর্তী কালে প্রচারের সময় কয়েকবার জাহাজডুবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি পত্রাদিতে এবং কথায় পুরানো বাইবেলের প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন—তাইতে মনে হয় তাঁর মনটা বাইবেলে পরিপূর্ণ ছিল। জেরুসালেমে প্রতিভাবান ধনী যুবক পলের সামনে প্রচুর প্রলোভন এসেছিল। কারণ সেখানকার সুন্দরী মেয়েরা এইসব বিদেশীদের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হত। কিন্তু ধর্মের প্রতি পলের একটা টান ছিল এবং উহাই তাঁকে সাংসারিক ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছিল। জীবনীকার লিখেছেন—অবিবাহিত পলের মনে নিশ্চয়ই ভেসে উঠেছিল জনৈক ইহুদী যাজকের এই মর্মকথা: "আমি কি করব? আমার দেহমন ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে লেগে রয়েছে। অপর যারা আছে তারাই এই জগতের সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করুক।"

স্বামীজীর শিক্ষা ছিল পলের চাইতে ব্যাপক। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শুধু ধর্ম দর্শন নয়, প্রায় সব রকম বিদ্যায় পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ—এ বিষয়ে তাঁর বক্তৃতাবলী প্রমাণ। তিনি খৃষ্টান চার্চের কোন দলিলের তারিখ যে ভাবে হুবহু বলতে পারতেন, প্রসিদ্ধ খৃষ্টান যাজক ফাদার হিয়াসিন্থের পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। স্বামীজীর জীবনে যে কত প্রলোভন এসেছিল—উহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করা অসম্ভব। বিবাহ-ব্যাপারে তাঁর একটি সুন্দর অভিব্যক্তি উল্লেখ করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব: "আমি কেন বিয়ে করব? আমি যে প্রত্যেক নারীর মধ্যে জগন্মাতাকে দেখতে পাই। এইসব ত্যাগ করেছি কেন?—সাংসারিক বন্ধন এবং আসক্তি হতে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য, যাতে আর পুনর্জন্ম না হয়। মৃত্যুর সময় আমি ভগবানের দৈবী সত্তার সঙ্গে মিশে যেতে চাই।"

গতানুগতিকতায় আঘাত পেলে গোঁড়া ক্ষ্যাপা হয়ে ওঠে। গোঁড়ামিকে বাঁচাবার জন্য সে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং মানুষকে খুন করতেও দ্বিধা করে না। 'ক্রুসেড', 'এক হাতে কোরাণ অপর হাতে তরবারি'—এসব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা। দুরন্ত পলের দুরন্তপনা যে কি বিকটরূপ ধারণ করেছিল—তা সত্যিই বিস্ময় সৃষ্টি করে। তখন খ্রীষ্টের প্রভাব জেরুসালেমে এবং অন্যান্য জায়গায় শুরু হয়েছে। 'যীশুখ্রীষ্ট মরবার পর আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠলেন।' দলে দলে তাঁর শিষ্য বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রাচীনপন্থী ইহুদীদের তা সইবে কেন? তারা যীশুকে শুধু ক্রুশবিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হল না, তাঁর শিষ্যদের উপরেও অকথ্য অত্যাচার শুরু করল। তাদের পাথরের আঘাতে স্টিফেন নামক জনৈক খ্রীষ্টভক্তকে 'হে প্রিয় যীশু, আমাকে গ্রহণ কর' বলে প্রাণ ত্যাগ করতে হল। পলের সামনেই উহা ঘটেছিল। সত্যের জন্য, ভগবানের জন্য যুগে যুগে মানুষ তো এভাবেই শোণিত-শুল্ক দিয়ে এসেছে।

খ্রীষ্টবিদ্রোহী পলের অত্যাচারের কাহিনী নূতন বাইবেলে রয়েছে: "পল চার্চের ব্যাপক ধ্বংসে প্রবৃত্ত হলেন; বাড়ীতে বাড়ীতে ঢুকে নির্বিচারে নারী-পুরুষদের টেনে বের করলেন এবং কারাগারে পাঠালেন।" উন্মত্ত মোটর-

চালক যেমন একটি দুর্ঘটনা করেই ক্ষান্ত হয় না—সে একটার পর একটা দুর্ঘটনা করতে করতে এগোয়, ক্ষিপ্তপ্রায় পলও ঐরূপ ক্রমাগত অত্যাচার শুরু করলেন—যেমন করেই হোক, বিধর্মী চার্চের উচ্ছেদ-সাধন চাই। জেরুসালেমকে খ্রীষ্টানমুক্ত করে আবার বিধর্মী বিতাড়নের জন্য তিনি একশ পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী পূর্ব সিরিয়ার অন্তর্গত দামাস্কাস অভিমুখে চললেন। পল ছিলেন নেতা এবং তাঁর অধীনে ছিল একদল সুসজ্জিত সৈন্য এবং আইনসঙ্গত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। যাত্রাপথের অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য পলের মনে রেখাপাত করল না—তাঁর মন ছিল অন্তঃসংগ্রামে রত। এ জগতের দার্শনিকদের মন তো এরূপ অন্তর্জগৎ-বিশ্লেষণেই মত্ত থাকে। শিকারী পলকে শিকার করবার জন্য আর একটি দৈবী শিকারী-শক্তি (The Hound of Heaven) দামাস্কাসের পথে অপেক্ষা করছিল। তিনি ভাবতে লাগলেন খ্রীষ্ট যদি মেসিয়াই হবেন তবে তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হলেন কেন? তাঁর এত যন্ত্রণা কেন? তাঁর শিষ্যগণ প্রতারক। যাহোক আট দিন চলার পর একটা অঘটন ঘটল। তাঁর চোখে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল; একটা জলন্ত জ্যোতি তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। নেতা পল, খ্রীষ্টান-বিতাড়নকারী পলের ঘোড়ার পদস্খলন হল এবং প্রভুকে সুপথে শায়িত করে সে ভয়ে বিপথে ছুটল। পলের আত্মকথা: "আমি ইহুদী, প্রাচীন সুব্যবস্থার সূক্ষ্ম নিয়মে শিক্ষিত এবং ঈশ্বরে সদা অনুরক্ত; বিধর্মীদের প্রাণনাশ এবং নারী-পুরুষদের কারাগারে অর্পণ—এ সব আমি করেছি। এবং তারপর শুরু হল আমার দামাস্কাস অভিযান। যখন আমি দামাস্কাসের কাছে উপস্থিত হয়েছি তখন সেই দ্বিপ্রহর বেলায় আকাশ হ'তে এক উজ্জ্বল জ্যোতি আমাকে ঘিরে ফেলল। আমি ভূমিতে পড়ে গেলুম এবং শুনলুম এক বাণী আমাকে স্নেহ-মাখা মধুরস্বরে বলছে, 'সল, সল, কেন তুমি আমাকে তাড়না করছ?' আমি উত্তরে বললুম, 'প্রভু, আপনি কে?' তিনি বললেন, 'আমি ন্যাজারাথের যীশু—যাঁকে তুমি তাড়না করছ।' আমার সঙ্গীরা সেই আলো দেখেছিল কিন্তু আমাদের কথোপকথন শুনতে পেল না।" দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে শক্তিমান, বিচারশীল, দৃঢ়নিষ্ঠ এবং ত্যাগী পলের এই আকস্মিক পরিবর্তন ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ আমরা পরে দেখাব এই লোকটির দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম কতদূর বিস্তার লাভ করেছিল। স্বামীজী দেববাণীতে তাই বলেছেন, "আনুমানিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে আনুমানিক জ্ঞান নিয়ে কথা বললেই ঝগড়া বাধে। কিন্তু যা প্রত্যক্ষ দর্শন করেছ, তারই সম্বন্ধে কথা বল দেখি—কোন মনুষ্য-হৃদয়ই তাকে স্বীকার না করে পারবে না। প্রত্যক্ষানুভূতি করাতেই সেণ্ট পলকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।"

যদি ভগবান থাকেন তবে তাঁকে দর্শন করতে হবে, নতুবা নাস্তিক হওয়া ভাল—এইরূপই ছিল স্বামীজীর মনের অবস্থা। অনন্ত জিজ্ঞাসা এবং মনোজগতে তুমুল ঝটিকা শুরু হয়েছিল স্বামীজীর প্রথম জীবনেই। কোন জলজ-প্রাণীকে ডাঙায় তুললে সে যেমন ছটফট করতে থাকে কিন্তু জলে থাকে তার স্বাভাবিক অবস্থা; সেইরূপ নিত্য অবাধ-দর্শনেচ্ছা স্বামীজীর ঈশ্বরহীন জীবনে ঐ ডাঙায় তোলা জলজপ্রাণীর মত মৃত্যুযন্ত্রণা বহন করে আনল। কারণ সদা ঈশ্বরানন্দ-রসে মগ্নতাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক

অবস্থা। দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখেছেন : "তিনি (নরেন্দ্রনাথ) বলে গেলেন সংশয়ের যন্ত্রণার কথা, নিত্যবস্তু সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হতে না পারার নৈরাশ্যের কথা।... অধীর হয়ে আর্তনাদ করলেন এমন একটি শক্তির জন্য যা তাঁকে রক্ষা করবে, উন্নীত করবে, উদ্ধার করবে এই নিষ্ফলতা থেকে. তাঁর শূন্য হৃদয়ে আনবে মহিমার প্লাবন—তেমন একজন গুরু চাই, আচার্য চাই, চাই দেহধারী পূর্ণতাকে, চাই বিক্ষুব্ধ আত্মার শান্তিদাতাকে।" পলের জীবনীকার তাঁর জীবনকে দুভাগে ভাগ করিয়ে দেখিয়েছেন—খ্রীষ্টহীন ও খ্রীষ্টহীন জীবনে পল প্রাচীন ধর্মের স্বার্থরক্ষার জন্য দুয়ারে দুয়ারে উৎপীড়ন করেছেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণহীন জীবনে নরেন্দ্রনাথ 'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?' এই জিজ্ঞাসা নিয়ে মনীষী ধর্মনেতাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন, বেগবতী নদীবক্ষে ঝাঁপ দিতে পর্যন্ত কসুর করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেও ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। পরবর্তী জীবনে তাই তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্যবসিত।'

ইতিহাস কি পাণিপথ ও পলাশীর কথা লিখেই থেমে যাবে আর দামাস্কাস ও দক্ষিণেশ্বরের কথা লিখবে না? নিশ্চয়ই লিখবে—কারণ পাণিপথ ও পলাশীতে জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে আর দামাস্কাস ও দক্ষিণেশ্বরে—জাতির নয়, লৌকিক দৃষ্টিতে জনের আর খাঁটি নির্ভুল দৃষ্টিতে জগতের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ধ্যানসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ বাল্যাবধি জ্যোতি দেখতেন। যে প্রত্যক্ষানুভূতি পলকে অভিভূত করেছিল উহাই আবার নরেন্দ্রনাথকে বেহুঁশ করেছিল। তাঁর আত্মকথা: "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) সহসা নিকটে এসে নিজ দক্ষিণপদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হল। চক্ষু চেয়ে দেখতে লাগলুম, দেয়ালগুলির সঙ্গে গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হতে ছুটে চলেছে।...সামলাতে না পেরে চীৎকার করে বলে উঠলুম, 'ওগো তুমি আমার একি করলে?'...তিনি ঐ কথা শুনে খল খল করে হেসে উঠলেন এবং হাত দিয়ে আমার বক্ষ স্পর্শ করতে করতে বলতে লাগলেন, 'তবে এখন থাক, একেবারে কাজ নেই, কালে হবে।'" প্রচণ্ড শারীরিক শক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, বিদ্বান, তীব্র ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথের দৃঢ়সংস্কারযুক্ত মন একটি সামান্য স্পর্শে ভেঙ্গেচুরে 'কাদার তালের মত' হয়ে গেল, আর তিনি মহাকবির কথা ভাবতে লাগলেন: পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক তত্ত্ব আছে, মানববুদ্ধিপ্রসূত দর্শনশাস্ত্র যাদিগের স্বপ্নেও রহস্যভেদের কল্পনা করতে পারে না।

এ জগতে কোন মানুষের যখন প্রকৃত পরিবর্তন হয় তখন বুদ্ধি ও হৃদয়ের যুগপৎ পরিবর্তনই হয়ে থাকে এবং মৌলিক উপাদানগুলি অবিকৃত থাকে। ভগবৎকৃপায় পলের মেজাজের মূল কাঠামো, চারিত্রিক দৃঢ়তা, চুলচেরা বিচারক্ষমতা—সব কিছুই রইল; শুধু ধ্বংস হল সেই জিঘাংসা-প্রবৃত্তির। পল দামাস্কাসে নবজীবন নিয়ে ঢুকলেন এবং 'তোমাকে যা যা করতে হবে বলে নির্দিষ্ট আছে, উহা সেখানে তোমাকে বলা হবে।'—প্রভুর এই আদেশের অপেক্ষায় রইলেন।

জেরুসালেম হতে পল কর্তৃক বিতাড়িত যীশুর সতর জন শিষ্যের মধ্যে জনৈক ধার্মিক ব্যক্তি, নাম অননিয়, পলের কাছে এসে বললেন, 'ভাই সল, চোখ খুলে দেখ। ... ওঠ, তাঁর নামে দীক্ষিত হও এবং সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেল।' পলের আধ্যাত্মিক ও আনুষ্ঠানিক উভয় দীক্ষাই হয়ে গেল। আর এই খ্রীষ্ট-দীক্ষা বলতে বুঝায়—যীশু ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরপুত্র, ক্রুশ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম, পুনরভ্যুত্থান, পবিত্র আত্মা প্রেরণ—এগুলি অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীকার; অবশ্য যীশুর জীবন ও উপদেশ, খ্রীষ্টধর্মের ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতা পরে দীক্ষার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। তারপর এক রবিবার পল সমাজগৃহে গিয়ে তাঁর প্রাচীন ব্যবস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা বলে সকলকে বিস্মিত করেছিলেন। আর এই বিস্ময় বিবাদে পরিণত হল। পলের আত্মকথা: 'দামাস্কাসে আরিতা রাজার শাসনকর্তা আমাকে ধরবার জন্য সেই নগরে পাহারার ব্যবস্থা করলেন; আর একটি ঝুড়িতে করে দেওয়ালের জানালা দিয়ে আমাকে নামিয়ে দেওয়া হয়, তাই তাদের হাত এড়াতে পারলুম।' তাড়িত করতে গিয়ে পল নিজেই বিতাড়িত হলেন

পরিবর্তনের পর পল প্রচারে না গিয়ে প্রব্রজ্যায় বেরুলেন; বাইবেল-হাতে সেই মৌনতীর্থযাত্রী পার্বত্য গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে বিমাতা-সদৃশ আরবের সেই তপ্ত মরুপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন। জীবনীকার লিখেছেন: 'তিনি প্রাচ্যের বেদুইন পোষাক পরলেন; আলখাল্লার উপর ছিল চামড়ার কোমরবন্ধ আর উজ্জ্বল রঙীন উষ্ণীষ।' দীর্ঘ তিন বছর তিনি কৃচ্ছ্রসাধন ও ধ্যান-ধারণায় কাটালেন আর এই তিন বছরই ছিল তাঁর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ। স্বামীজী বলেছেন, খ্রীষ্টকে দর্শন কর তবেই তুমি যথার্থ খৃষ্টান হবে। আর সবই বাজে কথামাত্র।" তাঁর সরল রাজযোগের প্রস্তাবনায় রয়েছে: "সকল দেশের মহান আচার্যেরাই বলে গেছেন, 'দেখেছি ও জানি'। যীশু, পল ও পিটার সকলেই বলেন, তাঁদের প্রচারিত সত্য তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন।" দামাস্কাসের দিব্য দর্শনের পর পলের অন্তর যীশুর ভাবে ভাবিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রব্রজ্যাবস্থায় ঐ ভাবগুলি—যীশুর দারিদ্র্য, নিঃস্বার্থপরতা, মানবপ্রেম, স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছাপূরণ—হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ঢুকতে লাগল। তাঁর নিজের কথায়, 'খ্রীষ্টের কৃপা আমাকে বশ করে ফেলল'। তীব্র অধ্যাত্ম-পিপাসা পলের মনকে ক্রমাগত উচ্চস্তরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। 'হৃদয় যখন পূর্ণ হয় তখন মুখ কথা বলে (When heart filleth mouth speaketh)। পলের কাছে দৈবাদেশ এল: "জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকট আমার নাম বহনার্থে তুমি আমার মনোনীত পাত্র"। পল 'চাপরাশ' পেলেন এবং অনুভব করলেন যে ভগবান তাঁর কাঁধে হাত রেখে চালাচ্ছেন। তিনি স্বগতোক্তি করে উঠলেন: গুরুভার আমার উপর অর্পিত; ধিক আমাকে, যদি আমি সুসমাচার প্রচার না করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের ভিতর সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করে বললেন, "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি।" নেতা নির্বাচন করে তিনি বললেন, "দেখ্ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। পরিশেষে

তিনি এক টুকরা কাগজে চাপরাশ লিখে দিলেন, "নরেন শিক্ষে দিবে"। বিদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, "আমি পারবো না"। পরমহংসদেব জোর করে বললেন, "করতেই হবে, তোর ঘাড় করবে"। স্বামী বিবেকানন্দের ঘাড়ে এই গুরুদায়িত্ব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিল। তাঁর পত্রাবলীতে ও কথাবার্তায় ছড়িয়ে আছে এক অদৃশ্য শক্তির ঘাড়ে চেপে থাকবার বহু অভিব্যক্তি: "আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে"; "ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু-তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়—স্থির হয়ে থাকতে দেয় না।"

(ক্রমশঃ)

খৃষ্ট স্মরণ

শ্রীশান্তশীল দাশ

মানুষের মন হতে বিদ্বেষের বিষ গেল না তো!
বরং তা দিনে দিনে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।
এখানে ওখানে নিত্য গড়ে ওঠে মারণ-অস্ত্রের
কত সাজ-সরঞ্জাম—দিনে রাতে অস্ত্রের ঝনঝনা।

সেই অস্ত্রে বলি হয় অসংখ্য জীবন। হাহাকার
চারিদিকে; রক্তস্নাতা হয় শস্যশ্যামলা ধরণী।
মানুষের হাসি গান কোলাহল নিমেষে নিঃশেষ;
সুসজ্জিত জনপদ প্রেতভূমি, মৃতের শ্মশান।

এই বিদ্বেষের বিষ মুক্ত হবে কবে যে মানুষ!
তোমার প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত কি হবে না কখনো?
এই হানাহানি, এই আতঙ্ক-ছড়ানো ধরণীতে
মানুষ বাঁচবে বল কী নিয়ে, সে কিসের আশ্বাসে?

দুঃসহ জীবন আজ, হে মানবপ্রেমী তুমি এসো,
আবার এ ধরণীতে নিয়ে এসো প্রেমমন্ত্রখানি;
সেই মন্ত্র দিকে দিকে ধ্বনিত হউক। কী নিঃসীম
অন্ধকার চারিধারে: আলো চাই, জীবনের আলো।

তোমার প্রেমের মন্ত্রে ধরণীতে নব উজ্জীবন
হউক, বাঁচুক ধরা, শেষ হোক এই নৃশংসতা;
মানুষের এ পৃথিবী হাসি-গান আনন্দে উচ্ছল
তোমার চরণস্পর্শে হোক আবার, হে মানবত্রাতা।

"অন্নং বহু কুর্বীত"

স্বামী বুধানন্দ

উপনিষদ্ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন : এই সবই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু। যা আছে, তুমি, আমি জগতের আর সব কিছু সেই একই বস্তু। উপরে, নীচে, চারদিকে, কাছে, বহু দূরে—সবই সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ।

সাধন করে নির্বাসনা হয়ে যিনি শুদ্ধচিত্ত হন তাঁর এ সত্যলাভ হয়। এরূপ সত্যদ্রষ্টা জীবনের সমস্যা, ভয়, দুঃখ, অভাব অতিক্রম করে অক্ষয় আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হন। একেই বলে আত্মানুভূতি। অমরত্বলাভ বা মুক্তি এরই নামান্তর।

ব্যষ্টি-বিবেচনায় সব যুগের সব লোকের সকল সমস্যার শেষ সমাধান আত্মানুভূতিতে। অন্য কিছুতে নয়। এই হল ভারতের অধ্যাত্ম-মনীষার শেষ কথা।

"শেষ কথার" আমাদের প্রয়োজনটা কি ?

আজকের দিনের জোরালো ঘোরালো সমস্যা-তমিস্রায় এ নিষ্ঠুর বাক্য-বিন্যাসের কি সার্থকতা ? আমরা চাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কুটিল কুশ্রী বহু ব্যর্থতার হাত থেকে নিষ্কৃতি। আমরা চাই পেটভরে দুটো খেতে। নির্ভেজাল খাদ্য-পানীয়, পরিচ্ছন্ন পোষাক, রোগে চিকিৎসা-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, সরস অবসর-বিনোদনের সংস্থা ও সন্তানদের শিক্ষার ব্যয়হ্রাস, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয়, উন্নতির সোপানে উর্ধ্বমুখী গতি—উপনিষদের ঋষি আমাদের সমস্যার কি জানবেন যে আমাদের অভাবের, দুঃখের কাঁচা ঘায়ে মহাবাক্যের নুন ছিটাতে এসেছ ! আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে ভাঙে। রোষ বিস্ফোরিত হয় বলে। বাঁচবে যদি সরে পড়ো। পুঁথি-পাজি লুকিয়ে ফেল। না হলে আমরা সব কিছুতে আগুন ধরিয়ে দেব।

শোন ভাই ! সত্য তোমার হুমকির পরোয়া রাখে না। "শেষ কথাটা" না ধরলে অভ্রান্ত আরম্ভটি করা, দিগ্‌ভ্রান্ত না হয়ে পথ চলা, অসম্ভব। দিগ্‌ভ্রান্ত পণ্ডশ্রমী। তুমি তো আর এমনটি হতে চাও না। তুমি চাও জীবনে উন্নত হতে, কৃতার্থ হতে। সুখ, আনন্দ, শান্তি চাও তুমি।

উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি। রাজসভায় যখন একদিন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এলেন রাজর্ষি জনক জিজ্ঞেস করলেন : "যাজ্ঞবল্ক্য কি প্রয়োজনে এসেছেন—পশুকামনায় কিংবা আত্ম-বিষয়ক প্রশ্ন কামনায় ?" যাজ্ঞবল্ক্য বললেন : "সম্রাট উভয়েরই জন্য।"

দুই-ই আমাদের চাই : গোধন আর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা। তত্ত্বজিজ্ঞাসা যদি না থাকে, হাজার খাও ক্ষুধা মিটবে না। পাগল হয়ে যাবে বাসনার তাড়নায়। অতৃপ্তি হু হু করে গ্রাস করবে ভোক্তাকে। আর গোধন যদি না থাকে, খেয়ে বাঁচবার উপায় পর্যন্ত থাকবে না। চোখে দেখবে অন্ধকার। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলবে। চাই : ভাব-সাম্য। তবেই হবে ভারসাম্য।

উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি। অনেক করে বলেছেন : "অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ ব্রতম্।" অন্নবর্ধন করবে। এ হল উপাসকের অবশ্যকৃত্য ব্রত। "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"—অন্নকে ব্রহ্ম বলে জানবে। "অন্নং ন নিন্দ্যাৎ"—অন্নকে নিন্দা করবে না।

সাধারণ মানুষের কথা হচ্ছে : শুধু যদি অন্ন নাও, ক্ষুধা মিটবে না। শুধু যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নাও, তত্ত্ব-ধরণার শক্তি পাবে কোত্থেকে ?

হতে পারেন এমন মানুষ যিনি ব্রহ্মে বুঁদ হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু অতি বিরল। কোন কালে দু-একজন দেখা যায়। তাই তোমার আমার কথাই হোক।

আমাদের "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" আর "অন্নং বহু কুর্বীত" এই দুই মন্ত্রার্থে সম-ধ্যায়ী হয়ে আধুনিক ভারতে প্রয়োজ্য প্রাণস্পর্শী কার্যকরী সমাজ-দর্শন চাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে শিক্ষার এ সমাজ-দর্শনটিকে আমরা সর্বাঙ্গসুন্দররূপে পেয়েছি।

কেন "অন্নং বহু কুর্বীত ?" কারণ, অতি সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : "খালি পেটে ধর্ম হয় না।"

তাই চাই : অন্নবর্ধন। যে কোন প্রকারে অন্নবর্ধন করো। বাবুয়ানা ছাড়ো, নাতো মরবে, ভয়ানক ভাবে মরবে। হাল ধরো। জমি পতিত ফেলে রেখো না। আবাদ করো। আগাছা উপড়ে ফেলো। উত্তম বীজ চাষে লাগাও, সঞ্চয় করো। খাল কেটে জল আনো। সোনা ফলবে। রোখ করে মাঠে লাগো। ঝরে পড়ুক ঘাম। যদি খেটে ঘাম না ঝরাও, বহু কষ্টের অনেক গুণ বেশী অশ্রু ঝরবে। জমির সীমা নিয়ে ঝগড়া করো না। "সমবায় এব সাধুঃ।" উষর জমি উর্বরা করো। সকল জমিতে জল নিয়ে এসো যেমন ওরা করেছে জাপানে। ইঁদুরের ঘোগগুলি বন্ধ করে ফেলো। কাজ শেষ না করে এদিকে ওদিকে তাকিও না।

সকল প্রকার শস্য ফলাও, আর ফল মূল। ভাতুয়াগিরিটা এবার ছাড়ো। শুধু ভাতই খেতে হবে সারা জীবন, একথালা ভরে ভাত, তার অর্থ কি ? নানা রকমের সবজি ফলান, হরেক-রকমের খাদ্য উদ্ভাবন করো। গিয়ে দেখো মাইশোর কেন্দ্রীয় খাদ্য-গবেষণাগারে—ওঁরা কত রকমের নূতন খাদ্য আবিষ্কার করেছেন। সে সব আবিষ্কার লোকের কাছে চালু করো। বাজারে চলতি করে ব্যবসাও করো। শুধু পো ধরে থেকো না। খাদ্যগবেষকেরা কি বলেন জানো ? ভারতে খাদ্যাভাব ততটা নয় যতটা আছে কায়েমী খাদ্য-স্বভাবদোষের নিদারুণ নিষ্ঠা। তাই আমাদের এতই কষ্ট। চেষ্টা করলে আমাদের খাদ্য-সমস্যা আমরা খেয়ে ফেলতে পারি।

খাদ্য-স্বভাব বদলাও দেখি। একঘেয়েমি কর যদি, না খেয়ে মরবে। চাপাটি খেতে হচ্ছে বলে নিজেকে ভাগ্যহীন মনে করো না। সমস্যাটিকে নানা চেষ্টার আঘাত করো, জোর আঘাত।

অজ্ঞানের জায়গায় বিজ্ঞান আনো। আলস্যে আনো কর্ম-দুর্বারতা। রোগে আনো আরোগ্য। চোখ মেলে না তাকানোটা একটা রোগ। চেয়ে দেখো চারদিকে, দেখে শেখ। লম্বা কথা রাখো। নম্র হয়ে শেখ। তোমার সাঁতরা-গাছির মুলো-ক্ষেতটাই নন্দন-কানন নাও হতে পারে! চোখে দেখো—বিস্ময়ে আনন্দে জগতে জীবনসংগ্রামে কত মানুষ কত ভাবে লড়ে চলছে। উঠছে, পড়ছে, দৌড়াচ্ছে। আর তোমার একি হা-হুতাশ!

কি করেছ তুমি ? নৈরাশ্যে তোমার কি অধিকার ? যত জুয়াচুরি! কোমর বাঁধো। মহাশক্তি নিয়ে এসো শিরায় শিরায়। শক্তি-চর্চা না করে আরম্ভ করলে ভিক্ষা-চর্চা!

মাকে ঠাকুর বলেছিলেন : "দেখ, কারও কাছে একটি পয়সার জন্য চিৎহাত করো না। তোমার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। একটি পয়সার জন্য যদি কারো কাছে হাত পাত, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে।"

মা আচরণ করে শিখিয়ে গেলেন এ আদেশের তাৎপর্য। কি কষ্ট, পয়সা নেই, শাক-পাতা বিনা-নুনে ভাত, কাপড়ে তালি দেওয়া—তবু রইলেন সেই রাজ-রাজেশ্বরী! শুধু দিয়ে গেলেন জীবনভরে। শুধু দান আর আশীর্বাদ।

এত দেখেও কি শিখতে নাই ভাই!

গোঁফ-খেজুরেগিরি ছাড়ো। তুমি নিজের জমি চাষ করো, ফসল ফলাও। নিজে হাতে বিলাও দেশে দেশে। আর কাঙালপনা করো না। ঐ করে করে একেবারে ছোট হয়ে গেছ, তুচ্ছ হয়ে গেছ মান-হুঁস হারিয়ে ফেলেছ।

আর নয় এবার উঠে দাঁড়াও। চেয়ে দেখো, "এমন সোনার জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।"

হাল ধরে থেকে চাষ করো। ঐ "শেষ কথাটি" মনে রাখাই হাল ধরে থাকা।

ঠাকুর মাকে আরো বলেছিলেন: "তুমি কামারপুকুরে থাকবে। শাক বুনবে—শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।"

থাকবে "নিজ নিকেতনে।" নয়তো অভাব কোন কালে মিটবে না। স্ব-ভাব হারিয়ে বি-শ্রী জানোয়ার হবে। ভারতের সনাতন সাধনার আস্ত জীবন-শৈলীটিই তোমার "নিজ নিকেতন"।

জীবন-যোজনার যত নয়া বুলি কপচাও না কেন, ভেবে দেখো অর্থনীতিকে সব শাস্ত্রের নির্যাস ভেবে নিয়ে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছ। কাম আর অর্থ এই দুই পুরুষার্থের মারমুখ সন্ধানী হয়েও জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার পথ খুঁজে পাচ্ছ না।

শুধু শাক বুনলে চলবে না, হরিনামটিও করতে হবে। ধর্মকে না ধরলে অর্থের গোলামি ঘুচবে না। মোক্ষকে না ধরলে ধর্মের নামে হবে ধর্ম-ধ্বজী।

আর এই যে অন্ন-বর্ধন করবে তা সকলের জন্যে। শুধু তোমার ক্ষুদ্র আমি-আমার টুকুর জন্যে নয়। জগতে অর্থনীতির সব চেয়ে বড় সমস্যা উৎপাদন নয়—বিতরণ। সকলের অন্ন সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে—তবেই না তুমি সভ্য। নিজের জন্যে শুধু যদি চাষ করো, শুধু যদি নিজের জন্যে রাঁধ, তুমি তা হলে চোর। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন। চাই লোকসংগ্রহে সাগ্রহ যজ্ঞোন্মুখতা। লুকিয়ে রেখোনা অন্ন। যাদের জঠরে বুভুক্ষার বৈশ্বানর ধক্ ধক্ করছে তারা বুনো আগুন হয়ে তোমার গুষ্টিসুদ্ধ পুড়িয়ে মারবে। সাবধান! সর্বনাশ করে ছাড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন জীব-শিব মন্ত্র। শ্রীশ্রীমা বলেছেন: জগৎ তোমার। জগতের কেউ তোমার পর নয়। জগদ্বাসী সকলে তোমার আত্মীয়। তাদের আপন করে নিতে শেখ। বিবেকানন্দ বলেছেন: ঐ যে দেখতে পাচ্ছ তাঁকে, যিনি সব হয়ে তোমার সুমুখে বিজৃম্ভিত হয়ে আছেন। কোথায় ছুটছ ভগবান খুঁজতে—দেখতে। পাগলামি ছাড়ো। সুমুখের ভগবানকে চোখ মেলে চেয়ে দেখো। সেবাপর হয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ো।

জীবসেবা, অন্নবর্ধন, সকলকে আপন করে নেওয়া নিয়েই আজকের দিনের উপযোগী কার্যকরী সমাজ-দর্শন বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছেন। জগৎকে "কাক-বিষ্ঠা" বলেন নি। বলেছেন: সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। সবার ভেতরে বাইরে আত্মা জ্বল জ্বল করছে। নারায়ণই হয়ে আছেন দরিদ্র, মূর্খ, লোচ্চা। হয়েই যে শুধু আছেন তাই নয়, ভুলেও গেছেন যে তিনি নারায়ণ। সকলের মাঝে নারায়ণকে উসকে দেওয়াই সেবা।

বললেন না সবাইকে নেংটি পরতে আর

গায়ে ছাই মাখতে হবে। আদেশ দিলেন: বিজ্ঞানের শক্তি আয়ত্ত করো। কল-কারখানা বানাও। অর্থ উৎপাদন করো। খাদ্য বিতরণ করো। দেশের একটি কুকুরও যেন না খেয়ে থাকে। বললেন—অন্য আজগুবি ধর্ম ভুলে যাও, এই হোক তোমার ধর্ম। শিক্ষা। শিক্ষার প্রসার করো, গভীর করো সকলের মাঝে। ভোগ করো। কাঙালের দল ধর্ম করতে এসেছে!

সকলের মাঝে ভগবানকে উসকে দেবার জন্যেই এত ফন্দি ফিকির! বন্দী হয়ে আছে সব ভণ্ডামির জতুগৃহে। আসক্ত হয়ে জ্বালাটা হাড়ে-মাসে বোঝ, তবে তো হবে অনাসক্তি। আরক্ত না হলে বিরক্তি আসবে কোত্থেকে? পেটপুরে খেলে না, হাই তুলে বলা হচ্ছে "এ জগৎ অনিশ্চিত এ কথা নিশ্চিত"।

সকলের মাঝে নারায়ণকে উসকে দেবার জন্যেই চাই অন্নবর্ধন ব্রত। শুধু দেহের—পেটের ক্ষুধার অন্ন নয়। চাই মনের ক্ষুধার অন্নও। চাল-কলার ভোগ হলেই শুধু চলবে না। সুগন্ধি ফুল চাই—চাই চন্দন-চর্চা। শুধু পুষ্প-চন্দন-চর্চা হলেই চলবে না। চাই মন্ত্র।

"ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না" ঠাকুর বলেছেন। ত্যাগ না হলে মিথ্যা-মোহ ঘুচবে কি করে? মিথ্যা-মোহ না ঘুচলে সত্য ধরা অসম্ভব। সত্য না ধরলে ধরাকে সরা জ্ঞান হবে কি করে? সরাজ্ঞান হতে-না-হতে বিস্ফোরিত হবে ব্রহ্মজ্ঞান। তবে তো কেল্লা ফতে।

তাই "অন্নং বহু কুর্বীত"। এমন অন্ন সবাইকে জুটিয়ে দিতে হবে যাতে শক্তির উৎসমুখ খুলে যায়, ধৃতি হয়, স্মৃতি জাগে; যাতে তৃষ্ণা সম্পূর্ণ না মিটলেও সদসদ্-বিচার বুদ্ধি স্ফুরিত হয়, তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগে। চাষের জমিতে তাই অনেক রকমের ফসল ফলাতে হবে। তাই উপনিষদ্ বলেছেন: "স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্"।

সুরে বেঁধে রাখতে হবে ব্যবহারিককে। "মামনুস্মর যুধ্য চ"। মহাবিক্রমে কুশলতার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু স্মরণে ধরে রাখা চাই সকল জ্ঞান-শক্তি-মুক্তির উৎসকে। এই হল অন্ন-বর্ধন। অন্ন চাই, পরমান্নও চাই।

পরিসংখ্যানের হেঁয়ালিতে ছেলেমানুষের মতো ভুলনা। দৃষ্টিকে মায়া-ভেদী করো। সে শক্তি তোমাতে দেওয়া আছে। হ্রস্ব হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলার মাতলামি ছাড়ো। কৃপণ হয়েই হিসাবের এত বাড়াবাড়ি। কৃপাণ ধরে ভ্রান্তির কথা কেটে ফেলো। আত্মা হাসতে হাসতে জগৎ ছেয়ে ফেলবেন।

ভোগ করতে চাও? কথাটা কোত্থেকে শিখলে? চতুর্বর্গ কোথায় ব্যাখ্যাত হয়েছিল? ঊর্ধ্বমুখী দুই বর্গ বাদ দিয়ে নিম্নমুখী দুই বর্গ রাখতে চাও বুঝি? ইংরেজের গোলামি ছেড়ে এখন বুঝি চাও ইন্দ্রিয়ের গোলামি করতে? যাওনা যত পার ভোগ কর গিয়ে। সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করো। যযাতির কথা না হয় ভুলে গেছ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে নাও। এটাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

ভোগ করতে তোমায় কেউ বারণ করছেনা। ঋষি নয়, শাস্ত্র নয়, আচার্য নয়। তবে মনে রেখো দু-একটা কথা: তোমার যেমন ভোগে অধিকার, সকল মানুষেরও সে অধিকার ভোগে। জগতে ভোগ্য বস্তুও পরিমিত। আর, এই সবটা পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য ও ভোগ্য বস্তু যদি তোমার একার জন্য হত, তবু ভোগেচ্ছা মিটবেনা ভোগে। পেট্রল দিয়ে

কি আগুন নেবানো যায়? এমন ভোগ নেই যার জ্বালা-ভীতি নেই। এটি জেনে-মেনে নিয়ে তবে স্বস্তি-শান্তি।

দেহের ক্ষুধা মিটাতে হলে মনকে সংযত সংহত করতে হবে; মনকে সংযত করতে হলে আত্মার সন্ধান করা চাই। এ সবই হল অন্ন-বর্ধন। পতিত জমিতে আবাদ করে সোনা ফলানো।

সিন্ধুপারে অন্যের লুকানো সিন্ধুকের দিকে লোলদৃষ্টি। এদিকে নিজের সিন্ধুক খোলার নাম নেই। এই অনর্থকেই আবার বলি প্রগতিশীল অর্থনীতি।

তাই ঋষি বলেছেন: "ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্"। ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ো না। মর্ম এই: যো-সো করে ভূমাভীপ্স হওয়া। "নাল্পে সুখমস্তি" কিনা।

আবার সুরু হল ধর্মকথা!

যদি জানতে ভাই ধর্ম কি বস্তু! জাতগৃহ থেকে জন্মান্তর অবধি তোমার সব সময়ের এমন সুহৃদ আর কে আছে? কে তোমাকে এত ভাল জেনেছে, ভালবেসেছে?

ভীষ্মাচার্য মহাভারতে বলেছেন: ধর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছিল উন্নতি, রক্ষণ আর অগ্রগতির জন্যে। যাতে সকলের উন্নতি, রক্ষণ আর অগ্রগতি হয় সেই ধর্ম।

এখানেই মাটি খুঁড়ে পড়ে থেকে জাবর কেটো না। এগিয়ে চলো। সর্বোদয়ের জন্যে ক্ষুদ্র আমিকে অস্তমিত করাই উন্নতি। নিজের জন্য কিছু না রাখাই রক্ষণ। অন্যের জন্য পথ ছেড়ে দাঁড়ানোই অগ্রগতি।

এই হল ভগবানকে উসকে দেওয়া। এই হল অন্ন-বর্ধন।

ধর্মকে ভূষণ করো না, কৃপাণ করো। ক্ষুধার, মিথ্যার, মোহের, ভয়ের সকল বাঁধন কাটতে হবে। তবে তো মুক্তপুরুষ। হে মুক্তিমুখী, "চরৈবেতি!" মৃত্যুকে স্বাগত করার শক্তি চাই।

জীবনকে ভালবাসো: উত্তম কথা। কিন্তু মৃত্যুকে যদি ঘৃণা কর, ভয় কর, জীবনকে বুঝতে পারো নি। চাই জীবন-মৃত্যুর আলো-ছায়ার পারে শাশ্বত-দীপ্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া। এই হল সত্যিকারের কুশল। ঋষি বলেছেন: "কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্"।

কালো পাথরের মত যদি হয় আঁধার, চাই তেমনি পাথর-চেরা আলো ভোগের বীভৎসতা যেখানে ভয়ঙ্কর, চাই সংসারান্তক-সন্ন্যাস। চিরভাস্বর শাশ্বত শান্ত সন্ন্যাস। সমস্যা হয় যত জটিল, তত চাই উন্নত আদর্শ। দুর্যোগই সুযোগ। প্রলয়ের ঝঞ্ঝাক্ষণে করতে হবে গায়ত্রী-ধ্যান। মৃত্যুরূপাই মা। ভীতি থেকে মুক্তি চাই অভীতে।

যারা ওপারের জানে না কিছু, এপারেও জানে অল্পই তারা। ঈশ্বরকে যারা জানেনি জগৎকে তারা কতটুকু বুঝেছে? ছোট কথা শুনে শুনে ছোট হয়ে যেয়ো না। অভীঃ-মন্ত্রে জাগো। ভূমার দিকে ধেয়ে চলো। "অন্নং বহু কুর্বীত।" সকলের দেহ-মন-আত্মার অন্ন জোগাও।

নিজেকে বাদ দিও না কিন্তু!

মনে রেখো কুরুক্ষেত্রই ধর্মক্ষেত্র। সেখানে কূটনীতি ব্যাখ্যাত হয়নি। ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত হয়েছিল। মোক্ষশাস্ত্র ব্যাখাত হয়েছিল। যিনি "সুহৃদং সর্বভূতানাম্" তাঁর অন্নবর্ধন অনুষ্ঠানে, এই সংসার, স্বর্গ, অপবর্গ, সবই সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। নীতি-ই শ্রী। শ্রী-ই ভূতি। যার ভূতি তার ভীতি কি। সেই হয় বিশ্ব-বিজয়ী, কালজয়ী।

হে পার্থ, তুমি থেকো আমাদের চির-সাথী। হে অচ্যুত, তুমি হয়ো আমাদের চির-সারথি।

বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা

শ্রীসব্যসাচী ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারতের আর্যসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তার অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে; উপনিষদের ঋষিদের ঈশ্বরসাধনার সৌরভে সেই মহান সভ্যতা সুরভিত। তপোবনের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে ঈশ্বরসাধনায় মগ্ন সেই ঋষিদের কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বরের প্রশস্তি-গাথা। ঐক্যসাধনাই ছিল তাঁদের তপস্যা, সকল ক্ষুদ্রতা ও খণ্ডতাকে তাঁরা ত্যাগ করেছিলেন, ত্যাগ করেছিলেন অনিত্যকে, মিথ্যাকে। তাঁরা অনুভব করেছিলেন, "খণ্ডতার মধ্যে অসুন্দর, সৌন্দর্য 'একে'র মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল 'একে'র মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যে মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে।" একের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ঋষিরা সকল ভেদবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, সর্বজীবকে ভালোবেসেছিলেন, সকলের মধ্যেই পরমপুরুষের অস্তিত্বকে করেছিলেন উপলব্ধি। তাঁদের সেই ব্রহ্মোপলব্ধির পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে বেদ-উপনিষদে; তার মধ্যেই নিহিত আছে আর্যতপস্বীর অধ্যাত্মমানসের উজ্জ্বল প্রতিফলন।

তারপর কত যুগ কেটে গেছে, 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' দিয়ে কতশত যাত্রী চলে গেছে, কালের অবধারিত পরিবর্তনে যুগপ্রবাহ নিয়েছে নূতন পথ। হিন্দুসভ্যতার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে কত প্রতিকূলতার ঝড়। পরে মুসলমান সভ্যতার অন্তরালে ভারতের সেই মহান দৃষ্টিভঙ্গী যেন ঈষৎ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তবু যা সত্য, তার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। আকাশজোড়া মেঘ যেমন সূর্যের আলোকে বাধা দিতে পারে না, পৃথিবীজোড়া মিথ্যা তেমনি পারে না একটুকরো সত্যকে আবৃত করতে। তাই ভোগবিলাসের যে আতিশয্যে ভারতবাসীর মন হয়েছিল কলুষিত, তার মধ্যেই অবশেষে তারা মিথ্যাকে আবিষ্কার করেছিল, আবার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল সনাতন সত্যের কাছে।

কিন্তু এরই পরে ভরতে এলো বিরাট আলোড়ন, এলো পাশ্চাত্যসভ্যতা। ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ঘটলো অনুপ্রবেশ। তার জন্য কোন প্রস্তুতি ছিল না ভারতবাসীর পক্ষে, তাই প্রাচ্যসভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্যসভ্যতার মিলন ঘটলো না, ঘটলো সংঘর্ষ। নিজ পবিত্র আদর্শচ্যুত ভারতবাসী ত্যাগ করতে লাগলো জাতীয়তাকে, ভোগবাদী পাশ্চাত্যের বাহ্যিক আড়ম্বরে তারা মুগ্ধ হলো, তাদের অন্ধ অনুকরণে অপচয় করলো নিজেদের সকল সামর্থ্য।

এরই সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন ঘটলো বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো শিক্ষিত ভারতবাসী। আজকের দিনে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর অভিযান, ভারতবর্ষেও তার ঢেউ এসে লাগলো। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বিজ্ঞান তাদের মনে জ্ঞানপিপাসাকে যতটা না জাগিয়েছে, তার চেয়ে বেশী জাগিয়েছে দেশের সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করার প্রবল বাসনাকে। আজও তাই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আমরা আর্যঋষির দৃষ্টিভঙ্গীকে বলি 'মিথ্যা', ব্রহ্মোপলব্ধিকে বলি 'অবিশ্বাস্য' আর শাস্ত্রকে বলি 'অর্থহীন'।

কিন্তু সত্য এক ; মিথ্যারই প্রকারভেদ আছে, সত্য অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়। মানুষের জ্ঞান তিনটি মূল শাখায় প্রসারিত—বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন। এই তিনটি শাখার মধ্যে মানবচিন্তা পূর্ণ প্রকাশের পথ রয়েছে। কিন্তু এ শাখাগুলি পৃথক নয়, একটি মহীরুহের সঙ্গে তারা সংযুক্ত। সুতরাং দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান—এদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা নিতান্তই আপাত। প্রকৃতপক্ষে একটি সত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশের জন্য ঐ পার্থক্যের সৃষ্টি। প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে বিজ্ঞান দেখে সত্যকে, সাহিত্য দেখে সত্যসুন্দরকে আর দর্শন সান্নিধ্য পায় সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষ সেই আনন্দস্বরূপের। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রে ক্রান্তদর্শী ঋষিদের যে ঈশ্বর উপলব্ধি, তা কেবল মাত্র অলীক কল্পনাবিলাস নয়, বৈজ্ঞানিক সত্যের কঠিন ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে তাঁদের অধ্যাত্মসাধনার গগনচুম্বী সৌধ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসে তাই বিজ্ঞান খুবই সহায়ক। বিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার শক্তির নিত্যতাবাদ বা conservation of energy। এই সূত্র অনুযায়ী পৃথিবীতে যে পরিমাণ শক্তি আছে, তার যোগফল সর্বদাই ধ্রুব। এর কোন ব্যত্যয় হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানই আবার বলে, পৃথিবী সবসময়ে ছিল না, এক বিরাট নৈসর্গিক আলোড়নে তার উৎপত্তি। তাই যদি সত্য, তবে এই শক্তি পৃথিবীতে এলো কিভাবে? বিজ্ঞান বলে, সেই শক্তি এসেছে এক মহাজাগতিক শক্তি বা cosmic energy-র উৎস থেকে। আমাদের শাস্ত্র বলে সেই শক্তি এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। ঈশ্বর হয়েছেন সেই মহাজাগতিক শক্তি। মহাশূন্যের সংখ্যাহীন গ্রহনক্ষত্র অবিরাম আবর্তিত হচ্ছে ; তাদের প্রত্যেকেরই আছে স্বতন্ত্র বিচরণভূমি, প্রত্যেকের গতিপথই একটা সুষ্ঠু ছন্দে বাঁধা। এই ছন্দ নিয়ন্ত্রিত করছে এক মহাশক্তি। তাঁকেই আমরা বলি ব্রহ্মশক্তি। বিজ্ঞানের মতে, আমরা শক্তিকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরতে পারি না। বিদ্যুৎশক্তিকে কেউ কোনদিনই দেখেনি। তার চেয়েও সূক্ষ্ম ঈশ্বরকে দেখা যাবে কি করে? তিনি ইন্দ্রিয়াতীত। তিনি বুঝবার জিনিস নন, অনুভবের জিনিস।

বিজ্ঞানের গতি থেমে নাই। নব নব আবিষ্কার-সোপান বেয়ে সে উঠছে উন্নতির শীর্ষে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এক নূতন তত্ত্ব শুনিয়েছেন বিশ্ব-বাসীকে, জানিয়েছেন, শক্তি ও পদার্থ একই বস্তু পদার্থ থেকেই শক্তির উদ্ভব, আবার energy থেকেই matter-এর সৃষ্টি। অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশাল শক্তির সম্ভাবনা, যার প্রচণ্ড ক্ষমতায় অমানবিক প্রকাশ ঘটেছে অ্যাটমবোমার মধ্যে। বিশ্বের কাছে এ তথ্য অভিনব হলেও এর মূল ভাব ভারতবাসীর কাছে অপরিচিত নয়। শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনন্ত শক্তিকে, ঈশ্বরকে দেখেছেন, অণু-পরমাণুর মধ্যে তাঁর মহিমা লক্ষ্য করেছেন, বলেছেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

প্রত্যেকটি পদার্থ অসংখ্য অণু বা পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু পদার্থ অচেতন, সে চলতে পারে না, কথা বলতে পারে না। জীবনের কোন লক্ষণই নেই তার মধ্যে। কিন্তু সেই অণু-পরমাণুরা যখন জীবদেহের কোষ উৎপন্ন করে, তখন সেই জীবকোষের সমাবেশে গঠিত জীবদেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা দেয় কেন? মানুষ কথা বলে, চিন্তা করে। সে ক্ষমতা তার মধ্যে আসে কি করে? প্রাণই বা কী? এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না, এখানে

বিজ্ঞান মূক। কিন্তু আমরা জানি প্রতিটি পরমাণুতেই চৈতন্য অন্তর্নিহিত। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তা প্রাণশক্তিরূপে, সূক্ষ্মশরীররূপে এবং তাতে প্রতিকল্পিত চেতনা 'জীবাত্মা'রূপে বিকশিত হয়। এই 'জীবাত্মার' উন্নততর বিকাশই মানুষের যথার্থ উন্নতি। বৈজ্ঞানিক ডারউইন বলেছেন, "Struggle for existence and survival of the fittest"—আমাদের ভাষায়, যে তার জীবাত্মাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে, জীবনযুদ্ধে তারই জয় অনিবার্য। মানুষ যখন মুক্তিলাভ করে তখন তার জীবাত্মা মিলিত হয় পরমাত্মার সঙ্গে। ভারতের মহাপুরুষেরা প্রাণী-দেহে ঈশ্বরকে দেখেছেন, জীবকে দেখেছেন শিবরূপে, নরের মধ্যেই দেখেছেন নারায়ণকে, নিজেকে দেখেছেন সর্বত্র। উপনিষদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তাই "আত্মানং বিদ্ধি"।

ভারতবর্ষের নিজস্ব যে চিন্তাধারা, জন্মান্তর-বাদ, তারও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এর মধ্যে।

মানুষ ভারতীয় ঋষির দৃষ্টিতে তাই মৃত্যুহীন। তাই তাঁরা বিশ্ববাসীকে আহ্বান করতে পেরেছেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ····।" তাঁরা সকল মানুষকে ভালবাসতে পেরেছেন, অমৃতের সন্তান ব'লে সকলকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন। হাজার হাজার বৎসর পরে যীশুখৃষ্টের মুখে আমরা শুনেছি "Hate the sin, but not the sinner"। এই উপদেশ ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে একাত্ম।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতীয় দর্শন যদি ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় বলেছে, উপনিষদ্ যদি ব্রহ্মকে নিরাকার বলেছে, তবে মূর্তিপূজা কেন? এর উত্তরে বলতে হয়, মূর্তিপূজা ভারতীয় দর্শনের বিরোধী নয়—হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজার ভূমিকা অসামান্য। ধর্ম শব্দের অর্থ—'যা ধারণ করে'। যাকে অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করা যায়, তা-ই হলো ধর্ম। নিরাকার ঈশ্বরকল্পনা তো সাধারণ মানুষের বোধশক্তির অতীত। তা মুষ্টিমেয় ঋষির জন্য, সত্যদ্রষ্টার জন্য সীমিত। সাধারণ মানুষের জন্যই ঈশ্বরের মূর্তিরূপ, সাকার ব্রহ্মসাধনার প্রবর্তন। সাকারকে ধরে নিরাকারের পথে যাত্রা। অসীমেরই প্রকাশ সীমার মধ্যে। বিজ্ঞান বলে শক্তির কোন রূপ নেই, যখন পদার্থের মধ্যে সে আশ্রয় নেয় বা পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তখনই তাকে আমরা অনুভূতির মধ্যে ধরতে পারি। ঠিক তেমনই ঈশ্বর নিরাকার, রূপের মাধ্যমে তাঁর প্রকাশ। পূজার সময়ে পূজারী মূর্তির উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করেন না, করেন সেই অমূর্তেরই উদ্দেশ্যে। অধিকাংশ মানুষকেই নিরাকারের সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করতে হ'লে সাকারকেই করতে হয় মাধ্যম, রূপসাগরে ডুব দিয়েই খুঁজতে হয় অরূপরতনকে।

তাই বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সনাতন শাস্ত্রোক্ত সত্যের কোন বিরোধ নেই। এই সত্যোপলব্ধির জন্যই পার্থিব প্রলোভন ত্যাগ করে ভারতের নারী বলতে পেরেছে, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্যাম্?—যার দ্বারা আমি অমৃতকে পাব না, তার দ্বারা আমি কি করব?" অমৃতত্বের প্রতি এই আকুলতা ভারতীয় অধ্যাত্মমানসের প্রতি এক মহামূল্য ইঙ্গিত বহন করে।

কিন্তু তাঁরা সংসারকে উপেক্ষা করেন নি। গীতার কর্মযোগ ঈশ্বরসাধনারই অঙ্গবিশেষ। ত্যাগের জন্যই ভোগ, বর্জনের জন্যই গ্রহণ—এই হলো ভারতের সনাতন আদর্শ। সংসারের প্রতি মনোযোগ থাকুক, কর্তব্যে অবিচল নিষ্ঠা থাকুক, কিন্তু কিছুর প্রতিই যেন না থাকে

তিলমাত্র আসক্তি। 'পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ' —এ নীতি তাই তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন—আজীবন ভোগের মধ্যে থেকে রাজারা আশ্রয় নিয়েছেন তপোবনে। ভারত তার নৃপতিকে শিখিয়েছে 'ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি, ধরিতে দরিদ্রবেশ' আর গৃহীকে শিখিয়েছে "সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

ভোগসর্বস্ব জীবনদর্শনের জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়, প্রকৃত বিজ্ঞান কখনও দর্শনের পরিপন্থী নয়। আসলে, যে সভ্যতাকে আমরা বিজ্ঞানসভ্যতা মনে করে দম্ভ করি, তা বিজ্ঞানসভ্যতা নয়, তা হলো বস্তুতান্ত্রিকতা বা Materialism। এই বস্তুতান্ত্রিকতাই ভারতবাসীকে প্রলুব্ধ করছে ভোগের উৎকট লালসার প্রতি। সেই প্রলোভনের টানে আমরা নিজস্ব অধ্যাত্মচিন্তাকে ভুলে যাচ্ছি, নেমে যাচ্ছি নৈতিক অবনতির গহ্বরে; স্থূলতার আবরণে তাদের ধর্মীয় ভাবনা আবৃত। এই অধঃপতন থেকে মুক্তি সত্যই যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে প্রাচীন অধ্যাত্মসাধনার আশ্রয় গ্রহণ করাই আমাদের একমাত্র উপায়। এবং "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

"ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সকল প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে, এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম, বাকী সব অধর্ম। এই সহায়তার নাম কর্ম, বাকী সব কুকর্ম; আর আমি কিছু দেখছি না।···কর্মের ফল যে পবিত্রতা, তাহা কেবল পরোপকার-মাত্রে ঘটে।" "পরোপকারই এক সার্বজনীন মহাব্রত। আবালবৃদ্ধবনিতা, আচণ্ডাল, আপশু সকলেই এ ধর্ম বুঝিতে পারে।" "পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

বেদান্ত-দর্শন (২য় অধ্যায়)—অনুবাদক স্বামী বিশ্বরূপানন্দ। প্রকাশক—স্বামী চিদাত্মানন্দ, অধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া, হিমালয়। প্রাপ্তিস্থান—অদ্বৈতাশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালি রোড, কলিকাতা ১৪। পৃষ্ঠা ৮১৫ + ১৯; মূল্য ১৩৲ টাকা।

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ ও স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী সম্পাদিত বেদান্তদর্শন অদ্বৈত আশ্রম হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মসূত্রের আচার্য শঙ্কর-কৃত ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও ভাবদীপিকা নামক বিস্তৃত ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সূত্র-সমূহের পদচ্ছেদ ও পদব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক অধিকরণের প্রারম্ভে ভারতীতীর্থ-কৃত বৈয়াসিক ন্যায়মালার শ্লোক ব্যাখ্যা-সহ সংযোজিত হওয়ায় অধিকরণের তাৎপর্যবোধ অধিকতর সুগম হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ও দর্শনে অব্যুৎপন্ন তাঁহারাও এই গ্রন্থের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রহ্মসূত্র ও শাঙ্কর ভাষ্যের মর্ম উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ বেদান্তদর্শনের ছাত্রগণ এই গ্রন্থের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন। স্নাতকোত্তর বিভাগের বেদান্তশ্রেণীর ছাত্রগণের নিকট দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'স্মৃতি' ও 'তর্ক' পাদের ব্যাখ্যান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাহাদের নিকট এই গ্রন্থ অত্যন্ত আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। বেদান্তদর্শনে সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল নামক চারটি অধ্যায় বিদ্যমান। তন্মধ্যে অবিরোধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়টি সর্বাধিক যুক্তি-ও তর্ক-সমন্বিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য। এই অধ্যায়টির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় জ্ঞানপিপাসু-গণের ও ছাত্রগণের একটি অভাব বিদূরিত হইয়াছে। আশা করি অন্যান্য খণ্ডগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পাঠকগণের অভাবের সম্পূরণ করিবে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আকাঙ্ক্ষা করি।

—শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী

স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী—ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য। প্রকাশনায় অশোক প্রকাশন-এর পক্ষে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক, এ ৬২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ২০০; মূল্য পাচ টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলা-পার্ষদ বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থখানি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ছোট ছোট পরিচ্ছেদে মহাজীবনের অনেক কাহিনী পরিবেশিত, যেগুলি অনেকেরই অজানা। ভাষার স্বচ্ছতা আছে, বর্ণনার ভঙ্গীটিও ভাল। বাল্যকালের ঘটনাবলী সুন্দর-ভাবে চিত্রিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে এবং সাধনা ও পরিব্রাজক জীবনের নানা ঘটনা নিপুণ লেখনীস্পর্শে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমেরিকায় সুদীর্ঘকাল অবস্থান ও বেদান্ত-প্রচারের বিষয় খুব কমই জানিতে পারা যায় পুস্তকখানি হইতে, এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে ইহাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত বলা চলে না। পরবর্তী সংস্করণে এই অভাবগুলি দূর করিতে চেষ্টা করিলে গ্রন্থের মূল্য এবং মর্যাদা উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব

বেলুড় মঠ : গত ১৮ই পৌষ (৩. ১. ৬৭) মঙ্গলবার কৃষ্ণা সপ্তমীতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১১৪তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, তৎপরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা, হোমাদি, ভজন, পাঠ ও কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকায় আয়োজিত সভায় স্বামী ভূতেশানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। স্বামী তেজসানন্দজী, স্বামী সৎস্বরূপানন্দজী এবং সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপযোগী মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সারাদিনে, বিশেষতঃ অপরাহ্ণে বহু ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী : কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১১৪তম জন্মোৎসব গত ১৮ই পৌষ মঙ্গলবার (৩. ১. ৬৭) মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচার পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। তিনসহস্রাধিক ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। রাত্রে গ্রে স্ট্রীট সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকীর্তন হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা

ত্রিচুড় : গত ১০ই নভেম্বর দক্ষিণ-ভারতে ত্রিচুড় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গুরুকুলে বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত মন্দির ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি বেলুড় মঠের মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত; দক্ষিণ-ভারতে এই ধরনের মন্দির ইহাই প্রথম। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রায় ৫০ জন এবং অন্য সম্প্রদায়ের কয়েকজন সন্ন্যাসী এই উৎসবে যোগদান করেন।

এইদিন প্রত্যুষে নহবতবাদ্য-সহকারে সুসজ্জিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি-সহ শোভাযাত্রা মন্দির প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল সবৎসা গাভী, মঙ্গলঘট। শঙ্খধ্বনি, পুষ্প- ও লাজ-বিকিরণ এবং গঙ্গোদক-সিঞ্চনের পশ্চাতে পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি মস্তকে ধারণ করিয়া তিনবার গর্ভমন্দির প্রদাক্ষিণান্তে সমবেত অসংখ্য নরনারীর জয়ধ্বনির মধ্যে বেদীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার ভক্ত নরনারী ত্রিচুড় শহর ও অন্যান্য স্থান হইতে উৎসবে যোগদান করেন। স্থানীয় পুরোহিতগণ গণপতি-হোম ও বাস্তুযাগ করিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, শিব, নারায়ণ, গণেশ প্রভৃতির ষোড়শোপচার পূজা সুসম্পন্ন করেন বেলুড় মঠের স্বামী হিতানন্দজী ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

প্রায় দুই হাজার ভক্তকে পরিতোষ সহকারে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে 'ওটম্ তুল্লাল' গান হয়। আরাত্রিকের পর স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পরে ভজনসঙ্গীত গীত হয়। পরদিন অপরাহ্ণে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজকে মানপত্র প্রদান করেন।

দুইদিনব্যাপী এই উৎসবে আশ্রমে এক আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বেলঘরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত প্রাচীন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সহিত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত 'মানুষ তৈয়ারীর' যুগোপযোগী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অল্প কয়েকটি ছাত্রকে লইয়া যে প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল, ক্রমোন্নতি ও ক্রম-বিস্তারের পথে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইয়া সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, গত ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করিল। গত ২৪, ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বর বেলঘরিয়া আশ্রম-প্রাঙ্গণে উহার সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব (প্রথম পর্যায়) অনুষ্ঠিত হয়।

২৪শে ডিসেম্বর পরমারাধ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পাদস্পর্শে আশ্রম পূত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর এই দিনটিতে আশ্রমে তাঁহার স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন সকাল ১০টার সময় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রভৃতিকে মাল্য ও অর্ঘ্য প্রদান করিয়া এবং পরে বিবেকানন্দ ধামে আসিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সুসজ্জিত ফটোর সম্মুখে ৫১টি প্রদীপ জ্বালিয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন। ইহার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে একটি চিত্তস্পর্শী প্রসঙ্গের শেষে বলেন, 'মহারাজ বিদ্যার্থী আশ্রম-কে খুবই স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার প্রেরণা ও উৎসাহ লইয়াই এখানকার কর্মীরা যাত্রাপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আজও তাঁহার আশীর্বাদ এই প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির পথে লইয়া চলিয়াছে, প্রার্থনা করি ভবিষ্যতেও লইয়া চলিবে।'

এইদিন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী, সাধারণ কর্মসচিব স্বামী গম্ভীরানন্দজী প্রমুখ মঠের বহু সন্ন্যাসী ও শিক্ষাব্রতী উৎসবে যোগদান করেন। আশ্রমের পতাকা উত্তোলন করেন আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী সন্তোষানন্দ। সন্ধ্যায় শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাভারত আলোচনা করেন। আলোচনাটিকে মহাভারতের তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ ভূমিকা বলা যাইতে পারে। ইহার পর 'খ্রীষ্টমাস ইভ' অনুষ্ঠিত হয়।

২৫শে ডিসেম্বর সকালে প্রাক্তন ও বর্তমান বিদ্যার্থীদের মিলনোৎসব-সভা আরম্ভ হয়। অন্যতম প্রবীণ প্রাক্তন বিদ্যার্থী, আশ্রমের বর্তমান কর্মসচিব স্বামী সন্তোষানন্দজী সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রবীণ বিদ্যার্থী স্বামী বিশোকানন্দজী সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলেন, 'স্বামীজীর আদর্শে জীবনগঠনের প্রচেষ্টা এই আশ্রমের প্রাণ। ইহা যেন আশ্রমে চিরদিন অব্যাহত থাকে।' প্রাক্তনী-সংসদের কর্মসচিব শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর বিবরণী পাঠের পর স্বামী সন্তোষানন্দজী বলেন, 'মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। এই কথাটি স্মরণে রাখিয়া জীবনপথে চলিলে সব সমস্যা-সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।'

এইদিন বিকালে স্বামী গম্ভীরানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নির্বেদানন্দজীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ ৭০ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে যে নেতিমূলক ভাব দেখিয়াছিলেন, আজও তাহা বর্তমান রহিয়াছে। ইহাই ছাত্রদের আত্মবিকাশের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। ছাত্রদের কল্যাণপথ-নির্দেশক আজ কেহ নাই।'

তিনি বলেন, 'শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া চাই; এই আশ্রম হইতে সেই শিক্ষার আলোক আজ ৫০ বৎসর ধরিয়া বিকীর্ণ হইতেছে।' প্রধান অতিথি শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় তাঁহার ভাষণে স্বামীজীর সেবাধর্ম ও দেশসেবকের আদর্শ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বহু কথা বলেন।

সভার প্রারম্ভে স্বামী সন্তোষানন্দজী আশ্রমের জীবনকথা সংক্ষেপে বিবৃত করেন। সভান্তে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী তেজসানন্দজী।

সন্ধ্যায় বিদ্যার্থী আশ্রমের ছাত্রগণ "সূর্যগ্রহণ" ও "বগলার বিভ্রাট" নাটিকা-দুইটি মঞ্চস্থ করে।

তৃতীয় দিন ২৬শে ডিসেম্বর সকালে মিলনোৎসব-সভার দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। বিকালে ব্যায়ামাচার্য শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ ও তাঁহার সম্প্রদায় ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন করিয়া সহস্রাধিক দর্শককে মুগ্ধ করেন।

সন্ধ্যায় স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ রহড়া বালকাশ্রমের কয়েকজন বিদ্যার্থীর সহিত সুললিত ভাষায় সঙ্গীত সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকথা পরিবেশন করেন।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের রজত-জয়ন্তী উৎসব

ভারতপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নশিশু রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের যে রজত-জয়ন্তী ১৯৬৬ সালের ৪ঠা জুলাই এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে পূজা-হোমাদির মাধ্যমে অনুসূচিত হইয়াছিল, গত ২৮শে ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজী বর্ষারম্ভের শুভদিবস পর্যন্ত সেই উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

গত ২৮শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ বিদ্যামন্দির কলেজ ভবনের প্রবেশ-পথে স্বামী বিবেকানন্দের একটি আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। অতঃপর তিনি বিদ্যামন্দিরের জাতীয় সমরশিক্ষাবাহিনী এবং ব্যাণ্ডবাদকদের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আয়োজিত এক সভায় পৌরোহিত্য করেন পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

সভাপতির ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, সেই শিক্ষার প্রকৃষ্ট মাধ্যম ভালবাসা, স্নেহ ও প্রীতি। প্রধান অতিথি ডঃ মজুমদার তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন যে, আজ বিভ্রান্ত শিক্ষাজগতে এই বিদ্যামন্দির একটি স্থির আলোকশিখা,—মরুভূমির শুষ্কতার মধ্যে সজীবতার আশ্বাস পরে বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজী বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভাশেষে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে 'মহাসমর' নাটকটি অভিনীত হয়।

২৯শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে বিদ্যা-মন্দিরের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ ভট্টাচার্য তাঁহার ভাষণে বলেন যে বর্তমান অবস্থায় রামকৃষ্ণমিশন পরিচালিত একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন। ঐ দিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট শিল্পিগণ কর্তৃক সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

৩০শে ডিসেম্বর শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাসের পরি-চালনায় হাওড়া জনকল্যাণ সমিতিকর্তৃক ব্যায়াম ও দেহচর্চা সম্বন্ধীয় এক প্রদর্শনী ষ্টিত হয়। এই প্রদর্শনীটি সকলের অকুণ্ঠ

প্রশংসা লাভ করে।

৩১শে ডিসেম্বর ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে শিক্ষাসম্পর্কে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন—স্বামী মুমুক্ষানন্দ, সর্বশ্রী জনার্দন চক্রবর্তী, তামসরঞ্জন রায়, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী এবং অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়। এই দিন সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

১লা জানুআরি বিদ্যামন্দির রজতজয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি-দিবসে বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব আয়োজিত হয়। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে ত্রিপুরার কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর (প্রাক্তন ছাত্র) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ছাত্রদের পুনর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। এই সভায় প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে শ্রীজগদীশ দাস, শ্রীবাবুরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅমূল্য কুমার মণ্ডল বক্তৃতা করেন। অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজী মহরাজ তাঁহার ভাষণে বলেন, স্বামীজীর আদর্শে পরিচালিত, বিদ্যামন্দিরের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রতিটি ছাত্রের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন এবং প্রত্যেক ছাত্রকে শুভশক্তির আধার করিয়া তোলা।

সভাপতি ডঃ ধর বিদ্যামন্দির শিক্ষাদর্শের কথা এবং বর্তমান বিপর্যস্ত সমাজে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথি ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন—স্বামীজীর আদর্শে সৃষ্ট বিদ্যা-মন্দির উন্নত শিক্ষাদর্শের স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর রজতজয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত ১লা জানুআরি (১৯৬৭) 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথম দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, কালীকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন অবলম্বনে কথকতা, 'সাধককবি রামপ্রসাদ' পালাকীর্তন, শ্রীখোল লহরা ও পল্লীগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে স্বামী তীর্থানন্দ কর্তৃক ভাগবত-ব্যাখ্যার পর স্বামী গম্ভীরানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার যুগোপযোগী ভাষণ দেন। সভান্তে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর রামায়ণ-কীর্তন (পালা—মারুতির কীর্তি) শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করেন। এই দিন প্রায় ২৫ হাজার ভক্ত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল, সভাদিতে প্রায় ৮ হাজার নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ কর্তৃক গীতা-ব্যাখ্যার পর জনসভায় স্বামী ভূতেশানন্দ (সভাপতি), স্বামী সৎস্বরূপানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ এবং স্বামী নির্জরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে সুন্দর বক্তৃতা দেন। রাত্রে ব্যায়ামাচার্য শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ ও মুষ্টিযোদ্ধা বিভূতিভূষণ ঘোষের পরিচালনায় বিবিধ ব্যায়াম-কৌশল ও মুষ্টিযুদ্ধ তরুণসম্প্রদায়কে স্বাস্থ্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করে। এই দিন উদ্যানবাটীতে ১২ হাজার লোকের সমাগম হয়।

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে চৈতন্যমঙ্গল-লীলাকীর্তন এবং হাওড়া-সমাজ কর্তৃক নদের নিমাই 'নদীয়া-লীলা' কীর্তনাভিনয় প্রায় ১৫ হাজার দর্শককে প্রচুর আনন্দ দিয়াছিল।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে প্রতি বৎসরের ন্যায় 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে যথারীতি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা পাঠ ও ভজনাদি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রসাদ হাতে-হাতে দেওয়া হয়। বহু ভক্তের সমাগমে ও ভজনকীর্তনে যোগোদ্যান আনন্দমুখর হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

আসামে রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্ত-সেবাকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

উত্তরপ্রদেশে বান্দা জেলায় লখ্‌নৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে এবং বিহারে মুঙ্গের ও হাজারিবাগ জেলায় যথাক্রমে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ ও রাঁচি (মোরাবাদী) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক খরা-ত্রাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। সমস্ত আর্তসেবাকার্যই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় কর্তৃক উপরি-উক্ত কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ও নিকটবর্তী শাখা-কেন্দ্র-সমূহের সহায়তায় পরিচালিত হইতেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর খরা-ত্রাণ তহবিল হইতে পর্যাপ্তপরিমাণ অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

রেলওয়ে বোর্ড রিলিফের জন্য সর্ববিধ অত্যাবশ্যক দ্রব্য, যথা—ঔষধপত্র, ভিটামিন ট্যাবলেট, বিস্কুট, গুঁড়া দুধ, পরিধেয় বস্ত্রাদি, কম্বল প্রভৃতি যথাসম্ভব সত্বর বিনা-ভাড়ায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনেও পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিহার ও উত্তরপ্রদেশে দুর্গত জনগণের মধ্যে খরা-ত্রাণকার্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতেছে বলিয়া সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইলে এই সুযোগ পাওয়া যাইবে। চাল, আটা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং আলু বিনা-মূল্যে প্রেরণ করা যাইবে না। আগামী ২৮শে ফেব্রুআরি, ১৯৬৭ পর্যন্ত রেলওয়ে-কনসেশন পাওয়া যাইবে।

স্বামী গোপালানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণ

আমরা অতি দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি যে, গত ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬ রাত্রি ১০টার সময় কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শ্রীমৎ স্বামী গোপালানন্দ (গোপাল মহারাজ) ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হঠাৎ পড়িয়া গিয়া বাম উরুর অস্থিমুখ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হইয়াছিল।

তিনি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন।

কিছুকাল তিনি বালিয়াটী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে কয়েক বৎসর তিনি তপস্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর; কঠোর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতেন তিনি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই বেলুড় মঠে জপধ্যান ও প্রার্থনাদির মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৮ই মাঘ, (১. ২. ১৯৬৭) বুধবার, কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৫তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের উদ্বোধন

মেদিনীপুর জেলায় আরিট গ্রামে গত ১৪ই ডিসেম্বর "বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের" (প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের) উদ্বোধন উপলক্ষে নবনির্মিত ত্রিতল ভবনের দ্বার উন্মোচন করেন বেলুড় মঠের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ। উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি-চীফ-ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ দাস মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

বিকাল ৪ টায় উক্ত বিদ্যালয়ের হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ। এই সভায় সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ হয়। সকালে প্রভাতফেরী, ষোড়শোপচার পূজা, হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়।

পরলোকে ডক্টর কালিদাস নাগ

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও বহুভাষাবিদ্ ডক্টর কালিদাস নাগ গত ৮ই নভেম্বর (২২ শে কার্তিক) প্রাতঃকালে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। কলিকাতাতেই তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্কটীশ চার্চ কলেজে প্রথম অধ্যাপনায় ব্রতী হন এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিযুক্ত হন। এই বৎসরই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যশস্বী অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত বিনয়নম্র সৌজন্য ও শিষ্টাচার এবং মধুর স্বভাবের সম্মিলন কচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মিলনের ক্ষেত্রে তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টা চিরকাল অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত তিনি এশিয়া মহাদেশের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারকরূপে তিনটি মহাদেশ ভ্রমণ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি পাশ্চাত্য মনীষী রোম্যাঁ রোল্যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনচরিত রচনায় বহু তথ্য সরবরাহ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসবে পাশ্চাত্য মনীষিগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষাকারিগণের মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন বলা যায়। বহু সভা-সমিতিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজী সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাষায় ভাষণ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্য ও ভাবধারার প্রতি তাঁহার অন্তরের আকর্ষণ ছিল।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন সময়ে তিনি বহু তথ্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ দ্বারা উদ্বোধনকে অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নয়।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ।। শান্তিঃ।।।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন বিহার ও উত্তরপ্রদেশ খরা-ত্রাণ-কার্য

অদৃষ্টপূর্ব খরার জন্য বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বহু অঞ্চলের লোক অনাহারে প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে। পরিস্থিতি এমন বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে যে আপ্রাণ চেষ্টায় ইহার প্রতিকার-কল্পে সমগ্র দেশের একযোগে আগাইয়া আসিবার সময় আসিয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র খুলিয়া এ-দুটি প্রদেশে ত্রাণকার্য আরম্ভ করিবার কাজ মিশন হাতে লইয়াছে। উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় এবং বিহারের মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলায় কাজ আরম্ভও হইয়া গিয়াছে।

আসামের কাছাড় জেলায় মিশনের বন্যাত্রাণকার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু উহা সমাপ্ত করিবার পূর্বেই বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ত্রাণকার্যের গুরুভার আসিয়া পড়িল। আমাদের সামান্য সম্বল লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। তবে সহৃদয় দেশবাসীর উপর আমরা পূর্ণ আস্থা রাখি; এরূপ জনহিতকর কার্যে পূর্বে মিশন সর্বক্ষেত্রেই তাঁহাদের সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে।

অর্থ বা দ্রব্যাদি যে কোন সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ-এ চেক পাঠাইবার সময় "রামকৃষ্ণ মিশন" এই নামে চেক কাটিবেন।

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া, পশ্চিম বঙ্গ।

২। উদ্বোধন আফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩।

৩। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯।

৪। রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. সানাটোরিয়াম, পোঃ রামকৃষ্ণ সানাটোরিয়াম, রাঁচি, বিহার।

৫। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মোরাবাদী, রাঁচি-৮, বিহার।

৬। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা-৪, বিহার।

৭। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পোঃ বিদ্যাপীঠ, দেওঘর (সাঁওতালপরগণা), বিহার।

৮। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামসেদপুর-১, বিহার।

৯। রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী-১।

১০। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, লক্ষ্ণৌ, উত্তরপ্রদেশ।

বেলুড় মঠ,
১৬.১২.৬৬

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ-সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ
উদ্বোধনের নূতন বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন।

দিব্য বাণী

পীত্বা পীত্বা পরমপীযূষং বীতসংসাররাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকলকলহপ্রাপিণীং স্বার্থসিদ্ধিম্।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা শ্রীগুরুচরণং সর্বকল্যাণরূপং
নত্ব' নত্বা সকলভুবনং পাতুমামন্ত্রয়ামঃ॥

প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদিদেবৈর্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ॥—স্বামী বিবেকানন্দ

সংসার-আসক্তি ত্যজি', ত্যজি' সর্ব-দ্বন্দ্ব-মূল স্বার্থপরতায়,
পরামৃত পান করি', ধ্যান করি' সর্ববিধ কল্যাণ-নিলয়
শ্রীগুরু-চরণাম্বুজ, ধরাবাসী সবাকারে করি' নমস্কার—
অমৃত-পানের তরে সবাকারে আমন্ত্রণ করি বারংবার।

পূর্ণ যেই পাত্রখানি অনাদি-অনন্ত-বেদ-
পয়োধি-মন্থন-লব্ধ অতুলন ধনে—
যাহে শক্তি প্রদানিলা প্রজাপতি-নারায়ণ-
মহেশাদি শক্তিমান সর্ব দেবগণে,
পরিপূর্ণ যাহা সর্ব-অবতার-প্রাণসারে—
পূর্ণ যাহা সবাকার মিলিত সত্তায়—
সে-অমৃত-পূর্ণপাত্র ধরিয়া মানবদেহ
রামকৃষ্ণ-রূপ লয়ে এসেছে ধরায়!

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য

আমাদের মন যে রঙ-এ ছোপানো থাকে, তাহাই আমাদের দৈনন্দিন আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। চিন্তাই আমাদের স্বভাবের মূল। ব্যক্তিগত, জাতিগত চিন্তাধারাই তাই আমাদের জীবনের নিয়ামক এবং মানদণ্ডও।

মনে রঙ ধরাই আমরা নিজেরাই—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।" যে বিষয়ে যত বেশী মন দিই, তাহার কথা চিন্তা করি, মনে তাহার রঙ ধরে তত বেশী। আমাদের আচরণও সেই অনুপাতে অভ্যাসের গভীরতার দিকেই তত বেশী করিয়া চলিতে থাকে।

কাজেই যেখানে আচরণের, অভ্যাসের সংস্কার বা পরিবর্তন প্রয়োজন, সেখানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন চিন্তার পরিবর্তন, মনের আগের ছাপ তুলিয়া তাহাকে অন্য রঙ-এ ছোপানো কিভাবে তাহা সহজে করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা-প্রণালীতে দেখা যায়, আগের ছাপ তোলার জন্য কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া না যাইয়া সোজাসুজি তিনি নূতন রঙ-এ মনকে ছোপাইতে বলিতেন—মনের মোড় ফিরাইয়া দেওয়ার কথা বলিতেন; 'পুব দিকে এগিয়ে গেলে পশ্চিম আপনি পিছিয়ে পড়বে', তার জন্য পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নাই।

স্বামী যোগানন্দ (তখন যোগেন্দ্রনাথ) দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করেন। তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন, 'কাম জয় করা যায় কিরূপে?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, 'খুব হরিনাম করবি, তাহলেই যাবে।'

উত্তরটি যোগানন্দজীর মনঃপূত হয় নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগাসনাদি বাহিক কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিয়া উহা অভ্যাস করিতে বলিবেন, কিম্বা হরীতকী খাইতে বা প্রাণায়াম করিতে বলিবেন। কালীবাড়ীতে তখন একজন হঠযোগী আসিয়াছিলেন; পঞ্চবটীতে থাকিতেন। তাঁহার নিকট মাঝে মাঝে যাইয়া স্বামী যোগানন্দ তাঁহার ক্রিয়াকলাপ গভীর কৌতূহলভরে লক্ষ্য করিতেন। তাহার ফলে এরূপ একটা প্রত্যাশাই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনঃপূত না হইলেও তিনি তাঁহার কথামত চলিলেন এব অল্প দিনেই উহাতে সুফল পাইলেন।

একজন ভক্ত পানাসক্ত। তাহাকে তিনি মদ্যপানের দোষ দেখাইয়া যুক্তিতর্ক সহায়ে কদভ্যাসের কবল হইতে মুক্ত হইতে বলিলেন না; বলিলেন, 'খাবার সময় মাকে নিবেদন করে খাবে।' বলা বাহুল্য, তাহাতেই ফল হইয়াছিল। একজন মহিলা ভক্ত জপধ্যানের সময় মন স্থির করিতে পারিতেছেন না, একজন আত্মীয়ের উপর অধ্যধিক ভালবাসার ফলে জপধ্যানের সময়ও মন তাহার দিকেই যায়। তাঁহাকে তিনি আত্মীয়টির উপর হইতে মন তুলিয়া লইতে বলিলেন না; বলিলেন 'ওকে আরো বেশী করে ভালবাস। তবে ওকে মানুষ বলে ভাববে না, ভগবান বলে ভাববে।' অল্প কিছুদিন তাঁহার নির্দেশমত চলার ফলে মহিলাভক্তটির ইষ্টদর্শন হইয়াছিল। গৃহস্থ ভক্তগণকে সাধারণভাবে এই কথাই তিান বলিতেন, আত্মীয়বর্গের সহিত আচরণের সময় ভগবানেরই সেবা করিতেছি, এই কথা ভাবিতে বলিতেন; সংসারত্যাগের উপদেশ তাঁহাদের

দিতেন না। সত্যলাভ যেখানে লক্ষ্য, সেখানে মনকে সত্যের রঙে সোজাসুজি রঞ্জিত করিতে বলিতেন, 'মনের মোড় ফিরাইয়া' দিতেন শুধু। ইহারই ফলে অসত্যের রঙ-এর ছাপ আপনি উঠিয়া যাইত।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক

বর্তমান যুব-সমাজের চিন্তা ও আচরণ পালটাইতে হইলে এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। এ কাজে ইহা ছাড়া অন্য পথও আর নাই। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই অন্য ভাষায় বলিয়াছেন, 'কদভ্যাসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় মনে বিপরীত চিন্তার ছাপ দেওয়া।'

এক ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত মনের কাছে ইহা প্রথমে যতটা কঠিন বলিয়া মনে হয়, আসলে মোটেই তাহা নহে, কিছুদিনের অভ্যাসেই সর্ববিধ চিন্তাই সাধারণ মনের কাছে স্বাভাবিক ও প্রিয় হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, মন ধোয়া কাপড়ের মত, যে রঙ-এ ছোপানো যায়, সেই রঙই ধরে। প্রয়োজন শুধু অভ্যাস। অভ্যাসের ফলে 'পশ্চিম আপনি পিছাইয়া যায়' এবং অভ্যাসের ফলে 'মিছরীর পানার আস্বাদ' একবার একটু পাইলে মন 'পুব দিকে আগাইয়া' চলে দ্রুততর গতিতে, পিছনে চিটেগুড়ের পানা'র দিকে ফিরিয়া দেখিতেও চায় না।

সচ্চিন্তা এবং সদভ্যাসের নিয়মিত ব্যাপক ব্যবস্থা তাই জাতির উন্নতির জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করিয়া আমাদের জাতির উন্নতির জন্য একান্তভাবেই প্রয়োজন ধর্মের দিকে জাতীয় মনের মোড় ফিরাইয়া দেওয়া। জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী যা কিছু অবাঞ্ছিত আচরণ আজ দেশের সর্বত্রই লক্ষিত হইতেছে, তাহা নিরোধের ইহাই একমাত্র উপায়। ধর্মের দিকে জাতীয় জীবনের মোড় ফিরিলে জীবনে যা কিছু বরণীয়, যা কিছু শক্তিপ্রদ, যা কিছু সর্ববিধ উন্নতির সহায়ক, তাহা আপনি আসিয়া পড়িবে। স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, "ধর্ম, একমাত্র ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি।"

আজ যে বিপর্যয় জাতীয় জীবনে আসিয়াছে, তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি যুগে যুগে পরিবর্তনশীল; সময়োপযোগী পরিবর্তন সেগুলির ঘটিবেই—স্বাভাবিক নিয়মে। তাহার জন্য দুশ্চিন্তার কিছু নাই। কিন্তু ইহার জন্য যদি জাতীয় আদর্শকে ত্যাগ করিবার প্রবণতা আসে, তাহা অতীব ক্ষতিকর, বিপজ্জনক। আজ সেই বিপদই দেখা দিয়াছে। আদর্শ ও নীতির মান সম্বন্ধে ধারণা আজ যুব-মনে পাল্টাইয়া যাইতেছে। সুদীর্ঘকাল মুসলমানগণের পরাধীনতায় থাকিয়াও যাহা হয় নাই, ইংরেজ আমলে যাহা স্বল্পসংখ্যক যুবককে মাত্র প্রভাবিত করিয়াছিল (তাহাতেই সাংস্কৃতিক পরাজয়ে জাতির স্বাতন্ত্র্যের অবলুপ্তির আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিল এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব অমিত বলসঞ্চার করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল), সেই সাংস্কৃতিক পরাজয়ের বিপদ আবার আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। ভারতের নিজস্ব আদর্শ ত্যাগ করিবার প্রবণতা যুবকগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যাইতেছে। ভারতীয় জাতি যুগযুগ ধরিয়া যে জীবনাদর্শকে আঁকড়াইয়া চলিতেছে, তাহার মূল ভিত্তি ঈশ্বরবিশ্বাস, সত্য ও পবিত্রতা; এ সবকিছুই আজ

জীবনে অপ্রয়োজনীয়, এমনকি জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়াও বিবেচনা করার চিন্তা আজ ভারতের যুবকদের গ্রাস করিতে চলিয়াছে। স্বাধীন ভারতের একাংশ চীন এখনো দখল করিয়া রহিয়াছে, অন্নের জন্য এখনো আমরা পরমুখাপেক্ষী; কিন্তু এসবের চেয়েও বেশী লজ্জার কথা, বেশী আশঙ্কার কথা সাংস্কৃতিক বিজয়ের যে কালো ছায়া যুব-মনকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করিয়া চলিয়াছে, আমাদের তাহা অপসারণ করার অপারগতা; আর বোধ হয় অপসারণ করার প্রয়োজনীয়তাবোধও।

আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না, যা-কিছু অনর্থ আজ ঘটিতেছে, তাহার অন্যতম মূল কারণ হইল জাতীয় মনে আদর্শ ও নীতির এই নবমূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন যতই আপাতরমণীয়তার ও অগভীর যুক্তির চাকচিক্যে মণ্ডিত হউক না কেন, ইহা মনুষ্যত্বের উন্নতিপথাভিমুখী নয়, নিম্নাভিমুখীই। যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করার প্রচেষ্টাই মানুষকে পশুত্বের স্তর হইতে উন্নীত করিয়াছে, সে প্রবৃত্তিগুলির অবাধ সঞ্চরণের পথ যে আদর্শ ও নীতি উন্মুক্ত করিতে চায়, তাহা পরিণামে মনুষ্যত্বকে কোথায় টানিয়া নামাইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। মানবকল্যাণসাধনে মানুষকে অধিকতর শক্তি-শালী করে কোন্‌টি—সংযম না অসংযম? একাগ্রতা না বিক্ষিপ্তচিত্ততা?

ভারতীয় জাতির অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট যে চিন্তাধারা একদা স্বামী বিবেকানন্দের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল—'হায়, অদৃষ্টের কি পরিহাস, ভগবান শুকের জন্মভূমিতে ত্যাগ পাগলামি ও পাপ বলিয়া ধিক্কৃত হইতেছে', যে চিন্তাধারা দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা দিনরাত বিষয়-চিন্তা করে মাথা ঠিক রাখতে পারলে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে, তাঁর চিন্তা করে আমি বেহেড হয়ে গেলাম?'—সেই চিন্তাধারাই আজ আবার জাতীয় মনকে, বিশেষ করিয়া যুব-মনকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে।

ইহার একমাত্র প্রতিকার যুবকগণের 'মনের মোড় ফিরাইয়া' দেওয়ার প্রচেষ্টা। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই তাহা করা সহজ। শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের চিন্তা আজ বহু ঘা খাইবার পর আমাদের সকলের মনে জাগিতেছে। কিন্তু কোন সুফলপ্রসূ পন্থা এখনো নির্দিষ্ট হয় নাই। আমাদের দেশে ইহার একমাত্র পথ, স্বামীজী যাহা বলিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মচর্যআশ্রমের আদর্শে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজা—যে আদর্শে নিয়মিত সচ্চিন্তা ও সদভ্যাসের মাধ্যমে মনের মোড় ফিরাইয়া তাহার উৎকর্ষসাধন ওতপ্রোত। কেবল সদ্‌গ্রন্থ পাঠেই (তাহার ব্যবস্থাও এখন নাই) 'মনের মোড় ফিরানো' যায় না, কিছু সেবা এবং নিয়মিতভাবে সকাল-সন্ধ্যায় ভজন-প্রার্থনাদির মাধ্যমে মনকে একাগ্র করার, তাহাকে 'মিছরীর পানার' আস্বাদ দেওয়ার ব্যবস্থারও প্রয়োজন।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীর শিক্ষাব্যবস্থাকে আজ ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আদর্শে ঢালিয়া সাজিবার সময় আসিয়াছে।

অনুপম

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

রামকৃষ্ণ পরমহংস
মানব-ভাবনা-লোকে নিরঞ্জন পূর্ণের প্রতিমা
ভূমি ও ভূমার অবতংস !
জ্ঞানেতে বিরাট
প্রেমেতে স্বরাট
ভক্তির সাগর যেন হোয়েছে জমাট
কর্মের আকাশপটে ভেসে যায় উদাসী অভ্রাট
অসীমের রূপে মুগ্ধ প্রেমোচ্ছল ব্রহ্মর্ষি সম্রাট !

নক্ষত্রের কুহেলিকা হোতে
অপরিমাণ কাল স্রোতে
সৃষ্টির মঞ্জরী কত ফোটে, ছোটে, ফুলে আর ফলে—
লক্ষ কোটি অভিজ্ঞান মহাকাশে চলে আর জ্বলে—
নিরবধি রচনার তালে
কল্পান্ত ঘোষিত কালে কালে
ব্যক্তির ঈশ্বর ওই বহ্নি-স্পর্শে হোল বিশ্বেশ্বর
দেশ-কাল-জাতি-হারা অচিহ্নিত মুক্ত মহেশ্বর !
যে তাহারে যে রূপেতে চায়
বিভাসিত হোয়েছে সে তায়
সীমাহীনে সীমা বাঁধে বেদী ও অন্তরে
মানুষের কারা হোতে মুক্ত তুমি করেছ ঈশ্বরে !

হে মহান্, হে পরমহংস
করুণাকটাক্ষে তব ছিন্ন হয় কাম আর কামনাবিধ্বংস
হিল্লোলিত পবিত্রতা
রূপ স্তব্ধ তব তথা
কল্পনা বিহ্বল হয়—স্তুতি বুঝি নতি হোয়ে যায়—
মুক্তির এষণা বসে মরণের মাল্য রচনায় !
জ্যোতির দেবতা তুমি
ভূমা তাই পায় ভূমি
ধর্ম আর নাহি মাগে গিরিদরী বন
তোমার চরণস্পর্শে শিবময় হোয়েছে ভুবন।

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

[স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে লিখিত]

57, R. K. Bose St.
31st. July, '97

My Dear Swam i,

স্বামীজী ইংলণ্ডে যে রিপোর্ট করিতে বলিয়াছেন তাহা এখানে করা হইতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সুধীরের মারফৎ জুন মাসে মঠে কি কি পাঠ বা কে কি বিষয়ে lecture দিয়াছে বা কি Private Study করিয়াছে তাহা শীঘ্রই রাজেনের মারফৎ লিখিয়া পাঠাইবেন। মঠের members ও office-bearers দিগের নামও লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি next week মঠে যাইতেছি, শরীর তত ভাল নাই। আপনারা সকলে কেমন আছেন?

দাস ব্রহ্মানন্দ

(২)

[স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লিখিত]

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

Gurave Namah

Alambazar Math,
October. '97.

My Dear Gangadhar,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তুমি আমার ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ, প্রণাম ও কোলাকুলি জানিবে। পূজা বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। হরিবাবু নয় দিন চণ্ডীপাঠ করিয়াছেন। সুশীল হইয়াছিল পূজারী এবং সুধীর ছিল তত্ত্বধারক।...হরিপ্রসন্ন, সুধীর ও সুশীল...সত্বরই আম্বালায় যাইতেছে।[১] ভালবাসা ও প্রণাম লও।

Yours afftly
Brahmananda

---

[১] সুধীর মঃ ও হরিপ্রসন্ন মঃ যান। সুশীল মহারাজের যাওয়া ঘটে নাই। স্বামীজীর সহিত তাঁহারা লাহোরে মিলিত হন।

(৩)

[মোহনদাস পাণ্ডুরং মোরে-কে লিখিত]

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

4th. Nov. '97

মহাশয়,

গত মাসের ১২ই তারিখের পত্রে আপনি যে সব প্রশ্ন করিয়াছেন তদুত্তরে আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :—

আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য এই—আমাদের যুবকদের এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহার সাহায্যে তাহারা বেদান্তোক্ত মোক্ষ (জীবন্মুক্তি) লাভ করিতে পারে, এবং সেই জন্যই তাহাদিগকে শুধু পল্লবগ্রাহী শাস্ত্রজ্ঞ তৈয়ার না করিয়া যাহাতে তাহারা চরিত্র গঠন করিতে পারে—উন্নততর ছাঁচে জীবন তৈরী করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে যত্নপর হইতে হইবে। এক কথায়, আমাদের এটি হইল একটি ধর্মীয় সংস্থা—একটি মঠ; যাহারা শাস্ত্রবিহিত সত্যোপলব্ধির নিমিত্ত সংসারের সকল সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য ছিন্ন করিয়াছে তাহারাই আমাদের তত্ত্বাবধানে এখানে বাস করিয়া নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং ভগবানে ভক্তিলাভের অভ্যাস করে ও যাহাতে তাহাদের নৈতিক চরিত্র উন্নততর হইতে পারে তজ্জন্য নিজদিগকে নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে রাখিয়া জীবন যাপন করে। যে সব শর্তে বিদ্যার্থীদের এখানে গ্রহণ করি সে সম্বন্ধে আপনাকে জানাইতেছি যে, এমন কাহাকেও এখানে রাখা হয় না যাহাদের ত্যাগের পথ হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অথবা যাহাদের স্কন্ধে সংসারের গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে। তবে আমরা সত্বরই এমন সব প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছি যেখানে অবস্থান করিয়া সকলে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়াও প্রকৃত শিক্ষা পাইতে পারিবে, স্ব স্ব জন্ম ও সংস্কারানুযায়ী তাহারা জাগতিক ও পারমার্থিক উন্নতির সুযোগেরও প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে।

আপনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার জবাবের জন্য সে উহা আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে, সেই জন্যই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি।

Yours etc.
S. Brahmananda

To

Mohandas Pandurang Moray,
C/o. R. B. Todankar Esqr.
Secretary's Office,
Port Trihut,
Bombay.

(৪)

[স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লিখিত]
(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

Alambazar Math,
27. 11. 97.

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

My Dear brother Swami,

কোন কারণবশতঃ তোমাকে সময়মত সংবাদ দিতে পারি নাই বলিয়া আমি দুঃখিত। আশা করি তুমি এজন্য ক্ষমা করিবে, গত সপ্তাহে মঠে পৌঁছিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পরদিনই স্বামী তুরীয়ানন্দের জরুরী নির্দেশে কলিকাতায় যাইতে হইল ; কারণ তিনি জানাইয়াছিলেন যে, গোপালের মা গুরুতর অসুস্থ এবং তাঁহার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। সেই জন্যই কয়েকজন গুরু-ভাইকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে তিনি এখন অনেকটা ভাল ; আজ তিনি অন্নপথ্য করিবেন। গতকাল ভোরে আমি মঠে ফিরিয়াছি এবং খুব সম্ভবতঃ এখানেই···পর্যন্ত থাকিব।

আশা করি তুমি সেই পার্শ্বেলটি পাইয়াছ যাহার মধ্যে G. C. Ghosh-এর··· এবং আরতি-প্রদীপের নমুনাটি ছিল।

তুমি এখন কেমন আছ ? সুরেশ কোথায় ? তোমার প্রিয় কালেক্টার সাহেবের খবর কি ? তোমার অনাথাশ্রমের জন্য তিনি কি কোন জমি দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ? স্বামীজী লাহোরে অপূর্ব কাজ করিয়াছেন। তিনি সেখানে অতি চমৎকার তিনটি বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বাগ্মিতায় সেখানকার শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য শ্রেণীর সকলেই খুব মুগ্ধ হইয়াছিল। স্থানীয় Tribune পত্রিকায় তাঁহার যে বক্তৃতা ছাপা হইয়াছিল তাহার একটি নিষ্কর্ষ তোমার নিকট পাঠাইতে চেষ্টা করিব। তোমার পড়া হইয়া গেলে উহা এখানে পাঠাইয়া দিও। স্বামীজী দলবল সহ লাহোর হইতে নিরাপদে দিল্লীতে পৌঁছিয়া সেখানেও তিনটি বক্তৃতা দিয়াছেন। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ যে, সেভিয়ার সেখানে একটি মঠ স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। তবে এখনও স্থানটি নির্দিষ্ট হয় নাই।···

তোমার খাতা ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র তোমার নিকট সত্বরই পাঠান হইবে। ভাই, তুমি তো আমার কুঁড়েমি স্বভাব জান। এই বিলম্বের জন্য মাফ করিও। সদাসর্বদা তোমার কাজের কথা ও তোমার সংবাদ আমাদিগকে লিখিয়া জানাইও।···

ভায়া, সুপ্রভাত ! তুমি যে মহৎ কাজ ও উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য আমরা খুবই সন্তুষ্ট।

পরের পত্রে আরও কিছু লিখিব। ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে।

Yours affly
S. B.

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—যুগপ্রবর্তন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী গম্ভীরানন্দ

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ স্বামীজীর আদেশ-পালনে তৎপর থাকিলেও সকলে তাঁহার ভাবধারা বা কার্য-প্রণালী সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতে পারিতেন না। ইহার প্রমাণ ঐ সমিতি-প্রতিষ্ঠার দিনেই পাওয়া গিয়াছিল। সভা-ভঙ্গের পর বাহিরের সভ্যেরা চলিয়া গেলে স্বামীজী স্বামী যোগানন্দকে বলিলেন, "এভাবে কাজ তো আরম্ভ করা গেল, এখন দেখ্ ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।" স্বামী যোগানন্দ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার এসব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরকম ছিল?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজাপাঠ প্রবর্তন করতে কখনও উপদেশ দেন নি। তিনি সাধন-ভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যেসব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরী করে যেতে আমার জন্ম হয় নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।" স্বামীজী বিনা বাধায় আরও অনেক কিছু বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সব শুনিয়া যোগানন্দজী মন্তব্য করিলেন, "তুমি যা ইচ্ছে করবে তাই হবে। আমরা তো চিরদিনই তোমার আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এসব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জান, মধ্যে মধ্যে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কিনা; তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি না তো?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক কতটুকু নন, তিনি অনন্তভাবময়। ...তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন —তা আমি কি করব—বল্?"

কিছু পরে স্বামীজী গিরিশবাবুর বাড়ীতে বেড়াইয়া আসিতে চলিলেন; সঙ্গে গেলেন যোগানন্দ ও শিষ্য শরচ্চন্দ্র। গিরিশবাবুকে তিনি বলিলেন, "জি. সি., মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা করি, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দিই, ইত্যাদি। আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়।...তুমি কি বল?" গিরিশবাবু বলিলেন, "আমি আর কি বলব? তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র, যা করাবেন তাই তোমাকে করতে হবে।"

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে'র উক্ত বিবরণানুসারে বাদ-বিসংবাদ সেদিন ঐখানেই থামিয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই—যোগানন্দজী শেষ পর্যন্ত সন্দেহমুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; বিশেষতঃ মতভেদটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের

ভাবরাশি-বিষয়ে তত নহে, যত উহার কার্যকরী প্রয়োগ সম্বন্ধে। মতবাদ হিসাবে কেহ হয়তো সেবাব্রত-প্রচারের বিরোধিতা করিতেন না; কিন্তু সন্ন্যাসী ও শ্রীরামকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে ঐ কার্যে নামাইবার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল সরব ও সক্রিয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাদি হইতে সেবার ভাব স্বতই আসিয়া পড়ে এবং অদ্বৈত বেদান্ত মানিতে গেলে সামাজিক কৃত্রিম ভেদ অসমঞ্জস হইয়া পড়ে[১] ইত্যাদি কথা বলিলেও প্রতিবাদে খুব বেশী মুখর বা সক্রিয় হইবার প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু কেহ যদি বলে, সেবাব্রতের দ্বারা মুক্তি হইবে ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের ঐ পথ অনুসরণ করা উচিত, তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুরূপ দাঁড়ায়। সুতরাং ইহা আশ্চর্য নহে যে, যোগানন্দজী তখনকার মতো চুপ করিয়া গেলেও তাঁহার দ্বিধা দূর হইল না এবং গুরুভ্রাতাদের অপর কেহ কেহ তখনও বিরোধ প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা পরবর্তী আর একটি ঘটনা হইতে পাই।

স্বামী যোগানন্দের সহিত আলোচনার পরে আর এক সন্ধ্যায় স্বামীজী বলরাম-ভবনেই বসিয়া গুরুভ্রাতাদিগের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন, এমন সময় ঐরূপ বিশ্রম্ভালাপ-সূত্রেই এক অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হইল। পরিবেশ ভিন্ন হইলেও অকস্মাৎ যে প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল তাহার বিষয়বস্তু ছিল পূর্ব-দিনেরই অনুরূপ। প্রথিতযশা স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্ববাসী যদিও পাইত গুরুগম্ভীর পরিবেশমধ্যে বক্তৃতাপরায়ণ বা কঠিন সমস্যাবলীর সমাধানে নিযুক্ত আচার্যরূপে, তথাপি স্বীয় বন্ধুগোষ্ঠীর, বিশেষতঃ গুরুভ্রাতাদের নিকট তিনি ছিলেন সদা কৌতুকপরায়ণ ব্যঙ্গপ্রিয় প্রীতি-ভাজন। তাঁহাদের সহিত আলাপকালে তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া যাইত—কোথাও কোন সঙ্কোচ বা আবরণ থাকিত না। তিনি হাসিতেন, অপরকে হাসাইতেন; ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন, অপরের ব্যঙ্গকৌতুকও খুশিমনে গ্রহণ করিতেন। সেসব গল্প-গুজব ও বাধাহীন আলোচনাকালে কেহ প্রতিটি কথা ওজন করিয়া বলিতেন না—অতিরঞ্জন বা অবহেলন প্রভৃতি স্বভাবতই হইয়া যাইত। সরস মনখোলা তর্কের কালে শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধেও অনেক ক্ষেত্রে এমন সব মন্তব্য উচ্চারিত হইয়া যাইত, যাহা অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বক্তার গভীর অশ্রদ্ধা, অহঙ্কার ইত্যাদি অর্থেই গৃহীত হইতে পারিত। এই সকল আলোচনা ইতরসাধারণের সম্মুখে হইত না, কারণ ইঁহাদের অন্তরের ভাবের সহিত অপরিচিত ব্যক্তিদের পক্ষে এইরূপ মন্তব্যাদির যথার্থ মর্মগ্রহণ সম্ভবপর ছিল না এবং তজ্জন্য কদর্থ করার অবকাশও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু গুরুভ্রাতারা সব বুঝিতেন, এবং জানিতেন যে, খোঁচা দেওয়া ও খাওয়ার মধ্যে যে আত্মীয়তাবোধ বিদ্যমান থাকে উহাই নরেন্দ্রনাথকে আনন্দিত করিত, যদিও বাহ্যতঃ তিনি কঠোরতর পাল্টা জবাব দিয়া প্রতিপক্ষীভূত গুরুভ্রাতাকে তখনকার মতো জব্দ করিতে পারিলে অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে স্বামীজীকে চটাইয়া দিয়া সকলে আনন্দিত হইতেন, তাঁহার ক্রুদ্ধপ্রায় মূর্তি তাঁহাদিগকে হাসাইত, এবং তাঁহার কথাগুলি ইতরসাধারণের দৃষ্টিতে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীত হইলেও মর্মজ্ঞ গুরুভ্রাতারা কখনও ঐ শব্দরাশিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিতেন না।

সেই সন্ধ্যায়ও ঐ ধারায়ই কথা চলিতেছিল।

১। "শিবজ্ঞানে জীবসেবা", "ভক্তের জাতি নাই", "খালি-পেটে ধর্ম হয় না", "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর" ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী স্মরণীয়।

হঠাৎ এক গুরুভ্রাতা[২] প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, স্বামীজী কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করিবার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেন না, আর তাঁহার প্রবর্তিত কার্যধারার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও জীবনের সামঞ্জস্যই বা কোথায়? হাসি-ঠাট্টারই মধ্যে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল; সুতরাং তৎকালীন ভাবেরই পরিপোষক উত্তর দিতে গিয়া স্বামীজী প্রথমে বলিলেন, "তুই কি জানিস? তুই তো ঘোর মূর্খ! যেমন গুরু তাঁর তেমনি চেলা! প্রহ্লাদের মতো 'ক' দেখেই কেঁদে সারা। তোরা সব ভক্তের দল, অর্থাৎ কতক-গুলো ভাবরোগগ্রস্ত উন্মাদ। তোরা ধর্মের কি জানিস? শুধু কচি খোকার মতো নাকে কাঁদতে পারিস, 'ওহে প্রভু, তোমার কি সুন্দর নাক, কিবা চোখ! কি যে সব, আহা মরি!' ইত্যাদি। মনে করেছিস এতেই তোদের মুক্তি হাতের ভেতর, আর শেষ দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে তোদের হাত ধরে একেবারে গোলোকে টেনে নিয়ে যাবেন। আর জ্ঞানের চর্চা, লোক-শিক্ষা, আর্ত-অনাথের সেবা, এসব মায়া—কেননা পরমহংসদেব ওসব করেন নি! আর কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন, 'আগে ভগবান লাভ কর, তারপর আর সব। পরের উপকার করতে যাওয়া অনধিকারচর্চা'—যেন ভগবান-লাভ করা মুখের কথা! ভগবান একটা খেলনা কিনা যে খুঁজলেই মুঠোর মধ্যে পড়বে!"

বলিতে বলিতে এবং বার বার বাধা পাইয়া তিনি হঠাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন এবং উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দমন করিতে না পারিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "তোমরা মনে করেছ যে, তোমরাই তাঁকে বুঝতে পেরেছ, আর আমি কিছুই পারিনি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা শুষ্ক নীরস জিনিস, তার চর্চা করতে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে গলা টিপে মারতে হয়। তোমরা যাকে ভক্তি বলছ, সেটা যে একটা দারুণ আহাম্মকি কেবল মানুষকে দুর্বল করে মাত্র, তা বুঝছ না। যাও, কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি-মুক্তি চায়? কে দেখতে চায় তোমার শাস্ত্র কি বলছে? যদি আমি আমার দেশের লোককে তমঃকূপ থেকে তুলে মানুষ করে গড়তে পারি, যদি তাদের ভেতর কর্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে আমি হাসতে হাসতে সহস্র নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ-টামকৃষ্ণ কারুর কথা শুনতে চাইনে। যে আমার মতলব অনুসারে কাজ করতে চায়, তারই কথা শুনবো। আমি রামকৃষ্ণ কি কারুর দাস নই—শুধু যে নিজের ভক্তি-মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করতে প্রস্তুত, তারই দাস।" বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ আরক্তিম ও চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, স্বর রুদ্ধপ্রায় হইল এবং সমস্ত শরীর মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বিদ্যুদ্বেগে সেই ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং স্বীয় বিশ্রামাগারে প্রবেশপূর্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

উপস্থিত গুরুভ্রাতারা আলোচনার এই প্রকার অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখিয়া বড়ই দুঃখিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন, এবং সহসা কোন কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকজন সাহস অবলম্বনপূর্বক স্বামীজীর কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, স্বামীজী যোগাসনে নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট এবং তাঁহার মুদিত নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত হইতেছে। দেখিয়াই মনে হইল, তিনি

২। ইংরেজী জীবনীর মতে ইনি স্বামী যোগানন্দ (৫০৩ পৃঃ)। বাঙ্গলা জীবনীতে নাম নাই (৬৫৩ পৃঃ)। 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা'র মতে (৩১৪ পৃঃ) লাটু মহারাজ একদিন ঐরূপ আলোচনা আরম্ভ করেন, পরে অপরেরা যোগ দেন।

ভাবরাজ্যে বিরাজমান। অতএব তাঁহারা কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, স্বামীজীর ভাবভঙ্গ করিতে সাহস পাইলেন না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্বামীজীর ভাব প্রশমিত হইলে তিনি মুখাদি প্রক্ষালনান্তর ধীরপদবিক্ষেপে অনুতপ্ত বন্ধুবর্গের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার মূর্তি তখন সৌম্য শান্ত ও গম্ভীর, দেখিলেই অনুমান হয়, তাঁহার হৃদয়মধ্যে এক প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে; কারণ তখনও স্নিগ্ধোজ্জ্বল ললাট ও জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল সদ্যঃপ্রশমিত ভাবাবেগের রক্তিম রাগ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ কাহারও বাক্যস্ফূর্তি হইল না। অবশেষে স্বামীজী নিজেই বলিলেন:

"মানুষের প্রাণ যখন ভক্তিতে ভরে ওঠে, তখন তার হৃদয় ও স্নায়ুসকল এত নরম হয় যে, তাতে ফুলের ঘা পর্যন্ত সহ্য হয় না। তোমরা কি জান যে, আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেম-কাহিনী পর্যন্ত পড়তে পারি না? ঠাকুরের কথা খানিকক্ষণ বলতে বা ভাবতে গেলেই ভাবোদ্বেল না হয়ে থাকতে পারি না! সেই জন্য কেবলই এই ভক্তি-স্রোতটা চেপে যাবার চেষ্টা করি। আর জ্ঞানের শিকল দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই, কারণ এখনও মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্তব্য শেষ হয়নি। সেই জন্য যেই দেখি, উদ্দাম ভক্তিপ্রবাহে প্রাণটা ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে, অমনি তার মাথায় কঠিন জ্ঞানের অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত করতে থাকি। ওঃ, এখনও আমার অনেক কাজ বাকী রয়েছে! আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস; তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন, যতদিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই। বাস্তবিক আমার ওপর তাঁর কি ভাল-বাসা!…" স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি পুনর্বার তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আর কথা বলিতে দিলেন না, গ্রীষ্মের অছিলায় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলেন এবং তাঁহার মনের গতি অন্যদিকে ফিরাইতে যত্নপর হইলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে স্বামীজী স্বাভাবিক ভূমিতে নামিয়া আসিলেন এবং সকলে বাসস্থানে ফিরিলেন।

গুরুভ্রাতারা জানিতেন ও অদ্যকার ঘটনায় চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলেন যে, স্বামীজী বাহ্যজীবনে কঠিন জ্ঞানচর্চায় ব্যাপৃত ও মানবকল্যাণপ্রদ বিবিধ প্রচেষ্টায় নিরত থাকিলেও কর্ম ও জ্ঞানের কঠিন উপলখণ্ডের নিম্নে তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সর্বদা ভক্তির এক ভাববহুল বিপুল ফল্গুধারা প্রবাহিত রহিয়াছে, অবকাশ পাইলেই উহা বাহিরের কঠিনাবরণ ভেদ করিয়া আপন শক্তিতে দুকূল ভাসাইয়া চলিবে; তাই আরব্ধ কার্যের অনুরোধে স্বামীজী অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্ব বরণ করিয়াও সেই স্রোতোধারাকে অন্তরেই চাপিয়া রাখিতেন। তাঁহারা ইহাও জানিতেন, জগৎ-কল্যাণের জন্য ও স্বামীজীর মানবলীলাকে দীর্ঘায়িত করিবার জন্য তাঁহার ভক্তিভাবের নিরঙ্কুশ প্রকাশের পথ আপাততঃ রুদ্ধ রাখাই আবশ্যক; নতুবা প্রেমভক্তির প্রবল উৎস ছুটিয়া বাহির হইলে তাঁহার রোগশীর্ণ পার্থিব দেহ সে বেগধারণে অক্ষম হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাই তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিমনা দেখিলে গুরুভ্রাতারা তাঁহার ভাবগতির মোড় ফিরাইতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন।

এই ঘটনাবলম্বনে আমরা স্বামীজীর দুর্বোধ্য আপাতবিরোধী অনেক বাণী ও উপদেশাবলীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাই—বুঝিতে পারি, কেন তিনি মাঝে মাঝে কর্ম বা জ্ঞানের উপর অতিমাত্র জোর দিতেন, এবং ঐ মার্গদ্বয়ের প্রশংসায় মাতিয়া গিয়া ভক্তিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের

বাণে বিদ্ধ করিতেন, কেন তিনি নির্বিকল্প-সমাধিবান পুরুষ হইয়াও নীরব ব্যক্তিগত সাধনাপেক্ষা জনগণের কল্যাণার্থ কর্মমার্গ অবলম্বনকেই উচ্চতর স্থান দিতেন, আর কেনই বা মন্দিরের পূজার তুলনায় বিরাটের পূজাকে উর্ধ্বতর আসন দিতেন। তিনি ছিলেন যুগাচার্য—বর্তমান যুগের মানবমাত্রের কল্যাণ-পথের নির্দেশক, স্বমুক্তিসাধনের চমৎকারিত্ব বা ব্যক্তিগত মুক্তিপ্রাপ্তির উৎকর্ষ প্রমাণ করা তো তাঁহার একমাত্র কর্তব্য ছিল না। যাহা হউক, সেদিনের ঘটনার এই স্থায়ী ফল হইল যে, গুরুভ্রাতারা স্বামীজীর আচরণাদি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হইলেন; তারপর তাঁহারা এভাবে আর কখনও প্রতিবাদ করেন নাই, বরং সাধ্যমত তাঁহার কর্মের সহায়ক হইয়াছিলেন। সেদিন হইতে তাঁহাদের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছিল, উহাই শুভপথ—ঠাকুর সত্য সত্যই স্বামীজীর ভিতর দিয়া স্বকার্য সাধন করিতেছেন।

স্বামীজী ছিলেন যুগনায়ক, তাই যুগবাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল তাঁহার কম্বুকণ্ঠে, আর সে বাণী রূপায়িত হইয়াছিল তাঁহার সবল ব্যক্তিত্ব অবলম্বনে। তাঁহার বার্তা ও জীবনে প্রচারিত ও প্রকটিত হইয়াছিল নবযুগের সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য এবং প্রাচীন যুগের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মুক্তিপ্রয়াসের সহিত আধুনিক যুগের উদারতর সর্বমুক্তির অপূর্ব মিলন। লব্ধনির্বাণ বুদ্ধদেব সারনাথে ধর্মচক্র-প্রবর্তন-পূর্বক উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, "আইস, আমরা সকলে মিলিয়া এই চক্রকে গতিশীল করিয়া তুলি।" স্বামীজীও মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বার্তা পুনঃপ্রচারিত করিয়া উহার বিকাশের পন্থা নির্দেশের জন্য একটি যন্ত্র স্থাপিত করিলেন, আর সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা আমার কাজে সহায় হ।" রোঁমা রোঁলা লিখিয়াছেন: "ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বিবেকানন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘটির প্রকৃতি ছিল ভগবৎপ্রেরণা-প্রসূত-সমাজসেবামূলক, নরনারীর সেবাভাব-প্রণোদিত ও বিশ্বজনীন। অধিকাংশ ধর্মে যুক্তি এবং আধুনিক জীবনের সমস্যাবলী ও প্রয়োজনের সহিত বিশ্বাসের যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, বিবেকানন্দের সঙ্ঘে তাহা না হইয়া উহাকে বরং বিজ্ঞানের সহিত হাত মিলাইয়া একেবারে সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে; জাগতিক ও অতিজাগতিক প্রগতির সহিত উহাকে সহযোগিতা করিতে হইবে এবং শিল্প ও কলাবিদ্যার প্রতি উৎসাহ দেখাইতে হইবে। কিন্তু ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে জনসমাজের কল্যাণ। উহা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনই উহার মতের সারকথা, কারণ এইরূপ সমন্বয়েরই মধ্যে সনাতন ধর্ম নিহিত ('লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ', ১২১)।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য স্মৃতি

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

যাঁহাদের স্নেহচ্ছায়ায় আমার সাধুজীবন বর্ধিত হইয়াছে, পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। যখন আমি মঠ-মিশনে প্রথম প্রবেশলাভ করি, তখন মঠ-মিশন সম্বন্ধে আমার খুব অল্পই জ্ঞান ছিল; শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের অপরিসীম স্নেহ-যত্ন না পাইলে মঠ-মিশনে টিকিয়া থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। পূজনীয় হরি মহারাজের আদেশে পাঠ সমাপন করিবার জন্য ৺কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, খুব সম্ভব ১৯১৯ সালে। কিন্তু পাঠ সমাপন হইল না। অধিকতর মনোযোগ দিয়া যখন পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি, তখন একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মঠে গিয়া পড়িলাম। ইতঃপূর্বে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সহিত কিছু কিছু আলাপ করিয়াছিলাম। আমি ৺কাশীতে থাকি ও পূজনীয় হরি মহারাজের কাছে যাই শুনিয়া তিনি স্নেহের সহিত আমাকে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার পর আরও দু-একবার মঠে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি ও পুনরায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি তাহাও তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছি। মঠে অনেক ব্রহ্মচারীর সহিত সেই সময়ে আলাপ হইয়াছিল ও তাঁহাকে আমার পরীক্ষার পূর্বের ও পরের মানসিক সকল অবস্থার কথাও বলিয়াছিলাম। যে দিনের কথা বলিতে যাইতেছি সেইদিন খুব সম্ভব পূজনীয় প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মতিথি। ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মঠে পৌঁছিয়াছিলাম। তখন উৎসবাদি একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়া ব্রহ্মচারীজী সোৎসাহে বলিলেন, 'ও! তুমি আজ তো খুব ভাল দিনে আসিয়াছ দেখিতেছি! চল, তোমাকে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের নিকটে লইয়া যাই।' ব্রহ্মচারীজী ইতিমধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি (পূঃ মহাপুরুষ মহারাজ) হঠাৎ আমার দিকে স্নেহদৃষ্টি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহা হইলে এখন তুমি কি করিবে?' (তাঁহার এই কথাটি আমার এখনও বেশ মনে আছে), সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'যদি দয়া করিয়া আপনাদের আশ্রয়ে রাখেন তো এখানেই থাকিব।' এই কথা তখন যে কি করিয়া আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কেননা উহার জন্য তখন তো একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না; কিন্তু ইহার উত্তরে আমাকে ততোধিক বিস্মিত করিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, 'চলে এস, তোমাদের জন্যই তো স্বামীজী এইসব মঠ করিয়া গিয়াছেন।' অত্যন্ত পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কবে আসিব?' বলিলেন, 'যেদিন ইচ্ছা, কালই আসিতে পার।' পরে একটু মাথা নাড়িয়া ও স্মিতহাস্য করিয়া বলিলেন, 'তবে মঘা, অশ্লেষা ও বৃহস্পতিবারের বারবেলা বেছে এসো—শ্রীশ্রীঠাকুর উহা মানিতেন, জান তো?' তথাকথিত ইংরেজী-শিক্ষিত আমরা উহা হয়তো মানিব না বলিয়াই বোধহয় ঐরূপ

বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, পরের দিনই মঠে আসিলাম, ইহার জন্য অন্য কাহাকেও যে কিছু বলিতে হইবে তাহা জানিতাম না, কাজেই সন্ধ্যার পরে আমাকে মঠে দেখিয়া অনেকেই নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না; তবুও দিলাম ও সর্বপ্রথম ঐদিন মঠে রাত্রিবাস করিলাম। কঠোরতায় অনভ্যস্ত আমরা উপাধানবিহীন শয্যায় শুইয়া শীতে ঘুমাইতে পারি নাই। সকালে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি সর্বপ্রথম রাত্রে ঘুম হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন; সসঙ্কোচে উহা নিবেদন করিলাম। তিনি দুঃখিত হইয়া মঠের তদানীন্তন পরিচালককে ঐ বিষয়ে আরও অবহিত হইতে বলিলেন।

আনন্দে মঠে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু বোধ হয় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বুঝিতে পারিলেন। রোজ সকালে তিনি মঠে পাদচারণা করিতেন, একদিন হঠাৎ আমাকে বলিলেন, 'চল, আজ আমার সহিত বেড়াইবে এস, তোমার কথা সব শুনিতে হইবে।' বেড়াইতে বেড়াইতে আমার তদানীন্তন মনের অবস্থার কথা জানিতে চাহিলেন, আমিও বলিলাম, 'মহারাজ, পরীক্ষা দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া আপনাদের সঙ্ঘে যোগ দিব—মাঝে মাঝে মনে উঠিয়াছে, অথচ এখানে থাকিতে খুবই ভাল লাগিতেছে।' শুনিয়াই তিনি বলিলেন, 'দেখ, তাহা হইলে পরীক্ষাই দাও, জান তো, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন যে গুবরে পোকা তাহার মুখে একটু গোবর লাগাইয়া নানা দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; কত সুগন্ধ ফুলের বাগানের মধ্য দিয়া হয়তো সে যাইতেছে, কিন্তু ঐ গোবরটুকুর জন্য অন্য কোন গন্ধই পায় না। তোমারও ঐরূপ বাসনা থাকিলে উহা আগে পূরণ করিয়া এস, পরে না হয় সাধু হইবে।' কিন্তু আমি পরের দিনই তাঁহাকে বলিলাম, 'না মহারাজ, আমার সে বাসনা গিয়াছে, দয়া করিয়া আপনাদের আশ্রমেই রাখুন।'

তদবধি তাঁহাদের আশ্রমেই রহিলাম। নানারূপ সংস্কার লইয়া সাধু হইতে গিয়াছি; কাজই মাঝে মাঝে সেগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠিত, মঠের সাধুরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নানাপ্রকার সেবা করিতেন, কিন্তু আমি ভাবিতাম—ঐগুলি বৃথাই তাঁহাদের সময়ক্ষেপ করা, জপধ্যান লইয়াই তো তাঁহাদের থাকা উচিত। জানি না, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন কি না; অপর একদিন যখন তাঁহার সহিত বেড়াইতেছিলাম তখন কয়েকটি সাধু মঠের সবজির বাগানে জল দিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া তিনি বলিলেন, 'দেখ দেখ, ইহারা কেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতেছে। পূর্বে দেশ ও দশের কিছু কিছু সেবা করিয়াছি।' সাধুদের ঐ সকল কাজ তাহাদের তুলনায় তুচ্ছ মনে হইত, তাই বলিলাম, 'মহারাজ! হ্যাঁ, কিন্তু এ তো ছেলেমানুষী বলিয়া মনে হয়, এইরূপ কাজতো আমরা ইতঃপূর্বে অনেক করিয়াছি।' মহারাজ আমার কথা বুঝিলেন ও বলিলেন, 'হ্যাঁ, তবে এ তো শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ।' তখনও এই কাজগুলি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার অঙ্গ ও আমাদের পূর্বকাজগুলি যে অহঙ্কার-মিশ্রিত ছিল তাহা বুঝিতাম না, উহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ঐরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

রোজ সকাল-সন্ধ্যায় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য সঙ্গ লাভ করিয়া সত্যই নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। সকালে ও সন্ধ্যায়

দীর্ঘ দুই ঘণ্টা তিনি মঠের পুরাতন মন্দিরের ভিতর ধ্যান করিতেন; আমরাও বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতাম। আমাদের এ ক্ষুদ্র চেষ্টাকেও তিনি বৃহৎ করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতেন ও আমাদিগকে ঐরূপ চেষ্টা করিতে দেখিলেই 'লাগো, ঠিয়া পড়িয়া লাগো', বলিয়া কখনও কখনও আমাদিগকে উৎসাহ দিতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় ধ্যানাদির পরে তন্ময়ভাবে তিনি তাঁহার ঘরে, কখনও বা উত্তরের বারান্দায় বেঞ্চে বসিতেন, আমরাও একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিতাম। ধীর গম্ভীরভাবে তখন তিনি আমাদের নাম ধরিয়া 'কেমন আছ সু-' ইত্যাদি কথা বলিতেন, সেই সুমধুর গম্ভীর আহ্বানেই কিন্তু আমাদের মন ভরিয়া যাইত, মনের সকল সংশয় দূর হইত। মনে হইত আমরা যেন আনন্দের খনির আস্বাদ পাইয়াছি। সকল সংশয় ইঁহাদের কৃপায় শীঘ্রই দূর হইয়াছিল।

প্রায় আড়াই বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে মঠে বাস করিয়া মঠকর্তৃপক্ষের আদেশে ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি মিশন কেন্দ্রে কর্মী-রূপে যোগদান করিলাম, মঠ হইতে পূজনীয় মহাপুরুষাদির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে একেবারেই মন সরিতেছিল না, তবুও তাঁহাদের আদেশ বলিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহারই এক সময়ে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলাম, 'মহারাজ, দূরে যাইতেছি, আমাদের কথা মনে রাখিবেন; শুনিয়াই কিন্তু তিনি বলিলেন, 'দূরে যাইতেছ! কোথায় যাইতেছ? যেখানেই যাইবে সেখানে তো তিনিই আছেন, তাঁহারই আশ্রয়ে যাইবে, দূর কোথায়?' আর একদিন ঐরূপ অন্যত্র যাইবার কালে বলিয়াছিলাম, 'মহারাজ, আশীর্বাদ করিবেন'; শুনিয়াই বলিলেন, 'আশীর্বাদ? দেখ, আমাদের মুখ হইতে কখনও অভিশাপ বাহির হয় না, তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, যদি তিরস্কারও করিয়া থাকি তো তাহা সকলই আশীর্বাদ বলিয়া জানিবে।' ৺কাশী হইতে কলিকাতায় আসিবার প্রাক্কালে পূজনীয় হরি মহারাজের মুখ হইতে অনুরূপ কথা শুনিয়াছিলাম; জানি না তাঁহাদের সে সকল আশীর্বাদ জীবনে কোন কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছি কি না।

অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ যখন মধুপুরে ৺পূর্ণ শেঠের বাগান-বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন একদিন আমাদের জীবনের দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম, 'মহারাজ, সাধনভজন করিয়া কিছুই হইতেছে না।' তিনি তখন দ্বিপ্রহরে আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া পড়িয়াছিলেন, আমাদের কথা শুনিয়াই কিন্তু উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, 'দেখ, ছোট ছেলে রোগ হইতে সারিয়া উঠিলে মাকে বলে—মা, আমায় ভাত দাও, আমি একথালা ভাত খাব; মা কিন্তু জানেন তাহার পেটে কতটুকু সহিবে, তাই ধীরে ধীরে উহার যতটুকু সহিবে ততটুকুই দিয়া যান; পরে উহা যখন সহিবে, তখন হয়তো সবটুকুই দিয়া দিবেন। তোমাদেরও তাহাই হইয়াছে, তিনি সময় বুঝিয়া সব দিয়া দিবেন।'

এইরূপ উৎসাহের কথা তাঁহার মুখ হইতে একাধিকবার শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে—একদিন কি খেয়ালবশে তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিক Spinoza-র দর্শন তাঁহার ঘরে বসিয়া নিবিষ্টমনে পড়িতেছিলেন, হঠাৎ আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ, বেড়ে তো লিখিয়াছে!' আমি তখন নিঃশব্দে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাঁহার পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া ইতঃপূর্বে কোন কথা

বলি নাই, হঠাৎ আমাকে নিকটে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'ওহে তোমরা কি এ বই পড়িয়াছ?' কলেজে অধ্যয়নকালে উহা পড়িয়াছিলাম বলিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ মহারাজ, পড়িয়াছি।' বলিলেন, "দেখ দেখ, কেমন লিখিয়াছে, ভগবান সম্বন্ধে বলিতেছেন: 'To define Him is to limit Him; to determine Him is to negate Him. Of Him we can only say that He is.'—অর্থাৎ তাঁহাকে কোন সংজ্ঞা দিতে গেলে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়, তাঁহার বিষয়ে সঠিক কিছু বলিতে গেলে তিনি যাহা নন তাহাই বলা হয়, তাঁহার সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলিতে পারা যায় যে তিনি আছেন। দেখ, ঠিক আমাদেরই বেদান্তের মত 'তিনি সৎ' ইহাই বলিতেছেন, ইহা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।"—বলিয়াই আবার বলিলেন, "দেখ—'He is.'-এর পরেই লিখিতেছেন, 'It is better to say that It is.' দেখ দেখ, তিনি যে লিঙ্গালিঙ্গবর্জিত—ইহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ঠিক আমাদেরই 'ওঁ তৎ সৎ'-এর মত; তাঁহাকে 'তৎ' বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, 'সঃ' বা 'সা' কিছুই নহে। তিনি সত্যই এইরূপ।" শুনিয়া বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, ঐ সৎস্বরূপ সম্বন্ধে তো কিছুই বুঝিতে পারি না, তবে ধ্যান করিয়া কিছু আনন্দ পাই বলিয়া তাঁহাকে মনে হয় আনন্দস্বরূপ।" শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ। তবে বাবা, তাঁহার কৃপায় যখন তাঁহার যথার্থ আস্বাদ পাইবে, তখন দেখিবে, তিনি আনন্দ নিরানন্দ উভয়েরই পারে।" জানিনা তাঁহাদের কৃপায় কবে আমাদের সেই সত্তা যথার্থ ভাবে উপলব্ধ হইবে।

তিনি চিরদিন উদাসীন ছিলেন। তাঁহার আচার-ব্যবহারে তাঁহার চির-অভ্যস্ত উদাসীনতার কথা সর্বদা প্রকাশ পাইত কিন্তু তাঁহার বাহিরের দিকটি অত্যন্ত কঠিন বর্মে আচ্ছাদিত হইলেও ভিতরের দিকটি অত্যন্ত কোমল ছিল। তাঁহার স্নেহাদির কথা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। ঢাকা হইতে একবার মঠে আসিয়াছিলাম, তখন নানা কারণে শরীরটি খুবই কৃশ হইয়া গিয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজ বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়াছিলেন, আমাকে খালি গায়ে দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'স্ব-একদম পালওয়ান্ হো গিয়া!' অর্থাৎ ঢাকায় গিয়া খুব জোয়ান হইয়াছে দেখিতেছি, তিনি রহস্য করিয়া ইহা বলিতেছেন। সেইরূপই আবদারচ্ছলে তাঁহাকে বলিলাম, 'হ্যাঁ মহারাজ, তা আপনার শরীর ভাল আছে তো?' শুনিয়াই কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজের ভিতরে ডুবিয়া গেলেন, বলিলেন, 'আমাদের শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? দেখ, তাঁহার কৃপায় এ ছাঁচে যাহা উঠিবার সব উঠিয়া গিয়াছে! বুঝিয়াছ—সব উঠিয়া গিয়াছে' —এই কথাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধভাবে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। আমরা তো অবাক্, এই ভাবে তাঁহাকে নিজের সম্বন্ধে অন্য কোন সময়ে বলিতে শুনি নাই।

অবশ্য তাঁহার শরীরবোধরাহিত্য অনেক সময়ে দেখিয়াছি, তাঁহার অত্যন্ত অসুস্থতার সময়ে ডাক্তার আসিয়া তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মুখ হইতে প্রথমেই উত্তর বাহির হইত—'আমি ভালই আছি'। অথচ তখন অত্যন্ত শ্বাসকষ্টে ভুগিতেছিলেন। ডাক্তার (ডাঃ অজিত রায় চৌধুরী) তাঁহার ভাব জানিতেন বলিয়া বলিতেন, 'হ্যাঁ, আপনি তো ভালই আছেন, তবে এই শরীরটার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি'। তখন আপনভোলা পুরুষ নিকটে সেবককে ডাকিয়া বলিতেন, 'বল, কেমন আছি, কাল কেমন ছিলাম।' সেবকও ছোট ছেলেকে

বুঝাইবার মত বলিত, 'ভালই আছেন, কাল বেশ ঘুমাইয়াছেন' ইত্যাদি; তিনিও উহা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখ বেশ ভালই আছি, কাল বেশ ঘুমাইয়াছি' ইত্যাদি। জানিনা, পরে তাঁহার সেবকগণ ডাক্তারকে তাঁহার শরীরের যথার্থ অবস্থার কথা বলিতেন কিনা। সাধারণ কেহ তাহার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'দেখ এ শরীর! এ ষড়্‌বিকারশীল শরীর—অস্তি, জায়তে, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি—ইহার এই ছয় অবস্থা, ইহা হইবেই, ইহার কথা ভাবিয়া কি হইবে?'

আমরা যখন মঠে প্রথম ঢুকি, তখন ৺কাশীতে কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি সবেমাত্র মঠে আসিয়াছেন, কঠোর তপস্বীর ভাব তখনও তাঁহার সকল আচার-ব্যবহারে বিদ্যমান। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেন; একটি ব্রহ্মচারী তাঁহার সেবা করিত। দেখিতাম—সে তাঁহার ঘরের সম্মুখে বসিয়া কেবল জপ করিত, কোন কিছুর প্রয়োজন হইলে মহারাজ নিজেই তাহা করিতেন, ব্রহ্মচারীর জপ বা ধ্যান ভঙ্গ করিতেন না। আমরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন যে, উহাকে ঐ চুক্তিতেই তিনি তাঁহার সেবকরূপে রাখিতে রাজী হইয়াছেন এবং দৃঢ়ভাবে বলিয়া দিয়াছেন, 'আমি তোমাকে না ডাকিলে কখনও তুমি আমার ঘরে ঢুকিবে না'; ব্রহ্মচারী তাই ঘরের বাহিরেই বসিয়া থাকে ও জপ-ধ্যানে সময় কাটায়।

পরে দেখিলাম তাঁহার সে ভাব ক্রমে দূর হইতেছে, তিনি কোমল হইতে কোমলতর হইতেছেন। শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) স্থূলদেহে থাকাকালে মহাপুরুষ মহারাজ বড় কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই; কেহ তাঁহার নিকট দীক্ষা চাহিলে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতেন ও পুনঃপুনঃ উহা চাহিলে পূজনীয় মহারাজকে উহার জন্য ধরিতে বলিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের শরীর যাইবার কিছু পূর্বে পূজনীয় মহারাজের আদেশ লইয়া তিনি স্বামী অভেদানন্দজীর সহিত ঢাকায় যান ও মহারাজেরই আদেশে সেখানে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। মহারাজেরই ঢাকা যাইবার কথা ছিল; তিনি যাইতে পারিবেন না বুঝিয়া মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহা হইলে সেখানে দীক্ষার্থীদের কি হইবে? তুমি না গেলে কে তাহাদের দীক্ষা দিবে?' শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের সামনেই হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'তারকদা, হাত খুলুন!' —অর্থাৎ আপনার সঞ্চিত শক্তি এবার অকাতরে বিতরণ করুন। মহারাজ সত্যই তাঁহাকে দীক্ষা দিতে বলিতেছেন কি না তাহা জানিবার জন্য তিনি তিনবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ও তিনবারই ঐ একই উত্তর পাইয়া বলিয়াছিলেন, 'তবে তাহাই হইবে। জয় শ্রীগুরুমহারাজ!' ইত্যাদি। তাহাই হইল; মহাপুরুষ মহারাজ সেবার ঢাকা ও মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে অকাতরে দীক্ষা দিলেন। পরে পূজনীয় মহারাজের শেষ অসুখের সংবাদ পাইয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কিছু দিন পরে শ্রীশ্রীমহারাজের শরীর গেল; মঠ-মিশনের সকল ভার তাঁহার উপর পড়িল। তখন দেখিলাম তাঁহার স্বভাব একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। দীক্ষা দিবার প্রথম দিকে বলিতেন, 'আমি কাহারও গুরু নহি, শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমাদের গুরু, আমি তোমাদিগকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়াছি মাত্র।' পরের দিকে তাঁহার মুখে এরূপ কথা কখনও শুনি নাই, তিনি কোমল হইতে কোমলতর হইতেছিলেন।

মনে পড়ে একবার বরিশাল হইতে কয়েকটি ভক্ত আসিয়াছেন, আমি তখন বরিশালে থাকিতাম, ভক্তগণ দীক্ষার্থী জানিয়া আমি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়া দেখি, তিনি তখন হাঁপানিতে খুবই কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার সেবক বলিলেন, 'এ অবস্থায় দীক্ষার প্রশ্ন উঠানো একান্ত অসম্ভব ও অর্বাচীনতা।' আমারও মনে সেইরূপ ধারণা হইল, কিন্তু পরে আবার তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি, তিনি কিছু সুস্থ হইয়াছেন; তখন ধীরে ধীরে সেই সব ভক্তদের দীক্ষার কথা উঠাইলাম। শুনিয়াই পরমকারুণিক মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাদের ডাকিলেন ও ঘরে বসিয়াই তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন।

এইরূপ দীর্ঘ আশী বৎসর বা ততোধিক কাল নরদেহে থাকিয়া কঠোর সাধুজীবন ও আপামর সাধারণে অপার করুণা দেখাইয়া তিনি ১৯৩৪ সালে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহভালবাসায় শুধু আমরা কেন, বহু দীন, দুঃখী, দুঃস্থ, আর্ত ধন্য হইয়াছে। আজও সেই কথা স্মরণ করিয়া মনে সান্ত্বনা পাই —'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ!'

ফাল্গুনী দ্বিতীয়া

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

আজি ফাল্গুনী-শুক্লা-দ্বিতীয়া-রাতি,
হেরি ধরণীতে পূর্ণিমা-জোছনা-ভাতি।
আজি কে এল গো রুনু-ঝুনু মঞ্জুল-পায়,
কার আগমন সুরভিত বসন্ত-বায়!
কার চরণছন্দে সবে আঁখি মেলি চায়,
কার পুণ্য পরশে দুখ-তমো দূরে যায়!
একি অপরূপ-রূপ হেরি, মন মুরছায়,
আজি বিশ্বের মনোচোর এল কি ধরায়?
আজি ধরার দুখের রাশি সব ঘোচাতে
এল কি গোলোকপতি গোলোক হতে?
আজি ফাল্গুনী-দ্বিতীয়ার রজনী হাসে,
ধরা অধরাকে ধরি বুকে পুলকে ভাসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাঙ্গনে ঃ চিনু শাঁখারী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পূর্বাভাষ

'চিনিবাস প্রভুদেবে বুঝেছিল ঠিক।
যথার্থ 'বাসিত তাঁহে প্রাণের অধিক॥
কেবা সম তাঁর যেবা 'বাসে গদাধরে।
অধম পামর তাঁর কৃপা ভিক্ষা করে॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে সমাগত যে-সকল ভাগ্যবান, পরমপুরুষের দিব্য লীলা-রস-মাধুর্য আস্বাদনে চরিতার্থ হয়েছিলেন, ভক্তবর চিনু শাঁখারী তাঁদেরই অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-পরিমণ্ডলীর নিকট দেশে, বিদেশে—সর্বত্র এই মহাত্মার পুণ্য নাম সুবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী ভক্তবৃন্দ, যাঁরা শ্রীধাম কামারপুকুর-দর্শনে গমন করেন, তাঁরা অনেকেই তথায় নবযুগাবতারের অমিয়লীলা-স্মৃতি-বিজড়িত স্থানসমূহের অন্যতম 'চিনু শাঁখারীর ভিটা'টিও দর্শন করে ধন্য হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঐ চিহ্নিত ভিটাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মস্থানের অনতিদূরেই পূর্বদিকে অবস্থিত এবং বর্তমানে উহা কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্গত।

পরমভাগবত চিনু শাঁখারী ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুমধুর বাল্যলীলা-বিলাসের একান্ত ঘনিষ্ঠ সহচর এবং বিশিষ্ট পরিকর। সবিশেষ প্রণিধানের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তথা গদাধর যখন নিতান্তই বালক, ঐশ্বর্যবিহীন সাধারণ গ্রাম্য বালক, চিনু শাঁখারী তখনই তাঁকে পরম প্রেমময় ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করেন এবং সেই বোধে ও দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁকে অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁর শ্রীচরণ-বন্দনাদিও করেন। অতএব সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি শ্রীভগবানের নরলীলা-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

ঈশ্বর যখন মনুষ্য-দেহ ধারণপূর্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি মানুষেরই ন্যায় সকল আচরণ করেন। এজন্য সর্বসাধারণে তাঁকে চিনতে পারে না। যাঁরা দিব্যপ্রজ্ঞাসম্পন্ন বিশিষ্ট মহাত্মা, কেবল তাঁরাই তাঁর যথার্থ স্বরূপ ও তত্ত্ব অবগত হন। কিন্তু এ-ধরনের প্রাজ্ঞ বা দ্রষ্টা জগতে সুদুর্লভ। প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: 'নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়,—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখন বা ভয়—ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। কেবল ভরদ্বাজাদি বারজন ঋষি রামচন্দ্রকে অবতার ব'লে চিনেছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।'—কথামৃত—৪।৮।৩

এ-প্রসঙ্গে মণি ও শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বপূর্ণ কথোপকথনটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য:

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, আমার সঙ্গে আর কারু মেলে?···

মণি। আজ্ঞে না। আপনার তুলনা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। [সহাস্যে] অচিনে গাছ শুনেছ?

মণি। আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে এক রকম গাছ আছে,—তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।

মণি। আজ্ঞে, আপনাকেও চিনবার যো নাই।—আপনাকে যে যত বুঝবে সে ততই উন্নত হবে।"—কথামৃত—৩৷৫৷২

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবৃত্তান্ত অনুধ্যানে দেখা যায়, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্ত-পরিকরবৃন্দ এবং তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ ও চিহ্নিত লীলাপার্ষদগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবনে বিচিত্র ঈশ্বরীয় ভাব, মহাভাব, মুহুর্মুহুঃ সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি এবং বিবিধ অলৌকিক শক্তি ও অপার আধ্যাত্মিক যোগ-বিভূতি প্রভৃতি দর্শনে তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করেছিলেন। অথচ, তাঁর নিতান্ত বাল্যাবস্থায়, যখন তিনি ঐশ্বর্যবিহীন সাধারণ গ্রাম্য বালক, তখনই মহাভাগ্যবান চিনু শাঁখারী তাঁকে অনন্ত মহিমময় অবতারপুরুষ তথা স্বয়ং ভগবানরূপে চিনতে পেরেছিলেন। অধিকন্তু তিনি স্বীয় মুক্তি বা পরমাগতি প্রাপ্তির জন্য অনন্যচিত্তে তাঁর শরণাপন্নও হয়েছিলেন।

'ধন্য ধন্য চিনু দুটি দেহ পদরেণু।
যথার্থ তোমার নাম হইয়াছে চিনু॥
চেনা কাজ বুঝ ভাল তাই চিনু নাম।
তোমার চরণে করি অগণ্য প্রণাম॥'—পুঁথি

জীবনকথা

ভক্তবর চিনু ছিলেন কামারপুকুরের অধিবাসী। তিনি জাতিতে ছিলেন শঙ্খবণিক বা শাঁখারী। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল শ্রীনিবাস। কিন্তু গ্রাম্য নরনারীগণের উচ্চারণ-সৌকর্যে তাঁর ঐ নামটি—'চিনিবাস', 'চিনে', 'চিনু' প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়। বস্তুতঃ এই সকল উচ্চারণ 'শ্রীনিবাস'-এরই অপভ্রংশ। যাহোক, পল্লীবাসিগণের নিকট তিনি 'চিনে শাঁখারী' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথামৃতে[১] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখে তাঁর এই নামেরই উল্লেখ দেখা যায়। অবশ্য, শ্রীশ্রীমায়ের কথায়[২] তাঁর 'চিনু শাঁখারী' নামই উল্লেখিত রয়েছে।

শ্রীধাম কামারপুকুরে যে-স্থানটি 'চিনু শাঁখারীর ভিটা' নামে চিহ্নিত, সেই স্থানেই চিনুর বসতবাটী ও দোকান ছিল। তাঁর দেহাত্যয়ের পর ঐ বসতবাটীরই এক স্থানে পূতদেহাবশেষ-সমন্বিত সমাধি-বেদী নির্মিত হয়। যা হোক, চিনু তাঁর জাত-ব্যবসায়ই করতেন। তবে কেবল ঐ ব্যবসার দ্বারা তাঁর দৈনন্দিন সংসার-যাত্রা নির্বাহ হত না। সেজন্য তিনি তাঁর ঐ দোকানে পল্লীবাসিগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীও কিছু কিছু রাখতেন। তাঁর পরিবারে পোষ্যবর্গের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। সুতরাং কেবল ঐ ক্ষুদ্র দোকানের সামান্যমাত্র উপার্জনে, বহু দুঃখ-ক্লেশের মধ্য দিয়ে তাঁকে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করতে হত। কিন্তু এজন্য তিনি আদৌ বিচলিত হতেন না এবং নিজেকে কখনও অসুখী জ্ঞান করতেন না। বস্তুতঃ ঘোরতর দৈন্য-দুর্দশায় পতিত হয়েও তিনি স্বীয় চিত্তের প্রশান্তি সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখতেন।

'ব্যবসায় অল্প আয় কষ্টে গুজরান।
কিন্তু তাঁর গদাধরে ছিল বড় টান॥
... ...
বিষয়-সম্পত্তিহীন খেটে খেতে হয়।
পোষ্যবর্গ আছে ঘরে একাকী সে নয়॥
সে ভাবনা কখন না উদয় অন্তরে।
মিষ্টান্ন খাওয়ান কিন্তু নিত্য গদাধরে॥'—পুঁথি

দরিদ্র হলেও চিনু ছিলেন পরম ভক্ত—অতিশয় নিষ্ঠাবান ও সদাচারী বৈষ্ণব। তিনি অত্যন্ত ভক্তিমান ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন।

১ কথামৃত—২৷১৪৷৩

২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ

নামে রুচি, ঈশ্বরে প্রেম-ভক্তি, আত্মাভিমান-শূন্যতা—বৈষ্ণবের এ-সকল আদর্শ গুণাবলী ছিল তাঁর একান্ত প্রকৃতিগত ও স্বভাবসিদ্ধ। নিজ সাধনায় তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, প্রীতি ও অনুরাগ থাকলেও অপর কোনও ধর্মমতকে তিনি কখন অবজ্ঞা করতেন না। তাঁর মধ্যে কোনরূপ সংকীর্ণতা বা অন্ধ গোঁড়ামি ছিল না। তিনি ছিলেন উদার ও প্রেমিক। ঈশ্বরপথের পথিক সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই ছিল তাঁর প্রেমপূর্ণ ভাব। যা হোক তাঁর সাধ্য নিতান্ত সীমাবদ্ধ হলেও, সাধনায় প্রযত্ন ছিল কিন্তু অফুরন্ত। নিয়মিত জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, নামসংকীর্তন, সদ্‌গ্রন্থপাঠ প্রভৃতিতে তিনি প্রত্যহ বহুক্ষণ অতিবাহিত করতেন। রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত এবং পুরাণাদি পাঠ ও চর্চায় তাঁর প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। ভক্তিশাস্ত্রাদিতে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ও অধিকার ছিল। যা হোক, কামারপুকুর পল্লীতে অথবা নিকটবর্তী গ্রামসমূহে যেখানেই কথকতা, রামায়ণগান, ভক্তিমূলক যাত্রাভিনয়, হরিসংকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হ'ত, সেখানেই তিনি পরম আগ্রহভরে উপস্থিত হতেন। তিনি নিজ গৃহেও কখন কখন অষ্টপ্রহর বা চব্বিশ প্রহর হরিবাসর, ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের কথকতা এবং নামসংকীর্তনাদি পুণ্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। অধিকন্তু তিনি নিজেও নিয়মিত-ভাবে ভক্তিশাস্ত্রসমূহের প্রসঙ্গ এবং আলোচনাদি করতে ভালবাসতেন।

'অচল ভকতি হৃদে সৎ-শাস্ত্রবিৎ।
ভাগবতে চিনিবাস অতি সুপণ্ডিত॥
... ...
চরিত্রে চিনুর বহে বিদুরের ধারা।
ভক্তিতে বিভোর চিত্ত উন্মাদের পারা॥'
—পুঁথি

চিনু শাঁখারী সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেছিলেন তার ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিণত বয়সেরও কিছু লীলা দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বর হতে মাঝে মাঝে কামারপুকুরে শুভাগমন করতেন তখন চিনু পরমাহ্লাদিত চিত্তে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন এবং উভয়ে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বীয় প্রথম জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করেছেন,—"কি অবস্থা সব গেছে! দেশে চিনে শাঁখারী আর আর সমবয়সীদের বললাম, ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল বল! সকলের পায়ে পড়তে যাই! তখন চিনে বললে,—ওরে তোর এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলা উড়ে, তখন আম গাছ, তেঁতুল গাছ, সব এক বোধ হয়। এটি আমগাছ; এটা তেঁতুলগাছ চেনা যায় না।"—কথামৃত, ২।১৪।৩

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ বিবাহলীলা চিনু দর্শন করেছিলেন। সেই সূত্রে তিনি শ্রীশ্রীমায়েরও পুণ্য দর্শনলাভে ধন্য হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পরিণয়কালে শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর। যা হোক, বেদান্তসাধনার শেষে দক্ষিণেশ্বরে কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও ভাগিনেয় হৃদয়রামসহ কামারপুকুরে আগমন করেন (ইং ১৮৬৭, ১২৭৪ সন) তখনও চিনু জীবিত ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য সন্দর্শন ও সান্নিধ্যলাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন। সে-সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বয়ঃক্রম ছিল বত্রিশ বৎসর। কিন্তু ঐ সময় চিনুর বয়স কত হয়েছিল, তা সঠিক-ভাবে জানা না গেলেও তিনি যে অতিশয় বৃদ্ধ এবং অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন, তার উল্লেখ প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে* পাওয়া যায়।

*পুঁথি—পৃঃ ১৩২, মায়ের কথা—২য় ভাগ—পৃঃ ১২৫

গদাধরের যখন বাল্যাবস্থা, চিনু তখন বার্ধক্যে উপনীত। বৃদ্ধ হলেও কিন্তু তাঁর দেহ ছিল তখন বেশ সুঠাম ও বলিষ্ঠ। অধিকন্তু তাঁর স্বাস্থ্য অটুট ও নীরোগ থাকার জন্য তাঁকে সে-সময় বৃদ্ধ ব'লে মনে হত না—তাঁকে তখন যুবার মতই দেখাত। বালক গদাধরও বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ও দীর্ঘকায় ছিলেন—বয়সের তুলনায় তাঁকে অনেক বড় দেখাত। যা হোক, চিনু গদাধরকে দেবাংশসম্ভূত জ্ঞান করতেন এবং গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির চক্ষে দেখতেন। তাঁকে দেখে চিনু এরূপ আহ্লাদিত ও আত্মহারা হতেন যে সময় সময় ভাবের আতিশয্যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। প্রেমাবেশে ভাবোন্মত্ত হয়ে কখন কখন তিনি গদাধরকে নিজের কাঁধে তুলে নৃত্যও করতেন।

'বৃদ্ধ বটে চিনিবাস আঁটা-সোটা কায়।
গায়েতে প্রচুর বল রোগ নাই তায়॥
প্রভুরে দেখিয়া চিনু এত মত্ত হ'ত।
কাঁধেতে চড়ায়ে তাঁয় প্রচুর নচিত॥'
—পুঁথি

গদাধরের প্রতি চিনুর যেরূপ সুগভীর স্নেহ-ভালবাসা ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, চিনুর প্রতিও তাঁর সেইরূপ অগাধ মমতা-প্রীতি ও অদ্ভুত প্রেমাকর্ষণ দেখা যায়। তাঁদের উভয়ের বয়সের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান থাকলেও, মনের দিক হতে কিন্তু তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ছিল নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও মধুর অন্তরঙ্গতা। এইজন্য তাঁদের উভয়ের মধ্যে বরাবর দেখা যায় সুনিবিড় সৌহার্দ্য ও দিব্য প্রেম-সম্পর্ক।

গদাধরের পিতা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টো-পাধ্যায়কে চিনু সাতিশয় মান্য ও ভক্তি করতেন। এই পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। তাঁকে তিনি নিজ পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন এবং সেইভাবে ভক্তি ও সম্ভ্রমপূর্ণ সম্ভাষণাদিও করতেন। সেই সূত্রে গদাধরও চিনুকে 'দাদা' ব'লে ডাকতেন। বস্তুতঃ তাঁর সুমধুর কণ্ঠে ঐ সম্ভাষণ শুনে চিনুর আনন্দ-আহ্লাদের অবধি থাকত না।

'বলরাম-অবতার ভক্ত চিনিবাস।
'দাদা' শব্দে শ্রীপ্রভুর আছিল সম্ভাষ॥
দাদা ব'লে ডাকিলে গলিয়ে যেত চিনু।
পরম উল্লাস মন গদ্‌গদ তনু॥'—পুঁথি

চিনুর সপ্রেম আকর্ষণে গদাধর প্রতিদিন তাঁর গৃহে গমন করতেন। তাঁর আগমনে তিনি মহা উল্লাসে ও অপার আনন্দে আত্মহারা হতেন। পরম সমাদরে তিনি তাঁকে আসনে বসাতেন এবং সমস্ত কাজ-কর্ম ফেলে, তাড়াতাড়ি বাজারে ছুটতেন। তথায় জিলিপি, বোঁদে প্রভৃতি যা ভাল মিষ্টান্ন পেতেন, তাঁর জন্য তিনি তাই কিনে আনতেন। তিনি গভীর প্রীতিভরে তাঁকে ঐ-সকল মিষ্টান্ন এবং পানীয় জল দিতেন। গদাধর পরম আহ্লাদিত চিত্তে ঐগুলি ভোজন করতেন। চিনু তাঁর পাশে বসে একান্ত বিমুগ্ধ হৃদয়ে ও অপলক নেত্রে তাঁকে দর্শন করতেন। সে-সময় তাঁর দোকানে খদ্দেররা এলে, তাদের প্রতি তিনি একেবারে উদাসীন থাকতেন। পরম প্রেমাস্পদ শ্রীমান্ গদাধরকে পেয়ে তিনি এরূপ তন্ময় ও আত্মহারা হতেন যে, তিনি তখন অন্য সমস্ত কিছুই ভুলে যেতেন। সে-সময় অপর কোন বিষয়েই তাঁর হুঁশ থাকত না।

'ধীরে ধীরে খান প্রভু চিনু বসি' দেখে।
দোকানে খদ্দের এলে খাতির না রাখে॥
প্রেমে গদগদ চিত চিনু ভক্তিমান।
বিহ্বল এমন যেন শূন্য বাহ্যজ্ঞান॥
কিবা বলে কিবা করে কোন বোধ নাই।
না পাল্‌টি আঁখি দু'টি দেখেন গদাই॥
—পুঁথি

যা হোক, পল্লীবাসীরা তাঁদের উভয়ের প্রগাঢ় সম্প্রীতি ও নিবিড় সৌহার্দ্যের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিল। তাই তারা উপেক্ষিত হলেও কখন সে-জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হত না। বরং তারা চিনু ও গদাই-এর ঐ সকল সুমধুর আচরণ ও অদ্ভুত প্রেমসম্পর্ক দর্শনে পরম আনন্দ লাভ করত।

* * *

শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পাঠে ভক্তবর চিনু অবগত হয়েছিলেন, শ্রীভগবানের লীলা অনন্ত এবং তাঁর অবতারও অসংখ্য—যখনই ধর্মে গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্ম-অনাচারের প্রবল অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। চৈতন্য-ভাগবতেও তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পুনরাবির্ভাব ও নিত্যলীলার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পেয়েছিলেন:

'অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার।
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥
অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

চিনুর সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল, স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ধরাধামে গদাধর তথা শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে পুনরাবির্ভূত। বস্তুতঃ এই বিশ্বাসে এবং নিষ্ঠায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বীয় ইষ্টদেবতা জ্ঞানে আজীবন ভক্তি-শ্রদ্ধা ও পূজা-বন্দনাদি করেন।

পরমভাগবত চিনুর অন্তরে একদা এক অভিনব ভাবের উদয় হয়। তিনি শ্রীমান্ গদাধরের চরণকমলে সর্বতোভাবে আত্ম-নিবেদনের সংকল্প করেন। সেই আকাঙ্ক্ষিত কৃত্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি সেদিন প্রাতঃকালে স্বহস্তে পুষ্পাদি চয়ন করে পরম অনুরাগভরে মালা গাঁথতে বসেন। যথাসময়ে সদানন্দময় বালক সহাস্যবদনে তাঁর কুটীরে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে চিনুর হৃদয় অপার প্রেমোল্লাসে মত্ত হয়ে ওঠে। তিনি তখন স্বীয় অন্তরের প্রবল ভাবাবেগ কোনক্রমে সংবরণ করে, গদাধরকে বহু সমাদরপূর্বক আসনে বসান এবং শীঘ্র মালা গাঁথা শেষ করে দ্রুতপদে বাজারে যান ও মনোমত মিষ্টান্নাদি কিনে আনেন।

অতঃপর তিনি পুষ্প, চন্দন, তুলসী, মাল্য, মিষ্টান্ন প্রভৃতি অতি সংগোপনে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে, গদাধরের হাত ধরে তাঁকে গ্রামের বাহিরে এক নির্জন প্রান্তরে নিয়ে যান। তথায় এক বৃক্ষতলে তিনি তাঁকে সযত্নে আসনে বসান এবং নিজে তাঁর সম্মুখে ভক্তিবিনম্র মূর্তিতে নতজানু হয়ে করযোড়ে উপবেশন করেন। উদ্দাম ভাবাবেগে তাঁর হৃদয় পরম পুলকিত ও সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু, স্বেদ, কম্পন প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণও তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়। তারপর তিনি বহু কষ্টে নিজেকে কতকটা প্রকৃতিস্থ করে চন্দন, তুলসী, পুষ্প প্রভৃতি গদাধরের চরণকমলে গদ্‌গদচিত্তে অর্পণ করেন এবং মনোহর মাল্যখানি তাঁর গলায় পরিয়ে দেন। অতঃপর পরম প্রীতিভরে স্বহস্তে মিষ্টান্ন গ্রহণ করে তিনি তাঁকে ভোজন করাতে উদ্যত হন। কিন্তু অদম্য ভাবের আতিশয্যে তখন তাঁর কণ্ঠ বাষ্পবিজড়িত—নির্বাক। অবিরল অশ্রুপ্রবাহে তাঁর নয়নের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। তাঁর সর্বাঙ্গে পুলক ও কম্পন উপস্থিত। ফলে, মিষ্টান্নসহ তাঁর হাত কখন বালকের মুখে, কখন চোখে, কখন কপালে, কখন গলায়, কখন বা কানে পতিত হতে থাকে তখন গদাধর চিনুর ঐ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে, নিজ হস্তে তাঁর হস্তধারণপূর্বক মহা আহ্লাদিত চিত্তে তাঁর হস্তের মিষ্টান্নাদি ভোজন করেন। এইরূপে তাঁর ভোজন সমাপ্ত হলে চিনু তাঁর চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে

করযোড়ে তাঁর নিকট কত কাতর প্রার্থনা ও ব্যাকুল বিনতি নিবেদন করেন।

'ভোজন সমাপ্তে চিনু আপনা সম্বরি।
প্রভুরে কহেন কত করযোড় করি॥
আগত হয়েছে কাল জরা-যুক্ত তনু।
কত হবে লীলা-খেলা দেখিতে না পেনু॥
বড়ই রহিল দুঃখ আমার অন্তরে।
করুণ কটাক্ষে দেখ অধীন কিঙ্করে॥'

—পুঁথি

এই ঘটনার পর চিনু দীর্ঘকাল ইহলোকে ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পরিণত বয়সের কিছু লীলাদর্শন করেছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁর অন্তরে মনে হয় আশঙ্কা ছিল, গদাধরের অবতারলীলা বিকশিত হবার পূর্বেই হয় তো তাঁর জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ শরীর পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাবে। ফলে, পরমপুরুষের পার্থিব লীলা-বিলাস সন্দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর জীবনে ঘটবে না। মনে হয়, সেই জন্যই তিনি সেদিন ভক্তিভরে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম অর্চনাপূর্বক তাঁর চরণকমলে ঐরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা ও কাতর আর্তি নিবেদন করেন।

*　　*　　*

গদাধরের বয়ঃক্রম তখন প্রায় দশ বৎসর। শিবরাত্রির নিশিতে প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত সীতানাথ পাইনের বাটীতে যাত্রাভিনয়ে, শিব সেজে অভিনয় করতে গিয়ে, শিব-চিন্তায় তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য—সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। গদাধরের দিব্যাবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞবর চিনু উহার অন্তর্নিহিত রহস্য সহজেই বুঝতে পারেন। তিনি তখন অপার উল্লাসভরে তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র ও নৈবেদ্য সংগ্রহ করে আনেন এবং ঐ সকল উপচার দ্বারা পরম ভক্তিভরে তাঁর পূজার্চনাদি করেন। অতঃপর তাঁকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য তিনি অবিরাম শিবনাম উচ্চারণ ও শিব-স্তুতি পাঠ করতে থাকেন। বহুক্ষণ ধরে ঐভাবে নাম ও স্তুতি করার পর ধীরে ধীরে তাঁর শিবাবেশ প্রশমিত হয় এবং তিনি ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হন। অবশ্য, এ-প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন, ঐরূপ দিব্য আবেশে তিনি ক্রমান্বয়ে তিন দিন সংজ্ঞাশূন্য হয়ে ছিলেন।

'চিনে যারা চিনু আদি গ্রামবাসিগণ।
তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র করিয়া চয়ন॥
চরণে অর্পণ করে মহা অনুরাগে।
মহেশ-সন্তোষ দিব্য নৈবেদ্য-সংযোগে॥
হর হর দিগম্বর স্তুতি মুখে গায়।
ধর ধর মহাভাব আপন ইচ্ছায়॥
তবে ভেঙ্গে যায় ভাব অঙ্গে হয় লীন।
কেহ বলে হেন ভাবে যায় তিন দিন॥'

—পুঁথি

যা হোক, মহাভাবুক গদাধরের বিচিত্র ভাবাবেশ এবং উহাদের নিরাকরণের পদ্ধতি-সকল ভক্তবর চিনুর যে সবিশেষ জানা ছিল, উল্লিখিত ঘটনাটি উহারই পরিচায়ক।

*　　*　　*

শ্রীমান্ গদাধর অতি অদ্ভুত মেধা ও অনন্য-সাধারণ মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন আশ্চর্য শ্রুতিধর।

'বাল্যাবধি শ্রুতিধর ছিলেন এমন।
বারেক শুনিলে কভু নহে বিস্মরণ॥'—পুঁথি

শৈশবে পিতার নিকট রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যানমালা ও দেব-দেবীগণের আশ্চর্য মহিমাসূচক বিচিত্র কাহিনী শুনে, বাল্যে পাঠশালায় সরল বানানযুক্ত 'দাতাকর্ণ-কথা', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' প্রভৃতি পুঁথি পাঠ করে, লাহাবাবুদের পান্থশালায় সমাগত বিভিন্নপন্থী সাধু-সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব-সন্তগণের মুখে নানা

ধর্মপ্রসঙ্গ ও তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করে এবং পল্লীর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ভাগবত-পাঠ, কথকতা, যাত্রাগান, পালাকীর্তন প্রভৃতি শুনে বাল্য-কালেই গদাধর শাস্ত্র-পুরাণাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পল্লীবাসী নরনারীগণের সমাবেশে তিনি রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি সুমধুর সুরে পাঠ এবং প্রসঙ্গগুলি সরলভাবে আলোচনাদি করেও শুনাতেন। সাধারণের বোধগম্য চমৎকার উপমা ও অকাট্য যুক্তি সহায়ে তিনি শাস্ত্রাদির অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসাও করতে পারতেন।

যা হোক, শাস্ত্রীয় নানা বিষয় নিয়ে চিনু গদাধরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদি করতেন। কোন কোন দুরূহ বিষয়ের মীমাংসায় উভয়ে এক-মত হতে না পারলে কখন কখন তাঁদের মধ্যে তুমুল তর্ক-যুদ্ধ হত। সময়ে সময়ে চিনু ঐরূপ বিতর্ককালে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়তেন এবং রাগ- ও অভিমান-ভরে অন্যত্র চলে যেতেন। তাঁদের রঙ্গলীলা দেখে উপস্থিত গ্রামবাসী দর্শকেরা ভাবত, উভয়ের সুমধুর প্রেমসম্পর্ক বুঝি চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা উভয়ে পুনরায় একত্র মিলিত হতেন এবং প্রেমভরে মধুর আলাপন করতেন। এইরূপ কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটতে প্রায়ই দেখা যেত। গ্রামবাসীরা তাঁদের ব্যাপার দেখে যেরূপ বিস্মিত সেইরূপ আহ্লাদিত হত এবং সকলেই তা উপভোগ করত।

বস্তুতঃ, ভাবরাজ্যের ব্যাপার অতীব নিগূঢ়। প্রেমাস্পদের সহিত সাময়িক বিচ্ছেদ হলেও, ঐরূপ বিরহব্যথায় ভক্তহৃদয়ে এক অপূর্ব সুখানুভূতি উপস্থিত হয়। সুতরাং মনে হয়, এই কারণেই চিনু গদাধরের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করতেন।

'প্রভুর সহিত হয় নানা তর্কবাদ।
কখন চটিত তর্কে, কখন আহ্লাদ ॥
শাস্ত্র লয়ে তর্কদ্বন্দ্ব কভু এত দূর।
সপ্তম ছাড়িয়া রাগ উঠিত চিনুর ॥
উভয়ে উভয়ে কত কথা মুখে মুখে।
তুমুল বিবাদ দ্বন্দ্ব হয় মহারোখে ॥
পুনশ্চ সাক্ষাৎ নহে শপথ করিয়া।
পলাইত নিজ ঘরে দুরু দুরু হিয়া ॥

হেন বিবাদের মাত্র দণ্ডেকের পর।
উভয়েই মহাখুশী হয় একত্তর ॥'—পুঁথি

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেবার (ইং ১৮৬৭, ১২৭৪ সন) ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়রামসহ দক্ষিণেশ্বর হতে কামারপুকুরে আসেন, সেবার চিনু শাঁখারী একদিন চাটুয্যে-কুটীরে শ্রীশ্রী৺রঘু-বীরের অন্নপ্রসাদ গ্রহণের বাসনা প্রকাশ করেন। চাটুয্যে-পরিবারের সকলেই এতে আনন্দিত হন এবং তাঁকে প্রসাদ ধারণের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান।

'দিনেক ব্রাহ্মণাবাসে প্রভুর গোচর।
উপনীত হৈল চিনু ভকতপ্রবর ॥
আজি তার মনে মনে উগ্রতর সাধ।
পাইবে ঠাকুর রঘুবীরের প্রসাদ ॥
প্রকাশ করিয়া কথা কহিল এখন।
ইষ্টগোষ্ঠী সকলেই হরষিত মন ॥
একে ভক্ত তাহে পুনঃ বৃদ্ধক বয়েস।
তদুপরি প্রভুপদে পিরীতি অশেষ ॥'

—পুঁথি

যা হোক, ঐ দিবস মধ্যাহ্নে তিনি পরম পরিতোষ সহকারে তথায় প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভোজনান্তে তিনি নিজ এঁটো পাতাখানি তোলার উপক্রম করলে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁকে বারংবার নিষেধ করেন এবং নিজে তাঁর ঐ

উচ্ছিষ্ট পাতা তোলেন। ঐ পাতা তোলার ব্যাপারে হৃদয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণীর তুমুল বচসা হয়। ব্রাহ্মণী হৃদয়ের নিষেধ অমান্য করে প্রবল তেজের সহিত বলেন—'চিনু ভক্ত লোক। তার এঁটো নেবো তাতে (দোষ) কি ?'—(মায়ের কথা)

'ব্রাহ্মণীর এক বোল আমি উঠাইব।
হৃদয় বলেন তাহা করিতে না দিব॥
কতই বুঝায় তবু ব্রাহ্মণী না বুঝে।
ত্যাগী সন্ন্যাসিনী কয় আপনার তেজে॥
তবে না কুপিত হৃদু কহে ব্রাহ্মণীরে।
তা'হলে দিব না তোরে থাকিবারে ঘরে॥
সাধিকা উত্তর কৈল না দাও না দিবে।
মনসা তখন শীতলার কাছে শোবে॥
বাটীস্থ অন্যান্য সবে মধ্যস্থ হইয়ে।
গণ্ডগোল উভয়ের দিল মিটাইয়ে॥'—পুঁথি

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না বিদুষী সাধিকা চিনুকে সশ্রদ্ধচিত্তে সর্বসমক্ষে 'ভক্ত' ব'লে স্বীকার করেন।

উপসংহার

'যেই প্রভু সেই ভক্ত নহে স্বতন্তর।
নিত্যাপেক্ষা লীলা তাঁর বড়ই সুন্দর॥'
—পুঁথি

শ্রীমা সারদামণি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

টেনে নিতে তুমি কাছে—
দিনে দিনে কত জনে—তার কি মাগো হিসেব আছে ?
মাটির ঘরে আমরা খেলি মিথ্যে মাটির পুতুল নিয়ে ;
তোমার ছোঁয়ায় সেই পুতুলেই উঠত মা প্রাণ ঝিলিক দিয়ে
সেই প্রাণ-আলোয় উছল হ'ত কৃপা তোমার কতই রাগে—
অশ্রুহাসির ছন্দে তানে গন্ধে গানে রূপসোহাগে॥
তোমার প্রেমে যেত গ'লে পাপীতাপীর শোকবেদনা।
পায়ের ধুলোর বরে তোমার জাগত মা অলোকচেতনা।
গেয়েছিলে শেষ নিশাসেঃ "নয় কেউই পর এই ভুবনেঃ
আপন ব'লে করলে বরণ হবে আপন জনে জনে॥"

রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমতী প্রণতি দেবী

যাঁরা সহজকে দুরূহ করে তোলেন তাঁদের বলি পণ্ডিত আর যাঁরা দুরূহকে সহজ করেন তাঁরা রসিক। মানুষের রসবোধ বিধাতার এক অপূর্ব দান। আর তা হবে না-ই বা কেন? তিনি নিজেই সে রসস্বরূপ। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" তিনি রসস্বরূপ, তিনি রস উপভোগ করে আনন্দ পান। রসোপলব্ধির জন্য চাই দ্বৈতভাব লীলা। তাই উপনিষদের ঋষি বলছেন—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥"
"স বৈ নৈব রেমে
তস্মাদেকাকী ন রমতে
স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে জগতের সুপ্তশক্তিকে জাগাবার জন্য স্নিগ্ধ কৌতুকরূপ সোনার কাঠির সাহায্য নিলেন, যা আমাদের নিজেদের জীবনের অসংগতির সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে কিন্তু আঘাত করে না। এই স্নিগ্ধ কৌতুককে ইংরাজী humour-এর সাথে তুলনা করা যায়। কার্লাইল বলেছেন, "True humour springs not more from the head than from the heart, it is not contempt; its essence is love······It is a sort of inverse sublimity, exalting, as it were, into our affections what is below us, while sublimity draws down into affections what is above us. The former is scarcely less precious or heart-affecting than the latter; perhaps it is still rarer, and as a test of genius still more decisive."

যা অত্যন্ত গভীর অথচ গভীরতার সাহায্যে ব্যক্ত করলে হয়তো সাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হবে না তাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ আপাত-লঘুতার মধ্য দিয়ে গভীরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন।

ঠিক ঠিক ধ্যান সকলের সব সময় হয় না, চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকলেই হয় না—একথাটি বোঝাবার জন্য বলছেন—"কেশবের ওখানে গিয়াছিলাম। তাহাদের উপাসনা দেখিলাম। অনেকক্ষণ ভগবৎ-ঐশ্বর্যের কথাবার্তার পরে বলিল—'এইবার আমরা তাঁহার (ঈশ্বরের) ধ্যান করি।' ভাবিলাম কতক্ষণ না জানি ধ্যান করিবে। ওমা!—দুমিনিট চোখ বুজিতে না বুজিতেই হইয়া গেল! এই রকম ধ্যান করিয়া কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? যখন তাহারা সব ধ্যান করিতেছিল, তখন সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—পরে কেশবকে বলিলাম, 'তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখিলাম,—কি মনে হইল জান?—দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় কখন কখন হনুমানের পাল চুপ করিয়া থাকে, যেন কত ভাল, কিছু জানে না। কিন্তু তা নয়, তারা তখন বসিয়া ভাবিতেছে—কোন্ গৃহস্থের চালে লাউ বা কুমড়োটা আছে, কাহার বাগানে কলা বা বেগুন হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই উপ্ করিয়া সেখানে গিয়া পড়িয়া সেইগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া উদরপূর্তি করে। অনেকের ধ্যান দেখিলাম ঠিক সেই রকম!'—সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিল।"

লীলাপ্রসঙ্গকার আর একদিনের একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন—"স্বামী বিবেকানন্দ

একদিন তাঁহার সম্মুখে ভজন গাহিতেছিলেন। স্বামীজী তখন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার উক্ত সমাজের ভাবে উপাসনা ও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। '(সেই) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে' ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীতটি তিনি অনুরাগের সহিত তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। উক্ত সঙ্গীতের একটি কলিতে আছে—'ভজন সাধন তাঁর কর রে নিরন্তর';—ঠাকুর ঐ কথাগুলি স্বামীজীর মনে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য সহসা বলিয়া উঠিলেন—না, না, বল্—'ভজন সাধন তাঁর কর রে দিনে দুবার'—কাজে যাহা করিবিনা, মিছামিছি তাহা কেন বলিবি? সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, স্বামীজীও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন।"

আমরা অনেক সময় জীবনের আসল উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ ভুলে গিয়ে নিজেদের কোন লাভের জন্য কাজ করি কিন্তু দোহাই দিই অন্য কোন কিছুর। ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপবাবু বলছিলেন যে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাম রাখবার জন্য কাজ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তার উত্তর দিচ্ছেন—"তুমি বলছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্য সব করছো; কিছুদিন পরে এ ভাবও থাকবে না। একটা গল্প শুন—একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়ে ঘর, অনেক মেহনত ক'রে ঘরখানি ক'রে ছিল। কিছুদিন পরে একদিন ভারী ঝড় এলো। কুঁড়ে ঘর টলটল করতে লাগলো। তখন ঘর রক্ষার জন্য সে ভারী চিন্তিত হ'লো। বললে, হে পবনদেব, দেখো ঘরটি ভেঙ্গো না বাবা! পবনদেব কিন্তু শুনছেন না। ঘর মড়মড় করতে লাগলো; তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে—তার মনে পড়লো যে হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্লো—বাবা! ঘর ভেঙ্গোনা, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার! ঘর তবুও মড়মড় করে। কেবা তার কথা শুনে। অনেকবার 'হনুমানের ঘর', 'হনুমানের ঘর' করার পর দেখলে যে কিছুই হ'লো না। তখন বলতে লাগলো, বাবা 'লক্ষণের ঘর', 'লক্ষণের ঘর'! তাতেও হ'লো না। তখন বলে—বাবা 'রামের ঘর', 'রামের ঘর'! দেখো বাবা, ভেঙ্গো না, দোহাই তোমার! তাতেও কিছু হ'লো না, ঘর মড়মড় করে ভাঙ্গতে আরম্ভ হ'লো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বলছে—যা শালার ঘর!"

(প্রতাপের প্রতি)—"কেশবের নাম তোমায় রক্ষা করতে হবে না। যা কিছু হয়েছে জানবে—ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হ'লো আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে; তুমি কি ক'রবে? তোমার এখন কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।"

আবার বলছেন,—"আর এক কথা—কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সেদিকে যেতে দেয় না। এই দেখনা সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে। (সকলের হাস্য)। তা ভালই হোক আর মন্দই হোক,—যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, 'আজ্ঞে খুব ভাল।'"

নব্যযুগের বিজ্ঞানের জ্ঞানাভিমানের উপর কটাক্ষ করে সকলকে গল্প শোনাচ্ছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ কথা যে ওঁর সাইন্সে-এ (ইংরাজী বিজ্ঞান-শাস্ত্রে) নাই! তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়?"

"একটা গল্প শোন—একজন এসে বললে,

ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ি হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যাকে ওকথা বললে, সে ইংরাজী লেখা-পড়া জানে। সে বললে দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ি ভাঙার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ওহে, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই বাড়ি ভাঙার কথা তো খপরের কাগজে লেখা নাই। ওসব মিছে কথা।"

বয়স হলে বিষয়চিন্তা ছেড়ে ঈশ্বরচিন্তা করা উচিত—এটি বোঝাবার জন্য শ্রীযুক্ত শ্যাম বসুকে বলছেন—"আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজা কেন? একজন বলেছিল, আর দুর্গাপূজা করনা কেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিলে, আর দাঁত নাই ভাই। পাঁঠা খাবার শক্তি গেছে।"

বিষয়ী লোকদের অর্থাসক্তি বোঝাচ্ছেন এইপ্রকারে—"আর এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যদুর মা তাই বলে, 'অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে, বাবা তোমার উটি নাই।' বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হলে বিরক্ত হয়।"

"এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের ব'সে শোনবার ভারী ইচ্ছা। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখলে যে আসরে প্যালা পড়ছে, তখন সেখান থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান ক'রে জানতে পারলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারী ভিড় হয়েছে। সে দুই হাতে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আসরে ভাল ক'রে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল।"

একদিন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে আদ্যাশক্তির সম্বন্ধে কিছু বলতে বলেন! পণ্ডিত বিনয়পূর্বক অস্বীকার করলে তাঁকে এই গল্পটি বললেন—"একজনকে একটি লোক খুব ভক্তি করে। সেই ভক্তকে তামাক সাজার আগুন আনতে বললে; তা সে বললে, আমি কি আপনার আগুন আনবার যোগ্য? আর আগুন আনলেও না।"

সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। জিতেন্দ্রিয় হলেও মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে নাই। উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন—"সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী। আর দু-রকম একাদশী আছে। ফলমূল খেয়ে,—আর লুচিছক্কা খেয়ে। (সকলের হাস্য)। লুচিছক্কার সঙ্গে হলো দুখানা রুটি দুধে ভিজছে। (সকলের হাস্য)। (সহাস্যে)। তোমরা নির্জলা একাদশী পারবে না।"

"কৃষ্ণকিশোরকে দেখলাম, একাদশীতে লুচি-ছক্কা খেলো। আমি হৃদুকে বল্লাম—হৃদু আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। (সকলের হাস্য)। তাই একদিন করলাম। খুব পেটভরে খেলাম। তারপর দিন আর কিছু খেতে পারলাম না।"

আর একটি উদাহরণ দিয়েই এ প্রসঙ্গের শেষ করব। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এলে পর, উনি বঙ্কিমবাবুর কাছে রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর কথা শেষ হলে বঙ্কিমবাবু, অধরবাবু ও অন্যান্যেরা পরস্পরের সঙ্গে ঐ বিষয়ে ইংরাজীতে কথা বলছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ কথা জানতে পেরে একটি গল্প বলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, সকলের প্রতি)—একটা কথা মনে প'ড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুনো, একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে

কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুরটুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম্ বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস্। নাপিত সে ছাড়বার নয়, সে বলতে নাগল, ড্যাম্ মানে যদি ভাল হয়, তাহ'লে আমি ড্যাম্, আমার বাপ ড্যাম্, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য)। আর ড্যাম্ মানে যদি খারাপ হয়, তাহ'লে তুমি ড্যাম্, তোমার বাবা ড্যাম্, তোমার চৌদ্দ-পুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য)। আর শুধু ড্যাম্ নয়। ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যা ড্যাম্ ড্যাম্।"

একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্রহ্মের আনন্দময় রূপটি তো শুধু একভাবে জানলেই হবে না। তাকে উপলব্ধি করে নিজের জীবনকে সেই সুরে বাঁধতে হবে। জীবন তো শুধু হাল্কা হাসিঠাট্টা নয়। তাই দেখি যারা শুধু রসিকতা নিয়ে পড়ে আছে শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের বলছেন—"ও সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়—তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে। ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে এগিয়ে পড়তে বলেছিল। সে প্রথমে এগিয়ে ছাখে চন্দনের কাঠ, তারপর ছাখে রূপার খনি,—তারপর সোনার খনি—তারপর হীরা মানিক।" একজন প্রশ্ন করছেন, "এ পথের শেষ নাই?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "যেখানে শান্তি, সেখানে তিষ্ঠ।"

অনন্তভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, কারণ তাঁর কোন একটি ভাব বোঝবার মত যোগ্যতাও আমাদের নেই। তিনি নিজেই আনন্দস্বরূপ, নিজেই নিজের উপমা। তাঁকে কার সাথে, কিসের সাথে তুলনা করব? যাঁর আনন্দের একটি কণা পেয়ে জগৎ মত্ত হয়েছে, তাঁর আনন্দের মাপ করতে গেলে সেই পিঁপড়ের অবস্থাই হবে, যে চিনির পাহাড় নিজের গর্তে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেই রস, সেই আনন্দ উপলব্ধির বস্তু, তা ধ্যানগম্য, আলাপ-আলোচনার দ্বারা লব্ধ বস্তু নয়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই মহিম্নঃস্তোত্রের এই অংশটি মনে পড়ে—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।"

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখতত্ত্ব ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়

অধ্যক্ষ শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ দাস

মালুঙ্ক্যপুত্র বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিলেন, 'জগৎ অনন্ত না সান্ত, সসীম না অসীম, মৃত্যুর পর তথাগতের কোন অস্তিত্ব থাকে কি না? বুদ্ধদেব এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'দেখ মালুঙ্ক্যপুত্র, বিষাক্ত বাণবিদ্ধ কোন ব্যক্তি কি চিকিৎসককে বলে, যে ব্যক্তি আমায় বাণবিদ্ধ করিল তাহার নাম কি, গোত্র কি, বাণটি কি ভাবে নির্মিত হইয়াছে—এ সকল না জানিলে আমি চিকিৎসা করিতে দিব না? এ সকল প্রশ্ন আরোগ্যলাভের সহায়ক নয় বলিয়া এ সকল প্রশ্ন সে উত্থাপন করে না। সেইরূপ জগৎ অনন্ত কি সান্ত এ সকল প্রশ্নের আলোচনা দ্বারা দুঃখ-বাণ-বিদ্ধ মানুষের শান্তি বা জ্ঞানলাভ হয় না, দুঃখের নিবৃত্তি হয় না; এজন্য এসকল বিষয়ে আমি শিষ্যদিগকে কোন শিক্ষা দিইনা।'[১] ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বুদ্ধত্বলাভের পর তিনি যে-ধর্ম প্রচার করিলেন তাহার উদ্দেশ্য মানুষকে দুঃখনিবৃত্তির পথ প্রদর্শন করা, কতকগুলি দুরূহ দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না।[২]

বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন (ক) রোগ নির্ণয় করেন, (খ) রোগের হেতু বা কারণ নির্ধারণ করেন, (গ) রোগীকে রোগমুক্ত করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন ও (ঘ) রোগমুক্তির উপযুক্ত নির্দেশ দান করেন, বুদ্ধদেবও সেইরূপ দুঃখ, দুঃখের হেতু বা কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায়—এই চারিটি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে এগুলিকে চারিটি আর্যসত্য বলা হয়। তিনি বলিলেন, "এই জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ আট প্রকারের: জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, প্রিয়-বিপ্রয়োগ, অপ্রিয়-সম্প্রয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ ও পঞ্চ উপাদান বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু। জীবমাত্রই এই আট প্রকারের দুঃখে অভিভূত, প্রত্যেকেরই জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ আছে, প্রত্যেকেরই প্রিয়জন-বিচ্ছেদ ভোগ করিতে ও অপ্রিয়জনের সংস্পর্শে আসিতে হয়। নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সব সময়ে সে পায় না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তুও সব দুঃখজনক।"[৩]

দুঃখের হেতু বা কারণ কি? তৃষ্ণা বা কামনাই দুঃখের হেতু বা কারণ। দুঃখের কারণস্বরূপ যে তৃষ্ণা, তাহা তিন প্রকারের, (ক) কামতৃষ্ণা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা (খ) ভবতৃষ্ণা বা বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা, ও (গ) বিভবতৃষ্ণা বা সম্পদ-তৃষ্ণা। তৃষ্ণাই দুঃখের হেতু কেন? কারণ, এ জগতের সব কিছু অনিত্য; কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এই সকল অনিত্য বস্তু আমরা কামনা করি বলিয়া আমাদের দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে অনিত্যবাদ বলা হয়। আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ ভোগ করিতে চাই কিন্তু আমাদের ভোগ করিবার শক্তি অতি স্বল্পস্থায়ী বা অনিত্য। জরা আসিয়া আমাদের সে শক্তি হরণ করে। আমরা সম্পদ বা বিভব কামনা করি, কিন্তু সম্পদ আমাদের সকলের ভাগ্যে

---

১ বুদ্ধকথা—ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন, পৃঃ ৬৯।৭০

২ Outline of Indian Philosophy—M. Hiriyanna, Ch. V, p. 137.

৩ বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচি, পৃঃ ১৬

করযোড়ে তাঁর নিকট কত কাতর প্রার্থনা ও ব্যাকুল বিনতি নিবেদন করেন।

'ভোজন সমাপ্তে চিনু আপনা সম্বরি।
প্রভুরে কহেন কত করযোড় করি॥
আগত হয়েছে কাল জরা-যুক্ত তনু।
কত হবে লীলা-খেলা দেখিতে না পেনু॥
বড়ই রহিল দুঃখ আমার অন্তরে।
করুণ কটাক্ষে দেখ অধীন কিঙ্করে॥'

—পুঁথি

এই ঘটনার পর চিনু দীর্ঘকাল ইহলোকে ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পরিণত বয়সের কিছু লীলাদর্শন করেছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁর অন্তরে মনে হয় আশঙ্কা ছিল, গদাধরের অবতারলীলা বিকশিত হবার পূর্বেই হয় তো তাঁর জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ শরীর পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাবে। ফলে, পরমপুরুষের পার্থিব লীলা-বিলাস সন্দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর জীবনে ঘটবে না। মনে হয়, সেই জন্যই তিনি সেদিন ভক্তিভরে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম অর্চনাপূর্বক তাঁর চরণকমলে ঐরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা ও কাতর আর্তি নিবেদন করেন।

*　　*　　*

গদাধরের বয়ঃক্রম তখন প্রায় দশ বৎসর। শিবরাত্রির নিশিতে প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত সীতানাথ পাইনের বাটীতে যাত্রাভিনয়ে, শিব সেজে অভিনয় করতে গিয়ে, শিব-চিন্তায় তিনি বাহ্য-জ্ঞানশূন্য—সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। গদাধরের দিব্যাবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞবর চিনু উহার অন্তর্নিহিত রহস্য সহজেই বুঝতে পারেন। তিনি তখন অপার উল্লাসভরে তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র ও নৈবেদ্য সংগ্রহ করে আনেন এবং ঐ সকল উপচার দ্বারা পরম ভক্তিভরে তাঁর পূজার্চনাদি করেন। অতঃপর তাঁকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য তিনি অবিরাম শিবনাম উচ্চারণ ও শিব-স্তুতি পাঠ করতে থাকেন। বহুক্ষণ ধরে ঐভাবে নাম ও স্তুতি করার পর ধীরে ধীরে তাঁর শিবাবেশ প্রশমিত হয় এবং তিনি ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হন। অবশ্য, এ-প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন, ঐরূপ দিব্য আবেশে তিনি ক্রমান্বয়ে তিন দিন সংজ্ঞাশূন্য হয়ে ছিলেন।

'চিনে যারা চিনু আদি গ্রামবাসিগণ।
তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র করিয়া চয়ন॥
চরণে অর্পণ করে মহা অনুরাগে।
মহেশ-সন্তোষ দিব্য নৈবেদ্য-সংযোগে॥
হর হর দিগম্বর স্তুতি মুখে গায়।
ধর ধর মহাভাব আপন ইচ্ছায়॥
তবে ভেঙ্গে যায় ভাব অঙ্গে হয় লীন।
কেহ বলে হেন ভাবে যায় তিন দিন॥'

—পুঁথি

যা হোক, মহাভাবুক গদাধরের বিচিত্র ভাবাবেশ এবং উহাদের নিরাকরণের পদ্ধতি-সকল ভক্তবর চিনুর যে সবিশেষ জানা ছিল, উল্লিখিত ঘটনাটি উহারই পরিচায়ক।

*　　*　　*

শ্রীমান্ গদাধর অতি অদ্ভুত মেধা ও অনন্য-সাধারণ মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন আশ্চর্য শ্রুতিধর।

'বাল্যাবধি শ্রুতিধর ছিলেন এমন।
বারেক শুনিলে কভু নহে বিস্মরণ॥'—পুঁথি

শৈশবে পিতার নিকট রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যানমালা ও দেব-দেবীগণের আশ্চর্য মহিমাসূচক বিচিত্র কাহিনী শুনে, বাল্যে পাঠশালায় সরল বানানযুক্ত 'দাতাকর্ণ-কথা', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' প্রভৃতি পুঁথি পাঠ করে, লাহাবাবুদের পান্থশালায় সমাগত বিভিন্নপন্থী সাধু-সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব-সন্তগণের মুখে নানা

ধর্মপ্রসঙ্গ ও তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করে এবং পল্লীর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ভাগবত-পাঠ, কথকতা, যাত্রাগান, পালাকীর্তন প্রভৃতি শুনে বাল্য-কালেই গদাধর শাস্ত্র-পুরাণাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পল্লীবাসী নরনারীগণের সমাবেশে তিনি রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি সুমধুর সুরে পাঠ এবং প্রসঙ্গগুলি সরলভাবে আলোচনাদি করেও শুনাতেন। সাধারণের বোধগম্য চমৎকার উপমা ও অকাট্য যুক্তি সহায়ে তিনি শাস্ত্রাদির অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসাও করতে পারতেন।

যা হোক, শাস্ত্রীয় নানা বিষয় নিয়ে চিনু গদাধরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদি করতেন। কোন কোন দুরূহ বিষয়ের মীমাংসায় উভয়ে এক-মত হতে না পারলে কখন কখন তাঁদের মধ্যে তুমুল তর্ক-যুদ্ধ হত। সময়ে সময়ে চিনু ঐরূপ বিতর্ককালে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়তেন এবং রাগ- ও অভিমান-ভরে অন্যত্র চলে যেতেন। তাঁদের রঙ্গলীলা দেখে উপস্থিত গ্রামবাসী দর্শকেরা ভাবত, উভয়ের সুমধুর প্রেমসম্পর্ক বুঝি চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা উভয়ে পুনরায় একত্র মিলিত হতেন এবং প্রেমভরে মধুর আলাপন করতেন। এইরূপ কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটতে প্রায়ই দেখা যেত। গ্রামবাসীরা তাঁদের ব্যাপার দেখে যেরূপ বিস্মিত সেইরূপ আহ্লাদিত হত এবং সকলেই তা উপভোগ করত।

বস্তুতঃ, ভাবরাজ্যের ব্যাপার অতীব নিগূঢ়। প্রেমাস্পদের সহিত সাময়িক বিচ্ছেদ হলেও, ঐরূপ বিরহব্যথায় ভক্তহৃদয়ে এক অপূর্ব সুখানুভূতি উপস্থিত হয়। সুতরাং মনে হয়, এই কারণেই চিনু গদাধরের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করতেন

‘প্রভুর সহিত হয় নানা তর্কবাদ।
কখন চটিত তর্কে, কখন আহ্লাদ॥
শাস্ত্র লয়ে তর্কদ্বন্দ্ব কভু এত দূর।
সপ্তম ছাড়িয়া রাগ উঠিত চিনুর॥
উভয়ে উভয়ে কত কথা মুখে মুখে।
তুমুল বিবাদ দ্বন্দ্ব হয় মহারোখে॥
পুনশ্চ সাক্ষাৎ নহে শপথ করিয়া।
পলাইত নিজ ঘরে দুরু দুরু হিয়া॥
… … …
হেন বিবাদের মাত্র দণ্ডেকের পর।
উভয়েই মহাখুশী হয় একত্তর॥’—পুঁথি

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেবার (ইং ১৮৬৭, ১২৭৪ সন) ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়রামসহ দক্ষিণেশ্বর হতে কামারপুকুরে আসেন, সেবার চিনু শাঁখারী একদিন চাটুয্যে-কুটীরে শ্রীশ্রী৺রঘু-বীরের অন্নপ্রসাদ গ্রহণের বাসনা প্রকাশ করেন। চাটুয্যে-পরিবারের সকলেই এতে আনন্দিত হন এবং তাঁকে প্রসাদ ধারণের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান।

‘দিনেক ব্রাহ্মণাবাসে প্রভুর গোচর।
উপনীত হৈল চিনু ভকতপ্রবর॥
আজি তার মনে মনে উগ্রতর সাধ।
পাইবে ঠাকুর রঘুবীরের প্রসাদ॥
প্রকাশ করিয়া কথা কহিল এখন।
ইষ্টগোষ্ঠী সকলেই হরষিত মন॥
একে ভক্ত তাহে পুনঃ বৃদ্ধক বয়েস।
তদুপরি প্রভুপদে পিরীতি অশেষ॥’
—পুঁথি

যা হোক, ঐ দিবস মধ্যাহ্নে তিনি পরম পরিতোষ সহকারে তথায় প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভোজনান্তে তিনি নিজ এঁটো পাতাখানি তোলার উপক্রম করলে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁকে বারংবার নিষেধ করেন এবং নিজে তাঁর ঐ

উচ্ছিষ্ট পাতা তোলেন। ঐ পাতা তোলার ব্যাপারে হৃদয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণীর তুমুল বচসা হয়। ব্রাহ্মণী হৃদয়ের নিষেধ অমান্য করে প্রবল তেজের সহিত বলেন—'চিনু ভক্ত লোক। তার এঁটো নেবো তাতে (দোষ) কি ?'—(মায়ের কথা)

'ব্রাহ্মণীর এক বোল আমি উঠাইব।
হৃদয় বলেন তাহা করিতে না দিব॥
কতই বুঝায় তবু ব্রাহ্মণী না বুঝে।
ত্যাগী সন্ন্যাসিনী কয় আপনার তেজে॥
তবে না কুপিত হৃদু কহে ব্রাহ্মণীরে।
তা'হলে দিব না তোরে থাকিবারে ঘরে॥
সাধিকা উত্তর কৈল না দাও না দিবে।
মনসা তখন শীতলার কাছে শোবে॥
বাটীস্থ অন্যান্য সবে মধ্যস্থ হইয়ে।
গণ্ডগোল উভয়ের দিল মিটাইয়ে॥'—পুঁথি

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না বিদুষী সাধিকা চিনুকে সশ্রদ্ধচিত্তে সর্বসমক্ষে 'ভক্ত' ব'লে স্বীকার করেন।

উপসংহার

'যেই প্রভু সেই ভক্ত নহে স্বতন্তর।
নিত্যাপেক্ষা লীলা তাঁর বড়ই সুন্দর॥'
—পুঁথি

শ্রীমা সারদামণি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

টেনে নিতে তুমি কাছে—
দিনে দিনে কত জনে—তার কি মাগো হিসেব আছে ?
মাটির ঘরে আমরা খেলি মিথ্যে মাটির পুতুল নিয়ে ;
তোমার ছোঁয়ায় সেই পুতুলেই উঠত মা প্রাণ ঝিলিক দিয়ে
সেই প্রাণ-আলোয় উছল হ'ত কৃপা তোমার কতই রাগে—
অশ্রুহাসির ছন্দে তানে গন্ধে গানে রূপসোহাগে॥
তোমার প্রেমে যেত গ'লে পাপীতাপীর শোকবেদনা।
পায়ের ধুলোর বরে তোমার জাগত মা অলোকচেতনা।
গেয়েছিলে শেষ নিশাসেঃ "নয় কেউই পর এই ভুবনেঃ
আপন ব'লে করলে বরণ হবে আপন জনে জনে॥"

রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমতা প্রণতি দেবী

যাঁরা সহজকে দুরূহ করে তোলেন তাঁদের বলি পণ্ডিত আর যাঁরা দুরূহকে সহজ করেন তাঁরা রসিক। মানুষের রসবোধ বিধাতার এক অপূর্ব দান। আর তা হবে না-ই বা কেন? তিনি নিজেই সে রসস্বরূপ। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তিনি রসস্বরূপ, তিনি রস উপভোগ করে আনন্দ পান। রসোপলব্ধির জন্য চাই দ্বৈতভাব লীলা। তাই উপনিষদের ঋষি বলছেন—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥"
"স বৈ নৈব রেমে
তস্মাদেকাকী ন রমতে
স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে জগতের সুপ্তশক্তিকে জাগাবার জন্য স্নিগ্ধ কৌতুকরূপ সোনার কাঠির সাহায্য নিলেন, যা আমাদের নিজেদের জীবনের অসংগতির সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে কিন্তু আঘাত করে না। এই স্নিগ্ধ কৌতুককে ইংরাজী humour-এর সাথে তুলনা করা যায়। কার্লাইল বলেছেন, "True humour springs not more from the head than from the heart, it is not contempt; its essence is love······It is a sort of inverse sublimity, exalting, as it were, into our affections what is below us, while sublimity draws down into affections what is above us. The former is scarcely less precious or heart-affecting than the latter; perhaps it is still rarer, and as a test of genius still more decisive."

যা অত্যন্ত গভীর অথচ গভীরতার সাহায্যে ব্যক্ত করলে হয়তো সাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হবে না তাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ আপাত-লঘুতার মধ্য দিয়ে গভীরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন।

ঠিক ঠিক ধ্যান সকলের সব সময় হয় না, চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকলেই হয় না—একথাটি বোঝাবার জন্য বলছেন—"কেশবের ওখানে গিয়াছিলাম। তাহাদের উপাসনা দেখিলাম। অনেকক্ষণ ভগবৎ-ঐশ্বর্যের কথাবার্তার পরে বলিল—'এইবার আমরা তাঁহার (ঈশ্বরের) ধ্যান করি।' ভাবিলাম কতক্ষণ না জানি ধ্যান করিবে। ওমা!—দুমিনিট চোখ বুজিতে না বুজিতেই হইয়া গেল! এই রকম ধ্যান করিয়া কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? যখন তাহারা সব ধ্যান করিতেছিল, তখন সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—পরে কেশবকে বলিলাম, 'তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখিলাম,—কি মনে হইল জান?—দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় কখন কখন হনুমানের পাল চুপ করিয়া থাকে, যেন কত ভাল, কিছু জানে না। কিন্তু তা নয়, তারা তখন বসিয়া ভাবিতেছে—কোন্ গৃহস্থের চালে লাউ বা কুমড়োটা আছে, কাহার বাগানে কলা বা বেগুন হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই উপ্ করিয়া সেখানে গিয়া পড়িয়া সেইগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া উদরপূর্তি করে। অনেকের ধ্যান দেখিলাম ঠিক সেই রকম!'—সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিল।"

লীলাপ্রসঙ্গকার আর একদিনের একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন—"স্বামী বিবেকানন্দ

একদিন তাঁহার সম্মুখে ভজন গাহিতেছিলেন। স্বামীজী তখন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার উক্ত সমাজের ভাবে উপাসনা ও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। '(সেই) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে' ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীতটি তিনি অনুরাগের সহিত তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। উক্ত সঙ্গীতের একটি কলিতে আছে--'ভজন সাধন তাঁর কর রে নিরন্তর' ;--ঠাকুর ঐ কথাগুলি স্বামীজীর মনে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য সহসা বলিয়া উঠিলেন—না, না, বল্—'ভজন সাধন তাঁর কর রে দিনে দুবার'—কাজে যাহা করিবিনা, মিছামিছি তাহা কেন বলিবি? সকলে উচ্চৈঃ-স্বরে হাসিয়া উঠিল, স্বামীজীও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন।")

আমরা অনেক সময় জীবনের আসল উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ ভুলে গিয়ে নিজেদের কোন লাভের জন্য কাজ করি কিন্তু দোহাই দিই অন্য কোন কিছুর। ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপবাবু বলছিলেন যে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাম রাখবার জন্য কাজ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তার উত্তর দিচ্ছেন—"তুমি বলছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্য সব করছো; কিছুদিন পরে এ ভাবও থাকবে না। একটা গল্প শুন—একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়ে ঘর, অনেক মেহনত ক'রে ঘরখানি ক'রে ছিল। কিছুদিন পরে একদিন ভারী ঝড় এলো। কুঁড়ে ঘর টলটল করতে লাগলো। তখন ঘর রক্ষার জন্য সে ভারী চিন্তিত হ'লো। বললে, হে পবনদেব, দেখো ঘরটি ভেঙ্গো না বাবা! পবনদেব কিন্তু শুনছেন না। ঘর মড়মড় করতে লাগলো; তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে—তার মনে পড়লো যে হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—বাবা! ঘর ভেঙ্গোনা, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার! ঘর তবুও মড়মড় করে। কেবা তার কথা শুনে। অনেকবার 'হনুমানের ঘর', 'হনুমানের ঘর' করার পর দেখলে যে কিছুই হ'লো না। তখন বলতে লাগলো, বাবা 'লক্ষণের ঘর', 'লক্ষণের ঘর'! তাতেও হ'লো না। তখন বলে—বাবা 'রামের ঘর', 'রামের ঘর'! দেখো বাবা, ভেঙ্গো না, দোহাই তোমার! তাতেও কিছু হ'লো না, ঘর মড়মড় করে ভাঙ্গতে আরম্ভ হ'লো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বলছে—যা শালার ঘর!"

(প্রতাপের প্রতি)—"কেশবের নাম তোমায় রক্ষা করতে হবে না। যা কিছু হয়েছে জানবে—ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হ'লো আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে; তুমি কি ক'রবে? তোমার এখন কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।"

আবার বলছেন,—"আর এক কথা—কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সেদিকে যেতে দেয় না। এই দেখনা সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে। (সকলের হাস্য)। তা ভালই হোক আর মন্দই হোক,—যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, 'আজ্ঞে খুব ভাল।'"

নব্যযুগের বিজ্ঞানের জ্ঞানাভিমানের উপর কটাক্ষ করে সকলকে গল্প শোনাচ্ছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ কথা যে ওঁর সাইয়েন্স-এ (ইংরাজী বিজ্ঞান-শাস্ত্রে) নাই! তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়?"

"একটা গল্প শোন—একজন এসে বললে,

ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ি হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যাকে ওকথা বললে, সে ইংরাজী লেখা-পড়া জানে। সে বললে দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ি ভাঙার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ওহে, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই বাড়ি ভাঙার কথা তো খপরের কাগজে লেখা নাই। ওসব মিছে কথা।"

বয়স হলে বিষয়চিন্তা ছেড়ে ঈশ্বরচিন্তা করা উচিত—এটি বোঝাবার জন্য শ্রীযুক্ত শ্যাম বসুকে বলছেন—"আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজা কেন? একজন বলেছিল, আর দুর্গাপূজা করনা কেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিলে, আর দাঁত নাই ভাই। পাঁঠা খাবার শক্তি গেছে।"

বিষয়ী লোকদের অর্থাসক্তি বোঝাচ্ছেন এইপ্রকারে—"আর এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যদুর মা তাই বলে, 'অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে, বাবা তোমার উটি নাই।' বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হলে বিরক্ত হয়।"

"এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের ব'সে শোনবার ভারী ইচ্ছা। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখলে যে আসরে প্যালা পড়ছে, তখন সেখান থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান ক'রে জানতে পারলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারী ভিড় হয়েছে। সে দুই হাতে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আসরে ভাল ক'রে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল

একদিন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে আদ্যাশক্তির সম্বন্ধে কিছু বলতে বলেন! পণ্ডিত বিনয়পূর্বক অস্বীকার করলে তাঁকে এই গল্পটি বললেন—"একজনকে একটি লোক খুব ভক্তি করে। সেই ভক্তকে তামাক সাজার আগুন আনতে বললে; তা সে বললে, আমি কি আপনার আগুন আনবার যোগ্য? আর আগুন আনলেও না।"

সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। জিতেন্দ্রিয় হলেও মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে নাই। উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন—"সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী। আর দু-রকম একাদশী আছে। ফলমূল খেয়ে,—আর লুচিছক্কা খেয়ে। (সকলের হাস্য)। লুচিছক্কার সঙ্গে হলো দুখানা রুটি দুধে ভিজছে। (সকলের হাস্য)। (সহাস্যে)। তোমরা নির্জলা একাদশী পারবে না।"

"কৃষ্ণকিশোরকে দেখলাম, একাদশীতে লুচি-ছক্কা খেলো। আমি হৃদুকে বল্লাম—হৃদু আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। (সকলের হাস্য)। তাই একদিন করলাম। খুব পেটভরে খেলাম। তারপর দিন আর কিছু খেতে পারলাম না।"

আর একটি উদাহরণ দিয়েই এ প্রসঙ্গের শেষ করবো বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এলে পর, উনি বঙ্কিমবাবুর কাছে রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর কথা শেষ হলে বঙ্কিমবাবু, অধরবাবু ও অন্যান্যেরা পরস্পরের সঙ্গে ঐ বিষয়ে ইংরাজীতে কথা বলছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ কথা জানতে পেরে একটি গল্প বলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, সকলের প্রতি)—একটা কথা মনে প'ড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুনো, একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে

কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুরটুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম্ বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস্। নাপিত সে ছাড়বার নয়, সে বলতে নাগল, ড্যাম্ মানে যদি ভাল হয়, তাহ'লে আমি ড্যাম্, আমার বাপ ড্যাম্, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য)। আর ড্যাম্ মানে যদি খারাপ হয়, তাহ'লে তুমি ড্যাম্, তোমার বাবা ড্যাম্, তোমার চৌদ্দ-পুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য)। আর শুধু ড্যাম্ নয়। ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যা ড্যাম্ ড্যাম্।"

একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্রহ্মের আনন্দময় রূপটি তো শুধু একভাবে জানলেই হবে না। তাকে উপলব্ধি করে নিজের জীবনকে সেই সুরে বাঁধতে হবে। জীবন তো শুধু হাল্কা হাসিঠাট্টা নয়। তাই দেখি যারা শুধু রসিকতা নিয়ে পড়ে আছে শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের বলছেন—"ও সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়—তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে। ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে এগিয়ে পড়তে বলেছিল। সে প্রথমে এগিয়ে ছাখে চন্দনের কাঠ, তারপর ছাখে রূপার খনি,—তারপর সোনার খনি—তারপর হীরা মানিক।" একজন প্রশ্ন করছেন, "এ পথের শেষ নাই?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "যেখানে শান্তি, সেখানে তিষ্ঠ।"

অনন্তভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, কারণ তাঁর কোন একটি ভাব বোঝবার মত যোগ্যতাও আমাদের নেই। তিনি নিজেই আনন্দস্বরূপ, নিজেই নিজের উপমা। তাঁকে কার সাথে, কিসের সাথে তুলনা করব? যাঁর আনন্দের একটি কণা পেয়ে জগৎ মত্ত হয়েছে, তাঁর আনন্দের মাপ করতে গেলে সেই পিঁপড়ের অবস্থাই হবে, যে চিনির পাহাড় নিজের গর্তে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেই রস, সেই আনন্দ উপলব্ধির বস্তু, তা ধ্যানগম্য, আলাপ-আলোচনার দ্বারা লব্ধ বস্তু নয়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই মহিম্নঃস্তোত্রের এই অংশটি মনে পড়ে—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।"

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখতত্ত্ব ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়

অধ্যক্ষ শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ দাস

মালুঙ্ক্যপুত্র বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিলেন, 'জগৎ অনন্ত না সান্ত, সসীম না অসীম, মৃত্যুর পর তথাগতের কোন অস্তিত্ব থাকে কি না? বুদ্ধদেব এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'দেখ মালুঙ্ক্যপুত্র, বিষাক্ত বাণবিদ্ধ কোন ব্যক্তি কি চিকিৎসককে বলে, যে ব্যক্তি আমায় বাণবিদ্ধ করিল তাহার নাম কি, গোত্র কি, বাণটি কি ভাবে নির্মিত হইয়াছে—এ সকল না জানিলে আমি চিকিৎসা করিতে দিব না? এ সকল প্রশ্ন আরোগ্যলাভের সহায়ক নয় বলিয়া এ সকল প্রশ্ন সে উত্থাপন করে না। সেইরূপ জগৎ অনন্ত কি সান্ত এ সকল প্রশ্নের আলোচনা দ্বারা দুঃখ-বাণ-বিদ্ধ মানুষের শান্তি বা জ্ঞানলাভ হয় না, দুঃখের নিবৃত্তি হয় না; এজন্য এসকল বিষয়ে আমি শিষ্যদিগকে কোন শিক্ষা দিইনা।'[১] ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বুদ্ধত্বলাভের পর তিনি যে-ধর্ম প্রচার করিলেন তাহার উদ্দেশ্য মানুষকে দুঃখনিবৃত্তির পথ প্রদর্শন করা, কতকগুলি দুরূহ দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না।[২]

বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন (ক) রোগ নির্ণয় করেন, (খ) রোগের হেতু বা কারণ নির্ধারণ করেন, (গ) রোগীকে রোগমুক্ত করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন ও (ঘ) রোগমুক্তির উপযুক্ত নির্দেশ দান করেন, বুদ্ধদেবও সেইরূপ দুঃখ, দুঃখের হেতু বা কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায়—এই চারিটি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে এগুলিকে চারিটি আর্যসত্য বলা হয়। তিনি বলিলেন, "এই জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ আট প্রকারের: জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, প্রিয়-বিপ্রয়োগ, অপ্রিয়-সম্প্রয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ ও পঞ্চ উপাদান বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু। জীবমাত্রই এই আট প্রকারের দুঃখে অভিভূত, প্রত্যেকেরই জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ আছে, প্রত্যেকেরই প্রিয়জন-বিচ্ছেদ ভোগ করিতে ও অপ্রিয়জনের সংস্পর্শে আসিতে হয়। নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সব সময়ে সে পায় না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তুও সব দুঃখজনক।"[৩]

দুঃখের হেতু বা কারণ কি? তৃষ্ণা বা কামনাই দুঃখের হেতু বা কারণ। দুঃখের কারণস্বরূপ যে তৃষ্ণা, তাহা তিন প্রকারের, (ক) কামতৃষ্ণা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা (খ) ভবতৃষ্ণা বা বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা, ও (গ) বিভবতৃষ্ণা বা সম্পদ-তৃষ্ণা। তৃষ্ণাই দুঃখের হেতু কেন? কারণ, এ জগতের সব কিছু অনিত্য; কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এই সকল অনিত্য বস্তু আমরা কামনা করি বলিয়া আমাদের দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে অনিত্যবাদ বলা হয়। আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ ভোগ করিতে চাই কিন্তু আমাদের ভোগ করিবার শক্তি অতি স্বল্পস্থায়ী বা অনিত্য। জরা আসিয়া আমাদের সে শক্তি হরণ করে। আমরা সম্পদ বা বিভব কামনা করি, কিন্তু সম্পদ আমাদের সকলের ভাগ্যে

---

১ বুদ্ধকথা—ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন, পৃঃ ৬৯।৭০।

২ Outline of Indian Philosophy—M. Hiriyanna, Ch. V, p. 137.

৩ বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচি, পৃঃ ১৬।

জোটে না, জুটিলেও তাহা চিরস্থায়ী হয় না। সকলেই আমরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে চাই, কিন্তু মৃত্যুতে আমাদের জীবনের সমাপ্তি হয়। কামনার অপূর্তিই দুঃখের কারণ ও কাম্য বস্তুর অনিত্যতাই কামনা-অপূর্তির প্রধান কারণ। এতদ্ব্যতীত, মনও আমাদের চিরচঞ্চল। আজ যাহা চাই কাল তাহা চাই না। ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনের পরিবর্তন হয়। বুদ্ধদেব মানুষের মনকে আগুনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন একটি আগুন জ্বলিতেছে। এই মুহূর্তে যে আগুনটি দেখিতেছি ও পর মুহূর্তে যে আগুনটি দেখি এই দুইটি এক নয় ও কারণ উহাদের শিখাগুলিও এক নয় এবং উপাদানও এক নয়। আগুনটি যেমন প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে, আমাদের মনও সেইরূপ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। আজ আমরা যাহা চাই, কাল আর আমরা তাহা চাই না। মনোভাবের এই ক্ষণিকত্বের জন্য ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিয়াও আমরা শান্তি পাই না ও নিত্য নতুন তৃষ্ণা আমাদের পীড়িত করে। শ্রদ্ধেয় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "There is sorrow because all things are transient. They vanish as they occur. The law of causality conditions all beings which is in a state of perpetual becoming, arising and passing away. ···Sorrow is one with transiency. Desires cause suffering since we desire what is impermanent, changeable and perishable. It is impermanence of the object of desire that causes disappointment and regret."[8]

দুঃখের ঐকান্তিক নিরোধ যে সর্বদাই বাঞ্ছনীয় এবিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু কিরূপে দুঃখের নিরোধ সম্ভব? কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এই জীবন যখন দুঃখময়, দেহের বিনাশেই দুঃখের নিবৃত্তি। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বলেন, দেহের বিনাশে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, কারণ পুনর্জন্ম হইতে পারে। তৃষ্ণার ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত পুনর্জন্ম অবশ্যই হইবে। দেহের বিনাশে নয়, তৃষ্ণার ক্ষয়েই নির্বাণ-লাভ হয়। জগতে যদি কোন নিত্য বস্তু না থাকে, তবে পুনর্জন্ম হয় কিরূপে? কাহার পুনর্জন্ম হয়? বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ভগবান, আত্মা, বা কোন নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারা—"প্রতীত্যসমুৎপাদ" বা একের বিনাশের পর অন্যের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করেন। প্রত্যেক উৎপাদের কোন না কোন প্রত্যয় বা হেতু বিদ্যমান। প্রত্যয় বা হেতু এতাদৃশ যে কোন বস্তু বা ঘটনার উৎপত্তি হইবার পূর্ব-ক্ষণেই সতত লুপ্ত হইয়া যায়। "প্রতীত্যসমুৎ-পাদ" কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার বিচ্ছিন্ন প্রবাহ মাত্র।[৫] তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই কারণের অভাবে এই প্রবাহ আর থাকে না ও জন্মান্তর হয় না। গ্রীক রাজা মিলিন্দের প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নাগসেন প্রশ্ন করিলেন, "যদি কোন লোক প্রদীপ জ্বালে, তবে উহা সারা রাত্রি জ্বলিতে থাকিবে কি?

"···সারা রাত্রি জ্বলিতে থাকিবে।"

"মহারাজ, রাত্রির প্রথম যামে যে দীপ-শিখা ছিল, উহা কি দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামেও বিদ্যমান থাকে?"

"না, ভন্তে।"

"মহারাজ! তবে কি ঐ প্রদীপ প্রথম যামে এক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামে অন্য হইয়া যায়?"

৪ Indian Philosophy—Radhakrishnan —vol. I—2nd Edition, p. 366.

৫ বৌদ্ধ দর্শন—ধর্মাধর মহাস্থবির। পৃঃ ১৭। ইংরাজীতে ইহাকে বলা হইয়াছে, Discontinuous Continuity.

"না, ভন্তে সেই প্রদীপ সারারাত্রি জ্বলিতে থাকে।"

"ঠিক এইরূপই মহারাজ! কোন বস্তুর অস্তিত্বের শৃঙ্খলায় এক অবস্থা উৎপন্ন হয়, এক লয় হয়—এবং এই প্রকারে প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকে। এক প্রবাহের দুই অবস্থাতে এক ক্ষণেরও অন্তর থাকে না; কারণ একের লয় হইতেই অপরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক অন্তিম বিজ্ঞানের (চেতনার) লয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপর জন্মের প্রথম বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।"[৬] এই জন্যেই বলা হইয়াছে 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ' কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় বিচ্ছিন্ন প্রবাহ মাত্র। যেমন তৈলের অভাব হইলেই প্রদীপ নিবিয়া যায়, সেইরূপ তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই কারণের অভাবে এই প্রবাহ আর থাকে না ও জন্মান্তর হয় না।

তৃষ্ণার ক্ষয় কিরূপে সম্ভব? তিনি বলিলেন, তৃষ্ণার ক্ষয় করিতে হইলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামক পথে চলিতে হইবে। কিন্তু এই পথে চলিতে হইলে, ভোগবাহুল্য বা বিলাস অথবা তাহার বিপরীত শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন এই দুইটিই পরিত্যাগ করিতে হইবে। একটি উপমার দ্বারা তিনি ইহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, একটি বাদ্যযন্ত্রের তারগুলি যদি খুব আঁট করিয়া বা খুব ঢিল করিয়া বাঁধা থাকে তাহাতে যেমন ঠিক সুর বাহির হয় না, সেইরূপ শরীরনিগ্রহে বা ভোগবাহুল্যে রত ব্যক্তি ঠিক-ভাবে সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না।[৭] কৃচ্ছ্র-সাধন অথবা বিলাস এই দুইটি অন্ত পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধন সম্ভব। অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি? ১. সম্যক্ দৃষ্টি, ২. সম্যক্ সঙ্কল্প, ৩. সম্যক্ বাক্য, ৪. সম্যক্ কর্ম, ৫. সম্যক্ আজীব, ৬. সম্যক্ ব্যায়াম, ৭. সম্যক্ স্মৃতি, ৮. সম্যক্ সমাধি। এই আটটি বিষয়ের যথাযথ অনুশীলই অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধন। এগুলির যথাযথ অনুশীলন কিরূপ?

১. **সম্যক্ দৃষ্টি**—কোন কাজ করিবার পূর্বে যেমন কাজটি কেন করিব ও তাহা সম্পাদন করিবার কৌশলই বা কি, সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেইরূপ দুঃখের হেতু, দুঃখ-নিরোধের প্রয়োজনীয়তা ও নিরোধের উপায় বা কৌশল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

২. **সম্যক্ সঙ্কল্প**—দৃষ্টি বা লক্ষ্য করিয়া সেই অনুযায়ী সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে নিজের অহংকে যতদূর সম্ভব খর্ব করিয়া সকল জীবের প্রতি অবিদ্বেষ ও অহিংসার ভাব পোষণ করিতে হইবে।

দৃষ্টি ও সঙ্কল্প ঠিক হইলে, সেই অনুযায়ী কার্য করিতে হইবে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মার্গে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৩. **সম্যক্ বাক্য**—মিথ্যাভাষণ, কটু-ভাষণ, অসার প্রলাপ ভাষণ হইতে বিরত হইয়া সত্য, প্রিয় ও অর্থপূর্ণ কথা বলা উচিত।

৪. **সম্যক্ কর্ম**—কর্ম তিন প্রকারের। কতকগুলি কর্ম বুদ্ধদেবের মতে নিরর্থক ও মূল্য-হীন। তিনি বলিয়াছেন অগ্নিপূজা, পশুবলি বা কোন বিশেষ নদীতে স্নান—এ সকল কার্য নিরর্থক। একবার এক ব্রাহ্মণ বলেন, বাহুক নদীতে স্নান করিলে পাপীর পাপস্খালন হয়, ইহা শুনিয়া তিনি বলেন—হিংসাপরায়ণ, দুষ্কৃতকারী পাপীর পাপ কোন নদীর জলেই

৬ বৌদ্ধ দর্শন—ধর্মাধর মহাস্থবির। পৃঃ ৬২।৬৩

৭ বুদ্ধকথা—অমূল্যচন্দ্র সেন। পৃঃ ৬৫। সাধনার সময় অতিরিক্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে তাঁহার শরীর এরূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল যে উদর স্পর্শ করিলে মেরুদণ্ডে হাত ঠেকিত; তথাপি তিনি বোধি লাভ করিতে পারেন নাই; পরে শরীর সুস্থ হইলে তিনি বোধি লাভ করেন। সঙ্ঘে ভিক্ষুদের শরীর যাহাতে সুস্থ থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইত ও অসুস্থ ভিক্ষুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত।

ধুইয়া যায় না। যে ব্যক্তি সত্যবাদী, প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকেন, অদত্ত ধন গ্রহণ করেন না ও আত্মত্যাগে অভ্যস্ত তাহার পক্ষে গয়ায় যাইবার প্রয়োজন নাই বা বিশেষ কোন নদীতে স্নান করিবারও প্রয়োজন নাই।[৮]

কতকগুলি কর্ম সাধকের পক্ষে ক্ষতিকর এজন্য এগুলি সর্বদা পরিত্যাজ্য। এইগুলি বর্জন করিবার ইচ্ছা যাহাতে সাধকের মনে বদ্ধমূল হয় এবং ইহা অভ্যাসে পরিণত হয় এজন্য তিনি 'শীল' গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন ও প্রত্যহ শীলগুলি স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। এই পাঁচটি শীল পাঁচটি প্রতিজ্ঞামাত্র। এই প্রতিজ্ঞাগুলি ভগবানের কাছে, গুরুর কাছে বা অপর কাহারও কাছে নয়, নিজের কাছে নিজের প্রতিজ্ঞা। এই পাঁচটি প্রতিজ্ঞা কি?

(ক) পাণাতিপাত বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি=প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হওয়ার শিক্ষাপদ আমি গ্রহণ করিতেছি।

(খ) অদিন্নদানা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি=যাহা আমাকে দেওয়া হয় নাই তাহার গ্রহণ হইতে বিরত হওয়ার শিক্ষাপদ আমি গ্রহণ করিতেছি।

(গ) কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি=ব্যভিচার হইতে বিরত হওয়ার শিক্ষাপদ আমি গ্রহণ করিতেছি।

(ঘ) মুসাবাদা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি=মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত হওয়ার শিক্ষাপদ আমি গ্রহণ করিতেছি।

(ঙ) সুরা-মেরয়-মজ্জ-পমাদট্টানা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি=প্রমাদাশ্রয় সুরা বা মেরয় মদ্য পান হইতে বিরত হওয়ার শিক্ষাপদ আমি গ্রহণ করিতেছি।

এগুলি নিষিদ্ধ কর্ম। ভিক্ষু ও গৃহী সকল শিষ্যকেই এই সকল কার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য পাঁচটি শীল গ্রহণ করিতে হইত।[৯] নিষিদ্ধ কর্ম ও নিরর্থক কর্ম ব্যতিরেকে আরও কতকগুলি কর্মের কথা বলা হইয়াছে যাহা সাধকের পক্ষে মঙ্গলকর। "মঙ্গলসুত্তে" বলা হইয়াছে, অসৎজনের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়দের পূজা করা, পিতামাতার পূজা করা, স্ত্রীপুত্রের কল্যাণ করা—সাধকের পক্ষে মঙ্গলকর কর্ম।[১০] নিষিদ্ধ কর্ম হইতে বিরত থাকা ও সর্বদা মঙ্গলকর কর্ম করাই সম্যক্ কর্ম।

৫. **সম্যক্ আজীব**—এমন জীবিকা গ্রহণ করা উচিত যাহা সাধকের পক্ষে অনুকূল। মাদকদ্রব্যবিক্রয় অথবা যে জীবিকায় মিথ্যাভাষণ বা প্রাণিহত্যা করিতে হয় এরূপ জীবিকা গ্রহণ করা উচিত নয়।

৬. **সম্যক্ ব্যায়াম**—ব্যায়াম অর্থে চেষ্টা বা প্রযত্ন বুঝিতে হইবে। কি বিষয়ে চেষ্টা করিব? চারি প্রকার চেষ্টার কথা বলা হইয়াছে। (ক) যাহাতে মনে কোন কুচিন্তার উদয় না হয় (খ) মনে যে সকল অকুশল বা কুচিন্তা উদয় হইয়াছে তাহা যাহাতে দূর হয় (গ) সুচিন্তা বা কুশল চিন্তা যাহাতে মনে উদয় হয় ও (ঘ) মনে যে সকল সুচিন্তা বা কুশল চিন্তা

৮ তিনি আরও বলিয়াছেন, "neither abstinence nor going naked nor shaving the head nor a rough garment, neither offering to priests nor sacrifices to the gods will cleanse a man who is not free from delusions." —Radhakrishnan—Indian Philosophy, vol. I, p. 421.

৯ এই শীলগুলি খৃষ্টানদিগের Ten Commandments-র সহিত তুলনীয়। এই পাঁচটি ব্যতিরেকে ভিক্ষুদের আরও পাঁচটি শীল গ্রহণ করিতে হইত।

১০ অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনেয্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।
মাতাপিতু-উপট্ঠানং পুত্তদারস্স সংগহো
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

উদিত হইয়াছে তাহা যাহাতে স্থায়ী হয় ও পূর্ণতা লাভ করে সে সকল বিষয়ে সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে।

৭. **সম্যক্ স্মৃতি**—মানুষের মন অত্যন্ত চঞ্চল। আমরা আমাদের লক্ষ্য সব সময়ে ঠিক রাখিতে পারি না। আবেগ বা উত্তেজনায় আমাদের মনের স্থৈর্য নষ্ট করিয়া আমাদের সাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করে। সম্যক্ স্মৃতিতে এই মনঃ-সংযমের কথা বলা হইয়াছে।[১১] রূপ, রস, বেদনা, আবেগ প্রভৃতির অনিত্যতা বা ক্ষণিকত্ব ও আর্যসত্যগুলিকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে বলা হইয়াছে। এইভাবে মনঃসংযমে অভ্যস্ত হইলেই পরবর্তী মার্গ ঠিকভাবে অনুশীলন করা সম্ভব।

৮. **সম্যক্ সমাধি**—নানা বিষয়ে মনের বিক্ষেপ দূর করিয়া মনকে একাগ্র করাকে সমাধি বলে। চারিটি ধ্যানের মধ্য দিয়া মনের শক্তি ও একাগ্রতা বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে।

প্রথম ধ্যান :—নির্জনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সকল প্রকার কামনা ত্যাগ করিয়া বিচারপূর্ণ ধ্যানে নিযুক্ত হওয়াই প্রথম ধ্যান। ইহাতে মন আনন্দে পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় ধ্যান :—বিচার-বিতর্কের অতীত হইয়া মনে গভীর শান্তি অনুভব করাই দ্বিতীয় ধ্যানের উদ্দেশ্য।

তৃতীয় ধ্যান :—অহংজ্ঞান বা আত্মমোহ দমন করিয়া উপেক্ষার ভাব আনয়ন করাই তৃতীয় ধ্যানের উদ্দেশ্য।

চতুর্থ ধ্যান :—সুখ ও দুঃখের অতীত হইয়া উপেক্ষার ভাব মনে দৃঢ় করিয়া অবস্থান করাই চতুর্থ ধ্যানের উদ্দেশ্য।

এইরূপ ধ্যানের ফল কি? ধ্যানের ফলে চিত্ত-বিমুক্তি হয়। এই চিত্ত-বিমুক্তি কিরূপ? "চিত্তের যে বিমুক্তি হয়, তাহার নাম অনিমিত্ত চিত্ত-বিমুক্তি, আকিঞ্চন্য চিত্ত-বিমুক্তি এবং শূন্যতা চিত্ত-বিমুক্তি। সমাধির উচ্চ অবস্থায় কোন বাহ্য বস্তু চিন্তার বিষয় হয় না এইজন্য ইহার নাম অনিমিত্ত (নিমিত্তবিহীন)। তখন অন্তরে এই চিন্তা উপস্থিত হয়, 'কিছু নাই' 'কিছু নাই' এইজন্য ইহার নাম আকিঞ্চন্য (কিছু নাই—এই ভাব)। তখন আমিত্ব-জ্ঞান ও মমত্ব-বোধ বিদূরিত হয়, এইজন্য ইহার নাম শূন্যতা।

সম্যক্ সমাধির একটি বিকল্প সাধনের কথা বলা হইয়াছে; তাহার নাম ব্রহ্মবিহার। "সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহার উভয়ই সাধনের পথ। কিন্তু প্রণালীতে পার্থক্য আছে মজ্‌ঝিম-নিকায়ের অন্তর্গত মহা-বেদল্ল সুত্তে এ বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।...ব্রহ্মবিহারে চিত্তের যে বিমুক্তি তাহাতে চিত্তের প্রসার বর্ধিত হয়, তাহা অসীম ও অপ্রমাণ অর্থাৎ প্রমাণ বা পরিমাণরহিত। এইজন্য ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে অপ্রমাণ চিত্ত-বিমুক্তি। প্রণালীতে পার্থক্য থাকিলেও এতদুভয়েরই লক্ষ্য ও ফল একই। সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহার উভয় সাধনেই রাগ দ্বেষ মোহ বিদূরিত হয়; উভয়ই অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির ও নির্বাণলাভের উপায়। —মজ্‌ঝিম, ৪৩, মহা-বেদল্ল সুত্ত। উভয় পথই ধ্যানের পথ, উভয়ই গোতমের অনুমোদিত এবং উভয় পথেই গোতম সাধনা করিয়াছিলেন এই সাধনার ফল বুদ্ধত্বলাভ।"[১২]

[১১] To avoid mental unsteadiness, the mind that plays and roves is to be controlled. Emotions are to Buddhism as to Stoicism 'failures, disturbances of moral health and if indulged become chronic diseases of the soul.' They destroy all healthy endeavour. —Radhakrishnan—Indian Philosophy, vol. I p. 423.

[১২] বুদ্ধ-প্রসঙ্গ—মহেশচন্দ্র ঘোষ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃঃ ৩৩।

ব্রহ্মবিহারে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই চারি প্রকার ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে।[১৩] তিনি পুত্র রাহুলকে বলেন, "হে রাহুল! মৈত্রীভাবনা সাধন করিবে, মৈত্রী-ভাবনায় বিদ্বেষ-বুদ্ধি (ব্যাপাদ) বিদূরিত হইবে। হে রাহুল! করুণা-ভাবনা সাধন করিবে; করুণা-ভাবনা দ্বারা হিংসা-বুদ্ধি বিদূরিত হইবে।

হে রাহুল! মুদিতা-ভাবনা সাধন করিবে, মুদিতা-ভাবনা দ্বারা অ-রতি-ভাব বিদূরিত হইবে। হে রাহুল! উপেক্ষা-ভাবনা সাধন করিবে, উপেক্ষা-ভাবনা দ্বারা রাগ (অর্থাৎ আসক্তি, কাম) বিনষ্ট হইবে।—মজ্‌ঝিম, ৬২ মহারাহুলোবাদ সুত্ত।"[১৪]

মৈত্রী-ভাবনায় বলা হইয়াছে—সকল প্রাণী সুখী হউক, শত্রুহীন হউক, অহিংসিত হউক ও সুখী আত্মা হইয়া কাল অতিবাহিত করুক এইরূপ ধ্যান করিবে। মাতা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ুর দ্বারা রক্ষা করেন, সকল জীবে সেইরূপ অপরিমিত মানস রক্ষা করিবে।[১৫] এইরূপ অনেকগুলি ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে।

১৩ "মিত্রের প্রতি যে ভাব সেই ভাবের নাম মৈত্রী; ...প্রাণের যে অবস্থায় অপরের দুঃখে দুঃখ উপস্থিত হয়, অপরের দুঃখ ও অহিত দূর করিবার বাসনা হয় সেই অবস্থার নাম করুণা। প্রাণের যে অবস্থায় অপরের সুখে সুখ উপস্থিত হয়, সেই অবস্থার নাম মুদিতা।...যখন মানুষ দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগতস্পৃহ হয় ও নিতান্তই শান্তভাবে অবস্থিতি করে, সেই অবস্থাকে উপেক্ষা বলা হয়।"—বুদ্ধ-প্রসঙ্গ—মহেশচন্দ্র ঘোষ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ৩৪।৩৫।

১৪ বুদ্ধ-প্রসঙ্গ—মহেশচন্দ্র ঘোষ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃঃ ৩৫।৩৬.

(১৫) সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, আবেরা হোন্তু,
অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী আত্তানং পরিহরন্তু।

* * *

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে
এবম্পি সব্বভুতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

এরূপ ধ্যানে চিত্ত প্রসারিত হয়; সকল প্রাণীর সহিত একাত্মবোধ হয়। ইহা শূন্যতার সাধন নয়, অহংকে লুপ্ত না করিয়া ব্যাপ্ত করিয়া বিশ্ব-সত্তার সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়াই এই সাধনের উদ্দেশ্য। এজন্য বলা হইয়াছে ইহাতে অপ্রমাণ চিত্ত-বিমুক্তি লাভ হয়।

অন্য ধর্মে প্রার্থনা বা উপাসনার যে স্থান, বৌদ্ধ ধর্মে ধ্যানের সেই স্থান। প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। ধ্যান অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ মার্গ এবং এই মার্গগুলির সাধন ঠিকভাবে সম্পন্ন করিলেই নির্বাণ লাভ হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে ভগবানের দয়া বা গুরুর কৃপা সাধকের কোন সাহায্যেই আসে না। ভগবানের অস্তিত্বই বৌদ্ধশাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। সাধককে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় নির্বাণ লাভ করিতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে আনন্দ[১৬] বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তাঁহার অত্যয়ের পরে ভিক্ষুসংঘ কিভাবে পরিচালিত হইবে, সেই সম্বন্ধে তিনি যেন কিছু নির্দেশ দিয়া যান। বুদ্ধদেব কিন্তু এরূপ কোন নির্দেশ দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, সংঘের কোন পরিচালক বা নেতা থাকিতে পারিবে না—তিনি নিজেও নিজেকে সংঘের পরিচালক বা নেতা বলিয়া মনে করেন না—ভিক্ষুরা নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করিবে। তাহারা হইবে, —'আত্মদীপ', 'আত্ম-শরণ', 'ধর্মশরণ' ও 'অনন্য-শরণ'।[১৭]

বৌদ্ধেরা মনে করেন আত্মশরণ হইয়া বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্মে শরণ লইয়া তাঁহারই নির্দেশিত পথে চলিলেই নির্বাণ লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে নির্বাণ লাভ করা যায় না, এজন্য তাঁহারা বলেন,

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

১৬ আনন্দ বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য ও পরিচারক।

১৭ মহাপরিনির্বাণের কথা—সুকুমার দত্ত। ন্যাশানাল বুক ট্রাস্টের গ্রন্থ। পৃঃ ১৫। 'আত্মদীপ'—Rhys David এই কথাটির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, 'Be, ye lamps unto yourselves'.

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দুহিতা চলিয়া গেছে! ছায়ায় মৃত্যুর
কাঁদিছে নিঃসঙ্গ পিতা কন্যাশোকাতুর!
যুগ-যুগান্তর ধ'রে সারাবিশ্বময়
এমনি কেঁদেছে কত পিতার হৃদয়!
অন্ধকারে খুঁজিয়াছে হারানো সন্তানে!
তুমি জানো, একদিন মৃত্যুর সন্ধানে
বাহিরিল নচিকেতা। সেই অভিসার!
মর্মে হোম-বহ্নি-শিখা মহাজিজ্ঞাসার!

অবশেষে সেই উপলব্ধির মহিমা!
দেহ মরে। আত্মার কে দিতে পারে সীমা?
সে যে নিত্য, অবিনাশী। মোছ আঁখিনীর!
সর্বত্র বিদেহী আত্মা তব নন্দিনীর!
দেহাত্মবুদ্ধির মূল—সে তো অবিদ্যায়!
যে আত্মা এখানে আছে সে আত্মা সেথায়।

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-রোপিত আম্রতরু

শ্রীরাখালদাস গোস্বামী

আপন হস্তে উপ্ত আমের চারাটি হয়েছে মস্ত,
পত্রে ও ফলে মুকুলে মুকুলে লিখিত সে ইতিবৃত্ত—
পরশে তরুটি অমৃতায়িত—কাণ্ড মূল ও শীর্ষ,
স্তম্ভিত-চিত যাত্রী অযুত লভিছে পরশ-হর্ষ।
স্থূল দৃষ্টিতে লুকায়েছ, এটি রেখে গেছ স্মৃতিচিহ্ন
জোয়ার গিয়েছে আজো সে রয়েছে কাল-বেলাভূমি-লগ্ন।
শান্ত-মুরজ বৃন্দাবনের এটি যে নূপুর ছিন্ন,
বুদ্ধের বোধিতরু সম এটি, খৃষ্টের ক্রুশচিহ্ন!
মক্কার কাবা প্রস্তর এটি, ইসলাম-মহাতীর্থ,
নিশ্চলীভূত গঙ্গাপ্রপাত গোমুখী হইতে মুক্ত!
নম বেদান্ত-সিদ্ধান্ত হে, সর্বসাধক-লক্ষ্য!
নম তরুবর, অরূপরতন-ছোঁয়ানো রূপের সাক্ষ্য!

সেণ্টপল ও স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য

উপযুক্ত বংশধর যেমন পৈতৃক সম্পত্তি পেয়ে ভালভাবে কোথায় কি আছে দেখে নেয়, তেমনি যোগ্যশিষ্য গুরুদত্ত শক্তিকে নিজের বশে আনবার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও ভগবদুপাসনায় নিরত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মানবলীলা সংবরণ করলে পর নরেন্দ্রনাথ প্রব্রজ্যায় বেরুলেন। পলের সঙ্গে ছিল খ্রীষ্টানদের 'বাইবেল' আর স্বামীজীর সঙ্গে ছিল হিন্দুদের 'গীতা' আর খ্রীষ্টানদের 'ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট'। নিঃসঙ্গ, নির্ভীক তরুণ সন্ন্যাসী অতিক্রম করলেন তরাই-এর জঙ্গল, তুহিনতুষার হিমালয়, রাজপুতানার মরুপ্রান্তর, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র। পল পরেছিলেন প্রাচ্যের পোষাক, আর স্বামীজী পরলেন চিরাচরিত ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর বেশ, সঙ্গে নিলেন দণ্ড ও কমণ্ডলু। 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন'—এই সন্ন্যাসীই আবার পাশ্চাত্য বেশ-ভূষায় ভূষিত হয়েছেন। এহেন ব্যক্তিদের উদ্দেশ করে তাই শাস্ত্র বলেছেন—'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ'। পলের ন্যায় স্বামীজীও কমবেশী তিন বৎসর একাকী অজ্ঞাতাবস্থায় কাটিয়েছেন। দামাস্কাসে পলকে ঝুড়ির ভিতর বসে পালাতে হয়েছিল আর লিমডিতে স্বামীজী এক উৎকট সম্প্রদায়ের হাতে বন্দী হন; পরিশেষে ভগবৎকৃপায় মুক্তি পান।

'নির্জনতার আনন্দলোক – একমাত্র আনন্দলোক'—কিন্তু এই আনন্দ বিধাতা স্বামীজীকে দেন নি। পল-লিখিত ও -কথিত সুসমাচারের মঙ্গলাচরণে একথা-কয়টি প্রায়ই দেখা যায়—'পল, যীশুখ্রীষ্টের দাস, আহূত, প্রেরিত, ঈশ্বরের সুসমাচারের জন্য পৃথককৃত' ইত্যাদি। স্বামীজীর একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃতির দ্বারা দেখান হচ্ছে উহা স্বামীজীরও মর্মকথা: "আমি রামকৃষ্ণের গোলাম– তাঁকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু'।...আমার উপর তাঁর নির্দেশ এই যে, তাঁর দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করব, এতে যা হবার হবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাই আসুক, নিতে রাজী আছি।"

'মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস হারিও না, আলো দেখতে পাবে'—পল ভগবৎ-বিশ্বাসে বুক বেঁধে জনশূন্য মরু থেকে জনপূর্ণ দামাস্কাসে হঠাৎ উপস্থিত হলেন। নিজমুখে বললেন, 'কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে তবে তার নবজীবন লাভ হয়।' দামাস্কাসে আবার পলের জীবনসংশয় হল। তাঁকে মেরে ফেলবার জন্য সব ষড়যন্ত্র হল। তারপর ঘোর অমানিশাতে ছদ্মবেশী কয়েকজন কৃষক ও উটচালকের দ্বারা বাহিত হয়ে নগর-প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে পলায়ন করেন এবং জেরুসালেমে উপস্থিত হন। সেখানে যীশুর শিষ্যেরা তাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন —কারণ এই লোকটি না খ্রীষ্টভক্তদের উৎপীড়িত করত? তারপর পলের পরিবর্তনের কাহিনী শুনে তাঁদের সঙ্গে মিলন হয়। এখানেও ইহুদীরা তাঁকে মেরে ফেলবার জন্য চেষ্টা করে, কারণ পলের ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতার কাছে তাদের সব কিছু ম্লান হয়ে যেতে লাগল। তখনকার দিনে ধর্মীয় বিতর্ক-বিচারের দ্বারা সমাধান হত না, হত ছোরা এবং তরবারির দ্বারা। পল এইরূপ হিংস্র সমাধান-পদ্ধতির হাত থেকে পলায়নের দ্বারা

নিষ্কৃতি পেলেন। তিনি জাহাজে কৈসরিয়া হয়ে নিজ জন্মস্থান টার্সাসে পৌছলেন। সেখানে ভগবানের পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিন-চার বছর যীশুর ধ্যান-ধারণায় কাটালেন। জীবনীকার লিখেছেন—পল নিজ দেশে পরদেশী হলেন, কারণ আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁর সংস্রব কেটে দিল। 'কুমারীকঙ্কণবৎ' দীর্ঘকাল একাকী কাটাবার পর, বসন্তের এক সন্ধ্যায় পুরানো বন্ধু ও যীশুভক্ত বার্ণবা তাঁর কাছে এলেন। তিনি আন্তিয়খে প্রচারে যান কিন্তু বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, কারণ তাঁর প্রচারের উপাদান ছিল বিশ্বাস ও ভক্তি—ছিল না সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতা এবং পরমতখণ্ডনের যুক্তি। তিনি বললেন, "ভাই পল, তোমাকে এখন প্রভুর বড় প্রয়োজন ; তিনি তোমায় ডাকছেন। চল আমার সঙ্গে আন্তিয়খে।" শুরু হল পলের নবযাত্রা। ভগবদ্বাক্য পলের স্মৃতিপটে উদিত হল : "তুমি আমায় বেছে নাও নি, আমিই তোমায় বেছে নিয়েছি।"

মোসাইক আইনের নেতিবাক্য, ছুঁৎমার্গ এবং অসংখ্য বিধিনিষেধের দাপটে লোক উৎপীড়িত হয়েছিল। পল তাদের সামনে গিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যু তোমাদের প্রাচীন নিয়মের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু ওদিকে জেরুসালেমে রাজা হিরোডের অত্যাচারে 'মাদার চার্চ' উত্তপ্ত হয়ে উঠল। পল ও বার্ণবা সেখানে গেলেন এবং পুনরায় আন্তিয়খে ফিরে এলেন। যীশুর মৃত্যুর পনের বছরের মধ্যেই সিরিয়া, ফিনিসিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় তাঁর ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। পল বার্ণবার সঙ্গে সাইপ্রাসে প্রচারার্থে গেলেন এবং যাত্রাপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে খ্রীষ্টবীজ বপন করলেন। 'প্রভুর নাম জয়যুক্ত হোক'—এই ছিল তাঁদের ভাব। গভর্ণর এই দুই প্রচারকের নাম শুনে আহ্বান জানালেন এবং প্রাচীন ইহুদী পণ্ডিত ইলিমাকেও ডাকলেন। পল শুরু করলেন তাঁর অভিভাষণ—প্রথমে সার্বজনীন দার্শনিক মতসকল, ঈশ্বরের ধারণা, একেশ্বরবাদ, ঈশ্বরের প্রকাশ, মানুষের ভিতর ঈশ্বর আছেন নতুবা সে ঈশ্বরের নাম করতে পারে না, স্রষ্টা ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সহিত মানুষের সম্বন্ধ ব'লে তিনি বিদ্যুৎবাগ্মিতা অবলম্বন করে শুরু করলেন খ্রীষ্টবাণী, খ্রীষ্টের পুনরভ্যুত্থান আর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং খ্রীষ্টই ত্রাণকর্তা বলে শেষ করলেন। গভর্ণর মোহিত হলেন। কিন্তু যাচাই করে নিতে হবে। ইলিমা উঠে শুরু করলেন প্রাচীন ইহুদী-ধর্মের ইতিকথা। অনুভূতি ধর্মের প্রাণ। পলের কাছে সব ম্লান হয়ে গেল। ইলিমার মুখ কালিমায় ভরে গেল এবং প্রতিহিংসার জন্য জ্বলে উঠল—ফলে বার্ণবা ভয়ানকভাবে অত্যাচারিত হলেন (মতান্তরে প্রাণ হারালেন)। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় রোমীয় সমাজে খ্রীষ্টের প্রভাব ঢুকল। পলের অভিযান অব্যাহত রইল। সাইপ্রাসের অন্তর্গত প্যাফোস থেকে জাহাজে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে অ্যাটালিয়ায় পৌছুলেন। এখান থেকে টাউরাস পর্বতমালা অতিক্রম করে চললেন এশিয়া মাইনরের দিকে। এ ছিল এক দুর্গম অভিযান। বাল্যে টার্সাসে ছাদের উপর বসে পিতার কাছ থেকে শুনেছেন এই পর্বতপারের কত সব কাহিনী। সঙ্গী মার্ক ভীত হয়ে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন সাগরপথে। পল প্রভুর কথা একবার স্মরণ করে নিলেন : 'যে ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়ে পিছন ফিরে চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।' অজ্ঞাত দেশে অপরিচিত মানুষের মধ্যে পল ও বার্ণবা প্রভুর সুসমাচার প্রচার করতে করতে চললেন। ইহুদীদের (বিশেষতঃ তাঁতী)

বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন, তাদের বয়ন-কাজে সহায়তা করতেন এবং পরিবারের একজন হয়ে যেতেন। কিন্তু রবিবার এলেই সমাজগৃহে গিয়ে নিজের প্রকৃত প্রচারকের স্বরূপ দেখিয়ে মোহিত করে দিতেন। গর্বিত ইহুদীদের ধারণা ছিল যে জগতের প্রতি তাদের একটি বাণী দিবার আছে—একেশ্বরবাদ, সুন্দর নৈতিক আইন ও মহাপুরুষের আগমন-প্রতীক্ষা। পল বললেন—ঐ মহাপুরুষই ন্যাজারাথের যীশুখ্রীষ্ট। কিন্তু প্রতিবাদ এল—তিনি যদি মহাপুরুষই হবেন তবে ক্রুশ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না কেন? পল নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যীশুর পুনরভ্যুত্থানের কথা বললেন। পরিশেষে বললেন, "খ্রীষ্ট ইহুদী-জেণ্টাইলে, প্রভু-ভৃত্যে, নারী-পুরুষে কোন ভেদ নাই। খ্রীষ্টে আমরা সবাই এক।" এইরূপ একত্বের বাণী শুনে তারা ক্ষেপে গেল—'মেরে ফেল, বিধর্মী, আমাদের ঐরূপ মহাপুরুষের প্রয়োজন নাই' বলে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু জেণ্টাইলরা তাঁদের অনুরক্ত হল। এইভাবে ফিসিডিয়া ছেড়ে তারা ইকনিয়াতে এলেন। এখানে এক অঘটন ঘটল। পল একদিন বক্তৃতাকালে পবিত্র কৌমার্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। তা শুনে থিক্লা নামে একটি অনূঢ়া মেয়ে তার বাগ্‌দত্তা স্বামীর সঙ্গ ছিন্ন করে এবং পলের কাছ থেকে খ্রীষ্টের উপদেশ গ্রহণ করে। কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ এবং স্থানীয় সমস্ত লোক মিলে পলের এবংবিধ আচরণের জন্য কশাঘাত করে এবং তাঁরা শীঘ্র লিষ্ট্রা ও ডার্বিতে চলে যান। এখানেও পল ঐশ্বরিক শক্তি প্রয়োগ করে মহাবিপদে পড়েন। একদিন এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে পল মানবমিত্র ব্যাধি-দুঃখ-পরিত্রাতা খ্রীষ্টের মহিমা কীর্তন করে বলেন—তাঁর আগমনে অন্ধ দৃষ্টি পায়, মূক কথা বলে, খঞ্জ চলে বেড়ায়। পাশেই ছিল এক জন্ম-খঞ্জ। আশায় তার বুক ভরে গেল এবং পলের দিকে করুণভাবে তাকাল। মানবদুঃখে ব্যথিত পলের ভিতর থেকে এক ঐশী শক্তির আদেশ এল: 'ঠিকভাবে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও'। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ভাল হয়ে গেল এবং চলতে শুরু করল। সব লোক পল ও বার্ণবাকে দুই গ্রীকদেবতার আবির্ভাব বলে মনে করল। কিন্তু পল উহার প্রতিবাদ করেন। তখন লোকগুলো রাতের অন্ধকারে পল-কে পাথর মেরে পদাঘাত করে নগরের বাইরে ফেলে এল। বার্ণবা ঐ কথা শুনে নগরের বাইরে রক্তাক্ত পল-কে ধরে উঠালেন। অন্য সঙ্গীরা তাঁর রক্ত ধুয়ে দিল। মৃত্যুপথযাত্রী পলের প্রাণ ফিরে এল। ঐকালে পল দৈববাণী শুনেছিলেন: "আমি দেখাব কি করে আমার নামের জন্য তাকে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়।" পরে তিনি লিখেছিলেন, "এখন থেকে কেউ যেন আমাকে ক্লেশ না দেয়, কারণ আমি যীশুর দাহচিহ্ন (stigmata) নিজের দেহে বহন করছি।" দুরন্ত পল যীশুর কৃপায় মেষশাবকের মত শান্ত হয়ে গেলেন। 'ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল ফিরিয়ে দাও'—যীশুর এ বাণী নিজের জীবনে পালন করলেন।

'ভ্রমণের বর্ষগুলি—শিক্ষালাভের বর্ষগুলি' স্বামীজীর জীবনে বহন করে এনেছিল এমন সব অভিজ্ঞতা যা তিনি শত গ্রন্থপাঠেও লাভ করতে পারতেন না। তীর্থযাত্রীরা মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নির্জন দেবদেউলে বা গিরিগুহায় ভগবানের অন্বেষণ করে। কিন্তু যিনি 'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥'—অনুভব করেছেন তাঁর কাছে নির্জন গিরিগুহা বা জনপদে কোনই

পার্থক্য থাকে না। তাঁর নিজের কথায়: (পরিব্রাজক জীবনে) আমাকে কাজ করতে হবে এই ধারণা আমাকে এই সময়ে যত অভিভূত করেছিল এমন আমার সারাজীবনে আর কখনও হয় নি। মনে হত, কে যেন আমাকে সবলে সেই গুহা হতে গুহান্তরে জীবনযাপন হতে বিরত করে নিয়ে সমতল ক্ষেত্রে বিচরণ করবার জন্য নিক্ষেপ করল।

পলের জীবনীকার পলের প্রচারযাত্রাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—প্রথম যাত্রার কথা বলা হয়েছে; বাকী দুইটি পরে উল্লেখ করা হবে। স্বামীজীর প্রচারযাত্রাকেও আমরা তিন ভাগে ভাগ করব—প্রথম, সমগ্র ভারতবর্ষ (পাশ্চাত্যে যাবার আগে ও পরে), দ্বিতীয়, প্রথম পাশ্চাত্যগমন এবং তৃতীয়, দ্বিতীয় পাশ্চাত্যযাত্রা।

পলের ন্যায় স্বামীজীও দরিদ্রের কুটীর, রাজপ্রাসাদ—সর্বত্র প্রচার করে বেড়িয়েছেন। যুবক-সন্ন্যাসীর প্রতিভায় ও ব্যক্তিত্বে সব লোক মোহিত হয়ে যেত। প্রকৃত প্রচারকের বৈশিষ্ট্য হল হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমন্বয়—উভয়ের জীবনেই ইহা সংঘটিত হয়েছিল। হৃদয়হীন প্রচারকদের জ্রকুটি করে পলের নিজস্ব উক্তি: "যদি আমি মানুষের এবং দূতগণের ভাষা বলি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে তবে আমি শব্দকারী পিত্তল ও ঝম-ঝমকারী করতাল হয়ে পড়েছি।" স্বামী বিবেকানন্দের বুদ্ধি ও বিচারের প্রশংসা করে মিসেস রাইট লিখেছেন, "এই মানুষটি অসাধারণ বুদ্ধিমান, কিভাবে যুক্তি প্রয়োগ করতে হয় জানেন, জানেন কিভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। তাঁকে ফাঁদে ফেলা যায় না। কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে সমর্থ নয়।" কিন্তু আমরা জানি—গিরিশবাবুর মুখে গরীব, অনাথ দুঃখীদের মর্মস্পর্শী কথা শুনে স্বামীজীর বেদবেদান্ত, বিচার সব ভেসে গিয়েছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বুদ্ধির চাইতে হৃদয়ের দ্বারাই তিনি প্রচারের পথ অধিক সুগম করেছেন।

যীশুর মৃত্যুর পর পনের বছরের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটি জায়গায় তাঁর ভাব ছড়িয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের কল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের দশ বছরের মধ্যে তাঁর মহান ভাব সমগ্র ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করল। স্বামীজীর প্রথম যাত্রার প্রথম ভাগ যদিও অজ্ঞাতভাবে হয়েছিল তবুও উহা ছিল শক্তির বিকাশোন্মুখ অবস্থা। আগুন কখনও চাপা থাকে না, প্রতিভা পুষ্পের মত আপনভাবে বিকশিত হয়, উহাকে দাবিয়ে রাখা যায় না; তেমনি ঠিক ঠিক শক্তির পূজারী স্বামীজীর মধ্যে দিব্যশক্তি প্রকাশ পেল। জীবনীকার রোঁলা কবিত্বপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন, "তিনি শক্তির আধিক্যে ভুগছিলেন" আর উহাই প্রকাশ পেল তাঁর নিজের কথায়: "আমি এক দুর্বার শক্তি অনুভব করছি। মনে হয়, আমি বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ব। আমার মধ্যে এত শক্তি আছে, মনে হয়, আমি সমগ্র পৃথিবীকে আমূল বদলাতে পারব।"

ত্যাগ, অগ্নিবৎ পবিত্রতা ছাড়া মানুষকে মানুষ-পদবীতে ভূষিত করা যায় না। সতীত্বই জাতীয় শক্তির উৎস। কুমারী থিক্লা পলের সান্নিধ্যে এসে জীবন পাল্টে ফেললেন, তেমনি বহু ঘটনা আমরা স্বামীজীর জীবনে দেখতে পাই। স্টেলা নামে একজন চিত্রতারকাকে স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে দীক্ষা দেন এবং বালগোপালকে ইষ্টরূপে নির্দিষ্ট করেন। পরে সেই সুন্দরী নারী সাধন-ভজনের জন্য এক নির্জন দ্বীপে চলে যান। মেরী লুই নামে এক ফরাসী রমণীকে তিনি সন্ন্যাস দেন (অভয়ানন্দ)।

ইনি পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত এবং ভক্তি-মার্গের সাধিকারূপে ভারতে এসেছিলেন।

আমরা পলের অলৌকিকভাবে খঞ্জত্ব সারানর উল্লেখ করে এসেছি। ঐরূপ কাজ যীশু-শিষ্য পিটারও করেছেন আর ভগবান যীশুর তো কথাই নাই। স্বামীজীর জীবনেও ঐরূপ ঘটনা ঘটেছে। আলমোড়ায় এক ভূতাবিষ্টের মাথায় জপ করে দেওয়ামাত্র সেরে গেল। আমেরিকায় জনৈকা 'হে-ফিবার' রোগীকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে দয়াপরবশ হয়ে তার হাতদুখানি নিজের হাতের তালুর উপর রাখতে বলেন এবং খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে নিশ্চলভাবে বসে থাকেন। একটু পরেই রোগীর দেহ থেকে জ্বর চলে গেল। কেবল শারীরিক নয়, মানসিক ব্যাধিও সারিয়েছেন বহু লোকের। ইহার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্বন্ধ নাই—তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় এইসব সিদ্ধাইকে তিনি ঘৃণা করতেন। একদিন নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "তোমাদের অবতার ও তাঁর শিষ্যবর্গ যদি সিদ্ধাইগুলো না দেখাতেন, তাহলে আমি তাঁকে আরও বেশী সত্যসন্ধ বলে মনে করতুম। বুদ্ধ এই কাজের জন্য একটি ভিক্ষুর আলখাল্লা কেড়ে নিয়েছিলেন।"

আমরা পলের জীবনে বহু দুঃখকষ্টের কাহিনী উল্লেখ করেছি। 'যে করে আমার আশ, আমি তার করি সর্বনাশ'—এ প্রবাদ-বাক্য নিষ্ঠুর হলেও সত্য। এ জগতে যে যত বড় হয়েছে তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। আর যারা বাধা দিয়েছে, তাদের একখানি সুন্দর ছবি বাইবেলের গীতাংশে আছে: "তাদের কণ্ঠ অনাবৃত কবরস্বরূপ, জিহ্বায় ছলনা, ওষ্ঠাধরে কালকূট, মুখ অভিশাপ ও কটুকাটব্যে পূর্ণ আর চরণ রক্তপাতের জন্য ত্বরান্বিত।" এই সুন্দর গীতিলহরীর প্রতিটি শব্দ স্বামীজীর উপর বর্ষিত হয়েছে। স্বামীজীর দুঃখকষ্টের কথা পড়লে বা শুনলে অজ্ঞানতে নয়নকোণ সিক্ত না হয়ে যায় না। জীবনীকার রোঁলা লিখছেন: "পৃথিবীর যুগব্যাপী দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁর চারিদিকে ক্ষুধিত সামুদ্রিক পক্ষীর মত অহরহ ডানা ঝাপ্টিয়ে বেড়াত।" দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব। মেরীকে একখানি চিঠিতে লিখেছেন, "সারা জীবন' আমি জগতের জন্য খেটেছি, কিন্তু সে জগৎ আমার দেহের একখাবলা মাংস কেটে না নেওয়া পর্যন্ত এক টুকরো রুটিও আমাকে ছুঁড়ে দেয় নি।" একদিন আপনভাবে বলে ফেললেন: "এক সময়ে না খেতে পেয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, মাথার ওপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল তবে হুঁশ হয়েছিল।"

আমাদের ভাগ্য ভাল যে স্বামীজী ৫০ বছর আগে আমেরিকায় যান নি; কারণ প্রসিদ্ধ অজ্ঞেয়বাদী ইঙ্গারসোল বলেছিলেন তাহলে স্বামীজীকে অবশ্যই পাথরের ঘায়ে প্রাণ হারাতে হত। তবে পরীক্ষা স্বামীজীকে দিতে হয়েছে—আর উহা ছিল পাথর অপেক্ষা অধিকশক্তিশালী—বন্দুকের গুলি। ঐ গুলি নির্ভীক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের প্রাণ কাঁপাতে পারে নি, যেমন অসমান পাথরগুলো পলের রক্তপাত ঘটিয়াছে কিন্তু প্রাণ কাঁপাতে পারে নি। কারণ উভয়েরই প্রাণ ছিল সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে নিবেদিত। আমরা একটু আগেই বাইবেলের গীতিতে বাধাদানকারীদের 'ওষ্ঠে কালকূট' উল্লেখ করেছি কিন্তু ও বিষ তো কাব্যিক। হিংসাদ্বেষরূপ বিষে জর্জরিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তি ডেট্রয়েটে স্বামীজীকে কফির সঙ্গে বিষপ্রয়োগে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু ভগবান তাঁর সন্তানকে সদা রক্ষা করেন, তাই তিনি রক্ষা পেলেন।

এ জগতে যাঁরা ভগবান লাভ করেন বা জীবন্মুক্ত হন এবং লোককল্যাণের জন্য ঈশ্বরাদেশে পৃথিবীতে থাকেন তাঁরাও অবিদ্যা-লেশবশতঃ বা বাধিতের অনুবৃত্তিবশতঃ লৌকিক এবং দেশীয় আচার-বিচার সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করতে পারেন না; অবশ্য এতে তাঁদের স্বরূপোপলব্ধির বিঘ্ন হয় না। তাই আমরা যীশুশিষ্য পিটার বা শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য যোগানন্দের ভিতর উহার কিঞ্চিৎ আভাস পেয়ে থাকি। পল ও স্বামীজীরও ঐরূপ দেশকালের আবরণ ছিল, তবে উহা ছিল অত্যন্ত পাতলা কাগজের মত—তাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত উদার এবং অসাম্প্রদায়িক।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি যীশু ও শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা বেশী প্রচার সম্ভবপর ছিল না; তাঁরা জগতে অনন্তভাবরাশি বিতরণ করে গেছেন এবং পরবর্তীকালে শিষ্যেরা ঐসব ভাবের প্রচার করেছেন। এইকালে জেরুসালেমের একদল গোঁড়া ইহুদী খ্রীষ্টান নিজেদের থেকে অন্যজাতীয় খ্রীষ্টানদের (ধর্মান্তরিত) একটু নিকৃষ্ট মনে করতেন এবং বলতেন যে এই মোসাইক আইনের ভিতর দিয়ে না গেলে তাঁরা খাঁটি খ্রীষ্টান হতে পারবেন না। ফলে যীশুশিষ্যদের সভা আহূত হয় এবং পার্থক্য তুলে দেওয়াই সাব্যস্ত হয় এবং প্রমাণিত হয়: মুক্তি আইনের ভিতর দিয়ে আসে না, উহা আসে যীশুর কৃপার ভিতর দিয়ে। পিটার ও পল চললেন আস্তিয়খে। উভয়েই চাইলেন চার্চের অখণ্ডত্ব কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পিটার আইনের কবলিত হয়ে একটু ভুল করে ফেললেন; কিন্তু উদার খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, খ্রীষ্টে আত্মনিবেদনকারী পল বললেন, "খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি, আমি আর জীবিত নই; কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন।" পল ব্যক্তি-প্রচারের চাইতে ভাবের প্রচারের উপর বেশী জোর দিয়ে বলেছেন, "আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত হতে দিও না।"

ঘটনাটি মনে হয় ১লা মে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা-দিবসের একখানি প্রতিচ্ছবি। প্রশ্ন উঠেছিল: সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া, লোকের উপকার করব এরূপ অভিমান করা—এসব বিদেশী ভাব। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল? স্বামীজী প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস? তা হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।" পল যেমন সদা খ্রীষ্টে যুক্ত ছিলেন তেমনি স্বামীজী বহুবার ঐরূপ উল্লেখ করেছেন। ১লা মে তারিখে গিরিশবাবু তাই বললেন, "আমি দেখছি প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। সাদা চোখে দেখছি।" স্বামীজী এক চিঠিতে লেখেন, "আমার মত অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল।"

অন্যায় অত্যাচার না হলে হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তঃস্থলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না। শুরু হল পলের দ্বিতীয় যাত্রা। বার্ণবা ও তাঁর ভাইপো মার্ক থেকে পৃথক হয়ে পল চললেন পশ্চিমাভিমুখে—রোম ও স্পেনের দিকে। সঙ্গে চললেন পিটারের অনুরক্ত শিষ্য সিরিয়া ও কিলিকিয়া হয়ে তাঁরা ডার্বি ও লিস্ট্রায় পৌঁছুলেন। খ্রীষ্টের জন্য পলের দুঃখ-ভোগ সত্যই অবর্ণনীয়। পলের প্রব্রজ্যাকালীন দুঃখকষ্টের কথা তিনি করিন্থীয়দের একখানি পত্রে লিখেছেন, "আমি পরিশ্রমে অতিমাত্ররূপে, কারাবন্ধনে ও প্রহারে অতি নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িত হয়েছি। আর মৃত্যু ছিল সদা

আমার শিয়রে। ইহুদীদের কাছে পাঁচবারে উনচল্লিশ আঘাত খেয়েছি। তিনবার আমায় ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়েছে আর প্রস্তর ছুঁড়ে একবার। তিনবার জাহাজডুবির কবলে পড়েছি আর অগাধ জলে এক দিবারাত্র ছিলাম। যাত্রায় অনেকবার নদীসংকটে, দস্যুসংকটে, স্বজাতিঘটিত সংকটে, পরজাতিঘটিত সংকটে, নগরসংকটে, মরুসংকটে, সমুদ্রসংকটে, কপট ভাইদের কাছ থেকে, পরিশ্রমে ও আয়াসে, অনিদ্রায়, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, শীতে বিবস্ত্রে কাটিয়েছি। এসব বাহ্য বিষয় ছাড়াও একটা চিন্তা অহরহ আমায় ঘিরে ছিল—তা হচ্ছে সমস্ত চার্চের তত্ত্বাবধানের গুরুভার।"

তারপর পল ও সীল মিলিত হয়ে ত্রোয়াতে গেলেন এবং দৈবদর্শন পেলেন—একজন ম্যাসিডোনিয়ান পুরুষ তাঁদের ম্যাসিডোনিয়ায় আমন্ত্রণ করছে। তাঁরা ত্রোয়া থেকে জলপথে নেপল্‌ হয়ে ফিলিপীতে পৌছুলেন—উহাই ছিল ম্যাসিডোনিয়ার একটি প্রধান নগরী। এখানে একদিন নদীতীরে প্রার্থনাকালে একজন মহীয়সী বিদুষী ধনবতী নারীর সহিত তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। ইনি (লিডিয়া) ছিলেন রাজপোষাক-বিক্রেত্রী কিন্তু ধার্মিক। তিনি পলের কাছ থেকে খ্রীষ্টে দীক্ষা নেন এবং তাঁদের বাসের জন্য নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানান। এখানেও এক অঘটন ঘটে। এখানে এক দৈবজ্ঞা ভূতাবিষ্টা রমণী অপরের ভাগ্যকথনের দ্বারা তার প্রভুদের বিস্তর অর্থাগমে সাহায্য করত। একদা পল যীশুর নামে ঐ আবিষ্ট আত্মাকে বের হয়ে যেতে আদেশ দেন এবং সে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। বস্‌! আর যাবে কোথা? পল ও সীলকে ধরে নিয়ে লোকগুলো বিচারকের কাছে হাজির হল—তারপর বেত্রাঘাত, অত্যাচার ও কারাগারে নিক্ষেপ। মধ্যরাত্রে পল ও সীল প্রার্থনাসঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন। হঠাৎ তুমুল ভূমিকম্প। ভীত হয়ে কারারক্ষীগণ ও বিচারকগণ উভয়কে মুক্তি দিলেন; কয়েদ-রক্ষীর স্ত্রী অভুক্ত বন্দীদ্বয়কে খেতে দিল। তাঁরা লিডিয়ার ঘরে ফিরে এলেন। ইহাই ছিল ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের প্রথম পর্বের ইতিহাস।

ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যাবে যে প্রচারশীল ধর্মে নারীদের অবদান কতখানি! কামিনীকাঞ্চনত্যাগী পলের জীবনে দারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যেও এই সব মহীয়সী কতভাবে সাহায্য করেছেন, তার একটু ইঙ্গিত করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব। একটু আগেই আমরা লিডিয়ার আদর-আপ্যায়নের কথা বলেছি। নারীদের প্রতি পলের ছিল অপরিসীম । তিনিই প্রথম জনৈকা বিদুষীকে প্রচারে নিযুক্ত করেন। রুফুর মাকে তিনি আপন মা বলে মনে করতেন। ধনী ব্যবসায়ী ফিলমনের স্ত্রীকে পত্রে শ্রদ্ধা-প্রীতি জানাতে ভুলতেন না। গৃহকর্মে নারীদের অবদান, বিধবাদের মুক্তহস্তে চার্চকে অর্থদান সব বিষয় তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন।

আমরা স্বামীজীর প্রচারপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। এও সমুদ্রযাত্রা। অজানাদেশে অজানাদের কাছে সনাতন বাণী বহন করে নিয়ে চললেন স্বামীজী। 'আমি এখানে মেরীমাতার পুত্রের বংশধরগণের মধ্যে এসেছি; প্রভু যীশু আমাকে সাহায্য করবেন'—এই মর্মে পৌছ-সংবাদ এল ভারতে। দেশ-কালের অতীত সন্ন্যাসীর সকল দেশই তাঁর স্বদেশ, সকল মানুষই তাঁর স্বজন। স্বামীজীর দুঃখকষ্টের কথা আমরা পূর্বে বহু উল্লেখ করেছি কিন্তু তুলনামূলক প্রবন্ধ বলে এখানে মাত্র একটি ঘটনার অবতারণা করছি: জনৈক

বাল্যবন্ধু এসে একদিন স্বামীজীকে বলেন, "স্বামীজী, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলতে, 'বে করব না, আমি কি হব দেখবি'। তা যা বলেছিলে তাই করলে।" স্বামীজী—"হ্যাঁ ভাই, করেছি বটে। তোরা তো দেখেছিস খেতে পাইনি, তার উপর খাটুনি। বাপ্, কতই না খেটেছি! আজ আমেরিকানরা ভালবেসে এই দেখ কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে। দুটো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে শুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাঁচি।" ঘটনাটি ছোট কিন্তু উহার সারমর্ম হচ্ছে—অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে অকালে অন্তর্ধান। (ক্রমশঃ)

"কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোকশিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন। তাঁরা বীরপুরুষ।"

"নারদাদি আচার্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরও ভক্তি লয়ে ছিলেন।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সমালোচনা

Vivekananda—A Biography in Pictures—Published by Swami Chidatmananda, President, Advaita Ashrama, Himalayas. Calcutta Office: Advaita Ashrama, 5 Debi Entally Road, Calcutta 14. Printed on Thick Foreign art paper; Size $11\frac{1}{8}'' \times 8\frac{3}{4}''$; Price: Thirty rupees.

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মশত-বার্ষিকীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মহাজীবন অনুধ্যানের জন্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইলেও জীবনচরিতসহ একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র-পুস্তকের বিশেষ অভাব ছিল। সম্প্রতি অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় সে অভাব দূর হইল। বিভিন্ন সময়ে ও পরিবেশে তোলা ফটো, বিশেষ ঘটনা-সংক্রান্ত চিত্র, স্বামীজী-সংক্রান্ত বহু স্থানের ছবি এবং স্বামীজীর সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের চিত্র এবং তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা-দিগের চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বামীজী সম্বন্ধে এ যাবৎ যতগুলি ছবি পাওয়া গিয়াছে, সবই দেওয়া হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত একটি পূর্বে অপ্রকাশিত চিত্রও গ্রন্থের শোভা-বর্ধন করিয়াছে।

আটটি অধ্যায়ে ১৬২টি চিত্র কালানুক্রমে সন্নিবেশিত, প্রত্যেক চিত্রের পার্শ্বে আছে স্বামীজীর রচনা বা বক্তৃতাংশ বা তাঁহার অনবদ্য জীবনের ঘটনা-বিশেষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে স্বামীজীর জীবন-বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। স্বামীজী সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যদর্শন দিয়া গ্রন্থখানি আরম্ভ করা হইয়াছে। গ্রন্থের শেষাংশে পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে রামকৃষ্ণ-আন্দোলন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় এবং যুগাচার্যের মহাজীবন-পঞ্জী। কয়েকটি চিত্র সম্বন্ধে মূল্যবান মন্তব্যও সন্নিবেশিত। সময় ও ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হওয়ায় স্বামীজীর সমগ্র জীবনীটি মানস-পটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। উৎকৃষ্ট কাগজে শোভন মুদ্রণ, সুন্দর বাঁধাই প্রভৃতি চিত্রপুস্তকের যেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেগুলি ত্রুটিবিহীন হওয়ায় গ্রন্থখানি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছে। পুস্তকখানি গ্রন্থাগারে ও শিক্ষায়তনগুলিতে সংরক্ষণযোগ্য।

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা (শ্লোকের অন্বয়, অন্বয়ার্থ ও পাদটীকাসহ বঙ্গানুবাদ): স্বামী ধীরেশানন্দ কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত। প্রকাশক—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ১৪৩; মূল্য দুই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণমঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রীধীরেশানন্দজী মহারাজ-প্রণীত 'বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা' নামক পুস্তকটি পাইয়া, আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে উহা পাঠ করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম। স্বামীজী 'বেদান্ত-সংজ্ঞা-প্রকরণম্' এবং স্বামী স্বরূপানন্দজী-প্রণীত 'আর্ষ-সংজ্ঞাবলিঃ' পুস্তকদ্বয় হইতে এই গ্রন্থের মূল সংস্কৃত-শ্লোকগুলির সংকলন করিয়া বঙ্গ-ভাষায় উহার অনুবাদ ও নানা বেদান্ত-গ্রন্থের সাহায্যে উহার সরল ও সুখবোধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে —"আচার্যবান্ পুরুষো বেদ" অর্থাৎ 'আচার্যবান্

পুরুষই বেদান্ত-রহস্য অবগত হইতে পারেন।' অদ্বৈত-বেদান্তশাস্ত্রে অভিজ্ঞ প্রত্যেক সুধী ব্যক্তির নিকটই এই পুস্তক আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাখ্যা সর্বত্রই ভগবান্ ভাষ্যকারের এবং অন্যান্য অদ্বৈত-মার্গাবলম্বী বেদান্তাচার্যগণের মতের অনুকূল। কোথাও গ্রন্থকার আধুনিকতার অনুরোধে শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করেন নাই—সেইজন্য এই পুস্তকের মহত্ত্ব ও গৌরব আরও অধিক। গ্রন্থকার নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত ও সূক্ষ্ম-চিন্তাশীল। তিনি এই গ্রন্থে বেদান্তের অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা ও সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি দ্বৈতবাদী শাস্ত্রসকলের অদ্বৈতমতের সঙ্গে বিরোধ নাই। পরন্তু ঐ সকল শাস্ত্র অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে উঠিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন—সুতরাং অদ্বৈত-বাদের সহিত ঐ সকল শাস্ত্রের সম্বন্ধ বিরোধের নয়, পরিপূরকের। সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ এই গ্রন্থ সুযোগ্য গ্রন্থকার দ্বারা সংকলিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হওয়ায় ইহার উপযোগিতা বাড়িয়াছে।

বাংলা ভাষায় বেদান্ত-শিক্ষার্থিগণের নিকট বেদান্তের পরিভাষা-সমূহের জ্ঞাপক এরূপ এক-খানি গ্রন্থের এতদিন অভাব ছিল। ধীরেশানন্দ-জীর প্রচেষ্টায় উহা দূর হইল, সুতরাং তিনি ধন্য-বাদার্হ। যাঁহারা বেদান্তের চর্চা ও আলোচনা করেন এবং সংক্ষেপে বেদান্তের সারমর্ম অবগত হইতে চান তাঁহাদের প্রত্যেকেই, এই গ্রন্থ নিকটে রাখিলে লাভবান হইবেন। বেদান্তের পদার্থসমূহের সংজ্ঞানির্ণয়-বিষয়ে এই স্বল্পায়তন পুস্তকখানি অভিধানের কাজ করিবে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

—অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়

মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ ; বিশ্বমাতা সারদা ঃ শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী। জয়া প্রকাশনী, ১১এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭। পৃঃ ১০৬ ও পৃঃ ৯১। মূল্য ঃ ২৲ ও ১.৫০।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে সাধক-মহা-পুরুষদের জীবনীরচনার দিকে নতুন করে ঝোঁক দেখা দিয়েছে। উপন্যাসোপম জীবনী থেকে নিরপেক্ষ বিচারসহ জীবন-মূল্যায়ন—সব ধরনের প্রচেষ্টাই সমর্থনীয়—যদি মূল আদর্শটি বজায় থাকে। সুখের বিষয়, শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী তাঁর প্রথম দুটি ক্ষুদ্র জীবনী পর্যালোচনা প্রচেষ্টায় আন্তরিক শ্রদ্ধার সাহিত্যশোভন প্রকাশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর অমৃতময় জীবন-কাহিনীর মূল ভাবসৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এ জাতীয় জীবনী রচনায় অলৌকিক কাহিনী সন্ধানের প্রবণতা ত্যাগ করে বরণীয় আদর্শ-বাদকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথম প্রয়াস হিসাবে এ জীবনীদুটি সাধুবাদের যোগ্য। কিন্তু বাংলা ও ভারতের এমন আরো অনেক অধ্যাত্ম-সাধক আছেন, যাঁদের জীবনকাহিনী পাঠক-সমাজে স্বল্পপরিচিত। লেখক তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের প্রেরণায় সেই সব জীবন সম্বন্ধে গবেষণায় ব্রতী হলে জীবনী-সাহিত্যের অপরিমিত সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

'বিশ্বমাতা সারদা' গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় 'গোপালের মা' স্থলে 'গোলাপ মা' ভুলটি আশু সংশোধনযোগ্য। ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)—শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়। বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী-১ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা যথাক্রমে ২৯৩+৩০ ও ১৫১+১৪৯+৩০।

ইতঃপূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান তৃতীয় খণ্ডে গীতার তৃতীয় অধ্যায় (কর্মযোগ) এবং চতুর্থ খণ্ডে একাদশ (বিশ্বরূপদর্শনযোগ) ও ত্রয়োদশ অধ্যায় (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ) স্থান পাইয়াছে। এই খণ্ডদুইটিতেও প্রায় ষাটখানি গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে এবং উপনিষদ্ মহাভারত ও বহু গ্রন্থ হইতে গৃহীত উদ্ধৃতিসহ বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গীতা সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিমত একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় পূর্বপ্রকাশিত খণ্ডদুইটির ন্যায় বর্তমান গ্রন্থদ্বয়ও সুধীজনের তথা সর্বস্তরের পাঠকগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কর্ণ-কুন্তী—রচয়িতা ও প্রকাশক: বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার, ১৯ রমানাথ ভট্টাচার্য স্ট্রীট, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৮৬; মূল্য ২.৭৫।

কর্ণ ও কুন্তী—মহাভারতের অন্যতম এই দুই প্রসিদ্ধ চরিত্র অবলম্বনে বহু গ্রন্থ রচিত হইলেও আলোচ্য কাব্যগ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। রচয়িতার নিজস্ব অভিমত: "কর্ণ-কুন্তীর মত চরিত্রের আবেদন শুধু পুরাবৃত্তের পারধিতে সীমিত নয়, তার মধ্যে শাশ্বত মানবীয় অনুভূতিও বর্তমান; অলৌকিক দৈবলীলার সঙ্গে মানবীয়তা সেখানে ওতপ্রোত। কর্ণের সংগ্রামশীল জীবনের ট্র্যাজেডিও তাই মানব-জীবনের ট্র্যাজেডি। কুন্তীর আকুতি ও মমতা-মূর্ছনাও তাই ব্যক্তিগত ও সেকালীন নয়, তা সর্বকালীন।"

উল্লিখিত মন্তব্যটিকে পরিস্ফুট করিবার সার্থক প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় গ্রন্থখানিতে। ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্যে চরিত্র-চিত্রণ অনবদ্য হইয়াছে। কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য ঘটিলেও ভাষায় আড়ষ্টতা নাই। বিদ্যার্থীদের হাতে তুলিয়া দিবার মত বইখানি যোগ্য সমাদর লাভ করিবে মনে হয়।

অনুভূতির পরশ ও আলেখ্য (কাব্য-গ্রন্থ)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশক: শ্রীভাস্কর রায়, ১৮০ বেচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৩৪। পৃষ্ঠা ১১৭; মূল্য আড়াই টাকা।

কবিতা প্রাণের জিনিস। অন্তরের ভাবধারার স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দোবদ্ধ প্রকাশই কবিতা। গ্রন্থে প্রকাশিত অধিকাংশ কবিতা সম্বন্ধে একথা বলা চলে। গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে কবিতাগুলির অসঙ্গতি দেখা যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মুখবন্ধে লিখিয়াছেন:

"'অনুভূতির পরশ' কাব্যগ্রন্থখানি নানা দিক দিয়া বিশেষত্বপূর্ণ। ইহার প্রথম বিশেষত্ব এই যে ইহা আধুনিক যুগের গতানুগতিক কবিতা-রচনার ধারায় রচিত নহে; এমনকি, ইহাতে যে প্রাচীন কোন ধারাও অন্ধভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে তাহাও নহে। কবি এখানে প্রত্যক্ষ লোককে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া অপ্রত্যক্ষ কল্পলোকে অভিসার করিয়াছেন তাহাও নহে। ইহাতে বাস্তব জীবনের রূঢ়তা একদিক দিয়া যেমন কবিচিত্তকে আঘাত করিয়াছে আবার তাহার সঙ্গেই আধ্যাত্মিক প্রশান্তি তাঁহার মনের অনেকখানি আসন জুড়িয়া রাখিয়াছে।"—আমরাও ইহা সমর্থন করি।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা: মরীচিকা, পঞ্চবটী, ভগবান শঙ্করাচার্য, কামারপুকুর।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১৮ই মাঘ (১.২.১৯৬৭) বুধবার কৃষ্ণা সপ্তমীতে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৫তম জন্মতিথি-উৎসব সারাদিন বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দে ও উৎসাহে উদ্‌যাপিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভের পর বেদপাঠ, ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর ষোড়শোপচার পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যা, কালীকীর্তন, হোম ও বিশেষ ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ও তাঁহার ঘরটি পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারী যুগাচার্য স্বামীজীর উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পূর্বপার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় স্বামী চিদাত্মানন্দ সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অমলেন্দু বসু ইংরেজীতে ভাষণ দেন। কৈশোরে পাঠ্যাবস্থায় স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী দ্বারা তিনি কিরূপ প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করিয়া বলেন, প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে স্বামীজীর বাণীর যে কত প্রয়োজন আজ তাহা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। অতঃপর বারাসত সরকারী মহা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার যুগপুরুষ স্বামীজীর বহুমুখী জীবনের বিভিন্ন দিক সাবলীল ভাষায় যুগোপযোগী আলোচনা করিয়া উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দেন। স্বামী চিদাত্মানন্দ অল্পক্ষণ হিন্দীতে ও পরে বাংলায় বলেন। সভাপতির সময়োপযোগী ভাষণে পরিস্ফুট হয় যে, স্বামীজীর আদর্শ আমাদের জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

উদ্বোধনে—শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে ৩রা মাঘ (১৭.১.৬৭) মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্য দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভোগরাগ ও ভজন হইয়াছিল। প্রাতঃকালে রহড়া আশ্রমের ছাত্রবৃন্দ সুন্দর ভজন করে। বহু ভক্ত পূজ্যপাদ মহারাজের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। বেলুড় মঠ এবং কলিকাতাস্থ ও পার্শ্ববর্তী আশ্রমগুলি হইতে শতাধিক সাধুর সমাগমে উদ্বোধন-কার্যালয়ে এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীঅনাথ বসুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করে।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা

গত ২৬শে জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নব-নির্মিত মর্মরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্বদিন, ২৫শে জানুআরি শ্রীমূর্তির অধিবাসাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ২৬ তারিখ সকাল ৭-৪৮ মিনিটের সময় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর-বিগ্রহে এবং পরে বেদীতে রক্ষিত শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে অর্ঘ্য প্রদান করেন। বেলুড় মঠ ও স্থানীয় সব আশ্রম হইতে বহু সাধু এবং কয়েকশত ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচার পূজা ও হোমাদি সুসম্পন্ন হয়। মন্দিরের পাশে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি মনোরম পীঠ নির্মিত হইয়াছিল। সেখানে কাশী হইতে আগত পণ্ডিতগণ বাস্তুপূজাদি ও রুদ্রযাগ সুসম্পন্ন করেন। পূজা-যজ্ঞাদি আনন্দোৎসবে সারাদিন আশ্রম মুখরিত ছিল, একটি শান্ত গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল। সারাদিনে প্রায় সাড়ে চার হাজার ভক্তসমাগম হয়।

এই আনন্দোৎসব উপলক্ষে মন্দির ও আশ্রম অতি মনোরম সজ্জায় সুসজ্জিত করা হয়। অধিবাস ও মন্দিরের পূজাদি করেন স্বামী হিতানন্দ ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ। প্রসাদ হাতে হাতে দেওয়া হয়। মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীমণি পাল।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদধূলিপূত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবশেষের একাংশ এই মন্দিরে রক্ষিত; ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমাধিতে লীন হইবার সাতদিন পর, ২৩শে আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের এই উদ্যানবাটীতে উহা সমাধিস্থ করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তগণ প্রায় সকলেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পরে উহারই উপর মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান শাখাকেন্দ্ররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, উদ্বোধনের নূতন বাড়ীর ভিত্তিস্থাপন

গত ১৭ই জানুআরি মঙ্গলবার পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি-দিবসে সকাল ১০টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ উদ্বোধনের নূতন বাড়ীর ভিত্তিস্থাপন করেন। বেলুড় মঠ ও স্থানীয় আশ্রমগুলি হইতে বহু সাধু এবং বহু ভক্ত ভিত্তিস্থাপন-উৎসবে যোগদান করেন।

পরিকল্পিত নূতন বাড়ীর জন্য শ্রীশ্রীমায়ের বাটী বা উদ্বোধন অফিসের সন্নিকটে নয়ানকৃষ্ণ সাহা লেনের উপর একখণ্ড নূতন জমি (প্রায় ১২'৫ কাঠা) ক্রয় করা হইয়াছে। এই দিন এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও বেদপাঠাদি করা হইয়াছিল। পরে হাতি-বাগান দীনসঙ্ঘ কর্তৃক কালীকীর্তন ও সিকদার বাগান সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাভিনয় এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

পরিকল্পনানুসারে বাড়িটি জমির ১৪০' × ৪০' স্থান জুড়িয়া নির্মিত হইবে এবং চারতলা হইবে; একতলায় উদ্বোধন অফিস, দোতলায় লাইব্রেরী ও তেতলায় বক্তৃতা-গৃহ হইবে।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বারাণসীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে ১৯৬৬-২৬শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৬৭-৮ই জানুআরি পর্যন্ত শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বার্ষিক আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসব-পক্ষটিতে ১লা জানুআরি কল্পতরু-উৎসব এবং ৬ই জানুআরি মহাপুরুষ মহারাজের তিথিপূজাও উদ্‌যাপিত হয়। উভয় দিনই সমবেত জনসভায় আশ্রমাধ্যক্ষ

স্বামী অপূর্বানন্দ ভাষণ দেন। ২৬শে ডিসেম্বর হইতে পর পর ৬ দিন বৈকালিক আলোচনা-সভায় স্বামী ঈশানানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-কথা আলোচনা করেন; শেষ পর্যায়ে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত।

৩রা জানুআরি শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজার দিন পূজাপাঠ, ভজনকীর্তন, আলোচনাদি হয়। সকালে স্বামী ভাস্বরানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনা করেন। মধ্যাহ্নে কয়েক শত দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী ঈশানানন্দ।

৪ঠা ও ৫ই জানুআরি বৈকালে শ্রীঅমূল্য কুমার চক্রবর্তী রামায়ণ গান ও মাথুর কীর্তন করেন।

৮ই জানুআরি রবিবারে অনুষ্ঠিত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী শোভারানী বসু। এই সভায় প্রঃ ডাঃ কুমারী ভক্তিসুধা মুখার্জী সংস্কৃতে, প্রঃ কুমারী কৃষ্ণা ব্যানার্জী ইংরেজীতে, প্রঃ ডাঃ কে. পি. সিং হিন্দীতে এবং স্বামী অপূর্বানন্দ বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। ঐ উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে সংস্কৃত, ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় রচনা-প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রায় ছয়শত টাকার মূল্যবান ধর্মগ্রন্থের ১৪৭টি পুরস্কার বিতরিত হয়।

সভান্তে স্থানীয় সেতারশিল্পী শ্রীশঙ্কর ব্যানার্জী যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ময়মনসিংহ: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা জানুআরি (১৮ই পৌষ) মঙ্গলবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ১১৪তম জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি হইয়াছে। বৈকাল ৩টায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী বকুলরানী চক্রবর্তী। সুরে চণ্ডীপাঠ ও অন্যান্য ভক্তিমূলক গানের পর শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ পঠিত হয়। শ্রীমতী ছন্দা রায় প্রভৃতির প্রবন্ধ পাঠ ও শ্রীমতী শাশ্বতী নাগের আবৃত্তির পর বক্তৃতা দেন অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সরকার ও শ্রীমতী সুস্মিতা হোম রায়। সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। প্রায় দুই হাজার লোককে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৩রা জানুআরি হইতে ৬ই জানুআরি পর্যন্ত ৪ দিন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৩রা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা হোম ভোগ ও প্রসাদবিতরণ বেদপাঠাদি হইয়াছে। সন্ধ্যায় আরতির পর গীতিকা-শিল্পীগোষ্ঠী 'মমতাময়ী মা সারদা'গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। অন্যান্য দিন সঙ্গীতানুষ্ঠান, পাঠ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনা হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বিহারে এবং উত্তরপ্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের খরা-ত্রাণ-কার্য পুরাদমে চলিতেছে। উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় মাউ ও কারউই তহশীলে এবং বিহারে হাজারীবাগ জেলায় ইটখোরীতে ও মুঙ্গের জেলায় চকাই ও ঝাঝা অঞ্চলে ১৫.১.৬৭ পর্যন্ত ৪,৫৬০ টি পরিবারের ১০,৮০৭ জনকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে:

চাল ১০,২৩১ কেজি, গম ১১,৭৫০ কেজি, মাইলো ৪,৯৭০ কেজি, ধুতি ৮৭৭ খানি, শাড়ি ২,১৫৭ খানি, চাদর ২৪৮ খানি, কম্বল ১,৯৩৬টি। অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি (নূতন এবং পুরাতন) ১,৮২৭ খানি, জমানো দুধ ও ভিটামিন-ট্যাবলেট।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স করপোরেশন রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে দুর্গত জনগণের মধ্যে খরা-ত্রাণ-কার্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা ঔষধ, কম্বল, গরম জামা, চাদর প্রভৃতি, টিনে-ভরা সবজি-জাতীয় খাদ্য, দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বিমানযোগে প্রেরণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিদিগের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে, বিমানযোগে পাঠাইতে হইলে দ্রব্যসমূহের প্যাকেটগুলির প্রত্যেকটি যেন ২´×২´×২´ মাপের চেয়ে বড় না হয়।

কার্যবিবরণী

কলম্বো: সমুদ্রতীরের সন্নিকট রামকৃষ্ণ রোডের উপর অবস্থিত সিংহল শাখার প্রধান কর্মকেন্দ্র কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণী (১৯৬৪, এপ্রিল—১৯৬৬, মার্চ) আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই আশ্রমে নিয়মিত পূজাপাঠ, সাময়িক উৎসব, ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে তামিল ও ইংরেজীতে ক্লাস ও আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি রবিবার ধর্ম-ক্লাস করা হইতেছে; ১৫টি শিশু লইয়া ইহা আরম্ভ করা হয়, বর্তমানে ৫৫০টি শিশু ক্লাসে যোগদান করে; ১৮ জন অবৈতনিক শিক্ষক এই কার্য পরিচালনা করেন।

গ্রন্থাগারে ২,৪৩০ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক রাখা হইয়াছে; পাঠাগারে ৮টি দৈনিক এবং ২৭টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। কলম্বো হইতে ১৮০ মাইল দূরে কাতারাগামায় সপরিসর রামকৃষ্ণ-মণ্ডমে (ধর্মশালা) তীর্থযাত্রীদিগকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সাহায্য করা হইয়া থাকে। এখানে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ জনের অধিক এবং শনি-রবিবার গড়ে প্রায় ৭০০ জন আশ্রয়-প্রার্থী তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষে জুলাই-আগস্ট মাসে বার্ষিক 'ইসালা' (Esala) উৎসবে ১৭ দিন পর্যন্ত প্রায় ১২,০০০ তীর্থযাত্রীকে বিনামূল্যে আহার্য ও ২০,০০০ লোককে সরবৎ দেওয়া হয়।

বাট্টিকালোয়া আশ্রমের উদ্যোগে জেলখানার কয়েদীদিগকে ও কুষ্ঠাশ্রমে ১০০ জন রোগীকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কালাডি-উপ্পোদাই-এ বালকদের জন্য একটি অনাথাশ্রম এবং আনাইপন্থী ও কারাইতিভূ-তে বালিকাদের জন্য দুইটি অনাথাশ্রম পরিচালিত হইতেছে। এই অনাথাশ্রমগুলিতে মোট ১২৫ জন শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করিয়াছে; তন্মধ্যে ৬০ জন বালিকা। বাট্টিকালোয়া কেন্দ্র কর্তৃক একটি শিশু-বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, এখানে ৪০০টি শিশু পড়াশুনা করে।

কলম্বো হইতে ২৮ মাইল দূরে ওয়াথুপিটি-ওয়েলা ট্রেনিং স্কুলে অপরাধপ্রবণ যুবকদিগকে সংশোধনমূলক ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়।

কলম্বো কেন্দ্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক কৃষ্টি-ভবন ও ছাত্রাবাস, অতিথি-নিবাস প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করা হইয়া থাকে।

আমেরিকায় বেদান্ত

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া:—স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি: অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ; সহকারী: স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল:

জুলাই, ১৯৬৬: স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় কি করিয়াছিলেন?

সেপ্টেম্বর, '৬৬ : মানুষের ডাকে ঈশ্বরের সাড়া; শাশ্বতশিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ; 'আমার সান্নিধ্যে তোমরা পবিত্র হইবে'; গুরু ও শিষ্য; ধর্ম—গঠন-শক্তি।

অক্টোবর, '৬৬ : দৈবী সত্তা ও চেতনার রূপান্তর; দ্বিতীয় জন্ম; স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক মূল্য; মৃতদের কি হয়? হিন্দুধর্মে মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা; 'ঈশ্বরকে দেখা যায়'; মনের দুইটি মুখ; 'শর-বৎ তন্ময়তা'।

নভেম্বর, '৬৬ : অতীন্দ্রিয়বাদে সুস্থ অগ্রগতি; আত্মশক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়? ব্যক্তিগত ধর্ম; মানবের ঐশী রূপ এবং মানব-রূপে ঈশ্বর; অনন্তকে হাতের মুঠোয় ধরা; অচেতনকে পবিত্র করিবার উপায়; আমাদের নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করা; বিশ্বতত্ত্বানুভূতি; ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দ।

পুরাতন মন্দিরে 'অবধূত-গীতা' আলোচিত হয়।

বক্তৃতা-সফর

গত ২৯.১.৬৬ হইতে ২৬.৬.৬৬ পর্যন্ত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন :

বিষয়	স্থান
রোঁম্যা রোলঁ্যা শতবার্ষিকী	থিয়জফিক্যাল সোসাইটি, বোম্বাই
মনুষ্যজীবনের চরমলক্ষ্যে কিরূপে পৌছান যায়?	রিজরোড, মালাবার হিল
স্বামী বিবেকানন্দ	ধর্মনগর বিদ্যার্থী ভবন, আমেদাবাদ
স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব	খার, বোম্বাই
ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মের স্থান	প্রার্থনা-সমাজ, বোম্বাই
স্বামী বিবেকানন্দ ও সেবা	সুরক্রিজ হল, কলিকাতা
সনাতন ধর্ম	শিবমন্দির, বাটানগর
শ্রীরামকৃষ্ণ	ইছাপুর
সনাতন ধর্ম আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়?	বাটানগর
শ্রীরামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ	কালিয়া কলোনী, বারাকপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ	চিত্তরঞ্জন, কসবা
শ্রীরামকৃষ্ণ	রাজপুর, যাদবপুর
বর্তমান ভারতে ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের দান	শিবপুর, হাওড়া
	মধ্যমগ্রাম
বেদান্ত	অ্যাকাডেমিয়েন টিবুরিনা, লুভার, রোম
যে সকল সাধু-মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছি	রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র, গ্রেজ, ফ্রান্স
মহাপুরুষদের স্মৃতি	
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শান্তি ও সমন্বয়ের বাণী	কিংসওয়ে হল, লণ্ডন
বেদান্তের বাণী	রামকৃষ্ণ আশ্রম, ৫১, হল্যাণ্ড পার্ক, লণ্ডন

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৩০শে জানুআরি, ১৯৬৭ রাত্রি প্রায় ১১ টা ৪৫ মিনিটের সময় স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ (শশী মহারাজ) ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি বহুকাল যাবৎ হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য কয়েকবার রাঁচি সানাটোরিয়ামে ছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া তিনি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন।

কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বালিয়াটী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও চণ্ডীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার তিরোধানে মঠ-মিশনের একজন সরল এবং অমায়িক স্বভাব-সম্পন্ন সন্ন্যাসীর অভাব ঘটিল।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর: গত ১৮ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে এখানে বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠের আয়োজন হইয়াছিল। ভোরে মঙ্গলারতির পর দেবীসূক্ত-পাঠ ও ভজনাদির দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। মঠপ্রাঙ্গণে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পত্রপুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন আশ্রম ও বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রীগণ কর্তৃক গীত-ভজন একটি বিশেষ ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। বেলা দশটায় প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। অপরাহ্নে প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা 'মায়ের কথা' হইতে পাঠ করিয়া শোনান। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত প্রায় ২০০০ ভক্ত মহিলার সমাগম হয়। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনের পর রাত্রি ৯টা পর্যন্ত কালীকীর্তন হইয়াছিল।

নব বারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ১৫ই জানুআরি '৬৭ রবিবার শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর চতুর্দশাধিক-শততম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্বামী জীবানন্দ। প্রধান অতিথি তাঁহার ভাষণে সমাজের বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনাদর্শ অনুসরণের জন্য নারীসমাজকে আহ্বান জানান।

সভাপতি মহোদয়ও তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীমার আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সভান্তে পরিষদ-সভাপতি ডঃ মহেন্দ্র চন্দ্র মালাকর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

চাঁদপুর: গত ১লা জানুআরি হইতে ৪ঠা জানুআরি পর্যন্ত চাঁদপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে মহাসমারোহে কল্পতরু-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী, সাধুসন্ন্যাসী এই উপলক্ষে আশ্রমে সমবেত হন। শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী মহাশয় এবং আরো অনেকে তিন দিনের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী মহারাজজীর ভাবধারা সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দান করেন। চতুর্থ দিনের মহোৎসবে প্রায় দশ হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

জালিয়া সারদা সঙ্ঘ: গত ১৮ই পৌষ শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত তেলো-ভেলোর মাঠসংলগ্ন ডাকাতে-কালীর প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসব পালিত হইয়াছে।

স্থানীয় ভক্তগণ, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন, দরিদ্রনারায়ণসেবা উৎসবের অঙ্গ ছিল।

পরলোকে গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থভক্ত 'বেলঘরিয়ার তারক'-এর পুত্র গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় গত ২২শে ডিসেম্বর প্রায় ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি ব্লাড্-প্রেসার ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন।

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বেলঘরিয়াস্থ পৈতৃক ভবনেই তিনি বাস করিতেন। তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বাল্যকালে পিতা তারকনাথ

মুখোপাধ্যায়ের সহিত বেলুড় মঠ, কাশী প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতকালে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের দুর্লভ সঙ্গ ও আশীর্বাদ লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। বিবাহের চারিবৎসর পর একটি কন্যাসন্তান রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী গতাসু হন। তাহার পর হইতে তাঁহার জীবনের উপর দিয়া শেষ দিন পর্যন্ত একের পর এক বহুবিধ দুর্যোগ বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া সর্বাবস্থায় অবিচলিত চিত্তে সবকিছুকেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা বলিয়া হাসিমুখে বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন এরূপ বিশ্বাস ও শ্রীভগবানে নির্ভরশীলতা খুব কমই দেখা যায়।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

পঙ্গপালের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক অভিযান

সম্প্রতি লণ্ডনের অ্যান্টি-লোকাস্ট রিসার্চ সেণ্টারের গবেষণায় ভবিষ্যতে পঙ্গপাল দমন করা সম্ভব হইবে এমন আশা পাওয়া গিয়াছে। যে সমস্ত গাছ খাইয়া পঙ্গপাল বাঁচিয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ নূতন অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার ফলে পঙ্গপালের জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে বিপর্যয় ঘটাইয়া তাহাদের প্রজনন রোধ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা যায়।

অ্যান্টি-লোকাস্ট রিসার্চ সেণ্টারটি ১৯৪৫ সালে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহা একটি গবেষণা ও আন্তর্জাতিক তথ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হইতেছে। বহুদেশের পঙ্গপাল-দমন-কর্মীদের জন্য একটি শিক্ষাক্রমও এখানে পরিচালিত হয়।

—ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৮শে ফাল্গুন (১৩.৩.৬৭) সোমবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩২তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজাপাঠ ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার (১৯.৩.৬৭) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

ভ্রমসংশোধন

গত পৌষ, ১৩৭৩ সংখ্যায় (৬৮তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা) ৬৭৮ পৃষ্ঠায় প্রথম কলম ২৪শ ও ২৯শ লাইনে এবং দ্বিতীয় কলম ২য় লাইনে 'স্বামী শুভানন্দ' স্থলে "স্বামী শুদ্ধানন্দ" হইবে।

দিব্য বাণী

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি...... যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম॥

—ঐতরেয়োপনিষদ্, ৩।১।৩

(প্রজ্ঞানই পরম ব্রহ্ম। শুদ্ধ-বোধ-রূপ সেই পরব্রহ্ম হতে
স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহধারী সর্ব প্রাণী, স্বর্গ-আদি সর্ব লোক, সকল বস্তুই—
ব্রহ্ম ছাড়া যাহা কিছু সবই তাহা—হয়েছে সঞ্জাত ;
ব্রহ্মই এ বিশ্বরূপে, জীব-ও ঈশ্বর-রূপে হন প্রতিভাত।)

প্রজ্ঞানই পরম ব্রহ্ম। তিনিই হিরণ্যগর্ভ ; তিনি
দেবরাজ, প্রজাপতি, সর্ব দেব ; তিনি
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, ব্যোম্—এই পঞ্চ মহাভূত
(বিশ্বরূপে প্রতিভাত সকল বস্তুর যাহা মুল উপাদান) ;
স্থাবর, জঙ্গম, খেচরাদি অসংখ্য প্রাণীও তিনি।
এ-সকলই, দ্যুলোকাদি সর্ব লোকও প্রজ্ঞায় চালিত,
প্রজ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত—
(সমুদ্ভূত হয় সবই প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হতে,
তাঁহারই সত্তায় লভে আপনার আপাত-সত্তারে,
বিনাশের কালে পুনঃ
সবই হয় লীন সেই পরব্রহ্মে, প্রজ্ঞানেতে, চেতনা-সায়রে।)

কথাপ্রসঙ্গে

সত্যান্বেষণে বেদান্ত ও বিজ্ঞান

বেদান্ত ও বিজ্ঞান উভয়পথেই প্রমাণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান

মানুষের মন চিরদিনই সত্যান্বেষী। জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য মানুষ চিরদিনই প্রয়াসী। কত পথ ধরিয়া কতভাবে যে মানুষ ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছে ও এখনো করিতেছে, তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। মূল পথ দুটি—একটি বহির্জগতের বিশ্লেষণ, অপরটি অন্তর্জগতের বিশ্লেষণ। একটি পথে জ্ঞান আহরণের সহায় আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মার্জিত ও তীক্ষ্ণীকৃত কিন্তু বোধের সাধারণ সীমায় সীমিতশক্তি মনবুদ্ধির অনুমান। ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের কাছে যেসব প্রত্যক্ষ তথ্য আনিয়া দেয় তাহা, এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া অনুমান যাহা বলে তাহা আমাদের আগাইয়া লইয়া চলে এপথে। এপথে সর্বাগ্রণী হইতেছে জড়বিজ্ঞান। অপর পথেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানই সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ; তবে তাহা সাধারণ সীমিত-শক্তি মনবুদ্ধির নয়, অধিকতর শক্তিসম্পন্ন মনবুদ্ধির। মনকে সূক্ষ্মবস্তু প্রত্যক্ষ করিবার মত শক্তিসম্পন্ন করিবার পর সে মনবুদ্ধির প্রত্যক্ষজ্ঞান-লব্ধ তথ্য, এমনকি মনবুদ্ধির সাহায্য ছাড়াও বোধ করিবার শক্তি অর্জন করিয়া তদ্দ্বারা উপলব্ধ মনবুদ্ধির সীমারও পারের তথ্য এ পথের অবলম্বন। এপথ ধর্মপথ বা আধ্যাত্মিক পথ। এ পথে সর্বাগ্রণী হইল বেদান্ত।

নিজের প্রত্যক্ষ করা সত্যের কথা আমরা সরাসরি শুনিতে পাই ধর্ম ও বিজ্ঞান এই দুই পথের সত্যদ্রষ্টাদের মুখেই—ঋষি-অবতার-আচার্য প্রভৃতির মুখে এবং বিজ্ঞানীদের মুখে। ইহাদের উভয়ের প্রত্যক্ষ করা সত্যকে যুক্তিবিচার দিয়া সর্বসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন দার্শনিকগণ। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে, বিশেষ করিয়া অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকগণ ধর্মপথেরই পথিক। কারণ তাঁহারা সাধারণ মনের সীমায় নিজ প্রত্যক্ষকে সীমিত রাখিয়া কেবল বুদ্ধিমাত্র সহায়ে অগ্রসর হন নাই, তাঁহারা আগে মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ, সূক্ষ্ম করিয়া, তাহারও ঊর্ধ্বে উঠিয়া, সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তাহার পর যুক্তিবিচার অবলম্বনে সে সত্য সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে সন্দেহ-সংশয় উঠিতে পারে তাহা নিরসন করিয়া উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'ফিলজফি'র ভারতীয় নাম 'দর্শন' শব্দটিই যেন এই সত্যের জ্ঞাপক। তাছাড়া ভারতে বেদান্তানুগ সব দর্শনেই বেদান্তনিহিত সত্যদ্রষ্টাদের উপলব্ধির কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, যে-সত্যের কথা তাঁহারা বলিতে চাহিতেছেন, সে-সত্যকে পূর্বগ সত্যদ্রষ্টাগণ তাঁহাদেরই মত একই ভাবে উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। যুক্তি-অনুমান-উপমাদি সাধারণ মনবুদ্ধির সীমার মধ্যেকার জিনিস বলিয়া আপেক্ষিক—মানুষের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উহাতে পরিবর্তন আসিতে পারে, এমনকি কিছু কিছু ভুল প্রমাণিত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ করা সত্য চিরদিনই একরূপ, উহা পরিবর্তিত হয় না। উপনিষদ্‌, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ। উহাতে বলা হইয়াছে, কেবল বিচার করিয়া, তর্কের দ্বারা সত্য লাভ করা যায় না, উপলব্ধিই উহা লাভ করার একমাত্র উপায়। সত্য-দ্রষ্টাদের উপলব্ধিই উহার প্রমাণ। আমরা

সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম যে সব যুক্তি দিই, আমাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান কেহ আসিয়া পরে হয়ত উহা নাকচ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া সে সম্বন্ধে যদি কিছু বলি, তাহা নাকচ করিবার সাধ্য কাহারো নাই। যে সকল দর্শন, অধিকাংশ পাশ্চাত্য দর্শন, কেবল সাধারণ মনবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ- ও যুক্তি-ভিত্তিক, তাহাদের সিদ্ধান্তগুলিকে তাই মানুষের সাধারণ-জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়, বিজ্ঞানের কোন কোন মূল সিদ্ধান্তকেও (বিজ্ঞান অবশ্য তাহার অধুনাতন সিদ্ধান্তগুলিকেও আপেক্ষিক সত্য বলিয়াই জানে, চরম সত্য বলে না)। কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে বেদান্ত আপেক্ষিক ও চরম সত্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে, আজিও তাহা অপরিবর্তিত এবং অসংখ্য সত্যদ্রষ্টার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা সমর্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রমুখ সত্যদ্রষ্টাগণ ইহার অধুনাতন সমর্থন দিয়া গিয়াছেন। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, স্বামী বিবেকানন্দ তৎকালে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সব মূল তথ্য সম্বন্ধেই অবহিত ছিলেন ; এমনকি, তখনো বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত না হইলেও জড়বস্তুকে যে পুরাপুরি শক্তিতে রূপায়িত করা সম্ভব, এবং তারের সাহায্য ছাড়াই বৈদ্যুতিক শক্তি দূরদূরান্তে প্রেরণ করা সম্ভব, তাহার ইঙ্গিতও তাঁহার রচনাবলীতে পাওয়া যায়।)

বেদান্তে আপেক্ষিক ও চরম সত্য

আপেক্ষিক সত্যের সীমায় জ্ঞান যতক্ষণ সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সিদ্ধান্ত পাল্টাইতে এবং বিভিন্ন পথ ধরিয়া সত্যান্বেষণে অগ্রসর হইলে তাহা বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু আপেক্ষিকতার সীমা ছাড়াইয়া চরমে পৌঁছাইলে সব পথেরই সেই মিলনভূমিতে উহা এক এবং অপরিবর্তিত না হইয়া পারে না। বেদান্ত সেই চরম সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছিয়াছে। সেখানে পৌঁছিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, জড়বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা, মনবুদ্ধি-অহঙ্কারাদি, এমনকি ঈশ্বরীয় রূপাদিও, সব-কিছুই এই অদ্বয় চরম সত্যেরই আপেক্ষিক অবস্থা মাত্র। একমাত্র বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখিয়াই তাই বোঝা যায়, ধর্ম ও বিজ্ঞান একই লক্ষ্যাভিমুখী। একমাত্র বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখিয়াই তাই বলা যায়, আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া এমনকি পরস্পরবিরোধী বলিয়াও প্রতীত ধর্মমতগুলি সবই একই লক্ষ্যাভিমুখী। এই কেন্দ্র বিন্দু হইতে সামান্য দূরেও, সমদূরবর্তী বৃত্তের উপরও অসংখ্য দিকে অসংখ্য বিন্দু থাকিতে পারে—অসংখ্য বিভিন্ন আপেক্ষিক সত্য থাকিতে পারে এবং আছেও।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন পথ ধ'রিয়া চলিয়া নিজ প্রত্যক্ষকে স্থূল জাগতিক স্তরের বহু ঊর্ধ্বে উন্নীত করিয়া রাম, কৃষ্ণ, সীতাদেবী, শ্রীরাধা, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি বহুবিধ বিভিন্ন ঈশ্বরীয় রূপে জগতের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই ইঁহাদের সত্তা তাঁহার সত্তার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে কেন্দ্রবিন্দুতে লইয়া গিয়াছিল, এবং ঈশ্বর এবং তিনি নিজেও যে একই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য চরম সত্যের, অদ্বয় সত্তার বিকাশ, তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছিল। এই চরম সত্যের, অদ্বয়তত্ত্বের উপলব্ধির পরই বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন, "একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" এই উপলব্ধিই বলিয়া দেয়, 'আমি এবং ভগবান স্বরূপতঃ অভিন্ন'—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এবং "ময্যেব সকলং জাতম্"—এ

দুই-ই একই কথা। এই অদ্বয় তত্ত্বের উপলব্ধিবলেই বোঝা যায়, একত্বই জ্ঞানের চরম সীমা, বেদান্তের উপলব্ধিবান সাধকও ভগবান বাসুদেবের মতই সমস্বরে বলিতে পারেন, "বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যঃ"; বলিতে পারেন, "সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" সেই চরম তত্ত্ব ব্রহ্মই আমার ও বিশ্বের স্বরূপ। বেদান্তমতে ইহাই চরম সত্য, আর সব সত্যই আপেক্ষিক

বেদান্ত জোর দিয়া বলে যে, সত্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়

কেন্দ্র হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, বৈচিত্র্য ও স্থূলতা ততই বাড়িতে থাকে। বিশ্ব কেবল অচেতন বস্তুর সমষ্টি নয়, মন, বুদ্ধি, চেতনাদিও এই বিশ্বেরই অন্তর্গত বস্তু। বেদান্ত ঐ সবকিছুকেই বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, এ সবকিছুরই মূলে চরমসত্যরূপে শুদ্ধ চৈতন্য বিদ্যমান। ইহাকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান প্রভৃতি বলা হয়। ইহা হইতেই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু উদ্ভূত, যাবতীয় বস্তু ইহারই বিভিন্ন বিকাশ, বা এই সত্যকেই আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ করার শক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বস্তুরূপে দেখি। সাধারণ অবস্থাতেও আমরা চরম সত্যকেই, ভগবানকেই বিভিন্ন বস্তুরূপে দেখি। যদি আমাদের প্রত্যক্ষ করার শক্তি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানের মতেই আমরা এই বস্তুগুলিকেই কতকগুলি অ্যাটম-এর সমষ্টি, এবং আরো বাড়িলে ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনাদির সমষ্টিরূপে দেখিব; আরো বাড়িলে শক্তিরূপে দেখিব। প্রত্যক্ষ করিবার সাধারণ শক্তি দিয়া আজ পর্যন্ত যন্ত্রের সাহায্য লইয়াও আমরা অ্যাটম প্রভৃতিকে দেখিতে পাই না, যদিও ঐগুলির অস্তিত্বে বিজ্ঞান নিঃসন্দেহ। সত্যদ্রষ্টারা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, পবিত্রতা, একাগ্রতাদি সহায়ে মনবুদ্ধি শুদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ করার শক্তিকে আরও বাড়াইতে পারা যায়, এবং সেই শুদ্ধ মনবুদ্ধি দ্বারা এসবের চেয়েও সূক্ষ্ম সত্য প্রত্যক্ষ করা যায়; এক অবস্থায় দেখা যায়, সমগ্র জগৎ অসংখ্য-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ একটি মানস-পারাবার, ভাবসাগর বা ইচ্ছাসমুদ্র মাত্র। আর ইহারও পারে যাইয়া চরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখা যায়, সবই চৈতন্যে ওতপ্রোত—"ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু আর সব অবস্তু"—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

স্থূল পঞ্চভূত

কিভাবে বিশ্বের একমাত্র 'বস্তু' এই চরম সত্য, শুদ্ধ চৈতন্য ধাপে ধাপে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূলতর, এক হইতে বহুরূপে প্রকাশিত হন—কি ক্রমে সৃষ্টি হয়, সত্যদ্রষ্টারা তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। ইচ্ছাশক্তিরূপে তাঁহাতে প্রথম প্রকাশ—"একোঽহং বহু স্যাম্।" জড়জগতের এই অচেতন বস্তুগুলি সৃষ্টির স্থূলতম প্রকাশ। মধ্যে অনেকগুলি স্তর আছে। শেষ স্তরের এই সব অচেতন বস্তু সম্বন্ধেও কয়েকটি মূল কথা বেদান্ত বলিয়াছে।

বিজ্ঞানের জড়বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একদিন মানুষের কাছে বেদান্তোক্ত এই অচেতনপদার্থ-বিষয়ক মূল সত্যগুলি হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিককালে বিজ্ঞান সত্যান্বেষণে এপথে বহুদূর অগ্রসর হইবার পর যে সব সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে এখন বেদান্তোক্ত জড়পদার্থ-বিষয়ক উপলব্ধ সত্যগুলিকে আর হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া তো চলেই না, বরং নিরপেক্ষ যুক্তির আলোকে দেখিলে

দেখা যায় যে এই স্তরে উভয় পথে আবিষ্কৃত সত্যই এক হইতে চলিয়াছে। আর দেখা যায়, বিজ্ঞান সত্যান্বেষণের পথে যতদূর গিয়াছে, তাহা ছাড়াইয়া বহু বহু দূরের আপেক্ষিক সত্যগুলি সম্বন্ধে এবং চরম সত্য সম্বন্ধে বেদান্ত যাহা বলিয়াছে, যুক্তির দিক দিয়া সেগুলিকে উড়াইয়া দিবার অধিকারও আজ কারো নাই, যতক্ষণ না সেগুলির বিপরীত কিছু আবিষ্কৃত হইতেছে। অনেক সময় মনে হয়, বেদান্তের প্রত্যক্ষ করা মূল সত্যগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে বিজ্ঞানের উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জ্ঞানলাভের পথ সুগম হইবে।

ভাবিতে আশ্চর্য লাগে, আজ বিজ্ঞান স্থূল জগৎ সম্বন্ধে যে মূল সত্যগুলি আবিষ্কার করিতেছে, সত্যদ্রষ্টারা সেগুলিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন হাজার হাজার বছর আগে। সৃষ্টিপ্রসঙ্গে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সবই সত্য কি না তাহা যাচাই করিয়া দেখিতে হইলে মন-বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা, এমনকি উচ্চতম সত্য জানিতে হইলে মনবুদ্ধিরও পারে যাওয়ার মত শক্তি অর্জন করা প্রয়োজন। উচ্চতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে না হইলেও, তাহার বহু ধাপ নীচের স্তরের বিষয়ে, জড়বস্তুর বিষয়ে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, আজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার কিছুটা ধারণা করা সাধারণ অবস্থাতেই ইহা লক্ষ্য করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, হিন্দুরা যে সত্যকে হৃদয়ের গোপন প্রদেশে এতদিন সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আজ বিজ্ঞানের সত্যাবিষ্কারের ফলে সারা জগতে তাহা ঢাক পিটাইয়া প্রচারিত হইতে চলিয়াছে। সে সত্য বেদান্তের সত্য—একত্বের বাণী।

মাটি জল প্রভৃতি বিশ্বের যে সব বস্তু আমরা দেখিতে পাই—সত্যদ্রষ্টারা বলিয়াছেন, সেগুলিকে পাঁচটি 'ভূত' বা মূল পদার্থে ভাগ করা যায়; এই পঞ্চভূতই—বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর উপাদান এগুলির নাম ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ বা আকাশ। এগুলির জন্য আমাদের মনে কঠিন তরল ও বায়বীয় পদার্থের, তাপ প্রভৃতি শক্তির এবং দেশ বা স্পেস্-এর বোধ মনে জাগে।

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপাদান পঞ্চভূতকে তাঁহারা স্থূল পঞ্চভূত বলিয়াছেন। বলিয়াছেন এগুলিও যৌগিক পদার্থ—সূক্ষ্মপঞ্চভূত মিলাইয়া মিশাইয়া এগুলি গঠিত। যেমন স্থূল 'ক্ষিতি', যাহা আমাদের মনে কঠিন পদার্থের বোধ জাগায়, তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম ক্ষিতি তো আছেই, সূক্ষ্ম অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমও আছে; তবে ক্ষিতির পরিমাণ বেশী, অন্যগুলি কম। তেমনি 'তেজ', যাহা আমাদের মনে আলোক-তাপাদি শক্তির বোধ জন্মায়, তাহার মধ্যেও সূক্ষ্মভূতগুলি সবই আছে, তবে সূক্ষ্ম তেজের পরিমাণই সেখানে বেশী।

'পঞ্চভূতে গড়া দেহ', 'পঞ্চভূতে গড়া বিশ্ব' কথাগুলি বিজ্ঞানের সত্যাবিষ্কার আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের মনে কোন সন্দেহ জাগায় নাই।

বিজ্ঞান যেদিন আবিষ্কার করিল যে, যাবতীয় বস্তুর মূল উপাদান নিরানব্বুইটি, (এলিমেণ্ট) এবং ডাল্টন যেদিন বলিলেন যে সেগুলির ক্ষুদ্রতম অংশ অ্যাটম অবিভাজ্য, অবিনশ্বর, সেদিন চিন্তাশীল শিক্ষিত মনে সন্দেহ জাগার কথা যে সত্যদ্রষ্টাদের 'পঞ্চভূতের' ধারণা বোধ হয় ভুল, বিজ্ঞানের কথাই 'বেদবাক্য'। সেদিন কাহারো মনে জাগে নাই যে ইহারও পরের কথা আছে। তারপর রাদারফোর্ড—আবিষ্কার করিলেন যে অ্যাটমগুলি অবিভাজ্য নয়, অবিনশ্বরও নয়, এগুলিও

কয়েকটি স্থূল পদার্থের (ইলেকট্রন-প্রোটনাদির) সমবায়ে গঠিত। তখন আগেকার 'বেদবাক্য' বাতিল হইল, বিজ্ঞান বলিল, জগতের মূল উপাদান কয়েকটি কণা মাত্র। তাহারও পর মহামতি আইনস্টাইন যুগান্তকারী আবিষ্কার করিলেন, জগতের মূল উপাদান শক্তি (এনারজি), তেজ। কার্যতঃ এখনো করা সম্ভব না হইলেও বিজ্ঞানে ইহা এখন স্বীকৃত সত্য যে জড় পদার্থকে পুরাপুরিভাবে শক্তিতে রূপায়িত করা যায়। কতখানি জড়পদার্থকে ভাঙ্গিলে কতখানি শক্তি পাওয়া যাইবে, তাহার গাণিতিক হিসাবও তিনি দিয়া গিয়াছেন ($E=mc^2$)।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এখনপর্যন্ত 'শক্তিই একমাত্র বস্তু' ইহা সত্য হইলেও আমাদের সাধারণ মনের প্রত্যক্ষে আমরা বিচিত্রবস্তুপূর্ণ জগৎই দেখি। টেবিলকে টেবিলই দেখি, এনারজিরূপে দেখিতে পাইনা। দেখা যায় না। এনারজির বিভিন্ন অবস্থায় কতকগুলি গুন আসিয়া পড়ে, এবং কঠিন, তরল, তাপ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর বোধ জন্মায়। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় প্রকৃতিদেবী যেন ম্যাজিক দেখান। আমাদের এই বোধ-গুলিই আমাদের জগৎ বা জাগতিক বস্তু।

এখন বিভিন্ন 'বস্তু' বলিয়া যখন কিছু নাই (বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও শক্তি ছাড়া নাই), একই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা বা সংস্থান আমাদের মনে বিভিন্ন বোধ জাগাইতেছে, তখন প্রত্যক্ষ করার শক্তির এই স্তরে যদি কেহ গুণাগতভাবে সেগুলিকে ভাগ করে, আজ আর আমরা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না ; বরং স্বীকার করিতে হয়, আপেক্ষিকতায় এই স্তরে তাহাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য ইহা অনুমান করা কথা নয়. বিজ্ঞান যেমন প্রত্যক্ষ করিয়া (বা প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তির উপর অনুমানাদি সহায়ে) সত্য সম্বন্ধে কথা বলে, সত্যদ্রষ্টারাও তাহাই করিয়াছেন। আর, আমরা যেন না ভুলি, এসব সত্যের কথা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন আধুনিক বিজ্ঞানের সত্যাবিষ্কারের বহু পূর্বে।

সূক্ষ্ম পঞ্চভূত

সত্যদ্রষ্টারা বলিয়াছেন, পঞ্চভূতও আপেক্ষিক সত্য, চরম সত্য হইতে বহু দূরে। যেমন উচ্চ গণিতে সব শূন্য সমান না হইলেও সাধারণের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উহা অকাট্য সত্য, যেমন মহাজাগতিক ক্ষেত্রে হিসাবের সময় না হইলেও সাধারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরলরেখা অকাট্য সত্য, যেমন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত 'এলিমেণ্ট' সত্য, ইহাও সেইরূপ। ইহারও পরের কথা যাহা, তাহা আজ বিজ্ঞানের নাগালের বাহিরে হইলেও তাহার কিছুটা একদিন বিজ্ঞানের নাগালে আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এনারজি এখনো বিশ্লেষিত হয় নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের অগ্রগতি থামিবে না, এনারজির ভিতরের খবরও একদিন আমরা জানিতে পারিব আশা করি। তখন বেদান্তোক্ত উচ্চতর আপেক্ষিক সত্যের ইঙ্গিত পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে—এনারজিও মূল পদার্থ নয়, কয়েকটি সূক্ষ্মতর উপাদানের সমবায়ে গঠিত। সত্যদ্রষ্টারা বলেন, স্থূল 'তেজ' সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত, তবে তেজের অংশ তাহাতে অধিক বলিয়া তেজের গুণই তাহাতে সমধিক প্রকাশিত। সূক্ষ্ম ভূতগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—উহাদের যৌগিক স্থূল অবস্থাই বস্তুরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের অস্তিত্বের ইঙ্গিত সাধারণ মনই পাইতে পারে। এখনই কি ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না ?

স্থূল পঞ্চভূত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের যৌগিক রূপ

বিজ্ঞানের দৃষ্টি লইয়া দেখিলে এই সত্যের

কিছুটা আভাস এখনই পাওয়া যায়। 'ক্ষিতি' (সলিড) বা কাঠিন্য-বোধ জাগাইবার মত গুণ যে আপেক্ষিক বস্তুতে রহিয়াছে, আমরা জানি, তাহা একেবারে সলিড নয়। কতকগুলি বড় কণা (মলিকিউল) দিয়া তাহা গঠিত এবং সেই কণাগুলির মধ্যবর্তী স্থানে 'আকাশ' বা স্পেস্ আছে। মলিকিউল যাহা দ্বারা গঠিত, সেই অ্যাটমগুলির মধ্যে আরো বেশী 'আকাশ' আছে; সলিড বা কণা বলিতে যে গুণ আমাদের মনে জাগে, বস্তুতঃ তাহার পরিমাণ আকাশের তুলনায় অত্যল্প; কিন্তু ইলেকট্রন কণার প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণনের জন্যই—তাহার সবটা জুড়িয়া 'কণা'র ধর্ম, কাঠিন্য ফুটিয়া উঠে। (অ্যাটমের অন্তর্নিহিত 'আকাশে'র মধ্য দিয়া কণার গমনাগমনও ক্ষেত্রবিশেষে ঘটিয়া থাকে)। আবার, কঠিন, জলীয় ও বায়বীয় পদার্থের ধর্মের পার্থক্য শুধু বস্তুকণাগুলির পরস্পরের আকর্ষণ কাটাইয়া আন্দোলিত হইবার বা সঞ্চরণ করিবার গুণের মাত্রার ন্যূনাধিক্যে মাত্র। বাষ্পীয় পদার্থে উহা সর্বাধিক, জলীয় পদার্থে কম, কঠিন পদার্থে অতি অল্পমাত্রায় রহিয়াছে। তেজ বা এনারজির গুণের প্রকাশও ক্ষিতিতে রহিয়াছে গতি-শক্তিরূপে—প্রত্যেকটি অণুর স্পন্দনে ও ইলেক্ট্রনের গতিতে, এবং কেন্দ্রীন ও ইলেক্ট্রনের আকর্ষণী শক্তিরূপে।

ঠিক এই ভাবেই জলীয় ও বাষ্পীয় পদার্থে পঞ্চভূতের সবগুলির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

তেজ বা এনারজির অন্তর্দেশে কি আছে, বিজ্ঞান এখনো তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার গুণের মধ্যে দুটি ভূতের গুণ, তেজের নিজের গুণ এবং ক্ষিতির গুণ—কণার গুণ—দেখা যায়। যেমন তেজের একটি বিকাশ আলো তরঙ্গধর্মী হইলেও কণার মত উহা আকৃষ্টও হয়; আলো ও তাপ বস্তু হইতে বিকীর্ণ হইবার ও বস্তুতে প্রবেশ করিবার সময় উহাতে কণার ধর্ম দেখা যায়।

'আকাশ' সত্যদ্রষ্টাদের মতে শুধু স্পেস্ বা দেশ নয়, শূন্য নয়—বলা যায় উহা সর্বব্যাপী অতি সূক্ষ্ম এক সত্তা, যাহার মধ্যে আমাদের বস্তুর উপলব্ধি হয়, এবং যাহা পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম অবস্থা, যেমন শক্তি এখন বিজ্ঞানের মধ্যে সর্বভূতের সূক্ষ্মতম অবস্থা। দেশের বোধ জাগানো আকাশের গুণ মাত্র। এক সময় বিজ্ঞান শক্তির তরঙ্গধর্মের ব্যাখ্যা করিতে এই আকাশেরই অনুরূপ 'ইথারের' কল্পনা করিত। এখন আর তাহা প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কে জোর করিয়া বলিতে পারে, শক্তির ধর্মে কণাধর্মের কল্পনা, সে কল্পনা পরিত্যাগ ও তাহা পুনর্গ্রহণের মত স্পেসের ধারণার মধ্যে আবার ইথারের ধারণা, আকাশ, ফিরিয়া আসিবে না? ফিরিয়া আসিলে এবং উহাকেও বিশ্লেষিত করিবার শক্তি বিজ্ঞান অর্জন করিতে পারিলে জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই উহার মধ্যে পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূতেরই অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে না, একথা কে বলিতে পারে?

মনবুদ্ধি ও চেতনা

স্থূল পঞ্চভূত যেমন জগতের স্থূল বস্তুর উপাদান, সূক্ষ্ম পঞ্চভূত তেমনি মন-বুদ্ধি, প্রাণ প্রভৃতির উপাদান। সত্যদ্রষ্টারা বলেন, এই সূক্ষ্ম বস্তুগুলি সাধারণ অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর না হইলেও মনকে এগুলি দেখার মত সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন করা যায় এবং তখন এগুলি দেখাও যায়। বেদান্তমতে জড়বস্তুর মতই সূক্ষ্মপঞ্চভূত-উদ্ভূত মন-বুদ্ধি প্রভৃতিও অচেতন বস্তু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চেতন বস্তু একমাত্র চরম সত্য ব্রহ্ম বা অদ্বয় সত্তা বা ভগবান। জড়বস্তু এবং

মনবুদ্ধি উভয়ই অচেতন হইলেও মনবুদ্ধির বৈশিষ্ট্য হইল ইহার মাধ্যমে চৈতন্য প্রকাশিত হইতে পারে। একমাত্র চৈতন্যসত্তাই মনবুদ্ধিরূপ অচেতন পদার্থরূপে এবং উহাতে সীমিত চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হন। যেমন একখণ্ড বিদ্যুতান্বিত ধাতুখণ্ডে একই সঙ্গে ধাতুরূপে ও তাহাতে সীমিত শক্তিরূপে শক্তির প্রকাশ ঘটে।

বেদান্তের বিশ্লেষণ যেখানে আরম্ভ, বিজ্ঞান এতদিনে সেই স্তর স্পর্শ করিয়াছে মাত্র। বেদান্তের নামরূপের অনিত্যতা, জগতের মূল উপাদানের বিনাশ- ক্ষয়- ও বর্ধন-হীনতা প্রভৃতি সত্যগুলি এখন বিজ্ঞানেরও সত্য (যদিও আপেক্ষিক স্তরে, এবং মনবুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্তু এখনো বিজ্ঞানের নাগালের বাহিরে)। প্রাকৃতিক নিয়মের পিছনে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব প্রভৃতি বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিও কোন কোন বৈজ্ঞানিকের চিত্তে বিদ্যুচ্চমকের মত ক্ষণিক উদ্ভাস দিতেও সুরু করিয়াছে। এপথে সত্যান্বেষণ যতদূর সম্ভব, তাহার শেষসীমায় বিজ্ঞান যেদিন পৌঁছিবে, সেদিন বেদান্তোক্ত মনবুদ্ধির পারের সত্যগুলিকেও বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিয়াই গ্রহণের পথে কাহারো কোন দ্বিধা আর থাকিবে না।

"শাস্ত্র বলেন, জগতে স্থূল সূক্ষ্ম, চেতন অচেতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ—ইট, কাঠ, মাটি, পাথর, মানুষ, পশু, গাছপালা, জীব জানোয়ার, দেব উপদেব সকলই এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মবস্তুকেই তুমি নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ ঘ্রাণ ও আস্বাদ করিতেছ। তাঁহাকে লইয়া তোমার সকলপ্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সহিত তুমি ঐরূপ করিতেছ।"

— স্বামী সারদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ—আধুনিক পণ্ডিতদের সঙ্গে

স্বামী নির্বেদানন্দ

আধ্যাত্মিকতা-রসে বঞ্চিত ব্যক্তিদের দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মর্মাহত হতেন, প্রকৃতিপ্রদত্ত একটা শাস্তি বলেই মনে করতেন তিনি এ অভাবকে। আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ভেতর অনেকেই গর্বান্ধ হয়ে যেভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরকে একটা ধাপ্পা ভেবে উপহাস ও ঘৃণা করতেন, তা দেখে তাঁর অন্তর বিপুল বেদনায় ভরে উঠতো। এই সব নিরীশ্বরবাদী ও অজ্ঞেয়বাদী পণ্ডিতদের কারো সঙ্গে যখনই তাঁর সাক্ষাৎ হত, তখনই তিনি নিজের বিনয়নম্র অথচ মর্মভেদী মন্তব্য সহায়ে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের বাচালতাপ্রবণ মনোভাবের পরিবর্তন-সাধনের জন্য সর্ব-প্রযত্নে প্রয়াসী হতেন। অবশ্য পণ্ডিতদের ভেতর ধর্মজীবনে কারো যথার্থ নিষ্ঠা এসেছে জানতে পারলে তাঁর জন্য সব সময়ই তিনি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতেন; তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, লক্ষ্য করতেন আধ্যাত্মিক পথে কত-খানি তাঁরা এগিয়েছেন। আধুনিক প্রথায় শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও ধর্মাচরণে আন্তরিক উৎসাহ যথেষ্ট রয়েছে, এমন বহু ব্যক্তির সঙ্গে এভাবে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে দু-একজন ছিলেন অধ্যাত্মজীবনে বিশেষভাবে উন্নত। এসব ব্যক্তির সঙ্গ করে খুব খুশী হতেন তিনি এবং ধর্মবিষয়ে এঁদের দৃষ্টি আরো প্রসারিত করে দেবার জন্য ভগবানলাভরূপ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে খুব উৎসাহ দিতেন। প্রাণপ্রদ ধর্মালোচনার মাধ্যমে সেবার ভাব নিয়ে বিনয়নম্রচিত্তে একাজে ব্রতী হতেন তিনি।

* 'Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance' গ্রন্থ হইতে অনূদিত—সঃ

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিল বাংলার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাংলা উপন্যাসের জন্মদাতা বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বিখ্যাত পরিত্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথের পিতা ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগগুলির মধ্যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর অনতিদূরে একটি বাগানবাড়ীতে স্বনামধন্য ব্রাহ্মনেতা শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাক্ষাৎকারই সব চেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। এই সাক্ষাৎকারের ফলে অতি সাধারণ পর্যায়ের ব'লে প্রতীত, নামেমাত্র শিক্ষিত দক্ষিণেশ্বরের এই সাধুটির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সুমার্জিতরুচি প্রখ্যাত আচার্যের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে চলতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন কখনো সমাজগৃহে, কখনো তাঁর বাড়ীতে। কখনো বা কেশব দক্ষিণেশ্বরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতেন।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তাঁর চিত্তাকর্ষক স্মৃতি-কথায় তাঁর নিজস্ব স্বাভাবিক সুস্পষ্ট বর্ণনা সহায়ে এ-দুজন মহৎ ব্যক্তির রোমাঞ্চকর মিলনগুলির মধ্যে একটির চিত্র অঙ্কিত করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, "দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদর্শন-মানসে কেশবের গমনকালে তাঁর বিশেষ ইচ্ছায় আমিও একবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কালীবাড়ীতে

তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটে নি। কেশব তাঁর জামাতা, কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্র-নারায়ণ ভূপের একটি ছোট বজরা নিয়ে নদীপথে এসেছিলেন; আমি এবং আরো কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলাম সেখানে। ভাগিনেয় হৃদয়কে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ বজরায় উঠলেন। বজরা উজান বেয়ে চলতে লাগলো। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব খোলা ডকে পায়ের ওপর পা মুড়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসলেন। খুব কাছাকাছি বসেছিলেন তাঁরা, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যতই উৎসাহিত ও আগ্রহান্বিত হয়ে উঠতে লাগলেন, ততই তিনি কেশবের দিকে আরো এগিয়ে যেতে লাগলেন; শেষে তাঁর হাঁটু ও জানু কেশবের কোলের ওপর গিয়ে উঠলো। পরমহংসদেব প্রায় আটঘণ্টাকাল বজরায় ছিলেন; এর ভেতর যে কয়মিনিট তিনি সমাধিস্থ হচ্ছিলেন, সেটুকু সময় ছাড়া আর কোন সময়ই তাঁর কথা বলা বন্ধ হয়নি। যেভাবে তিনি কথা বলছিলেন, সেদিন থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত আর কাউকে আমি সেভাবে কথা বলতে শুনিনি। কথোপকথন যাকে বলে, তা হচ্ছিল না মোটেই; এই আটঘণ্টার ভেতর তীক্ষ্ণধী বাগ্মী ও পণ্ডিত কেশবচন্দ্র বড় জোর গোটা দশ-বারো বাক্য বলেছিলেন। অনেকক্ষণ পরপর শুধু একটা করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন তিনি অথবা তাঁর কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে বলছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একাই কথা বলে যাচ্ছিলেন, নিম্নের ঊর্মিমুখরা গঙ্গার ধারার মত তাঁর কথাও অবিরামধারে বয়ে চলেছিল। হৃদয়ের অন্তস্তল হতে নিঃসৃত সেই শান্ত কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না, অর্ধনিমীলিত নেত্র, ক্রোড়স্থাপিত-বদ্ধাঞ্জলি সম্মুখবর্তী সেই শীর্ণকায় সন্ন্যাসীকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাঁর কম্পিত ওষ্ঠাধর হতে অতি সহজবোধ্য কথা নিঃসৃত হত, কিন্তু চিন্তার চেয়ে আরো ঊর্ধ্বে উঠতে, আরো গভীরতায় তলিয়ে যেতে পারতো তা। প্রতিটি চিন্তাই ছিল নবালোকের বার্তাবহ, প্রতিটি গল্প, প্রতিটি বাক্যালঙ্কার, প্রতিটি উপমা ছিল অপরূপ। মানুষের মুখের গড়ন এবং সে গড়নের বিভিন্নতা কিরূপ বিভিন্ন চরিত্রের পরিচায়ক, তা বোঝাচ্ছিলেন তিনি; নিজের বিবিধ সাধনলব্ধ বহুবিধ অনুভূতির কথা বলছিলেন, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারজনিত নিত্যভাবাবেশের কথা বলছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলতে বলতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন, তাঁর মুখ থেকে দিব্যানন্দের বিভা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হতে লাগলো।"

সর্ব ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ও সার্বজনীন ভাব, তাঁর মৌলিক সন্দেহবিনাশী বাণী, এবং সর্বোপরি তাঁর জলন্ত আধ্যাত্মিক জীবন দেখে কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি বহু ব্রাহ্ম-ভক্তদের সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে কেশবচন্দ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে চলতেন বিভিন্ন ধর্মসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক মহানন্দপ্রদ কথাগুলি। বিভিন্ন ধর্মমতকে তিনি যে শুধু প্রশ্রয় দিতেন তা নয়, ঈশ্বরলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ বলে সমস্ত ধর্মমতকে সত্য সত্যই তিনি গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন: ভগবান এক ছাড়া দুই নন; বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে সেই একই ভগবানের অর্চনা করছে পৃথিবীর সব ভক্ত সাধকরাই। নিজ বিশ্বাসের ওপর অটল হয়ে স্থিত হয়ে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে, নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে ঘোষণা করতেন, "হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সব ধর্মমতেই আমি সাধনা করেছি,

আবার হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতানুযায়ীও চলেছি ; ...আমি দেখেছি সব মতই মানুষকে সেই একই ভগবানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে ; ... হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির সর্বত্রই দেখি ধর্মের নামে ঝগড়া-বিবাদ চলেছে, কখনও তারা ভাবে না যে যাঁকে কৃষ্ণ বলা হচ্ছে, তাঁরই নাম শিব, তাঁরই নাম শক্তি, তাঁকেই আবার যীশু ও আল্লা বলা হয় ; এক রাম, সহস্র নাম। একটা পুকুরে কয়েকটা ঘাট আছে। একটা ঘাটে হিন্দুরা কলসী ভরে জল নিচ্ছে, বলছে 'জল' ; আর একটা ঘাটে মুসলমানরা চামড়ার মশকে করে জল তুলছে, বলছে 'পানি' ; তৃতীয় ঘাটে খৃষ্টানরা জল নিয়ে বলছে 'ওয়াটার'। একথা কি ভাবা যায় যে জল 'জল' নয়, শুধু 'পানি' বা 'ওয়াটার' ? এটা একটা হাসির কথা নয় কি ? নানান নাম, কিন্তু বস্তু একই ; সেই একই বস্তুকে সবাই চাইছে ; ভেদ শুধু অবস্থা, রুচি ও নামের। যে যার নিজের মত ধরে চলুক। আন্তরিক ভাবে ব্যাকুল হয়ে যদি কেউ ঈশ্বরকে জানতে চায়, তার কল্যাণ হোক, সে নিশ্চিতই ভগবান লাভ করবে।"

সার্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধে নিজের ধারণাবিষয়ক শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ সহজ, স্পষ্ট, ওজস্বী ও মর্মস্পর্শী উক্তি সমীপাগত ব্রাহ্মভক্তদের ধর্মনিষ্ঠ, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মনের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করত, কল্পনায় তা বেশ দেখা যায়। গুণবান ব্রাহ্ম আচার্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কেশবচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন ; তিনি আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্বন্ধে নিজ ধারণার নির্ভরযোগ্য নিদর্শন-লিপি কিছু রেখে গেছেন। বাংলার পূর্বতন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে তাঁর রচিত 'দি হার্ট অব্ আর্যাবর্ত' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 'থিয়িষ্টিক্ কোর্টারলি রিভিউ' হতে পুনর্মুদ্রিত 'পরমহংস রামকৃষ্ণ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ থেকে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নিজের কথা বহুলাংশে উদ্ধৃত করেছেন ; এই উদ্ধৃতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্রের ধারণার নিখুঁত একটি ছবি ফুটে উঠেছে : "'তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) ও আমার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় ?'—প্রশ্ন করছেন তিনি। 'আমি পাশ্চাত্য-ভাবানুপ্রাণিত, সভ্য, আত্মকেন্দ্রিক, অর্ধ-সন্দিগ্ধচিত্ত, তথাকথিত শিক্ষিত, বিচারশীল ব্যক্তি ; আর তিনি ? একজন দরিদ্র, অশিক্ষিত, অমার্জিত, অর্ধ-পৌত্তলিক, বান্ধবহীন হিন্দু ভক্ত ! ডিসরেলি ও ফসেট্, ষ্টান্‌লি ও ম্যাক্সমূলার এবং ইউরোপের প্রায় সব পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণদের বক্তৃতা আমি শুনেছি ; আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের আশায় দীর্ঘকাল তাঁর কাছে বসে থাকতে যাই কি জন্য ?... আর একা আমি নই, আরো ডজন ডজন লোক তাই করে।' এবং যথেষ্ট চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাঁর পরিচয়ের অনুকূলে রয়েছে শুধু তাঁর ধর্ম। কিন্তু তাঁর ধর্মও একটি প্রহেলিকা। 'তিনি শিবের পূজা করেন আবার কালীর পূজাও করেন ; তিনি রামের পূজা করেন, কৃষ্ণের পূজা করেন, আবার বেদান্ত-মতের একজন স্থিরনিশ্চয় সমর্থকও তিনি। তিনি প্রতিমা-পূজক, অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এবং অতি শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে অদ্বিতীয়, নিরাকার, পরব্রহ্মরূপ অনন্ত ঈশ্বরের ধ্যানও করেন...। পরমানন্দই তাঁর ধর্ম, জ্ঞানাতীত অন্তর্দৃষ্টিই তাঁর পূজা, এক অদ্ভুত বিশ্বাস ও অনুভূতির আগুনের এবং ব্যাকুলতার শিখায় তাঁর সমগ্র প্রকৃতি দিবারাত্র প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে।'"

শ্রীরামকৃষ্ণের যথোচিত গুণগ্রহণ ও তৎপ্রতি প্রতাপচন্দ্রের মনোভাব তাঁর নিম্নলিখিত কথায় আরো বিশদভাবে ফুটে উঠেছে: "যতক্ষণ তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) পাওয়া যায়, তাঁর কাছে থেকে পবিত্রতা সম্বন্ধে অতি উচ্চাঙ্গের উপদেশ পাবার জন্য এবং বিষয়বুদ্ধিহীনতা, আধ্যাত্মিকতা ও ভগবদ্-প্রেমোন্মত্ততা শিখবার জন্য ততক্ষণ আমরা সানন্দে তাঁর পদতলে বসে থাকবো।" যে কজন ব্রাহ্মভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় কতখানি যে মগ্ন হয়েছিলেন তা এই ভদ্রমহোদয়েরই আর একটি উক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে: "তিনি তাঁর বালকের মত সরল ভক্তি সহায়ে এবং এক চির-উন্মুখ মাতৃত্বে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় সহায়ে আমাদের মনের সামনে অদ্ভুতভাবে তা (ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনার ভাব) খুলে ধরেছিলেন···। তাঁর সংস্পর্শে এসেই পৌরাণিক ভারতের পুরাণবর্ণিত তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরীয় ভাবগুলি আমরা আরো ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম।"

ব্রাহ্মসমাজের কাগজে ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক এইসব বিবরণীগুলি হতেই পরিষ্কার বোঝা যায় ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত দক্ষিণেশ্বরের এই সাধুটি একদল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের ওপর কি প্রচণ্ড প্রভাবই না বিস্তার করেছিলেন; বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের প্রতিটি অঙ্গ ও প্রতিটি ভাবে পূর্ণ আস্থাবান, এমনকি প্রতিমা-পূজাতেও বিশ্বাসী একজন হিন্দু—হিন্দুদের মধ্যেও আবার বিশেষ-ভাবে হিন্দু—কিভাবে এইসব বিচার-প্রবণ ও বিশ্লেষণ-পরায়ণ মনগুলির ওপর নিজ অনুভূত সত্য মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এধরনের প্রকাশনে আরো একটি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছিল এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে প্রয়োজনটি। এরই মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় পেয়েছিলেন কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা, যাদের ভেতর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকাংশ শিষ্যেরাই এসেছিলেন।

অসীমের ডাক

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

মাঝে মাঝে কার যেন ডাক শোনা যায়—
ডেকে বলে অবিরাম, 'আয় আয় আয়!'
কোথা হতে সে ডাক যে আসে বারবার
হৃদয় বাহির খোঁজে সন্ধান তার।
চাও যদি তারে যাও ছাড়ায়ে এ সংসার
চাও যদি, যেতে তবে হবে ভবসিন্ধু-পার।
সেথা নাই রাগ. দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও কোলাহল—
পরম পুরুষ সেথা শান্তি ও সুধাময়,
চলা-পথ ভরা তাঁর অহেতুক করুণায়।

পারমাণবিক শক্তি

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন, যানবাহন চালনা এবং রাত্রির অন্ধকার দূর করার জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। এই শক্তি ব্যবহৃত হয় বাষ্পীয়, তৈল-চালিত বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মাধ্যমে। প্রকৃতিতে বিভিন্ন জ্বালানীতে যে শক্তি সঞ্চিত আছে সেই শক্তি ব্যবহার করেই এই যন্ত্রগুলি চালানো হয়। জ্বালানী সংগ্রহ হয় বনের কাঠ থেকে, মাটির নীচে খনির কয়লা থেকে বা ভূগর্ভের অভ্যন্তরের পেট্রোলিয়াম থেকে। কোনভাবে অগ্নিসংযোগ করতে পারলেই জ্বালানীগুলি জ্বলতে থাকে এবং সঞ্চিত শক্তি তাপরূপে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী হয়ে দেখা দেয়। পৃথিবীতে অসংখ্য রকমের পদার্থ আছে কিন্তু খুব অল্প কয়েক ধরনের পদার্থই জ্বালানীরূপে ব্যবহার হতে পারে। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এই সব জ্বালানীও ফুরিয়ে আসছে। তাই নূতন জ্বালানীর আবিষ্কার আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন এক নূতন ধরনের জ্বালানীর সন্ধান পান। তাঁর গবেষণায় ধরা পড়ে যে—কোন বিশেষ পদার্থে শক্তি সঞ্চিত আছে তা নয়—সব পদার্থেই শক্তি নিহিত আছে। পৃথিবীতে যত রকমের পদার্থ আছে সবই শক্তির ঘনীভূত রূপ। এই সঞ্চিত শক্তি পরিমাণে অপরিসীম। প্রায় এক শত কোটি কিলোগ্রাম কয়লা জ্বালিয়ে যে শক্তি পাওয়া যায়, এক গ্রাম পরিমাণের যে কোন পদার্থেই তার সমপরিমাণ শক্তি সঞ্চিত আছে। আইনষ্টাইনের এই আবিষ্কার এমনিতে অবিশ্বাস্য মনে হয়। ভাবা যেতে পারে যে এই তথ্যই যদি সত্য হয় তাহলে যে কোন বস্তুর এক গ্রাম পদার্থকে শক্তিতে পরিণত করে নিলেই তো আমাদের সব প্রয়োজন মিটে যায়। কাজেই প্রশ্ন ওঠে এই সহজ সমাধানটি কাজে লাগানো হচ্ছে না কেন।

আইনষ্টাইনের আবিষ্কার তত্ত্বের দিক থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত এবং পদার্থ ও শক্তিকে সর্বতোভাবে পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তনীয় মনে করা যায় কিন্তু সমস্যা হল বাস্তবক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কিভাবে করা সম্ভব। এখন পর্যন্ত সব রকমের পদার্থকেই আমরা শক্তিতে পরিণত করতে পারিনি। কয়েকটি বিশেষ পদার্থকেই আমরা এমনভাবে পরিবর্তিত করতে পারি যে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির কিছু অংশ আমাদের কাজের উপযোগী হয়। এই পরিবর্তন ঘটানো হয় পদার্থগুলির পরমাণুতে। তাই এভাবে পরমাণুতে পরিবর্তন ঘটিয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় তার নাম হয়েছে পারমাণবিক শক্তি।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বেকারেল ঘটনাক্রমে একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। তখন রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার হয়ে গেছে এবং বেকারেল এই রশ্মি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ওঁর ধারণা ছিল রঞ্জনরশ্মির উদ্ভব হয় ফ্লোরেসেন্স থেকে। তাই ইউরেনিয়াম-পটাসিয়াম বাই-সালফেট নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন যে, এই লবণ সূর্যালোকে রাখলে যে রশ্মি নির্গত হয়

তা-ও রঞ্জনরশ্মি কিনা আকস্মিকভাবে তিনি দেখতে পান যে সূর্যালোকে না রাখলেও এই লবণ থেকে এক ধরনের রশ্মি নির্গত হয় যা ফটোর ফিল্মে ছাপ ফেলতে পারে। পরবর্তীকালে এই রশ্মির নাম দেওয়া হয়েছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি (Radioactive ray)। বেকারেলের আবিষ্কারের পরে বহু বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয় রশ্মি এবং যে পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বার হয় তা নিয়ে, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে, গবেষণা আরম্ভ করেন। নূতন নূতন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। কুরী-দম্পতি একটি নূতন মৌলিক পদার্থও আবিষ্কার করেন যার নাম দেওয়া হয় রেডিয়াম। অন্যান্য পদার্থের তুলনায় রেডিয়াম অনেক বেশী তেজস্ক্রিয়। তাই রেডিয়াম ব্যবহার করে তেজস্ক্রিয়ার গূঢ় তথ্য বিশেষভাবে জানা সম্ভব হয়।

কালক্রমে প্রমাণিত হয় যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মির উদ্ভব হয় পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীনে। কেন্দ্রীনে দু-রকমের কণা থাকে—প্রোটন ও নিউট্রন। প্রোটনগুলি ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কিন্তু নিউট্রনে কোন তড়িৎ নেই। বিভিন্ন পদার্থের বিশেষত্ব নির্ভর করে কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যার উপরে। যেমন হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীনে থাকে একটি প্রোটন, হিলিয়ামের কেন্দ্রীনে দুটি—এমনি ভাবে কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে বিভিন্ন রকমের পদার্থ তৈরী হয়। সাধারণ ভাবে কেন্দ্রীনে নিউট্রনের সংখ্যাও নির্দিষ্ট—যেমন হিলিয়ামের কেন্দ্রীনে দুটি প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত থাকে দুটি নিউট্রন। কার্বনে ছয়টি প্রোটনের সঙ্গে থাকে ছয়টি নিউট্রন। কিন্তু একই পদার্থের কেন্দ্রীনে নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য হতে পারে। যেমন হাইড্রোজেনে সাধারণতঃ কোন নিউট্রন থাকে না কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীনেও একটি প্রোটনের সঙ্গে একটি নিউট্রন যুক্ত হয়। রাসায়নিক গুণের দিক থেকে এমনি হাইড্রোজেনের সঙ্গে নিউট্রনযুক্ত হাইড্রোজেনের কোন পার্থক্য নেই কিন্তু এর পারমাণবিক ওজন বেশী। এর নাম দেওয়া হয়েছে ডয়টেরন। কোন পদার্থের কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা যদি একই থাকে তাহলে নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও রাসায়নিক গুণ একই থাকে। কিন্তু যদি কোনভাবে প্রোটনের সংখ্যার পরিবর্তন হয় তাহলে পদার্থটি অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

পদার্থের এমনি পরিবর্তন থেকেই উদ্ভব হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মির। কেন্দ্রীনের নিউট্রন ও প্রোটন পরস্পরকে আকর্ষণ করে ধরে রাখে। এই আকর্ষণজনিত শক্তি হল কেন্দ্রীনের বন্ধন-শক্তি। বিভিন্ন পদার্থের কেন্দ্রীনের বন্ধনশক্তি বিভিন্ন। উচ্চ সংখ্যার প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনের চেয়ে কম সংখ্যার প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনের বন্ধনশক্তি কম। তাই উচ্চ সংখ্যার প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীন প্রোটন হারিয়ে নিজে নিজেই পরিবর্তিত হতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থে এমনটা ঘটে; কেন্দ্রীন থেকে কিছু প্রোটন ও নিউট্রন প্রতিনিয়ত বেরিয়ে আসে এবং কেন্দ্রীনটি অন্য পদার্থের কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সাধারণতঃ দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। একে বলা হয় আলফা কণা। হিলিয়ামের কেন্দ্রীনেও দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন থাকে, তাই আলফা কণা হল মূলতঃ হিলিয়ামের কেন্দ্রীন।

তেজস্ক্রিয়ায় আলফা কণার নিষ্ক্রমণে যখন কোন কেন্দ্রীন রূপান্তরিত হয় তখন এর বন্ধন-শক্তির কিছু অংশও মুক্ত হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে পরিবর্তিত কেন্দ্রীন ও আলফাকণার

ভরের যোগফল পূর্বের অপরিবর্তিত কেন্দ্রীন-টির ভরের চেয়ে কিছু কম হয়। এর ফলে কিছু ভর বিলুপ্ত হয়। এই বিলুপ্ত ভর মুক্ত বন্ধনশক্তির সমার্থক। কাজেই তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনে কিছু পরিমাণের শক্তিও সৃষ্টি হয়। এই শক্তির একটা অংশ দেখা যায় রঞ্জনরশ্মির চেয়ে জোরালো এক ধরনের রশ্মি বা গামারশ্মি-রূপে। অন্য অংশ প্রকাশিত হয় আলফাকণার গতিজনিত শক্তি এবং পরমাণুগুলির ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত গতির শক্তি বা তাপশক্তি রূপে। তাই তেজস্ক্রিয় পদার্থকে বলা যায় এক ধরনের প্রতি-নিয়ত দাহ্যমান জ্বালানী। সবসময়েই তেজস্ক্রিয় পদার্থে তাপ সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এভাবে কেন্দ্রীনে পরিবর্তন হয় প্রকৃতির খেয়ালে শুধুমাত্র বিশেষ কয়েকটি পদার্থেই। পরিবর্তনের হারও খুব সীমিত। এক গ্রাম রেডিয়ামের মধ্যে আধ গ্রাম অংশ তেজস্ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হতে লাগে প্রায় ষোলশত কুড়ি বৎসর। এই আধ গ্রামের মধ্যেও সবটাই শক্তিতে পরিণত হয় না। এক গ্রাম রেডিয়াম থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রতি ঘণ্টায় যে শক্তি পাওয়া যায় তা ব্যবহার করে একশ চল্লিশ গ্রাম জলের তাপমাত্রা মাত্র এক ডিগ্রী তোলা যেতে পারে। এই সহজ হিসাব থেকেই বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ জমানো আছে তা জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হলেও আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় এর কার্যকারিতা খুবই কম। তেজস্ক্রিয় পদার্থ-কে যদি নিজের খুশীমত ভাঙ্গতে দেওয়া হয় তাহলে খুব সামান্য অংশই ভাঙ্গে। কিন্তু যদি কোন কৃত্রিম ব্যবস্থা করে এমনটা করা যায় যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ টি পরিবর্তিত হতে থাকবে তাহলে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় —আশা করা যায় তেজস্ক্রিয় জ্বালানী ব্যবহার করেও আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যাবে।

খুব তাড়াতাড়ি কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুকে ভাঙ্গার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ফার্মি, হান, ষ্ট্রাসম্যান, এবং মিটনারের পরীক্ষায়। সাধারণত: তেজ-স্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রীন নিজে নিজে খুব ধীর গতিতে পরিবর্তিত হয়ে ভারী থেকে হাল্কা পরমাণুর দিকে এগোতে থাকে। এদের পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয় যে, কৃত্রিমভাবে পরমাণুকে এমনভাবে ভাঙ্গা যায় যাতে ভারী পরমাণুগুলি একবারেই দুটি হাল্কা পরমাণুতে ভেঙ্গে যাবে। ইউরেনিয়ামের পরমাণুতে যদি কোন শক্তিশালী নিউট্রনকণা ধাক্কা দেয় তা হলে এর কেন্দ্রীন নিউট্রনকণাটিকে আত্মসাৎ করেই ভেঙ্গে যায়। এই ভাঙ্গনের ফলে দুটি নূতন কেন্দ্রীন তৈরী হয়—যাদের পারমাণবিক ওজন ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনের ওজনের অর্ধেকের কাছাকাছি (১নং চিত্র)।

(১নং চিত্র)
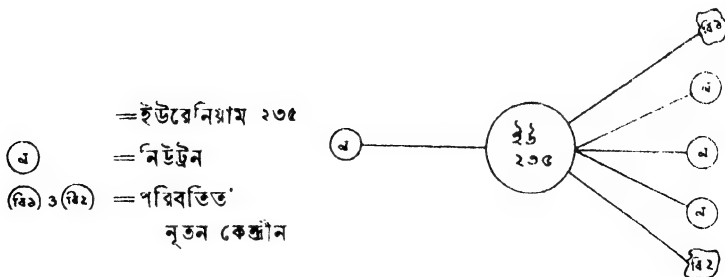
এই ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীনের বিভাজন (Nuclear fission)। হিসাবে দেখা যায় ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনের ভর এবং ভাঙ্গনের পরে যে নূতন কেন্দ্রীন দুটি তৈরী হয় তাদের মোট ভরের সঙ্গে অনেক পার্থক্য থাকে। কাজেই এ ধরনের ভাঙ্গনে প্রচুর ভর বিলুপ্ত হয় এবং অনেক পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। উপরন্তু নূতন কয়েকটি শক্তিশালী নিউট্রন কণাও জন্ম নেয়।

কেন্দ্রীনের বিভাজন থেকেই কার্যকরী পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীনের বিভাজনের ফলে উৎপন্ন শক্তির সঙ্গে যে নিউট্রনকণাগুলি বার হয় সেই কণাগুলি যদি আবার অন্য ইউ-রেনিয়ামের পরমাণুতে ধাক্কা দেয় তাহলে আরও অনেক নূতন শক্তিশালী নিউট্রনকণা পাওয়া যাবে। এভাবে যদি নিউট্রনকণায় পরিবর্ধন বা ক্রমবর্ধমান বিভাজন (Chain reaction) চলতে থাকে তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শক্তি-শালী নিউট্রনকণাগুলির সংখ্যা বিশেষভাবে বেড়ে যাবে (২নং চিত্র) এবং অনেক পরিমাণে ইউরেনিয়াম পরিবর্তিত হয়ে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হবে। কিন্তু মুশকিল হল যে, কোন ইউরে-নিয়ামের কেন্দ্রীনের বিভাজনের ফলে যে নূতন নিউট্রন পাওয়া যায় তারা সব সময়েই অন্য কেন্দ্রীনে আঘাত ক'রে বিভাজন করতে পারে না। অধিকাংশ সময়েই অন্য ইউরেনিয়ামের পরমাণুর কেন্দ্রীন কণাগুলিকে শুধুমাত্র আত্মসাৎ করে বা কণাগুলির সঙ্গে অন্য কেন্দ্রীনের সংঘাত হয় না। তাই ইউরেনিয়ামের পরমাণুর বিভাজনে অনেক পরিমাণের পদার্থ শক্তিতে পরিণত হলেও উপযুক্তভাবে শক্তি সৃষ্টি করতে
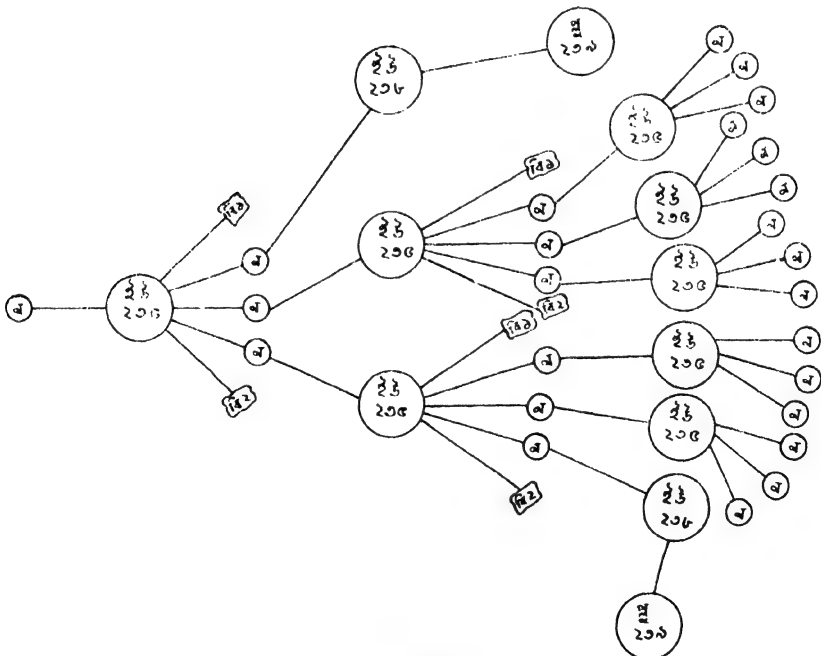
(২নং চিত্র)

হলে আরও অনেক কিছু করবার দরকার হয়।

প্রকৃতিতে সহজ অবস্থায় যে সব ধাতু পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে ভারী হল ইউরেনিয়াম। এর কেন্দ্রীনে বিরানব্বইটি প্রোটন থাকে, যার জন্য এর পারমাণবিক সংখ্যা হল ৯২। এই বিরানব্বইটি প্রোটনের সঙ্গে কেন্দ্রীনে ১৪৩টি বা ১৪৬টি নিউট্রন থাকতে পারে। সাধারণ ইউরেনিয়ামে এই দুই ধরনের ইউরেনিয়াম-পরামাণুই থাকে এবং আলাদা ভাবে বোঝাবার জন্য এদের নাম দেওয়া হয়েছে ইউরেনিয়াম ২৩৫ ও ইউরেনিয়াম ২৩৮ প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা থেকে। ইউরেনিয়াম ২৩৫ থাকে হাজারে সাত ভাগ, বাকীটা ইউরেনিয়াম ২৩৮। ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনের বিভাজনের ফলে যে নূতন নিউট্রনকণাগুলি জন্মায় তারা ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর পরমাণুতে সহজে বিভাজন আনে কিন্তু ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর পরমাণু বিভাজিত হয় না—এরা নিউট্রনকে শুধুমাত্র আত্মসাৎ ক'রে প্লুটোনিয়াম ২৩৯ তৈরী করে। কাজেই ইউরেনিয়ামে ক্রমবর্ধমান বিভাজন করতে হলে ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর পরিমাণ বাড়ানো দরকার। ইউরেনিয়াম ২৩৫ যদি অনেকটা একসঙ্গে রাখা যায় তাহলে তেজস্ক্রিয়ার জন্য স্বতই যে নিউট্রন বার হয় তারাই ক্রমবিবর্ধমান বিভাজন করবে এবং অত্যন্ত অল্প সময়ে পারমাণবিক পরিবর্তন সংঘটিত হবে। পরিমাণে বেশী না হলে হবে না কেননা সব নূতন নিউট্রন সংঘাত না করেই ইউরেনিয়ামের বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং বিভাজনে সহায়তা করবে না। যে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী একসঙ্গে রাখলে ক্রমবর্ধমান বিভাজন হয় সেই পরিমাণকে বলা হয় সঙ্গীন ভর (Critical mass)। পারমাণবিক বোমায় সর্বপ্রথমে ইউরেনিয়ামের শক্তি ব্যবহার হয়। পারমাণবিক বোমায় দুই বা তার বেশী সঙ্গীন ভরের কম পরিমাণের ইউরেনিয়ামের খণ্ড আলাদাভাবে রাখা থাকে। বোমাটি ফেলার পরে সাধারণ একটি বোমা ফাটিয়ে ঐ ইউরেনিয়ামের খণ্ডগুলিকে একসঙ্গে এনে ফেলা হয়। ফলে নিউট্রনগুলি সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকে এবং ইউরেনিয়ামের পরমাণুগুলি ভাঙ্গতে থাকে ; জন্ম দেয় এক বিভীষিকার। প্রচণ্ড রকমের তাপ সৃষ্টি হয়। আশে পাশের সব কিছু পুড়ে, গলে, ভেঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষাক্ষেত্র নালন্দা

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

রাজগীর ছেড়ে নালন্দা।

আশে পাশে লোকালয়ের নিবিড় মেলা। দোকান হাট। রাজ্যপাট। মানুষের কর্ম-প্রবাহের চিহ্ন। খরস্রোত নয়, সহজনাব্য।

পথের গৈরিকমাটির মতন নির্লিপ্ত উদাসীন জীবনযাত্রা। কোলাহল নেই। কলরব নেই। একটা ধীর সুস্থতা এখানকার মানুষগুলিকে যেন জানতে দেয় নি, শুধু দিন যাপন আর প্রাণ ধারণের গ্লানি।

কিছুদুর যেয়েই পথটা মোর ফিরেছে পশ্চিমে। অস্তাচলের দিকে। অস্তাচলের দিক। কেননা একদিন যে সূর্য, যে দীপ্ত জ্ঞানপ্রভাকর পূর্বাকাশে নালন্দার রক্তরঙিন উজ্জল নাম লিখেছিল তা আজ বহু সময়ের কক্ষ পরিক্রমা শেষ করে অস্তাচলের অবকাশে অবসন্ন বিলীন হয়েছে।

কিছুদুর এগুনোর পরই যে পথটা নজরে পড়ে সে'টি পিচে মোড়া। এতক্ষণ অবশ্য ধুলি-ধুসরিত অনবগুন্ঠিত পথ ছিল। এখনকার এই অবগুন্ঠিত পথ তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আনবে —তা'হলে কি এখান থেকেই নালন্দার অবলুপ্তির সীমানা? এখান থেকেই নালন্দা অতীতচারী হ'ল? এখান থেকেই সে ইতিহাস?

বর্তমান আর অতীত।

সংঘর্ষনচেতন বর্তমান অতীতের কোন চিহ্ন রাখতে চায় না। অথচ অতীতকে না হ'লেও বর্তমানের চলে না।

নালন্দার পিচমোড়া পথে বর্তমান কালের সদম্ভ পদধ্বনি। আধুনিক যানবাহন—বাস, মোটর। টাঙ্গাও আছে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই কানে একটা ধ্বস ধ্বস আওয়াজ আসে। তাকিয়ে দেখা যায় একসার পিপীলিকার মতন রেলগাড়ী চলেছে। এই রেলগাড়ীই বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের ঐতিহ্যকে বহন করছে। ছোট রেললাইন। যাত্রীর ওঠনামাও বেশী নেই। একটা নিঝুমভাব সর্বত্র। মন্থর জীবনের চিত্র যেন। মনে হয় এখানকার জীবন আরাম-আলস্যে গা ঢেলে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করছে। এখানকার রেলকে তাই যন্ত্রদানব বলে মনে হয় না। ইঞ্জিনের বাঁশী কানের পর্দা ফাটায় না। বরং কানের ভেতর দিয়ে মরমে যেয়ে প্রবেশ করে।

রেললাইনের ধারে বিহারশরিপের সদর স্টেশন। কিছু লোক নামে এখানে। কিছু লোক ওঠে। বিহারশরিপ অতিক্রম করে দক্ষিণদিকে একটা স্টেশন। খুবই ছোট্ট স্টেশন। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। এখানে ট্রেন দুই এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। এই স্টেশনের পরের স্টেশনই নালন্দা।

নালন্দা আধুনিক কালের দেওয়া নাম।

পূর্বে এই স্টেশনের নাম ছিল বড়গাঁও রোড।

বড়গাঁও অনেকযুগের ইতিহাসমণ্ডিত। অনেক কাহিনী আছে একে নিয়ে। পাটনা জেলার বিহার মহকুমার এই গ্রাম নালন্দার ধারক ও পালক। স্টেশন থেকে ধ্বংসাবশেষের দুরত্ব প্রায় আড়াই মাইল। যাতায়াতের জন্য রিক্সা ও টাঙ্গার ব্যবস্থা আছে। প্রাইভেটকারও যেতে কোন বাধা নেই। তবে এ পথটুকু হেঁটে গেলেও কোন কষ্ট হয় না। রাস্তা পিচঢালা।

দু'ধারে অসংখ্য গাছের নিবিড় ছায়া। এই ছায়াবীথিতলে হাঁটতে হাঁটতে মনে প্রসন্নতার ছায়া নামে। সব কিছুকে কেমন মধুময় বলে মনে হয়।

নালন্দার প্রতিটি ধূলিকণা প্রতিটি স্পর্শ যেন মধুময়। বহু যুগযুগান্তর ধরে বহু তাপস, বহু শ্রমণ মধুকর যেন নালন্দাতে বহু প্রযত্নে এক বিরাট মৌচাক রচনা করেছেন। আর তারই বার্তা পেয়ে বহু ভ্রমণকারীর লুব্ধ বাসনা কালে কালে যেয়ে সেখানে হুমড়ী খেয়ে পড়েছে। কার আগে কে কি গ্রহণ করবে?

এই পথেরই বাঁ দিকে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীঘর খুঁড়ে বার করা হয়েছে। ডান দিকে একতলা হলদে রঙের বাড়ীতে একটা সুন্দর মিউজিয়াম তৈরী করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউজিয়ামের মাঝখানে রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারের মতন একটা চারফুট নাগাদ প্রাচীরে ঘেরা হলদে বাড়ী। সেইটেই টিকিট কাটবার ঘর। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দক্ষিণা লাগে। মিউজিয়াম দেখতেও লাগে।

মাটি খুঁড়ে যে সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে বিহার সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ তাকে সযত্নে রক্ষা করছেন। ছোট একটা লোহার গেট পার হয়ে নালন্দাতে ঢুকতে হয়। তারপর একটা নাতিদীর্ঘ মাঠ। কোন আধুনিক বাড়ীর লনের মতন। দু'পাশে মসৃণ সবুজ ঘাসের কার্পেটে মোড়া জমি। ধারগুলি সব ফুলে ছাওয়া। বসবার বেঞ্চও আছে। সবুজ জমির মাঝখান দিয়ে একটা ইটপাতানো সত্তর গজ লম্বা আর গজখানেক চওড়া পথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ঢুকবার জন্য।

এই পথে ভেতরে ঢুকে বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে গেলে পরে সেইসব ছোট ছোট ঘরের মেলা—যেখানে নানান দেশের নানান বিদ্যার্থীরা জ্ঞান-মধুর জন্যে সুবৃহৎ মৌচাক রচনা করতো। প্রতিটি ঘর বিশেষভাবে দেখবার মতন। পড়া-শোনার পক্ষে বেশ নিরিবিলি। বাইরের কোলাহল থেকে মুক্ত। শান্ত নিদিধ্যাসনের বেশ উপযুক্ত।

ঐতিহাসিকদের মতে, আজ যেখানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে নাকি বহুকাল আগে এক বিরাট আম্রকুঞ্জ বা বাগানবাড়ী ছিল। বুদ্ধের পাঁচশত বণিক শিষ্য বহু অর্থ ব্যয়ে এই বাগানটি কিনে বুদ্ধকে দান করেন। তিনমাসকাল ধরে বুদ্ধ এখানে বসে তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। এভাবে এখানে একটা বৌদ্ধ বিহার গড়ে ওঠে। তারপর সেই বিহারই রূপান্তরিত হয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়।

ক্রমে নালন্দার সীমানা প্রসারিত হতে থাকে। ইউয়ান চোয়াং-এর সময় পর্যন্ত পাঁচজন রাজা নালন্দার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তারপর পালবংশের রাজারা নালন্দার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য মুক্তহস্তে রাজকোষের অর্থ দান করেন। এই পাঁচজন রাজার মধ্যে গুপ্ত সম্রাট নরসিংহ বালাদিত্যের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রাজনীতির কঠোর সংবিধান নিয়ে ব্যস্ত থেকেও শিক্ষার অনুশাসনকে ক্লীবপঙ্গু করে প্রাণের সম্পদকে ধূলিমলিন হতে কোন দিনের জন্য বিন্দুমাত্র সুযোগ দেননি তিনি। বাইরের সকল আক্রমণকে কঠোরহস্তে দমন করে শিক্ষার গৌরবকে চির অম্লান রেখে বালাদিত্য নরসিংহ মহাকালের হিসাবের খাতায় একটা বিরাট অঙ্কের উত্তর মিলিয়ে গেছেন।

নালন্দার মধ্যে ঢুকেই ছাত্রদের ঘরগুলির পাশেই একটু তফাতে নজরে পড়ে আধুনিক গ্যালারির মতন পোড়া ইটের থাকে থাকে সাজানো উঁচুনীচু বসবার আসন। সামনের

আসন থেকে গজ ত্রিশ তফাতে আছে সু-উচ্চ বসবার আসন। বোধহয় এইটিই আসল বক্তৃতাগৃহ।

তারপর পশ্চিমে আরও একটু অগ্রসর হলে দেখা যাবে গম্বুজের মতন সু-উচ্চ একটা বুরুজ। তাতে উঠবার জন্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সিঁড়ি আছে। এটাকে নীচ থেকে মানমন্দিরের মতন মনে হয়। আধুনিক কালের অবজারভেটারীর মতন দেখতে। ইউয়ান চোয়াং খুব উচ্ছ্বসিত ভাষায় এটির ও পার্শ্বস্থিত অন্যান্য বুরুজগুলির বর্ণনা দিয়েছেন,—"এই বুরুজগুলি যেন প্রভাতের কুজ্ঝটিকা ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। একই সময় ঐ বুরুজের জানালা থেকে যে কেউ অস্তগামী সূর্যের অপূর্ব শোভা দেখতে পাবে এবং সেখানে বসে নির্মল প্রশান্ত চিত্তে ধ্যান করতে পারবে।" কিন্তু মহাকাল আর এই পরিব্রাজক-প্রসংশিত বুরুজগুলির দেহ অক্ষত রাখে নি। জানলাগুলির কোন চিহ্নই আজ আর বর্তমান নেই। কেবল স্থানে স্থানে খাঁজ-কাটা জায়গাগুলি দেখে অনুমান করা যায় ঐখানেই বোধ হয় জানালা উন্মুক্ত ছিল। আজো ঐ উন্মুক্তিপথে দূরে দৃষ্টিপাত করলে আম্রবিতানের ঘনছায়ায়, উজ্জ্বল পুষ্পে শোভিত কনকবৃক্ষশ্রেণীর মিলিত সংসারে দু'চোখ জুড়ায়।

দশ হাজার ছাত্র নালন্দায় থেকে নানা বিষয় পড়াশোনা করতো। একশ বক্তৃতাগৃহ থেকে আচার্যরা বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের উপদেশ দিতেন। আর এই সকল জ্ঞানলাভের জন্য কোন পারিশ্রমিকই দিতে হতো না ছাত্রদের। এ সব ঘটনা ও কাহিনী ইতিহাসের অতিরঞ্জিত কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নালন্দার মাঠে ঘুরতে ঘুরতে এর সত্যতাকে বোঝা যায়। সুবৃহৎ চত্বরের মধ্যে এই সব বক্তৃতাগৃহের ধ্বংসাবশেষ আজও ভারতবর্ষের এক গৌরবময় অধ্যায়কে প্রমাণিত করবার জন্য অবস্থিত আছে।

নালন্দার গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করবে সকল কৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালীই। কেননা ইউয়ান চোয়াং যখন নালন্দায় অবস্থিতি করছিলেন তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। শীলভদ্র উত্তর বঙ্গের এক রাজপুত্র।

শীলভদ্রের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী নামক স্থানের সুপণ্ডিত ধর্মপাল নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। ধর্মপালের কীর্তিবাহী ছোট ছোট স্তূপগুলির থেকেই তা অনুমান করা যায়। ধর্মপাল শিক্ষার উন্নতির দিকে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নালন্দা প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণে নালন্দা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়ে বড়গাঁও নামক স্থান থেকে অনেক পুরাতন মঠ ও ছাত্রাবাস আবিষ্কার করেছেন। আজকের নালন্দাতে সেগুলিই দেখতে পাওয়া যায়।

মাটি খুঁড়ে যেগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি সযত্নে রাখা হয়েছে মিউজিয়ামে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকাটি দাঁড়িয়ে আছে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত সেই একই জায়গায় অভিজ্ঞানের বর্তিকা হাতে নিয়ে। নালন্দা আমাদের গৌরবান্বিত ইতিহাসের এক অক্ষয় নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নালন্দার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করতে করতে মনে হ'ল নালন্দার মতন বিশ্ববিদ্যালয় এক দিক দিয়ে আজকের ভারতবর্ষে একটিও নেই। দশহাজার ছাত্রকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোন খরচ করতে হতো না। খাওয়া, পরা, বিছানা ও ওষুধ,—এই চার অত্যাবশ্যক অভাব

পূরণের জন্য তাদের এক পয়সাও খরচ করতে হতো না। অর্থাৎ গুরুদের সঙ্গে এক জায়গায় থেকে দশহাজার ছাত্র এক পয়সাও খরচ না করে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালাভ করতে পারত। আজকের ভারতবর্ষ এরকম ব্যবস্থার কথা যেন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। আজকের ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার সংকটগুলির সাথে অতীতের শিক্ষাব্যবস্থার এই সংকটহীন চিত্রের তুলনা করলে মনে হয় আজকের ভারত পুরাতনের তুলনায় কত অনগ্রসর রয়েছে? অতীত আর বর্তমানের ভারতবর্ষ,—এ দু'য়ের মধ্যে যেন কত ব্যবধান।

নালন্দা একদিন সমস্ত এশিয়ার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। দেশদেশান্তর থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতো। কীসের জন্য? কোন্ তাগিদে?

নালন্দাতে ঘুরতে এসে প্রকৃতই অনুভব করলাম যে এখানে এতকিছু দেখবার আছে, বুঝবার আছে যে তা বলে শেষ করা যাবে না। দীর্ঘসময় ধরে বারবার তাকে বুঝতে হবে, দেখতে হবে।

সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ পরিক্রমা শেষ করে আবার ফিরে এলাম সেই বুরুজেরই পাশে। সেই সুদীর্ঘ মানমন্দিরের পাদদেশে।

একটু এগিয়েই একটা নাতিপ্রশস্ত চত্বর। এখানে দেওয়ালে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি। নানা ধরনের। নানা গড়নের। বিচিত্র কারুকার্য করা। অনেকগুলিই ভেঙে গেছে। কিন্তু যা বর্তমান আছে তাতেও বিচিত্রতার শেষ নেই। কত যুগযুগ আগের তৈরী এই মূর্তিগুলি আজও কেমন সুন্দর রয়েছে। শিল্পীর স্বাক্ষর আজও কেমন ভাস্বর!

গাইডকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল এই মূর্তিগুলি নাকি মাটির তৈরী। শুধু মাটির তৈরী এই মূর্তিগুলি নির্মাণদক্ষতার এক আশ্চর্য নিদর্শন। মাটির সঙ্গে গোবর ও চুন মিশিয়ে এক অদ্ভুত মর্টারে তৈরী এগুলি। সে যুগে অন্য কোন দেশের পূর্তশিল্পীরা এ ধরনের মর্টার তৈরী করতে জানতেন কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের এই একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করলেই বুঝতে পারা যায় সেদিনকার ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রগতির অবস্থাকে। সেদিন আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানকে গরিমার সাথে বিশ্বের নানা স্থানে বহন করে নিয়ে গিয়েছি। ভারতবর্ষের পণ্ডিতদের বিজয়-বৈজয়ন্তী সেদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক মহাসূত্রে গ্রথিত করেছিল। সে সব কথা আর কত বলবো? আজ রিক্ত ভারতবর্ষ, আত্ম-বিস্মৃত ভারতবাসী সামান্য জ্ঞানলাভের জন্য দলে দলে গিয়ে ইউরোপের দ্বারপ্রান্তে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ক্রমাগত উপস্থিত হচ্ছে!

পরকে জানা অন্যায় নয়। সেটা গৌরবেরই। কিন্তু সবচেয়ে আগে জানতে হবে নিজেকে। আত্মজ্ঞান না হলে পরজ্ঞান অসম্পূর্ণ। তাই উপনিষদের ঋষি ডাক দিয়ে বলেছেন—

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ॥
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

আত্মজ্ঞানবিমুখ সকলেই মৃত্যুর পর অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন অসুরলোক প্রাপ্ত হয়।

রাজস্থানের পার্বণ মেলা ও ব্রত

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে পড়ে জন্মাষ্টমী। কিন্তু মেলাও নয়, পার্বণ উৎসবও নয়। এটি হ'ল জনসাধারণের প্রায় সকল হিন্দুরই—বৈষ্ণব শাক্ত শৈব সৌর নির্বিশেষেই শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর উপবাসপালন ব্রত। মন্দিরে মন্দিরে (রাধাগোবিন্দ) বিগ্রহের জন্মোৎসব রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর। বিগ্রহের জন্মপরবর্তী স্নান, কেশমোচন অনাবৃত দেহে—সে এক নূতন মূর্তি বিগ্রহের!

কিন্তু সবটাই বার ব্রত উপবাস পর্যায়ের উৎসব। চরণামৃতগ্রহণ পারণ ও নানা বিধি-নিষেধের ব্যাপারে জটিল। কারো বা দুদিন উপবাস হয়ে যায় জন্মাষ্টমীর জন্মনক্ষত্র হিসাবে, কারো বা একদিন। বৈষ্ণবদের অত কঠোর নয়—তাঁদের গৃহে সেদিন নন্দোৎসব। নন্দলালার জন্মোৎসব। ভূরিভোজন অথবা উপবাসহীন ব্রত। এদিকে রাজস্থানেও ভারতে অন্য প্রদেশের মতই কিছু মেলা নেই। শুধু ব্রত, দেবদর্শন। জন্মাষ্টমীর পরে—যে দেশব্যাপী একটা পার্বণ পর্ব পড়ে—সেটা হ'ল অপর পক্ষে। পিতৃপক্ষের তর্পণশ্রাদ্ধ পনের দিন ধরে। এটাকে ওদেশে বলে 'কণাগত্'। তর্পণশ্রাদ্ধ বার্ষিকী। এই তর্পণটা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলে নিজনিজ কুলপ্রথানুযায়ী করেন। নদীতীর তো ওখানে নেই। ঘরেই পার্বণ শ্রাদ্ধ তিথি-হিসাবে করেন। প্রতিদিনের তর্পণ দেবালয়ে বসেও ব্রাহ্মণরা করেন। ব্রাহ্মণভোজন স্বজাতি-ভোজন দরিদ্রভোজন দানপুণ্যও তিথি ধরেই করেন। যদি তিথি না মনে থাকে বা বাল্যে পিতৃমাতৃহীন সন্তানদের জানা না থাকে তাহলে তাঁদের দেশের 'পঞ্চাঙ্গ' (পাঁজি, পঞ্জিকা) মতে একটা 'সর্ব পিতৃশ্রাদ্ধ' ও 'সর্ব মাতৃশ্রাদ্ধ' বলে বিশেষ নির্দেশিত তিথিতে তাঁরা পিতৃলোকের তর্পণশ্রাদ্ধ করেন। এই তর্পণশ্রাদ্ধ রাজা-মহারাজাদেরও করতে হয়। বার্ষিক তিথিতে শ্রাদ্ধ করার চলনের চেয়ে এইটেই খুব বেশী প্রচলিত প্রথা। 'কণাগত্' এর সাধারণ নাম। 'পিতৃপক্ষ' নামে দেবীপক্ষের আগের পক্ষটীতে এদেশেও তর্পণ করা হয়। কিন্তু ওদেশে একেবারে বার্ষিক শ্রাদ্ধহিসেবে ব্রাহ্মণভোজন করানো হয়। ব্রাহ্মণ দিয়েই তর্পণও হয় তর্পণকর্তা অপারক হ'লে বা অন্যত্র থাকলে।

আমাদের দেশে এই পিতৃপক্ষের আগের পক্ষটা ভাদ্রমাস ভোর নানা ব্রতের পার্বণের মাস। রাধাষ্টমী ও দুর্গাষ্টমী—তালনবমী—অনন্তচতুর্দশী আদি। ওখানে এধরনের ব্রত নেই। তবে রাধাষ্টমীও বড় ব্রত উৎসব একটি। সে আবার ওই সময়ের রাজারও ইষ্টদেবী হিসাবে। তবে ছোটখাটো যে ব্রতগুলি আছে তার মাঝে একটা ব্রত হ'ল 'সোমতী' অমাবস্যা। অর্থাৎ সোমবারের অমাবস্যা পালন। সে ব্রতটা হ'ল বিপত্তারিণী ব্রতের মত গ্রামীণ বা লৌকিক ব্রত। দানপাত্রী হলেন ব্রাহ্মণী নয়—ধোপানী। দানবস্তু হ'ল যব গম চাল বা পয়সা। একটা তুলসীগাছকে ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করে ১০৮টা পয়সা মুদ্রা অথবা একশো আট কুন্কে বা যে-কোনো ওজনের ঐ শস্য

দান। একটী চমৎকার 'কথা'ও আছে অরণ্যষষ্ঠী মঙ্গলবারের ব্রতকথার মত। দেখা যাবে এই ব্রতগুলি আমাদের দেশের গ্রামীণ লোকব্রত পার্বণের মত।

মহালয়ার পার্বণ শ্রাদ্ধ ব্রতের পরই এসে পড়ে নবরাত্রি উৎসব। আমাদের দেবীপক্ষের মত। কিন্তু দুর্গাপূজা নয়, যদিও কালী চণ্ডী দুর্গাপূজার সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ। সব কালীবাড়ী দুর্গামন্দিরে চণ্ডীপাঠ পূজা উপবাস ব্রতপালন প্রতিপদ থেকে দশেরা—বিজয়া দশমী অবধি। চণ্ডীপাঠ কিন্তু বলা হয় না। আর সর্বসাধারণের পূজাপার্বণও নয়। কিন্তু মেলা বসে বিজয়া দশমীতে, একাদশীতে। উত্তরপ্রদেশে মীরাট দিল্লীতে একে 'নওচণ্ডীর' মেলা বলা হয়। (নবরাত্রির চণ্ডীমেলা ?)

এদিকে রাজোয়াড়ার রাজপুত ক্ষত্রিয়দের উৎসব উপবাস পালন করতে যেমন হয়—তেমনি সমস্ত অস্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র বন্দুক তরোয়াল ছোরা বর্শা ঢাল চর্ম বর্ম সব পরিষ্কার করা মেরামত আছে কিনা দেখার পর্ব। ক্ষত্রিয়দের প্রধানদের এইসব দিনে প্রতিদিনই নিরামিষ ভোজন। মহাষ্টমী নবমীর দিন উপবাস বা একাহার সন্ধ্যাবেলা। কঠোরভাবেই পালন করতেন সকলে। কিন্তু এই অস্ত্রপূজার ব্রত উপবাস পার্বণ ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা অন্য সম্প্রদায়দের পালন করার প্রথা নেই। এ শুধু রাজপুত ক্ষত্রিয়দের বীর ধর্ম, শক্তি উপাসনার পার্বণ। শক্তিপূজার মন্ত্র হ'ল চণ্ডীপাঠ। এবং শক্তির প্রতীকসমূহ হ'ল অস্ত্রাগারের অস্ত্রসমূহ। প্রথম দিন প্রতিপদে পৈতৃক 'খড়্গ' পূজা করতে হয় রাজাদের স্নানশুদ্ধ হয়ে। উদয়পুরেও এটী বিশেষভাবে করা হয়। এই অস্ত্রাগারকে ওদেশে বলা হয় 'পিলেখানা' (পারস্য শব্দ ?)। এসব উৎসব দেখা নয়—শোনা। এ তো আর মেয়েদের, বিশেষ করে সেকালের অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েদের দেখা সম্ভব ছিল না। অস্ত্রের নাম ইতিহাসও জানার সুযোগ ছিল না। কিন্তু সহসা দেখতে পেয়েছিলাম একসময়ে। সেটী ১৩৬০ সালে; নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের জয়পুর অধিবেশনের পর উদয়পুর দেখতে যাওয়াতে সহসাই উদয়পুর রাজপ্রাসাদের বিখ্যাত অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত অস্ত্রাগারটী সম্মেলনের প্রতিনিধিদের দেখানোর জন্য খুলে দেওয়া হয়। একমাস আগেই 'দশেরা' বা নবরাত্রি উৎসব হয়ে গেছে। দেওয়ালী এসে পড়েছে।

দু-তিনটি প্রকাণ্ড ঘরের টেবিলে আলমারীতে, দেওয়ালের গায়ে টাঙানো, ছোট ছোট টেবিলে, ঘরের কোণে কোণে অস্ত্রশস্ত্র বর্ম চর্ম সাজানো রয়েছে। কদিন আগেই পরিষ্কার ও সংস্কার করা হয়েছে। ঝকঝক করছে তাদের ভীষণ ভয়াবহ চেহারা—আকার। লেখা রয়েছে পাশে পাশে 'চিরকুট' কাগজে, কোন্‌টি কোন্ রাণার বা রাজার লেখা রয়েছে, রাণাদের দেওয়া তাদের সংক্ষিপ্ত ও সাঙ্কেতিক আদরের প্রিয় নামগুলিও।

দেখলাম রাণা প্রতাপের তরওয়াল কিরীট বর্শা, বনে বনে যা নিয়ে ঘুরেছেন, যে বনবাস থেকে আর চিতোর প্রাসাদে উদয়পুরে ফেরা হয়নি। সিংহাসনেরও সঙ্গী বনবাসেরও সঙ্গী, স্ত্রীপুত্র অমাত্য পরিজন নিয়ে পলাতক মহারাণার পথের একান্ত বিশ্বস্ত মূক অনুচর তারা। সহায় সম্পদ রক্ষক ছিল তারাই তাঁদের সকলের। ভয়াবহ উগ্রদীপ্ত চেহারা তাদের, কিন্তু প্রভুর দেওয়া কি প্রীতিময় মধুর 'নাম' (আজ আর নামগুলি মনে নেই)। সাঙ্কেতিক নামও বটে। সে নাম বাইরের লোক চর দূত জানতে পারত না।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম রাণা সঙ্গের (সংগ্রাম

সিংহের) তরবারী। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা। শোনা যায় রাণা সঙ্গ ছিলেন প্রায় সাত ফুটের কাছাকাছি দীর্ঘ মানুষ। মহাবীর। তেজস্বী। একটি যুদ্ধে একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। রাজপুতের তেজ দর্প বীর্য তাতে তাঁর কিছুই কমেনি।

ঝক্‌মকে কোষমুক্ত তরবারীখানি ভীমদর্শন। সাধারণ মানুষের হাতে করে তোলার সাধ্য নেই। বাঙালী দর্শকরা হাতে করে দেখলেন।

ছোটবড় রাণা মহারাণা বীর মহাবীরের ব্যবহৃত নানা নামে সমাদৃত অস্ত্রশস্ত্রের কৌতূহল জাগানো প্রদর্শনী। যে অস্ত্রের এখন প্রচলন নেই। যে শৌর্যবীর্যের প্রকাশের ক্ষেত্র বদলেছে। তবু মানুষ তার ঐতিহাসিক মহিমায় তেমনি মুগ্ধ হয়।

রাজপুত রাণা মহারাণা রাজা মহারাজার জীবনের সেকালের ইতিহাসে অস্ত্র আর অশ্ব নানা সমাদৃত নামে সমাদরে সম্ভ্রমে অভিষিক্ত হয়ে আছে। তার সঙ্গে হাতিও। তবে ঘোড়ার মত নয়। হাতির মহিমা রাজকীয়, অশ্ব বা ঘোড়ার মহিমা দ্রুততার প্রয়োজনীয়তায়।

এখন দশেরার বা নবরাত্রির মেলা ও উৎসবের কথা বলি। ঐ ন'দিন তো নানা কৃচ্ছ্রসাধন ও অস্ত্রাগার পরিষ্কার অস্ত্রপূজা চলে। সঙ্গে সঙ্গে মহাষ্টমী ও নবমী পূজার দিন দেবী-মন্দিরে—উদয়পুরে 'মাতাচল' পাহাড়ে দেবী-মন্দিরে, জয়পুরে অম্বরেশ্বরীর (বারো ভুঁইঞা কেদাররায়ের কালীমাতা মানসিংহ রাজা বাংলা-দেশ থেকে নিয়ে যান) মন্দিরে সমারোহে পূজা উৎসব হয়। এবং দুটী বা তিনটী মহিষ বলি দেওয়ার প্রথা আছে। পূজার সময় তখনকার দিনে মহারাজা ও মহারাণী, রাণারা যেতেন মন্দিরে। কিন্তু (লোকজনরবে ইনি যশোরেশ্বরী বলেই প্রসিদ্ধ) বিজয়া দশমীর দিন একটি বিরাট মেলা হ'ত। সব মেলার মতই শোভাযাত্রা (সওয়ারী লওয়াজমা) বেরুত। গজ বাজী রথ পদাতিক উট গরুর মিছিল উৎসব মত্ত মানুষ খেলনা পুতুল বাদ্য গান বাজার গ্রামীণ ও সহরের লোকজন মিলিয়ে সে মেলা।

প্রতি মেলাতেই রাজার বেরুনোর প্রথা ছিল এবং এক এক মেলায় এক এক রকমের যানবাহনে সেই শোভযাত্রায় বাহির হতেন। এদিনে বেরুতেন বিশালকলেবর একটি পুরাতন দীর্ঘজীবী গজরাজ (তাদের নামও গজরাজা গজমুকুট ধরনের) হাতিতে চড়ে। মেলা যেত রামনিবাস বাগান অবধি শোভাযাত্রার সমারোহসহ সেখানে সমস্ত 'ঠাকুর' 'লোক' (সামন্ত জমিদার) নিজের নিজের বিশেষ অস্ত্রে ভূষিত হয়ে আসতেন। সৈন্যদের শোভাযাত্রা তোপ ছোড়ার নানারকম অস্ত্রের খেলার নৈপুণ্য দেখানোর পর বিজয়া দশমীর রামচন্দ্রের বিজয় অভিযান যাত্রার অনুকরণে ও অনুসরণে সেকালের প্রথানুযায়ী সম্বৎসরের তাঁদের সমস্ত 'শুভযাত্রা'র পদক্ষেপটি বিজয়া দশমী তিথিতে করে নিয়ে ফিরতেন।

তারপর প্রাসাদে একটি দরবার বসত সামন্ত সর্দার বৃদ্ধ কর্মচারীদের নিয়ে। 'নজর' ভেট হয়ে সেদিনের উৎসব সমাপ্ত হত। এই দরবারের পোষাক হত সকলেরই কুঙ্কুম বা লাল রং-এর। তারপরদিন একাদশীর প্রাতেও আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কামান তোপ বন্দুক ছোড়া, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ সহ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বাগান সহর পরিভ্রমণ করে ত্রিপোলিয়া (তিন তোরণ পথ) পথে ফিরে প্রাসাদে আসা। সামনে একটা বিজয়স্তম্ভ থাকে, তাকে তিন পাঁচ বা সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়। রাজা রাণা সামন্ত সর্দার সকলেই করেন। তারপর সভায়

নজর দেওয়া ও কুলপ্রথামত পূর্বপুরুষদের কীর্তিগানের পর নবরাত্রির উৎসব শেষ হয়। ক্ষত্রিয় সামন্তপরিবারেও ঘরে ঘরে শস্ত্রশক্তি-পূজা এবং পূজান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়। এই হল নবরাত্রি পালনের শেষদিন। এই নবরাত্রিতে 'বলি' প্রতিপদ থেকে নবমী অবধি, প্রতিদিনই ছাগ মহিষ কোনো না কোনো পশুবলি দেওয়ার প্রথা আছে। যদিও মহাষ্টমী ও নবমীতে বিশেষভাবেই মহিষবলির প্রথা আছে। মেলায় সব জাতি সব সম্প্রদায় যোগ দেন কিন্তু এই রাজপুত ক্ষত্রিয়দের কৌলিক শক্তিপূজা ও শস্ত্রপূজায় তাঁদের কোনো যোগদান এবং আনুষ্ঠানিক কাজ নেই। রাজস্থানের ব্রাহ্মণ বৈশ্য জৈন (সরাওগী) সম্প্রদায় একেবারে অহিংসবাদী; নিরামিষাশী, পশুপক্ষী-হত্যা বা আমিষ খাদ্য আহার তাঁদের মধ্যে একেবারেই নেই। রাজকর্মচারী অবশ্য ব্রাহ্মণ জৈন বৈশ্য সম্প্রদায়ের মাঝে থেকে অনেক আছেন কিন্তু তাঁদের কুলাচারপ্রথা ক্ষত্রিয় রাজপুতদের থেকে একে-বারে পৃথক। ক্ষত্রিয় রাজাদের ভোজে উৎসবে তাঁরা নিমন্ত্রিত হন, যানও কিন্তু আহারাদি করেন না, নিরামিষ ভোজ্য হলেও। তাঁদের জন্য প্রস্তুত খাবার তাঁদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার প্রথা ছিল বা আছে; খান বা না খান।

এই নবরাত্রির পরের উৎসব হল কোজাগরী পূর্ণিমাতে। ওখানে বলে শরৎ-পূর্ণিমা। এদিনেও দরবার বসে পুরাতন রাজ-প্রাসাদ অম্বরের প্রাসাদে। রাজা থেকে সামন্ত-সর্দার কর্মচারী সকলেরই পোষাক সাদা। উষ্ণীষ বা পাগড়ী অবধি প্রায় সাদা কিংবা ফিকে 'মতিয়া' (হলদে গোলাপী মিশ্র) রংয়ের। ওদেশে পুরুষরা হাতে পায়ে গলায় পাগড়ীতে কানে গহনা পরেন। সেদিনের গহনা সব হীরা মুক্তা রূপার পরা হয়। হলদে সোনার গহনা পরা হয় না।

মহারাণীদের দরবারেও আমন্ত্রিতা নারীরা ঐ ফিকে রংয়ের বসন-ভূষণ পরতেন। মেয়েদের একেবারে সাদা পরিচ্ছদ বৈধব্যের বসন, তাই একটু রং থাকত। রাত্রে বিস্তৃত ছাতের ওপর দরবার বসত; জ্যোৎস্নায় সবই সাদা দেখাত। এঁদের আভরণ-অলঙ্কারও সেদিনে সোনা-বাদ গহনা।

শরৎপূর্ণিমার দরবার শেষ হতে হতেই দেওয়ালীর পর্ব এসে পড়ে। এই দেওয়ালী বা দীপাবলী উৎসব সারা ভারতবর্ষের উৎসব।

আমাদের বাংলাদেশে এদিনে দেওয়ালীও বটে, কালীপূজার উৎসবও বটে। বাংলার ধরনে কিন্তু প্রতিমা এনে কালীপূজা অন্যত্র কোথাও নেই। পাঞ্জাবে রাজস্থানে নেই। বিহারে উত্তর-প্রদেশে নেই। উড়িষ্যাতে মাদ্রাজেও প্রতিমাপূজা নেই। কিন্তু দেবী-মন্দিরে, শক্তিমন্দিরে বিশেষ পূজাবিধি আর বলিবিধিও আছে।

আর আশ্চর্য এই যে সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে, পাঞ্জাবেও কতক জায়গায়, এদিনে সবঘরে লক্ষ্মীপূজা হয় খুব সমারোহে। মাদ্রাজে গুজরাটেও এই লক্ষ্মীপূজা হয়। সোনা রূপা মাটি পিতলের প্রতিমা, কিংবা ছবিতে দু-পাশে দুটী সাদা হাতি দুটী ঘট ভরে শুঁড়ে ধরে, মাঝখানে নারায়ণের কোলে লক্ষ্মীদেবীকে স্নানজলধারা ঢেলে দিচ্ছে। এই হলেন লক্ষ্মীদেবী—চারদিকে খই ছোলা কড়াই নানা রকমের ভাজা, চিনির মঠ, খেলনা পুতুল, মিষ্টান্ন; ইচ্ছা হলে ফল—নৈবেদ্য নয় কিন্তু—আর সোনা মোহর টাকা দিয়ে অর্চনা। রাত্রে পূজা হয়, দিনে হয় না। আমাদের কোজাগরী লক্ষ্মীর

মত দেওয়ালীর লক্ষ্মীপূজা রাত্রেই হয়। আমাদের অলক্ষ্মী বিদায় আছে; ওদেশে নেই। পূর্বে বলেছি দেওয়ালীর আগের ত্রয়োদশীর নাম হল ধন-ত্রয়োদশী—ধন-তেরস। সেদিন রাজস্থানে গুজরাটে নতুন বাসন কেনার ধুম পড়ে যায়, পুরানো ভাঙ্গাচোরা বাসন বদল এবং নতুন কিনতে হবে। ছোট বড় ঘটী বাটী রেকাবী থালা লোটা চামচ যাই হোক। ধনীরা কেনেন রূপার বাসন। সাধারণ গৃহস্থ কেনে পিতল কাঁসা। তারপর দিন আমাদের দেশের চৌদ্দ প্রদীপ ও চৌদ্দ শাক। ওদেশে হল ছোট দেওয়ালী। কিছু প্রদীপ দেওয়া।

আর দেওয়ালীর আগের সব চেয়ে বড় কাজ হল বাড়ী ঘর পরিষ্কার, চুনকাম, মেরামত। দেওয়ালীর উৎসব হল লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে ঘরে ঘরে আত্মীয়কুটুম্বদের বন্ধুদের বাড়ী মিষ্টি পাঠানো—মিষ্টি দিতেই হয়। আর বধূ কন্যা বোনদের, ছেলেমেয়েদের নতুন কাপড় দেওয়া। কাপড় সকলে দিতে না পারলেও মিষ্টি দিতেই হয়।

এই দেওয়ালীতে পাহাড়ের গায়ে কেল্লার ওপরে মন্দিরের গায়ে গায়ে খাঁজে খাঁজে সরার মত প্রদীপ জেলে দেওয়া হত। প্রায় অর্ধরাত্রি অবধি সেই প্রদীপ জ্বলত।

সেদিন সহরভর্তি লোকের এই আলো দেখার উৎসব আর আলো জ্বালিয়ে রাখার উৎসব এবং রাত্রে নানা রকমে দীপান্বিতা রাত্রির সহর বেড়াতে বেরুনোর আনন্দ এবং বিজয়া দশমীর মত দোকানে দোকানে মিষ্টান্নের সমারোহময় আয়োজন। (ক্রমশঃ)

নৈসর্গিক

শ্রীতুলসীনারায়ণ চক্রবর্তী

আকাশের বুক জুড়ে এক এক ক'রে ফোটা তারার মতন
সন্ধ্যা নেমে আসে।

ঝাঁপাল গাছের ঐ সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
মিটমিটে আলো কাঁপে শিরশিরে হিমের বাতাসে।
প্রশান্ত নিঃশব্দে, মূক দূর ঐ দিগন্তের গায়
আমার গোধূলি-স্বপ্ন ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়।

দিনের বিদায়ক্ষণে আকাশে বর্ণের নানা খেলা
শেষ হ'য়ে যাবে; পুঞ্জীভূত অন্ধকার নামুক হৃদয়ে ধীরে।
আমি এই স্পন্দমান হৃদয়-নদীর তীরে তীরে
ঘুরেই বেড়াব আহা! এ-জীবন নিসর্গ-দর্শন।
আমার পেয়েছি প্রাণ, এই তীরে, এই সন্ধ্যাবেলা,
পেয়েছি পরম ধন! প্রকৃতি যে হৃদয়ের দিগন্তে দর্পণ।
হৃদয়েতে আজ বাজে যে বীণার সুর,
যে রসের বেদনার মূর্ছনায় প্রাণ ভরপুর,
জীবনে সার্থকতম সবচেয়ে সত্য এই সব,
এই যে আলোর নাচ, আকাশে, মাটিতে, ঘাসে মূক কলরব

সেণ্ট পল ও স্বামী বিবেকানন্দ

ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজীর প্রচারের দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাস বিরাট। উহা প্রবন্ধে উল্লেখ সম্ভব নয়। এক কথায় তিনি দুই গোলার্ধ পরিক্রমা করলেন। এই দ্বিতীয় যাত্রার প্রাক্‌কালে স্বামীজীও দৈবদর্শনে দেখেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ সাগরপারে যাবার ইঙ্গিত করছেন। তিনি আমেরিকা থেকে জনৈক গুরুভাইকে লিখছেন, "কি বলব আপসোস—যদি আমার মত দুটা তিনটা তোদের মধ্যে থাকত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম।…লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাটুলের মত হতে হবে, পাহাড়পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়। …দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেবো—যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভাল; যে না আসবে, সে ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে।" এইরূপ বোধ পলেরও ছিল। পলের একমুখী চিন্তা—খ্রীষ্টের জন্য বিশ্ববিজয়। ম্যারাথন দৌড়কারী গ্রীকদের বিজয়বার্তা এথেন্সে নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে ঘোষণার পরেই মারা যায়। লোকটি যেন পলেরই সগোত্র। দেশের পর দেশ ক্ষিপ্রগতিতে পল খ্রীষ্টের বিজয়বার্তা বহন করে নিয়ে বেড়িয়েছেন, 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' করে ছুটেছেন

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মানসকল্পনায় যে নারীচিত্র ফুটে উঠেছে—তা অভিনব এবং সুন্দর। অনেকের ধারণা সন্ন্যাসীরা নারীদের বিরূপ তে দেখেন কিন্তু উহা অবাস্তব। চতুরাশ্রমীদের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের সহিত নারীজাতির অটুট মাতৃসম্বন্ধ। স্বামীজীর প্রচারকার্যে নারীদের অবদান যে কতখানি তা তাঁর নিজের কথায় উল্লেখ করছি। আমেরিকা থেকে একখানি পত্রে লিখছেন :

"এদেশের তুষার যেমন ধবল তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন। সকল কাজ এরাই করে।…আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিয়েছে, খেতে দিচ্ছে—লেকচার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে ক'রে বাজারে নিয়ে যায়—কি না করে বলতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হব না।" আর একখানি পত্রে : "আমি এক বহু দূর দেশ হতে আগত নাম-যশ-ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দকশূন্য পরিব্রাজক প্রচারকরূপে এদেশে আসি, সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁদের গৃহে নিয়ে যান এবং আমাকে তাঁদের পুত্ররূপে সহোদররূপে যত্ন করেন।" পলের মত স্বামীজীও শিষ্যাদের প্রচারে নিযুক্ত করেছেন। মিস ওয়াল্ডোকে দিয়ে তিনি নিউইয়র্কে ক্লাস করিয়েছেন এবং নিবেদিতাকে দিয়ে বহুস্থানে বক্তৃতা করিয়েছেন। মিসেস ওলিবুল এবং মিসেস হেলকে তিনি 'মা' বলেই ডাকতেন।

ফিলিপী থেকে পল চললেন থিসলনিকাতে। ঐশী শক্তিতে ভরপূর পল মানুষের মনে উদ্দীপনার বহ্নি জালিয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে সেখানকার অধিবাসীদের লিখেছেন :

"আমাদের সুসমাচার তোমাদের কাছে কেবল বাক্যে নয়, কিন্তু শক্তিতে ও পবিত্র আত্মায় সঞ্চালিত হয়ে উপস্থিত হয়েছে।" তারপর থিসলনিকা থেকে বিরয়া হয়ে পল একাকী এথেন্সে পৌছুলেন। তুমুল মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও সমুদ্রযাত্রায় পল কিঞ্চিৎ সুস্থ হলেন। স্বামীজীর পরিব্রাজকের ডায়েরী থেকে এথেন্সের কিঞ্চিৎ বর্ণনা উদ্ধৃত করছি: "শহর দর্শন—আকরোপলিস, বিজয়ার মন্দির, পারথেনন ইত্যাদি দর্শন করা গেল। ওলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, থিয়েটার ডাইওনিসিয়াস ইত্যাদি সমুদ্রতট পর্যন্ত দেখা গেল।" পলের জীবনীকার লিখেছেন—পলও প্রায় ঐ সব দেখেছেন। অপর জীবনীকার রেনান পলের প্রতি একটু কটাক্ষ করে বলেছেন যে তিনি একটু ইহুদীসুলভ প্রতিমা-বিদ্বেষের ফলে গ্রীক স্থাপত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যের অপূর্ব সুষমা পান করতে পারেন নি। অবশ্য শিল্পী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে ঐসব প্রশ্ন উঠে না। এথেন্সে প্রতিমার ছড়াছড়ি দেখে পলের অন্তরাত্মা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। একটি বেদীর নীচে 'অজানা দেবতার উদ্দেশ্যে' এরূপ ক্ষোদাই দেখে পল তাদের বললেন, "তোমরা যে অজানা দেবতার ভজনা করছ, আমি তাঁকে তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি।" পৌত্তলিকতার প্রতি বিদ্রূপ করে বললেন, "ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু নির্মাণ করেছেন, তিনিই স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, সুতরাং হস্তনির্মিত মন্দিরে বাস করেন না।" আবার উপনিষদুক্ত 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি' অদ্বৈত-ভাবব্যঞ্জক কথা বললেন, "তাতেই আমাদের জীবন গতি ও সত্তা।"

স্বামীজীর বাণীও শুধু কথার উপরে কথা ছিল না। তিনি একদিন জনৈক গুরুভ্রাতাকে বলেন, "তোরা কি মনে করিস আমি কেবল বক্তৃতা দিই? আমি জানি আমি অনুভবনীয় জীবন্ত আধ্যাত্মিকতা তাঁদের দিই এবং তাঁরা সেটা জেনেই গ্রহণ করে।" আর একজন গুরুভাই লিখেছেন: ধ্যানকালে কুণ্ডলিনী যেরূপ জাগে, স্বামীজীর বক্তৃতা শুনবার কালে ঐরূপ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হত। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হলেও পলের মত স্বামীজী প্রতিমা-বিদ্বেষী ছিলেন না বরং বহু অধিকারীর পক্ষে মূর্তিপূজার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন এবং মূর্তিবিদ্বেষী খ্রীষ্টানদের এ ব্যাপারে বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি। হাটুগেড়ে প্রেমাস্পদকে 'তুমি আমার সব' বলে রূপযৌবনের পূজা ভাল, না যে একাগ্র সাধক জানু পেতে মূর্তির সামনে পূজা করে প্রার্থনা করেন, 'সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, চন্দ্র তারা ও বিদ্যুৎও নয়; এই অগ্নি তাঁকে কিরূপে প্রকাশ করবে? এরা সকলেই তাঁর আলোকে আলোকিত' এইরূপ বলা ভাল? স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন: "হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য হতে সত্যে—নিম্নতর সত্য হতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হচ্ছে

পল এথেন্স থেকে করিন্থের দিকে চললেন এইকালে পল ভগবানের কাছে চিরদিনের জন্য ছুটি চাইলেন: "যথেষ্ট হয়েছে, এবার আমায় নাও।" এহেন অবস্থা স্বামীজীরও এসেছে। জগৎকল্যাণকামী স্বামীজী বলেছেন, "মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক্‌গে—'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'।" কিন্তু উভয়েই ছুটি পান নি।

করিন্থে আবহাওয়া তত সুবিধার ছিল না। নাবিক, দস্যু, বিদেশী পর্যটক, সৈনিক—সবার অবাধ মেলামেশার ফলে করিন্থ চলমান

নরকে পরিণত হয়েছিল। আর একথা খুবই সত্য—যেখানে পাপের আধিক্য সেখানেই ভগবানের কৃপা বর্ষিত হয়। সীল ও টীমথির মুখে তিনি ম্যাসিডোনিয়ার সব কথা শুনে আনন্দিত হলেন। থিসলনিকার জ্যাসন ও ফিলিপীর লিডিয়ার অর্থসাহায্যে পলের প্রচারের খুব সুবিধা হল। তিনি ভগবানের জয়গান করলেন। থিসলনীয়ানদের খ্রীষ্টে অটুট বিশ্বাস আছে শুনে পল তাদের কাছে ছুটে যেতে চাইলেন, কিন্তু উহা সম্ভব ছিল না; তাই চিঠি লিখতে বসলেন। জীবনীকার জোসেফ হোলজনার এই চিঠির পটভূমিকা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, কি ধরনের কাগজ, কালি, কলম, কিভাবে লেখা হল, এমন কি সাল (৫১ খৃষ্টাব্দ) —সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, "This was the beginning of the New Testament, and the first page of the book was a letter born in the need of the moment." খুবই লক্ষ্য করবার বিষয়—কাশ্মীরে একদিন খ্রীষ্টের ঐতিহাসিকত্ব বিষয়ে আলাপ-আলোচনাকালে স্বামীজী বলেছিলেন, "কার্যকলাপ এবং পত্রাবলী (Acts ane Epistles) জীবনীচতুষ্টয় (Gospels) হতে প্রাচীনতর এবং সেণ্ট জন একটা মিথ্যা কল্পনা। মাত্র একজন লোক সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ—তিনি সেণ্ট পল।"

মোটের উপর পত্রগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টজগতে পলের অবদান কতখানি। আজও যদি কোন গবেষক খ্রীষ্টের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হন তবে পলের চিঠিগুলি তীব্র চীৎকার করে সন্দেহ নিরাস করবার জন্য এগিয়ে আসবে। করিন্থে এক তাঁতীর দোকানে নূতন বাইবেলের জন্ম হল। পল ছিলেন অত্যধিক ভাবপ্রবণ, তাই চিঠি লেখবার আগে সারারাত্রি গভীর ধ্যানে ও প্রার্থনায় কাটালেন। চিঠিগুলি পড়লে মনে হয় কেউ যেন ভগবানের সান্নিধ্যে বসে কথা বলছে। পলের নিজের হাতে লেখা সম্ভব ছিল না—সীল ও টীমথি পাণ্টাপাণ্টি করে পলের কথা লেখেন। সেজন্য চিঠির প্রারম্ভে 'পল, সীল, টীমথি—পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যীশু-খ্রীষ্টে স্থিত' এই ধরনের উল্লেখ আছে এবং ৬০ বার 'আমরা' এই সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। সীল কেবল পলের নামেরই উল্লেখের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু উদার মহান পল তাঁর অল্পবয়সী সহকর্মীদের বাদ দিয়ে কোন গৌরব চাইলেন না। এই চিঠির সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "তোমরা তো সকলে জ্যোতির সন্তান, দিবালোকের সন্তান; আমরা রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই। অতএব এস, আমরা অন্য সকলের ন্যায় যেন নিদ্রা না যাই, বরং জেগে থাকি ও মিতাচারী হই।···বিশ্বাস ও প্রেম বুকে রেখে পরিত্রাণের আশারূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে দিই। · প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন, যেন আমরা বিনিদ্রাবস্থায় জেগে থাকি এবং তাঁর সঙ্গেই বেঁচে থাকি। অতএব তোমরা পরস্পরকে অশ্বাস দাও ও একজন অপরকে গড়ে তোল। সতত আনন্দ কর, অবিরত প্রার্থনা কর।··· দুর্বলদের সাহায্য কর, ক্ষীণসাহসদের সান্ত্বনা দাও, দীর্ঘসহিষ্ণু হও।···আত্মাকে নির্বাণ করো না।" পলের পত্রগুলি নবজাত খ্রীষ্টধর্মে যুগান্তর এনেই ক্ষান্ত হয়নি, এখনও উহা বহু অধ্যাত্ম-পিপাসু আত্মাকে প্রেরণা যোগাচ্ছে।

চিঠি মানবমনের প্রতিচ্ছবি। ব্যক্তিগত পত্রে মানুষের চিন্তা স্বাধীনভাবে, খোলাখুলিভাবে ঘোরাফেরা করে। ফলে উহাতে স্বচ্ছভাবে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন হয়। স্বামীজীর পত্রগুলি ঐরূপ। চিঠিগুলি যে শুধু স্বামীজীর জীবনে-তিহাসের সঙ্গে যুক্ত তা নয়, উহাতে আছে—

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্ম, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-কৃষ্টি, ইতিহাস, আবার ভারতের অভ্যুত্থানের দিগ্‌দর্শন, বুভুক্ষু মানবের অন্নের কথা, প্রকৃত মানুষ হবার উপায়, আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধান। স্বামীজীর পত্রগুলির যে-কোন একটি কথা যে-কোন কালের যে কোন মানুষের হৃদয়ের সুপ্ত আত্মাকে বিকশিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁর স্বহস্তে লেখা অংশ খুব কম। ইহার কারণ এই সব গতিশীল মানবের চিন্তাকে হাতে লিখে রূপদান করবার সময় কোথায়? দেশ হতে দেশান্তরে তাঁরা বজ্রবেগে স্খলিত নক্ষত্রের মত ছুটে বেড়ান। পলের জীবনীকার পলের পত্রগুলিকে দলিল বলে গণ্য করেছেন; আর স্বামীজীর পত্র এবং রচনাবলী সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখেছেন, "ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দুধর্ম সমগ্রভাবে এক শ্রেষ্ঠ হিন্দু মনীষার দ্বারা বিবৃত হল। অনাগত যুগে বহুদিন ধরে যখন হিন্দুধর্মাবলম্বী কেহ হিন্দুধর্মের প্রমাণ চাইবে, যখন কোন হিন্দুজননী তাঁর সন্তানগণকে শিক্ষা দেবেন—পূর্বপুরুষদের ধর্ম কি ছিল, তখন প্রমাণ ও আলোকের জন্য তিনি এই গ্রন্থাবলীর উপরই নির্ভর করবেন।"

আমরা সেন্টপলের বিষয় বেশী জানি না, তাই স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীর একটু মাত্র ইঙ্গিত করে পলের জীবনগাথা অধিক করে দেখিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং পাঠক মনে করবেন না যে, স্বামীজীর জীবনে এই সমস্ত ঘটনাবলীর দূরাবগাহিত্ব কম। যাহোক আমরা থিসলনীয়ানদের প্রতি পলের পত্রের যে উদ্ধৃতি দিয়েছি—উহার প্রত্যেকটি বাক্য হয় একই ভাষায়, নতুবা সামান্য একটু আলাদা ভাষায় স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অজস্রভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। মাত্র দু-চারটা তুলে দিচ্ছি: "আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়, আমরা সিদ্ধিলাভ করবই করব।" "হে মহাপ্রাণ, জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তোমার কি নিদ্রা সাজে?" "সাহস অবলম্বন কর, বিশ্বাস কর—আমরাই মহৎ কর্ম করব।" "অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি··· দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও।" "উঠ, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ—থেমো না।" "পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু।" এই সকল পত্রের প্রতি ছত্র হতে সে অদম্য তেজ, বিশ্বাস, উৎসাহ, শৌর্য ও ইচ্ছাশক্তি ক্ষরিত হয়—তা না পড়লে ধারণা হয় না।

করিন্থ থেকে পল ইফিসে চললেন। আরম্ভ হল পলের তৃতীয় প্রচারযাত্রা। বাধা নাই, সিদ্ধিও নাই। করিন্থে পল খুব ধাক্কা খেলেন, কিন্তু ঈশামসি রাত্রে দর্শন দিয়ে বললেন, "ভয় করো না, বরং কথা বল, নীরবে থেকো না। কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; তোমাকে হিংসা করে কেউ আক্রমণ করবে না এরূপ দর্শন স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় হয়েছে, আগামীদিনের বক্তব্যনিরূপণে বিচলিত স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ রাত্রে এসে জোর গলায় বলে যেতেন আর স্বামীজী পরদিন সেইসব বলতেন। যাহোক, পলকে ধরে বিচারকের সামনে নিয়ে যাওয়া হল; কিন্তু নির্দোষ বলে তিনি পেলেন মুক্তি। পল যখন পথ দিয়ে চলতেন তখন রুগ্‌ণ, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত সব লোক তাঁর কাছে আরোগ্য কামনা করত, আর তিনি খ্রীষ্টের অমূল্য উপদেশ—'বিনামূল্যে তুমি পেয়েছ—বিনামূল্যে দান কর'—উহার সদ্ব্যবহার করতেন। এ জগতে শিয়ালেরও একটা মাথা গুঁজবার জায়গা আছে কিন্তু সন্ন্যাসী পলের তাও ছিল না। প্রতিষ্ঠাকে 'শূকরীবিষ্ঠা'র মতো ত্যাগকারীর প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব? তাই

জীবনের শেষপ্রান্তে করিন্থীয়দের একখানি পত্রে লিখছেন : "এখন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও বস্ত্রহীন রয়েছি এবং মুষ্ট্যাঘাতে ক্রমাগত আহত হচ্ছি। আজ পর্যন্ত জগতের আবর্জনা ও জঞ্জাল বস্তুর মতো রয়েছি।" বড়ই দুঃখের কথা! কিন্তু 'বাহাদুরী কাঠ' খ্রীষ্ট-সৈনিকদের ওতেই আনন্দ। এই কালে দেখা দিল এক নূতন উপদ্রব। একদল ইহুদী গুপ্তচর গোপনে জেরুসালেমের চার্চে খ্রীষ্টান সাজে এবং তাঁদের প্রাচীন প্রথা বাঁচাবার জন্য শেষ চেষ্টা করে। তারা যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্যদের উপর অত্যাচারের চেষ্টা করল এবং পলের প্রচেষ্টায় যেসব জায়গায় খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল সেসব জায়গায় বলে বেড়াতে লাগল যে, তারা সাক্ষাৎ শিষ্যদের কাছ থেকে চিঠি এনেছে—পলের সুসমাচার বিকৃত ও ভ্রমাত্মক ; পল যীশুর শিষ্য নন এবং তিনি যীশুকে কখনও দেখেন নি। জীবনের শেষপ্রান্তে এই সন্দেহ নিরসনের জন্য পল তাঁর প্রচারিত দেশগুলির খ্রীষ্ট নেতাদের আহ্বান করলেন, বিভিন্ন দেশে পত্রাদি লিখলেন, এবং সকলকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর মরমের কথা : "স্বাধীনতার নিমিত্তই খ্রীষ্ট আমাদিগকে স্বাধীন করেছেন, অতএব তোমরা স্থির থাক এবং দাসত্বের জোয়ালে (ইহুদীদের অসংখ্য নিয়মকানুনে) আর বদ্ধ হয়ো না। ওরা 'দাসীর সন্তান', ওদের নিয়মকানুন অসংখ্য আর আমরা 'স্বাধীনতার সন্তান', আমাদের একমাত্র নিয়ম—উহা হচ্ছে সদা আত্মার পথে পরিভ্রমণ। ···তোমরা আত্মার বশে থাক।" তিনি তাঁর প্রচারিত সুসমাচারের প্রকৃতি ও উৎস বিবৃত করে বললেন, "ইহা মনুষ্যসৃষ্ট নহে এবং আমি মানুষের শিক্ষায় শিক্ষিত নই। আমি ভগবান যীশুর শিষ্যদের শিষ্য নই ; আমি প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা এই সুসমাচার লাভ করেছি।" (ক্রমশঃ)

"তোমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে—'ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতি বিধান।' মনে রাখিবে—দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে।"

"তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্ত্য এবং ধর্ম-বিশ্বাস ও সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্যের জনক।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতা

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[উদ্বোধনের গত পূজাসংখ্যায় 'গোপালের মা ও নিবেদিতা' নামে যে-লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমান লেখাটিও সেই ধারায় তৈরী করা হয়েছে। শ্রীমা ও নিবেদিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে যথাসম্ভব তথ্যপ্রদানই এই লেখার উদ্দেশ্য। এই সংখ্যার লেখায় প্রধানতঃ নিবেদিতার পত্র থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলন করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও যেসব অন্য তথ্য আছে, যেমন 'The Master as I Saw Him'-গ্রন্থে শ্রীমার বিষয়ে নিবেদিতার বর্ণনা, 'মায়ের কথা' এবং নিবেদিতার জীবনীসমূহে উভয়ের সংযোগ বিষয়ে নানা সংবাদ, সেগুলি বর্তমান সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব হয়নি।]

শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী এবং তাঁর প্রধান শিষ্যা সারদাদেবীর জীবনকথা মোটামুটি পরিচিত বলে সে সম্বন্ধে অধিক তথ্য দেবার দরকার নেই। লোকলোচনের সামনে আসতে সারদাদেবী কখনই চাননি, রক্ষণশীল হিন্দু রমণীর মতই জীবন কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের পক্ষে তাঁকে 'জননী' ও 'বিশ্বজননী' না বলে উপায় থাকেনি। মিসেস ওলিবুল, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাই 'সম্ভবতঃ' প্রথম ইউরোপীয় মনুষ্য যাঁদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন।* কিন্তু প্রাচীন সংস্কারে লালিত এই নারী প্রথম সাক্ষাতেই যে অসাধারণ উদারতা ও চরিত্রমহিমা দেখিয়েছিলেন, তা নিত্য স্মরণীয়। ওলিবুল, ম্যাকলাউড বা নিবেদিতা সারদাদেবীর চরিত্রে যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা তাঁদের বিবেকানন্দ-ভক্তির জন্য নয়—সারদাদেবীর বিচ্ছুরিত চারিত্রশক্তির জন্যই। এখানে মনে রাখতে হবে, এই তিনজন বিদেশী মহিলার প্রত্যেকেই অতি বিদগ্ধ, শিক্ষিত এবং ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষায় সংস্কৃতিতে অগ্রণী বহু মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এঁদের দু'জন আবার আমেরিকায় অভিজাত-মণ্ডলীভুক্তা। সারদাদেবীর সাক্ষাৎ-দর্শনের পরে মিসেস বুল তাঁর অভিজ্ঞতার কিছু কথা অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লৌকিকভাবে সারদাদেবীকে পত্নীভাবে গ্রহণ না করায় ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ যখন সারদাদেবীর কষ্ট কল্পনায় বেদনার্ত, তখন ম্যাক্সমূলার এই অহেতুক সমবেদনার যোগ্য সান্ত্বনারূপে মিসেস বুলের পত্রটিকে উপস্থিত করেছিলেন। মিসেস ওলি বুল ১৮৯৮-এর ১১ জুলাই শ্রীনগর থেকে ম্যাক্সমূলারকে লেখেন :

"আমরাই প্রথম বিদেশী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সারদাদেবীকে দর্শন করায় অনুমতি পেয়েছি। তিনি 'আমার মেয়েরা' বলে আমাদের গ্রহণ করলেন। বললেন যে, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। আমাদের একেবারেই অপরিচিতভাবে দেখলেন না। গুরুর কাছে আনুগত্য বলতে কি বোঝায়, একথা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল,—তাঁর ক্ষেত্রে আবার নিজ স্বামীই গুরু—তিনি জানালেন, কাউকে গুরু নির্বাচন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সব কথা শুনতে

* এই তিনজনের ভারতে আসার বছরখানেক আগেই মিস মুলার ও মিসেস সেভিয়ার স্বামীজীর সঙ্গে কলকাতায় আসেন। তাঁরা সারদাদেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না। সম্ভবতঃ পাননি।

বা মানতে হবে, কিন্তু ঐহিক বিষয়ে নিজের সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কাজ করলেই—সে কাজ যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুরুর অননুমোদিত হয় তবুও—গুরুকে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হবে।

"স্বামীর সঙ্গে বাল্যেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ তিনি। স্বামীকে যখন সানন্দে সন্ন্যাসীর জীবন যাপনে অনুমতি দিলেন, তখন স্বামীর গভীর বন্ধুতা পেলেন ও তাঁর শিষ্যারূপে গৃহীত হলেন। স্বামী তাঁকে দিন দিন শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুললেন। অপরপক্ষে পতি-সান্নিধ্যে অতিবাহিত বৎসর-গুলিতে ইনি স্বামীর পরামর্শদাতা ছিলেন। ইনি নিরন্তর প্রার্থনা করেছেন, আমার বাসনাকে শুদ্ধ ক'রে তোলো, যাতে চিরদিন তাঁর যোগ্য হতে পারি। দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত তিনি নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন গর্ভধারিণী জননীর সাধারণ আনন্দ কিন্তু হয়ে উঠেছেন বহু সন্তানের আধ্যাত্মিক জননী।"

সেই 'বহু সন্তানের' এক শ্রেষ্ঠ সন্তান ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সুগভীর স্নেহসম্পর্কের রূপ বর্ণনার অসাধ্য। বিদেশিনী 'খুকী'টির জন্য সারদাদেবীর মাতৃহৃদয় সদাই উচ্ছলিত থাকত। অপরদিকে নিবেদিতার কাছে তিনি চিরজননী মেরী-মাতার দেহধারিণী প্রতিনিধি। শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে শান্তিসায়রে অবগাহন করে নিবেদিতার জ্বালাময় সংঘর্ষ-ক্ষুব্ধ জীবন পরমের আনন্দস্পর্শ পেত। নিবেদিতা তাঁর ধাবমান জীবনের নানা পর্যায় থেকে বারবার ফিরে আসতেন শ্রীমায়ের কাছে আলোকের, আনন্দের ও শান্তির সন্ধানে। নিবেদিতার নানা রচনায় ও বহু চিঠিতে সেই প্রাপ্তি-সঙ্গীত বিকীর্ণ হয়ে আছে।

শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ ১৭ মার্চ, ১৮৯৮। 'ঐ বৎসর শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে আগমন করিয়া বাগবাজার ১০।২ নং বোসপাড়া লেনে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাগণকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।' শ্রীমায়ের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রভাব পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাগণের জীবনে সুগভীর হয়। ভারতীয় নারীদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্যবাসীরূপে যত নিন্দা ও কুৎসা তাঁরা শুনে এসেছেন, এই একটি সাক্ষাৎকার বহু দিনের সেই অন্ধকারের উপর বিপুল আলোকবর্ষণের তুল্য। মিসেস বুলের প্রতিক্রিয়া ম্যাক্সমুলারকে লেখা চিঠি থেকে আগেই দেখা গেছে। কিছু পরেই নিবেদিতার লেখা চিঠি থেকে তাঁর প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখব।

নিবেদিতার জীবনীকার মুক্তিপ্রাণা জানিয়েছেন, এই দিনটি সম্বন্ধে মার্গারেট তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, 'Day of days'। "বাস্তবিক শ্রীমায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাতের এই দিনটি প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করিত।"

শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার শেষ সাক্ষাৎ ১২ মে, ১৯১১। প্রথম সাক্ষাৎ ও এই শেষ সাক্ষাতের মধ্যে ১৩ বৎসরের অল্পকিছু বেশী সময়ের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে শ্রীমায়ের সঙ্গে একত্র বাস ও অগণিত সাক্ষাৎকার ঘটেছে নিবেদিতার। নিবেদিতার পত্রাবলীর মধ্যে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব উল্লেখ পাই সেগুলি তুলে ধরছি। এখানে বলা দরকার, শ্রীমায়ের আরও বহু উল্লেখ নিবেদিতার পত্রাবলীতে আছে, যার সবগুলি চয়ন করা সম্ভব নয়।

নিবেদিতার পত্রাবলীতে শ্রীমা সারদাদেবীর কথা

[নিবেদিতার যেসব চিঠি পাওয়া গিয়েছে,

তার মধ্যে ১৮৯৮-এর ২২ মে তারিখে নেল হ্যামণ্ডকে লেখা চিঠিতেই শ্রীমায়ের প্রথম উল্লেখ পাই। এই চিঠি লেখার আগে শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতাদির প্রথম সাক্ষাতের পরবর্তী আর একটি সাক্ষাতের সংবাদ পাই। বর্তমান বেলুড় মঠের নির্মাণকাজ শুরু হলে শ্রীমাকে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির মঠে নিয়ে আসা হয় নৌকা করে, ১৮৯৮-এর ৭ই এপ্রিল। বিকালে ফিরে যাবার আগে তিনি সেখান থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে বর্তমান মঠের জমিতে পদার্পণ করলে 'নিবেদিতা, ধীরামাতা ও জয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং সঙ্গে করিয়া সমস্ত জমি দেখাইয়া দেন।']

২২ মে, ১৮৯৮, নেল হ্যামণ্ডকে

অনেকবার ভেবেছি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা নাম্নী মহিলাটির বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখব। শুরুতে বলি, তিনি পঞ্চাশ-পেরোয়নি এমন হিন্দু বিধবার মত সাদা কাপড় পরেন।* পরার ধরন: কাপড় প্রথমত কোমরে স্কার্টের আকারে জড়ানো থাকে, তারপরে শরীরের উপর দিয়ে গিয়ে মাথা ঢেকে রাখে—অনেকটা nun-দের অবগুণ্ঠনের মত। পুরুষ মানুষ কথা বলতে এলে তাঁকে পিছনে (?) দাঁড়িয়ে থাকতে হয়; তিনি সাদা কাপড়ের ঘোমটা সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে নামিয়ে দেন; সরাসরি কথা বলেন না; বেশী বয়সী কোনো মহিলাকে মৃদু স্বরে, প্রায় ফিসফিসিয়ে কিছু বলে দেন, সেই মহিলাটি তাঁর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন জোরে। এই জন্য মনে হয় আচার্যদেব (স্বামীজী) কখনো এঁর মুখ দেখেননি। এই সঙ্গে কল্পনায় দেখে নাও, ইনি সব সময়ে মেঝেয় ছোট একটি মাদুরে বসে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটা খুব বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হচ্ছে না নিশ্চয়; কিন্তু এঁকে একটু ভালভাবে জানলেই দেখা যাবে, সহজ বুদ্ধি ও বাস্তববোধ এঁর চূড়ান্ত, প্রতি ক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো কিছু করবার আগে এঁর পরামর্শ সর্বদা নিতেন। রামকৃষ্ণ-শিষ্যেরা এঁর উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন। অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইনি। কী স্নিগ্ধ ভালবাসা এঁর! অথচ বালিকার মতই হাসি-খুশী। সেদিন যখন আমি জোর করে বললুম, স্বামীজীকে এখনি এখানে আমাদের মধ্যে আসতে হবে, নইলে আমরা চলে যাব—সেই শুনে তাঁর কী হাসি—তুমি যদি দেখতে! আচার্যদেব আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন,—এই খবর নিয়ে যে-সন্ন্যাসীটি এসেছিলেন, তিনি আমাকে সত্যই চলে যাবার জন্য জুতো পরতে উঠতে দেখে রীতিমত ভড়কে গেলেন, এবং দ্রুত স্বামীজীকে ডেকে আনতে ছুটলেন—তখন সারদার উচ্ছ্বসিত হাসির রূপ যদি দেখতে। আর কি যে মিষ্টি তিনি!—আমাকে বলেন, 'আমার খুকী।' আচারবিচারে বরাবরই রক্ষণশীল—সব কিছু সরিয়ে দিলেন যখন প্রথম দুটি বিদেশী

* এখানে নিবেদিতা সম্ভবতঃ শ্রীমায়ের সরু লাল-পাড় সাদা শাড়ির কথা বলতে চেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে সারদাদেবী যখন আয়তিচিহ্ন হাতের বালা খুলতে চেয়েছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে তাঁকে বলেন, তিনি সতত সান্নিধ্যেই রয়েছেন, দেহের মৃত্যু কোনো ব্যবধানই সৃষ্টি করেনি। এই দর্শনের জন্য সারদাদেবী হাতের বালা বর্জন করেননি এবং সরু লাল-পাড়ের সাদা থান পরতেন। বৈধব্যের সম্পূর্ণ শুভ্রবাস গ্রহণ না করার জন্য কিছু লোকনিন্দা হয় এবং কয়েকবার তিনি প্রচলিত বৈধব্য-বাস গ্রহণ করতে চান কিন্তু প্রতিবারই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান ও নিষেধ শোনেন। নিবেদিতা যখন শ্রীমায়ের কাপড় সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন বোধ হয় তাঁকে ঐসব দর্শনাদির কথা না বলে সহজবোধ্য একটি কারণ বলে দেওয়া হয়; বাংলা দেশে অল্পবয়সী বিধবারা অনেক সময় সরু পাড় থান পরে থাকেন, শ্রীমাও তেমনই কিছু করেছেন, এই রকম বোঝানো হয়।

মেয়ে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁর কাছে এলেন। এঁদের সঙ্গে তিনি খেলেন পর্যন্ত! আমরা গেলেই ফল খেতে দেওয়া হয়; তাঁকেও দেওয়া হলে—সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই ফল তিনি একসঙ্গে গ্রহণ করলেন!! এর দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি, এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতে হতে পারত না।* খুব মজার, না! তাঁর মহিমার একটা উত্তম দৃষ্টান্ত দিই—কলকাতায় তিনি যখন থাকেন, তখন সদাসর্বদা ১৪-১৫টি উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা তাঁকে ঘিরে থাকেন, যাঁরা রাগারাগি, ঝগড়াঝাটি করে সকলকে অস্থির করে মারতেন, যদিনা তিনি তাঁর অপূর্ব বিচক্ষণতা এবং প্রফুল্লতার দ্বারা এঁদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি রক্ষা করে চলতেন! তাই বলে সত্যই আমি ঐসব মহিলার স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনো কটাক্ষ করছি না, আমি নারী-জাতির সাধারণ স্বভাব অনুমান করে এই কথা বলছি।

তাঁর সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের বীরোচিত সম্ভ্রম দেখবার মতো। তাঁকে সর্বদা 'মা' বলে ডাকা হয়,—তাঁর বিষয়ে উল্লেখের সময়ে বলা হয় "শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী", প্রতি-ব্যাপারে তাঁকে স্মরণে রাখা হয়, সব সময়ে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে দু'একজন হাজির থাকেন; তাঁর ইচ্ছাকে স্থায়ী আদেশতুল্য জ্ঞান করা হয়। এ এক দর্শনীয় অপরূপ সম্পর্ক। তুমি যদি তাঁকে কিছু লেখো, আমি আনন্দ করে সেকথা তাঁকে জানাবো। একজন সন্ন্যাসী একদিন আমার হয়ে বাংলা করে তাঁকে Magnificat (যীশুজননী মেরীর গান) পড়ে তাঁকে শোনালেন—তিনি কী ভাবে না তা উপভোগ করলেন—দেখবার মতো! সত্যি করে বলতে গেলে, তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।

২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, নেল হ্যামণ্ডকে

কলকাতায় ফিরে গেলে সারদার কাছে থাকতে হবে, যতদিন না বাড়ি পাই।

[নিবেদিতা স্বামীজীর দলবলের সঙ্গে হিমালয়ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন ১৮৯৮-এর মে মাসে; কলকাতায় ফিরে আসেন ১লা নভেম্বর। সারদাদেবী তখন ১০/২ নং বোস পাড়া লেনে বাস করছিলেন। ঐ বাড়ির 'প্রবেশপথে দুইদিকে দুইটি ঘর ছিল; একটি ঘরে অসুস্থ অবস্থায় স্বামী যোগানন্দ বাস করিতেন; অপরটিতে নিবেদিতার থাকিবার ব্যবস্থা হইল।'

নিবেদিতা সারদাদেবীর নিকট থাকার ইচ্ছা করেছিলেন এবং শ্রীমা সাদরে তাঁকে গ্রহণ-করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি তখন সমাজ-দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত বলে বোধ হয়েছিল। ব্রাহ্মণকন্যার ঘরে ম্লেচ্ছ বিদেশিনীর স্থান। তখনকার দৃষ্টিতে 'শ্রীমা বস্তুতঃ সমাজবিরোধী কাজ' করেছিলেন যার ফল 'সুদূর পল্লীগ্রামে আত্মীয়স্বজনের উপর পর্যন্ত' বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা ছিল, কিছুকালের মধ্যেই নিবেদিতা তা অনুভব করেন। তাছাড়া নিবেদিতার বিদ্যালয়ের জন্যও স্বতন্ত্র বাড়ির দরকার ছিল। বাগবাজারের মত গোঁড়া জায়গাতে বাড়ি পাওয়াও সহজ ছিল না। অনেক চেষ্টায় 'বোস পাড়া লেনেই শ্রীমার বাড়ির অপরদিকে, অতি নিকটে ১৬ নম্বর বাড়িটি পাওয়া গেল।'

* এই ঘটনায় উল্লসিত স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮, মার্চে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন: "শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পারো, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন!...ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?"

শ্রীমার বাড়িতে আট-দশ দিন কাটাবার পরে নিবেদিতা ঐ বাড়িতে চলে যান।

নিবেদিতা ক্রমে নিজগুণে ঐ রক্ষণশীল বাগবাজার পল্লীতে কন্যাবৎ গৃহীত হয়েছিলেন, সেবিষয়ে বিবরণ নিবেদিতার জীবনীসমূহে এবং অবলা বসুর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়।]

৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৯৯, নেল হ্যামণ্ডকে

তাঁরা (ওলি বুল ও ম্যাকলাউড) শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর ফটো তোমাকে দেখাবেন। ইনি আমাদের 'নিজের মেয়ে' বলে দেখেন আর সদাসর্বদা আশীর্বাদ করেন। তাঁর ফটো কিন্তু সকলের মধ্যে বিতরণের জন্য নয়।

[শ্রীমায়ের যেসব ফটোর উল্লেখ এখানে নিবেদিতা করেছেন, তার একটি অন্ততঃ ঐতিহাসিক ফটো, যেটি এখন সর্বত্র পূজিত হয়। এর আগে শ্রীমার কোনো ছবি তোলা হয়নি, যদিও পরে তোলা অনেকগুলি ছবি পাওয়া যায়। মিসেস ওলি বুল প্রভৃতিরা প্রথম ইউরোপীয় যাঁরা শ্রীমার দর্শন পান, একথা আগেই বলা হয়েছে, আবার মিসেস ওলি বুলই প্রথম শ্রীমার ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন, যেটি দেশে-বিদেশে প্রচারিত ও অর্চিত। এক্ষেত্রে মিসেস বুলের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। অতীব বিস্ময়ের কথা এই ছবি তোলার সময়ে শ্রীমার বয়স পঁয়তাল্লিশ—শ্রীরামকৃষ্ণের 'পূজিত' ছবিটিও পঁয়তাল্লিশ বৎসরে তোলা। 'মায়ের কথা' (২য়) থেকে পাই শ্রীমা তাঁর এই ফটোটিকে 'ঠিক' বলে অনুমোদন করেছিলেন:

"(২৫-৯-১৯১০) জিজ্ঞাসা করিলাম—'মা এ ফটো কি ঠিক?'

"মা—হাঁ, এটি ঠিক। তবে পূর্বে আরও মোটা ছিলুম, যখন ছবি ওঠায়, তখন যোগীনের (স্বামী যোগানন্দ) খুব অসুখ। তার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে গিছল। মন ভাল নয়। যোগীনের অসুখ বাড়ছে তো কাঁদছি, আবার যোগীন ভাল থাকছে তো ভাল থাকছি। সারা মেম (মিসেস ওলি বুল) এসে এইটি ওঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, 'মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করব।' তাই শেষে এই ছবি ওঠায়।"

শ্রীমার এইকালীন ফটোর বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারতের মার্চ, ১৯৬৫-তে প্রকাশিত ও স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের—(আমেরিকান সন্ন্যাসী; পূর্বে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জন ইয়েল) একটি প্রবন্ধে আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যায়:

"ঈশারউড তাঁর গ্রন্থে (রামকৃষ্ণ-জীবনীতে) স্বাভাবিকভাবেই শ্রীমায়ের একটি প্রতিকৃতি দিতে চেয়েছেন। স্থির হয় যে ঠাকুরের ৪৫ বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে তোলা 'পূজিত' ছবির সমজাতীয় মাতাঠাকুরাণীর একটি ছবি দেওয়া হবে। শ্রীমায়ের ঐ ধরনের ছবিটির পরিচয় সন্ধানকালে কতকগুলি আকর্ষণীয় তথ্য পেলাম। এই ভঙ্গির ছবিটি কলকাতায় সিস্টার নিবেদিতার আবাসে ১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসে অন্য দুটি ছবির সঙ্গে একই সময়ে একই অবস্থানে তোলা হয়। ঠাকুরের দেহান্তের ১২ বৎসর পরে শ্রীমায়ের এই ছবি তোলা হয় এবং এইটি তাঁর প্রথম ছবি। শ্রীমার প্রতিকৃতি আমেরিকায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে মিসেস ওলি বুল ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন। শোনা যায় যে, একজন ইংরাজ ফটোগ্রাফারকে নিয়োগ করা হয়েছিল। পশুচর্মের আসন বিছিয়ে, সামনে কয়েকটি টব বসিয়ে দেওয়ার পরে শ্রীমা আসন গ্রহণ করেন। নিবেদিতা ও মিসেস বুল তাঁর শাড়ি ঠিকঠাক গুছিয়ে দিতে সাহায্য করেন। শ্রীমা ফটোগ্রাফারের সামনে বসতে খুবই লজ্জা-

বোধ করেন, কিছুতেই ক্যামেরার দিকে তাকাতে চান না, নতদৃষ্টিতে বসে থাকেন এবং ভাবস্থ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট না হলেও ক্যামেরাম্যান প্রথম ছবিটি তোলেন, যেটি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের 'নতদৃষ্টি চিত্র'। এরপর শ্রীমা সপ্রশ্ন আঁখি তোলেন—'শেষ হয়েছে কি?' ফটোগ্রাফার দ্বিতীয় ছবি তোলেন—সেইটিই সুপরিচিত 'পূজিত' ফটো।…

ঐ সময়ে গৃহীত তৃতীয় ফটোটির বিষয়ে আমার কিছু ব্যক্তিগত বক্তব্য আছে। এইটি হল শ্রীমা ও নিবেদিতার মুখোমুখি বসে থাকার ছবি। ভারতে থাকাকালে আমি কয়েকবার শুনেছি, এটি খাঁটি ছবি নয়, সাজানো ছবি; শ্রীমা ও নিবেদিতার ঐরকম একত্রে ফটো নাকি কখনো তোলা হয়নি; দুজনের দুটি ছবিকে কেটে মুখোমুখি জুড়ে কেউ হয়ত আবার নেগেটিভ তৈরী করে এই ছবি বানিয়েছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। এই তৃতীয় ছবিটির অস্তিত্ব ১২ বছর আগেও অজ্ঞাত ছিল। ১৯৫২ সালে ভারতে আসার পথে আমি ইংলণ্ড ঘুরে আসি; সেখানে আমি আর্ল অব স্যাণ্ডউইচের বাড়িতে ছিলাম। এঁর প্রথম পত্নী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান বন্ধু লেগেটদের আত্মীয়। লর্ড স্যাণ্ডউইচের বাড়িতে দ্বিতীয় লেডী স্যাণ্ডউইচ শ্রীমা-নিবেদিতার এই ছবিটির পুরাতন একটি মূল প্রিণ্ট দেখতে পান। ছবিটি তিনি আমাকে দেন ভারতে নিয়ে যাবার জন্য, এবং বলেন 'তিনি অন্ততঃ আগে এই ছবিটি দেখেননি, সম্ভবতঃ এটি সুপরিচিত ছবি নয়।' 'সুপরিচিত নয়—' বললে অল্পই বলা হয়। বেলুড় মঠে পৌঁছে ছবিটি স্বামী শঙ্করানন্দকে দিলে তিনি রীতিমত অবাক এবং অতীব উল্লসিত! সহর্ষে বললেন, 'এ ছবি আগে কখনো দেখিনিতো। এমন কোনো ফটো আছে জানতামই না!' বর্তমানে এই ছবিটির যেসব প্রিণ্ট দেখা যায়, সে সবগুলিই লর্ড স্যাণ্ডউইচের বাড়িতে থেকে পাওয়া মূল ছবির পুনর্মুদ্রণ।

ফটো তিনটি সম্বন্ধে নিবেদিতার চিঠি থেকে পাই (মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডকে লেখা, ৫ই জানুয়ারী, ১৮৯৯)—

By next week's post I send to London 10 photographs of her (mother). The two negatives are to be 40 Rupees and expenses 3·4—total 43·4 and my proof and negative cost nothing. So unless you write to the Contrary we shall keep the 3 negatives here."]

১৫ জানুয়ারী, ১৮৯৯, ওলি বুল ও ম্যাকলাউডকে

মাতাঠাকুরাণী জানালেন, স্বামীজীর কাছে বৈদ্যনাথে তাঁর এক সম্পর্কের মাসী আছেন। স্বামীজী যে পরে আবার পাশ্চাত্যে যাবেন, এ বিষয়ে মাতাঠাকুরাণীর সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, স্বামীজীর আরও অনেক কিছু করার আছে। গত কাল মা'র জন্মদিন গেছে, তোমরা মনে হয় তা আমাদের টেলিগ্রাম থেকে জেনেছো।

মা হঠাৎ আমাকে গত রাত্রে বললেন, আমি যদি এলাহাবাদে যাই, তিনিও সঙ্গে যাবেন। তিনি সর্বদা আমার সঙ্গে থাকতে চান! আমি জানতাম না যে তিনি এলাহাবাদের ব্যাপারটা জানেন। ব্যাপারটা তিনি পছন্দ করেন না। তাঁর কথার পিছনে মিসেস বুল আছেন কি—কি জানি! তুমিই বলতে পারবে। যাই হোক

জিনিসটি সুন্দর। পরের সপ্তাহের ডাকে লণ্ডনে তাঁর দশটি ফটোগ্রাফ পাঠাবো।……

৩ মার্চ, ১৮৯৯, নেল হ্যামণ্ডকে

ভালো কথা, মাতাঠাকুরাণীর কাছে তোমার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। উষ্ণ এক সন্ধ্যায় সঙ্গিনীদের সঙ্গে বসেছিলেন, সেখানে তোমার চিঠি অনুবাদ করে শুনিয়েছিলাম। তাঁরা প্রায়ই তৃপ্তিতে 'আহা!' বলে উঠছিলেন, আর আনন্দ প্রকাশ করে নিজেদের ডানদিকের কাঁধে চুমু খাচ্ছিলেন। (অর্থাৎ আনন্দে ডান-দিকে মুখ ফিরিয়ে, কাঁধ একটু উঁচু করে কাঁধে মুখ ঠেকাচ্ছিলেন, যা নিবেদিতার কাছে নিজ কাঁধে চুমু খাওয়ার মত মনে হচ্ছিল)। শুধু অমন একটি চিঠি লিখে তুমি তাঁদের মন কত গভীরভাবে স্পর্শ করেছ তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।……

শ্রীমাকে তোমার জন্য কিছু বলতে বললাম। তিনি তাঁর স্নেহ আর আশীর্বাদ জানালেন—তোমাকে নিজের সত্যিকারের মেয়ের মত তিনি দেখেন। এর বেশী তুমি কিছু আশা করো না যেন। কারণ অভিজ্ঞতা ও বাস্তব-বোধের বাইরে, চিন্তারাজ্যে, এই মহিলাদের পরিধি ব্যাপ্ত নয়। অনুভূতিরাজ্যেই এঁদের যত শক্তি। বুঝতেই পারছ, এঁরা এমন কোনো শিক্ষা পাননি যার দ্বারা নিজেদের চিন্তাকে অপরিচিতের কাছে আবেদনযোগ্য করে তুলবার মত করে গঠন করতে পারেন।

কিন্তু অনুভূতিতে শ্রীমা অনবদ্য। জেনে রেখো, তাঁর ঐ ফটো তোলার অর্থ—এক্ষেত্রে তিনি জীবনে প্রথম নিজ পরিবারের বাইরে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিকে সরাসরি তাকালেন, বা তেমন কেউ তাঁর মুখ দেখলেন। তাই বলে এর জন্য কোনো আত্মসচেতনতা তাঁর ছিল না—এক বিন্দুও নয়। স্বামীজী কিংবা এমনকি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে তাঁর বিবাহের পরে (বিবাহকালে বয়স মাত্র পাঁচ!) অবগুণ্ঠনহীন দেখেন নি।* পুরুষেরা তাঁকে পূজা করবার জন্য অন্তঃপুরের দরজা পর্যন্ত, কিংবা কখনো তার ভিতর পর্যন্ত এলেই অবিলম্বে তাঁর মুখের উপর লম্বা ঘোমটা নেমে আসে, যদিও কখনো কখনো প্রান্তে একটু ফাঁক থাকে, যাতে নিম্নচোখে তাকানো যায়। এই নিয়ে আমি এত মজা করেছি যে, পুরুষেরা বাইরে অপেক্ষা করার কালে তিনি সারাক্ষণ হেসে লুটোপুটি করেন, কিন্তু কোনো চাকর কিংবা সন্ন্যাসী যেমনি সিঁড়ির উপরে উঠে এসে চেঁচিয়ে জানালেন—অমুকচন্দ্র অমুক শ্রীমাকে প্রণাম জানাতে আসছেন—অমনি সমস্ত ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে ঘনীভূত হয়ে যায়, সমস্ত কথা থেমে যায়, হাত-পাথার নড়াচড়াও বন্ধ, ঘোমটা মুখে নেমে আসে নিঃশব্দে, সারা গা কাপড়ে ঢেকে যায়, ঘরের মাঝখানে বসে থাকলে আধখানা শরীর

* বালক নরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত সারদাদেবীকে অবগুণ্ঠনমুক্ত দেখেন নি কেন, এ বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতা ও মিস্ ম্যাকলাউডের এক কথোপকথন তুলে দেওয়া হয়েছে নিবেদিতা গার্লস স্কুল প্রকাশিত Sister Nivedita's Works-এর প্রথম খণ্ডে, *Notes on some wanderings* গ্রন্থের সংযোজনীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে কালীর অবতার, এই কথা বলেন। তারপর বলেন—

"এই সব অবতারের সঙ্গে একদল মানুষ আসেন, যাঁদের বলা হয় ঈশ্বরকোটী, যাঁদের প্রধান লক্ষণ—তাঁরা কখনো নিজেদের স্বার্থে কোনো কাজ করতে পারেন না—অপরকে সেবা ও সাহায্যই তাঁরা করে যান, তাঁরা সহায়তা করেন ভাবপ্রচারে।

"এক্ষেত্রে আমার ভূমিকা? হাঁ, রামকৃষ্ণ সর্বদা বলতেন, ঐ অবতারের 'নর' আমি!"

'সেই জন্যই কি আপনি কখনো সারদার মুখ দেখেন নি, তিনিও দেখেন নি আপনার?'—জয়া (ম্যাকলাউড) জিজ্ঞাসা করলেন।

আচার্যদেব সমর্থনে মাথা নাড়লেন।"

দরজার দিকে ঘুরে যায়—সব কিছু নীরবে ঘটে যায়। তারপর আগন্তুক বাইরে এসে দাঁড়ায়, চৌকাঠে মাথা ঠেকায়, কিংবা ভিতরে এসে শ্রীমার চরণ স্পর্শ করে এবং বলে: সে এই এই কাজ করতে যাচ্ছে। লোকটি হয়ত সদ্য কলকাতায় এসেছে, মায়ের জন্য কিছু প্রণামী এনেছে, কিংবা সে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে, তাই মায়ের আশীর্বাদ চায়। শ্রীমা তখন পার্শ্ববর্তিনীর কাছে অতি মৃদুস্বরে সস্নেহে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন, সেগুলি উচ্চতর স্বরে লোকটির কাছে শোনানো হয়। সব শেষে লোকটি আবার প্রণত হয়, শ্রীমা হাত জোড় করেন, যার দ্বারা বোঝা যায় তিনি আশীর্বাদ করলেন। তখন লোকটি চলে যায়। এতক্ষণে আবহাওয়ার ভার কমে। আগেকার ভাবভঙ্গি ফিরে আসে, কথা শুরু হয়, পাখা নড়তে থাকে, ঘোমটা খসে পড়ে—।

তাঁর মত স্বামীকে পূজা করেছেন অথচ স্বামীকে মুখ দেখতে দেননি—এমন কাউকে ভাবতে পারো! মুখ দেখতে দিলে স্বামীর মনে বা চিন্তায় তিনি কখনো কখনো উদিত হবেন—এই লোভ তো থাকতে পারত! না, অপরূপ তাঁর আত্মবিলয়—ইনি তাও চান নি। ভাবতেও শিহরিত হয়ে উঠি!

১২ মার্চ ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

আগামী সোমবার সকালে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের আসল জন্মোৎসবের (অর্থাৎ জন্মতিথির) জন্য মঠে যেতে পারতাম কিন্তু আমি 'না' বলায় স্বামীজী খুশী হলেন। তখন ভাবলাম, যদি মাকে দিয়ে [প্রিয়তমা য়ুম (ম্যাকলাউড) তুমিই এঁকে মা ডাকতে শিখিয়েছ—আমার ছেড়ে-আসা বাড়ির ছোট্ট মায়ের দাবির সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কের একটা টানাটানি ছিলই] খোকাদের জন্য (জগদীশ বসুদের জন্য) বিশেষ পূজা করিয়ে নিতে পারি, সেটাই আমার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের চেয়ে অনেক বড় কিছু হবে।...

আগামীকাল সেণ্ট প্যাট্রিক দিবস।...এক বছর আগে ঐ দিনটিতে আমরা সকলে মাকে দর্শন করেছি, তুমিই আমাকে ঐ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলে।...

সোমবার ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আসল জন্মদিন। শ্রীমা এসে পূজাঘরে তাঁর প্রতিকৃতির কাছে বিশেষ পূজা করেছিলেন। তারপরে তাঁর সঙ্গিনীরা ফলমূল আনলে তিরিশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি বসে প্রসাদ পেলাম। খাবার আগে বাচ্চাদের লম্বা হয়ে প্রণাম করার মধুর দৃশ্য যদি দেখতে—আর তাদের কলকাকলি! সুন্দর, ছোটখাট Holy Eucharist-এর (যীশুর নৈশভোজ) তুল্য ব্যাপারটা, সেই সঙ্গে বড়দিনের ভোজ। বিকালে শ্রীমা, তাঁর সঙ্গিনীরা, বাচ্চারা আর আমি—সকলে মিলে সাতটা গাড়ি করে চ্যাটার্জি নার্সারির অর্কিড দেখতে গেলাম,—নার্সারিতে মেয়েদের দিন ঐটি। কদাপি মনে করো না এর দ্বারা বাড়াবাড়ি খরচ হয়েছে কিছু। দু'বার চল্লিশ জন করে লোক নিয়ে গেল—কিন্তু গাড়িভাড়া ১২৲ টাকারও কম!...

চুপিচুপি য়ুম তোমাকে বলি, শ্রীমা বললেন, স্বামীজী সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক সেই কথাই বলেছিলেন স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রীমায়ের কাছে। কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকব আমি।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান দৃষ্টি

ব্রহ্মচারী বিদ্যাচৈতন্য

দৃগ্‌দৃশ্যৌ দ্বৌ পদার্থৌ স্তঃ পরস্পরবিলক্ষণঃ।
দৃগ্‌ ব্রহ্ম দৃশ্যা মায়েতি সর্ববেদান্তডিণ্ডিমঃ॥
ঘটকুড্যাদিকং সর্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি।
তদ্বদ্‌ ব্রহ্ম জগৎ সর্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥

(ব্রহ্মজ্ঞানাবলী-মালা, ১৮ ও ২০)

আলো ও অন্ধকারের ন্যায় দৃক্‌ ও দৃশ্য পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবসম্পন্ন। দৃক্‌ সাক্ষিচৈতন্য ও ব্রহ্মস্বরূপ; সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, অজ, নিত্য, অক্ষয়। দৃশ্য জড়, ত্রিগুণাত্মক, মায়ার কার্য ও বিকারী। একের ধর্ম অপরে কদাপি দৃষ্ট হয় না। 'মায়া তৎকার্যদেহাদি মম নাস্ত্যেব সর্বদা' —মায়া ও তৎসৃষ্ট দেহ-ইন্দ্রিয়াদির আত্মাতে অত্যন্তাভাব। 'ব্রহ্ম সর্বদৃক্‌ সদা।'

জগৎ, যাহা মায়ার কার্য ও দৃশ্য, স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। মৃত্তিকাপিণ্ডকে জানিলে যেমন মৃত্তিকার পরিণামভূত সমস্ত বস্তুই জ্ঞাত হয় (কার্য ও কারণ অভিন্ন বলিয়া ঘট পট সরা মৃত্তিকাতিরিক্ত অন্য কিছু নহে, মৃত্তিকার ধর্মই ঘটপটাদিতে বিদ্যমান), তদ্রূপ স্থাবর জঙ্গম চরাচর ভূতবর্গ নামরূপাদিতেই বিভিন্ন, উহাদের কারণরূপে ব্রহ্ম সর্বানুস্যূত ও সত্য। জগৎ চৈতন্যাতিরিক্ত অন্য কিছু নহে, জগৎ চৈতন্যস্বরূপ।

শ্রীশঙ্করাচার্য-রচিত অদ্বৈত বেদান্তের যে দুইটি সিদ্ধান্ত উক্ত হইল তাহা আপাতবিরোধীর ন্যায় প্রতীত হইলেও নিজ নিজ ক্ষেত্রে উভয়েই সত্য। শ্রুতি ও অনুভব সহায়ে বিচার করিলে দেখা যায় যে উহা তত্ত্বোপলব্ধির দুইটি অবস্থা-মাত্র। সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত সোপানবৎ পর্যায়ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়।

'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি জীবের স্বরূপাবধায়ক মহাবাক্য উপলব্ধির জন্য শাস্ত্রে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান দেওয়া হইয়াছে। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা-সিতব্যঃ' (বৃঃ উপ, ২।৪।৫)। শ্রুতিবাক্য শ্রবণের মধ্যে 'নেতি' 'নেতি' বিচার প্রধান অঙ্গ। যথা—

নাহং দেহো ন চ প্রাণো নেন্দ্রিয়াণি তথৈব চ॥
ন মনোঽহং ন বুদ্ধিশ্চ নৈব চিত্তমহংকৃতিঃ।
নাহং পৃথ্বী ন সলিলং ন চ বহ্নিস্তথাঽনিলঃ॥
ন চাকাশো ন শব্দশ্চ ন চ স্পর্শস্তথা রসঃ।
নাহং গন্ধো ন রূপং চ ন মায়াহং ন সংসৃতিঃ॥

(ব্রহ্মানুচিন্তনম্‌, ২১-২৩)

অনাত্মার অপবাদে চিত্ত স্বভাবতই আত্মধ্যানে নিয়োজিত হয়। স্বস্বরূপের ধ্যানের প্রকার আচার্যের লেখনীতে উক্ত হইয়াছে—

নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোঽস্মি নির্মলঃ॥
নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্‌
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ॥

(আত্মবোধঃ, ৩৪ ও ৩৬)

স্বয়ংজ্যোতি আত্মার নিরন্তর ধ্যানের ফলে জ্ঞানী মায়া বা জড়পদার্থ হইতে নিজের পৃথক অস্তিত্ব অনুভব করেন। মায়া ত্রিগুণাত্মক, জড় ও উৎপাদ্য; উহা নিজেকে ও অপরকে প্রকাশ করিতে পারে না। তজ্জন্য উহা দৃশ্য ও পর-নির্ভর। পরন্তু ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, দ্রষ্টা ও ত্রিকালা-বাধিত। সমাধিতে জীব-জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই নিত্যধাম বা তুরীয়। আত্মানুভূতি বাক্যমনাতীত। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান—ত্রিপুটির বিলুপ্তিতে নাম রূপ ও

বহুত্বের জগৎকে পিছনে ফেলিয়া জ্ঞানী অবাঙ্‌-মনসোগোচর রাজ্যে প্রবেশ করেন। ইহাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও পরম প্রাপ্তি। বেদান্তমতে ইহাই মুক্তি। বিবিধ উপায়ে আত্মচৈতন্যের স্বরূপ উপনিষদে বর্ণনা করা হইয়াছে—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ (বৃঃ উপ, ৪।৩।৭); অয়মাত্মা ব্রহ্ম (বৃঃ উপ, ২।৫।১৯); য আত্মা সর্বান্তরঃ (বৃঃ উপ, ৩।৪।২); সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (তৈঃ উপ, ২।১।৩); যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি (বৃঃ উপ, ৩।৫।১); সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ (শ্বেতঃ উপ, ৬।১১)।

শ্রেয়ের পথে জীবকে চালিত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণ ও স্বস্বরূপকে জানাই জ্ঞান। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যের উহাই শেষ কথা নয়। জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন দ্বারা অচেতন জগতের যথার্থ স্বরূপ জানা এবং চেতন জীব ও জড় জগতের মধ্যে যোগসূত্র কোথায় উহা উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

জীব ও জগতের মধ্যে স্বরূপগত ঐক্য বিদ্যমান বলিয়াই উপনিষদে প্রশ্ন করা হইয়াছে—

কস্মিন্ন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি (মুঃ উপ, ১।১।৪)। কোন্ বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সম্ভব ?

যদয়মাত্মা পদনীয়ম্—অনেন এতৎ সর্বং বেদ (বৃঃ উপ, ১।৪।৭)। এই যে 'আত্মতত্ত্ব ইহাই জ্ঞাতব্য। আত্মার জ্ঞানের দ্বারাই এই সমস্তকে জানা যায়। 'আত্মা চ ব্রহ্ম'। আপাতপ্রতীয়-মান চেতন অচেতন, দৃষ্ট অদৃষ্ট, মূর্ত অমূর্ত, নামরূপাদিভেদে যাহা কিছু বর্তমান সবই ব্রহ্ম-স্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানেই সর্ববিজ্ঞান।

শাশ্বত সত্য বস্তু জীবের নিকট দুই প্রকারে প্রতিভাত হয়—যথা, নিত্য ও লীলা বা ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ ভাব। সাধারণ অর্থে বলিতে ক্রীড়া বুঝায়। কিন্তু বেদান্তদর্শনে মায়ার কার্য জীবজগৎ ও নামরূপের বহুত্বকেই লীলা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সৃষ্টির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে স্রষ্টাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বৈতভূমিতে বিরাজ করিয়াই সৃষ্টি ও স্রষ্টার অস্তিত্ব গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং ঐ অবস্থা অজ্ঞানের অধীন। লীলা নামরূপবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন, সগুণ, সীমিত ও বহুত্বের রাজ্য, যেমন নিত্য বলিতে নির্গুণ, নির্বিশেষ, দ্বৈতবর্জিত, অনন্ত ব্রহ্মকেই বুঝায়।

নিত্য ও লীলাকে কুণ্ডলীকৃত ও গতিশীল সর্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চলমান ও গতিরহিত সর্পের মধ্যে কেবল অবস্থারই তারতম্য রহিয়াছে, সর্পাতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু নাই। তেমনি নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম সনাতন ব্রহ্মেরই দুই অবস্থার কল্পনামাত্র। মায়া ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, ব্রহ্মাতিরিক্ত মায়ার কোন অস্তিত্ব নাই। জীব মায়াধীন বলিয়া নামরূপ-যুক্ত জগৎকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। মায়া-মুক্ত জীব শুদ্ধ ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া জানে। মায়ার সৃষ্ট জীবজগৎ কখনই অসত্য হইতে পারে না কারণ উহাদের অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মই বিরাজ করিতেছে; দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বহির্জগৎ অলীক নয়, উহাদেরও সত্যতা আছে তবে আপেক্ষিক, চিরন্তন নহে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান বৃত্তিজনিত হইয়া থাকে। জাগতিক বিচিত্রতার হেতু জ্ঞানের প্রকারও বিভিন্ন। কিন্তু ভেদদৃষ্টি দ্বারা মানুষ অমরত্ব লাভ করিতে পারে না কারণ বহুত্বের রাজ্য মায়িক। বেদে উক্ত হইয়াছে—'নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি' এই ব্রহ্মে অণুমাত্রও ভেদ

নাই। যে ইহাতে ভেদ-সদৃশ বস্তু দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। আবার সমাধিতে ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনের ক্রিয়া বন্ধ থাকে, আত্মার অপরোক্ষানুভূতি হয়। ত্রিপুটির বিলয়ে নিত্যমুক্ত আত্মার রসাস্বাদনের জন্য জ্ঞাতা বা ভোক্তা কেহ থাকে না। তাই এমন একটি অবস্থার প্রয়োজন ও সত্যতা আছে, যখন মন সগুণের রাজ্যে বিচরণ করিতেছে অথচ দৃষ্টি অবিদ্যাপ্রসূত নহে। সগুণে অবস্থান করিয়াও মন অদ্বৈতে নিবদ্ধ। নিত্য ও লীলা হইতে ব্যতিরিক্ত এইরূপ এক ভূমির কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে এবং উহা আচার্য কর্তৃক সমর্থিত। 'বিজ্ঞানং চাত্মদর্শনম্' (সদাচারঃ, ৪৫)।

সর্বভূতে চৈতন্যদর্শনই বিজ্ঞান। সমাধিতে আত্মজ্ঞানের পর যাহার মন সৃষ্টির বহুত্বের মধ্যে নামিয়া আসে তিনিই অনুভব করিতে পারেন—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ উপ, ৩।১৪।১), 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা' (বৃঃ উপ, ২।৪।৬) অর্থাৎ নামরূপাদি খোলে বস্তুর অনেকত্ব রহিয়াছে কিন্তু স্বরূপে চৈতন্যই বিদ্যমান; চৈতন্য বিনা বস্তুর কোন সত্তা নাই। বিজ্ঞানীই দেখেন চরাচর ভূতবর্গে যাহা কিছু আছে সব বিরাট চৈতন্যেরই ভাবতরঙ্গমাত্র।

'আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি
সর্বমাত্মানং পশ্যতি।

(তিনি) দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন—নিখিল বস্তুকে আত্মা বলিয়া সন্দর্শন করেন।' (বৃঃ উপ, ৪।৪।২৩)। আচার্য লিখিয়াছেন—

সম্যগ্‌বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা॥

যাহার সম্যগ্‌জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, এবং-বিধ যোগী যেমন আত্মাতে সমস্ত জগৎ দেখেন, সেইরূপ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা সমস্ত আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। (আত্মবোধঃ, ৪৭)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহুমুখী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞান দর্শন বিষয়ে নতুন তথ্য পাওয়া যায়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রভেদ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—'জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা, এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১১৮) 'বিজ্ঞান কি না তাঁকে বিশেষরূপে জানা। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা, বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে দাসভাবে মধুরভাবে, এরই নাম বিজ্ঞান।' (ঐ, পৃঃ ৬৮)

বিজ্ঞানীর অনুভূতি তিনি বর্ণনা করিতেছেন—'আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়! প্রতিমা চিন্ময়! বেদী চিন্ময়! কোশাকুশী চিন্ময়! চৌকাঠ চিন্ময়! মানুষ জীব জন্তু সব চিন্ময়!' (ঐ, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৪২ ; ৩য় ভাগ, পৃঃ ৮৪)

সর্বভূতে চিন্ময় দৃষ্টির দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়া স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন—

(নির্বিকল্প সমাধি হইতে কিঞ্চিৎ ব্যুত্থিত হইয়া) "ঠাকুরের 'আমি' বোধটার ঈষৎ প্রকাশ যখন হইতেছিল তখন দেখাইতেছিল যেন একটা বিরাট মনে নানা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, ভাসিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে আবার লয় হইতেছে। অপর সকলের তো কথাই নাই, ঠাকুরের নিজের শরীরটা, মনটা ও আমিত্ব-বোধটাও ঐ বিরাট মনের ভিতরের একটা তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯)

অনন্তশক্তিসম্পন্ন যে বিরাট 'আমি'র কথা বলা হইয়াছে তাহা বস্তুতঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরেরই আমিত্ব। এই বিরাট 'আমি'র ইচ্ছাতেই প্রতিটি কার্য নিয়ন্ত্রিত ও সুসম্পন্ন হইতেছে। ব্যষ্টি 'আমি' বিরাট 'আমি'রই অংশমাত্র। বস্তুসমষ্টি ও ভাবরাশি 'আমি'-রূপ চিৎসমুদ্রের একএকটি ঢেউ বই আর কিছু নয়। বিরাট 'আমি'র সৃষ্টির বিরাম নাই—সমুদ্রে অগণিত ঢেউয়ের পতনের পর যেমন আপনবেগেই নব নব ঢেউয়ের সঞ্চার হয় তেমনি বিরাট 'আমি'তে অসীম অনন্ত ভাব ও বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। জীবের নিকট এরই নাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইহাই চলমান জগৎ, ইহাই ঈশ্বরের লীলা।

নিত্যধামে যিনি বিরাজ করেন তাঁহার নিকট নির্গুণ নিরবচ্ছিন্ন চিদাদ্বৈতানুভূতি ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, কিন্তু যখন 'আমি'-জ্ঞানের কিঞ্চিৎ প্রকাশ হয় অর্থাৎ নির্গুণের অদ্বৈত ভাব লইয়া যখন লীলার বৈচিত্র্যে অবতরণ করেন, তখনই দেখেন জীব-জগৎ বিরাট চিৎরূপী 'আমি'রই খেলা। যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অনুভূতিকেই 'ভাবমুখ' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বিরাট 'আমি'র সহিত নিজের একাত্মবোধ অনুভব করা এবং যাবতীয় কার্যকলাপ সেই 'আমি' হইতেই উত্থিত হইতেছে এইটি উপলব্ধি করা! চিৎরূপ 'আমি'ই নানা রূপ ধরিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান। তাহাদের আকার অনন্ত, ভাব অনন্ত। অবিদ্যাধীন জীব বিরাট 'আমি' সম্বন্ধে অজ্ঞ, অনন্ত ভাবতরঙ্গে চিৎরূপ যোগসূত্র উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই উহাদের খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, জড় বলিয়া দেখে।

জগৎকে যাঁহারা প্রপঞ্চ, মিথ্যা, মায়ার চাতুরী বলিয়া মনে করেন সেই বিচারবাদীদের নিকট চিন্ময় দৃষ্টি এক অবাস্তব কল্পনা। উক্ত ভ্রান্তি খণ্ডন করিতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন—'তিনিই আমি, তিনিই জীব জগৎ সব। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই লীলার জন্য নানা রূপ ধরিয়াছেন।' (ঐ, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৮৯)

সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছান যায়। বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তিনি দেখেন—ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারী সেই ইট, চুন, সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারী। নেতি নেতি করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ।' (ঐ, পৃঃ ১১)

লোকহিতকর কার্য সম্পাদনের জন্যই বিজ্ঞানী নিত্যভূমি হইতে লীলায় অবস্থান করেন। "ব্রহ্মজ্ঞানের পর—সমাধির পর কেহ কেহ নেমে এসে 'বিদ্যার আমি' 'ভক্তির আমি' লয়ে থাকে। এর দুটি উদ্দেশ্য। প্রথম লোকশিক্ষা হয়, তারপর রসাস্বাদনের জন্য।" (ঐ, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ, ৭ ও ৩৫০)

যিনি স্বরূপকে বোধে বোধ করিয়াছেন অথচ জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ করেন নাই তাঁহার সহিত বিজ্ঞানীর কতই না পার্থক্য। জাগতিক প্রচেষ্টাকে তিনি মায়ার খেলা, সংসারের বন্ধন বলিয়া মনে করেন। জগতের অস্তিত্ববোধে তিনি অসুখী, বুঝি বা শঙ্কিতও —পাছে বন্ধনে পড়েন। তাই দ্বৈতবর্জিত সমাধিরাজ্যে তিনি প্রবেশ করিতে ব্যস্ত! এই সংসার তাঁহার নিকট 'ধোকার টাটি' কারণ মায়ার বেষ্টন বলিয়া ইষ্টলাভের উহা পরিপন্থী। তিনি নিজের মুক্তি অর্জন করিতেই ব্যস্ত, অপরকে পথ দেখাইবার তাঁহার শক্তি ও সাহস কোথায়?

কিন্তু বিজ্ঞানী জগতের স্বরূপ উপলব্ধি

করিয়াছেন তাই উহা তাঁহার নিকট 'মজার কুঠি'। চিন্ময় ভাবে পূর্ণ তাঁহার মন সর্বদাই হৃষ্ট ও পরিপূর্ণ। সাংসারিক কোলাহলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও তিনি ধীর শান্ত সৌম্য। নির্ভীক হৃদয়ে তিনি সংসারে বিচরণ করেন ও কল্পতরুর ন্যায় জীবের অভিলাষ পূরণ করিতে পারেন। তিনি মুক্তিদাতা। লীলাবস্থার মিথ্যাত্ববোধ তাঁহার নিকট দূরীভূত হইয়াছে আবার নিত্যধামকেও তিনি স্পর্শ করিয়াছেন। তাই বিরাট 'আমি'র সহিত নিজেকে অভিন্ন দেখিয়া তিনি লোক-হিতকর কার্য সম্পাদন করেন।

সমুদ্রের সহিত মহামিলনেই নদীর পরিপূর্ণতা। মহাকাশেই ঘটাকাশের পরিসমাপ্তি। উপাধির বিলুপ্তিতে বস্তুর স্বরূপে অবস্থান। তাই আচার্য বলিয়াছেন—

চিদেব দেহস্ত চিদেব লোকা-
শ্চিদেব ভূতানি চিদিন্দ্রিয়াণি।
কর্তা চিদন্তঃকরণং চিদেব
চিদেব সত্যং পরমার্থরূপম্ ॥

(স্বাত্মপ্রকাশিকা, ১৯)

নিবেদিতা

স্বামী জীবানন্দ

সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে বেদান্তের বীর্যময় বাণী
শুনি সচকিতা
দূর মহাসাগরের পার হতে ভক্তি-অর্ঘ্য আনি
পাশ্চাত্য-দুহিতা,
ডালি দিলে শ্রদ্ধাভরে শ্রীচরণে ভারতমাতার—
সেবা অতুলন—
তনু মন প্রাণ আয়ু বিদ্যা বল সব আপনার
করি সমর্পণ!

স্বদেশ গৃহ স্বজন পরিজন সবাকারে ভুলে
তুমি বিদেশিনী,
জপি কোন্ মহামন্ত্র, কী অপূর্ব সিদ্ধি লভি হলে
ভারত-নন্দিনী!
ভারতের জাগরণ-যজ্ঞে দান অবিস্মরণীয়—
নাহি যাবে চলে
বিস্মৃতির তলে কভু, অমলিন রহিবে অক্ষয়
দূর ভাবী কালে।

বিবেকানন্দের দীপ্ত জীবন-সূর্যের স্পর্শ হতে
　　জীবন-প্রদীপ
জ্বালি হলে শিখাময়ী, জ্বালাইলে পরে তাহা হতে
　　কত শত দীপ!
বিপ্লব-বহ্নিতে তব ভস্ম হল ক্লীবতার গ্লানি
　　ভীরুতার ছল,
স্মরিলে আজিও জাগে হৃদে সিংহ-সাহসের বাণী
　　তেজ বীর্য বল!

ভারত-সংস্কৃতি-পটে অলক্ষ্য অক্ষরে লেখা তব

সাহিত্য বিজ্ঞান ধর্ম শিল্প—সর্ব ক্ষেত্রে অভিনব
　　তোমার সুকৃতি।
যাগ্য বিশেষণে তাই করিয়াছে কত গুণী জন
　　তোমা সুশোভিতা,
'লোকমাতা' 'মহাশ্বেতা' 'শিখাময়ী' 'সতী'-আদি বলি,
　　গৌরব-মণ্ডিতা।

কিন্তু বিশেষণে আরো বিশেষিত করিবারে তারে
　　সাধ্য আছে কার,
'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'—এই নামে
　　পরিচয় যার?
তব জন্ম-শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে হৃদয়ে-হৃদয়ে
　　জাগো নিবেদিতা,
'বান্ধবী, সেবিকা, মাতা', মহাশক্তি শান্তিরূপা হয়ে
　　চির-অনিন্দিতা!

স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ

শ্রীসন্তোষকুমার তালুকদার

অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে দু'মুঠো অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন—তা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে জাগাতে হবে, গরীবদের খাওয়াতে হবে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে দিকে দিকে,…কান্না পায় না? মাদ্রাজ, বম্বে, পাঞ্জাব, বাঙলা—যে দিকে চাই, কোথাও যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না!—

স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে আমাদের প্রাণের এই কথা অনুরণিত হয়েছে। এই আদর্শ পুরুষের চিন্তায় মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী স্থান পেয়েছে। দেশের কথা চিন্তা করে যাঁর মনে জেগেছে উত্তাল তরঙ্গ, চোখ হয়েছে নিদ্রাহীন। এই বীর সন্ন্যাসী বিশ্বপথিক বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ছিলেন পরাধীন দেশেও স্বাধীন লোক; বিদেশে তিনিই ছিলেন Cyclonic Hindu বলে পরিচিত।

দেশবিশ্রুত বিবেকানন্দের কীর্তি আমাদের চিন্তা ও বাস্তব জীবনের সবক্ষেত্রেই তাঁর মুদ্রাঙ্ক রেখে গেছে। স্বাদেশিকতায় তাঁর স্থান কত উচ্চে তা বিচার করতে গেলে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করতে হয়। তাঁর কর্মকথা, চরিত-কথা কালসমুদ্রের কতগুলি লহরী-লীলায় কমলেকামিনীর ন্যায় রূপ বিস্তার করবে তা গণনা করা অসাধ্য। তিনি যে মহতী প্রেরণা জীবনে অনুভব করেছিলেন তা জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা সংক্রামিত করেছেন। মহাপুরুষেরা সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের উপর যে প্রভাব রেখে যান, তার দ্বারাই তাঁদের মহত্ত্ব পরিমিত হয়ে থাকে। সে প্রভাব আমাদের সাধারণ মাপকাঠিতে পরিমিত হতে পারে না। বিবেকানন্দের এসব উক্তি আমাদের মনে সংশয়ের উদ্রেক করে—এ কোন্ বিবেকানন্দ—এ কি সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের বলে বলীয়ান, গেরুয়াধারী বিবেকানন্দ, না অন্য কোন ব্যক্তি!

মানবপ্রতিভা বৈচিত্র্যময়। দুরতিক্রম বাধাসমূহ অতিক্রম করে সিদ্ধিলাভ করাই প্রতিভার স্বাভাবিকতা। কিন্তু সেই প্রতিভার সঙ্গে যদি বিশ্বজনীন প্রেম, নিরভিমান নিঃস্বার্থতা ও পূত চরিত্রের মহিমা যুক্ত থাকে তবে তা বিধাতার শুভাশীর্বাদ বহন করে আসে। শিশুর ন্যায় সরল পবিত্র, সদাশুভ্র হাস্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল, এই সকলই তাঁকে দেবত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। ভারতের মুক্তিসংগ্রামী, ইতিহাসের চলমান উল্কারূপে এবং নিজ আদর্শানুযায়ী দেশপ্রেমের দীপ্তিতে তিনি অবিস্মরণীয়।

যারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দিয়ে অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হয়ে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে একবারও এদের কথা চিন্তা করবার অবসর পায় না—তাদের তিনি 'বিশ্বাসঘাতক' মনে করেছেন। এই নির্যাতিত অধঃপতিত নরনারীর কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার ডিগ্রিধারী ব্যক্তির দ্বারা যে জাতি গড়ে ওঠে না, তা বহুবার বলেছেন স্বামীজী। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করে রাখবার জন্য। যাদের শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই

সে সব জড়-পিণ্ডের দ্বারা কিছু হবার নয়, তাই তিনি নেড়ে চেড়ে তাদের মধ্যে সাড়া আনতে চেয়েছিলেন এবং এ ছিল তাঁর প্রাণান্ত পণ। একটা মানুষ তৈরী করতে যদি লক্ষ লক্ষ বার জন্ম নিতে হয় তাও তিনি নিতে প্রস্তুত ছিলেন।

নিজের কথা কখনো ভাবেননি স্বামীজী। ব্যক্তিগত সাফল্য তাঁর লক্ষ্য ছিল না—তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের জয়—সমগ্র বিশ্বকে মিলন- ও উদার-মন্ত্রে দীক্ষিত করা। দুর্বলতা-রূপ পাপ ভারতবাসীকে কিভাবে নাগপাশের মত আবদ্ধ করেছে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে কান পাতি কেবল শুনি খোল-করতালই বাজছে। ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে কেবল মেয়েমানুষ বাজনা শুনে শুনে দেশটা মেয়েদের দেশ হয়ে গেল।' এক কথায় আমরা বলতে পারি তিনি দেশবাসীকে দেশাত্মবোধের মন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য ঠুংরী-টপ্পার আসরে পাখোয়াজ বাজিয়ে ধ্রুপদ গাইতে এসেছিলেন। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনবার জন্য দেশবাসীকে খেতে-শুতে-পড়তে, গাইতে-বাজাতে, ভোগে-রোগে কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিতে শিখিয়েছেন।

কপটতা, লুকোচুরি যেন কোন লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে, তার জন্য স্বামীজী সাবধানী বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। আর সর্বদাই ধৈর্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়কে পাথেয় করতে শিখিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে মঠমন্দির অনেক হয়েছে এবার হোক কল-কারখানা। কাজ করবার হাতিয়ার তিনি ভারতবাসীর হাতে তুলে দিতে এসেছিলেন—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়ে অন্নের সংস্থান করতে শিখিয়েছিলেন।

"আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জনই অশিক্ষিত অথচ কে তাহাদের কথা চিন্তা করে? এই সকল বাবুর দল কিংবা তথা-কথিত দেশহিতৈষীর দল কি? ছ্যা! ছ্যা! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড় জোর ডেপুটি-গিরি চাকরি—এই তো! এতে দেশের কি হলো? একবার চোখ খুলে দেখ স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকার উঠেছে। ফেলে দে তোর শাস্ত্র ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করার উপায় শিখিয়ে দে তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস।" "হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘুরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক।" তবেই দেশের ও দশের মুক্তি সম্ভব।

দেশে শিক্ষার আলো দেবার জন্য এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করার জন্য তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। ওদেশের মেয়েরা যে আকাশের পাখীর মত স্বাধীন তাদের তুলনায় এদেশের মেয়েদের অবস্থা তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষিত এবং উন্নত না করলে এ পশুজন্ম যে কিছুতেই ঘুচবার নয় তা তিনি বার বার বলেছেন। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে যে মেয়েরা প্রাণহীন স্পন্দনহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন।

স্বামীজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন

যে স্বাধীনতা ব্যতীত কোনরূপ উন্নতিই সম্ভব নয়—স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম সোপান। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, ফলে আমরা এই অপূর্ব ধর্ম পেয়েছি। কিন্তু তাঁরা সমাজের পায়ে অতি কঠিন শৃঙ্খল পরিয়েছেন। যেমন মানুষের চিন্তা করবার ও কথা বলবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তার আহার বিহার বিবাহ এবং অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—কিন্তু এই স্বাধীনতা যেন অপরের অনিষ্ট না করে।

স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের মন্ত্র, তাঁর মত এবং পথ আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে, প্রয়াগের অক্ষয় বটের মত ভারতবাসীর প্রাণ মৃত্যুহীন, কত শত বৎসরের বাধা-বিপত্তি নষ্ট করে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার, আবার নতুন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করবার শক্তি তাদের মধ্যে রয়েছে। ধর্মরাজ্য স্থাপন করলে, চরিত্রবলে বলীয়ান হলে, নীতি ও নিয়মানুবর্তিতাকে অন্তরের সঙ্গে মেনে নিলে, স্বার্থ অপেক্ষা জন্মভূমিকে বড় বলে জানলে, বচন অপেক্ষা রচন বড় হলে জাতি অমর, অজেয় হবে।

বীর সন্ন্যাসী বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, যাঁর সাহস ও শৌর্যের নিকট প্রতিপক্ষ সদা মাথা নত করে, জীবনমৃত্যুকে 'পায়ের ভৃত্য' করে বিরামহীন যে সংগ্রামের পদচিহ্ন রেখে গেছেন তা শিলালিপির মতই চিরস্মরণীয়। দেশের দুর্দশা দেখে আর তার বেদনাময় পরিণাম ভেবে তিনি স্থির থাকতে পারেননি। তাই বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে তিনি ভারতবাসীর ঘুম ভাঙাতে এসেছিলেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।"

বসন্ত ওই চ'লে যায়

শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

চৈত্র পাতা ঝরঝরিয়ে বসন্ত ওই চ'লে যায়,
বনে বনে মনে মনে অসীম সীমানায়।
সবুজের ওই অভিযানে,
বিহঙ্গের ওই গানে গানে,
গুমরে-ওঠা ব্যথার মাঝে কারে সে যে চায়।

গভীর বনে গভীর মনে আনন্দের ধ্বনি,
দ্বারে এসে আঘাত ক'রে ফিরে যায় সে শুনি
কী বেদনার মায়ার তালে
পা ফেলে যায় মহাকালে,
বুঝি কি না এসে কেন আবার ফিরে চায়॥

সমালোচনা

জননী সারদামণি—শ্রীমতী উষাদেবী সরস্বতী। প্রকাশিকাঃ শ্রীমতী অনুরাধা মিত্র, ৪ ছকু খানসামা লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ২৩৪ ; মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-পরিচালিত 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় যখন 'জননী সারদামণি' শিরোনামে প্রবন্ধাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন লেখাটির প্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারা এখন স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে সেইগুলি প্রকাশিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষা সহজ সরল প্রাণস্পর্শী ; রচনাশৈলী সুন্দর :

" 'মা' কথাটি বড়ই মধুর। শান্তিক্ষরা। এই 'মা' শব্দ শুনেই প্রত্যেক নারীর মনোবীণার সমস্ত তারগুলো যেন অপূর্ব আনন্দে ঝংকৃত হয়ে ওঠে! তার সারা অন্তর ভরে যায় এক অপরূপ স্বর্গীয় মাধুর্যে। নারীর এই চিরন্তন রূপই শাশ্বত, চির সুন্দর, চির নবীন।"

শ্রীশ্রীমা ছিলেন অসীম তেজোময়ী, শক্তিময়ী, মহামহিমময়ী, অসামান্যা। তিনি সকলেরই 'মা'। বিশ্বজননীর এক অপরূপ ছবি!

গ্রন্থখানি পাঠ করিলে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের মহিমামণ্ডিত একটি ছবি মানস-পটে ফুটিয়া উঠিবে।

স্বামী অভেদানন্দ (শতবার্ষিকী স্মরণে) প্রকাশক : ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য ও শ্রীভূপতি-মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বেলানগর, পোঃ অভয়নগর (হাওড়া)। পৃষ্ঠা ৮২ ; মূল্য দুই টাকা।

বেলানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কর্তৃক লিখিত শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই পুস্তকখানি অনেক তথ্যপূর্ণ বলিয়া বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে। লেখকের জীবনে পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিবার পরম সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপার্ষদের দিব্য জীবনযাপন-প্রণালী, লেখক তাঁহার দিনলিপিতে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই অনেকাংশ বর্তমান গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন। 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' শিরোনামে স্বামী অভেদানন্দের সুলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনীটি পাঠ করিয়া ভক্তবৃন্দ আনন্দ পাইবেন। স্বামী অভেদানন্দের সহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথোপকথনটি চমৎকার। পূজ্যপাদ মহারাজের প্রিয় স্তবসমূহ, যাহা তিনি আবৃত্তি করিতেন, সেগুলিও সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শরণাগতবৎসল শ্রীভগবান্—স্ব ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা। প্রকাশক : ডাঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কাঠিয়া বাবার আশ্রম, পোঃ সুখচর, জেলা ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ১২৮ ; মূল্য ১·৫০।

শ্রীভগবান কিরূপে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও একান্ত শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন এবং তাঁহার উপর কৃপাবারি বর্ষণ করেন, এই পুস্তকে তাহারই একখানি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে ; সরস মনোজ্ঞ কাহিনী ভক্তগণের ভাল লাগিবে।

গল্পে নীতিকথা—বিজ্ঞান স্বামী। প্রকাশক : সম্পাদক, শিবানন্দ যোগাশ্রম সঙ্ঘ, পোঃ তুড়িয়া, মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা ১২৮ ; মূল্য দুই টাকা।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ত্যাগ, সত্য, অধ্যবসায়, আন্তরিকতা, শিষ্টাচার, ধৈর্য, সেবা, স্বাবলম্বন, অভয়, সাম্য প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে সুলিখিত প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রচারিত হইলে ভাল হইবে।

বিদ্যাপীঠ (দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৬৫)—প্রকাশক: সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া। পৃষ্ঠা ১০১+৬৮।

রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত বহুমুখী বিদ্যালয়-গুলির অন্যতম পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত বার্ষিক পত্রিকাখানি পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

উল্লেখযোগ্য রচনা: শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় ভাব, মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ, ডাক্তারবাবু, আধুনিক চিত্রশিল্পের ইতিহাস, নন্দন, The Role of Private Enterprise in Education, Application of X-Ray Studies to Inorganic Chemistry. অনেকগুলি চিত্র দ্বারা পত্রিকাটি অলংকৃত। ছাত্রদের আঁকা ছবিগুলিতে ভবিষ্যৎ শিল্পীর সম্ভাবনা আছে; তাহাদের লেখা প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতাগুলিও সুন্দর। প্রচ্ছদপট সুদৃশ্য।

কল্যাণ (হিন্দী): ৪১তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা—শ্রীরামবচনামৃতাঙ্ক। সম্পাদক—শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০৪+৮; মূল্য ৮'৫০ টাকা।

হিন্দী ভাষায় ধর্মপত্রিকা হিসাবে বহুল প্রচারিত 'কল্যাণ'-পত্রিকা ভারতে সর্বত্র সমাদৃত। 'কল্যাণের' সুযোগ্য পরিচালকবৃন্দ প্রতি বৎসর একখানি করিয়া সুন্দর ও মূল্যবান সচিত্র বৃহদায়তন বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়া আসিতেছেন।

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মহীনতার ভাব প্রকট হওয়ায় প্রকৃত ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে সন্দি-হানতা ও অজ্ঞতা জনসাধারণকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; এই অবস্থায় 'শ্রীরাম-বচনামৃতাঙ্ক'-প্রকাশ বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পরম অমৃতময়ী ও কল্যাণকারিণী দিব্য বাণী অনুধ্যান করিলে ত্রিতাপদগ্ধ মানুষ যথার্থ শান্তি পাইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

আলোচ্য 'বিশেষাঙ্ক'টিতে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ধর্মপ্রবক্তাগণের লেখনী-মুখে বিভিন্ন সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে শ্রীরাম-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত ও উদ্গীত হইয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, রামচরিত-মানস, আনন্দরামায়ণ, রামগীতা, চম্পূরামায়ণ, হনুমন্নাটক, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মুক্তিকোপ-নিষদ্, রামরহস্যোপনিষদ্, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়োপ-নিষদ্, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়োপনিষদ্ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত নিবন্ধগুলি পাঠকালে মন অপার ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। কয়েকটি প্রবন্ধে আদর্শ রাজার ধর্ম, প্রজাপালন প্রভৃতি যুগোপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। বহুরঙের অনেকগুলি সুন্দর চিত্রে এবং বহু রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত নানা তথ্যপূর্ণ এই 'বিশেষাঙ্ক'খানি সংরক্ষণযোগ্য।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ২৮শে ফাল্গুন (১৩.৩.৬৭) সোমবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৩২তম পুণ্য জন্মতিথি-উৎসব মহা আনন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, উপনিষদ্-আবৃত্তি, উষাকীর্তন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম এবং দশাবতারের পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, সালিখা কীর্তন-সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীশ্রীকালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী চিদাত্মানন্দ হিন্দীতে ও শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় বাংলায় এবং সভাপতি মহারাজ ইংরেজীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালী-মাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ৯ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ১৩ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

সারাদিনে সহস্র সহস্র ভক্ত মঠে আগমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

কার্যবিবরণী

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কর্ম-ধারা নিম্নরূপ :

আবাসিক ত্রৈবার্ষিক মহাবিদ্যালয় (১৯৬০-জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত)—ছাত্রসংখ্যা ২৬০। এখানে ইংরেজী, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, গণিত, ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বিষয়ে অনার্স অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে একটি ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে; উত্তীর্ণের হার ৯৭%।

বিবিধার্থসাধক আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত)—ছাত্রসংখ্যা ৪৫১। বিদ্যার্থীদের বিষয়নির্বাচনের জন্য এখানে ছয়টি ধারা আছে। ইহা ভারত সরকার কর্তৃক আদর্শবিদ্যালয়-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮২ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই উত্তীর্ণ হয়। ছাত্রদের মধ্যে একজন আর্টস্-এ ৭ম স্থান এবং কৃষিবিদ্যায় তিনজন ৩য়, ৪র্থ ও ৭ম স্থান অধিকার করে।

আবাসিক সিনিয়র বেসিক স্কুল (১৯৬১-এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত)—৬ষ্ঠ হইতে ৮ম এই তিনটি শ্রেণী আছে, মোট ছাত্রসংখ্যা ২৫০।

ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি (আবাসিক)—এখানে অন্ধ ছাত্রগণকে ব্রেল শিক্ষাপ্রণালী (Braille system) অবলম্বনে এম-এ পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়; সঙ্গীত (ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত) এবং নানাবিধ শিল্প শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্যন্ত অন্ধ বালকদের মধ্যে একজন এম-এ ও তিনজন বি-এ, ৫ জন আই-এ, ৬ জন হায়ার সেকেণ্ডারী এবং ৫ জন স্কুল ফাইন্যাল পাস করিয়াছে।

আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত সমাজ-শিক্ষা ও ক্রীড়াবিভাগটির মাধ্যমে বয়স্কশিক্ষা এবং গ্রাম উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। ১৫টি কেন্দ্র খোলা

হইয়াছে, এবং এই কার্য সুষ্ঠুভাবে চালানো হইতেছে; কেন্দ্রগুলি অধিকাংশই গ্রামে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষাবিভাগে গোপালন, দরজীর কাজ, কাঠের কাজ, বই বাঁধানো ইত্যাদি শেখানো হয়।

কমারসিয়্যাল ইনষ্টিটিউট ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে খোলা হয়; সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ-রাইটিং শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। এখানে ৩০ জন ছাত্র শিক্ষা-লাভ করে।

আশ্রমে একটি বড় গ্রন্থাগার আছে। বাহিরের জনসাধারণও এখানে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে পারেন। গ্রন্থাগারের মোট গ্রন্থসংখ্যা ৩৫,০৮২ এবং সভ্যসংখ্যা ১,৭৯৯। গড়ে দৈনিক ২০০ জন অধ্যয়নের জন্য আসেন। ৫৯টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়।

বিবেকানন্দ সমাজ সেবাকেন্দ্রঃ উত্তর কলিকাতার রামবাগান বস্তীতে প্রধানতঃ হরিজন-দের উন্নয়নের জন্য একটি নার্সারি স্কুল, একটি বেসিক স্কুল, দুইটি নৈশ বিদ্যালয় (বয়স্কদের জন্য), একটি ছাত্রাবাস, একটি মেডিকেল রিলিফ সেণ্টার, একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেণ্টার, কোঅপারেটিভ সোসাইটি প্রভৃতি নরেন্দ্রপুর আশ্রমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অন্যতম নরেন্দ্রপুর আশ্রম। এখানকার কার্য-ধারা প্রধানতঃ শিক্ষামূলক হইলেও আশ্রমের সেবাকার্যও উল্লেখযোগ্য। ৬০টি দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র বিভিন্ন স্থানে চালানো হইতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের খরা-ত্রাণ-কার্য চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় মাউ ও কারউই তহশীলে এবং বিহারে হাজারীবাগ জেলায় ইটখোরীতে ও মুঙ্গের জেলায় চকাই ও ঝাঝা অঞ্চলে ৩১. ১. ৬৭ পর্যন্ত এই সেবাকার্যে ২৮,০৪৪ জনকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে:

চাল ১৩,৮৯৭ কেজি, গম ২৫,১১৪ কেজি, জোয়ার ১৪,২৯৪ কেজি, শিশু-খাদ্য ৫৩৮ কৌটা, জমানো দুধ ১৬ কৌটা, ৫৭,৮৮৪টি ভিটামিন ট্যাবলেট, ধুতি ১,৭৯৬ খানি, শাড়ি ৩,৫২১ খানি, চাদর ৫১৯ খানি, পরিধেয় বস্ত্রাদি (সুতী) ৩,৭০৯ খানি (নূতন: ২,১৪৬, পুরাতন: ১,৫৬৩), কম্বল ৪,০৮৪টি এবং গরম সোয়েটার ৮৭টি।

উৎসব-সংবাদ

ঢাকা: গত ১লা ফেব্রুআরি বুধবার দিবস ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকা-নন্দের ১০৫তম জন্মোৎসব মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন এবং বিশেষ পূজা হোমাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুপুরে প্রায় সাড়ে পাঁচশত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। বিকালে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাসভায় বিশিষ্ট শ্রোতাদের উপস্থিতিতে শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী, অধ্যাপক মোজাহের উদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র দাস ও শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র পাণ্ডে প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ স্বামীজীর রচিত কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধাদি পাঠ করে এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করে। স্বামী বিবেকানন্দের এক বিরাট প্রতিকৃতি বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের সম্মুখে আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়।

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩রা জানুআরি মঙ্গলবার পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদা

দেবীর জন্মতিথি কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য-গণের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ঐদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডী-পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে উপস্থিত বহু নরনারীকে ভোগের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২০শে জানুআরি শুক্রবার ফরিদপুরের মহিলাগণের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব হয়।

মধ্যাহ্নে কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্রের পত্নী শ্রীযুক্তা সুকুমারী ভদ্রের সভানেত্রীত্বে স্থানীয় মহিলাগণের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনদর্শন আলোচিত হয়। মহাকালী পাঠশালার ছাত্রী-গণের ভজন দ্বারা সভার কার্য আরম্ভ হয়। স্তোত্রপাঠ, শ্যামাসঙ্গীত, মাতৃসঙ্গীত, ভজনগান ও আবৃত্তির পর শ্রীশ্রীমায়ের জীবনদর্শন আলোচনা করেন আরতি মুখার্জী ও অসীমা দত্ত। পরে সভানেত্রী ভাষণ দেন। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক শ্রীসুধীর চক্রবর্তী সভান্তে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্বামী প্রণবাত্মানন্দজীর বক্তৃতা-সফর

গত ২২শে ও ৩০শে অক্টোবর এবং ২৩শে নভেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম শিলং, রামকৃষ্ণ আশ্রম গৌহাটী, রামকৃষ্ণ আশ্রম ডিব্রুগড়, রামকৃষ্ণ আশ্রম ডিগবয়, ডিগবয় ইণ্ডিয়াক্লাব, ডিগবয় কালীবাড়ী, রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ মার্ঘারিটা, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্ঘারিটা, লিডো দুর্গাবাড়ী, ডুমডুমা বেঙ্গলী হাই স্কুল, তিনসুকিয়া রেলওয়ে-ইনষ্টিটিউট, এ. ও সি. ক্লাব তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া সার্বজনীন কালীবাড়ী, চট্টেশ্বরী কালীবাড়ী তিনসুকিয়া, দুর্গাবাড়ী তিনসুকিয়া, দুলিয়াজান ক্লাব, দুলিয়াজান কালীবাড়ী, দুলিয়াজান লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্কুল, লংছোয়াল বস্তী, ডিকম, হিজোল-ব্যাঙ্ক টি ষ্টেট্, শনেশবাড়ী টি ষ্টেট, ডিব্রুগড় মারোয়ারী যুবক সংঘ, কদমণি, নালিয়াপোল, বরবাড়ী, গঙ্গাপাড়া, বাণীসদন বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি স্থানে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় নারী ও মাতা সারদাদেবী, 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'ভারতে শক্তিসাধনা' ইত্যাদি সম্বন্ধে মোট ৩০টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৮টি আলোক-চিত্র সহযোগে প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বামী নিখিলাত্মানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি যে, গত ৬ই ফেব্রুআরি, ১৯৬৭ ভোর ৪টার সময় স্বামী নিখিলাত্মানন্দ (যুগল মহারাজ) ৬৮ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীকাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হওয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া তিনি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতেই সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বরাহনগর, বোম্বাই, বেলুড় মঠ এবং বারাণসী কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। স্বর্গাশ্রমে ও আলমোড়ায় কয়েক বৎসর তিনি তপস্যায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার সরল ও অনাড়ম্বর জীবন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের ১১১তম জন্মোৎসব গত ৬ই জানুআরি হইতে ৮ই জানুআরি এবং ৫ই ফেব্রুআরি চারিদিন পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শিবানন্দ-বাণী আলোচনা, কথকতা, বক্তৃতা, ভজন-কীর্তন, শোভাযাত্রা ও নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন দিনে বেলুড় মঠের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীরমণী-কুমার দত্তগুপ্ত, অধ্যক্ষ অমিয় মজুমদার শ্রীহীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শিবানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা করেন। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ, বারাসতের শিল্পিগণ, শ্রীঅমূল্য সেন ও শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মহাসমর' (কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ) নাটক অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয় স্বামী পুণ্যানন্দের পরিচালনায় রহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক। শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, স্বামীজী ও মহাপুরুষজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি ও সংকীর্তন সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা বারাসত শহর পরিক্রমা করে। উৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম: গত ১২ই ফেব্রুআরি হইতে সপ্তাহব্যাপী দমদম চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৩১তম জন্মপূর্তি উৎসব এবং ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবর্ষজয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিবসে প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত'পাঠ, কালীকীর্তন প্রসাদবিতরণ ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভা হয়। উক্ত সভায় আশ্রমসম্পাদক কর্তৃক বাৎসরিক বিবরণ পাঠের পর প্রধান অতিথি শ্রীযশোদাকান্ত রায়, বক্তা শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল ও সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। রাত্রে প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস ও তাঁহার সম্প্রদায় বাউল গান পরিবেশন করেন। পরবর্তী দিবসগুলিতে উল্লেখযোগ্য ভারত সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটি দপ্তরের ও বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দিরের সৌজন্যে যথাক্রমে শিক্ষামূলক, বিবেকানন্দ ও মীরাবাঈ সবাকৃচিত্র প্রদর্শনী; অর্জুনপুর কিশোর-দল, আশ্রম সেবকদল ও আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক যথাক্রমে জহ্লাদ, আগাছা ও বাণী নাটিকার অভিনয়; ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের ধর্মসভায় বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের সম্পাদিকা ও অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণার ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ।

খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম: গত ১৮ই মাঘ (১৩৭৩) বুধবার এখানে যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব—বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, প্রসাদবিতরণ, ভজন, ও জীবনী-আলোচনার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়।

সভায় বহু গুণীজনের সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামীজীর আদর্শে জীবনগঠনের উপর আমাদের কল্যাণ নির্ভরশীল বলিয়া সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

বাঁশবেড়িয়া বিবেকানন্দ সংঘঃ গত ৫.২.৬৭ তারিখে বাঁশবেড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ সংঘের মহিলা-সদস্যগণের উদ্যোগে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা মহোদয়ার সভানেত্রীত্বে ভগিনী নিবেদিতা শতবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিরাট মহিলাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপিকা আনন্দময়ী চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। বেদমন্ত্রগান, ভজন ইত্যাদিতে অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য যথাযথভাবে বজায় ছিল।

বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

চিচড়া (মেদিনীপুর) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৭তম প্রতিষ্ঠা-স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৮. ১. ৬৭ তারিখে আয়োজিত সভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং শিক্ষাসম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পূর্বাহ্নে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

ভারতে একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

সূর্যদেহ হইতে যে নিউট্রন-কণিকা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তাহার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন টাটা মৌলিক গবেষণা কেন্দ্রের মহাজাগতিক শাখা। এইজন্য তাঁহারা একটি যন্ত্রও উদ্ভাবন করিয়াছেন—সেই যন্ত্রের সহায়তায় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে এই শক্তিমান মহাজাগতিক কণিকা ধরা পড়িয়াছে।

সেদিন সূর্যদেহের অর্ধভাগ জুড়িয়া তখন বিস্ফোরণ চলিতেছিল। একটি বেলুনে ইলেকট্রনিক ডিটেক্টর রাখিয়া সেটিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল মহাকাশে। ডিটেক্টর ঠিকই ধরিয়া ফেলিল, সূর্যদেহের বিস্ফোরণ-কালে সেখানে যে মহাপ্রলয় ঘটিতেছে, তাহারই সুযোগে গুচ্ছ গুচ্ছ নিউট্রন-কণিকা মহাকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

গবেষণা-সংস্থার একজন মুখপাত্র বলেন, নিউট্রনকে খুঁজিয়া পাইয়া আমরা শুধু সূর্যকেই ভাল করিয়া চিনিলাম না, মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নূতন সম্পদ সংগৃহীত হইল।

মহাকাশে নিউট্রনের সন্ধানলাভের জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আরও একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—১৯৬২ খৃষ্টাব্দে। সেবার বেলুনে করিয়া ফটোগ্রাফিক প্লেট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কোন কাজেই আসে নাই। তারপর দীর্ঘ চার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা চলিল নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের। অবশেষে, গত এপ্রিল মাসে নূতন যন্ত্রটিকে বেলুনে করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হয়। —ইউ. এন. আই.

পরলোকে শচীবালা সরকার

গত ২০শে পৌষ রাত্রি ৯টা ৩০ মিনিটের সময় পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্যা শচীবালা সরকার কুলটীতে ৭৬ বৎসর বয়সে ইষ্টস্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত সুরেন্দ্রকান্ত সরকার মহাশয়ের সহধর্মিণী। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে সরকার মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতি লিপিবদ্ধ আছে।

পুণ্যবতী মহিলার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

পরলোকে সরোজকুমার সরকার

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহ-সভাপতি সরোজকুমার সরকার গত ২১শে জানুআরি শনিবার সকালবেলা পরলোক গমন

করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি ফরিদপুর মিশন আশ্রমের সম্পাদকরূপে কার্য করিয়া গিয়াছেন; তৎপর সহ-সভাপতিপদে মনোনীত হন। তিনি মিষ্টভাষী ও অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। ফরিদপুর সদর ফৌজদারী আদালতে ৩০ বৎসরের উর্ধ্বকাল অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে সুনাম ও সততার সঙ্গে তিনি কার্য করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি একান্তভাবে কামনা করি।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!!!

পরলোকে চন্দ্রনাথ শর্মা

তেজপুর (আসাম) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রেসিডেন্ট চন্দ্রনাথ শর্মা ৮০ বৎসর বয়সে গত ১০.২.৬৭ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও উদারভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। নানাবিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-সংস্থার সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

সেবাশ্রমে আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দের উৎসব-সভায় সভাপতির ভাষণ প্রদানের পর যখন তিনি সভাস্থান ত্যাগ করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ থ্রম্বসিস-রোগে আক্রান্ত হন এবং ইহার ফলে ১০ই ফেব্রুআরি তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

পরলোকে যোগেশচন্দ্র ঘোষ

পূর্ববঙ্গের ঢাকা জিলার বিক্রমপুরনিবাসী যোগেশচন্দ্র ঘোষ গত ২৭শে মাঘ, ১৩৭৩, (১০ই ফেব্রুআরি, '৬৭) ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার দিলখুসা ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। দেশবিভাগের পূর্বে তিনি প্রথম জীবনে ঢাকায় শিক্ষক ছিলেন এবং পরে আইনব্যবসায় অবলম্বন করেন। দেশবিভাগের পর কলিকাতায় আসিয়াও ওকালতি করেন। যোগেশবাবু পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ, শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ ও শ্রীশ্রীখোকামহারাজের পূত সংস্পর্শে আসিয়া নানাভাবে তাঁহাদের স্নেহ ও কৃপালাভে ধন্য হন। ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যহিসাবে জনহিতকর কাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার কর্মক্ষমতা, সদালাপ ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে তিনি পরম শান্তি লাভ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

ভ্রম-সংশোধন

গত ফাল্গুন সংখ্যার ৬০ পৃষ্ঠায় ১ম কলম ১১শ লাইনে 'প্রয়োজনীয়তাবোধও' স্থলে 'প্রয়োজনীয়তাবোধের অভাবও' পড়িবেন।

দিব্য বাণী

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥ ১
দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমলপরিভোগসচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতিপদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥ ২

—'বিষ্ণুষট্‌পদী'—শঙ্করাচার্য

আমার অবিনয় ঘুচায়ে দাও, হরি!
দমন কর চিত, শান্ত কর মোর
বিষয় মৃগ-তৃষা—বাসনা অফুরান!
হৃদয় দাও মোর প্রসারি সব ঠাঁই—
সবার প্রতি মোরে কর হে দয়াবান!
এ ভব-পারাবার হইতে কর ত্রাণ!

পাবনা সুরধুনী যে পাদ-পদ্মের
ক্ষরিত মধু-সম, সচ্চিদানন্দ-যে
চরণ-কমলের সুরভি সুবিমল—
বন্দি শ্রীপতির সে ভব-ভয়-হারী
সকল দুখ-হারী চরণ-উৎপল—
(সুরভি-মধু-লোভী আকুল অলি-সম)।

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ৩

(স্বরূপে ভেদ নাই—অভেদ তুমি-আমি—)
দ্বৈতবোধ-নাশে সে জ্ঞান যবে হয়
তোমারই আমি তবু, আমার তুমি নও—
(অংশ পূর্ণেরই, পূর্ণ তার নয়)!
ঊর্মি সাগরেরি থাকে তো চিরদিন,
সাগর ঊর্মির, হে নাথ, কভু হয়?

কথাপ্রসঙ্গে

বৈশাখী পূর্ণিমা

বৈশাখী পূর্ণিমা মানুষের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় শুভ তিথি, যাহা আড়াই হাজার বছরেরও বেশী দিন ধরিয়া স্নিগ্ধ দিব্য বিভায় আমাদের হৃদয় ভরাইয়া দিতেছে। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এই তিথিতে।

দুঃখ-জরা-ব্যাধির কণ্টকে আকীর্ণ জীবনপথে বারবার ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ে পরিক্রমার হাত হইতে মানুষকে কিভাবে ত্রাণ করা যায়, তাহারই সন্ধানে সমবেদনা-উদ্বেল বিশাল হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি রাজ্য, রাজ-সুখ ও স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘকাল কঠোর তপস্যান্তে সে পথের সন্ধান লাভ করিয়া তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল মানুষের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া তাহাদের সে পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর কত যুগ গত হইয়াছে—কিন্তু তাঁহার বাণী আজিও শান্তির, প্রেমের পথ দেখাইয়া সারা বিশ্বের অগণিত মানবকে লইয়া চলিয়াছে নির্বাণের লক্ষ্যে।

মানুষের একেবারে হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি। উপদেশ দিয়াছেন তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে চলিত ভাষায় পালিতে—ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে, সহজভাবে।

বেদের কর্মকাণ্ড লইয়া পুরোহিতকুল তখন স্বার্থসিদ্ধিতে নিবদ্ধ-লক্ষ্য, 'বেদের প্রামাণ্যের' তখন অপব্যবহার চলিতেছিল। বেদের সার কথা যাহা, তাহা জানিবার সুযোগ হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। সে বিষম অবস্থা হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, বেদের প্রামাণ্য মানার প্রয়োজন নাই। অথচ তিনি পরিবেশন করিয়াছেন বেদেরই সার কথা, সহজ সরল ভাবে। স্বামীজীর কথা, "যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙিয়া সরল কথায়, চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন।" এই জন্যই স্বামীজী বৌদ্ধ-ধর্মকে হিন্দুধর্মের "বিদ্রোহী সন্তান" বলিয়াছেন।

তাছাড়া, "আত্মার" অস্তিত্বের কথাও বলেন নাই তিনি। সাধন সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা করিয়াছেন, অপরকে করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই 'মধ্যপন্থাই' অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথার সার মর্ম হইল: জীবন দুঃখময়। এই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। উহা করা যায়। দুঃখের কারণ আছে। সেই কারণের নাশেই দুঃখের নাশ হয়। মূল কারণটি হইল বাসনা, বিষয়ে আসক্তি। আসক্তির কারণ বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ, তারও কারণ দেহমনে 'আমি' বোধ। এ সব কিছুর মূল কারণ অজ্ঞান। এসব কথা যুক্তি দিয়াই বোঝা যায়, ইহার জন্য কাহারো কথা 'মানিবার' প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহার পূর্বের বা পরের কথা বলিতে গেলে 'বেদ' মানা ছাড়া, সত্যদ্রষ্টাদের উপলব্ধ কথা মানা ছাড়া অন্য উপায় নাই—কারণ তাহা মনবুদ্ধির অতীত প্রদেশের, আমাদের দেহমন-সীমিত 'আমি'র ও অতীত প্রদেশের কথা। তাই অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল, বা দুঃখের নিবৃত্তিকল্পে 'আমি', দেহমন-ইন্দ্রিয়, বিষয় প্রভৃতির, এক কথায় 'জীবন' বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সবকিছুর নাশ যখন হয়, সেই 'নির্বাণের' পরে কি থাকে, বা আদৌ কিছু থাকে কি না—এ সব প্রশ্নের উত্তরও তিনি দিতেন না, 'আত্মার অস্তিত্ব মানিতেন না।'

বেদান্ত (বেদেরই একাংশ, সারাংশ, জ্ঞানকাণ্ড) বলে এই সব কিছু নাশের পরও, আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু 'আমি'র নাশের পরও একটি সত্তা থাকে, সব কিছু আসিয়াছেও তাহা হইতে। বেদান্তও একথা বলে যে তাহার স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু বলে যে তাহা আছে, তাহা উপলব্ধিগম্য। 'অসৎ' হইতে কিছু আসে নাই, নাশের পরও কিছু 'অসৎ' হইয়া যায় না। বেদান্তে এই মূল সত্তাকেই 'আত্মা' বলা হইয়াছে, পরমাত্মা।

বুদ্ধদেবকে যে নাস্তিক বলা হয়, তাহা শুধু এইটুকুর জন্যই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন: নাস্তিক কেন হবে? বোধে বোধ হয়েছিল, মুখে বলতে পারে নাই।

বুদ্ধের হৃদয়ের তুলনা নাই। স্বামীজী বলিয়াছেন, "তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে, নাই তাঁহার intellect এবং heart, যাহা জগতে আর হইল না।" নিজেকে তিনি নিঃশেষে আহুতি দিয়াছিলেন অপরের কল্যাণে। স্বামীজী বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব নিজের জন্য একটি শ্বাসও গ্রহণ করেন নাই।

আজ শান্তির সন্ধানে দিশাহারা ধরণীতে বুদ্ধের পূজা, মানবকল্যাণে সদানিযুক্ত হৃদয়ের পূজা শান্তির অমিয় বর্ষণ করুক; বৈশাখী পূর্ণিমার বিমল স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের, মানবপ্রেমের বন্যায় পরিপ্লাবিত হউক বিশ্ববাসী সকলেরই অন্তর। তাঁহার সেই একথাটি যেন স্মরণ রাখি আমরা, যে কথা তিনি বলিয়াছিলেন দেহত্যাগের পূর্বক্ষণে, শালতরুমূলে শায়িত অবস্থায়। তরুশির হইতে শালফুল তাঁহার দেহের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে দেখিয়া আনন্দ বলিয়াছিলেন, 'তথাগত, দেবতারা এ সময় আপনার পূজা করছেন;' আনন্দের এই কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ফুল দিয়ে তথাগতের পূজা হয় না; তথাগতের কথামত জীবনগঠনের প্রয়াসই তথাগতের যথার্থ পূজা।'

চলার পথ—প্রেরণা ও লক্ষ্য

বিশ্বজগতের মূলে যে সত্য, তাহা লাভ করিবার জন্য নানা দিক হইতে মানুষের মনে আগ্রহ জাগিয়াছে, নানাপথে মানুষ সেদিকে

অগ্রসর হইয়াছে। বুদ্ধদেবের এ পথে পদক্ষেপ দুঃখ-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় খুঁজিবার জন্য। আচার্য শঙ্করের পদক্ষেপ সত্যকে জানিবার জন্য। লক্ষ্যে পৌঁছিলে ফল অবশ্য সর্বপথেই এক, পৃথক নহে। চির অস্তিত্ব, পূর্ণ জ্ঞান ও অবাধ আনন্দ একই সত্তা। দুঃখাদির হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের বা অমৃতত্ব ও চির-আনন্দলাভের সকল প্রচেষ্টায় জ্ঞানের আলোকও স্বতই আসে; আবার জ্ঞানলাভের সকল প্রচেষ্টায় আনন্দ ও অমৃতত্বও লাভ হয়।

এই সত্তা ছাড়া বিশ্বজগতে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। অথচ ইহাকেই মৃত্যুরূপে, অজ্ঞান বা খণ্ড-জ্ঞানরূপে, দুঃখরূপে জগতে আমরা সাধারণ অবস্থায় নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি কেন? এ 'কেন'-র উত্তর নাই, তবে ইহা ঘটে। ইহাই অজ্ঞান বা মায়া। সত্যকে জানিতে হইলেও যাহা, দুঃখাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলেও তাহাই—এই মায়ার, অজ্ঞানের পারে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। দুঃখাদির চিরনিবৃত্তি, নির্বাণও যাহা, আত্মজ্ঞানও তাহাই—অজ্ঞানের, মায়ার অতীত অবস্থা।

অজ্ঞানের, মায়ার পারে যাইতেই হইবে। তবে, সেখানে যাওয়ার প্রেরণাগুলির মধ্যে যেটি কোন কিছু লাভের জন্য নহে, কোন কিছু এড়াইবার জন্য নহে, কেবল সত্যকে জানিবার জন্যই—স্বামী বিবেকানন্দ সেটিকে সর্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও এই প্রেরণাবশেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ও আচার্য শঙ্করের এই দিকটির প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "তাঁহার (বুদ্ধের) মায়াবাদ কপিলের মতো। কিন্তু শঙ্করের how far more grand and rational! বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন—জগতে দুঃখ, দুঃখ, পালাও পালাও। সুখ কি একেবারেই নাই? যেমন ব্রাহ্মরা বলেন, সব সুখ—এও সেই প্রকার কথা। দুঃখ, তা কি করিব? কেহ যদি বলে যে সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে দুঃখকেই সুখ বোধ হইবে? শঙ্কর এ দিক দিয়া যান না—তিনি বলেন, 'সন্নাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি'—আছে অথচ নেই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য আমি জানিব,—দুঃখ আছে কি, কি আছে; জুজুর ভয়ে আমি পালাই না। আমি জানিব, জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ তা তো প্রাণভরে গ্রহণ করিতেছি। আমি কি পশু যে ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ-জরামরণ ভয় দেখাও? আমি জানিব, জানিবার জন্য জান দিব। এ জগতে জানিবার কিছুই নাই, অতএব যদি এই relative-এর পার কিছু থাকে—যাকে শ্রীবুদ্ধ 'প্রজ্ঞাপারম্' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—যদি থাকে, তাহাই চাই। তাহাতে দুঃখ আসে বা সুখ আসে I do not care."

প্রেরণা যাহাই হউক, বিশালহৃদয়োদ্ভূত সমবেদনায় অপরের দুঃখনাশের পথের সন্ধান-লাভই হউক বা সত্যকে জানিবার সুতীব্র ইচ্ছাই হউক, বা সে সত্যের প্রতি ভালবাসা—ভক্তিই হউক, যাহাই হউক না কেন, দেখা যায়, যুগে যুগে অমিত ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষগণ এ ধরণীতে আবির্ভূত হন এবং বিভিন্ন প্রেরণা-বশে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, বিপুলবিক্রমে পথের সব বাধা অপসারণ করিয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া জগৎরূপ মায়ার রাজ্য হেলায় অতিক্রম করেন—"নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।" আর লক্ষ্যলাভের পর বিমল, চির-উজ্জ্বল আলোকে অপর পথিকের জন্য চির-উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়া যান সে পথগুলি। ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকলেই আমাদেরই জন্য, আমাদের

পথ দেখাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। একটি জিনিস তাঁহারা সকলেই নিজ জীবন দিয়া দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছেন—জীবনের পরমতীর্থে উপনীত হইতে হইলে চলার পথে নিজের বলিতে যাহা কিছু, তাহা সবই বিসর্জন দিয়া চলিতে হইবে, (দুঃখাদির কারণ বলিয়া হউক, বা অপরের কল্যাণের জন্য হউক, বা মনঃসংযমের বা সমাধির সহায়ক বলিয়াই হউক) নির্ভীক ভাবে পথের বাধাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

প্রেরণা যাহাই হউক, পথ যাহাই হউক, সে তীর্থাভিমুখে চলা যে স্বরু করে, তাহার শিরে শতধারে ঝরিয়া পড়ে ইঁহাদের চিরনিস্যন্দী করুণাধারা। ইঁহারা চিরজীবী। আমাদের প্রতি ইঁহাদের করুণা সীমাহীন; সমকালীন জনগণের কল্যাণের প্রয়োজনে তত্ত্বকে ইঁহারা যত বিভিন্নভাবেই প্রকাশ করুন না কেন, এই অহেতুকী করুণাবিতরণে ইঁহারা সকলেই সমভাবে রত। নির্বাণলাভের পর 'বুদ্ধের' অস্তিত্ব ছিল কি ছিল না, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আমাদের নাই, উঁহার পর তিনি যে আমাদের জন্য করুণার্দ্র হৃদয় লইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর আমাদের কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য। 'আচার্য শঙ্কর' বলিয়া কাহারো অস্তিত্ব আত্মজ্ঞান লাভের পর ছিল কি না, কেন বা কিভাবে তিনি আবার জ্ঞানলাভের পর ফিরিলেন, তাহা লইয়া ভাবিবার প্রয়োজন কি আমাদের? আমাদের কাছে তিনি আবার ফিরিয়াছেন আমাদের পথ দেখাইতে—এ কথা সত্য ধ্রুব। এ কথাটি যেন না ভুলি আমরা, যেন মনে রাখি যে ইঁহারা আমাদের আপনজন, চির-আপন। স্থূলদেহ ত্যাগের পরও এই অহেতুক করুণাবশেই ইঁহারা সূক্ষ্মদেহে থাকিয়া যান—চিরদিন আমাদের শিরে আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য, আমাদের হৃদয়ে পথ-চলার প্রেরণা জোগাইবার জন্য আর একান্ত ব্যাকুল যাত্রীর একাগ্র পবিত্র চিত্তে আবির্ভূত হইয়া তাহার বিশ্বাস, তাহার উদ্যম সহস্রগুণে বাড়াইবার জন্য।

শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Ramkrishna Math, Belur P. O., Howrah Dist,
Dated the 1st July, 1924

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভা দেবী—

মায়ী, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হইলাম। দুঃখের সংবাদে মনে চিন্তিত ও দুঃখিত হইলাম। তোমাদের বাড়ীর সামনের যোগেশবাবু একদিন সংবাদ দিয়াছিলেন যে, তিনি ছেলেটির অবস্থা ভাল শুনিয়াছিলেন ; তাহাতে তোমার বাবার, মার, আমারও মনে হইল ভাল হইবে। বিধির লিখন যাহা হইবার হইল।

মায়ী, তোমার দিদিকে বলিবে ছোটবেলায় কত পুতুল খেলিয়াছ, কোন পুতুল হারাইয়াছে ও কোন পুতুল ভাঙ্গিয়াছে, তার জন্য এক সময় কতো কাঁদাকাটি করিয়াছিলে। এখন ঈশ্বরদত্ত পুতুল তাঁর ইচ্ছায় তিনি লইয়াছেন। সাধারণ লোকের সে সমস্ত বুঝিবার শক্তি কোথায় ? যদ্যপি কাঁদাকাটি করিতে হয় ভগবানকে স্মরণ করিয়া কাঁদা ভাল, যাহা ইহকাল ও পরকালের। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার দিদির ও সকলের মনে শান্তি দিন। যে ছেলে তোমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছে তার জন্যও প্রার্থনা করি—শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কোলে রাখিয়া শান্তিতে রাখুন।

মায়ী, আজকাল শারীরিক ভাল আছি। এখানে আসিয়া ৮।১০ দিন বড় জলকষ্ট ছিল। গঙ্গার জল ও কলের জল লোনা ছিল। এখন জলে সেরকম লোনা নাই, বৃষ্টির জলে সব ভাল হইয়াছে। এখানে আসিয়া মনে হইয়াছিল ঢাকায় আরো ১০।১৫ দিন থাকিলে জলকষ্ট পাইতাম না। সমস্তই তাঁর ইচ্ছা।

মায়ী, তোমার যে জীবনব্যাপী দুঃখের কথা লিখেছ, সেও তাঁর ইচ্ছা। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এ সমস্ত কথা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না ; কোন কোন দুঃখে মানুষের মনকে ভগবানের দিকে এগিয়ে দেয়, যেখানে দুঃখ পায়। তার পরে শান্তি আসে। তোমায় এ সমস্ত বিষয় আর বেশী কি লিখব, যখন দেখা হইবে গল্প হবে। নিজের দুঃখের ভার কমাইবার জন্য বিচারবুদ্ধি সদাসর্বদা রাখিতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, যেমন "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা" ; হাতে কি পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, সে কাঁটা তুলিবার জন্য আর একটি কাঁটা দরকার হয়, অবশেষে দুইটা কাঁটাই ফেলিয়া দেয় ; পরে শান্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ-পুস্তক সময় পাইলে পড়িবে।

মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে, সকলকে জানাবে ও কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Ramkrishna Math, Belur P.O., Howrah Dist.,
Dated the 17th. July, 1924

কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভা দেবী—

মায়ী, তোমাদের পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। মধ্যে আমি ও মঠের অনেকে ডায়মণ্ডহারবার গিয়াছিলাম। সেখানে বেলুড় মঠের একটি ব্রাঞ্চ আশ্রম হইল। এই গত সোমবারে গিয়াছিলাম।

মধ্যে ২ বৃষ্টি জো'লো হাওয়ার জন্য শরীরও খারাপ বোধ করি। আমি ১০।১২ দিন পরেতে ৺ভুবনেশ্বর মঠে যাইব। আমার সহিত এখানকার মঠের এক জন সাধু থাকিবে। বর্ষার সময়টা সেই দিকে থাকিব। আজকাল ভালই আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় যে যত চিন্তা করিবে সে তত বেশী জানিতে পারিবে। একথা আমি তাঁর কাছ থেকেই শুনিয়াছি; আরো বলিয়াছিলেন—এখানকার হাব, ভাব, চাল, চলন, কথাবার্তা, যাদের খুব ভাল লাগিবে তাহাদের এই শেষ জন্ম। ঠাকুর 'আমি বলিতেছি' এ কথা ব্যবহার করিতেন না, বলিতেন 'এখান থেকে যা বলা হইয়াছে।'

মায়ী, শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানিবার ও পাইবার এই সোজা উপায়। খুব বিশ্বাস রাখিতে হবে যে আমি তাঁর মেয়ে, হৃদয়মন্দিরে তিনি আছেন; যেমন সাংসারিক পিতামাতার কাছে কত রকম আবদার চলে, সেই রকম তাঁর কাছে-ও চলে। মানুষ ভগবানের স্নেহ, দয়া, ভালবাসা, কখন বুঝিতে পারে?—যখন কোনো বিপদে পড়ে। সে বিপদ-ও তাঁর দয়া, কারণ তাহাতে তাঁকে জানিতে পারা যায়। মানুষের কত ভুল হয়। অনেকে হরিলুট মানসিক করে, কোনো রকম অসুখ বা কষ্টয় পড়িয়া; আর এমনি কেহ মানসিক করে না—হরি দেখা দাও, আমি তোমায় আপন হাতে খাওয়াইব। আন্তরিক প্রার্থনা কর।

মায়ী, আমার মনে হয় তোমাদের আশা বিফল হবে না। তাঁর ইচ্ছাতেই তোমাদের সহিত দেখাশুনা ইত্যাদি। আমি-ও তাঁর নিকট প্রার্থনা করি, তোমাদের শুভ ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করুন। সম্পদে বিপদে তাঁকেই স্মরণ করিবে।

মায়ী, আজ এই অবধি। আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবে, তোমার বাবা-মাকে জানাবে। আশা করি সমস্ত কুশল। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসুবোধানন্দ

পুঃ—আর একটি কথা, মনে যখন যাহা উদয় হবে, দুঃখ আসুক বা আনন্দ আসুক সমস্ত বিষয় তাঁর কাছে জানাতে হবে; তিনি তার বিধান করিবেন। তোমরা তাঁর আপনার—এই বিশ্বাস রাখিবে।

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Sri Ramkrishna Math,
Bhubaneswar P.O., Dt. Puri, (Orissa)
1st August, 1924

কল্যাণীয়া মায়ী,

আজ চারদিন হইল আমি ভুবনেশ্বর মঠে আসিয়াছি। এখানকার জল বাতাস স্বাস্থ্য সবই ভাল। এখানে ইঁদারার জল ব্যবহার করা হয়। আজকাল এ দেশে বৃষ্টি বেশী নাই, পরে হইবে। বেলুড়ে যা ভাত খাইতাম এখানে তার ডবল খাই, কোনো অসুখ বোধ হয় না। এই দেশে মনে করিয়াছি বর্ষাকালটা থাকিব। আশ্বিন মাসে বেলুড়ে যাইব, পরে নারায়ণগঞ্জ।

লীলাপ্রসঙ্গ পড়িয়া পড়িয়া তোমাদের মনে এতো আনন্দ হইয়াছে জানিয়া আমি খুব সন্তুষ্ট হইলাম। আমি তাঁর কাছে (শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে) শুনিয়াছি একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—এখানকার হাব, ভাব, চাল চলন, কথাবার্তা যাহাদের ভাল লাগিবে তারা এখানকার লোক, তাদের এই শেষ জন্ম।

মায়ী, যখন ধর্মসম্বন্ধে কোনো পুস্তক পড়িবে, সঙ্গে ২ মন যেন ঠাকুরের দিকে থাকে। মনে কর তোমার ছেলে বিদেশ থেকে তোমায় পত্র দিয়াছে; তখন তুমি পত্র পড়িবে, সেই সঙ্গে তার চেহারা মনে পড়িবে ও তার আরো কত কথা মনে ২ জানিতে পারিবে; এই রকম পড়া চাই। সকল লোকেই ভগবানের ছেলে মেয়ে, যে তাঁকে যতটা আপনার জানবে তার মন তত এগিয়ে যাবে। একজন সাধু, এখন তাঁর শরীর নাই, তিনি পশ্চিমে গাজিপুরে থাকিতেন। তিনি বলিতেন, যোন্ সাধন, তোন্ সিদ্ধি; বাঙলা ভাষায় বলে—যার যেমন ভাব, তেমনি লাভ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন পূর্বদিকে যতো এগুনো যায় পশ্চিম দিক দুরে পড়ে যায়। মন যতটা তাঁর দিকে যাবে, মায়া বন্ধন, মনের চাঞ্চল্য সব দুরে যাবে।

মায়ী, তুমি আন্তরিক ভালবাসা, শুভেচ্ছা জানিবে। তোমার বাবা মা সকলকে জানাবে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসুবোধানন্দ

নির্বাণ

ডক্টর মতিলাল দাস

বৌদ্ধ ধর্মের চরমলক্ষ্য নির্বাণ। বুদ্ধদেব নিজে বলেছেন—"হে ভিক্ষুগণ! সমুদ্রের মাত্র একটি আস্বাদ আছে—সে লবণাক্ত, আবার ধর্ম ও বিনয়ের তেমনই একটি আস্বাদ—সেই একক ও অনন্যপরিচয় নির্বাণেই পাওয়া যায়।" বহুমুখী নদীর যেমন একই আশ্রয়—সমুদ্রে মিলন—তেমনই বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষা ও উপদেশের সার কথা নির্বাণ।

বৌদ্ধ ধর্মকে তাই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে হলে নির্বাণের স্বরূপ ও তত্ত্ব অধিগম করতে হবে। সারথি ছন্দকের সাথে কপিলবাস্তু নগর ভ্রমণকালে সিদ্ধার্থ চারিটি দৃশ্য দেখেন—রোগজীর্ণ মানুষ, জরাভারপীড়িত মানুষ, মৃতদেহ আর এক সন্ন্যাসী। ছন্দক তাঁকে বুঝিয়ে দেয় যে ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—সে কথায় ব্যাকুল রাজপুত্র বুঝলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই সত্যলাভে সমর্থ হন এবং নিজে সংসারত্যাগের সংকল্প করেন। প্রাসাদে ফিরবার সময় কিসা গোতমী নামক শাক্যবংশীয় রাজকন্যা সিদ্ধার্থকে দেখে একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন।

নিব্বুতা নূন য়া মাতা
নিব্বুতো নূন য়ো পিতা।
নিব্বুতা নূন য়া নারী
যস্সায়ং ঈদিসো পতি॥

যে মাতা এমন মহিমান্বিত পুরুষের জননী, যে পিতা এমন মহামানবের জনক, যে নারী ঈদৃশ পতিলাভ করেছে, তারা সবাই পরম সুখী। কিন্তু নিব্বুত কথাটি সিদ্ধার্থের অন্তরে নির্বাণের স্বপ্ন জাগ্রত করল। তিনি চাইলেন কামতৃষ্ণার ধ্বংস, ঘৃণা ও অহঙ্কারের নির্বাসন এবং মিথ্যাপ্রত্যয়ের বিনাশ।

তিনি আলারকালম এবং রুদ্রক রামপুত্রের কাছে বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা করেন, কিন্তু তাতে তাঁর তৃষ্ণা মিটল না। তিনি নৈরঞ্জন নদীতীরে উরুবেল নামক স্থানে দীর্ঘ ছয় বৎসর দুশ্চর তপশ্চর্যা করে বোধিলাভ করলেন। বোধিলাভের পর তিনি বিজয়গাথা উচ্চারণ করেন :—

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং
গহকারক! দিট্ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ গা গহকুটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা॥

জন্মজন্মান্তর গৃহকারকের সন্ধানে অনেক জন্ম নিতে হয়েছে, অনেক দুঃখ সইতে হয়েছে—কিন্তু তার সন্ধান পাইনি। কিন্তু এখন তোমার দেখা পেয়েছি, পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে এইবার দুঃখের শেষ হয়েছে। তুমি আর গৃহ বাঁধতে পারবে না—তোমার স্তম্ভসকল ভেঙেছে, গৃহভিত্তিচয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, সমস্ত সংস্কারের শেষ হয়েছে, তৃষ্ণার ক্ষয় হয়েছে, এখন আমার চিত্ত বিমুক্ত।

নির্বাণ তাই মূলতঃ চিত্তের বিমুক্তি। তৃষ্ণাজালের সম্যক নিরোধফলে অনাদি সংসারপ্রবাহের অবসান ঘটে এবং পরম সুখের আবির্ভাব হয়। নির্বাণকে পশ্চিমের পণ্ডিতেরা অনেকেই নাস্তিত্ব, শূন্যতা, ধ্বংস এবং নির্বিশেষ বিনাশ বলে ভুল করেছেন।

বুদ্ধ বিনাশবাদী ছিলেন না—তিনি নির্বাণকে পরমসুখ বলে অনুভব করেছিলেন। নির্বাণ

অনির্বচনীয় শান্ত অবস্থা—শাশ্বত, অপূর্ব শান্তির আলয়, নির্বাণকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—তথাপি সেই দুর্লভ প্রাপ্তি অনুভবনীয়। সংসারের নিবৃত্তি কিন্তু আত্যন্তিক বিনাশ নয়। নির্বাণে আসবসকলের বিনাশ এবং অনুত্তর আনন্দের লাভ ঘটে।

সম্যক সম্বোধি হলেই নির্বাণের আবির্ভাব মেলে। তখন বিমুক্তি আসে এবং সাথে সাথে বিমুক্তির জ্ঞান উপলব্ধি হয়। তখন প্রজ্ঞাচক্ষুর উন্মেষ হয়। নিবাণ পরমার্থ—উত্তমার্থ—সেখানে গেলে মানুষ আর শোক করে না, সেখানে গেলে আর প্রত্যাবর্তন ঘটে না। সে অকুতোভয় পরম তীর, সেখানে অনুত্তর শান্তি—সমস্ত সংস্কারের উপশম—সুখময় অমৃতপদ।

কিন্তু এই শান্তি কি পরম শূন্যতায় স্থিতি—এটি কি মৃত্যুর তিমির-গুহা—এটি কি বিনাশের নাস্তিত্ব! আমরা দৃঢ়স্বরে বলব—নির্বাণ—পরম সুখের নিকেতন। এতম্ খো পরমং জ্ঞানম্ এতম্ সুখমনুত্তরম্ অশোকম্ বিরজম্ ক্ষেমম্। এই শান্তি কেবল নিরোধ নয় এই শান্তি উপশমের সুখে উল্লসিত। সংসারের কোনও কিছুর সাথে নির্বাণের আদৌ সংযোগ নেই—রাগ-দ্বেষ-মোহক্ষয়ের শেষে চিত্তের একান্ত বিমুক্তি হলে নির্বাণলাভ হয়।

কিন্তু বুদ্ধের জীবৎকালেই বুদ্ধশিষ্য যমক বিশ্বাস করতেন—নির্বাণলাভের পর অর্হৎ একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যান—একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যান—তাঁর আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। তাঁর সতীর্থেরা তাঁর এই অন্যায় বিশ্বাসের জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন—কিন্তু যমকের মিথ্যা প্রত্যয় দূর হল না। তাঁরা তাই বুদ্ধের প্রিয়তম প্রাজ্ঞতম শিষ্য সারিপুত্রকে নিবেদন করলেন। সারিপুত্র যমকের কাছে সত্য অবস্থা প্রকটিত করলেন। তিনি যমককে প্রশ্ন করলেন:—"রূপ শাশ্বত না ক্ষণিক?"

"রূপ ক্ষণস্থায়ী।"

"যা ক্ষাণক, তা কি অশুভ না শুভ?"

"অশুভ।"

"যা অশাশ্বত, ক্ষণিক, চঞ্চল এবং অশুভ, তার সম্বন্ধে কি বলা যায়, এটা আমার—এটা আমিই—এই আমার আত্মা?"

"না, তা কখনই বলা যায় না।"

সারিপুত্র তখন বললেন: "তাহলে সমস্ত রূপের সম্বন্ধে, সমস্ত বেদনার সম্বন্ধে, সমস্ত সংজ্ঞা, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধে—অতীতের, ভবিষ্যতের এবং বর্তমানের হোক, অন্তরের হোক বা বাহিরের হোক, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম হোক, নীচ অথবা উচ্চ হোক—প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে বলতে হবে—এষো ন মম এষো নাহম্ এষো ন মে আত্মা। এটা উপলব্ধি করে সাধক রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ অনুভব করেন—বিরাগের ফলে আসক্তিশূন্য হয়ে মুক্ত হন। সেই মুক্তি এলে তিনি অনুভব করেন তিনি মুক্ত; তিনি বুঝতে পারেন তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না—তাঁর ব্রহ্মচর্য পালিত হয়েছে, তাঁর করণীয় সবই তিনি করেছেন—তিনি আর সংসারের নহেন।

"তুমি কি বুদ্ধকে রূপ মনে কর যমক?"

"না।"

"তুমি কি বুদ্ধকে চেতনা, সংজ্ঞা, সংস্কার বা বিজ্ঞান মনে কর?"

"না, তাও করি না।"

"তুমি কি মনে কর তিনি রূপের সঙ্গে যুক্ত বা বিযুক্ত?"

"না।"

"তুমি কি তাঁকে বেদনার সঙ্গে, সংজ্ঞার সঙ্গে, সংস্কারের সঙ্গে এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত অথবা বিযুক্ত মনে কর?"

"না।"

"তবে কি তুমি ভাব তিনি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানের সমবায় ?"

"না।"

"তুমি কি মনে কর তিনি রূপহীন, বেদনাহীন, সংজ্ঞাহীন, সংস্কারহীন এবং বিজ্ঞানহীন ?"

"না, তাও করি না।"

"তাহলে তুমি দেখছি এই জীবনেই বুদ্ধের অস্তিত্ব প্রমাণিত করতে পারছ না। তাহলে তুমি কেমন করে বলছ যে, নির্বাণের পর দেহশেষে তিনি আত্যন্তিক বিনাশ লাভ করেন ?"

"সারিপুত্র ! আমি অজ্ঞানতার জন্য এই সংঘ-বিরোধী মত পোষণ করতাম, এখন আপনার উপদেশ শুনে সেই অন্যায় মত ত্যাগ করেছি এবং সত্য মতবাদ গ্রহণ করতে পেরেছি।"

এই আখ্যান থেকে এটা ধ্রুবভাবে প্রমাণিত যে বুদ্ধ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার বা বিজ্ঞান না হয়েও যেমন বর্তমান, দেহান্তে তিনি তেমনই বর্তমান থাকবেন। এর থেকে আরও বোঝা যায় মানুষের আত্মা ক্ষণিক কোন কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়—যে এক চিন্তাতীত, ভাবনাতীত তত্ত্ব। আত্মা ও অনাত্মা দুটি কথাই বুদ্ধবচনে আছে এবং দুয়ে মিলে সংশয়ের অন্ত নেই বৌদ্ধদের কেহ কেহ বলেন যে, মানুষের কোনও আত্মা নেই—কিন্তু সে কথা পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে সত্য। বুদ্ধ বারংবার বলেছেন যে পঞ্চস্কন্ধের কোনটি আত্মা নহে, কিন্তু তিনি কখনই আত্মা নেই বলেননি। তিনি পথচারী যুবকগণকে বলেছিলেন, "তোমরা কি চোরের সন্ধান করতে চাও, না তোমাদের আত্মার সন্ধান করতে চাও ?" তারা বলল, "আমরা আত্মানুসন্ধান করব।" বুদ্ধ তখন তাদের ধর্মোপদেশ দিলেন। অন্তিমকালে তিনি শিষ্যগণকে আত্মদীপ এবং আত্মশরণ্য হতে বলেছিলেন। এই সমস্যার সমাধান এই যে বুদ্ধ অনাত্মবাদ প্রচার করে মানুষের অহংবোধ এবং তৃষ্ণার একান্ত নিরোধ করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু পরম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন যে আত্মা তাকে তিনি কখনই নিন্দা করেননি। অনাত্মবাদ দ্বারা বাসনার বিনাশ ঘটে একথা ধর্মকীর্তি বলেছেন :

প্রজ্ঞার পূর্ণতায় নির্বাণ মেলে। সেই অনুভূতি এলে কর্ম এবং ক্লেশের পরিক্ষয় ঘটে। দুঃখের সমাপ্তি হয়। যে অনাদি মায়া মানুষের মনে অহংবোধের সৃষ্টি করে, তার শেষ হয়ে মানুষ এক পরম তত্ত্বে উপশম লাভ করে। Edmond Holmes তাঁর The Creed of Buddha নামক পুস্তকে নির্বাণ সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য : "Nirvana is a state of ideal spiritual perfection, in which the soul, having completely detached itself from what is individual impermament and phenomenal, embraces and becomes one with the Universal, the Eternal and the Real."

হোমস তাঁর পুস্তকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছেন—বুদ্ধ উপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি উপনিষদের গূঢ় রহস্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাই বৌদ্ধনির্বাণ আর ব্রহ্মনির্বাণ মূলতঃ এক এবং অভিন্ন।

বুদ্ধদেব বেদকে বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী থেকে ফিরিয়ে এনে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্রহ্মনির্বাণ আর বৌদ্ধনির্বাণে সত্যকার কোনও পার্থক্য নেই। উদানে নির্বাণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"হে ভিক্ষুগণ, এমন এক

আয়তন আছে যেখানে পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নির প্রবেশ নেই, সেই অমৃতপদ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, শরীর ও মনের অগোচর, তথায় সূর্য ও চন্দ্রের প্রকাশ নেই, তাহা পরলোকও নহে, ইহলোকও নহে কিংবা উভয়ও নহে, তথায় আগতি বা গতি নেই। তার উৎপত্তি, স্থিতি বা প্রতিষ্ঠা নেই। উক্ত পদ কোনও বস্তুতে অনুস্যূত নয়, কোন কিছুতে অবস্থিত নয়—সেখানে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত না থাকত, তাহলে জাত, ভূত, কৃত ও সংস্কৃত সংসার থেকে নিঃসরণ সম্ভব হত না।"

এই বর্ণনার সাথে উপনিষদের ব্রহ্মের কল্পনা তুলনা করলে আমরা নিঃসন্দেহ হব যে ব্রহ্মনির্বাণ এবং বৌদ্ধনির্বাণ একই তুরীয় অবস্থার কথা। সে অবস্থা অতীন্দ্রিয়, বাক্য-মনাতীত, অকথনীয় এবং অচিন্ত্যনীয়। নাগার্জুন তাঁর মাধ্যমিকা-কারিকা গ্রন্থে নির্বাণের এই ধরনের পরিচয় অভিব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

অপ্রতীতম্ অসম্প্রাপ্তম্ অনুছিন্নম্ অশাশ্বতম্
অনিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম্ এব নির্বাণমুচ্যতে।

দুঃখনিরোধের পর সম্যক্‌সম্বোধিলাভে যখন নির্বাণের আলোয় সাধকের জীবন আলোকিত হয়, তখন তাঁর অবস্থা প্রতীতির অতীত—উহা কোনও প্রকারে লভ্য নহে; কোনও শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদ নহে, কোনও ভঙ্গুর ক্ষণিক পদার্থের শাশ্বতভাবপ্রাপ্তি নহে—এই অমৃতপদের উৎপত্তি নেই, তাই তার বিনাশ নেই; এই যে অবস্থা—এই হল নির্বাণ।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের আখ্যান থেকে নির্বাণের অচিন্ত্য স্বরূপ আমরা ধারণা করতে পারি। রাজা ভিক্ষুনী ক্ষেমাকে প্রশ্ন করেন—"মৃত্যুর পরে কি বুদ্ধের অস্তিত্ব থাকে?"

"বুদ্ধ এ প্রশ্নের উত্তর দেননি।"

"তাহলে কি তিনি থাকেন না?"

"সেকথারও তিনি জবাব দেননি।"

"এ কথার কেন জবাব দেননি?"

ক্ষেমা তখন প্রতিপ্রশ্ন করলেন—"আপনার এমন কেউ কি আছে, যিনি গঙ্গাতীরের বালুকারাশির পরিমাণ বলতে পারেন?"

"না।"

"এমন কেউ কি আছেন, যিনি সমুদ্রের জলরাশির পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন?"

"না।"

"কেন পারেন না? তার কারণ সমুদ্র সুগভীর, দুষ্প্রবেশ এবং দুর্নির্ণেয়, তেমনিই শরীর থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধ সমস্ত পরিমাণের অতীত হয়ে পড়েন; তিনিও সুগভীর, দুষ্প্রবেশ এবং দুর্নির্ণেয় হয়ে যান, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে কিছু সঠিক বলা যায় না।"

নির্বাণ তাই দুর্বোধ এবং অনির্বচনীয়; বাক্য, মন ও চিন্তার অগোচর; কেবল নিবিড় অনুভূতির মাধ্যমেই তার উপলব্ধি হয়।

রাজার দুলাল সিদ্ধার্থ একদিন মানুষের দুঃখের সমাধান করতে প্রব্রজিত হয়েছিলেন—কঠোর সাধনায় তিনি সেই পরমার্থ লাভ করে বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য উদারচিত্তে সকলকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পরম কল্যাণের তিনি পথিকৃৎ—তিনি বার বার করে বলেছেন, "বুদ্ধ কোন কৃপা করতে পারেন না—মানুষকে আত্মনির্ভর হতে হবে—আপন চেষ্টায়, আপন তপস্যায় অমৃতপদ লাভ করতে হবে।"

নির্বাণের প্রশস্ত রাজপথকে তিনি সর্বমানবের দৃষ্টিগোচর করেছেন—সেই অমৃতপদের অনুসরণ

আমাদের সংকল্পসাধ্য। বহুকল্পদুর্লভ বোধি না পেলে আমি ছাড়ব না—এই ধরনের অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা যদি তাঁরই অনুজ্ঞাত মার্গে চলি—তাহলে তৃষ্ণাজাল হতে বিমুক্ত হয়ে এই জগতেই নির্বাণ লাভ করতে পারব।

বুদ্ধ আপন ধর্মকে আকালিক বলতেন। কাল তার পরিবর্তন করে না—সেই চিরন্তন সত্য বুদ্ধের জীবনকালেও যেমন আলোর দিশারী ছিল আজও তেমনিই আছে। সেই পথ গ্রহণ করে আমরা আজ কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলয়ে প্রার্থনা করি :

"শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য !
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।"

নির্বাণ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তৃষ্ণা-নদী-পারে সেই আনন্দ-ভবন !
দুঃখ সত্য। কামনার কণ্টকিত বন
মৃত্যুজালে অবরুদ্ধ রেখেছে আত্মারে !
সেই বন পার হ'য়ে অমৃতের দ্বারে
উপনীত হবে তুমি ! মরে গেলে 'আমি'
জীবন-মরুতে আসে প্রাণ-গঙ্গা নামি !
আসক্তির বিলুপ্তিতে সত্তার বিস্তার
দিক হতে দিগন্তরে ! ব্রহ্মেতে বিহার !
সকলেতে আমি আছি—এ অনুভূতির
নির্মল নিঃসীম নীলে উড়ে ভগ্ননীড়
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম ! এই তো নির্বাণ !
বাসনা-সাহারা-পারে স্নিগ্ধ মরূদ্যান !
আত্মার প্রশান্তি ! আমি শান্তির কাঙাল !
বীতরাগভয়ক্রোধ করো হে দয়াল !

স্বামী বিবেকানন্দ ও ক্রমবিবর্তনবাদ

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

ক্রমবিবর্তন-তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। ডারউইনের তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পর থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে আসছেন। ডারউইন, লামার্ক, মেণ্ডেল, হাক্সলি, হলডেন, সার্ডিন, সিম্পসন সকলেই নিজ চিন্তার মৌলিকত্বে বিশ্বাসী। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কিছু বক্তব্য আছে। বেদে, উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ আছে। ঋষিরা নানা সময়ে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁদের নিজস্ব চিন্তার কথা প্রকাশ ক'রে গেছেন। কপিল ও পতঞ্জলি তাঁদের দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে যা বলে গেছেন তার সঙ্গে নিজের প্রজ্ঞা ও অনুভূতি মিলিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ গড়ে তুলেছিলেন এক নিজস্ব মতবাদ। আর আশ্চর্য হতে হয়, তাঁর ধারণার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতপার্থক্য সামান্য।

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে জীব চার রকমের। অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ।

'অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ—অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্' (৩।১।৩)

ছান্দোগ্য উপনিষদে 'স্বেদজ' বাদ দিয়ে তিন রকম জীবের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে 'তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি'।

(ছান্দোগ্য : ৬।৩।১)॥

স্বেদজ জীবেরা এই তিন অর্থাৎ অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। এই সমন্বয় রক্ষা করবার জন্যে বেদান্তসূত্র (৩।১।২১) স্বেদজকে উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। বেদান্তসূত্রেই তার কারণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

'তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য' (৩।১।২২)॥ অর্থাৎ স্বেদজটি উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ঋষিরা মনে করতেন সৃষ্টি তিন প্রকারের—প্রাকৃত, বৈকৃত অথবা বৈকারিক, এবং উভয়াত্মক। ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে।

প্রাকৃত সৃষ্টি

প্রথম : মহৎ (ভগবানের সকাশ থেকে গুণ-সমূহের বৈষম্য)

দ্বিতীয় : অহংকার (এ থেকে দ্রব্য—জ্ঞান—ক্রিয়া প্রকাশিত)

তৃতীয় পঞ্চতন্মাত্র (ভূত সূক্ষ্মের উদ্ভব)

চতুর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়

পঞ্চম মন

ষষ্ঠ অবিদ্যা (এ থেকে জীবগণের মোহ জন্মে)

বৈকৃত বা বৈকারিক সৃষ্টি

সপ্তম স্থাবর বা প্রধান সৃষ্টি

ক	বনস্পতি	ঘ	বাঁশ
খ	ওষধি	ঙ	বীরুধ্ (কঠিন লতা)
গ	লতা	চ	গাছ (ফুল হয়ে যার ফল হয়)

তির্যগ (এরা ভবিষ্যজ্ঞানশূন্য, তমোজ্ঞানসম্পন্ন, দীর্ঘানুসন্ধানবিহীন, কেবলমাত্র আহারাদিতে তৎপর)

ক দ্বিশফ (গরু, ছাগল প্রভৃতি দুই খুর সমেত জন্তু)

খ একশফ (ঘোড়া, চমরী ইত্যাদি এক খুর সমেত জন্তু)

পঞ্চনখ (কুকুর, শেয়াল, বেড়াল ইত্যাদি)

জলচর (মকর, মাছ ইত্যাদি)

খেচর (শকুনি, বক, শ্যেন ইত্যাদি)

নবম : মানুষ

উভয়াত্মক সৃষ্টি

দশম : সনৎকুমার প্রভৃতি এবং গন্ধর্ব, কিন্নর ইত্যাদি।

বিবর্তন সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয়দের ধারণা অতি সংক্ষেপে বলা হলো। এবারে আমরা মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করবো। স্বামী বিবেকানন্দ ডারউইনের ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব গভীরভাবে অনুধাবন ক'রে তার ত্রুটিগুলি তুলে ধরেন। বিশেষতঃ 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' এবং 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রসঙ্গে আলোচনা ক'রে ডারউইনের বক্তব্যের সঙ্কীর্ণতার দিকটা দেখান। পাতঞ্জল দর্শনে ডারউইনের বক্তব্যের সমর্থন নেই বলেই যে, তিনি তা গ্রহণ করেন নি তা নয়। বিচার ক'রে দেখেছেন, যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বলেছেন ত্রুটিসমূহের কথা এবং নিজের চিন্তাশক্তির সাহায্যে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন তা এতকাল অবহেলিত হয়েই ছিল। যদিও তাঁর বেঁচে থাকাকালীন তিনি তাঁর বাগ্মিতার সাহায্যে সমবেত শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রে ফেলতে পারতেন, কিন্তু সেই কালে তাঁর ক্রমবিবর্তনবাদ সম্পর্কে এক গুরুত্ব-পূর্ণ সিদ্ধান্তকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মেনে নেন নি। তাঁর দেহাবসানের অনেকদিন বাদে তাঁর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া গেল পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ বায়োলজিষ্টদের কাছে। দেখা গেল, তাঁদের চিন্তার সঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের মিল যথেষ্ট।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী একবার আলিপুরের পশুশালা দেখতে যান। পশুশালার তৎকালীন অধ্যক্ষ উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় সুপণ্ডিত রামব্রহ্ম সান্ন্যাল তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ ও তার কারণ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?'

স্বামীজী বলেছিলেন, 'ডারউইনের কথা সঙ্গত হ'লেও ক্রমবিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে এটি যে চূড়ান্ত মীমাংসা তা বলা যায় না।' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডেলের আবিষ্কার পুনঃপ্রকাশিত হওয়াতে ডারউইনের বক্তব্যে কঠিন আঘাত এল। তার পরে ক্রমান্বয়ে চলেছে তর্ক-বিতর্ক। সাংখ্য-দর্শনে বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে সুন্দর আলোচনা আছে। নীচু জাতিকে উঁচু জাতিতে পরিণত করতে পাশ্চাত্যমতে জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রভৃতি যা সব কারণ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে, তা যে সব সময়ে তাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করে না, এ বিষয়ে স্বামীজী নিঃসন্দেহ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পশুশালার অধ্যক্ষকে বলেছিলেন:[১]

'নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করিতে পাশ্চাত্য মতে Struggle for existence, Survival of the Fittest, Natural selection প্রভৃতি যে সকল নিয়ম কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল বিষয় আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু এ সকলের একটিও উহার কারণ বলিয়া সমর্থিত হয় নাই। পতঞ্জলির মত হচ্ছে, এক species থেকে আর এক species-এ পরিণতি 'প্রকৃতির আপূরণের' দ্বারা সংসাধিত হয়। আবরণ বা obstacle-এর সঙ্গে দিন-রাত struggle করে যে উহা সাধিত হয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় struggle এবং competition জীবের পূর্ণতা

১. শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী: স্বামী-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড

লাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীব ধ্বংস ক'রে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়, তাহলে বলতে হবে, এই evolution দ্বারা বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করিয়া লইলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে উহা যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করিতেই হয়।'

এখানে 'জীবনসংগ্রাম' ও 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্যাখ্যাতারা বলেন, খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় জীবনের প্রারম্ভ থেকেই। এবং তা নিঃসন্দেহে কঠোর সংগ্রাম। শিশু জন্মাবার আগেই ভ্রূণ বা বীজ অবস্থায় অনেকটা নির্বাচন হয়ে যায়। তারপর দেখা যায় একদিকে বংশবৃদ্ধির জন্য যেমন প্রচুর আয়োজন, তেমনি অপরদিকে জীবনধারণের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা। প্রাণধারণের জন্য জাতিগত ও ব্যক্তিগত যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলছে তাকেই ডারউইন বলেছেন অস্তিত্বরক্ষার জন্য জীবনসংগ্রাম।

ডারউইনের 'সংগ্রাম' কথাটি বেশ জটিল। সংগ্রাম কথাতে বোঝায়—প্রত্যক্ষ ও সজ্ঞান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সংগ্রাম প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী জর্জ গেলর্ড সিম্পসন বলেছেন[২] যে, এই সংগ্রামের সঙ্গে 'ডিফারেন্সিয়াল রিপ্রোডাকন' কিছু পরিমাণে জড়িত।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি পুমা ও একটি হরিণ সংগ্রাম করতে পারে। একটি হত্যা করবার জন্য প্রবৃত্ত, অপরটি নিজেকে হত না করবার জন্য সংগ্রামে রত। যদি পুমা জয়লাভ করে, তাহলে হরিণের মাংস খাবে। এই 'আহার' তার সন্তান উৎপাদনের সহায়ক। অন্যদিকে হরিণ মরে গেল এবং সে আর সন্তান সৃষ্টি করতে পারলো না। তবে একথাও বলা যেতে পারে, যে হরিণটি পুমার সঙ্গে সংগ্রামে নিহত হ'ল সে হয়ত এত বয়স্ক হয়েছিল যে, তার হয়ত প্রজননক্ষমতা আর ছিল না। যদি পুমা হেরে যায় তাহলে সে হয়ত অন্য খাদ্যের সন্ধানে যাবে। সিম্পসন বলেন যে, এই সব ঘটনাবলী থেকে আমরা অনুভব করতে পারি—

'To generalise from such incidents that natural selection is overall and even in a figurative sense the outcome of struggle is quite unjustified under the modern understanding of the process. Struggle is sometimes involved, but it is usually not, and when it is, it may even work against rather than toward natural selection.'[৩] ডারউইনের 'struggle for existence' কথাটি এবং ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে একথা আগেই বলা হয়েছে। আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাণী-বিজ্ঞানী সার জুলিয়ান হাক্সলি স্বীকার করেছেন যে, ডারউইনের এই বক্তব্য ভ্রম-উৎপাদক। 'জীবনরক্ষার জন্য সংগ্রাম' বললে একটা কথা মনে হবে—হয় 'জীবন', না হয় 'মৃত্যু'। এর মাঝামাঝি কিছু নেই। ডারউইন নিজেই যে, সব সময় এই বক্তব্যটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে পেরেছেন তা নয়। সার জুলিয়ান হাক্সলি বলেছেন:[৪]

'This strange error springs, I would

২. George Gaylord Simpson: The Meaning of Evolution (Yale Univ. Press) 1964, P. 222

৩. G. G. Simpson: The Meaning of Evolution

৪. Sir Julian Huxley: 'The Emergence of Darwinism, Evolution After Darwin, vol. 1, P, 14

guess, from his failure—perhaps inevitable at the time—to think quantitatively on the subject, coupled with his adoption of the phrase 'the struggle for existence', with its implications of an all-or-nothing competition, life or death. If he had ever-spelled out natural selection in modern terms, as being the result of the differential reproduction of variants, he would at once have seen that any form of a selection can vary in vigour according to circumstances······

Strangely enough, elsewhere Darwin drops his all-or-nothing view and assumes a differential action of natural selection. This is, so far as I know, the one major point which he failed to think out fully and on which he expressed divergent conclusions.'

স্ব-শ্রেণীর মধ্যে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে থাকে—এই ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে তা সমগ্র প্রজাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক। হলডেনও একথাকে স্বীকার করেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এমনকি স্ব-শ্রেণীর মধ্যে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবশ্যক নয়। বরং সহ-অবস্থানের নীতি দেখতে পাওয়া যায়। '···Selection in favour of harmonious or co-opertive group of association, is certainly common'[৫]

স্বামীজী বলেন যে, প্রকৃতির অভিব্যক্তির নীচু স্তরগুলিতে যাই হোক উঁচু স্তরগুলিতে কিন্তু প্রতিবন্ধকসমূহের সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে তাদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়। দেখা যায়, সেখানে শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান, ধারণা এবং প্রধানতঃ ত্যাগের সাহায্যে প্রতিবন্ধকসমূহ সরে যায় অথবা অধিকতর আত্ম-প্রকাশ উপস্থিত হয়। কাজেই বাধাগুলিকে আত্মপ্রকাশের কাজ না বলে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি বলেছেন যে, হাজার পাপীর প্রাণ সংহার ক'রে পৃথিবী থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা করা হ'লে জগতে পাপ বাড়বে ছাড়া কমবে না। এর ফলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, পাশ্চাত্যের 'জীবসকলের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতিলাভ' রূপ মত মানবসমাজের পক্ষে অহিতকর। স্বামীজী বলতেন, নীচু প্রাণীকুলে ডারউইনের নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানবজগতে যেখানে জ্ঞান ও বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে সেখানে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

ডারউইনের ত্রুটি এই যে, তিনি মানুষ ও মনুষ্যেতর জীব-জন্তুদের বিবর্তনকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। যদিও তিনি অন্যান্য প্রজাতি থেকে মানুষের বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন; তিনি স্বীকার করেছেন যে, বিবর্তনপ্রক্রিয়ার সর্বোত্তম ফল মানুষ; তাহলেও তিনি ঐ মৌল দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিলেন ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ মানুষও অন্যান্য প্রাণীকে বিচার করেছেন সমদৃষ্টিতে। সার জুলিয়ান হাক্সলি ডারউইনের এই ত্রুটি ও তার কারণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁর এক প্রবন্ধে।[৬] এবং একথাও তিনি বলেছেন যে, ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয়ের

৫. G. G. Simpson: The Meaning of Evolution (Yale Univ. Press) 1964, P. 223

৬. Sir Julian Huxley: The Emergence of Darwinism Evolution After Darwin, vol 1 P. 16—17.

(Origin of Species এবং Descent of Man) নাম হওয়া উচিত যথাক্রমে 'The evolution of organism' এবং 'The Ascent of Man.'

যাঁদের আমরা আদর্শ ব'লে জানি, তাঁদের মধ্যে বাহ্য সংগ্রাম প্রায় একেবারেই দেখা যায় না। একথা সত্য যে, মানুষ যত উন্নত হয় তার জ্ঞান ও বুদ্ধির তত বিকাশ ঘটে। মানবেতর বা নীচু প্রাণীজগতে পরের ধ্বংসসাধন ক'রে উন্নতি করা সম্ভব কিন্তু মানবসমাজে তা চলে না। ত্যাগের মধ্যেই মানুষের পূর্ণ বিকাশ। যে লোক পরের জন্য যত ত্যাগ করতে পারেন, মানবসমাজে তিনিই তত বড়ো। নীচু প্রাণী-জগতে এর বিপরীত – সেখানে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত শক্তিশালী জানোয়ার ব'লে স্বীকৃত হয় একারণেই ডারউইনের জীবন সংগ্রামতত্ত্ব উভয়রাজ্যে সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। স্বামীজীর বক্তব্য আরো বিস্তৃতভাবে তুলে ধরছি।[৭]

'Animal Kingdom বা নিম্ন প্রাণিজগতে আমরা সত্যসত্যই struggle for existence, Survival of the fittest প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারউইনের theory কতকটা সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়। কিন্তু Human Kingdom বা মনুষ্যজগতে—যেখানে rationality-র বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উল্টোই দেখা যায়। যাঁদের আমরা really great men বা ideal বলে জানি, তাঁদের বাহ্য struggle একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal Kingdom বা মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে instinct বা স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationality-র বিকাশ। এইজন্য animal kingdom-এর ন্যায় rational human kingdom-এ পরের ধ্বংস-সাধন ক'রে progress হ'তে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution একমাত্র sacrifice দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice করিতে পারে মানুষের মধ্যে সে তত বড়ো। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান জানোয়ার হয়, সুতরাং struggle theory—এ উভয় রাজ্যে equally applicable হ'তে পারে না। মানুষের struggle হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal Kingdom এ স্থুল দেহের সংরক্ষণে যে struggle পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence-এ মনের উপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব-বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় মনুষ্যেতর প্রাণী ও মনুষ্যজগতে struggle বিপরীত দেখা যায়।'

জীবের নিম্নতম বিকাশ থেকে মানব পর্যন্ত —সর্বত্রই প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আত্মা বিকশিত হচ্ছে। নিম্নতম অভিব্যক্ত জীবনের মধ্যেও আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশ নিহিত আছে। ক্রম-বিকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মা নিজের বিকাশ সাধন করছে।

ক্রম-বিবর্তনতত্ত্ব সম্পর্কে স্বামীজী একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থমতে সব ধরনের উন্নতি তরঙ্গাকারে হ'য়ে থাকে। প্রতিটি গতি চক্রাকারে হ'য়ে থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখলেও দেখা যাবে যে, সহজ সরল ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ সৃষ্টি হতে পারে না। তাঁর মতে যদি ক্রমবিকাশের কথা বলা হয়, তাহলে ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়াকেও ধরতে হবে। তাঁর কথায়—"যে

---

৭. শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী : স্বামী-শিষ্য সংবাদ, পূর্বকাণ্ড।

ক্ষুদ্র অণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, উহা প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকশিত হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে ক্রমবিকাশবাদীদের (Darwin's Evolution) সহিত আমাদের কোন বিবাদ নাই।"

এই ক্রমসঙ্কোচ বা involution-এর কথা বিখ্যাত বিজ্ঞানী Pierre Teilhard De Chardin (পিয়ের টেলহার্ড দ্য সার্ডিন)-এর বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন যে, মানুষের মধ্যে 'existence of a "within" can no longer be evaded', যেহেতু 'it is the object of a direct intuition and the substance of all knowledge.'[৮]

এই প্রসঙ্গে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী সার্ডিনের আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরবো। মানুষের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন—[৯]

'It is impossible to deny that, deep within ourselves, an 'interior' appears at th[illegible] of beings, as it were seen through a rent. This is enough to ensure that in one degree or another, this 'interior' should obtrude itself as exsiting everywhere in nature from all time. Since the stuff of the universe has an inner aspect at one point of itself, there is necessary a 'double aspect to its structure', that is to say, in every region of space and time—in the same way, for instance, as it is grannular : co-extensive with their Without there is a Within to things.'

অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের কথা ডারউইন স্বীকার করলেও স্পষ্ট ক'রে বলেননি। তাছাড়া ক্রমসঙ্কোচের কথা তিনি হয়ত ভাবতেই পারেননি।

বিখ্যাত বায়োলজিষ্ট সার জুলিয়ান হাক্সলি ১৯৫৯ সালে তাঁর 'The Evolutionary Vision' বক্তৃতায় বলেছিলেন, মানুষের ক্রম-বিকাশ বায়োলজিক্যাল নয়, একে বরং মনস্তাত্ত্বিক বলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়া সভ্যতা বা সংস্কৃতির ধারা অনুযায়ী হয়। তার ফলে আত্মবোধ, মানসিক বিকাশ প্রভৃতি হয়ে থাকে।

এই সঙ্গে হাক্সলির আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন, 'মানুষের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র বস্তু বা পদার্থের উপরে 'মনে'র স্থান। পরিমাণ বা সংখ্যার উপরে গুণের আসন।'

'It (Evolutionary Vision) shows up mind enthroned above matter, quantity subordinate to quality.'[১০]

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে দেহের থেকে মনের প্রাধান্য বেশী একথা রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতেও ধরা পড়েছে। প্রতিযোগিতা আছে ঠিক, কিন্তু অপরকে ধ্বংস ক'রে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সাধনা মানুষের নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,[১১] 'অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে। মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র, পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়।'

---

৮. The Phenomenon & Man, London, Collins, 1959, P. 55.

৯. ibid.

১০. Evolution After Darwin, Vol III, P. 251- .

১১. যাত্রী।

স্বামীজী বলেছেন, ক্রমবিকাশপ্রক্রিয়া মানুষকে মহত্তর সোপানে পৌছে দেয়। স্যর জুলিয়ান হাক্সলিও একই কথা বলেন। তিনি স্বীকার করেছেন ক্রমবিবর্তনের উদ্দেশ্য মানুষকে পূর্ণতায় পৌছে দেওয়া। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন আমাদের বর্তমান জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের বিবর্তনের চরম উদ্দেশ্য এই নয় যে তারা বেঁচে থাকবে বা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে অথবা তার গঠনগত নানা জটিলতার সৃষ্টি হবে, কিংবা পারিপার্শ্বিকের উপর তার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বাড়বে, তার উদ্দেশ্য হলো, বর্তমান থেকে আরো বেশি পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া। তাঁর ভাষায়—

'......the fuller realization of more possibilities by the human species collectively and more of its component members individually.' [১২]

হাক্সলি বলেন, মানুষের চরম লক্ষ্য যদি 'বৃহত্তর পরিপূর্ণতা' ধরা হয়, তাহলে আমাদের এমন একধরনের বিজ্ঞানের প্রয়োজন (science of human possibilities) যার সাহায্যে আগামী দিনের (ভবিষ্যতের) 'মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন' (Psychological evolution) সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারবো। তাহলে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বহুকাল আগে স্বামী বিবেকানন্দ যে 'মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের' কথা বলে গিয়েছিলেন, বর্তমান কালের বিজ্ঞানীদের বক্তব্যে তারই সমর্থন মেলে।

বেদান্তদর্শন বলেন সমগ্র বিবর্তনক্রিয়া গাঠনিক ও গুণগত উদ্বর্তন তো বটেই, এবং তার চেয়েও বড় কথা অন্তস্থ 'অসীম সত্তা'র বৃহত্তর প্রকাশ। এ হচ্ছে 'বস্তুর' উদ্বর্তন এবং 'আত্মার বিকাশ'। বিংশ শতকের বায়োলজিষ্টরা আদি (প্রথম) জীবন্ত প্রাণীর মধ্যেও চিৎশক্তির বিকাশ লক্ষ্য করেছেন।

চিৎশক্তির আধ্যাত্মিক মান ক্রমে সমৃদ্ধ হতে থাকে, বিভিন্ন দিকে তার প্রকাশ ঘটে যতই বিবর্তনের ধাপ অগ্রসর হয়। স্নায়ুমণ্ডলীর বিকাশ চিৎশক্তিকে প্রগাঢ় ও ব্যাপক ক'রে তুলতে সাহায্য করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাকে যথাসম্ভব বাড়িয়ে তোলে। বিবর্তনের রঙ্গমঞ্চে মানুষের আবির্ভাবের পরে চিৎশক্তির এক নতুন ও ইঙ্গিতপূর্ণ দিক টের পাওয়া গেল। মানবেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে চিৎশক্তির বিকাশ ঘটে প্রধানতঃ বাইরেকার পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর ক'রে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য তাদের দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশের উপর এই শক্তির বিকাশ খুব বেশি নির্ভর করে না। কেবলমাত্র মানুষ 'নিজেকে' উপলব্ধি করতে পেরেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা সম্পর্কশূন্য উভয় সত্তার সম্বন্ধেই সে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল। বিংশ শতাব্দীর বায়োলজি এবং প্রাচীন বেদান্ত উভয়েই মানুষের এই বিশেষত্বকে তাঁর একান্তভাবেই 'নিজের' ব'লে ঘোষণা করেছেন। বিবর্তনের ফলে, মানুষের মধ্যে সঞ্জাত হয়েছে এই বিশেষ শক্তি—চিৎশক্তি বা আত্ম-জ্ঞান। নিঃসন্দেহে এটি জটিল জিনিস।

বিবর্তন সম্পর্কে বেদান্তের মতামত এবং সেই সঙ্গে মানুষের একক বিশেষত্ব বিষয়ে 'ভাগবতে' এক সুন্দর শ্লোক আছে—

'সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥'
(১১ : ৯ : ২৮)

১২. The Emergence of Darwinisim, (Evolution After Darwin) Vol I, P. 20.

—'ঈশ্বর তাঁর নিজের শক্তির সাহায্যে (ক্রমবিবর্তন ?) গাছ, সরীসৃপ, পশু, পাখী, কীট, প্রভৃতি বিভিন্ন শরীরের সৃষ্টি ক'রে তাতেও সন্তুষ্ট না হ'তে পেরে শেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী জ্ঞানসমন্বিত এই পুরুষদেহ (মানুষ) সৃষ্টি ক'রে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছিলেন।'

এক চৈতন্যময় অণু থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে মানব। যেহেতু মানুষের মধ্যে চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ। এই কথার প্রকারান্তরে সমর্থন মেলে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী L. S. Berg-এর বক্তব্যে। তিনি বলেছেন বিবর্তন কেবলমাত্র বহিরঙ্গে নয়, তা অন্তরঙ্গেও। এমন কোন শক্তি গঠনশীল অণুপরমাণুর মধ্যে আছে যা জীবাণুকে তার নির্ধারিত পথে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, বিবর্তনক্রিয়া যে পূর্বপরিকল্পিত। পূর্বেই অবস্থিত কোন সঙ্কুচিত জিনিসের (সত্তা ?) উন্মোচন মাত্র।

বার্গের একটি বিশেষ মন্তব্য শুনলে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণার সঙ্গে তার সুস্পষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—[১৩]

'Evolution is to a considerable degree predetermined, an unfolding or manifestation of pre-existing rudiments'.

বার্গ অনেকদিন আগে (১৯২৬) যে কথা বলেছেন আধুনিক কালের একজন খ্যাতনামা জীবতত্ত্ববিদ্ Theodosius Dobzhansky (কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক) তাঁর এক প্রবন্ধে[১৪] (১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) 'Evolution from within' কথাটাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

যদি স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, ক্রমবিকাশ মানে চৈতন্যের বিকাশ তাহলে একটি প্রশ্ন জাগে। তা হলো, মানুষ জন্মাবার আগে তো লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে—তখন তো চৈতন্যের অস্তিত্ব ছিল না। এই প্রশ্নের উত্তরে এ কথাই বলতে হয়—সেই সময় ব্যক্ত চৈতন্য ছিল না, কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল। সৃষ্টির শেষ হচ্ছে পূর্ণমানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্য। আদিতেও তাই। বর্তমান কালের বিজ্ঞানী সার্ডিন তাঁর 'The Phenomenon of Man' গ্রন্থে বলেছেন 'consciousness transcends by far the ridiculously narrow limits within which our eyes can directly perceive it.' (P. 300).

আশ্চর্য হ'তে হয় আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ ক্রমবিকাশতত্ত্ব সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ ক'রে গেছেন, তার আধুনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে বিজ্ঞানীদের কাছে। বিবেকানন্দ বিজ্ঞানী নন, এখনও তিনি দার্শনিক, ধর্মপ্রবক্তারূপেই খ্যাত এবং প্রচারিত। তাঁর রচনার এই অবহেলিত দিকটি উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা গেল আর এক বিরাট সত্তার। সে সত্তা বিজ্ঞানীর। যিনি সুদীর্ঘকাল আগে বিজ্ঞানের এক জটিল বিষয়ের উপর যে আলোকপাত করেছিলেন আজ তার সমর্থন দেখে তাঁর জ্ঞানের, দূরদৃষ্টির অতলান্ত গভীরতার কথা স্মরণ ক'রে বিস্ময়ে, পুলকে, শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হ'তে হয়।

১৩. L. S. Berg. 1926, Nomogenesis, London, Constable.

১৪. T. Dobzhansky : Evolution And Environment. (The Evolution of Life).

শ্রীমা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

১৬ মার্চ, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে (লেখা পত্র)

শ্রীমা বললেন, স্বামীজী সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করতে ভালবাসি, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কথাই তাঁকে বলেছিলেন: স্বামীজী জাতীয় দেবতার সাক্ষাৎ অবতার; আর তিনি কালীর অবতার।* বুঝতে পারছ!......সুতরাং কোনো এক দিক থেকে স্বামীজী উপরে আছেন। তোমাকে চমৎকার কিছু দিলুম, কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে নীরব থাকতে হবে।

২৬ এপ্রিল, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

যোগানন্দের মৃত্যু শ্রীমা ও যোগীনমার কাছে দারুণ বেজেছে। মৃত্যু কথাটি তিনি যেন সইতে পারছেন না—এমনই মানবিক বেদনা। 'জানি জানি সে আমার প্রভুর কাছে গেছে—সে কথা জানি আমি—কিন্তু সে যে আমার যোগীন, তাকে প্রভু কেড়ে নিলেন!'

২ মে, ১৮৯৯, নেল হ্যামণ্ডকে

চারিদিকে ঘণ্টা বাজছে, সুর ভেসে আসছে, এখন যে সন্ধ্যারতির কাল। ছাতের উপরে উঠে যাব এখন, চুপ করে শুয়ে দেখব তারকাদের ফুটে ওঠা আকাশ-অঙ্গনে।...... একে আমি বলি শান্তি-লগ্ন।......সন্ধ্যাদীপ জ্বলতে শুরু হয়েছে......অন্তঃপুরের মহিলারা প্রণত হয়েছে বিগ্রহের সামনে; এই সময়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকেই সারদাদেবীর গৃহে, ঠিকভাবে বলতে গেলে আশ্রমে, মহিলাদের অনেকে নিঃশব্দে জপমালা ঘুরিয়ে চলেছে, আর মা উপস্থিত কারো সঙ্গে আলাপ করে যাচ্ছেন।

১৮ জুন, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

মধুময় রামকৃষ্ণ!—আজ সকালেই তোমার ডাক এসে পৌঁছল। আমি একাদশী করছি—মজা করে। সাদা শাড়ি পরেছি—আর সারাদিন মায়ের কাছাকাছি আছি।

মা যে কী—সবে বুঝতে পারছি। সেদিন সদানন্দ সম্বন্ধে বিকট মিথ্যা দুর্নামের বিরুদ্ধে সদানন্দকে সমর্থন করতে যদি তাঁকে দেখতে! আর আমার 'জেনানা' প্রবন্ধ বেরুবার পরে তিনি যখন শান্তভাবে বললেন, সন্তোষিণীর মা (প্রবন্ধের জন্য) তার ছবি তুলতে দিয়ে আসলে তাঁকেই সাহায্য করেছেন—তখন এর মূল্য আমার পক্ষে কতখানি ছিল—নিশ্চয় বুঝবে।

[নিবেদিতা কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজ-পরিচালিত বিখ্যাত সচিত্র পত্রিকা 'এমপ্রেস'-এর জন্য ভারতীয় অন্তঃপুরজীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের জন্য সদানন্দ ও সন্তোষিণীর মা নিজেদের ছবি তুলতে দেন। এ বিষয়ে ১৬ই মার্চের পত্রে নিবেদিতা লেখেন—

"Yesterday morning Mr. and Mrs. Paskar came to photograph the house and children for the Empress. They

---

* The Mother says the Sri R. K. told her that Swami was even as I have loved to think him, a direct incarnation of the National God, and He Himself of Kali.........

also photographed Sadananda, got up as a typical beggar.]

৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

[মেরী হেল ও সারদাদেবী একই ধারায় নারী, এই কথা বলার পরে—]

দু'জাতীয় নারী আছে। এক ধরনের নারীতে অপ্রতিরোধী সহন, যেমন সারদাদেবী, যেমন (মনে হয় ঠিকই বলছি) পুণ্যবতী মেরী। মেরী হেলও এই ধারায়।······

২৫ ডিসেম্বর, ১৯০০, ম্যাকলাউডকে

[নিবেদিতা এই সময়ে পাশ্চাত্যে ছিলেন।]

তুমি যথাসময়ে (কলকাতা গিয়ে) মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে পারবে, আর মাতাঠাকুরাণীর কাছে যেতে পারবে—আমার কী যে ভাল লাগছে!······

উঃ! তুমি সদানন্দকে দেখবে, স্বরূপানন্দকে দেখবে, আর সেই সঙ্গে মাতাঠাকুরাণীকে!!! প্রায় বিশ্বাসই হচ্ছে না!

৪ জানুয়ারী, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

কী কাণ্ড! তুমি ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে মাতাঠাকুরাণীকে দেখবে! ভাবতেও অপূর্ব লাগে!

১১ জানুয়ারী ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

অনেক দিন ধরে মাতাঠাকুরাণীর জন্য উদ্বিগ্ন। গত মেলে পাওয়া চিঠিগুলিতে উদ্বেগের সমর্থন আছে। তাঁর কাছে ফিরে যেতে খুবই ব্যস্ত।

১৭ মার্চ, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

তোমার গত বারের চিঠি পড়লাম; শ্রীমা জোর দিয়ে বলেছেন—আমাকে ফিরে যেতেই হবে;—পড়ে খুবই আনন্দ হল। সারা (মিসেস বুল) যদিও উল্টো কথা বলছেন তবু ধরে নেওয়া যায় আমি বেরিয়ে পড়েছি।

২২ মার্চ, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমায়ের কাছে ফিরে যেতে সমস্ত মন-প্রাণ ব্যাকুল।

২৯ মার্চ, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে পারলে খুশী হব। তোমার মতই আমিও অনুভব করি, শ্রীমায়ের ইচ্ছা সব সময়েই ধ্রুব।

৩ মে, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

বিশেষ করে আমি শ্রীমায়ের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। শুনছি তিনি বড় রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছেন।

১০ জুন, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

সারদাদেবীর আবাসে ফিরে যেতে কী যে ব্যাকুল, কি করে বোঝাব? যত সব আজে-বাজে কাজ নিয়ে আছি।

৩ অক্টোবর, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

[অ্যাংলিক্যান সিষ্টারহুডের এক আশ্রমে নিবেদিতা কিছুসময় ছিলেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা বিষয়ে—]

এটি অ্যাংলিক্যান ভগিনী-আশ্রম, রোমান নয়, সুতরাং সব কিছু ইংরাজীতে, ল্যাটিনে নয়। আবেগ সম্বন্ধে এখানে সংযম আছে, আমার কাছে যা সুন্দর মনে হয়। তবু এদের সমস্ত জীবনটি যেন প্রার্থনামন্দির—দেওয়ালের প্রতিটি পাথর যেন ঈশ্বরভক্তি ও শান্তির পবিত্র প্রভাবে পূর্ণ।

'গেস্ট মিসট্রেস' আমাকে বললেন, এই সম্প্রদায় ভক্তিসাধনার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম-ব্রতী। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমায়ের পূজা-অর্চনার পরিমাণের চেয়ে বেশী কিছু নয় দেখে গভীর তৃপ্তি পেলাম। এদের আরাধনা শুরু হয় সকাল ৬টায়, দিনের শেষ অনুষ্ঠান ৯॥ টায়। সব জড়িয়ে প্রতিদিন সাধারণ উপাসনা ৪॥ ঘণ্টার। অবশ্য ব্যক্তিগত উপাসনাও সেই সঙ্গে আছে।

আহারাদির ব্যাপারে এদের আরও বাস্তব-বাদী দেখলাম। এঁরা বলেন, অনাহারে কাজ ও ধ্যান চলে না, এবং আমি কোনো খাওয়াই বাদ দিতে সাহস করিনি, কারণ যথেষ্ট না খেলেই জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হয়। এ ব্যাপারে প্রাচ্যরীতির চেয়ে এঁদের বেশী প্রাজ্ঞ বলে মনে হয়নি। অবশ্য ব্যাপারটি আকর্ষণীয়। আমি এর থেকে সাহস পেয়েছি—যেহেতু স্কুলের কাজের জীবনের সঙ্গে ধ্যানের জীবনকে মেলাবার উপায় দেখা গেছে শারীরিক সামর্থ্যকে না কমিয়ে···

অপরপক্ষে স্বামীজী ও শ্রীমায়ের কাছে ফিরে যেতে চাই—আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তাতে কেন্দ্রীভূত।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, মিসেস র‍্যাটক্লিফকে

[র‍্যাটক্লিফদের সন্তান-সম্ভাবনা হলে নিবেদিতা লেখেন—]

খুকী যখন জন্মাবে, আমি প্রথম তাকে নিয়ে যাব সারদাদেবীর কাছে আশীর্বাদের জন্য। সারদাদেবীকে আমরা 'হোলি মাদার' বলি; খুব সাদাসিধে হিন্দু রমণী তিনি, কিন্তু তবু আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।

[নিবেদিতার প্রত্যাশামত র‍্যাটক্লিফদের মেয়ে হয়নি, ছেলে হয়েছিল। এখানে উল্লেখ-যোগ্য মিঃ র‍্যাটক্লিফ স্টেটসম্যানের সম্পাদক ছিলেন।]

২১ জানুয়ারী, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

সপ্তাহখানেকের মধ্যে মাতাঠাকুরাণীর কলকাতায় আসার কথা। স্বামী সারদানন্দের বিশ্বাস, তিনি আর কখনও আমাদের কাছ থেকে সরে যাবেন না। একথা সত্য হবে—তাই বিশ্বাস করি।

২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

মাতাঠাকুরাণী এখন এখানে আছেন। কী ছোট্ট, রোগা আর কালো হয়ে গেছেন—গাঁয়ে থাকার কষ্টে শরীর যেন একেবারে ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বের মতই সেই স্বচ্ছ বুদ্ধি, উন্নত মর্যাদা, নারীত্বের মহিমা—অবিকল। তাঁকে কত রকমের আরামে রাখতে যে সাধ আমার হচ্ছে! একটি নরম বালিশ, জিনিস রাখার একটি তাক, একটি কম্বল, আরও কত কি দরকার। সব সময়ে ভিড়—লোকজন ঘিরে আছেই। তাঁকে একটি সুন্দর রঙিন ছবি দেবার ইচ্ছা। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর কোনো পরিবর্তন হয়নি। ক্রিস্টিন তাঁকে তেমন বুঝতে পারে না। এতে আমি মজা পাই, কারণ ক্রিস্টিন আন্তরিকভাবেই সেকথা বলে। তবে ক্রিস্টিনের এ মনোভাব স্থায়ী হবে না। একদিন নিশ্চয় সে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

কথায় কথায় জানাই, একটা কথা শুনে তুমি খুব খুশী হবে, যথার্থ মহত্ত্বের চেহারা আমি ক্রমেই বেশী করে ধরতে পারছি।

৩ মার্চ, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

মাঠাকরুণ এসে গেছেন। তেমনি আছেন আমাদের মা। যখন তিনি এখানে থাকেন—আমাদের আশ্রয় থাকে।

১৭ মার্চ, ১৯০৪, ওলি বুলকে

জানো, আজ থেকে ঠিক ৬ বছর আগে আমি মাঠাকরুণের চরণদর্শনে গিয়েছিলাম।

২৪ মার্চ, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

তোমার কথা মাঠাকরুণ সব সময়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে নিরন্তর ভালবাসা ও আশীর্বাদ পাঠান। মাঠাকরুণ, আমাদের সেই চির-

কালের মা-ই আছেন—সেই অবর্ণনীয় মহিমা আর মাধুর্যের নির্ঝর।

৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁর একটি সদ্য-দর্শনের কথা বললেন; তিনি আমাকে গেরুয়া বস্ত্রে দেখেছেন। মনে হয়, যে কোনো সময়ে তিনি আমাকে গেরুয়া দিতে পারেন। কিন্তু আমি তো নিতে পারব না। স্বামীজী আমাকে একটি জিনিস দিয়ে গেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত যা রক্ষা করতে হবে—ব্রহ্মচর্য।

১৩ নভেম্বর, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমাকে বললাম, তুমি এখনো তাঁর 'গণ্ডার কন্যা' রয়ে গেছ; তারপর এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের সুমহৎ উক্তিও শোনালাম। শ্রীমা আমার-- মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি—কী যে মিষ্টি! সব সময়ে তোমাকে আশীর্বাদ করেন।

৮ ডিসেম্বর, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমায়ের চরণদর্শনে সদ্য গিয়েছিলাম। সেই ধ্রুব মন্দির থেকে তার আশীর্বাদ পাঠাচ্ছি তোমাকে।

৫ মার্চ, ১৯০৫, ওলি বুলকে

শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু—শিশু ভগবান। শিশুর কাছে কেউ কিছু চায়! দিতে হয় সব কিছু তাকে। আকাশ বাতাস তাই পূজায় পূজায় পূর্ণ। সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজছে মধু! মধু! জীবন কর্মহীন, অর্থহীন – আঃ ভাবতেও অসীম শান্তি! সন্ধ্যা, তারার আলো, চাঁদের উদয়, আর প্রার্থনার সুর এসব কিছুই যেন আমাদের শ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মত। প্রদোষের সঘন মধুরিমার মতই তাঁর সঙ্গ—বিশেষতঃ যখন তিনি পূজার আসনে। আহা অপরূপ! অপরূপ!

[পূজার আসনে শ্রীমায়ের মূর্তি নিবেদিতাকে এমনই অভিভূত করত যে এ বিষয়ে তিনি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন—"১৯০৫ সালে মা বাগবাজারে ছিলেন। ঐ বৎসর ৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে নিবেদিতা সকালে উঠিয়াই মঠে গিয়াছিলেন। মঠ হইতে ফিরিয়া শ্রীমার নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পূজায় বসিয়াছেন। সেই পূজারতা মূর্তির দিকে চাহিয়া নিবেদিতার অন্তর এক প্রশান্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, 'শ্রীমা যখন পূজা করিতে বসেন, তাঁহাকে কী সুন্দর দেখায়! সেই মুহূর্তে আমি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসি!'"]

৫ এপ্রিল, ১৯০৫, ম্যাকলাউডকে

[নিবেদিতা এই সময়ে মারাত্মক অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের পথে—]

গতকাল শ্রীমা আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমার বিপদমুক্তিতে কত না খুশী। এমন ভালবাসায় ভরা মুখ আমি কোথাও দেখিনি।

৪ মে, ১৯০৫, ম্যাকলাউডকে

প্লেগের গতিক মন্দ, শ্রীমা শীঘ্রই কলকাতা ছেড়ে যাবেন শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু শুনছি খুব শীঘ্র যাবার সম্ভাবনা কম। এটা বুদ্ধির কাজ নয়। মাকে ঘিরে থাকে নানা মানুষ, যারা তাঁর ভালোত্বের সুযোগ নেয়, আর সারাক্ষণ সেইসব তাঁকে সইতে হয়।

[মুক্তিপ্রাণার জীবনীতে পাই, "১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে মে 'উদ্বোধন'-বাটীতে শ্রীমার

শুভ পদার্পণ হয়। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে নিজ ভবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া নিবেদিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ম্যাকলাউডকে লিখিলেন, 'বহুদিন পরে নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া ও শ্রীমার সান্নিধ্যলাভ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত।"]

১১ ডিসেম্বর, ১৯১০, সারদাদেবীকে

[মিসেস ওলি বুলের (সারা সি বুল) অসুখে মরণাপন্ন অবস্থার কথা শুনে নিবেদিতা দ্রুত আমেরিকা যান। সেখান থেকে শ্রীমাকে নিম্নের পত্রটি লেখা—]

আদরিণী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গীর্জায় গিয়েছিলাম সারার জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিল, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ি, হাতের বালা ; সব কিছু সামনে ভেসে উঠল। তখন ভাবলাম, অভাগী সারার রোগের ঘরটিকে শান্তিতে আর আশীর্বাদে ভরিয়ে দিতে পারে একমাত্র তোমারই পরশ। আর মাগো, জানো কি, ভাবলাম—সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার সময়ে তোমার ঘরে বসে ধ্যানের চেষ্টা করে কি বোকামিই করতাম! কেন বুঝিনে যে, তোমার শ্রীচরণের কাছে ছোট্ট মেয়েটির মতো বসে থাকাটাই সব—সব কিছু! মা, মাগো—ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মত উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই; তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা। সেই যে রবিবারটি—কয়েক মাস আগে, পুণ্যভরা সেই দিনটিতে গঙ্গাস্নান সেরে ছুটে তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম এক মুহূর্তের জন্য, তখন তুমি আশীর্বাদ করেছিলে, আর কি যে শান্তি আর মুক্তি বোধ করেছিলাম তোমার বাঞ্ছিত আবাসে! প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু জানি, সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে! সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র, যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ, যারা নিঃসহায়। আমরা তোমার কাছে খুব শান্ত হয়ে চুপটি করে বসে থাকব। তবে মজা করবার জন্য একটু-আধটু গোলমাল করব বৈকি! সত্যই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে,—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।

বেচারা সারার জন্য তোমার শান্তির উত্তরীয়-খানি পাঠিও। রাগদ্বেষের অতীত সমুচ্চ শান্তিতে সমাহিত থাকে না কি তোমার ভাবনা! তা কি পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দুর মত ভগবানের বুকের শিহরিত ভালবাসা নয়—যা পৃথিবীকে স্পর্শ করে না কখনো!

প্রিয়তমা মা আমার, তোমার চিরকালের বোকা খুকী, নিবেদিতা।

[একটি অখণ্ড গীতিকবিতার মত এই চিঠিটি লিখবার আশু কারণ,—"১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর বস্টনে নিবেদিতা মিসেস বুলের জন্য গীর্জায় প্রার্থনা করিতে যান। প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজের ডায়েরীতে লেখেন, 'গীর্জায় গিয়াছিলাম। সারদাদেবীকে আমাদের মেরী-

মাতা বলিয়া মনে হইল। তাঁহার সান্নিধ্য শুদ্ধিকর। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়, আমরা সকলেই তাঁহার (শ্রীমার) মত হই।' "]

[শ্রীমা ও নিবেদিতার শেষ পর্যায়ের সংযোগ সম্বন্ধে নিবেদিতার জীবনী থেকে অল্প কিছু উদ্ধৃত করছি :

"৭ই এপ্রিল (১৯১১)…ধীরে ধীরে জাহাজ বোম্বাই আসিয়া থামিল। শেষ বারের মত নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিলেন।…৯ই এপ্রিল তিনি অতি পরিচিত বোসপাড়া লেনের বাড়িতে পদার্পণ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।…১১ই এপ্রিল শ্রীমা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর পুরী হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঐ দিনই নিবেদিতা উদ্বোধনে গিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। শোকার্ত হৃদয় শ্রীমার স্নেহকরস্পর্শে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিল। মিসেস বুলের দেহত্যাগে শ্রীমা, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উল্লেখ করিয়া শ্রীমা অনেক কথা বলিলেন।

শ্রীমার এবার কলিকাতায় বাস অল্পদিনের জন্য; মাসখানেক পরে, ১৭ই মে তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন। শেষ বারের মত তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভের সুযোগ নিবেদিতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত কাজ ফেলিয়া তিনি ছুটিয়া যাইতেন শ্রীমার নিকট। তাঁহার অন্তরে কে যেন সর্বদা বলিতেছে, 'আর সময় নাই, যাহা করিবার সত্বর করিয়া লও।'…এবার গ্রীষ্মাবকাশে পুনরায় মায়াবতী। ১২ই মে মায়াবতী রওনা হইলেন। সঙ্গে সস্ত্রীক ডক্টর বসু ও অরবিন্দ বসু। যাত্রার দিন তিনি উদ্বোধন-বাড়িতে গিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীমার সহিত ইহাই তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ।"

"মাতৃত্ব হইতেছে এক আকুল উচ্ছ্বসিত ভালবাসা—যাহা কখনও প্রত্যাখ্যান করে না, যাহা আমাদের মস্তকে চিরবর্ষিত এক আশীর্বাদ, জীবনের সর্বাবস্থায় অলঙ্ঘনীয় এক অস্তিত্ব, আমাদের চিরদিনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্বরূপ হৃদয়-চন্দ্রাতপ, অতলস্পর্শী মাধুর্য-পারাবার, অচ্ছেদ্য স্নেহবন্ধন, বিমল পবিত্রতা এবং আরো কত কি!"

—ভগিনী নিবেদিতা

পারমাণবিক শক্তি

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর বিশ্বরঞ্জন নাগ

আইনষ্টাইন যে তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং বহু বিজ্ঞানীর চেষ্টায় প্রকৃতিতে সংগোপনে রাখা যে শক্তির উৎসের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল তার প্রথম ব্যবহার হল মানুষকে ধ্বংস করবার জন্য। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগলেন কি করে এই শক্তি মানুষের উপকারে লাগানো যায়। পারমাণবিক বোমায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরমাণুগুলি ভাঙ্গতে থাকে। যদি কোনভাবে এই ভাঙ্গাটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা হলেই পরমাণবিক শক্তি কাজের উপযোগী হবে। আরও একটি সমস্যাও হল এই যে, ইউরেনিয়াম ২৩৫ কম পরিমাণে ব্যবহার করে কিভাবে ক্রমবর্ধমান বিভাজন হতে পারে। সাধারণ ইউরেনিয়ামকে পরিশোধিত করে ইউরেনিয়াম ২৩৫এর পরিমাণ যদি বাড়াতে হয় তাহলে কাজটা হবে খুবই ব্যয়সাধ্য এবং অন্যান্য শক্তির তুলনায় পারমাণবিক শক্তির দাম হবে অনেক বেশী। তাই পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাবার উপযোগী করতে হলে এমন ব্যবস্থা করা দরকার যে সাধারণ ইউরেনিয়ামে ক্রমবর্ধমান বিভাজন হবে, সেই বিভাজনকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং বিভাজনের ফলে যে শক্তির উদ্ভব হবে তা ব্যবহার করে দরকারী যন্ত্রপাতি চালানো যাবে।

বর্তমানে এভাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। যে যন্ত্রে এটা করা হয় তার নাম হল রিয়্যাকটর বা পারমাণবিক চুল্লী। সাধারণ ইউরেনিয়ামে ক্রমবর্ধমান বিভাজন করবার জন্য একটি বিশেষ ঘটনার সাহায্য নেওয়া হয়। নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়াম-পরমাণুকে ভাঙ্গার সময়ে দেখা যায় যে নিউট্রনের শক্তির উপরে ভাঙ্গার সম্ভাবনা নির্ভর করে। শক্তি বেশী হলে নিউট্রনকে আত্মসাৎ করে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনের ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, কেননা পরমাণুর কেন্দ্রীন শক্তিশালী নিউট্রনকে ধরতেই পারে না। অপরপক্ষে শক্তি কম হলে অনেক সহজেই ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীন নিউট্রনকে ধরতে পারে এবং বিভাজিত হয়ে যায়। কাজেই সাধারণ ইউরেনিয়ামের সঙ্গে যদি এমন কোন পদার্থ মেশানো যায় যা নিউট্রনকে আত্মসাৎ করবে না কিন্তু এর শক্তি কমিয়ে দেবে তাহলে সাধারণ ইউরেনিয়ামেও যে ইউরেনিয়াম ২৩৫ আছে তাদের বিভাজনেও ক্রমবর্ধমান বিভাজন হতে পারে। এই ধরনের পদার্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কার্বন, জল ও ভারী জল (ভারী জলে হাইড্রোজেনের বদলে থাকে ডয়টেরন); এদের বলা হয় মডারেটার বা নিয়ন্ত্রক যা নিউট্রনের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য যখন নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করে নিউট্রনগুলির শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন আবার দেখতে হয় যে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনের সঙ্গে সংঘাত হওয়ার আগে নিউট্রনগুলির শক্তি যেন বেশ কমে যায়। মাঝামাঝি রকম কমলে কিন্তু ইউরেনিয়াম ২৩৮এর কেন্দ্রীন এদের আত্মসাৎ করে নেবে এবং নিউট্রনগুলি ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর কেন্দ্রীনকে ভাঙ্গতে পারবে না। তাই নিয়ন্ত্রক ইউরেনিয়ামের সঙ্গে না মিশিয়ে আলাদা ভাবে ইউরেনিয়ামের খণ্ডগুলির মধ্যে মধ্যে রেখে দিতে হয়। কোন ইউরেনিয়ামের খণ্ডে যে নিউট্রনগুলি তৈরী হয় তারা এই নিয়ন্ত্রকের মধ্য

দিয়ে নিকটবর্তী ইউরেনিয়ামের খণ্ডে পৌছানর আগেই অনেক শক্তি হারিয়ে ইউরেনিয়াম ২৩৫-কে ভাঙ্গবার উপযোগী হয় কিন্তু ইউরেনিয়াম ২৩৮এ অবলুপ্ত হয় না। মোট কথা দাঁড়ালো যে যদি সাধারণ ইউরেনিয়ামের মধ্যে কিছু নিয়ন্ত্রকের খণ্ড দেওয়া যায় তাহলেই ইউরেনিয়াম ২৩৫ এক হাজারে মাত্র সাত ভাগ থাকা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান বিভাজন হতে পারে।

ইউরেনিয়ামের মধ্যে যদি এমন কোন পদার্থ দেওয়া যায় যা নিউট্রনকে সহজে আত্মসাৎ করে তাহলে বিভাজনকে নিয়ন্ত্রণও করা যায়। ক্যাডমিয়াম ও বোরন একাজ করতে পারে। যে সব নিউট্রন ইউরেনিয়ামে জড়িয়ে থাকে এবং বিভাজন ঘটায় তাদের সংখ্যা সহজেই কমিয়ে দেওয়া যায় ক্যাডমিয়ামের বা বোরন কার্বাইডের রড ইউরেনিয়ামে প্রবেশ করিয়ে। কাজেই রডগুলিকে কতটা প্রবেশ করানো হল তা নিয়ন্ত্রণ করে ইউরেনিয়ামের পরমাণুগুলির বিভাজনের হার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বিভাজনের ফলে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তাকে কাজে লাগানো যায় যদি কোনভাবে চুল্লীর তাপ বাইরে নিয়ে আসা যায়। কোন তরলপদার্থকে চুল্লীর মধ্যে সঞ্চালিত করে তাপ বাইরে নিয়ে আসা সম্ভব। মুশকিল হল, তাপমাত্রা এত বেশী হয় যে তরল পদার্থটির বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু উচ্চচাপে তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক অনেক বেড়ে যায়। তাই খুব উচ্চচাপের জল ইউরেনিয়ামের মধ্যে পাঠিয়ে বিভাজনের ফলে তৈরী তাপকে বাইরে নিয়ে আসা যায়। এই উতপ্ত জল ব্যবহার করে আবার সাধারণভাবেই বৈদ্যুতিক যন্ত্র চালানো যেতে পারে।

পারমাণবিক চুল্লীতে উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি যেভাবে করা হয় তা ৩নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। (ক) হল চুল্লীর কেন্দ্রস্থল যে কার্বনের (খ) মধ্যে গর্ত করে ইউরেনিয়ামের (গ) রড
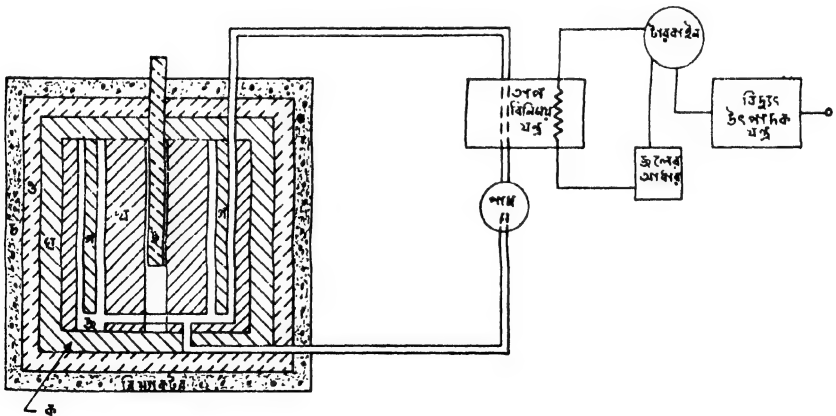
(৩ নং চিত্র)

ক=রিয়্যাকটারের কেন্দ্র
খ=কার্বনের নিয়ন্ত্রক
গ=ইউরেনিয়াম
ঘ=কার্বনের আবরণ
ঙ=জলের আবরণ
চ=কংক্রীটের ”
ছ=ক্যাডমিয়াম
জ=জলের জ্যাকেট

বসানো থাকে। মোটা ভাবে কার্বন দিয়ে (ঘ) এই কেন্দ্রস্থানটি চারদিক থেকে ঢেকে তার উপরে আবার জল (ঙ) এবং কংক্রীটের (চ) আবরণ দিয়ে লওয়া হয় যাতে বিভাজনের সময়ে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় তা বেরিয়ে এসে কর্মীদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করতে না পারে। ঐ কার্বনের মধ্যেই আবার গর্ত করে বসানো ক্যাডমিয়ামের রডগুলি (ছ)। এমন ব্যবস্থা থাকে যে এই রডগুলিকে ইচ্ছামত ভেতরে ঢোকানো যায় বা বের করে আনা যায়। ইউ-রেনিয়ামের রডগুলিতে ষ্টেনলেস ষ্টীলের জ্যাকেট (জ) পরা'না থাকে। এই জ্যাকেটের মধ্য দিয়ে উচ্চচাপের জল চালানো যেতে পারে। এই জলই আবার তাপবিনিময় যন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে বাষ্প তৈরী করা হয়। জলের বাষ্প চলে যায় টারবাইনে যার দ্বারা বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র চালিয়ে (ঝ) বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

প্রথমটায় ক্যাডমিয়ামের রডগুলি পুরোপুরি ভেতরে থাকে। চুল্লীটি চালু করার সময়ে আস্তে আস্তে ক্যাডমিয়ামের রডগুলি বাইরে বার করে নেওয়া হয়। এক অবস্থায় ক্রম-বর্ধমান বিভাজন আরম্ভ হয়ে যায় এবং ইউ-রেনিয়াম থেকে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হতে থাকে। যদি তাপমাত্রা বেশী বাড়তে দেখা যায় তাহলে ক্যাডমিয়ামের রডগুলি ভেতরে ঢুকিয়ে বিভা-জনের হার কমিয়ে লওয়া হয়। এভাবে স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে ক্যাডমিয়ামের রডগুলির ওঠানামা নিয়ন্ত্রিত করে বিভাজনের একটি নির্দিষ্ট হার চালু রাখা হয়। এবং যে জল ইউরেনিয়ামের রডগুলির উপরের জ্যাকেটের মধ্যদিয়ে আসে তার তাপমাত্রা নির্দিষ্ট হয়ে উৎপন্ন বিদ্যুতের সমতা রক্ষা করে।

অবশ্য সাধারণ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে পারমাণবিক চুল্লীকে চালু রাখা সম্ভব হলেও সাধারণতঃ শোধন করে ইউরেনিয়াম ২৩৫এর ভাগ বাড়িয়ে শতকরা পাঁচ ভাগ করে নেওয়া হয়। নিয়ন্ত্রক হিসাবেও কোন কোন ক্ষেত্রে জল বা ভারী জল ব্যবহার করা হয়, সেই জল ব্যবহার করেই চুল্লীর তাপও বাইরে নিয়ে আসা হয়। যে ধরনের চুল্লীর কথা বলা হল তাতে ক্রমান্বয়ে জলতে জলতে ইউরেনিয়াম ২৩৫ খরচ হয়ে যায় এবং চুল্লীটি চালু রাখার জন্য কয়েক মাস অন্তর ইউরেনিয়ামের রডগুলি পাল্টে দিতে হয়। এই অসুবিধাজনক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নূতন ধরনের চুল্লীর উদ্ভাবন হচ্ছে যাতে ইউরেনিয়াম ২৩৮এর পরমাণুগুলি নিউট্রন আত্মসাৎ ক'রে যে প্লুটোনিয়াম ২৩৯ তৈরী করে তার দ্বারাই চুল্লীটি চালু রাখা সম্ভব, যতদিন না সব ইউরেনিয়াম শেষ হয়ে যায়।

বর্তমানে পারমাণবিক চুল্লী ব্যবহার করে পরমাণুর শক্তিকে মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী করে তোলা হয়েছে এবং অন্য দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে যে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায় প্রায় তার সমান ব্যয়েই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যায়। উপরন্তু দাহ্য পদার্থের খনি থেকে দূরবর্তী স্থানেও এভাবে শক্তি সহজেই উৎপন্ন করা যায়। সাধারণ-ভাবে এই ধরনের বৈদ্যুতিকশক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্র অনেক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ভাবে, এর নিকটবর্তী জায়গায় গ্যাস না ছড়িয়ে কাজ করতে পারে। দিনের পর দিন এর ক্রমোন্নতিও হচ্ছে এবং শীঘ্রই এভাবে শক্তি উৎপাদন আরও সহজ ও সস্তা হবে আশা করা যায়।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, পারমাণবিক বোমায় বিধ্বংসীরূপে যে শক্তির প্রকাশ দেখা

দিয়েছিল আজ তা পুরোপুরি মানুষের আয়ত্তে এসেছে। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে একে পারমাণবিক শক্তি বলা হলেও আসলে চুল্লীতে যে শক্তি পাওয়া যায় তা কেন্দ্রীনের বন্ধনশক্তি। কেন্দ্রীনের রূপান্তর হওয়ায় এই বন্ধনশক্তি মুক্ত হয়ে বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে বস্তু শক্তিতে পরিণত হয় না। আইনষ্টাইন যে শক্তির সম্ভাবনা পদার্থে আছে বলে প্রমাণিত করেছেন তা এখনও পুরোপুরি আমাদের প্রয়োজনে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। পদার্থকে শক্তিকে পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করার কারিগরী এখনও আমাদের আয়ত্তে আসেনি। পারমাণবিক শক্তি এই শক্তিভাণ্ডারের অতি সামান্য অংশই উন্মুক্ত করেছে। আমাদের অতি পরিচিত কয়লা, পেট্রোলের ন্যায়ই এক ধরনের নূতন জ্বালানীর সন্ধান পাওয়া গেছে পারমাণবিক শক্তিতে। এ সব ক্ষেত্রেই পদার্থের রূপান্তরেই শক্তি প্রকাশিত হয়। পদার্থের বস্তুগত শক্তি এখনও আমাদের আয়ত্তের বাইরে। তবে চেষ্টা চলছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতেই আইনষ্টাইনের তত্ত্বের সম্যক ব্যবহার করে বস্তুকে পুরোপুরি শক্তিতে পরিণত করার চাবিকাঠি আমাদের হাতে আসবে।

রামকৃষ্ণ

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মোহান্ত

তোমাকে প্রণাম করি আজ এই পয়লা বৈশাখে
রামকৃষ্ণ! ভারতের প্রেম-মূর্ত, পথের দিশারী!
তোমার অমৃতবাণী মনে রেখে দেব আমি পাড়ি
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ পথ। দূরে রক্তপায়ী হায়েনারা ডাকে,
'জীবন' পথিকসম পরিক্রমাপথে শুধু কাঁপে॥
চারিদিকে লোভ হিংসা, অজ্ঞানের তীব্র অন্ধকার,
জীবন কারায় বন্দী। অন্যদিকে চিতাগ্নি দুর্বার।
মৃত্যুতে মহিমা নেই—দেহ ক্লান্ত ঋদ্ধির উত্তাপে॥

এমন দুঃসহ প্রাণ বহিতে কি পারিতাম যদি
তোমার জীবনমন্ত্রে প্রাণ নাহি হ'ত উদ্দীপিত!
বিবেকের বাণী যদি পথের নির্দেশ নাহি দিত
খরায় শুকায়ে যেত জীবনের এই ক্ষীণ নদী।

জীবনের ক্ষুদ্র নদী সাগর পাবেই আমি জানি,
পথের নির্দেশ দেবে তোমার অমৃত যুগ-বাণী॥

ধর্ম কি মনের আফিং?

অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্ক্স ও লেনিন ধর্মকে মনের আফিং বলেছেন। একথার সত্যতা নির্ভর করছে, ধর্মকে কি অর্থে ব্যবহার করছি তার ওপর। একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, কোন ধর্মনীতি, সমাজনীতি বা রাজনীতি মানুষের মনকে সাময়িক ঘুম পাড়িয়ে আফিং-এর অনুরূপ ক্রিয়া করতে পারে। অতি সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের পাতায়ও এর অজস্র নজীর মেলে। যে যুক্তিতে ধর্ম মনের আফিং, সেই একই যুক্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদও মনের আফিং। কিন্তু ধর্মের সত্য পরিচয় এতে নয়, যেমন বিজ্ঞানের সত্য পরিচয় নয় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে বা ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে। সুতরাং ধর্ম মনের আফিং এবং আফিং নয়ও —এই পরস্পরবিরো উক্তি আমরা একই নিঃশ্বাসে করতে পারি। এখন দেখা যাক, কি অর্থে একে মনের আফিং বলা যায় এবং কি অর্থে একে মনের আফিং তো বলা যায়ই না, বরং মনের সবচেয়ে সজাগ এবং মুক্ত অবস্থা বলা যেতে পারে।

মার্ক্স ও লেনিন যে পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মকে মনের আফিং বলেছেন তা হ'ল কতগুলো ধর্মীয় সংস্কার এবং আচার-আচরণ অথবা স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে priestcraft-এর দৌরাত্ম্য। সাধারণ লোকের মধ্যে এই priestcraft-এর প্রভাব ও শোষণ বিভিন্ন সময়ে খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল, এখনও নিতান্ত কম নয়। যতদিন ধর্মকে পুরোহিত-সম্প্রদায়ের একচেটিয়া শাসন ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে রাখতে দেওয়া হবে ততদিন এর আফিং-এর ক্রিয়া চলতেই থাকবে, যেমন দলীয় রাজনীতির আফিং-এর ক্রিয়া এখন সমস্ত দেশেই কম-বেশী প্রবল হয়ে উঠেছে। দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে যেমন একটি সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামী জাতীয়, এমন কি, আন্তর্জাতিক রাজনীতির আদর্শ থাকতে পারে এবং বাস্তবিকই আছে, তেমনি সম্প্রদায়নিরপেক্ষ, সার্বভৌম, বিশ্বজনীন একটি ধর্মীয় আদর্শ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এই আদর্শেরই নিঃসন্দিগ্ধ, অকুতোভয় প্রকাশ আমরা পাই প্রস্থানত্রয়ীতে। এজন্যই একে বলা হয়ে থাকে সনাতন ধর্ম। ঠিক ঠিক ধর্মাচরণ সামান্য হলেও জীবনের মহাভয় তাতে কেটে যায়—স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

প্রতি মানুষের সমগ্র জীবনকে যা ধারণ করে আছে তারই নাম ধর্ম; অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই এর ওপর নির্ভর করে আছে। এই ব্যাপকতম অর্থেই ধর্মকে নিতে হবে, যা মার্ক্স, লেনিন ও তাঁদের অনুগামীরা নেন নি। ফলে, মানবিক মূল্যবোধে এমন একটি শূন্যতা আজ এসেছে, যা কোন সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা ঠিক পূর্ণ করা যাচ্ছে না। মহাভারতকার যখন বললেন, "ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ", তখন তিনি একটি চিরন্তন সত্যকেই উচ্চারণ করলেন। ব্যক্তি-ঈশ্বর (তাঁর আবার বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন নাম) মানা, না মানা বা কতগুলো নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালন করা, না করাকে ধর্মের একমাত্র মাপকাঠি ধরে নিলে বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরূপ ঈশ্বর না মেনেও কপিলমুনি, বুদ্ধদেব ও মহাবীর

তিন নিশ্চয়ই ধর্মহীন ছিলেন না বা মহা বিজ্ঞান-সাধক আইনস্টাইনও ধর্মহীন ছিলেন না।

"বনের বেদান্ত"কে "ঘরের বেদান্তে" রূপান্তরিত করবার উদ্দেশ্য কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন স্বামীজী। তাঁর অজস্র বক্তৃতায় ধর্মের বিশ্বজনীন বিস্তার ও আদর্শ অপূর্ব ভাষায় ও শক্তিতে প্রকাশিত। তাঁর "ধর্মের বিজ্ঞান"-বিষয়ক বক্তৃতামালা প্রায় ৭০ বছর পূর্বে উচ্চারিত হলেও আশ্চর্যরকমের আধুনিক এবং তা সনাতন সত্য বলেই আধুনিক। তিনি বলেছেন, যুগে যুগে ধর্মের বিবর্তন হয়েছে—যাদুবিদ্যা ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে এর ধীরে ধীরে উত্তরণ হয়েছে। Alchemy-র ভোজবাজী থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বলে যেমন Chemistry নামক আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে, ধর্মেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় একটি সম্পূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণ-ভিত্তিক বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। এরই নাম যোগ। এর বিভিন্ন শাখা আছে, যেমন, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, ইত্যাদি। উদ্দেশ্য কিন্তু একই—মানুষের নিজেকে পুরোপুরি জানা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যেমন বিভিন্ন শাখা আছে—পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ইত্যাদি; উদ্দেশ্য কিন্তু একই—বিশ্বপ্রকৃতিকে আরও ভাল করে জানা।

জাতির নায়ক যিনি, তাঁর নিজের জীবনদৃষ্টি স্বচ্ছ না হলে জাতিকে তিনি জীবনের নির্ভুল সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না। মহাভারতে তাই রয়েছে, রাজাকে ধর্মনিষ্ঠ হতেই হবে।

বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই আত্মবিস্মৃত। নিজেকে জানবার চেষ্টা তাঁরা কোন কালেই করেননি বলে বারবার মনুষ্যকুলকে আত্মঘাতী সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। মানুষের নিজেকে জানার এবং তার নিছক জৈব সত্তাকে জয় ও অতিক্রম করার প্রয়োজন, আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা চিরকালের। এই প্রচেষ্টার সার্থকতম প্রয়াস পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে' পাই। সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই এই দুরূহ প্রয়াসের অগুণতি নজীর আছে। সুতরাং ধর্মকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা এবং 'ধর্মের বিজ্ঞান'কে আশ্রয় করা বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তা যত শীঘ্র হয়, ততই গোটা দুনিয়ার মানুষের মঙ্গল।

"প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো; একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাত কেবল এই—কোথাও সূর্যের উপর মেঘের ঘন আবরণ, কোথাও এই আবরণ একটু তরল। আমাদের বিশ্বাস জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহা সকল ধর্মেরই ভিত্তিস্বরূপ।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

রাজস্থানের পার্বণ মেলা ও ব্রত

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

দেওয়ালীর পরদিন ওদেশে হয় গোবর্ধনের মেলা নামে এক মেলা। নামের অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন ধারণের স্মারক মেলাই মনে হয়। কিন্তু একটি বিশেষত্বও দেখা যায় গো-বলীবর্দের সেবায় পুণ্য কর্মের প্রেরণার মত। রাজার গোশালা থেকে সব জমিদার সামন্ত এবং সাধারণ মানুষেরও গোশালা পরিষ্কার ও গরু-মহিষ-বলদের শিংগুলি নানা রংএ রঞ্জিত করা হয়। একটি যেন আনুষ্ঠানিক ব্রত ওটি। সেদিন আবার অন্নকূটও বটে। গোবিন্দজীর গোপীনাথজীর মদনমোহনজীর মন্দিরে মন্দিরে দেবতার সামনে অন্নের পাহাড়ের মত স্তূপ রচিত হয়। সেই অন্নস্তূপের পাশে ডাল তরকারি পরমান্ন মিষ্টান্ন ভাজা বড়ারও স্তূপ বাটিতে থালাতে পাতার দোনায় সাজানো হয়; ফুলের বিল্বপত্রের তুলসীর মালার শোভার মাঝখানে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ও সাজানোর ধরন। ভিড়ের দর্শকের আর শেষ থাকে না। প্রসাদও লোকে পেত সেকালে। দ্বিপ্রহরে অন্নকূট। উল্লেখযোগ্য, ৺জগন্নাথের মত ৺গোবিন্দজীর ভোগেও আলু অপাঙ্‌ক্তেয়— অচল।

বিকালে একটি বিরাট শোভাযাত্রাময় বিশাল মেলা। মেলার ও শোভাযাত্রার ধরন প্রত্যেক বারেই একরকম। সেই নকীব-বাজনা বাদ্য এবং সুসজ্জিত হাতি ঘোড়া উট গরু গাড়ী রথ পদাতিক সৈন্য সমন্বিত সওয়ারী বা শোভাযাত্রা বেরুতো। তবে রাজা-মহারাজাদের শোভা-যাত্রায় যানবাহনের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। 'তীজগঙ্গোর' মেলায় সোনাখচিত তাঞ্জাম বা পালকি। বিজয়া দশমীতে বৃদ্ধতম হাতি। গোবর্ধনের মেলায় রাজার সর্বশ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট একটি কালো ঘোড়া। চমৎকার তেজস্বী ঘোড়াটির সর্বাঙ্গে সোনারূপাখচিত জিন লাগাম, পায়ে গলায় সোনার নূপুর ও হার।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজা বেরুতেন গণগৌরী তোরণের পুরানো মঙ্গল তোরণপথ দিয়ে। সব 'সওয়ারী'র মত সে শোভাযাত্রাও সেই পথে বেরিয়ে সহর ঘুরে ত্রিপোলিয়া পথে অফিস-বিভাগের তোরণপথে আবার স্বস্থানে ফিরে যেত। ৺বিজয়া দশমীতে হাতি বাহন, সূর্যসপ্তমীতে চারঘোড়ার গাড়ী বাহন থাকত।

দেওয়ালীর পর আর বড় মেলা বিশেষ হ'ত না। তবে মাঝে মাঝে মহরমের (তা হ'ত যে কোনো মাসে) মেলাটি পড়ে যেত। যদিও সেটি মুসলমান পর্ব, তবু তাতে রাজার নামের একটি সুন্দর-দেখতে 'তাজিয়া' (কাগজের মন্দির) বেরুতো। আর সেখানকার নবাব সাহেবের (প্রধান সচিব তখনকার) একটি প্রকাণ্ড সুদর্শন তাজিয়া সমারোহ করে শোক মিছিল করে হাহুতাশ শব্দ করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে —'হায় হোসেন, হায় হুসেন' করতে করতে বেরুতো। প্রায়ই সেটি দুপুরবেলা বেরুত। দুধারে সহরের সর্বসাধারণ, সব সম্প্রদায়ের জনতা তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে সমবেত হ'ত। এ মেলায় শোভাযাত্রা (রাজকীয় সওয়ারী) বেরুতো না, ইসলামী শোকযাত্রা এটি।

কার্তিক মাসের পর প্রায় মাস তিন ওদেশে ব্রত পার্বণ উৎসব মেলা নেই। কার্তিকপূজা নেই। ইতুপূজা নেই। নবান্ন নেই, পৌষ পার্বণ নেই। কার্তিক মাসে 'ভীষ্মপঞ্চক' ব্রত আছে (বকপঞ্চক)। সেটার পুষ্করে খুব বড় মেলা হয় পাঁচদিন ধরে। অঘ্রাণ মাসটি নিরুৎসব মাস। পৌষ মাসে সারা মাস দেবালয়ে দেবালয়ে দেবতার "পৌষ খিচুড়ি"-ভোগ ব্রত। সারা মাস খিচুড়িভোগের ব্যবস্থা। প্রসাদ বিতরণ এবং পিঠে চাল পৌষপার্বণ নেই বটে কিন্তু পৌষ সংক্রান্তিতে প্রত্যেক বাড়ীর দাসদাসী লোকজনদের, ভিখারী অনাথদের চাল ডাল আর তিলের নাড়ু দিয়ে খিচ্‌ড়ি খেতে দেওয়ার প্রথা একটা আছে। এই সংক্রান্তির নাম হল তিলসংক্রান্তি।

এছাড়া আমাদের দেশের বিশ্বকর্মাপূজার দিনের (ভাদ্র সংক্রান্তির) ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথাটি ওদেশে পৌষ সংক্রান্তিতে চলে গেছে। পথে পথে ছাতে ছাতে মাঠে মাঠে 'কংখা' (ঘুড়ি) ওড়ানোর উৎসব প্রায় মাসাবধি চলে—শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তিতে।

তারপর মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীর একটি ভোরে হয় সূর্যসপ্তমীর মেলা—'সুরয সাতেঁ'। এটি মেলাহীন মেলায় উৎসব—লোকারণ্যহীন মেলা।

সেদিন শীতের ভোরে তখনো সহর নিদ্রিত। দোকানপসারের দুয়ার বন্ধ। পথ জনশূন্য-প্রায়। দেখা যেত একটি প্রকাণ্ড চার ঘোড়ার গাড়ী করে মহারাজাও নানা যানবাহনে সাঙ্গোপাঙ্গ-মন্ত্রীসামন্তসহ সমতলের প্রাসাদ অট্টালিকা থেকে বেরিয়ে চলেছেন, গলতা-পাহাড়ের সূর্যমন্দির পথে সূর্যপূজার জন্য। গলতা পাহাড়ের নামের কিংবদন্তী হ'ল গালব (বিশ্বামিত্রের জামাতা ?) মুনির আশ্রম।

ছোট সাদা মন্দিরটি। একটি ছোট সূর্যমূর্তি ছটাওয়ালা। আর আশ্চর্য, দেওয়ালে কয়েকটি বুদ্ধমূর্তির মত মূর্তি। এটি বুদ্ধদেবেরই মন্দির কিংবা পরবর্তীকালে সূর্যদেবের মন্দিরেই বুদ্ধমূর্তি আনা হয়েছে বলা কঠিন! সারা রাজস্থানে জৈন মন্দির। জৈন মহাবীর অবলোকিতেশ্বর অনেক। বুদ্ধের মন্দির-মূর্তি পাওয়া যায়। জয়পুরের সাঙ্গানের গ্রাম অপূর্ব জৈন স্থাপত্যে সমৃদ্ধ। উদয়পুরের পার্বত্য পথে একলিঙ্গনাথ মন্দিরের আগে পরে অনেক জৈন মন্দির, স্থাপত্যশিল্পে সমৃদ্ধ ও জৈনমূর্তিময়। অনেকগুলিকেই বুদ্ধমূর্তি মনে হয়।

এখন মেলার কথা। এই মেলা সূর্যসপ্তমীতে; শোভাযাত্রায় হাতি ঘোড়া রথ পদাতিক চতুরঙ্গ বাহিনী বেরুতো না; শুধু কিছু শান্ত্রী-সেপাইয়ের সমাবেশ থাকত পথের দুধারে।

মেলায় বাজার বসত না। তবে বাজনা-বাদ্য কিছু থাকত রাজার গাড়ীর সঙ্গে। লেপ মুড়ি দিয়ে নিদ্রিত মাঘের শীতার্ত কুয়াশাচ্ছন্ন সহরের চোখ তখন ঘুমে ভরা। বাজনার শব্দে চোখ রগড়ে কেউ উঠে দোকানের ঝাঁপ তুলেছে। কেউ পথের ধারে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ ছাতে উঠে এসেছে—নগণ্য কয়েকজন। দোকানপসার বসেনি—ক্রেতা নিদ্রিত, বিক্রেতাও সুষুপ্ত। শুধু মহারাজা আর সামন্তদের কর্মচারী-দের নিয়ে শোভাযাত্রাহীন উৎসব, গলতা পাহাড়ে পূজা অনুষ্ঠান শেষ হ'ত—এক চমৎকার ঊষা ও কুয়াশা মিলিত স্নিগ্ধদৃষ্টি নবোদিত সূর্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। এই সূর্যসপ্তমীর মেলা কোনারকেও হয়। অন্যত্র হয় কিনা জানিনা।

মাঘে ওদেশে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজার প্রথা নেই। ওদেশে সরস্বতীপূজাই কেউ জানেন না। শ্রীপঞ্চমীর নাম হল বসন্তপঞ্চমী। বসন্তকালের সূচনা। কিন্তু আগের দিন হয়ে যেত

গণেশচতুর্থীতে গণেশপূজা। ওদেশে 'দোয়াত'-পূজা নাম। মনে হয় ওখানে বিদ্যা ও সিদ্ধির দেবতা গণেশ। বছরে চার বার চারটি চতুর্থীতে গণেশপূজা হয়—ভাদ্রে আশ্বিনে মাঘে চৈত্রে। গণেশ হলেন "একদন্ত দয়াবন্ত চার-পূজাধারী।" এই 'দোয়াত'-পূজাই যেন সরস্বতীপূজার বিকল্প—শেঠ বণিক মহাজন-সমাজের পূজা বিদ্যার দেবতা, যা কিন্তু ছাত্র-সমাজের বিদ্যার্থী সমাজের পূজা নয়।

শ্রীপঞ্চমীর পর শিবরাত্রি। এটি সর্বভারতীয় ব্রত উপবাস ও শিবের পূজা। এতে উৎসব নেই, শুধু ব্রত।

এরপর দোল বা 'হোলী'। এটির কথা না বললেও হয়, সবাই জানেন, এটি দেওয়ালীর মত সর্বভারতীয়। সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতার উদ্দাম তাণ্ডব উন্মত্ত রঙের খেলার উৎসব। এই হোলীখেলার উৎসবে মন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত জনতার দেবতার উদ্দেশে ফাগ দেওয়াও যেমন, আবার সহর নগর গ্রাম জনপদ ভ'রে জনগণেরও অবাধ উন্মত্ত উল্লাস, রংখেলা! এবং কৌতুক এই, আধুনিক কালে এই যে রং—এ কেনা রং, ঘরের দোয়াতের কালির রং, পথের কাদা, নদীর ঘোলাজল, কি যে নয়, কত কি যে থাকে বলা শক্ত!

হোলীর পর আর ব্রত পার্বণ বড় একটা নেই। কিন্তু ততদিনে চৈত্রের বাসন্তীপূজার নবরাত্রি এসে পড়ে। বাসন্তীদুর্গাও শারদীয়া দেবীর মতই, যদিও নেই ওদেশে। দুর্গার 'বাসন্তী' নামও নেই। কিন্তু নবরাত্রি সুরু হয়ে যায় প্রতিপদ থেকে। কোনো কোনো দেশে তাকে 'নও চণ্ডীর' (নবচণ্ডী) মেলা উৎসব বলা হয়—যেমন উত্তরপ্রদেশে মীরাট, দিল্লী প্রভৃতি দেশে। রামলীলার উৎসব হয়, রামায়ণের কথা গান হয়। প্রতীক করে রাবণবধও হয় কোথাও, যাত্রার মত গান কথা হয়। অনেক জায়গায় রাবণবধ রাম-লীলার উৎসব!

এই নবরাত্রিতেও আবার একটি তীজ বা তৃতীয়ার মেলা হয়। এটিও গণগৌরী বা গঙ্গোর মেলা নামে অভিহিত। আগেরটি শ্রাবণ মাসের, নাম হরিয়ালী তীজ (হরিৎ)। এটি শুধু 'তীজ'। সেই গৌরী দেবী, সেই রকম বসনভূষণে সজ্জিতা, সেই রকম তাঞ্জামে আরোহণ করে বেরুলেন। আর—পূর্ব পূর্ব শোভাযাত্রার মতই 'সওয়ারী' 'লওয়াজ্‌মা' নামে শোভাযাত্রা। এদিনে রাজা বেরুতেন একটি স্বুবর্ণমণ্ডিত চারঘোড়ার গাড়ীতে। পদাতিক, হাতী, ঘোড়া, রথ, গরু, নানা যানবাহন সমন্বিত একই রকম আলো বাঁশী খেলনা পুতুল খাবারের বাজার এবং বিশাল জনতা সমন্বিত বিরাট মেলা!

এবারের কিন্তু এ মেলাতে শারদীয় নবরাত্রির মত অস্ত্রপূজা নেই। নবরাত্রি পালন শুধু মাতা অম্বরেশ্বরীর মন্দিরে বলি-ভোগরাগে। বিজয়া-দশমীর বিজয়যাত্রাও নেই। ৺রামনবমী শুধু ব্রত। বড় মেলা নয়। অশোকাষ্টমী অশোকষষ্ঠী বলেও কিছু পূজাপার্বণ নেই। এক দিনের গঙ্গোর মেলা মাত্র।

বৎসরের শেষ মেলা এটি।

বাংলাদেশের চৈত্র মাস শিবের মাস গাজনের মাস। লোকের মানসিক সন্ন্যাস নেওয়ার মাস। ব্রতে উপবাসে সারা মাস ভরা। শিবের, বাসন্তী দুর্গার, তারকনাথের সন্ন্যাস-গাজনের মেলাময় উৎসব ও ব্রত। নীলের উপবাসও বটে।

ওখানে শিবমন্দির শিবালয় অনেক—সর্বত্রই। রাজস্থানে কিন্তু শিবরাত্রি ছাড়া বাংলার মত অন্য সন্ন্যাস গাজন ব্রত উপবাস দেখিনি

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে যে মহারাজা মানসিংহ রাজা ছিলেন যিনি এখন 'রাজপ্রমুখ', ইনি ৺কালী ভক্ত—৺অম্বরেশ্বরীর ভক্ত। এঁর পিতা মাধব সিংহ ছিলেন শ্রীরাধার ভক্ত আর গঙ্গাজীর ভক্ত। তাঁর বছরে একবার বৃন্দাবন ও হরিদ্বার যাওয়ার প্রথা ছিল। তাঁর পিতা রাম সিংহ ছিলেন ঘোরতর শৈব—শিবভক্ত। একটি সুন্দর মন্দির করিয়ে বিশ্বেশ্বর শিব নামে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। একে একে তিন রাজার শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ভাবের মতের প্রবণতার জন্য প্রতিটি ভাবের মন্দিরের ও ভক্তের বেশ একটি সমাবেশ রয়েছে দেশে।

যদিও জয়পুরের রাজাদের উপাধি হ'ল "সওয়াই", রামসিং বা মানসিং যে নামই হোক সেবাইত অর্থেই বলা হয়। যেমন উদয়পুরের মহারাণারা একলিঙ্গ মহাদেবের 'দেওয়ান'।

রাজস্থানের নানা রাজ্যে শাক্ত বৈষ্ণব শৈব ধর্মের সমন্বয় ও সমাবেশ হয়েছে। সৌর এঁরা ছাড়া আছেন জৈন ধর্মের বিরাট সম্প্রদায়—যাদের বলা হয় "সরাওগী"; এঁরা অহিংসবাদী শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈন মতবাদী। এঁদের খাওয়াদাওয়া উপবাসব্রতের নিয়ম খুব কঠোর। 'সরাওগী'রা, যাঁরা গোঁড়া তাঁরা, সন্ধ্যার পর আহার করেন না কীটপতঙ্গের প্রাণহানির ভয়ে, দাঁত মাজেন না। অতি কঠোর মতবাদীরা মুখের ওপর কাপড় ঝুলিয়ে বিচরণ করেন, পাছে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে নাকে মুখে পোকা পতঙ্গ প্রবেশ করে। মেয়েরা, কিছু পুরুষও, ১০।১২ দিন থেকে মাসাবধিও উপবাসব্রত পালন করেন সামান্য জল খেয়ে। আবু পাহাড়ে এঁদের মন্দিরস্থাপত্য অপূর্ব সুন্দর। দিলওয়ারা মন্দির। কলকাতায় দুটি পরেশনাথ মন্দির এই জৈনদেরই মন্দির। যার একটি বেলগাছিয়ায়, অন্যটি গৌরীবাড়ীতে, সার্কুলার রোডের পথে।

এই হ'ল রাজস্থানের মানুষের মোটামুটি উৎসব পার্বণ ব্রত কথা।

চৈত্রসংক্রান্তির কোনো বিশেষ উৎসব কিন্তু ওদেশে দেখিনি—বাংলাদেশের চড়ক গাজন গঙ্গাস্নান ব্রতের মত।

সেণ্টপল ও স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য

আমরা পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের তিনবার প্রচারযাত্রার উল্লেখ করেছি। প্রথম ভারতবর্ষ (দুইবার) : দ্বিতীয়—সিংহল, চীন, জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যাণ্ড তারপর আবার লণ্ডন হয়ে ভারতবর্ষ। তৃতীয়—পুনরায় লণ্ডন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভিয়েনা, হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, কনস্টান্টিনোপল, এথেন্স, গ্রীস, মিশর হয়ে ভারতবর্ষ। পলের জীবনীকার, পল খ্রীষ্টপ্রচারে কত মাইল পথ অতিক্রম করেছেন তার একটা আনুমানিক হিসাব দিয়ে বলেছেন, উহা ২২১০ মাইলের কম নয়। স্বামীজীর ভ্রমণপর্বের যে তথ্য আমরা উপরে দিয়েছি—উহা বিজ্ঞানের দৌলতে পলের চাইতে অনেকগুণ বেশী সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলে এ কথা মনে করা সমীচীন নয় যে স্বামীজী কেবল যানবাহনেই চলেছেন। ভারতবর্ষের মতো উপমহাদেশে পরিব্রাজককালে পায়ে হেঁটে তিনি কম পথ অতিক্রম করেননি।

পলের মত গুরুদত্ত আধ্যাত্মিকতা স্বামীজী গোটা বিশ্বে ছড়িয়েছেন। 'করতলভিক্ষা তরুতলবাসঃ' সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অবলম্বন ছিল। আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে তিনি আনন্দের পরিবর্তে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। "নাম যশ সব সময় সুখের হয় না"—এ তাঁর খেদোক্তি। তারপর দেখা দিল ঠিক পলের মত উপদ্রব। গোঁড়া খ্রীষ্টানরা তো তুমুল বিরোধিতা করল—কুৎসা, অজস্র গালাগালি, ভয় দেখান, মিথ্যা অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র—কোনটাই বাদ দিল না। তাঁরা এও বলতে ছাড়ল না, "আমরা বরং চিরজীবন নরকে পচতে রাজী আছি, তবু এই দুর্বৃত্ত হিন্দুটাকে আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে দেব না।" আর জনৈক ধর্মপ্রচারক স্বদেশবাসী সরাসরি বলে বেড়াতে লাগলেন, "ও (বিবেকানন্দ) কেউ নয়, ঠক, জোচ্চোর; ও তোমাদের দেশে এসে বলে—আমি ফকীর।" এ হেন মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ স্বামীজী মুখোমুখি করেননি কারণ আত্মপক্ষ সমর্থন সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়—পরন্তু লোকনিন্দা পথিকৃৎ সন্ন্যাসীর অলংকার। তবে একথা সত্য, পাপ আর পারা হজম হয় না; আবরণের দ্বারা আগুন লুকান যায় না; 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'। পল মিথ্যারটনাকারীদের কথা অপনোদন করবার জন্য গালাতীয়দের চিঠি লিখেছিলেন। স্বামীজীও চিঠি লিখলেন, "কী! সংসারের ক্রীতদাসেরা কি বলছে—তার দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করবে? ছিঃ!...তুমি সন্ন্যাসীকে চেনো না। বেদ বলেন, 'সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ।...মিশনারীই হোক আর অপর কেউ হোক তারা যথাসাধ্য চীৎকার ও আক্রমণ করুক, আমি তাদের গ্রাহ্য করি না।...লোকমতের উপাসকেরা পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয় আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।" আর জীবনের শেষের দিকে আপন জীবনকথা লিখলেন, "আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার, তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি—আমি সামান্য বালকদের কথায় নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হবো?... আমি কখনও কোন জিনিস মতলব করে

করিনি।...যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে তা বিবেকানন্দ নয়—তা স্বয়ং প্রভু।" ঠিক পলের মতো অহংরহিত উপাসনা।

ইফিসে থাকাকালে পলের জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটে। 'Great is Diana of the Ephesians' (ডায়ানাই ইফিসীয়দের মহাদেবী)। পলের প্রতিমাপূজা-বিরোধী কথা শুনে একদল ব্যবসায়ী লোক ক্ষেপে গেল এবং তাকে ধরে বিচারকের সামনে নিয়ে গেল। ঐ লোক-গুলি ধর্মের দোহাই দিয়ে পলকে শেষ করতে চাইল, কিন্তু আসল ব্যাপার ছিল তাদের রুটি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কারণ তারা ডায়ানার বিভিন্ন ধরনের মূর্তি বিক্রী করে প্রচুর টাকা পেত। অবশ্য বিচক্ষণ বিচারক তাদের উপর এমন যুক্তি দেখালেন যে তারা হটে যেতে বাধ্য হল, আর পল পেলেন মুক্তি। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে প্রচারের ফলে বিদেশী মিশনারীদের আর এক বছরেই কয়েক মিলিয়ান টাকা কমে যায়, ফলে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে

নূতন বাইবেলে প্রাচীনপন্থী ইহুদীদের প্রতি পলের একটি তীব্র কটাক্ষ দেখা যায়। মুশা মুখে আবরণ দিয়ে চলতেন। অদ্যাবধি সমাজগৃহে মুশার বিধিনিষেধ পাঠের সময় ঐরূপ ঢেকে পড়বার বিধি রয়েছে। পলের বলবার উদ্দেশ্য, ঐ বিধিনিষেধরূপ আবরণ মানুষের হৃদয়কে ঢেকে রাখে—জ্যোতির্ময় স্বাধীন আত্মাকে দেখতে দেয় না আর ঐ আবরণের জন্যই ইহুদীরা দেখতে পারছে না তাদের সব কিছু খ্রীষ্টে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপরেই পল বলে চলেছেন: "গুপ্তকার্য-সমূহে জলাঞ্জলি দিয়েছি, ধূর্ততায় চলি না, ঈশ্বরের বাক্যে গোঁজামিল দেই না।... নিজেদের প্রচার করি না; খ্রীষ্ট যীশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি।"

ধর্মের সত্যবস্তুর উপর রহস্যের যবনিকা ফেলে কৌতূহল সৃষ্টি করা এই পৃথিবীর বক্ষে বহু দিন ধরে চলে আসছে। ইহাই স্বাভাবিক। কারণ সত্যের বিমল জ্যোতি খুব কম লোকই সহ্য করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দকেও আমেরিকায় ঐ ধরনের অলৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করায় তিনি ঠিক পলের মত স্বয়ং জ্যোতির্ময় সত্যের ছবি তুলে ধরে বলেন, "আমি আমার ধর্মের প্রমাণস্বরূপ কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাব—নিউজ পত্রিকার এ অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমতঃ আমি অলৌকিক ঘটনা নিয়ে কাজ করি না; দ্বিতীয়তঃ আমি যে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত- উহা অলৌকিক ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অলৌকিক ঘটনা বলিয়া আমরা কিছু মানি না।...যথার্থ জ্ঞানী পুরুষেরা কখনও ঐসব করেন না।" স্বামীজীর ধর্ম হল প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায়, সেখানে কোন আবরণ, তুকতাক বা কোন সম্মোহনবিদ্যার স্থান নাই।

পল যীশুর পুনরভ্যুত্থানের কথা দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, কারণ উহার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যীশু ঈশ্বরতনয়। আর তিনি উহা দামাস্কাসের পথে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। খ্রীষ্টান পল নিশ্চয়ই জন্মান্তরবাদ মানতেন না, কিন্তু পুনরভ্যুত্থান মানতেন। এই পুনরভ্যুত্থানের ব্যাপারেও খ্রীষ্টজগতে দুটি মত আছে—হিব্রুদের মতে সশরীরে পুনরভ্যুত্থান আর গ্রীকদের মতে আত্মার অমরত্ব। হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জন্মান্তরবাদ মানতেন এবং নিজ জীবনে মৃত ব্যক্তির আত্মার পুনরুভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করে বলেছেন: "জীবনে আমি অনেকবার পরলোক-গত আত্মাদের ফের এ জগতে আসতে দেখেছি। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরের সপ্তাহে

যে মূর্তি দেখলাম, সেটি জ্যোতির্ময় ছিল।"

পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। প্রিয়জনদের আবেষ্টনীর মধ্যে নিশ্চিন্ত জীবন, আরামের কোমল শয্যা, লোকপ্রতিষ্ঠা, সম্পদ-গৌরব—এ সবের পরিবর্তে দারিদ্র্য, প্রিয়বিরহ, লোকগঞ্জনা, দুঃখময় জীবন স্বেচ্ছায় কে বরণ করতে চায়? কিন্তু যুগে যুগে এক শ্রেণীর অশান্তের দল আসে—তারা জীর্ণ বেড়া ভেঙ্গে, পুরাতন বেড়া সরিয়ে, এমন কি খরস্রোতা নদীবক্ষে অপরের সুবিধার্থে নিজেদের দেহ দিয়ে সেতু তৈরী করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এবং এরাই মরে আসছে। আবার একথাও ঠিক নিজেরা মরে এরাই বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিয়ে যায়। কথায় বলে, 'প্রথম পদক্ষেপেই যত মুস্কিল।'

পল ইফিসাস ছেড়ে বিভিন্ন দেশ ঘুরে চললেন জেরুসালেমে—খ্রীষ্টের জন্মভূমিতে। তিনি পূর্বেই জীবনের সায়াহ্ন-গীতি শুনতে পেয়েছিলেন। ভগবান খ্রীষ্টের জন্মভূমিতে খ্রীষ্ট-প্রচারক পল অভ্যর্থনার পরিবর্তে পেলেন অপমান লাঞ্ছনা, সইলেন গঞ্জনা, হলেন বন্দী। জেরুসালেম থেকে তিনি নীত হলেন কৈসরিয়াতে। এখানে দুবছর কারাবাসের পর তাকে রোমে পাঠান হয়। যাওয়ার পথে জাহাজডুবি হয় এবং কোনমতে প্রাণরক্ষা পান বৃদ্ধ বন্দী পল। তারপর আবার দুবছর কারাদণ্ড (সেণ্ট লিউকের মতে ২ বছর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান)। রোমের কারাগার থেকে পল পেলেন সাময়িক মুক্তি। তারপর জীবনের শেষ বাণী প্রচারের জন্য ক্রীট, স্পেন, নিকোপলিস ঘুরলেন এবং এখানে আবার বন্দী হয়ে রোমে ফিরলেন—তারপর ৬৭ বছর বয়সে পল শহীদ হলেন। রোমের আইনানুযায়ী শহরের মাঝে না হয়ে সেখান থেকে ৩ মাইল দূরে অষ্টিয়ান সড়কের উপর পলের ছিন্ন শির মাটিতে পড়ল, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ হাতদুখানি শেষবারের মত উর্ধ্বে যীশুর কাছে জাগতিক নয় পারমার্থিক মুক্তি চাইল। পলের সেই শহীদ-বেদীর উপর লিখিত হল তাঁর বাণীর মর্মকথা: "For to me, to live in Christ; and to die is gain" [যেমন সবদা তেমনি এখনও খ্রীষ্ট আমার দেহে মহিমান্বিত হবেন—তা জীবন দ্বারাই হোক আর মৃত্যুর দ্বারাই হোক। কেননা, আমার পক্ষে জীবনই খ্রীষ্ট এবং মৃত্যুটাই লাভ। আমার ইচ্ছা দেহটা ছেড়ে দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে সদা যুক্ত থাকি, কেননা তা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ। কিন্তু এই দেহে থাকা তোমাদের জন্য অধিক আবশ্যক।]—(ফিলিপীয়দের প্রতি পলের পত্র।)

মৃত্যুরূপা মাতার পূজারী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মৃত্যুভয়ের প্রশ্নই উঠে না। তাঁরই আত্মকথা: "জীবন ও মৃত্যু ঠিক যেন টাকার এপিঠ আর ওপিঠ।" "যেদিন জীবনের আশা ছেড়েছি সেদিনই মৃত্যুকে জয় করেছি।" পলের মৃত্যুটা যেন স্বামীজীর চাইতে একটু বেশী করুণ; অবশ্য উভয়ের জীবনই ট্রাজেডীতে পূর্ণ। জীবনীকার পলের আত্মকথা উদ্ধৃত করেছেন: "আমি তুমুল সংগ্রাম চালিয়েছি, হৃদয়ে বিশ্বাস রেখে আমি খ্রীষ্টকে নিয়ে আমার পরিক্রমার পথ অতিক্রম করেছি।" সৈনিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রণে ভঙ্গ দেবার পাত্র নহেন: "সংগ্রাম ও যাতনা, যাতনা ও সংগ্রাম।...হাঁ, যে অবস্থাই আসুক না কেন—জগৎ আসুক, নরক আসুক, দেবতারা আসুন, মা আসুন—আমি সংগ্রাম চালিয়েই যাব, কখনও হার মানব না।... মহামায়ার সঙ্গে সংগ্রাম তো গৌরবের বিষয়।"

নিজের স্বরূপোপলব্ধি করে স্বামীজী মহা-

প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ ঠিক করলেন, বেড়াতে গিয়ে সমাধির স্থান চিহ্নিত করলেন, এমন কি খ্রীষ্টের মত শেষ ভোজের অভিনয়ও বাদ গেল না। শেষদিন শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত 'সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা' মন্ত্রটির মৌলিক ব্যাখ্যাকালে তিনি যোগের ষট্চক্রভেদের ইঙ্গিত করলেন এবং ঐ দিনই নিশার প্রথম যামে জীবশিবকে পরমশিবের সঙ্গে যোজিত করলেন আর শরীরটা ভাঁজ করা বস্ত্রের মত বসুন্ধরার বুকে পড়ে রইল। পলের মৃত্যুর অনেকগুলি বিবরণ আছে, স্বামীজীরও আছে। পলের ছিন্ন শির রক্তাপ্লুত হয়ে রাস্তায় গড়িয়ে পড়েছিল; আর স্বামীজী দেহত্যাগ করলেন সমাধিতে। তবে জনৈক গুরুভ্রাতার মতে 'তাঁর নাকের মধ্যে মুখের পাশে এবং দুই চোখে সামান্য রক্ত পড়েছিল।' কেহ কেহ বলেন, 'তাঁর মাথার শির ছিড়ে গিয়েছিল।' আবার কেউ বলেন, 'জপধ্যান করতে করতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়ে প্রাণবায়ু অনন্তে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।'

স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্মিত হল। প্রাচীরগাত্রে মহাযোগী বিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি ক্ষোদিত হল। কিন্তু পলের মত স্মৃতিফলকের উপর উৎকীর্ণ শিলালিপি কোথায়? ম্যাডাম কালভে বেলুড়মঠে এসে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দিরে স্বামীজীর নাম খুঁজে না পেয়ে স্বামীজীর এক গুরুভাইকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সেই সন্ন্যাসী অবাক বিস্ময়ে কালভের দিকে সৌম্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "স্বামীজী চির অমর হয়ে রয়েছেন।" এইরূপ নামরূপের পারের সূক্ষ্ম কথা সাধারণ মানুষ বুঝবে না; তারা নিশ্চয়ই মনে মনে স্বামীজীর শপথবাক্য ঐ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করবে: "I shall inspire men everywhere, until the world shall know that it is one with God."—(যতদিন না সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করছে ততদিন আমি সর্বত্র মানুষের মনে প্রেরণা জাগাতে থাকব।)

জীবনের প্রতি খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি ও হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি একরূপ নহে। পলের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বৈসাদৃশ্য ও সৌসাদৃশ্য দুই-ই আছে। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎশিষ্য, কিন্তু পল যদিও যীশুখ্রীষ্টের সাক্ষাৎশিষ্য ছিলেন না, তথাপি তিনি অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা শিষ্যত্ব পেয়েছেন —ইহা খ্রীষ্টান জগৎ মেনে নিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দুই গতিশীল মহামানবের জীবননাট্যের উপর আলোকপাত করলাম। প্রবন্ধে সব দিক দেখান সম্ভব নয়, তাই যতদূর সম্ভব তাঁদের গতিশীলতা, প্রচারের কাহিনী, জীবন ও বাণীর সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত লিপিবদ্ধ করা হল। প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা প্রাকৃতিক বস্তু হিমশৈলের ইতিকথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম আর উপসংহারে এই দুই মহামানবের জীবনকথা একটি গ্রীক উপকথার সঙ্গে মিলিয়ে শেষ করছি:

ক্রষ্টোফার ছিলেন একজন দৈত্য। তিনি সব সময় তাঁর চাইতে একজন বলবান ব্যক্তি খোঁজ করতেন যিনি তাঁর প্রভু হতে পারেন। তিনি রাজা ক্যানানের চাকরী ছেড়ে দিলেন, কারণ তিনি দেখলেন রাজা শয়তানের ভয়ে ভীত, এবং শয়তানও ক্রুশচিহ্নকে ভয় পায়। পরে তিনি একজন সাধুর কাছে দীক্ষিত হন— কিন্তু উপবাস, প্রার্থনা ইত্যাদি তাঁর তত ভাল লাগত না। তিনি মনস্থ করলেন যে, তিনি জনহিতকর কাজ করবেন এবং পথিকদের কাঁধে করে একটি সেতুহীন খরস্রোতা পার্বত্য

নদী পারাপারের কাজে লেগে গেলেন। একদিন ছোট ছোট পা ফেলে পার হতে এল একটি ছোট শিশু। ক্রষ্টোফার তাকে কাঁধে তুললেন এবং যখন মাঝ দরিয়ায় পৌছেছেন তখন ভয়ঙ্কর চাপে তাঁর সেই বিরাট দৈত্যশরীর কাঁপতে লাগল। কিন্তু তিনি যে পথিকদের পারাপার করবার ব্রত নিয়েছেন। তিনি মরিয়া হয়ে পৌছুলেন অপর পারে এবং শিশুটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে একটু ভৎ‌র্সনার স্বরে বললেন, "তুমি আমাকে মেরে ফেলছিলে আর কি? আমি যদি গোটা বিশ্ব কাঁধে করতাম তাহলে তা তোমার চেয়ে বেশী ওজন হত না।" শিশুটির মুখে একটু স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল। "ক্রষ্টো-ফার, তুমি অবাক হয়ো না", শিশুটি বলল, "তুমি কেবল যে বিশ্বকে বহন করলে তা নয়, তুমি তার স্রষ্টাকেও বহন করলে।"

জগতে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে—মুক্তি পাবার উপায়ও আছে। এই উপায়ের কথাই পল ও স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারে দ্বারে বলে গেছেন। উভয়েরই মর্মকথা: "দুঃখভার-জর্জরিত যে যেখানে আছো, সব এস, তোমাদের সব বোঝা আমার উপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাকো, আর তোমরা সুখী হও আর ভুলে যাও যে, আমি একজন কোন কালে ছিলাম।"

জয়তু স্বামিজি!

শ্রীরমেন্দ্র লাল রায়

বন্দনা লহ,
হে বীর বিবেকানন্দ!
বিশ্বভুবনে মন্দ্রিত তব জ্যোতির পরম ছন্দ।
বেদ-বেদান্ত মন্ত্র গীতার
অভয় শঙ্খ কণ্ঠে তোমার,
শতবর্ষের সাম-ওঁকার—অমৃত-নিস্যন্দ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণশিষ্য
সন্ন্যাসী ত্যাগী শান্ত;
মুক্তি-পথের দুর্জয় ব্রতী
নমঃ নির্ভীক পান্থ।
তব জীবনের কর্ম-সাধনা,
অগ্নিবীণার রুদ্র চেতনা
ধর্মযুদ্ধে আনিল প্রেরণা—আত্মদানের স্পন্দ

রামচরিতমানসে কাক-গরুড়-কথা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

প্রথম পর্ব

প্রস্তাবনা

শ্রীমৎ তুলসীদাস যেসব সুললিত প্রণাম ও বন্দনাদি ক'রে রামচরিতকথা আরম্ভ করেছেন, তার মধ্যে প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায়, বর্ণ অর্থ রস ও ছন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী ও সর্বমঙ্গল সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের প্রণাম—

বর্ণানামর্থসঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাং চ কর্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ॥

হৃদয়ের যে ভাবধারা, প্রাণের যে ব্যাকুলতা, যে মানসকথা আজ তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে উদ্যত, তা যেন বর্ণসংযোজনার পারিপাট্যে, অর্থের সুসঙ্গতিতে, রসের প্রাচুর্যে, ছন্দের মাধুর্যে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং নিখিল বিশ্বের সুখপ্রদ, কল্যাণপ্রদ হয়, সর্বপ্রথমে সেই প্রার্থনা।

তারপর পরের শ্লোকে ভবানী ও শঙ্করের বন্দনা।

ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্॥

ভবানী ও শঙ্করকে বন্দনা করি। কে সেই ভবানীশঙ্কর? কেমন সেই ভবানীশঙ্কর? "শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ"। একজন শ্রদ্ধার ও অপরজন বিশ্বাসের রূপ। দুয়ে এক, একে দুই। শ্রদ্ধারই পরিণত অবস্থা বিশ্বাস, আবার বিশ্বাসেরই প্রাথমিক অবস্থা শ্রদ্ধা। শঙ্করীকে তুষ্ট না করতে পারলে শঙ্কর তুষ্ট হন না। প্রকৃতিকে বশ না করতে পারলে পৌরুষ লাভ হয় না। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। এই শ্রদ্ধাবিশ্বাসের অভাবে, এই ভবানীশঙ্করের কৃপা বিনা, "ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্"-সিদ্ধগণ তো নিজ নিজ অন্তরে অবস্থিত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন না। বস্তুতঃ মন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ না হলে অন্তরের সকল জিনিস দেখা যায় না। শ্রদ্ধাবিশ্বাসই মনকে অন্তর্মুখ করে,—অন্তরের জিনিসের খোঁজ করায়। তাই দেখা যায়, এই শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপী ভবানীশঙ্কর তুলসী-রামায়ণের আদি-মধ্য-অন্তে সর্বত্রই পূজিত হয়েছেন। কেমন ক'রে বিশ্বাসীর সংস্পর্শে শ্রদ্ধা বিশ্বাসে পরিণত হয়; ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয়ে আগ্রহান্বিত শিষ্যে ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চারিত হয়; উত্তমভক্তের সঙ্গের ফলে পরাভক্তি লাভ হয়; সর্বসংশয়মুক্ত মনের সাহচর্যে সকল সংশয়ের নাশ হয়—হৃদয়ের গ্রন্থিসকল ছিন্ন হ'য়ে যায়; উহাই তুলসী-রামায়ণের মূল বক্তব্য বিষয়। আর হর-পার্বতী-সংবাদ, কাক-গরুড়-কথা প্রভৃতি কাহিনী এরই দৃষ্টান্ত স্থল।[১]

হর-পার্বতী-সংবাদ

কৈলাস পর্বতের একাংশ। বিশাল বটবৃক্ষতলে ব্যাঘ্রচর্মাসনে শিব সুখাসীন। মাথায় জটার মুকুট; জটাজালের অন্তরালে কুলু-কুলু-নাদিনী সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা। চন্দ্রমৌলি। পদ্মচক্ষু। নীলকণ্ঠ। লাবণ্যনিধি। তুলসী-দাসের নিজের ভাষায়,—"ধরে সরীর সান্তরস জৈসে," যেন শান্তরস শরীর ধরে বসে আছে! উত্তম সুযোগ বুঝে পার্বতী ধীরে ধীরে শিবের

১। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত তুলসীদাসের সকল দোঁহাগুলিই এবং অনেকস্থলে উহাদের বঙ্গানুবাদও শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্কলিত গ্রন্থ থেকে গৃহীত হ'ল।

কাছে এসে উপস্থিত হলেন; শিবও তাঁকে আদর ক'রে নিজের বামদিকে বসালেন। একে একে পূর্বজন্মের সব কথাই পার্বতীর মনে পড়তে লাগল। সতীদেহ ধরে যখন তিনি পূর্বজন্মে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন একদিন পঞ্চবটীবনে সীতাবিরহে কাতর রঘুপতিকে দেখে তাঁর মনে যেসকল সংশয়-সন্দেহের উদয় হয়েছিল, এখনও মনের কোণে সেগুলি উঁকিঝুঁকি মারছে!

সতীর সন্দেহ

ব্রহ্ম জো ব্যাপক বিরজ অজ
অকল অনীহ অভেদ।
সো কি দেহ ধরি হোই নর
জাহি ন জানত বেদ॥

ব্রহ্ম যিনি সর্বব্যাপক, মায়ারহিত, অজ, নিষ্ক্রিয়, ভেদশূন্য, সেই তিনিই কি দেহধারণ ক'রে মানুষের মত আচরণ করতে পারেন? কই, সে কথা তো বেদে বলে না।

বিষ্ণু জো সুরহিত নরতনুধারী।
সোউ সর্বজ্ঞ জথা ত্রিপুরারি॥
খোজই সো কি অজ্ঞ ইব নারী।
জ্ঞানধাম শ্রীপতি অসুরারি॥

আর যদি বিষ্ণু সত্যসত্যই দেবতাদের হিতের জন্য নরদেহ ধারণ করেই থাকেন, তবে তো তিনি মহেশ্বরের মতই সর্বজ্ঞ হবেন। সেই সর্বজ্ঞানের আকর রমাপতি অসুরারি কি মূর্খ মানুষের মত স্ত্রীকে খুঁজে খুঁজে বেড়াতে পারেন?

এ সন্দেহ তখন রামের বিভূতি দর্শনে, শিবের উপদেশেও দূর হয়নি। তাই আজ সুযোগ বুঝে, জন্ম-জন্মান্তরের সেই সন্দেহ—সেই প্রশ্নের কথা তুলে পার্বতী শিবকে বলছেন—

অজহূ কছু সংসয় মন মোরে।
করহু কৃপা, বিনবউঁ কর জোরে॥

হে প্রভু, এখনও আমার মনে কিছু সন্দেহ রয়ে গেছে। করজোড়ে মিনতি ক'রে বলছি,—কৃপা কর।

পার্বতীর আগ্রহ; নামে রুচি

তব কর অস বিমোহ অব নাহীঁ।
রামকথাপর রুচি মন মাহীঁ॥

তবে তখনকার মত ততটা মোহ এখন আর আমার নেই। এখন মনে রামকথায় রুচি এসেছে।

আহারে রুচি যেমন শরীরের রোগ-নিরাময়ের পূর্বাভাস, ঈশ্বরীয় কথায় রুচি তেমনি আশু মানসিক-রোগ-নিবারণের—ভবব্যাধি-মুক্তির সূচনা করে।

পার্বতী কাতরভাবে বিনয় ক'রে শিবকে বলতে লাগলেন,—হে প্রভু! রামচন্দ্রের উদার বাল্যলীলা, জানকীর সাথে বিবাহ, বনগমন, বনবাসে নানা লীলা, রাবণাদি রাক্ষসবধ, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, রাজ্যাভিষেক, অবশেষে প্রজাগণের সাথে বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বিষয় ও "অউরউ রামরহস্য অনেকা"—আরও আরও অনেক প্রকার রামলীলারহস্যের কথা আমাকে বল, যা শুনলে বিবেক বিমল হয়—"অতি বিমল বিবেকা"। আর,

জো প্রভু মৈঁ পূছানহিঁ হোঈ।
সোউ দয়াল রাখহু জনি গোঈ॥

হে দয়াল, যে সব কথা আমি জিজ্ঞাসা করিনি, এমন সব কথাও আমার কাছে যেন গোপন রেখনা।

পার্বতীর আন্তরিকতায় শিব তুষ্ট হলেন। তাঁর সহজ-সরল ছলবিহীন প্রশ্ন শিবের ভাল লাগল।

প্রশ্ন উমাকে সহজ সুহাঈ।
ছলবিহীন সুনি সিবমন ভাঈ॥

এখানে পার্বতীর প্রশ্নকে "সহজ সুহাঈ," "ছলবিহীন" বলা হয়েছে। "সহজ সুহাঈ" বলতে,—সহজ অতএব সুন্দর, এরূপ অর্থ সহজেই করা যায়। বাস্তবিকই, সহজের একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে—একটা মাধুর্য আছে, যা কিনা অনেক সাজগোজ, অনেক কলাকৌশলেও ফুটিয়ে তোলা যায় না। আর "ছলবিহীন" কথাটি দ্বারা তুলসীদাস যেন সাধকমাত্রকেই সাবধান ক'রে দিচ্ছেন—নিজের অন্তরের অন্তরে খোঁজ ক'রে দেখতে বলছেন, যেন "ভাবের ঘরে চুরি" না থাকে। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, মনের প্রকৃত ভাব গোপন ক'রে অনেকস্থলেই আমরা আপন আপন প্রশ্নের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য আন্তরিকতার ভান করি; লঘু হবার ভয়ে, মনের দ্বন্দ্ব-সংশয়-সন্দেহ মনে চাপা দিয়ে রেখে, মুখে ভক্তি-বিশ্বাসের বাঁধাধরা বুলি আওড়াই মাত্র।

আগ্রহান্বিতা শিষ্যার আন্তরিক ব্যাকুলতা, সত্যকারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা, সশ্রদ্ধ আত্মনিবেদন জগৎগুরু শিবের অন্তর স্পর্শ করল।

পার্বতীর সহজ-সরল প্রশ্নে শিবের ভাবান্তর

হরহিয় রামচরিত সব আয়ে।
প্রেমপুলক লোচন জল ছায়ে॥
শ্রীরঘুনাথ রূপ উর আবা।
পরমানন্দ অমিত সুখ পাবা॥

একে একে শিবের মনে রামচরিত্রের কথা সব জেগে উঠল। প্রেমপুলকে অঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'ল। চোখদুটি জলে ভরে গেল। হৃদয়ে রঘুনাথের মূর্তি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। তিনি পরমানন্দ লাভ করলেন—অপরিমিত সুখ সম্ভোগ করতে লাগলেন।

মগন ধ্যানরস দণ্ড জুগ পুনি মন বাহের কীন্‌হ।
রঘুপতিচরিত মহেস তব হরষিত বরনই লীন্‌হ॥

দু'দণ্ড ধ্যানমগ্ন থেকে, পরে মনকে বহির্মুখ ক'রে মহেশ্বর হৃষ্টমনে রঘুপতিচরিত বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন।

তুলসীদাসের এইভাবে শিবের ভাব-বর্ণনায় অবিকল শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবের কথাই এসে পড়ে।

"অন্তরঙ্গ সনে করে রস আস্বাদন।
বহিরঙ্গ সনে করে নামসংকীর্তন॥"

এখানে অন্তরঙ্গ অর্থাৎ হৃদয় এবং বহিরঙ্গ অর্থাৎ মুখ, এরূপ অর্থে বলা যায় - অন্তর্দশায় অন্তরে হরিরস আস্বাদন করছেন; বহির্দশায় মুখে হরিনাম কীর্তন করছেন।

পার্বতীর প্রশংসা

করি প্রণাম রামহি ত্রিপুরারি।
হরষি সুধাসম গিরা উচারী॥
ধন্য ধন্য গিরিরাজকুমারী।
তুম্‌হ সমান নহিঁ কোউ উপকারী॥

* * * *

পুছেহু রঘুপতি কথা প্রসঙ্গা
সকল লোক জগ পাবনি গঙ্গা॥
তুম্‌হ রঘুবীর চরণ অনুরাগী।
কীন্‌হিহু প্রশ্ন জগতহিত লাগি॥

ত্রিপুরারি, রামকে প্রণাম ক'রে আনন্দে মধুর কণ্ঠে বলতে লাগলেন,—ধন্য গিরিরাজকুমারী পার্বতী তুমি ধন্য! তোমার সমান উপকারী কেউ নেই। তুমি রঘুপতিকথা জানতে চেয়েছ, ও-কথা গঙ্গার মত জগতে সকল লোক পবিত্র-কারী। রঘুপতিচরণে তোমার অনুরাগ আছে, তাই জগতের হিতের জন্যই তুমি এরূপ প্রশ্ন করেছ।

আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ

শিব এখানে পার্বতীকে গিরিরাজকুমারী বলে সম্বোধন ক'রে বলেছেন, তাঁর মত উপকারী অর্থাৎ জগতের প্রকৃত কল্যাণকারী কেউ নেই,

কারণ আত্মসন্দেহভঞ্জনার্থে তিনি যে প্রশ্ন করেছেন—যে ঈশ্বরতত্ত্ব জানতে চেয়েছেন, উহা তো শুধু তাঁর একার জন্য নয়। রঘুবীরের চরণে আন্তরিক অনুরাগবশতঃ জগতের হিতের জন্যই তিনি রামচরিতকথা জানতে চেয়েছেন, যে কথা হিমগিরিনিঃসৃত গঙ্গাধারার মতই জগৎ-পবিত্রকারী। জানিনা, এই কথা বলতে গিয়ে রামভক্ত তুলসীর মনে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ শ্রীভগীরথের সগরবংশ-উদ্ধার-রূপ-নিমিত্ত-কারণে মর্ত্যে পতিতপাবনী গঙ্গা আনয়নের কথাই মনে এসেছিল কিনা, অথবা স্থান-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে যুগে যুগে যা ঘটে আসছে, এখানে প্রকারান্তরে তিনি তারই আভাস দিচ্ছেন। বাস্তবিকই দেখা যায়, সত্যস্বরূপ ভগবানকে সত্যভাবে পাবার জন্য সত্যপ্রচেষ্টার ফলে কোন মানুষের মন যখন সত্যের প্রকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তখন সেই আলোকে শুধু যে তারই নিজ মনের অন্ধকার বিদূরিত হয় তা নয়, তাতে অন্যের মনও আলোকিত হয়—যুগ যুগ ধরে অন্যেও সত্যপথে চলবার সামর্থ্যলাভে কৃতার্থ হয়। আপাতঃ-প্রতীয়মান বিভেদ-বিচ্ছেদ সত্বেও জগদন্তর্গত মানুষের মূলপ্রকৃতিগত সমস্যা এক এবং অভিন্ন; কাজেই মানুষের ব্যক্তিগত আত্ম-কল্যাণের ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জগৎকল্যাণই সাধিত হয়, আবার জগৎকল্যাণকল্পে অনুষ্ঠিত সকল আন্তরিক মঙ্গল-চেষ্টার ফলে আত্মকল্যাণই লাভ হয়ে থাকে।

যাহোক এরপর দেখতে পাওয়া যায়, আত্মভোলা শিব আনন্দে বিভোর হয়ে রামতত্ত্ব —রামমাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে চলেছেন। বলতে বলতে বোধ হয় পার্বতীর প্রশ্নের কথা একেবারেই ভুল হয়ে গেছে। তাই দেখা যায়, কতক্ষণ পরে অবসর বুঝে পার্বতী শিবকে নিজ প্রশ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

পার্বতীর প্রশ্ন

প্রথম জো মৈঁ পূছা সোই কহহূ।
জৌ মো পর প্রসন্ন প্রভু অহহূ॥
রাম ব্রহ্ম চিন্ময় অবিনাসী।
সর্বরহিত সব উর পুরবাসী॥

নাথ ধরেউ নরতনু কেহি হেতু।
মোহি সমুঝাই কহহু বৃষকেতু॥

হে প্রভু, যদি তুমি আমার উপর প্রসন্ন থেকে থাক, তবে প্রথমে আমি যে কথা জানতে চেয়েছিলাম, সে কথা আমাকে বল। রাম—যিনি ব্রহ্ম চিন্ময় অবিনাশী, যিনি সর্ব-রহিত, সকল হৃদয়েই বাস করেন—হে নাথ, সেই তিনি কেন নরদেহ ধারণ করেছিলেন? হে বৃষকেতু, আমাকে সে কথা বুঝিয়ে বল।

মনে হয়, পার্বতীর পূর্বসন্দেহ এখনও মন থেকে সম্পূর্ণভাবে দূর না হয়ে থাকলেও এখন প্রশ্নের রূপ-পরিবর্তন এবং রামতত্ত্ব জানবার আগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই তুলসী এখানে বলছেন—উমার এরূপ "রামকথাপর প্রীতি পুনীতা" অর্থাৎ রামকথা শ্রবণের আগ্রহে পবিত্রীকৃত বাক্যে তুষ্ট হয়ে শিব নানাভাবে তাঁর প্রশংসা ক'রে পুনরায় বলতে লাগলেন—

রামচরিতমানস-কথা

সুনু সুভকথা ভবানী রামচরিতমানস বিমল।
কহা ভুসুণ্ডি বখানি সুনা বিহগনায়ক গরুড়॥

হে ভবানি, যে বিমল শুভকথা এক সময়ে কাকভূষণ্ডী বিশদভাবে বর্ণনা ক'রে বলেছিল আর পক্ষিরাজ গরুড় যা [শ্রদ্ধার সাথে] শুনেছিল, সেই রামচরিতমানস-কথা তোমাকে এখন বলছি, [মন দিয়ে] শোন।

এই কথা বলে শিব একে একে বিষ্ণু কিজন্য এবং কেমনভাবে নরদেহ ধারণ ক'রে দশরথের

পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে সব কথা এবং রামচন্দ্রের বাল্যলীলা, বিশ্বামিত্রের অনুগমন, রাক্ষসবধ, অহল্যা-উদ্ধার, হরধনুভঙ্গ, সীতার সহিত বিবাহ, পিতৃসত্যপালনার্থে বনগমন, গুহকের সহিত মিত্রতা, চিত্রকূট ও পরে দণ্ডক-বনে বাস, মুনিগণের মনোরঞ্জন, রাবণকর্তৃক মায়াসীতা-হরণ[২] সীতার বিরহে রামের বিলাপ, মতঙ্গ-আশ্রমে শবরীর সহিত মিলন, সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা, সীতার অন্বেষণ, সেতু-বন্ধন, রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ ইত্যাদি অযোধ্যা-কাণ্ড থেকে আরম্ভ ক'রে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় ঘটনার উল্লেখ করতে করতে, যেখানে মেঘনাদের বাণে রামচন্দ্রের নাগপাশে বদ্ধ হওয়ার কথা এসে পড়ল সেখানে এসে, যেন পার্বতীকে সন্দেহ অবিশ্বাসের হাত থেকে সাবধান করার সুরে বলছেন—

পার্বতীর প্রশ্নের যুক্তিখণ্ডন

খগপতি জাকর নামু জপি মুনি কাটহিঁ ভবপাস।
সে প্রভু আব কি বন্ধতর ব্যাপক বিশ্বনিবাস॥

হে পার্বতি, [সর্পকুলের অরি] স্বয়ং খগপতি গরুড় যাঁর নাম জপ করে, [যাঁর নামে] মুনি ভববন্ধন ছেদন করে, এমন সে প্রভু, যিনি বিশ্বের আধার—বিশ্বব্যাপক, তিনি কি ক'রে নাগবন্ধনে পড়তে পারেন ?

উপরের শ্লোকের কথাগুলি একটু বিস্তারিত ক'রে দেখলে মনে হয়, শিব নিজের এই প্রশ্নের দ্বারা পরোক্ষভাবে পার্বতীরই পূর্বেকার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ; বলছেন—ভেবে দেখ পার্বতি, যারা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান বলে খ্যাত, যেমন ধর পক্ষিরাজ গরুড়, তারাও যাঁর নাম জপ করে ; আবার মুনিগণ—যারা সকল পার্থিব বন্ধন ছিন্ন ক'রে মুক্তিলাভ করতে চেষ্টিত, তারাও যাঁর নামের প্রভাবে ভবপাশ ছেদনের শক্তিলাভ করে, সেই তিনি নিজে শক্তিহীন, এ কথা কেমন ক'রে বলতে পারা যায় ? আর দেখ, যদি তুমি বল তিনি বিশ্বের আধার, সর্বব্যাপক, তবে তার পক্ষে বন্ধনই বা কি ক'রে সম্ভব ? কাজেই, হয় বলতে হয়—ঈশ্বর বলে যা বলা হচ্ছে, সে সবই কেবল মিথ্যা কল্পনা মাত্র ; আর না হয় তোমাকে বলতেই হয় যে, তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কোন বন্ধনই তাঁকে বাঁধতে পারে না, এ বন্ধন বন্ধনই নয়, তোমার বদ্ধ চোখে বন্ধনের মত বোধ হচ্ছে মাত্র।

এ কথার পরই শিব বলছেন—

চরিত রামকে সগুণ ভবানী।
তরকি ন জাঁহি বুদ্ধি বল বাণী॥
অস বিচারি জে তজ্ঞ বিরাগী।
রামহিঁ ভজহিঁ তর্ক সব ত্যাগী॥

হে ভবানি, রামের সগুণ চরিত [অর্থাৎ নরলীলায় তাঁর যে নরের মত আচরণ] বুদ্ধি বল ও বাক্যের অগম্য ; উহা তর্কের বিষয়ও নয়। এরূপ বিচার ক'রে যে ব্যক্তি সত্য সত্যই তত্ত্বজ্ঞ ও বৈরাগ্যবান, সে সমস্ত তর্ক-বিচার ছেড়ে দিয়ে রামেরই ভজনা করে।

(ক্রমশঃ)

২। তুলসীদাস রাবণকর্তৃক সীতাহরণ স্বীকার করতে হয়েই "রামচরিতমানসে" কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থাবলম্বনে "মায়াসীতা" অথবা "ছায়াসীতা"র অবতারণা করেছেন, দেখা যায়।

সমালোচনা

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য॥ অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ॥ জিজ্ঞাসা॥ ৩৩, কলেজ রো, কলি-৯॥ পৃষ্ঠা ৩২৩॥ দাম—আট টাকা॥

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ মহাশয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর তিনি চিন্তাশীল এবং বিদগ্ধ লেখক বলে সুধীসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকদের সম্বন্ধে সৌখীন সাহিত্যরসিক সমাজে (ডিলাটেণ্ট) প্রায়ই এমন সমস্ত আলোচনা শুনতে পাই, যাতে মনে হয় এই সমস্ত অধ্যাপক পণ্ডিত মনীষী হলেও ঠিক রসিক হতে পারেন না। পুঁথিপত্র ও তত্ত্বকথা নিয়ে তাঁরা এত তন্ময় হয়ে থাকেন যে, সাহিত্যরস সৃষ্টিতে তাঁদের অনীহা না থাকলেও বিশেষ আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু অধ্যাপক নাথের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি পড়বার পর আমাদের সুদৃঢ় ধারণা হয় যে, অধ্যাপনার সঙ্গে রসসংবেদনার অহিনকুল-স্বভাববিরোধ নেই। বস্তুতঃ এই গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মানসের মূল ঐতিহ্য আলোচনাপ্রসঙ্গে যেভাবে এ জাতির ধর্ম, সাধনা ও সারস্বত-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে লেখকের চিন্তা, বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে হবে। লেখক 'কথারম্ভ' শীর্ষক উপচ্ছেদে সর্বপ্রথম আধুনিকতার স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ণয়ের পর সেই মাপকাঠির সাহায্যে রামমোহন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য, চারিত্র, মানস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অতি নিপুণ আলোচনা করেছেন—যা যুগপৎ গবেষণা ও রসবিশ্লেষণ বলে উচ্চ প্রশংসা পাবে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের উচ্চ মানসিকতা বিচার করতে গিয়ে ধর্মান্দোলনকে বরবাদ করা আধুনিক লেখকদের হানিকর 'ফ্যাসনে' পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পারমার্থিকতা ও ঈশচেতনা মানব-সংস্কৃতির এক অনশ্বর মহিমারূপে ইতিহাস-বিবর্তনে স্থান পেয়েছে। জড়বাদকে জীবনের মর্মমূলে একমাত্র অধিরাজ বলে স্থাপন করতে গেলে মানুষের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও জীবন-ধারাকেও পরিত্যাগ করতে হয়—যার অর্থ হচ্ছে আত্মহনন। সুখের বিষয়, লেখক বস্তুসচেতন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর আধুনিক কালের ধর্মান্দোলনের যথার্থ স্বরূপ আলোচনায় তীক্ষ্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, "উনবিংশ শতাব্দের সম্বন্ধে আমরা সম্প্রতি অত্যন্ত সজাগ হয়ে পড়েছি। যে সব ব্যক্তি ও কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট ও দৃঢ় ছিল, সে সম্বন্ধেও আমরা কথা বলবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছি, যদিও বিন্দুমাত্র নতুন কথা বলবার নেই।" (এই গ্রন্থের ভূমিকা) কিন্তু বাংলার উনবিংশ শতাব্দী সম্বন্ধে নানা আলোচনা হলেও এখনও এ বিষয়ে অসংখ্য এবং সুপ্রচুর 'নতুন কথা' বলার অবকাশ আছে। লেখক এই গ্রন্থে সেই প্রচেষ্টার প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়ে রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব, মাইকেল, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিক মহাপুরুষদের কর্ম ও সাধনাকে

বিশ্লেষণ করেছেন। পরিশিষ্টে তিনি যে ঐতিহাসিক কাল ও ঘটনাপঞ্জী দিয়েছেন, 'রেফারেন্স' হিসেবে তাও পাঠককে সাহায্য করবে। নতুন করে তিনি পুরাতনের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন, তীক্ষ্ণ মত ও মন্তব্যের দ্বারা পাঠকদের চিন্তাকেও নতুন দিকে জাগ্রত করেছেন, এ জন্য তিনি চিন্তাশীল পাঠকের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবেন।

অবশ্য তাঁর সব মত ও মন্তব্যের সঙ্গে যে পাঠক একমত হবেন না তা বলাই বাহুল্য। যেখানে সংস্কৃতির উপর দণ্ডধারী রাজনীতির রক্তচক্ষু 'রেজিমেণ্টেশন' নেই, সেখানে সত্য-নির্ণয়ে মতভেদ তো হবেই—এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়। মতানৈক্য তো মতৈক্যেরই পথ প্রস্তুত করে। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্য ও সাধনার মতো বিরাট ও জটিল ব্যাপার ব্যক্তিভেদে মতভেদ সৃষ্টি করলে বিস্ময়ের কারণ নেই। হয়তো ঈশ্বর গুপ্তের প্রগতিশীল মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর উনার্থক মন্তব্য কেউ কেউ মেনে নিতে পারবেন না, কিন্তু এ রকম দু-চারটি মতভেদের কথা ছেড়ে দিলে শ্রীযুক্ত নাথের এ গ্রন্থ কৌতূহলী পাঠকসমাজে যে নতুন চিন্তা উদ্রেক করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগশঙ্খ (১৯৬৭)—বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, প্রকাশক—শ্রীরাখালরাজ তরফদার, বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদহ। পৃষ্ঠা ৪৪।

এবারের 'যুগশঙ্খ' পূর্বপ্রকাশিত পত্রিকা-গুলির মত সচিত্র। অধিকাংশ রচনাই নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রগণের। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লেখা প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতায় ছাত্রদের সাহিত্য-সাধনার আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা যায়। 'বিদ্যামন্দির সংবাদ পরিক্রমা'য় সারা বৎসরের কর্মধারার সুন্দর বিবরণী দেওয়া হইয়াছে।

সন্দীপন (সপ্তম সংখ্যা : ১৯৬৭)—প্রকাশক : স্বামী অজজানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৮৮+৩০।

শিক্ষণমন্দিরের সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত পত্রিকাখানির সর্বত্রই সুরুচির চিহ্ন বর্তমান। সন্দীপনের এই সংখ্যাটিতে ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে কয়েকটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমাকে লিখিত নিবেদিতার পত্রের অনুবাদটি এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দের 'ধ্যান' শীর্ষক প্রবন্ধটি পত্রিকার অলঙ্কারস্বরূপ। অন্যান্য দিক থেকেও পত্রিকাটির প্রবন্ধের বিষয়বস্তু-নির্বাচন শিক্ষণমন্দিরের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। কবিতাগুলিও সুন্দর। 'আমাদের কথা'য় শিক্ষণমন্দিরের ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণ জন্মমহোৎসব

বেলুড় মঠে গত ২৮ শে ফাল্গুন (১৩।৩।৬৭) সোমবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপনের পরে পরবর্তী রবিবার ৫ই চৈত্র (১৯।৩।৬৭) সারাদিনব্যাপী সাধারণ জন্ম-মহোৎসব মহা আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত এক মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সজ্জিত রাখা হয়। প্রায় ১০,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠে সারাদিনে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোক সমবেত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের খরা-ত্রাণ-কার্য যথাযথভাবে পরিচালিত হইতেছে।

বিহারে হাজারীবাগ জেলায় ইটখোরীতে ও মুঙ্গের জেলায় চকাই ও ঝাঝা অঞ্চলে এবং সাঁওতাল পরগণা জেলায় মনোহরপুর ব্লকে (২৮।২।৬৭ পর্যন্ত) এবং উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় মাউ ও কারউই তহশীলে (৩১।১।৬৭ পর্যন্ত) এই সেবাকার্যে ৪৭,৭২৩ জনকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে:

চাল ১৪,২৩৫ কেজি, গম ৭৩,৮২৭ কেজি, জোয়ার ৩৩,৫৭৩ কেজি, শিশু-খাদ্য ৫৩৮ কৌটা, জমানো দুধ ১৬ কৌটা, ৬৭,৯৩৪টি ভিটামিন ট্যাবলেট, ধুতি ২,৭৬৯ খানি, শাড়ী ৩,৯৬২ খানি, চাদর ৮৬৫ খানি, পরিধেয় বস্ত্রাদি (সুতী) ৩,৮১০ খানি, তুলার কম্বল ৮,৩৬২টি, গরম সোয়েটার ১৩৩টি, পশমী কম্বল ৩৪টি, পশমী জ্যাকেট ৩৭টি, পশমী টুপী ৪৭টি এবং লংক্লথ ৬৪২ গজ।

কার্যবিবরণী

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা হাসপাতালের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৫—মার্চ, ১৯৬৬) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রতিষ্ঠাকালে শয্যাসংখ্যা ছিল ৩২; বর্তমানে ২৪০ টি শয্যা আছে, তন্মধ্যে ১৩টি কেবিন ও ১৩টি কুটির।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাকেন্দ্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হইয়াছে। এখানে সর্বপ্রকার যক্ষ্মারোগীর আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা আছে। আরোগ্য-লাভের পর রোগীদের পুনর্বাসনেরও কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছে; রোগমুক্ত ব্যক্তিদিগকে ল্যাবরেটরি, এক্স-রে, নার্সিং, স্টোর, অফিস, পাওয়ারহাউস, ওয়াটার ওয়ার্কস্, টেলারিং প্রভৃতি স্যানাটোরিয়ামের বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৪১; তন্মধ্যে ৩২৯ জন রোগী নূতন ভর্তি হইয়াছে এবং ২১২জন পূর্ব বৎসরের। বৎসর-মধ্যে ৩৩০জন রোগমুক্ত হইয়া চলিয়া যান; বৎসরের শেষে ২১১জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১০৬জন রোগীর অস্ত্রচিকিৎসা করিতে হয়। ৮১জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-খরচে চিকিৎসা করা হয়, ইহাদের মধ্যে ১০জন তপসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। ২৪জন রোগীকে কম খরচে চিকিৎসা করা হয়।

কলিকাতা ও পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে এবং জনসাধারণের দানে বিনা-ব্যয়ে ও অল্প ব্যয়ে এতগুলি রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা দ্বারা ১৪৭টি ফ্রি-বেডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৪০জন রোগী আরোগ্য লাভের পরে স্থানীয় আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছে, ইহাদের সকলকেই স্যানাটোরিয়ামে নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম জীবিকা নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয় এই জনকল্যাণকর সেবাপ্রতিষ্ঠান যক্ষ্মা-হাসপাতালটির বার্ষিক ব্যয় সম্পূর্ণ সঙ্কুলান হইতেছে না, আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রতিবর্ষেই বেশী হইতেছে। এই বিষয়ে আমরা সহৃদয় সরকারের এবং বদান্য জনগণের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উৎসব-সংবাদ

বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৫তম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১লা ফেব্রুআরি পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের পুণ্য জন্মতিথির দিনটি পূজা-হোম, শাস্ত্রপাঠ, হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই দিন সকালে স্বামী ভাস্বরানন্দজী ও অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী অপূর্বানন্দজী যুগাচার্য স্বামীজীর জীবনের বহু দিক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করেন।

২রা ও ৩রা ফেব্রুআরির অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীঅমূল্য চক্রবর্তী ও তাঁহার সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন। ৪ঠা ফেব্রুআরি যৌগিক আসন ও সূর্যনমস্কারাদি ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়।

উৎসবের শেষ দিন ৫ই ফেব্রুআরি অপরাহ্ণে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী) ডক্টর ত্রিগুণা সেন মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দেন। রচনা-প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিগণের মধ্যে সভাপতি মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করেন।

ঢাকা: গত ২৮শে ফাল্গুন হইতে ৫ই চৈত্র পর্যন্ত যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩২তম জন্মোৎসব ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন উষা-কীর্তন, পূজা, ভজন-কীর্তনাদি হয়। দুপুরে বহু ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। বিকালে শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিন সকালে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়; বিকালে ও সন্ধ্যার পর শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাসের 'রামায়ণ-গান' সকলকে আনন্দ দান করে। তৃতীয় দিন সকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-পাঠ, দুপুর হইতে বিকাল পর্যন্ত রামায়ণ-গান এবং সান্ধ্য আরাত্রিকের পর শ্যামাসংগীত হয়। চতুর্থ দিন সকালে উপনিষদ্-পাঠ, এবং বিকালে রামায়ণ-গান এবং সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত স্থানীয় শিল্পীদের উচ্চাঙ্গের সংগীত হয়। পঞ্চম দিন সকালে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, দুপুরে রামায়ণ-গান ও বিকাল ৪টায় অধ্যাপক মোজাহের উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ছাত্র-

সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে ছাত্রগণকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শানুযায়ী জীবনগঠন করিতে উপদেশ দেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয় ভোলানাথ সম্প্রদায় পদাবলীকীর্তন 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা গাহিয়া ভক্তবৃন্দকে আনন্দ দান করেন। ষষ্ঠ দিন সকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও দুপুরে 'রামায়ণ-গান' হয়। বিকাল ৪টায় শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয় আলোছায়া নাট্যসংসদ সারারাত্রি 'রাবণ-বধ' যাত্রাভিনয় করেন। ঐ অভিনয়টি শ্রেণী-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে দর্শকবৃন্দ সকলেই উপভোগ করেন।

শেষদিন, ১৯শে মার্চ, সকাল ৯টায় পণ্ডিত রাসমোহন চক্রবর্তী সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতত্ত্ব আলোচনা করেন। দুপুরে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বহু দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া খাওয়ানো হয়। ঐদিন দুপুরে ও রাত্রে নরসিংদী রামায়ণ পার্টি রামায়ণ গান করে। অপরাহ্ণে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার-বিতরণের পর ধর্মসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মালিক আব্দুল বারি সাহেব সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি পণ্ডিত রাসমোহন চক্রবর্তী হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। অতঃপর দেশকর্মী শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী, এডভোকেট শ্রীবীরেন্দ্র পাণ্ডে, অধ্যাপক মোজাহের উদ্দিন আহমদ, ডক্টর হরিনাথ দে ও প্রফেসর এন. ভি. সোমানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সর্বধর্মসমন্বয়'-বিষয়ক অতি সুন্দর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলকেই এই সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করিতে আবেদন জানান। অতঃপর স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শ্রীসুধাংশুশেখর হালদার মহাশয় সংক্ষেপে মিশনের কার্যবিবরণী আলোচনা করিয়া সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই আনন্দোৎসবে প্রতিদিনই শহরের শত শত নরনারী আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তৃপ্ত হইয়াছেন।

কোয়ালপাড়া রামকৃষ্ণ যোগাশ্রমে গত ১৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকালে ভজন, শাস্ত্রপাঠ, পূজা-ভোগাদির পর দুপুরে নরনারায়ণ-সেবা হয়। প্রায় তিন হাজার জন প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী পৌরোহিত্য করেন। স্বামী গদাধরানন্দ, ডাঃ ভবতারণ মাল ও অধ্যাপক শ্রীরমাপদ ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

বক্তৃতা-সফর

গত ১.৭.৬৬ হইতে ৩১.৮.৬৬ পর্যন্ত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন :

বিষয়	স্থান
যে মহাপুরুষদের দেখিয়াছি	সোসাইটি হল, নিউ ইয়র্ক
শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ	৫৮, ডিয়ারফিল্ড স্ট্রীট, বোস্টন
ভারতের মহাপুরুষগণ	ইউ. এস. এ
যে-সকল মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছি	বেদান্ত সেন্টার, চিকাগো

বিষয়	স্থান
প্রশ্নোত্তর (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলসন ইয়াং-এর গৃহে)	চিকাগো
প্রশ্নোত্তর	বেদান্ত সেণ্টার, চিকাগো
যে সব মহাপুরুষদের জানি	বেদান্ত সেণ্টার, সেণ্টলুই
বেদান্ত	সারদা আশ্রম, সাণ্টা বার্বারা, হলিউড
দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত	বেদান্ত সোসাইটি, হলিউড
মহাপুরুষ-প্রসঙ্গে	কনভেণ্ট, সানফ্রান্সিস্কো
কর্মরহস্য	নূতন মন্দির "
অভ্যর্থনা ও উত্তর	" "
বেদান্ত ও কর্মরহস্য	বেদান্ত সোসাইটি, স্যাক্রামাণ্টো
মহাপুরুষদিগের স্মৃতি	কনভেণ্ট, হলিউড
মহাপুরুষগণের পুণ্যস্মৃতি—অভ্যর্থনার উত্তর	সিয়েটল
কর্মজীবনে বেদান্ত	"
বেদান্তের প্রয়োজন	ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ. "
মহাপুরুষদের স্মৃতি	রিট্রিট, পোর্টল্যাণ্ড
"	" "
যে সকল সাধু মহাপুরুষকে দেখিয়াছি	" "
মহাপুরুষগণের স্মৃতি	প্রার্থনাগৃহ, হনলুলু
যে সাধু পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছি	হনলুলু
বেদান্তের প্রয়োজনীয়তা কি ?	ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ. হল, হনলুলু
মহাপুরুষগণের স্মৃতিকথা	টোকিও, জাপান
"	" "
ভারতের সাধু-মহাপুরুষগণ	রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমী, ওসাকা
প্রশ্নোত্তর	ওসাকা
ধর্মপ্রসঙ্গ	টোকিও
সনাতন ধর্ম	ইণ্ডিয়া ক্লাব হল, ইয়োকোহামা

স্বামী নটরাজানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৮ই মার্চ, ১৯৬৭ ভোর ৪টা ৫০ মিনিটের সময় সিংহলে বাট্টিকালোয়া সাধারণ হাসপাতালে স্বামী নটরাজানন্দ ৬৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর কিছুকাল যাবৎ সুস্থ যাইতেছিল না, তিনি ক্যান্সারজনিত রক্তাল্পতায় ভুগিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। স্বামী বিপুলানন্দের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। কয়েক বৎসর তিনি রেঙ্গুন সেবাশ্রমের কর্মী-রূপে এবং কিছুকাল নটরমপল্লী আশ্রমে অধ্যক্ষরূপে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি সিংহল-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়গুলি সাফল্যের সহিত পরিচালনা করেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপের ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যপূজাদি ও সাময়িক উৎসবগুলি অতি নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শাখামন্দির-ভবনেও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি নিয়মিতভাবে চলিতেছে। শিশুদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যায়তন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ৭,২১৭ জন রোগী হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হয়। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারটির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা, রথোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ভক্তগণ বিমল আনন্দ লাভ করেন।

উৎসব-সংবাদ

নওড়া: ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব প্রতিবারের ন্যায় এবারও তাঁহার জন্মস্থান পাইঘাটি পরগণার নওড়া গ্রামে শ্রীতারাপদ সরকারের গৃহে গত ১৩ই ফেব্রুআরি শুক্লাচতুর্থী তিথিতে বিশেষ পূজাদির সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

বড় আন্দুলিয়া: গত ২৩শে ফেব্রুআরি হইতে ২৭শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত নদীয়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে পাচদিনব্যাপী 'গদাধরের মেলা' হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রচার এই মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ২৬শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। স্বামী পুণ্যানন্দজী তিনদিন ছায়াচিত্রের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব জীবন-কথা পরিবেষণের সুযোগ করিয়া দেন। এইবার লইয়া মেলা চতুর্থ বৎসর অতিক্রম করিল।

সরোজিনী নগর ও দক্ষিণ দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ৫ই মার্চ ইংরাজী, হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ৭০০ ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করিয়াছিল। ৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তৎপরে ২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় ভারত সেবক সমাজ প্রাঙ্গণে স্বামী স্বাহানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও সভায় প্রায় ৬০০ জনসমাগম হয়। ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় স্বামীজীর বাণী আবৃত্তির পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী ইংরাজীতে, দিল্লী কলেজ ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক শ্রীকুমারেশ চক্রবর্তী বাংলায় এবং সর্বশেষে দেশরক্ষা-মন্ত্রণালয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক অধিকারী ডাঃ এন. আর. ওহারাদ পাণ্ডে হিন্দীতে স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। পরে স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী পুরস্কার বিতরণ করেন।

হুগলা জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ১৩ই মার্চ হইতে ১৯শে মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসব পালিত হইয়াছে।

প্রথমদিন পূজা-পাঠাদির পর মধ্যাহ্নে এক

হাজারের অধিক নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য এবং সন্ধ্যার পরে কালীকীর্তন করেন ভাটপাড়া নবীন সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ।

দ্বিতীয় দিন জনসভায় স্বামী যোগানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমণি বাগচী স্বামী অভেদানন্দজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

তৃতীয় দিনের সভায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের আদর্শ ও তাঁহার শিক্ষাদানের কয়েকটি বিশেষ দিক লইয়া আলোচনা করেন স্বামী গোকুলানন্দ, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চৌধুরী ও সভাপতি শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মল্লিক।

প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিবেদিতার জীবনচরিত এবং ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা-আন্দোলনে এবং জনসেবায় তাঁহার অবদান বিষয়ে আলোকপাত করেন সভানেত্রী মহোদয়া ও শ্রীরাধারাণী চট্টোপাধ্যায়। সভান্তে আনন্দন সঙ্গীত সমাজের "ভগিনী নিবেদিতা" গীতি-আলেখ্য সকলকে প্রীতি দান করে।

পঞ্চম দিনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকীর্তন করেন স্বামী পুণ্যানন্দজীর পরিচালনায় রহড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ। ষষ্ঠ দিনে নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে শঙ্করাচার্য প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয় সাধকের অলৌকিক জীবনের উপরে আলোকপাত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন-শাখার কর্মিবৃন্দ। শেষ দিন, ১৯শে মার্চ, সঙ্ঘ-পরিচালিত বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষা মন্দিরের ছাত্রছাত্রীগণের বিচিত্রানুষ্ঠানের পরে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। হুগলী রোটারী ক্লাবের সভাপতি শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন সভার উদ্বোধন করেন; সভাপতিত্ব করেন জেলা-শাসক শ্রী বি. এন. চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যার পরে দেওঘর শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমের শ্রীমৎ বঙ্কু-কিশোর ব্রহ্মচারী ও সম্প্রদায়ের লীলাকীর্তন সকলকে আনন্দ দান করে।

এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে মৃন্ময় মূর্তিতে নিবেদিতার জীবনালেখ্য প্রদর্শনী শত শত দর্শককে আনন্দ দান করে।

আগরতলা শহর হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী আমতলীস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৩ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সেবাশ্রমের নূতন গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিস্থাপন, পূজাদি এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে সাধারণ সভায় 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন শ্রীসুধীরকুমার কর। মধ্যাহ্নে তিন সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী গোকুলানন্দজী আশ্রমপ্রাঙ্গণে ১৯শে মার্চ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী অবলম্বনে একটি অমূল্য ভাষণ দানে সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। ২১শে মার্চ তারিখে একই উদ্দেশ্যে আগত স্বামী জীবানন্দজী আশ্রম-পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালার শিক্ষার্থী, শিক্ষকমণ্ডলী এবং সমবেত ভক্ত অনুরাগীদের মধ্যে একটি অনুপম ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন।

আমেদাবাদঃ গত ১৩ই মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মণিনগর-এ (আমেদাবাদ) প্রতিপালিত হইয়াছে। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও নবচণ্ডীপাঠ হয়। বিকালে শ্রীবিবেকানন্দ পাঠচক্র কর্তৃক বেদ পাঠ,

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী পাঠের পর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। পরে শ্রীমতী সুলোচনা ব্যাম গুজরাতী ভজন ও কলিকাতার শ্রীরমেন্দ্রনাথ পাল হিন্দী ও বাংলা ভজন ও কীর্তন পরিবেশন করেন। প্রসাদ-বিতরণের পর উৎসব সমাপ্ত হয়।

অনুরূপ কার্যসূচী দ্বারা গত ৩রা জানুআরি শ্রীশ্রীমায়ের ও ১লা ফেব্রুআরি স্বামীজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

জয়নগর-মজিলপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘে গত ১৩ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাবতিথি বিশেষ পূজাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় পাচালি পরিচালনা করেন স্থানীয় শিল্পী শ্রীকালাচাঁদ ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়। ১৯শে মার্চ তারিখ সন্ধ্যায় "সাধক কমলাকান্ত কথাগীতি" পরিবেশন করেন শ্রীলক্ষ্মী হাইত ও সম্প্রদায়। ২৪শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন ও বাণী বিষয়ে আহূত ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী জীবানন্দ মহারাজ। তিনি তাঁর আবেগময় ও দীর্ঘ ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবনের বিভিন্ন দিক পরিক্রমা করেন। অধ্যাপক সমরেন্দ্র বসু মহাশয়ও একটি মনোজ্ঞ ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দেন। পরে "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের গীতি-আলেখ্য" পরিচালনা করেন স্থানীয় বান্ধব নাট্যসমিতি।

নব-বারাকপুরঃ গত ১৯শে মার্চ রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় নব-বারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত স্থানীয় শক্তিসংঘ-প্রাঙ্গণে এক বিশেষ সভায় রামকৃষ্ণ-মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী "বর্তমান যুগ ও শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারা" সম্বন্ধে বাংলাভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

খেপুতঃ গত ১৩ই মার্চ খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব পালিত হয়।

ভোরে মঙ্গলারতি উপনিষদ্-পাঠ ও কীর্তন, পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোমাদি, প্রসাদ-বিতরণ এবং সন্ধ্যায় কথামৃতপাঠ ও ভজন অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

সুরবিতানঃ গত ১৩ই মার্চ খিদিরপুরে মনসাতলা লেনে অবস্থিত সঙ্গীতালয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থা সুরবিতানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবতিথি-উৎসব পালিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের শিশুবৃন্দ ও সংস্থার অধ্যক্ষ শ্রীরবীন বসুর ভজনসঙ্গীতে উৎসবের উদ্বোধন হয়। পরে শ্রীবসু 'অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক ভাষণ দান করেন।

পরলোকে মহেন্দ্রচন্দ্র সোম

৩০.১০.৬৬ তারিখ রবিবার রাত্রি ৩-১৫ মিনিটের সময় জোরহাট শহরের বিশিষ্ট প্রবাসী নাগরিক মহেন্দ্রচন্দ্র সোম ৬৫ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। মহেন্দ্রবাবু শ্রীহট্ট জেলার (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) কাদীপুর গ্রামের বিখ্যাত সোম-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর সরকারী কার্যব্যপদেশে তিনি জোরহাট শহরে আগমন করিয়া সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। নিষ্ঠা ও ভক্তির জন্য তিনি ভক্তসমাজে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

দিব্য বাণী

ওঁ বাঙ্‌ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌; আবিরাবীর্ম এধি; বেদস্য ম আণীস্থঃ; শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ; অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্‌ সংদধামি; ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি; তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু; অবতু মাম্‌, অবতু বক্তারম্‌, অবতু বক্তারম্‌।

—ঋগ্বেদ (শান্তিপাঠ)

মন যেন রহে বাক্যে, বাক্য মোর মনে সদা রয়—
'মন-মুখ এক' যেন হয়!
আপন প্রভায় তুমি প্রকাশিত, হে আত্মন্‌,
আমার মাঝারে হোক তোমার প্রকাশ!
মন-মুখ এক হয়ে, বেদের যা অর্থ, মোর
চিত্তে তার ঘটাক বিকাশ!
শুনি যাহা, সদা যেন রয় তাহা মোর স্মৃতি-তলে,
দিবস ও রজনীরে মিলিত করিব আমি অধ্যয়ন-বলে—
দিবারাত্র মগ্ন হয়ে অধ্যয়ন করি বেদ-গাথা!
চিন্তা মোর সত্য হোক, বাক্য মোর সত্য হোক—
মন-বাক্যে আমি যেন কহি সত্য কথা!
ব্রহ্ম! তুমি রক্ষা কর—আমারে ও আচার্যেরে রক্ষা কর সদা!

কথাপ্রসঙ্গে

অবহেলিত সংস্কৃত

অতীব দুঃখের বিষয়, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা যতবার হইতেছে, প্রতিবারেই সংস্কৃত ভাষাকে বিদ্যার্থিগণের নিকট হইতে অধিকতর দূরে সরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিদ্যার্থিগণের শিক্ষার 'ভার-লাঘবের' যেন আর অন্য কোন পথ নাই!

পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে কলেজে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে সংস্কৃত (বা উর্দু প্রভৃতি) শিক্ষা কিছুটা করিতেই হইত। উহাতেই সংস্কৃতভাষায় যে সামান্য জ্ঞান হইত, তাহাতেই সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ এবং গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র অন্বয়াদি দেখিয়া বুঝিবার মত সামর্থ্য প্রায় সকলেরই আসিয়া যাইত। এক কথায়, ভারতীয় সংস্কৃতি-সৌধের প্রবেশদ্বারে তাহাকে পৌছাইয়া দেওয়া হইত। উৎসুক মেধাবী বিদ্যার্থিগণ ইচ্ছা করিলে উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনেক কিছুরই সন্ধানলাভের সামর্থ্য নিজের চেষ্টাতেই অর্জন করিতে পারিত, কলেজে আর সংস্কৃত না পড়িয়াও।

ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় সংস্কৃতি মূলতঃ সংস্কৃত ভাষার ভিত্তির উপর স্থাপিত। ভারতীয় জাতির সংহতির মূল সূত্র এখনো সংস্কৃত। ভারতের মহিমা, মানবজাতির প্রাচীনতম সর্বোচ্চ চিন্তা সংস্কৃত ভাষার মণিপেটিকায় রক্ষিত। ভারতের ভবিষ্য ভাগ্যনিয়ন্তা বিদ্যার্থীদের সেই সংস্কৃতের সংস্পর্শ হইতে ক্রমশঃ দূরে সরাইয়া দেওয়ার অর্থই হইতেছে জাতির নিজস্বতা, জাতির গৌরব, জাতির মিলনভূমি—এক কথায় জাতির প্রাণের উৎস হইতে তাহাকে দূরে রাখা। শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাধুনিক পুনর্বিন্যাস সংস্কৃত শিক্ষাকে এমন স্থানে রাখিতে চাহিতেছে যে, সাহিত্য বা বিজ্ঞান যে কোন বিভাগের বিদ্যার্থীই ইচ্ছা করিলে সংস্কৃতভাষা স্পর্শ না করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করিতে পারে, 'সুশিক্ষিত' হইয়া দেশ-বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির দূত-রূপে প্রেরিতও হইতে পারে। আমাদের জাতীয় শিক্ষার ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

সুশিক্ষিত মানুষই যে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেকথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। জাতির বিভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভবিষ্য সেবকের যথাযথ যোগ্যতা আনয়নই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং এই দিকটিতে বিশেষ চিন্তা দেওয়ার প্রয়োজনের গুরুত্বও খুব বেশী, অন্যান্য পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষাকে একাসনে বসানো যায় না, তাহার স্থান বহু উর্ধ্বে—এসব কথাও আমরা ভাবিতেছি ও বলিতেছি। ইহাও তো দেখিতেছি যে, কেবল সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষিত করিয়া জাতির সেবক-রূপে যেরূপ মানুষ চাহিতেছি সেরূপ মানুষ পাইতেছি না। কি করিলে যথার্থ মানুষ তৈয়ারী হয়, তাহা ভাবিয়া তাহার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা কবে আর করা হইবে? যাহা করা হইতেছে তাহা এই উদ্দেশ্যসাধনের পথে অগ্রসর না করাইয়া জাতিকে বরং আরো পিছাইয়া দিবে।

মানুষকে যথার্থ শিক্ষিত করিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত করিতে হইলে 'সেকুলার' বা লৌকিক শিক্ষা ছাড়া আরো কিছুর প্রয়োজন;

জে. জে. গুডউইন

"গুডউইনের ঋণ অপরিশোধনীয়। আর যাঁহারা মনে করেন, আমার কোন চিন্তাদ্বারা তাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, তাহার প্রত্যেকটি কথা শ্রীমান গুডউইনের স্বার্থলেশহীন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমি এমন একজন অকপট বন্ধু, ভক্তিমান শিষ্য ও অদ্ভুত কর্মীকে হারাইয়াছি, যে জানিত না, ক্লান্তি কাহাকে বলে। পরার্থে যাঁহারা জীবনধারণ করেন, এরূপ লোক জগতে অতি অল্প। সেই অত্যল্প সংখ্যারও আর একটি হ্রাস পাইল।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জে. জে. গুডউইনের সমাধিস্থানের উপর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ

শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম *

"চল আত্মা শীঘ্রগতি তারকাখচিত তব পথে,
ধাও হে আনন্দময় যেথা নাহি বাঁধে মনোরথে ;
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ,
চিরশান্তি আশীর্বাদ যেথা করে তোমারে বরণ !
সার্থক তোমার সেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান,
অপার্থিব প্রেমপূর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান ;
মধুময় তব স্মৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে,
বেদীতলে পুষ্পসম রেখে গেলে সৌরভ বিছায়ে !

টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছ সে আনন্দ-সন্ধান,
জন্মমৃত্যুরূপে যিনি, তাঁর সাথে হলে একপ্রাণ,
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধরায়,
আগে চলো, সংসার-সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায় !"

—স্বামী বিবেকানন্দ

---

* 'Requiescat in Pace' কবিতার অনুবাদ

শিক্ষার মধ্যে হৃদয়ের বিস্তারের জন্য, বিদ্যার্থীর জনসেবার ইচ্ছাকে জাগ্রত করার জন্য, তাহার উচ্চ আদর্শের প্রতি অনুরাগ আনয়নের জন্য সচ্চিন্তা-পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন। ইহা জানিয়াও আমরা তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষা) কিছু তো করিতেছি না-ই, উপরন্তু সংস্কৃতশিক্ষার মাধ্যমে উহা যতটুকু হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার পথও বন্ধ করিতে চলিয়াছি।

আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষা উচ্চ চিন্তারাজ্যে প্রবেশের, জীবনে শক্তি, প্রাণবত্তা ও নিঃস্বার্থপরতা আনয়নের সিংহদ্বার। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাতেও এ দ্বার যতখানি অবারিত ছিল, স্বাধীনতা পাইবার পর আমরা তাহাও ধীরে ধীরে রুদ্ধ করিয়া দিতেছি! তাছাড়া, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত ভাষাগুলি ভালভাবে শিখিবার জন্যও সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজন।

যত শীঘ্র আমরা ইহা বুঝিতে পারি ততই মঙ্গল। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের মত আমরা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা লাভের গৌরবে মণ্ডিত হইতে পারিতাম (জাতির সংহতিকেও দৃঢ়তর করিতে পারিতাম)—যে গৌরব শাশ্বত ভারতের গৌরব, যে গৌরবে মণ্ডিত হইয়া এখনো আমরা জগৎসভায় সমুন্নতশিরে দাঁড়াইতে পারি, যে গৌরব জাতির অন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন শক্তিকে বিকশিত ও উদ্বেল করিয়া তুলিতে পারে। তাহা যখন সম্ভব হইল না, অন্ততঃ স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণী কয়টিতে সর্বভারতে সকল বিদ্যার্থীর জন্য সংস্কৃত শিক্ষাকে (প্রয়োজন মত উর্দু প্রভৃতিকে) আবশ্যিক করা একান্ত প্রয়োজন। ধর্মকে শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান দিতে হয়ত (ভ্রমবশতঃ) আমাদের 'সেকুলারিজমের' সর্বনাশ হইল বলিয়া আমরা আঁতকাইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু সংস্কৃত-শিক্ষাকে আবশ্যিক করিবার পথে তো সে ভয়ও নাই।

জে. জে. গুডউইন

স্বামী বিবেকানন্দ যে দুইজন ইংরেজকে ভারতের কল্যাণে আত্মত্যাগী শহীদ বলিয়াছেন, গুডউইন তাঁহাদের অন্যতম—"দুজন মহাপ্রাণ ইংরেজ আমাদের জন্য—হিন্দুদের জন্য আত্মত্যাগ করলেন। শহীদ কোথাও থাকে তো এঁরাই।" গুডউইনের দেহত্যাগ-সংবাদ পাইয়া তাঁহার মাতাকে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, "পরার্থে যাঁহারা জীবন ধারণ করেন এরূপ লোক জগতে অতি অল্প। সেই অত্যল্প সংখ্যারও আর একটি হ্রাস পাইল।"

নিঃস্বার্থ ভালবাসা, যে ভালবাসা ভালবাসার পাত্রের দোষগুণের অপেক্ষা রাখে না, নির্বিচারে কেবল তাহার কল্যাণকামনাই করে, সে ভালবাসা হৃদয়ের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, গুডউইন তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। গুডউইনের জীবনে মহাপ্রাণতার, নিঃস্বার্থ-পরতার উদ্বোধন হইয়াছিল স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়াই। ইহার পূর্বে তাঁহার জীবন ছিল উচ্ছৃঙ্খল। তাহা জানিয়াও স্বামীজী তাঁহাকে ভালবাসিতেছেন দেখিয়াই তিনি তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন; স্বামীজীর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন।

গুডউইন ছিলেন ক্ষিপ্র-লিপিকার। গুড-উইনের জন্ম ইংলণ্ডে। সেখানে তিনি তিনটি পত্রিকার সম্পাদকরূপে ও বহুস্থানে ক্ষিপ্র-লিপিকাররূপে কাজ করিবার পর ভাগ্যান্বেষণে অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহুস্থান ঘুরিয়া যখন আমেরিকায় আসেন, সেই সময়, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি স্বামীজীর ক্ষিপ্র-লিপিকার-

রূপে নিযুক্ত হন। স্বামীজী তখন লণ্ডন হইতে সম্ভ ফিরিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ইতিপূর্বে অন্যান্য লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। স্বামীজী অতি দ্রুত বলিয়া যাইতেন; তাছাড়া তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তুও ছিল তাঁহাদের নিকট অপরিচিত। সেজন্য সব কথা তাঁহারা বুঝিতে বা লিখিয়া উঠিতে পারিতেন না। গুডউইনকে পাওয়ায় সে কার্য যথাযথরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল।

প্রথম সাক্ষাৎ হইতে প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি স্বামীজীর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকিয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ড ঘুরিয়া ভারতে আসেন। ভারতে 'কলম্বো হইতে আলমোড়া' পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার সহিত মিলিত হইবার পর হইতে স্বামীজীর সমস্ত বক্তৃতাগুলির ক্ষিপ্রলিখন এবং ভাষায় রূপান্তর করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। অতন্দ্রভাবে এ কাজ তিনি করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই বিশ্ববাসী আজ স্বামীজীর বাণীগুলি পাইয়াছে। এই কাজের মাধ্যমে বিশ্বের, বিশেষ করিয়া ভারতের যে সেবা তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আমরা এজন্য তাঁহার নিকট যে কতখানি ঋণী, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্বামীজীর কথাগুলির সংরক্ষণে জগতের কতখানি কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা গুডউইন অনুভব করিয়াছিলেন। তাই নিঃস্বার্থ মানবসেবার প্রেরণাতেই এ কাজে তিনি আত্মবলি দিয়াছেন-কেবল গুরু স্বামীজীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার জন্যই নয়, অর্থের জন্য তো নয়ই। নিজ ভরণপোষণের জন্য তাঁহাকে নিজ শ্রমের উপর নির্ভর করিতে হইত। যোগ্য ক্ষিপ্র-লিপিকার-রূপে তাঁহার উপার্জন কম ছিল না। কিন্তু স্বামীজীর ক্ষিপ্র-লিপিকাররূপে নিযুক্ত হইবার কালেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজন সেটুকু না লইয়া তাঁহার উপায় নাই বলিয়াই হয়ত লইতে হইবে কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কিছু নহে। আর্থিক কারণেই পাশ্চাত্যে তাঁহাকে স্বামীজীর সঙ্গ ছাড়িয়া কিছু দিন থাকিতে হইয়াছিল—লণ্ডন হইতে কিছু-দিনের জন্য স্বামী সারদানন্দের সহিত আমেরিকা যাইতে হইয়াছিল।

গুডউইনের পূর্বজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। স্বামীজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তাঁহার বয়স ছিল আনুমানিক পঁচিশ বৎসর।

স্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে প্রথমবার ভারতে ফিরিয়া ভারতীয় জাতিকে জাগাইবার জন্য সারা ভারতে অগ্নিময়ী বাণী ছড়াইয়া যখন আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় গুডউইনকে তাঁহার নিকট হইতে মাদ্রাজে চলিয়া যাইতে হয়। সেখানে তিনি 'মাদ্রাজ মেল' নামক সংবাদপত্রে একটি কাজ যোগাড় করেন। সেখানেই তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁহাকে উটকামণ্ড লইয়া যাওয়া হয়। উটকামণ্ডে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন তিনি দেহত্যাগ করেন এবং 'সেণ্ট টমাস' গির্জার অন্তর্ভুক্ত সমাধিস্থলে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়।

তাঁহার সমাধিস্থলের উপর সদ্যনির্মিত যে স্মৃতিস্তম্ভটির উদ্বোধন সম্প্রতি (২৩।৪।৬৭) হইয়া গেল, তাহার পাদদেশে একটি ফলকে স্বামীজীকর্তৃক লিখিত 'Requiescat in Pace (শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম)' কবিতাটি খোদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গুডউনের দেহত্যাগের পর স্বামীজী তাঁহার উদ্দেশে এই কবিতাটি লিখিয়া তাঁহার মায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Alambazar Math,
3. 12. 97.

My dear Mohant,

তোমার পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তোমরা ৺রামেশ্বর দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছ ইহাতেই আমাদের আনন্দ। তোমাদের সকলকার শরীর ভাল আছে শুনিয়াও সুখী হইলাম।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ৺জগদ্ধাত্রী-পূজার পর কলিকাতা আসিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় স্থগিত রাখা হইয়াছে। বোধ হয় মাঘ মাসে শুভাগমন করিবেন।

স্বামীজী দিল্লী হইয়া রাজপুতানায় যাইতেছেন; বোধ হয় এতদিনে তথায় পৌঁছিয়া থাকিবেন। তাঁহার উপস্থিত সঙ্কল্প এইরূপ যে Khetri হইতে Kathiawar হইয়া একেবারে কলিকাতা চলিয়া আসিবেন। কার্যে কি হয় বলিতে পারি না। শরৎ শীঘ্রই এখানে আসিতেছে; তবে ঠিক কোন্ তারিখে এখানে আসিয়া পৌঁছিবে তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। হরিদাসী মঠেও একখানি পত্র লিখিয়াছে। তাহাতে শরতের জন্য দুঃখ করিয়াছে। কালীর কথাও হরিদাসী খুব সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছে।

এ বৎসর মহোৎসব কোথায় হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। স্বামীজী আসিয়া একটা যা হউক স্থির করিবেন। পূর্ণ পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছে, একদিন মঠে আসিয়াছিল। শারীরিক বেশ ভাল আছে। গঙ্গাধর মহুলাতে রহিয়াছে। Relief-work close করিয়া দিয়াছে। Orphanage ও মঠ স্থাপন করিবার জন্য খুব খাটিতেছে। সারদাও Relief-work close করিয়া দিয়াছে। তাহার এখানে জ্বর হইয়াছিল। শীঘ্রই এখানে ফিরিয়া আসিতেছে। যোগীন সেখানে এক প্রকার ভাল আছে। মঠে এখন পুরাতন দলের মধ্যে হরিবাবু, বাবুরাম ও আমি আছি। ছেলেদের মধ্যে কানাই, সুশীল, নন্দ, যোগেন ও খগেন

আছে। আমাদের শরীর ভালমন্দ মিশ্রিত, বড় সুবিধা নয়। অতুলবাবুকে তুমি যে ঔষধের কথা লিখিয়াছিলে তাহার জন্য তিনি ২৲ আমাকে দিয়াছেন। আমি তোমার দুই মাসের খাইবার ঔষধ, ২ টিন সরিষার তৈল ও তৈলের মসলা পাঠাইবার জন্য দয়ালবাবুকে বলিয়া আসিয়াছি। বোধ হয় এতদিনে তিনি পাঠাইয়াছেন। যদি না পাঠাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমি আগামী রবিবার কলিকাতায় যাইয়া যত শীঘ্র পারি পাঠাইব।

মঠের কাজ একপ্রকার চলিতেছে, তবে হরিবাবুর শরীরটা একটু খারাপ হওয়ায় নিত্য-পাঠটা ভালরূপ হইতেছে না। সুশীল একপ্রকার করিয়া কাজ চালাইতেছে। এখানে তোমার post-এ যিনি permanent হইয়াছেন তিনি (বাবুরাম মহারাজ) ঠাকুরসেবা বেশ সুচারুরূপে চালাইতেছেন। তবে তাঁহার শরীরটা একটু delicate, সেইজন্য তোমার মত energetically হয় না। গতকল্য নূতন মোহান্তের জন্মতিথি-উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। চেলির কাপড় পরিধান করাইয়া ও velvet surge-এর গায়ের কাপড় গায়ে দিয়া নানা ব্যঞ্জনাদি সমন্বিত বৃহৎ কদলীপত্রে স্তূপাকারে স্থাপিত অন্নের সম্মুখে অতি বৃহৎ পশমী আসনে উপবিষ্ট করান হইয়াছিল। সম্মুখে ধূপ জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল।* আহার করিবার সময় খোল-করতাল লইয়া হরিনাম সঙ্কীর্তন করা হইয়াছিল। এই সমারোহের Description পাঠ করিয়া তোমরা বিশেষ আনন্দিত হইবে সন্দেহ নাই।

আর অধিক কি লিখিব! আমাদের ভালবাসা তোমরা সকলে জানিবে। তোমরা কেমন আছ মধ্যে মধ্যে লিখিও। গোপালদাদা কেমন আছেন? তিনি পায়ে একটি বেদনা লইয়া এখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ছেলেদের সকলকার প্রণাম জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি—

Affly yours
Brahmananda

---

* অন্নাহার করিতে বসিবামাত্র শঙ্খধ্বনি করা হইয়াছিল।

শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Sri Ramakrishna Math, Bhubaneswar, P. O.,
Dt. Puri (Orissa)
শনিবার, ৭ই ভাদ্র
1924.

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী—

মায়ী—তোমার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি, সমস্ত সংবাদে আনন্দিত হইয়াছি। আমার জ্বর হইয়াছিল, শরীরও খুব দুর্বল ছিল। এই জ্বরের নাম ডেঙ্গুজ্বর। অনেকদিন অবধি শরীর দুর্বল থাকে; ভুবনেশ্বরে অনেকের হইয়াছিল ও হইতেছে; শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এখন এখানকার মঠের সকলেই ভাল আছে ও আছি।

মায়ী, তুমি জানিতে চাহিয়াছিলে কি করে তাঁর উপর ভালবাসা হবে ও তাঁর দেবমূর্তি দর্শন হবে? শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, ছেলেমেয়েরা পিতামাতার কাছে কেঁদে-কেটে আবদার করে বসে—আমার অমুক জিনিস চাই; সেই সময় পিতামাতা সেই জিনিস না দিয়া থাকিতে পারেন না। ভগবানকে জানিতে হবে—তিনি আমার পিতামাতা; তাঁর কাছে কেঁদে প্রার্থনা করিতে হবে।

অনেক সময় মায়া-মমতায় মানুষ ভুলিয়া যায়; সে মায়া কে দেয়, কে পাঠায়? যখন ছেলেমেয়েরা পিতামাতাকে কোনো জিনিসের জন্য বেশি বিরক্ত করে, আবদার করে, তখন সেই পিতামাতা ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাবার জন্য কত রকম উপায় করেন; ছেলেমেয়েরা ভয় পাইয়া যখন খুব কাঁদে তখন পিতামাতা বলেন, কেন ভয় করিতেছ, এই যে আমরা তোমার কাছে আছি! পরে বিশ্বাসীর মন আর কিছুতেই চঞ্চল হয় না। কিম্বা অন্যদিকে যায় না।

মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছাদি তোমরা সকলে জানিবে। শীতকালে যখন ঢাকায় দেখা হবে কত কথাবার্তা হবে। তোমাদের সকলের কুশল সংবাদে সুখী করিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে আজকাল কি পুস্তক পড়িতেছ?

এ দেশে এ বৎসর বৃষ্টি বেশী হয় নাই।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Sri Ramakrishna Math, Bhubaneswar, P. O.,
Dt. Puri (Orissa)
বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর। 1924,

পরম কল্যাণীয়া, শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

মায়ী—তোমাদের পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। আমার অসুখ সারিয়াছে, শারীরিক দুর্বলতা এখনো যায় নাই। কারণ ৩৪ বার জ্বর হইয়াছে ও সারিয়াছে। সেইজন্য মনে করিয়াছি আসছে সপ্তাহে কলিকাতা বেলুড় মঠে যাইব। তোমাদের পত্র বেলুড় মঠের ঠিকানায় পাঠাবে। শরীর থাকলে অসুখ আছেই একটা; বলে, শরীরম্ ব্যাধিমন্দিরম্।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আর এক পুস্তক আছে "রামকৃষ্ণ-পুঁথি"। সে পুস্তক করিয়াছিল শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। সে পুস্তক কবিতায় লেখা। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক জানিতে পারিবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বাস খুব করিতে বলিতেন। যাহা কিছু হইবার এক বিশ্বাসের জোরে হবে। যতো বড় ২ সাধু মহাত্মা হইয়াছিলেন তাঁহাদের খুব বিশ্বাস ছিল ও ইষ্টে নিষ্ঠা ছিল। যেখানে লোকে বেশি বিচার করিতে যায়, গোলমাল করিয়া ফেলে; বিশ্বাসের জোরে মানুষ সর্বভূতে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় তাহার দেবতার দর্শন পায়, যেমন গোপালের মার কথা পড়িয়াছ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, তাঁকে পাইবার জন্য যে মানুষ চেষ্টা করে, তিনি আরো কাছে আসেন, তাঁর ছেলেমেয়েদের দর্শন দেন। আন্তরিক চেষ্টা করা চাই তাঁর কাছে কেঁদে-কেটে।

মায়ী, মনে করি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাবার্তা কত কি লিখিব। লিখিতে বোসে তাঁকে যখন মনে পড়ে সব ভুলে যাই কি লিখব। ঠাকুর বলিতেন, কোনো রকম অহঙ্কার মনে থাকিলে জ্ঞান ভক্তি দাঁড়াতে পায় না, যেমন উঁচু মাটিতে জল দাঁড়ায় না।

আমার আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা তোমরা জানিবে ও তোমার বাবা মা সকলকে জানাবে।

বিবেকানন্দ স্বামীর লেকচার পুস্তক পড়িবে, বাঙ্গালায় তরজমা হইয়াছে। অনেক পুস্তক আছে। খবর নেবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—শ্রীসুবোধানন্দ

রামচরিতমানসে কাক-গরুড়-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

পূর্বকথা অনুসরণে, গরুড় কর্তৃক নাগপাশ মোচন ও রামায়ণের অবশিষ্ট কাহিনী বর্ণন

অতঃপর, কেমন করে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে গরুড় রামচন্দ্রকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছিল শিব সে কথা বললেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, এই ঘটনায় গরুড়ের মনেও যে সংশয়-সন্দেহের উদয় হয়েছিল, তখনকার মত সে সব কথা আর পার্বতীকে বিস্তারিত করে কিছু বললেন না। এরপর মেঘনাদ-বধ, রাবণবধ, সীতা উদ্ধার, দেবগণ কর্তৃক স্তবস্তুতি, সীতা লক্ষণ ও কপিগণের সঙ্গে রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, ভরতাদির সঙ্গে পুনর্মিলন, পরমার্থপ্রসঙ্গ প্রভৃতি নানা লীলাকথা কীর্তন করার পরে, অবশেষে শিব পার্বতীকে বলছেন—

কাক গরুড়-কথার মহাত্ম্যবর্ণন

বিমল কথা হরিপদ দায়নী।
ভগতী হোই সুনি তান পায়নী॥
উমা কহেউঁ সব কথা সুহাঈ।
জো ভুসুণ্ডি খগপতিহিঁ সুনাঈ॥

এই পবিত্র কথা হরিপাদপদ্মে রতি এনে দেয়, শ্রবণে অনন্যাভক্তি লাভ হয়। উমা, কাকভূষণ্ডী গরুড়কে যা শুনিয়েছিল, সেই সব সুন্দর কথাই তোমাকে বললাম।

কছুক রামগুণ কহেউঁ বখানী।
অব কা কহউঁ সে কহহু ভবানী॥

ভবানি, রামের গুণের কথা কিছু কিছু বলেছি, এখন আর কি বলব, বল? শিবের এই কথার উত্তরে পার্বতী এতক্ষণে বলছেন—

তুমহরী কৃপায়তন অব কৃতকৃত্য ন মোহ।
জানেউঁ রামপ্রতাপ প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ॥

হে কৃপাময়, তোমার কৃপায় এখন আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার আর মোহ নেই। হে প্রভু, জ্ঞান- ও আনন্দ-স্বরূপ রামচন্দ্রের শক্তির কথা আমি জানতে পেরেছি।

দেখা যায়, তুলসী এখানে ঈশ্বরের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে শিবের পূর্বকথা প্রসঙ্গে পার্বতীর নিজ অপরোক্ষ অনুভূতি ও আত্ম-সমাধানের কথাই বলছেন। পার্বতী বলছেন—বুঝেছি, ঈশ্বরের শক্তির কথা এতদিনে জানতে পেরেছি! এ শক্তির রূপ, জ্ঞান ও আনন্দ; আর শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং জ্ঞানানন্দস্বরূপ। এই চরম এবং পরম বোধের ফলে আমার সকল মোহ অপগত হয়েছে—সকল সংশয়ের নাশ হয়েছে—চিরদিনের মত আমি কৃতকৃতার্থ হয়েছি। বাস্তবিকই, ঈশ্বরকে যখন আমরা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে জানতে পারি, অথবা অন্য কথায়, যখন আমাদের মধ্যে সৎ চিৎ এবং আনন্দ পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখনই কেবল আমাদের সকল জানাজানি, সকল বোঝাবুঝি, সকল ছুটাছুটির অবসান হয়। তখন, "বোঝাবুঝির বোচকা ফেলে, মারছে সে মজা"। তারপর যে জানাজানি, যে বোঝাবুঝি, যে ছুটাছুটি, সে কেবল রসাস্বাদনের জন্য। বদ্ধের পক্ষে যা জ্বালা, মুক্তের পক্ষে তাই-ই খেলা। তাই, একই সংসার, কখনও ধোঁকার টাটি, কখনও বা মজার কুটি!

অতঃপর পার্বতীর যে কৌতুহল, পার্বতীর যে প্রশ্ন তাতে এই আভাসই পাওয়া যায়।

হরিচরিত্রমানস তুম্হ গাবা।
সুনি মৈঁ নাথ অমিত সুখ পাবা॥
তুম্হ জো কহা যহ কথা সুহাঈ।
কাগ ভুসুণ্ডি গরুড় প্রতি গাঈ॥

হে নাথ, তুমি রামচরিতমানস-কথা কীর্তন করলে, তা শুনে আমি অত্যন্ত সুখ পেলাম। তুমি বলেছ, এই সব সুন্দর সুন্দর কথা কাক-ভূষণ্ডী গরুড়কে বলেছিল।

কিন্তু,

পার্বতীর কৌতূহল

বিরতি জ্ঞান বিজ্ঞান দৃঢ় রামচরিত অতি নেহ।
বায়সতন রঘুপতি ভগতি মোহি পরম সন্দেহ॥

যার বৈরাগ্য জ্ঞান বিজ্ঞান এত দৃঢ়, রাম-লীলাকথায় এত প্রীতি, রঘুপতির প্রতি যার এত ভক্তি, তার কিনা কাকের দেহ! এতে আমার মনে বড়ই সন্দেহ (কৌতূহল) হচ্ছে, [অর্থাৎ ব্যাপারটি যে কি, তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা]।

রামপরায়ণ জ্ঞানরত গুণাগার মতিধীর।
নাথ কহহু কেহি কারণ পায়েউ কাগ সরীর॥

যে এমন রামপরায়ণ জ্ঞাননিষ্ঠ সর্বগুণসম্পন্ন স্থিরবুদ্ধি,—হে নাথ, বল সে কি কারণে কাকের দেহ পেয়েছিল।

আর,

গরুড় মহাজ্ঞানী গুণবাসী।
হরিসেবক অতি নিকট নিবাসী॥
তেহি কেহি হেতু কাগ সন জাঈ।
সুনী কথা মুনিনিকর বিহাঈ॥

মহাজ্ঞানী গুণবান গরুড়, যে কিনা [নিজে] শ্রীহরির সেবক, সর্বদা তাঁর কাছে কাছে থাকে, সে এ কথা [হরিকথা—রামচরিত-কথা] শোনবার জন্য মুনিদের কাছে না গিয়ে, কেনই বা কাকের কাছে গিয়েছিল?

পার্বতীর যথার্থ প্রশ্নে শিবের সন্তোষ ও কাকভূষণ্ডীর পরিচয়-প্রদান

পার্বতীর এ হেন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় আনন্দিত হয়ে শিব এবার বলছেন—

ধন্য সতী[৩] পাবনি মতি তোরী।
রঘুপতি চরণ প্রীতি নহিঁ থোড়ী॥
সুনহু পরম পুনীত ইতিহাসা।
জো সুনি সকল সোক ভ্রম নাসা॥
উপজই রামচরণ বিস্বাসা।
ভবনিধি তর নর বিনহিঁ প্রয়াসা॥

হে সতি, ধন্য তুমি, তোমার বুদ্ধি পবিত্র হয়েছে; রঘুপতিচরণে তোমার ভক্তি বড় কম নেই! সেই পরম পবিত্র কাহিনী শোন, যা শুনলে সকল শোক, সকল ভ্রম নাশ হয়, রাম-চরণে বিশ্বাস-ভক্তির উদয় হয়; মানুষ বিনা চেষ্টায় ভবসাগর পার হয়।

গিরি সুমেরু উত্তর দিসি দূরী।
নীল সেল এক সুন্দর ভূরী॥

উত্তর দিকে, সুমেরু পর্বত থেকেও আরও দূরে একটি খুব সুন্দর নীল পর্বত আছে

তেহি গিরি রুচির বসই খগ সোঈ।
তাসু নাস কলপান্ত ন হোঈ॥
মায়াকৃত গুণ দোষ অনেকা।
মোহ মনোজ আদি অবিবেকা॥
রহে ব্যাপি সমস্ত জগ মাঁহী।
তেহি গিরি নিকট কবহু নহিঁ জাহীঁ

৩। এখানে শিব পার্বতীকে "সতী" বলে সম্বোধন করছেন। এর তাৎপর্য এরূপ হতে পারে যে তিনি এখন স্বামীর কথা নির্বিচারে গ্রহণ করবার উপযুক্তা হয়েছেন, তাই পূর্বে যে সব কথা শিব তাঁর নিকট ব্যক্ত করেন নি, এখন তা বলতে উদ্যত হয়েছেন, এ তারই ইঙ্গিত। অথবা, এখন যে কথার অবতারণা হতে চলেছে উহা [তুলসীর মতে] দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরের কথা, তাই সেই পূর্বস্মৃতির উদ্দীপনার জন্যই এই "সতী" সম্বোধন। অথবা, ইহা উভয় ভাব ব্যঞ্জকও হতে পারে।

তহ বসি হরিহি ভজই জিমি কাগা।
সে সুনু উমা সহিত অনুরাগা॥

সেই সুন্দর পর্বতে সেই কাক বাস করে। কল্পান্তেও তার বিনাশ নেই। মায়াকৃত নানা দোষগুণ, কাম-মোহাদি বিবেকবিরুদ্ধ ভাব সমস্ত জগৎ ছেয়ে থাকলেও, ঐ পর্বতের কাছে ওরা কখনও যেতে পারে না। সেখানে বসে কাকভূষণ্ডী যেমন ক'রে হরিভজন করে, উমা, সে কথা অনুরাগের সাথে শোন।

কাকের নিরন্তর হরিভজন

পীপর তরুতর ধ্যান জো ধরঈ।
জাপজজ্ঞ[৪] পাকরি তর করঈ॥
আমছাহঁ কর মানস পূজা।
তজি হরি ভজনু কাজু নাহিঁ দূজা॥

সে অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে ধ্যান-ধারণা করে, পাকুড় গাছের নীচে বসে জপযজ্ঞ করে, আমগাছের ছায়ায় মানস পূজা করে। হরি-ভজন ছাড়া তার আর অন্য কোন কাজই নেই।

বরতর কহ হরিকথা প্রসঙ্গা।
আবহিঁ সুনহিঁ অনেক বিহঙ্গা॥
রামচরিত বিচিত্র বিধি নানা।
প্রেম সহিত কর সাদর গানা॥

বটবৃক্ষতলে সে হরিকথা-প্রসঙ্গ করে। অনেক পাখী এসে সেকথা শোনে। বিচিত্র রামচরিত্র সে নানাভাবে প্রেমের সাথে সাদরে কীর্তন করে।

কাক-ভূষণ্ডীর স্বরূপ—প্রকারান্তরে তুলসাদাস কি বলতে চাইছেন?

এই প্রসঙ্গে, সুমেরু পর্বতের উত্তরে নীল পর্বত-শৃঙ্গে শিববর্ণিত সদাহরিভজনশীল কাক-ভূষণ্ডীর কথা ভাবতে গিয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে শিবেরই ছবি। সুমেরু পর্বত পৃথিবীর শেষপ্রান্তে অবস্থিত, কাজেই তারও উত্তরে যে নীলপর্বত তা পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীর বাইরে, প্রকারান্তরে সেই কথাই বলা হচ্ছে। যেমন, ৺কাশীধাম—যেখানে বিশ্বেশ্বরের বাস, তাকে বিশ্বের বাইরে বলা হয়ে থাকে। শিব নীলকণ্ঠ, পাহাড়ের মতই অচঞ্চল তাঁর মন। এখানেও নীলপর্বতের কথা বলা হয়েছে। তারপর, সদাহরিভজনশীলতা। কথা আছে, মন যখন লিঙ্গ-গুহ্য-নাভি ও হৃদয়দেশ ছেড়ে কণ্ঠে ওঠে, তখন আর হরিকথা ছাড়া কথা থাকে না। সর্বদা রামগুণগান-পরায়ণ, সংসার-সমুদ্র-মন্থ-নোত্থিত হলাহল পানে নীলকণ্ঠ, বিশ্বের অতীত বিশ্বনাথকেই কি তুলসী এইভাবে কাক-ভূষণ্ডী সাজিয়েছেন? অথবা, কাক-ভূষণ্ডীকেই শিব সাজিয়েছেন—কে জানে? অথবা, ভগবানই যে ভক্ত হন, আবার ভক্তই ভগবান হয়ে যান, রূপকচ্ছলে সেই কথাই কি এখানে বলতে চাইছেন?

কাক-গরুড়-কথা আরম্ভ

সে যাহোক, শিব ব'লে যেতে লাগলেন—

গিরিজা কহেউঁ সো সব ইতিহাসা।
মৈ জেহি সময় গয়উঁ খগ পাসা॥[৫]
অব সো কথা সুনহু জেহি হেতু।
গয়উ কাগ পহিঁ খগকুল কেতু॥

হে গিরিজা, আমি নিজে যখন ভূষণ্ডীকাকের নিকট গিয়েছিলাম তখনকার কথা তোমাকে বলেছি। এখন যে কারণে পক্ষীরাজ গরুড় কাকের কাছে গিয়েছিল, সে কথা শোন।

এই কথা ব'লে, পূর্ববর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধ-কথা উল্লেখ ক'রে শিব এবারে বলতে লাগলেন—

৪। এখানে "জাপজজ্ঞ" অর্থে "জপ ও যজ্ঞ" না ব'লে জপরূপ যজ্ঞ এই অর্থে "জপযজ্ঞ" বলা হ'ল।

৫। বর্তমান প্রবন্ধের সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ না থাকায়, তুলসীদাস-বর্ণিত শিবের কাক-ভূষণ্ডীর সাথে সাক্ষাৎকারের কাহিনী এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়নি।

রামচন্দ্রের নাগপাশ দর্শনে শিবের মনোভাব

জব রঘুনাথ কীন্হ রণক্রীড়া।
সমুঝত চরিত হোত মোহি ব্রীড়া॥
ইন্দ্রজীত কর আপু বঁধায়ো।
তব নারদ মুনি গরুড় পঠায়ো॥

যখন রঘুনাথ যুদ্ধের খেলা খেলছিলেন, আমার লজ্জা হয়, তখনকার তাঁর সেই লীলা আমি ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। যখন তিনি [খেলতে খেলতে] আপন ইচ্ছায় ইন্দ্রজিতের হাতে বাঁধা পড়লেন, তখন নারদমুনি [তাঁকে নাগপাশের বন্ধনমুক্ত করবার জন্য] গরুড়কে পাঠালেন।

জ্ঞানী শিবের দৃষ্টিতে সবই খেলা, এর ভালই বা কি, আর মন্দই বা কি? বন্ধনই বা কি, আর মুক্তিই বা কি? ভক্ত শিবের দৃষ্টিতে, সবই রামের ইচ্ছা! স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার না করলে, কে তাকে বাঁধতে পারে? আর, কথা আছে, ঈশ্বরকে বরং জানা যায়, কিন্তু তাঁর লীলা জানা যায় না। তাই কি শিব এখানে অকাতরে স্বীকার করছেন যে, রামচন্দ্রের লীলা তিনিও বুঝে উঠতে পারেন নি?

গরুড়ের মনে সন্দেহের উদয়

বন্ধনকাটি গয়উ উরগাদা।
উপজা হৃদয় প্রচণ্ড বিষাদা॥[৬]
প্রভু বন্ধন সমুঝত বহুভাঁতী।
করত বিচার উরস আরাতী॥

নাগপাশের বন্ধন কেটে দিয়ে গরুড় চলে গেল বটে, কিন্তু তার হৃদয়ে বিষম-বিষাদ উপস্থিত হ'ল প্রভুকে এইভাবে বন্ধনগ্রস্ত দেখে মনে নানা বিচার-বিতর্কের উদয় হ'ল।

ব্যাপক ব্রহ্ম বিরজ বাগীসা[৭]।
মায়ামোহ পার পরমীসা॥
সো অবতার স্থনেউ জগ মাহীঁ।
দেখেউ সো প্রভাব কছু নাহী॥

শুনেছিলাম, সর্বব্যাপক, ত্রিগুণপরিশূন্য ব্রহ্ম,—জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধীশ্বর মায়ামোহের অতীত পরমেশ্বরই জগতে [রামরূপে] অবতীর্ণ হয়েছেন; [কর্মক্ষেত্রে কিন্তু] দেখলাম সে সব প্রভাব কিছুই নেই [অর্থাৎ তার কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না]।

ভববন্ধন তেঁ ছুটহিঁ নর জপি জা কর নাম।
খর্ব নিসাচর বাধেউ নাগপাশ সোই রাম॥

যাঁর নাম করলে মানুষের ভববন্ধন ঘুচে যায় [এমন কথা বলা হয়ে থাকে], [হায়!] তুচ্ছ রাক্ষস কিনা সেই রামকে নাগপাশে বেঁধেছিল!

গরুড়ের মনের এই সব সন্দেহের কথা তুলে শিব বলতে লাগলেন—

নানাভাতি মনহিঁ সমুঝাবা।
প্রগট জ্ঞান ন হৃদয় ভ্রম ছাবা॥
ক্ষেদখিন্ন[৮] মন তর্ঁক বঢ়াঈ।
ভয়উ মোহবস তুম্হরিহি নাঈঁ॥

গরুড় নানাভাবে নিজের মনকে বোঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু হায়! ভ্রান্তি-সমাচ্ছন্ন মনে জ্ঞানের প্রকাশ হ'ল না। বিষণ্ণ মনে তর্ক বেড়েই চলল। হে পার্বতি, সে তখন তোমার [এক সময়ে] যেমন হয়েছিল, তেমনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

৬। মনে হয় এখানে "বিষাদা" অর্থে "দুঃখ" বললে যথার্থ অর্থপ্রকাশ হয় না। দৃঢ়মূল সংস্কারে অত্যন্ত আঘাতের ফলেই মনে এই বিষাদের উদয় হয়—যেমন ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের মনে হয়েছিল। দুঃখ বলে বলতে হলে, একে আত্যন্তিক দুঃখ এরূপ বলা উচিত মনে হয়।

৭। এখানে "বাগীসা" কথার অনুবাদে "বাণীপতি" স্থলে এরূপ বলা হ'ল।

৮। "খেদখিন্ন" অর্থে দুঃখিত না বলে বিষণ্ণ বলা হ'ল। মনে হয় এখানে প্রকৃত ভাব যাহাকে শাস্ত্রে "দৌর্বল্য" বলা হয়েছে।

কৃত্যং করোতি কলুষং—কুহকান্তকারি !

দেখা যায়,—যে জলে প্রবাহ আছে, যে বায়ু গতিশীল, তা সকল মালিন্য অতিক্রম ক'রে চলে যায়। খানার বদ্ধ জলই দূষিত হয়, ঘরের রুদ্ধ বায়ুই বিষাক্ত হয়। ঘানিতে বাঁধা কলুর বলদ রাত্রিদিন ঘানির চারিদিকেই পাক খেতে থাকে, কিন্তু এক পাও এগিয়ে যেতে পারে না। তেমনি মানুষের জীবনও যখন চিরাভ্যস্ত ভাবধারার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মচক্রে নিরন্তর ঘুরতে থাকে, তখন তা-ও সেই দশাই প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে জীবন যেখানে সচল, সক্রিয়, উদ্যমশীল, কোন মালিন্য, কোন ভ্রান্তিই সেখানে চিরদিনের মত বাসা বাঁধতে পারে না,—চিরদিনের মত অগ্রগতি রোধ ক'রে রাখতে পারে না। হৃদয়ের গতিবেগই একদিন-না-একদিন পথের সকল বাধা দূরে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে যাবার পথ ক'রে নেয়। অসতো মা সদ্গময়; তমসো মা জ্যোতির্গময়; মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়। আবিরাবীর্ম এধি। হে স্বপ্রকাশ! বস্তুতঃ কোথায়ও ত তোমার অপ্রকাশ নেই! আমারই মনের অসৎভাব তোমার সৎ-স্বরূপকে বুঝতে দিচ্ছে না। আমার মনের অন্ধকারই তোমার জ্যোতির্লোকের সন্ধান আমার কাছে গোপন ক'রে রেখেছে। আমারই সংসার-সমুদ্রের সুখ-দুঃখের মরণোর্মিমালা জগৎ-সংসারের শান্তরূপ অমৃতরূপ আমাকে প্রত্যক্ষ করতে দিচ্ছে না। এ থেকে তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর। তোমার প্রকাশেই পরিত্রাণ। হে স্বপ্রকাশ! আমার দৃষ্টিতে—আমার বুদ্ধিতে—আমার চৈতন্যে প্রকাশিত হও! অসৎ থেকে সৎ-এ, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে পৌছিবার জন্য অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা অন্তর্যামীর কাছে গোপন থাকতে পারে না। তিনি কলুষকে পুণ্য করেন,—অগতিকে গতি দান করেন। তুলসীরামায়ণে পার্বতীর ক্ষেত্রে এর প্রমাণ একবার আমরা পেয়েছি। পক্ষীরাজ গরুড় ও কাক ভূষণ্ডীর কাহিনীও এরই অপর এক দৃষ্টান্তস্থল।

সন্দেহভঞ্জনার্থে গরুড়ের নারদের নিকট গমন

দেবর্ষি নারদ ও পক্ষীরাজ গরুড় দু'জনেই বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুলোকের অধিবাসী। তাছাড়া নারদই গরুড়কে, নাগপাশ-বন্ধন থেকে রামচন্দ্রকে মুক্ত করতে পাঠিয়েছিলেন। কাজেই, সন্দেহ-নিরসনের জন্য গরুড়ের পক্ষে প্রথমেই নারদের নিকট যাওয়াই স্বাভাবিক।

ব্যাকুল গয়উ দেবরিষি পাহীঁ।
কহেসী জো সংসয় নিজ মন মাহীঁ॥
সুনি নারদহিঁ লাগি অতি দয়া।
সুনু খগ প্রবল রাম কৈ মায়া॥

গরুড় ব্যাকুল হয়ে দেবর্ষি নারদের কাছে গিয়ে নিজ মনের সংশয়-সন্দেহের কথা বলল। কথা শুনে নারদের বড় দয়া হ'ল। তিনি বললেন, শোন গরুড়, রামের মায়া প্রবল।

জো জ্ঞানিনহ কর চিত অপহরঈ।
বরি আঈঁ বিমোহমন করঈ॥
জেহি বহুবার নচাবা মোহী।
সোই ব্যাপী বিহঙ্গপতি তোহী॥

যে মায়া জ্ঞানীগণের চিত্ত অপহরণ করে, জোর করেই মনকে বিমোহিত ক'রে থাকে, যে মায়া বহুবার আমাকেও নাচিয়েছে, হে বিহঙ্গপতি! সেই মায়াই তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

মহামোহ উপজা উর তোরে।
মিটহি ন বেগি কহে খগ মোরে॥
চতুরানন পহিঁ জাহু খগেসা।
সোই করেহু জো দেহিঁ দিনেসা॥

তোমার হৃদয়ে মহামোহ উপস্থিত হয়েছে। আমার কথায় তোমার সন্দেহ মিটবে না, হে খগেশ, তুমি চতুর্মুখ ব্রহ্মার কাছে যাও, আর তিনি যেমন বলবেন তেমনি কাজ কোরো।

এখানে গরুড়কে "খগেসা" অর্থাৎ পক্ষীরাজ বলা হয়েছে। নারদের প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকলেও, নারদ বিলক্ষণ বুঝেছিলেন যে আসল যে রোগ তার উপযুক্ত বিধান, স্বয়ং বিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গরুড় কখনও তার মত একজন নররূপধারী অতি-পরিচিতের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে পারবে না। তাই দেখা যায়, নারদ এ বিষয়ে নিজে আর কিছু না ব'লে তাকে সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ-দেবতা ব্রহ্মার কাছে যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন। অনুরূপ কারণেই বোধহয় মহর্ষি ব্যাস আপন পুত্র আজন্ম-ব্রহ্মচারী শুককে নিজে তত্ত্বোপদেশ না ক'রে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য রাজর্ষি জনকের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

অসকহি চলে দেবরিষি করত রামগুণগান।
হরিমায়া-বল বরনত পুনি পুনি পরম সুজান॥

এরূপ ব'লে পরম চতুর দেবর্ষি পুনঃপুনঃ শ্রীহরির মায়ার প্রভাব বর্ণনা করত রামগুণগান করতে করতে প্রস্থান করলেন।

কথা আছে—যেই জন কৃষ্ণভজে সে বড় চতুর। এখানে তুলসীও নারদকে "পরম সুজান" অর্থাৎ পরম চতুর বলেছেন। মনে হয়, এদ্বারা তুলসী একদিকে নারদের বিশ্বাস-ভক্তির এবং সেই সঙ্গে অন্যদিকে স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী যতটুকু মাত্র বলা দরকার ততটুকু বলেই কালবিলম্ব না ক'রে আপন পুরুষার্থসাধনে তাঁর তৎপরতার উল্লেখ ক'রে প্রকৃত ভক্তসুলভ চাতুর্যেরই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

ব্রহ্মা-গরুড়-সংবাদ

তব খগপতি বিরঞ্চি পহিঁ গয়উ।
নিজ সন্দেহ সুনাবত ভয়উ॥
সুনি বিরঞ্চি রামহি সিরু নাবা।
সমুঝি প্রতাপ প্রেম উর ছাবা॥

অতঃপর গরুড় ব্রহ্মার কাছে গিয়ে আপন সন্দেহের কথা শুনাল। ব্রহ্মা সকল কথা শুনে রামের উদ্দেশ্যে মাথা নত করলেন। রামের শক্তির কথা উপলব্ধি ক'রে তাঁর অন্তর প্রেমে পূর্ণ হ'ল।

মন মহুঁ করই বিচার বিধাতা।
মায়াবস কবি কোবিদ জ্ঞাতা॥
হরিমায়া কর অমিত প্রভাবা।
বিপুল বার জেহি মোহি নচাবা॥

বিধাতা মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—কবি, পণ্ডিত, জ্ঞানী সকলেই মায়ার বশ। হরির মায়ার কি অমিত প্রভাব! এ মায়া বহুবার আমাকেও নাচিয়েছে।

তব বোলে বিধি গিরা সুহাঈ।
জান মহেস রাম-প্রভুতাঈ॥
বৈনতেয় শঙ্কর পহিঁ জাহূ।
তাত অনত পুছহু জনি কাহূ॥
তহঁ হোইহি তব সংসয়-হানী।
চলেউ বিহঙ্গ সুনত বিধিবাণী॥

পরে, ব্রহ্মা মিষ্টকথায় গরুড়কে বললেন,— মহেশ্বরই রামের শক্তির কথা জানেন। হে বিনতানন্দন, তুমি শঙ্করের কাছে যাও। হে পুত্র! অন্য কাউকেই আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না। সেখানেই [শঙ্করের নিকটেই] তোমার সকল সংশয় ছিন্ন হবে। ব্রহ্মার কথা শুনে গরুড় আবার চলতে আরম্ভ করল।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। ব্রহ্মার সাথে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত গরুড়কে "খগপতি" অর্থাৎ পক্ষীরাজ ব'লে আখ্যাত করা

হয়েছে। কিন্তু এখন ব্রহ্মা তাকে গরুড় অথবা খগপতি না ব'লে, "বৈনতেয়" অর্থাৎ বিনতানন্দন এবং পরক্ষণে "তাত" অর্থাৎ পুত্র ব'লে সম্বোধন করছেন। কাজেই, গরুড়ের আন্তরিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় তার কাতরতা ও সশ্রদ্ধ ব্যবহারে ব্রহ্মা যে তার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হয়েছেন এবং তাকে নিজজন ব'লে মনে করছেন এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায়। আর সেই কারণেই, তাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বলছেন—অনত পূছহু জনি কাহূ—একমাত্র শঙ্কর ছাড়া, আর কাউকেই কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। "আপন ভজন-কথা না কহিবে যথাতথা"। আমরা পূর্বে দেখেছি,—দেবর্ষি নারদ গরুড়ের নিকট ব্রহ্মাকে "চতুরানন" ব'লে অভিহিত করেছিলেন। বোধহয় একথার ইঙ্গিত এই যে এদ্বারা তিনি গরুড়কে বলতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর মাত্র একটি মুখ, একমুখে তিনি আর কত বলতে পারবেন। ব্রহ্মার চারটি মুখ, চার মুখে চারিদিক দেখে শুনে, তিনি তাঁর চাইতে ভালভাবেই তাকে তত্ত্বোপদেশ দিতে পারবেন। এখন ব্রহ্মাকে "বিধি" এবং তার কথাকে "বিধিবাণী" বলা দ্বারা যেন আবার ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে যে,—বিধি সদয় হয়ে যা বললেন, সে সবই বিধিবাণী—বৈধীবাণী—অর্থাৎ লিপিবদ্ধ শাস্ত্রবাক্য অথবা বেদবাক্য। আর অতঃপর গরুড়কে শিবের কাছে যেতে বলার তাৎপর্য এই মনে হয় যে, শাস্ত্রকে অতিক্রম ক'রে, সাধারণ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন ক'রে কিছু বলবার বা করার সামর্থ্য স্বয়ং বিধাতারও নেই। একমাত্র শিবই —যিনি বেদান্তজ্ঞানের—অদ্বৈততত্ত্বের প্রতীক, তাঁর শরণাপন্ন হওয়া অর্থাৎ অদ্বৈতভূমিতে উপনীত হওয়া ভিন্ন জাগতিক কার্য-কারণ-সংস্কার-মুক্তি,—সকল সংশয়-সন্দেহের একান্ত নিরসন কোন মতেই সম্ভব নয়।

গরুড়ের শিবলোকে গমন, শিবকর্তৃক সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যবর্ণন

সুবুদ্ধি গরুড় শিক্ষাগুরু ব্রহ্মার সুপরামর্শ শিরোধার্য ক'রে পরমগুরু শিবের উদ্দেশ্যে শিবলোক অভিমুখে যাত্রা করল। কিন্তু শিবলোক পর্যন্ত আর যেতে হ'লনা; ব্যথিত হৃদয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই পথের মধ্যেই শিবের সাথে দেখা হয়ে গেল। তুলসী বলছেন—পার্বতীকে কৈলাসে রেখে শিব একাই যাচ্ছিলেন কুবেরের সাথে দেখা করতে, এমন সময় হঠাৎ পথে গরুড়ের সাথে দেখা। এইভাবে, শিবের সাথে এইরূপ অপ্রত্যাশিত মিলনের কথায় প্রকারান্তরে শাস্ত্রোক্ত সুদুর্লভ শাম্ভবী দীক্ষারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কিনা কে জানে? যা হোক, শিবের দর্শন পেয়ে গরুড় আনন্দে তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল এবং তাঁকে আপন সন্দেহের কথা আনুপূর্বিক নিবেদন করল। কথাপ্রসঙ্গে একথা উল্লেখ ক'রে শিব পার্বতীকে বলছেন—পার্বতি, তার বিনয়পূর্ণ মিষ্টকথা শুনে আদর ক'রে তাকে বললাম—

মিলেহু গরুড় মারগ মহঁ মোহী।
কবনভাঁতি সমুঝবউঁ তোহী॥
তবহিঁ হোই সব সংসয় ভঙ্গা।
জব বহুকাল করিয় সতসঙ্গা॥

গরুড়, পথের মাঝে তোমার সাথে দেখা হ'ল। এখন তোমাকে সব কথা কেমন ক'রে বুঝিয়ে বলি, বল দেখি? [তবে একটা কথা তোমায় বলছি] তুমি যখন দীর্ঘকাল সৎসঙ্গ করবে, তখন তোমার সকল সংশয় দূর হবে।

দেখা যায়, বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক পার হয়ে গরুড় আজ শিবলোকে শিবের সন্নিধানে উপস্থিত। নারদের মত ভক্তের যে সঙ্গলাভ করেছে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আশীর্বাদ পেয়েছে, শিবদর্শনও হয়েছে, এ হেন গরুড়কেও যখন শিব বলছেন—সকল সংশয় ছিন্ন করতে চাও ত বহুকাল সাধুসঙ্গ করতে হবে; তখন আর অন্যে কা কথা। (ক্রমশঃ)

কর্ম ও সংস্কার

শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

সংস্কার জিনিসটা একটু বিশদভাবে বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

উচ্চাবচ যে কোন ভাবই মনে উঠুক না কেন, উহা চিরকালের মত মানুষের মস্তিষ্কে একটি দাগ এঁকে যায়। এ ভাবে ভালমন্দ দু' রকম ভাবের দু'রকম দাগের সমষ্টির স্বল্পতা বা আধিক্য নিয়েই মানব-চরিত্র গঠিত হয় এবং কেউ ভাল লোক, কেউ মন্দ লোক ব'লে গণ্য হয়। আবার এই ভাল আর মন্দ ভাব শুধু মস্তিষ্কে দাগ এঁকেই ক্ষান্ত হয় না; ভবিষ্যতে ভাল মন্দ কর্মে পুনরায় প্রবৃত্ত করার মত সূক্ষ্ম প্রেরণাশক্তিতে পরিণত হ'য়ে মেরুচক্রের এক স্থানে চিরাবস্থান করে। জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত এই সব সূক্ষ্ম শক্তিই সংস্কার বা পূর্বজন্মের সংস্কার ব'লে কথিত হয়। এই জন্মান্তরীণ সংস্কারই প্রারব্ধরূপে জীবকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করায়। দেহ থেকে দেহান্তরে যাবার সময় জীব ঐ সংস্কারের পুঁটুলিটিকে বগলদাবা ক'রে নিয়ে যায় এবং নূতন দেহে প্রারব্ধ অনুযায়ী তাহা ভোগ করে।

এই কর্মসংস্কার বা বাসনাবীজ ত্রিবিধ—সঞ্চিত, ভবিষ্যৎ আর প্রারব্ধ—ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। এরাই মুক্তির অন্তরায়

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন:

ঈশ্বরীয় কথা শুনে রাখা ভাল; শুনতে শুনতে বিষয়-বাসনা ও সংসারাসক্তি একটু একটু ক'রে কমে, সংস্কারের বীজ সৃষ্টি হয়—যেমন একটু একটু চালুনির জল খেলে মদের নেশা একটু একটু ক'রে কমে।

আগের জন্মে কর্ম করা থাকলে পরজন্মে সহজ হ'য়ে যায়। যার সংস্কার আছে, সহজেই তার বিবেক-বৈরাগ্য হয়—সাধনার পথ সুগম হয়। সময় না হ'লে আবার হয় না।

ঈশ্বরের উপর টানও তেমনি আধার বিশেষে হয়, সংস্কার থাকলে হয়। তাই, তাঁকে লাভ করতে হ'লে সংস্কার দরকার। একটু কিছু ক'রে থাকা চাই। তপস্যা। তা এ জন্মেই হোক, আর পূর্বজন্মেই হোক।

দ্রৌপদীর যখন বস্ত্র হরণ করছিল, তার ব্যাকুল ক্রন্দন শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন; দিয়ে বললেন—'তুমি যদি কখনো কারুকে বস্ত্রদান ক'রে থাকো, তবে লজ্জানিবারণ হবে। মনে ক'রে দেখ তো!' দ্রৌপদী বললেন—'হাঁ, মনে পড়েছে। একজন ঋষি স্নান করছিলেন—তাঁর কপ্‌নি ভেসে গিছলো। আমি নিজের কাপড়ের আধখানা ছিঁড়ে তাঁকে দিছিলাম।' ঠাকুর বললেন—'তবে তোমার ভয় নাই।'

এখানে অনেক ছোকরা আসে—কিন্তু কেউ কেউ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে। গোপাল সেন ব'লে একটি ছেলে বরানগর থেকে আসতো। পঞ্চবটী-তলায় একদিন তার ভাব হয়েছিল। ভাবে আমার পায়ে হাত দিয়ে বলে—'আমি তবে যাই। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না—আপনার অনেক দেরী—আমি যাই।' কিছুদিন পরে তার সঙ্গী গোবিন্দ এসে খবর দিলে গোপাল শরীর ত্যাগ ক'রে চলে গেছে।

সংস্কার-দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য ব'লে বোধ হয়। এটা না কাটাতে পারলে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আসে না। যাদের ব্যাকুলতা আছে, তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে। সংস্কার থাকলে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হয়।

কর্মফলই জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, আর সেই বন্ধনেই জীবের দেহ হয়। দেহের বন্ধন কাটলেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়! দেহরূপ বন্ধন কাটাতে গেলে মুক্তসঙ্গ হ'য়ে তদর্থ কর্ম করতে হয় (গীতা—৩।৯)। জনকাদি ঋষিগণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

কর্মই যদি বন্ধনের হেতু, আর সে বন্ধনেই যদি জীবের দেহ হয়, তবে কর্মত্যাগই কি নিঃশ্রেয়স লাভের সহজ পথ নয়?

কর্মত্যাগ কাকে বলে? গীতায় ভগবান সন্ন্যাস ও ত্যাগের স্বরূপের বিভিন্নতা বর্ণন প্রসঙ্গে বলেছেন—সন্ন্যাস হচ্ছে কামনামূলক কর্মের ত্যাগ—কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কোন কর্ম না করা; আর ত্যাগ হচ্ছে সর্ব কর্মের ফলত্যাগ করা। (১৮।২)

যাঁরা সাংখ্যমতাবলম্বী জ্ঞানী তাঁরা বলেন—কাম্য কর্মসমূহই ত্যাজ্য, কারণ তারা বিপথে নিয়ে যায়; কিন্তু যাঁরা যোগী তাঁরা বলেন, কর্ম করতে করতে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ হয়ে যখন চিত্তশুদ্ধি হবে, তখন কর্মত্যাগের কথা আসবে; সুতরাং যজ্ঞ, দান বা তপঃ কর্ম করাই দরকার। এই ত্যাগ সম্বন্ধে একটি মীমাংসিত তত্ত্ব ভগবান শোনাচ্ছেন গীতায় (১৮।৫ ৬):—

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥"

গীতা আরো বলেছেন—

"নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।" ৩।৮
"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥" ৫।১১

—তুমি শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্ম কর, কারণ কর্ম না করার চেয়ে কর্ম করা অনেক ভাল।

যোগিগণ ফলাসক্তি ত্যাগ ক'রে মমত্বভাবশূন্য হ'য়ে কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন।

তাই গীতা (১৮।৭) নিত্য কর্মের ত্যাগকে তামস ত্যাগ বলেছেন। মোক্ষসাধন অধ্যাত্মজ্ঞানে যতদিন না অধিকার হয় ততদিন কামনা ও আসক্তি ত্যাগ ক'রে কর্ম ক'রে যেতে হবে। কেউ কেউ ভাবেন যে, কর্ম করা হবে, অথচ আসক্তি থাকবে না, ফলের কামনা থাকবে না—এ তো নিরর্থক কষ্ট করা; —কাজ নাই, কর্মত্যাগই করা যাক। গীতা এ ত্যাগকে বলেন রাজস ত্যাগ (১৮।৮)। এতে বন্ধন যায় না; বরং বাঁধনটি বেশী শক্ত হয়।

যখন কর্তব্য-বোধে নিত্যকর্ম করা হচ্ছে, ইন্দ্রিয়গণের কাজ আপনা-আপনি হ'য়ে যাচ্ছে, 'আমি করছি' এ অভিমানও নাই, ফলাকাঙ্ক্ষাও নাই—তখনই সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়। ইহাই প্রকৃত কর্মত্যাগ। (১৮।৯) এরূপ সাত্ত্বিক কর্মত্যাগী কর্মফল—বৈরাগ্যের ফলে মেধাবী (আত্মসাক্ষাৎকাররূপ মেধাযুক্ত) ও ছিন্নসংশয় (অজ্ঞানজাত সংশয়শূন্য) হ'য়ে কুশল কর্মেও আসক্ত হন না, অকুশল কর্মেও বিরক্ত হন না; কারণ তাঁর বুদ্ধি তখন আত্মায় স্থিত হ'য়ে তিনি স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করেন (১৮।১০)।

কর্মে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে যাঁরা কর্ম করেন, তাঁদের চিত্তশুদ্ধি হ'লে পরে আত্মজ্ঞান লাভ হয় ও দেহে আত্মবুদ্ধি নাশ হয়; কিন্তু চিত্তশুদ্ধিলাভের পূর্বে তাঁদের যদি দেহত্যাগ হয় তা হ'লে তাঁদের কর্মফল যায় না, সুতরাং কর্মেরই অনুরূপ ফল হয়। কেউ বা পাপকর্ম ক'রে নরকে যায় বা পশুপক্ষী হ'য়ে জন্মায়; কেউ বা পুণ্য কর্ম ক'রে দেবযোনিতে জন্মায়; আর কেউ বা পাপ-পুণ্য মিশানো কর্ম ক'রে সুখদুঃখময় মানুষ দেহে জন্মায়। চিত্ত শুদ্ধ হ'লে পর

কর্মফল আর তাকে ছুঁতে পারে না—কারণ সে অবস্থায় মোক্ষলাভ হয়। (গী-১৮।১২)। ভগবান বলেছেন (৬।১) কর্মফল আশ্রয় না ক'রে যিনি কর্তব্য কর্ম করেন তিনি সন্ন্যাসীও—যোগীও। তবে এ সন্ন্যাস গৌণ। এ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হবার আগে দেহত্যাগ হ'লে পূর্বজন্মার্জিত ত্রিবিধ কর্মের ফল অবশ্য হবে।

গীতানির্দিষ্ট কর্মযোগ বড় কঠিন। তার প্রথম পর্যায় হচ্ছে কর্মদ্বারা নিজকে তৈরী ক'রে তাঁকে লাভ করা। তার পরের পর্যায় হচ্ছে প্রত্যাদিষ্ট হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রদর্শিত অসীম নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার সঙ্গে লোক-শিক্ষা ও লোকসেবার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতির চরম উদ্বেলতার মধ্যেও ধীর, স্থির, হ'য়ে কর্ম করা—যার দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণদাস পালকে বলেছিলেন—'তুমি জগতের দুঃখ নাশ করবে? জগৎ কি এত-টুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় যেমন কাঁকড়া হয়, তেমনি অসংখ্য জগৎ আছে। আগে তাঁকে লাভ করো। তারপর যা হয় কোরো।'

কর্মযোগ কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: 'কর্মযোগ হচ্ছে কর্মের মাধ্যমে ভগবানে যোগ—কর্মের দ্বারা যোগ। যোগটাই প্রধান কথা। তাঁরি কর্ম কচ্ছি মনে ক'রে কর্মদ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণাদি কর্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হ'য়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে, তাঁতে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম করে—সেও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা-জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।

শাস্ত্রে যে সব কর্ম করতে বলেছে কলি-কালে করা বড় কঠিন। একে অন্নগত প্রাণ আবার আয়ু কম। বেশী কর্ম বিধি অনুসারে করবার সময় নাই। বেশী দেরী সয় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়; আর রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, আর কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া, এইসব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

কিন্তু কর্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নাই। তুমি ইচ্ছা কর আর না-ই কর, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে কর্ম করাবে। তাই অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করতে বলেছে অর্থাৎ কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না। যেমন—পূজা, জপ, তপ করছো, কিন্তু লোকমান্য হবার বা পুণ্যের জন্য নয়। প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য গুরুর উপদেশমত অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করবে; আপনাকে অকর্তা জেনে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে কাজ করবে। সাধন'র অবস্থায় গুরুর উপদেশ সর্বদা প্রয়োজন।

এই অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করার নামই কর্মযোগ। ভারী কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়; মনে করছি অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায় জানতে দেয় না। ঈশ্বরদর্শন না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনাসক্ত হওয়া সম্ভব নয়। গৃহস্থ বা অন্যান্য আশ্রমী যদি নিষ্কাম কর্ম করতে পারে তবে তাদের কর্মের দ্বারা যোগ হয়। এই কর্মযোগ ঈশ্বরলাভের একটা পথ।

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এসব আশ্রমে কর্মের দ্বারা যোগ হয়। সন্ন্যাসী কাম্যকর্ম ত্যাগ করবে কিন্তু নিত্যকর্ম কামনাশূন্য হ'য়ে

করবে। যে যে কর্মই করুক ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে, কামনাশূন্য হ'য়ে করতে পারলে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়। কর্মযোগে কতকগুলি শক্তি হয় —সিদ্ধাই হয়।

মোদ্দা কথা গুরুর আদেশ- ও উপদেশ-মত পূজাজপাদি, জীবসেবা, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি কর্ম করার নাম কর্মযোগ। জনকাদি যে কর্ম করতেন তার নামও কর্মযোগ। আর অনাসক্ত হ'য়ে আত্মপর ভেদে সকলের সেবা। জগদ্বাসী সকলেই সমান, তবে যাদের সঙ্গে সর্বদা আছি, তারা আগে সেবাটা পায়—বেছে নয়, কাছে আছে ব'লে।

কর্মকাণ্ড হচ্ছে আদিকাণ্ড। বিষয়কর্মে, ভোগৈশ্বর্যে আসক্তি থাকলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না; রজোগুণের বৃদ্ধি হয়—কাজের আড়ম্বর হয়। রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়—কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া—এই সব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। কাজেই কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম একটা উপায়—উদ্দেশ্য নয়। তাই কর্মকে আদিকাণ্ড বলেছে।

সাধন করতে করতে এগিয়ে পড়লে শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু—বস্তুলাভের জন্য আদিতে কর্ম করতে হয়।

প্রথম প্রথম কর্মের খুব হৈচৈ থাকে। যত ঈশ্বরের পথে এগুবে, ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দেবেন। তাঁর উপর যত ভালবাসা আসবে ততই অন্য কর্ম কমে যাবে।

লোকমান্য, বিদ্যা, সালিসি, মোড়লি, এসব যেন ছেলের হাতে লালচুষি। মা এ দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। চুষি ফেলে চীৎকার ক'রে না কাঁদলে মা আসবেন না। মা ভাবছেন ছেলে আমার চুষি নিয়ে (মোড়ল হয়ে) বেশ আছে। আছে তো থাক।

এ মায়েরই খেলা—বদ্ধ ক'রে রাখার জন্য। চোর চোর খেলা দেখ নাই? বুড়ী চায় না যে সবাই তাকে ছুঁয়ে ফেলে; তা হ'লে খেলাটা চলে না। 'চুষি ফেলে চীৎকার' কাকে বলছি বুঝেছ? লোকমান্য, মোড়লি, সালিসি এ সব হচ্ছে লাল চুষি। আর ঐহিক কর্ম কমাবার দিকে ঝোঁক, আর তাঁর নামগুণ গান ও প্রার্থনা এ হচ্ছে চীৎকার করে কাঁদা।

তা ব'লে কর্তব্য কর্ম কি একেবারে ছেড়ে দেবে? তা নয়। সাধু কি দুঃস্থ সম্মুখে পড়লে তাদের সেবা করবে বৈ কি!

সংসারে কর্ম যতদিন ভোগ আছে করো। কিন্তু ভক্তি অনুরাগ নিয়ে তাঁর নামগুণ কীর্তন করো, কর্মক্ষয় হবে। যত তাঁতে শুদ্ধাভক্তি ভালবাসা হবে, ততই কর্ম কমবে।'

কর্মগুলি আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। যে কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, আসক্তি নাই, অনুরাগ- বা বিদ্বেষহীন হ'য়ে করা হচ্ছে—এ ভাবে নিত্যই যে সব যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম করা হয়, তাই সাত্ত্বিক কর্ম (গীতা ১৮।২৩)। যে কর্ম ফল পাবার জন্য এবং 'আমি কর্তা', 'আমি যেমন করছি এমন ক' জন করে'—এরূপ অহঙ্কারের সঙ্গে, বহু কষ্ট ক'রে করা হয়, তাই রাজস কর্ম (গীঃ ১৮।২৪)।

আর ভবিষ্যৎ না ভেবে, কতখানি শক্তি ও অর্থব্যয় প্রয়োজন না ভেবে কাজটা হিংসামূলক কিনা অথবা আমার চেষ্টাসাধ্য কিনা এসব না ভেবে, না বুঝে, বোকার মত যে কর্ম করা হয় তা-ই তামস কর্ম (গী ১৮।২৫)।

ভগবান আবার বলেছেন (গী ১৮।১৩-১৫)

—বেদান্তে কর্মে পাঁচটি কারণের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে :

(১) এই শরীর ; যাকে অজ্ঞ জীব 'আমি' ব'লে মনে করে ;

(২) 'আমি কর্তা' অভিমান ; এই অভিমানই বিশ্বব্যাপী পূর্ণ অখণ্ড আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করে ;

(৩) মন, বুদ্ধি ও দশটি ইন্দ্রিয়—এই মোট ১২টি করণ ;

(৪) প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর পৃথক্ চেষ্টা (পৃথক্ পৃথক্ প্রাণাদির কার্য); অজ্ঞ জীবের এগুলিতেও 'আমার' বোধ যায় না ;

(৫) দৈব বা ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; যেমন চক্ষু আছে, কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য না থাকলে দেখা হয় না।

এই কারণগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টিই প্রবল যে 'আমি' (ব্রহ্ম) নিষ্ক্রিয়, তাতে মায়া ভেসে উঠে জগৎকার্য হয় ; জীবাত্মাতেও অবিদ্যা ভেসে উঠে তার দেহের কার্য হয়। জীব এই অবিদ্যার কার্য আত্মাতে আরোপ ক'রে 'আমি কর্তা' ব'লে মনে করে। ইন্দ্রিয়গুলো তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে কার্য করে। কিন্তু 'অহংকর্তৃত্ব' অভিমানই দৈবকার্য-পরম্পরাকে আত্মকর্ম ব'লে ভুল ধারণা করায়।

সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে কর্মের ভেদ হয় বলেই বর্ণাশ্রম-ধর্মে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের কর্মসকল স্বভাবজাত গুণের দ্বারা বিভক্ত হতো (গীতা ১৮।৪১-৪৮)।

সকল কর্মেরই শেষ ফল জ্ঞান এবং তার ফলই মুক্তি। পরমহংস শ্রীমূল চৈতন্য ভারতী বলেছেন—

"কষায়পঙ্‌ক্তিঃ কর্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্মভিঃ পকে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥"

—কর্ম কষায়কে (পাপকে) পরিপাক করে, আর জ্ঞানই পরম আশ্রয়স্থল ; কর্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ বিনষ্ট হ'লে তখন জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

যতক্ষণ মায়ার বশে থাকতে হয় ততক্ষণ কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বোধগম্য হয় না ; কিছুতেই এ কথা মনে আসে না যে আত্মাতে কর্মের একান্ত অভাব—আমি প্রবৃত্তিরও কর্তা নই, নিবৃত্তিরও কর্তা নই, আমি কর্ম করি এ বুদ্ধি ভ্রান্তিমাত্র। গীতা বলেছেন (৪।১৮), যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন, (অর্থাৎ যাঁর শরীর কর্ম করলেও আত্মা শান্ত ও নিষ্ক্রিয়-ভাবাপন্ন থাকে —যাঁর 'আমি করলাম' বুদ্ধি নষ্ট হয়েছে) সকল কর্মেই তাঁর আত্মার অকর্মতা লক্ষ্য হয়। আবার বিহিত বা নিষিদ্ধ কোন কর্ম না করাতেই অকর্ম হ'লো ব'লে যে মনে কচ্ছে, তার ঐ মনে-করারূপ অভিমানই বন্ধন এনে দেয় ব'লে অকর্মেও কর্ম হয়ে যায়। যিনি এ দৃষ্টিতে কর্মকে দেখেন তিনিই সূক্ষ্মবুদ্ধি জ্ঞানী ; তিনিই আত্মাতে যুক্ত, কারণ তিনি বিকর্মহীন এবং আত্মাকে অকর্তা জেনে কর্ম করার ফলে আত্মতৃপ্তি ও জ্ঞানের উদয় হেতু সকল কর্মের তত্ত্ব তাঁর বোধে আসে ব'লে তিনি কৃৎস্নকর্মকৃৎ (সার্থককর্মা)।

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী মুক্ত হন কেন ? কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা যখন থাকে না, তখন 'অহংকর্তৃত্ব' থাকে না, দেহেন্দ্রিয়াদি থেকে আত্মাকে যখন পৃথক্ ব'লে নিশ্চয় বোধ হয়, সে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের কাজ হ'লেও—কর্ম ক'রেও কোন কর্ম করা হয় না (তার ফলে কর্মবন্ধন হয় না)। নিষ্কাম, সকলপ্রকার ভোগ্যবস্তুত্যাগী, সংযত-অন্তর্বহিঃকরণ—জ্ঞানীর শরীর ধারণোপযোগী কর্মের জন্য তিনি কোনরূপ অনিষ্টের (পাপপুণ্যাদির) ভাগী হন না—তাঁর সমস্ত কর্মই লয়প্রাপ্ত হয় (গীতা ৪।২০-২২)।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন :

সংসার-কর্মভূমিতে কর্ম করতেই আসা। যেমন দেশে বাড়ী, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে। শরীররক্ষার জন্য এবং নিজ নিজ প্রকৃতির বশেও কর্ম করতে বাধ্য হয়; জ্ঞানলাভের জন্যও কর্ম করতে হয়; আবার কারু বা আদেশ পেয়ে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে কর্ম করতে হয়।

কর্ম ভাল। জমি পাট করা হ'য়ে গেলে যা রুইবে তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

কেউ বলে, 'সংসারের কর্ম কর্তব্য—এ কর্ম ত্যাগ করলে হবে না।' কিন্তু ঈশ্বরকে জানবার জন্য যেসব কর্ম তাই ক'রে উঠতে পারা যায় না—আবার অন্য কর্ম। করতে পারলে ভাল। কিন্তু কর্মকাণ্ড বড় কঠিন। নিষ্কাম হ'য়ে করা চাই। তবে সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার করতেই হবে; তা ছাড়া নিত্যকর্ম—ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নামগুণগান, এ সব করতে হবে। আর কেঁদে কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ঐ কর্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। বলবে—'হে ঠাকুর, আমার বিষয়-কর্ম কমিয়ে দাও; কেননা ঠাকুর, দেখছি বেশী কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। মনে করছি নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে। হয়ত দান, সদাব্রত করতে গিয়ে লোকমান্য হ'তে হচ্ছা হ'য়ে পড়ে।'

হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তাঘাট, পুকুর—এ সব কর্ম খুঁজে না বেড়িয়ে যেটা সম্মুখে পড়লো, না করলে নয়, সেটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হবে। ইচ্ছে ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়—তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে গিয়ে দানই করতে লাগলো, কালীদর্শন আর হলো না। আগে যো সো ক'রে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালী দর্শন ক'রে তার পর যত খুশি দান কর না।

তাই বলছি, এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাকো, আর এক হাতে কর্ম করো। কামনা-শূন্য হ'য়ে কর্ম করতে চেষ্টা করলে শেষে শুদ্ধসত্ত্ব-গুণ লাভ হয়। রজো মিশানো সত্ত্বগুণ থাকলে ক্রমে নানাদিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার করবো এইসব অভিমান এসে জোটে। কামনা-শূন্য কর্ম খুব ভাল। কিন্তু বড় কঠিন; সকলে পারে না। নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়। ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়।

কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে দেখলুম, একজন পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর হাতে তুলে এক এক বার দেখছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না—কর্ম না করলে ভক্তিলাভ হয় না; ঈশ্বরদর্শন হয় না। ধ্যান, জপ, তাঁর নামগুণকীর্তনও কর্ম আবার দান, যজ্ঞ, তপঃ এ সবও কর্ম। মাখন চাইলে দই পেতে মন্থন করতে হয়; মাছ চাইলে চার ক'রে ছিপ ফেলতে হয়। তাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম কর—বসে থাকলে হবে না। ব্যাকুল হয়ে কাঁদ—তাঁর জন্য পাগল হও। লোকে না হয় বলুক যে অমুক ঈশ্বরের জন্য পাগল হ'য়ে গেছে।

কিছু কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়া-তাড়ি কর্মগুলি শেষ ক'রে নিতে হয়। কর্ম যে বরাবরই করতে হয় তা নয়। ঈশ্বরলাভ হ'লে আর কর্ম থাকে না। ফল হ'লে ফুল আপনিই ঝরে যায়।

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমের মধ্যে প্রথম তিনটিতে কর্ম করতে হয়। গৃহস্থ ও অন্যান্য আশ্রমী যদি নিষ্কাম কর্ম

করতে পারে, তা হ'লে ঈশ্বরলাভ হ'তে পারে।

যতদিন ভোগের আশা আছে, ততদিন সকাম কর্ম থাকবে।

শ্রীশ্রীসারদাদেবী বলেছেন: কর্ম করা প্রয়োজন। কর্মই কর্মের বন্ধন কাটে, আর নিষ্কাম ভাব আসে। তাই একদণ্ডও কর্ম ছেড়ে থাকবে না। কাজে মন ভাল থাকে-বাজে চিন্তা আসে না। সেজন্যই নরেন নিষ্কাম কর্মের পত্তন করেছিল। বসে থাকলে মন অশুদ্ধ হয়—শুচিবাই বেড়ে যায়।

মহেশ্বর

(গান)

আনন্দ

পরমেশ্বর শান্ত মহেশ বসিয়াছে যোগাসনে
রজতশিখর-শুভ্র অঙ্গ স্থির নিশ্চল ধ্যানে॥
বাসনায় গড়া সপ্ত ভুবনে শ্মশান করেছে জ্ঞানের আগুনে
তাহারি ভস্ম মাখিয়া অঙ্গে মগ্ন হয়েছে ধ্যানে॥
চরণে নমিছে দেবদেবী শত, কুবের এনেছে বৈভব কত,
আত্মানন্দে বিভোর ভিখারী চাহে না কাহারো পানে॥
স্তিমিত নয়ন খোলে সে যখন প্রেমের তুফানে ভাসায় ভুবন,
করুণায় ভরা স্মিত হাস্যে চাহে সে ভকত পানে।
হৃদয়ে নাচে যে জননী তারা, জটায় গঙ্গা পাগল-পারা
ধরণীর জ্বালা ধুয়ে ধুয়ে দিতে ঝ'রে পড়ে কলতানে॥

বিজ্ঞানের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ কে? কেন তাঁর এ নরদেহ-ধারণ? কি ছিল তাঁর মিশন কি-বা তাঁর মেসেজ (message)? এ-প্রশ্ন তুলেছিলেন তৎকালীন যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীরা, পরম-নিরিখ না ক'রে যাঁরা কোন কিছুর সত্যতা স্বীকার করতে রাজী নন, যাঁরা জড়বিজ্ঞানের স্থূল প্রমাণ ভিন্ন কোন জিনিসকে সত্যসিদ্ধ ব'লে মানেন না। বর্তমান বিজ্ঞান-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রোঁমা রোলার কথায়: "Ramakrishna was the consummation of two thousand years of spirituality of three hundred million people." ত্রিশ কোটি মানুষের দুই সহস্র বৎসরের অধ্যাত্মসাধনার পূর্ণ অভিব্যক্তি হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রদত্ত "My Master" শীর্ষক অভিভাষণে এ কথাটা আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের বস্তুপ্রধান ভোগবাদ আর অধ্যাত্মবাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন স্বামীজী:

"Man act on two planes, the spiritual and the material. Waves of adjustment come on both planes. On the one side, of the adjustment on the material plane, Europe has mainly been the basis during modern times; and of the adjustment on the other, the spiritual plane, Asia has been the basis throughout the history of the world. Today man requires one more adjustment on the spiritual plane; today when material ideas are at the height of glory and power, today when man is likely to forget his divine nature through his growing dependence on matter, and is likely to be reduced to a mere money-making machine, another adjustment is necessary—absolutely necessary." মানুষ যেন অর্থোৎপাদক যন্ত্রবিশেষ। এই শোচনীয় পরিণতি হতে মানুষের মুক্তির জন্যই চাই নূতন সাযুজ্য। পাশ্চাত্যের বস্তু-ভোগ্য জীবন আর প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ, এ দুয়ের সামঞ্জস্যে মানুষকে পূর্ণতায় ও সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত করার মহান মিশনই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাবের নিগূঢ় রহস্য। তাই তাঁর কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল প্রেমের বাণী, সাম্য, সামঞ্জস্য ও মানবিকতার বাণী। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "Religion can be given and taken more tangibly, more realistically than any material object. Religion is not talk, or doctrines or theories; nor is it sectarianism. Religion cannot live in sects and societies. It is the relation between soul and God." রামকৃষ্ণ সকল তুচ্ছ আচার-বিচারের ঊর্ধ্বে, সকল সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি ছাড়িয়ে, এক মহান উদার অনুভব ও উপলব্ধির আকাশে তুলে ধরলেন ধর্মকে। শ্রীরামকৃষ্ণই আবার ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিলেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যায়। সংসারকে বলা হয় সমুদ্র। এ সমুদ্রে নিশ্ছিদ্র নৌকার মত ভাসতে হবে মানুষকে। নৌকার ভিতর জল ঢুকলে নৌকার বিপদ। সংসারে থেকেও সংসারে যে আচ্ছন্ন ও

অভিভূত না হয় তার পক্ষেই সংসারসমুদ্র পাড়ি দেওয়া সম্ভব, নচেৎ ডুবে যেতে হবে। ঈশ্বরচিন্তা মানুষের রক্ষাকবচ। ঈশ্বরচিন্তারূপ তেল হাতে মেখে সংসারের আঠা, অর্থাৎ গ্লানি-কলুষ মায়া বন্ধন ইত্যাদিতে আবদ্ধ না হয়ে সংসারের কর্তব্য পালন করতে হবে। এমন সহজ স্বচ্ছ কথায় ধর্ম ও দর্শনকে সর্বজনবোধগম্য করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'ক'-এ কৃষ্ণ, 'হ'-এ হরি। যেখানে সত্য প্রকট, যেখানে জ্ঞান উপলব্ধিজাত, সেখানে অলঙ্কার ও ভাষাচাতুর্য নিষ্প্রয়োজন। নিরলঙ্কার নির্ভেজাল কথাই সেখানে যথেষ্ট। সত্য ও সত্যসুন্দর ঈশ্বর যে সোজা ও সরল পথেই চলেন।

পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী সন্দেহাকুল যুবক নরেন্দ্রনাথও সত্যকে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন যুক্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কঠিন কষ্টিপাথরে। সাধু, সন্ত, জ্ঞানী ও গুণী মানুষমাত্রের কাছেই জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথের এক প্রশ্ন: ঈশ্বর কি কেবল তত্ত্বসিদ্ধ, ঈশ্বর কি প্রত্যক্ষগোচর নন? এ যেন অধ্যাত্ম-উপলব্ধির প্রতি বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ—প্রাচ্যের কাছে পাশ্চাত্যের সদম্ভ জিজ্ঞাসা। জনেজনের কাছে কাছে জিজ্ঞাসা করা নরেন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মেলেনি কোথাও। এ প্রশ্নের সরাসরি অকপট উত্তর একমাত্র তিনিই দিতে পারেন, যিনি পেয়েছেন সাক্ষাৎ দর্শন, যাঁর ঘটেছে অন্তরোপলব্ধি, যাঁর বিশ্বাসে ও তপস্যায় মৃন্ময়ী পাষাণী হয়েছেন প্রত্যক্ষীভূতা লীলাময়ী এবং চিন্ময়ী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিত নির্দ্বিধায় বলেছিলেন, হ্যাঁ ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দেখেছি যেমন তোমাকে দেখছি তার চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে দেখেছি। তোমাকেও দেখাতে পারি। স্তম্ভিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্যবিদ্যাপারঙ্গম সংশয়াবিষ্ট নবভারতের প্রতিভূ যুবক নরেন্দ্রনাথ। এ জিজ্ঞাসা অন্তর্দর্শনের নিকট বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা। এ উত্তর সংশয়ের প্রতি সত্যোপলব্ধির উত্তর। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী কালের বিজ্ঞান-প্রভাবিত মানুষের এক জটিলতম সংশয়ের নিরসন ঘটিয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

সেদিনের বাংলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌গণ একের পর এক পরখ করতে চেয়েছেন এই আপার. অদ্ভুত মানুষটিকে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচারের মাপকাঠি দিয়ে। কিন্তু এ অতলান্তিকের তল কেউই নিরূপণ করতে পারেন নি। লবণের পুতুল লবণসমুদ্র মাপতে এসে লবণজলে গলে গেল। এই সহজ সরল সত্যদ্রষ্টা মানুষটির কাছে সকলকেই পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে। সহস্র বৎসরের বন্ধ গুহার আঁধার যেমন একটিমাত্র দীপশিখার আলোকে অপসারিত হয়, তেমনি ছিন্ন হয়েছিল তাঁদের সংশয়জাল শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ, সরল কথায়। বিখ্যাত বাগ্মী ও প্রচারক ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলরকে লিখেছিলেন: কে এই রামকৃষ্ণ? এমন কী জিনিস তার মধ্যে আছে? এঁর কথায় ব্যক্ত হয় সকল শাস্ত্রের সার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্মল নির্যাস। এঁর কাছে এলে পাই দেব-সত্তার পবিত্র স্পর্শ। ইনি প্রায় নিরক্ষর হয়েও সকল জ্ঞানের সারাৎসার

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন লোকশিক্ষার জন্য। তাঁর বাণী সরল, সুন্দর, অমৃতময়। ভারত-হিতৈষী, রামমোহন-বন্ধু উইলিয়ম ডিগবি বলেন রামকৃষ্ণ-বাণী মুখের কথামাত্র নয়—"Ramakrishna spoke as no other man of his age spoke, and revealed God to the weary hearts."

A heart speaking to a heart. হৃদয়ে হৃদয়ে বাণী-বিনিময়। হৃদয়ে হৃদয় অনুভব। ঠাকুরের কাছে এসেছেন বহুজন। ঠাকুর নিজেও গেছেন বহুজনের কাছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী, আচার্য শিবনাথ, গিরিশ চন্দ্র প্রমুখ অসংখ্য নামী ও অনামী মানুষের হয়েছে এই দুর্লভ দেবদর্শন। যেখানে আনন্দ-ময় ঠাকুর সেখানেই আনন্দের হাট। সেখানে যেন 'আনন্দেরই সাগর থেকে' এসেছে বান।

ঠাকুর কল্পতরু। চিত্তের বিক্ষোভ, মানসিক অশান্তি, জিজ্ঞাসা, প্রত্যাশা এমন কি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ – যে যা নিয়ে এসেছে ঠাকুরের কাছে কেউ বিরূপ হয়ে ফেরেনি। বিষয়ী, ব্যবসায়ী, সমাজপতি, সংস্কারক, সাহিত্যিক, সাধুসজ্জন, ধনী, নির্ধন, প্রবীণ, নবীন, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ছিল অবারিত দাবী ও নিশ্চিত অধিকার। যে রোগীর যে রোগ, নিপুণ চিকিৎসকের মত তিনি তাকে সে-ই ঔষধ দিতেন যোগীন মহারাজ শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির মানুষ—গুরুনিন্দায় ব্যথিত হয়েছেন। তাঁর পৌরুষকে ঘা মেরে জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁকে ধিক্কার দিয়ে ঠাকুর বললেন, গুরুনিন্দা শুনেও প্রতিবাদ কল্লিনে কেন? অনুরূপ ঘটনায় তেজস্বী নিরঞ্জনানন্দ ঠাকুরের নিন্দায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে গঙ্গাংক্ষে খেয়ানৌকা ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তা শুনে ঠাকুর নিরঞ্জনানন্দকে "ক্রোধ চণ্ডাল" বলে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বাক্-সিদ্ধ, বাণী-কণ্ঠ। মহাসমাধির পূব মুহূর্ত পর্যন্ত সে দেব-ক ছিল অফুরন্তবাঙ্ময়। মানুষ চেনার ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অদ্বিতীয় জহুরী। যাঁর বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে, জগৎজনচিত্তে আনবে শান্তি ও মুক্তির আশ্বাস—সে বাণীর যোগ্য বাহক-বিঘোষক চাই। জ্ঞানী, গুণী, ধনী ও প্রভাব-প্রতাপশালী কত মানুষই না এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে। তাঁদের কাউকে তিনি এ-কাজের জন্য বেছে নেন নি। বেছে নিয়েছেন জন কয় অনভিজ্ঞ, নিঃসম্বল, অজ্ঞাতনামা কিন্তু অপাপবিদ্ধ তাজা তরুণকে। নতুন মৃৎভাণ্ডেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে দুধ রাখা যায়! পুরনো হাঁড়িতে রাখলে কেটে যাবার ভয় থাকে। এই তপঃসিদ্ধ তরুণরা হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর যোগ্য ধারক ও ব্যাখ্যাতা। তাঁদের চাইতে যোগ্যতর আধার আর কেউ নয়।

স্বামী বিবেকা-ন্দের মতে ভারতে যে কোন নব জাগরণের পূর্বে ঘটেছে ও ঘটবে এক মহা ধর্মবিপ্লব। শ্রীঅরবিন্দও একথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন এযুগের এ-বিপ্লবের অগ্রদূত। রোঁমা রোলার ভাষায় "The Pilot of the age." এ তথ্য ইতিহাস-সিদ্ধ। বুদ্ধ, শঙ্কর চৈতন্য, শিখগুরুকুল, রামদাস শিবাজী, দক্ষিণ ভারতের রামানুজ, মধ্বাচার্য ও রামমোহন এঁরা প্রত্যেকেই হচ্ছেন নবজাগরণের উদ্গাতা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণে। ঐতিহাসিক সত্যই প্রমাণিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণে। অন্যেরা যদি শতদল পদ্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন সহস্রদল। নদী বহুমুখী ধারায় সমুদ্রগামী। এই সহজ সত্যটি-ই প্রমাণিত হল শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎসাধনায়। ধর্ম-সাধনার ধারা নানা-কালে, নানা দেশে ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বহুদিকগামী কিন্তু এক লক্ষ্যাভিমুখী। যে পথেই চল না কেন পথের শেষ এক ও অভিন্ন। এই নিগূঢ় তত্ত্বের অকাট্য, অভ্রান্ত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অদ্ভুত জীবনচর্যায়। জগতের যত ধর্মমত, যত বিশ্বাস, যত সাধনার ধারা শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান-সঙ্গমে মিলিত হল। চুম্বকের অনিবার্য

আকর্ষণের মতই তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ছুটে এসেছিল নানা সাধক, নানা ব্রতধারী। এসেছিলেন বাৎসল্য-সাধক জটাধারী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, বৈদান্তিক তোতাপুরী, সুফী দরবেশ গোবিন্দ রায়—শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক, সাকার ও নিরাকারবাদী, খৃষ্টান ও মুসলমান এবং আরও অনেকে। "হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।" কোন বিরোধ নয়, বিভেদ নয়, কোন সংঘাত নয়, সংঘর্ষ নয়। রামকৃষ্ণ সবাইকে মিলিত করালেন সত্য, শান্তি ও ঈশ্বরপ্রেমের মহাসমন্বয়ে। নব যুগের এ-ই ধর্ম। এ ধর্মে নাই বিবাদ, নাই বিচ্ছেদ। সমন্বয় ও শান্তির পথই মানুষের মুক্তির পথ, কল্যাণের পথ, রক্ষার পথ, বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ: "An advent, the like of which the world could not bear in another 500/1000 years." আগামী হাজার বছরেও ধরিত্রী মাতা এম্বিতর আর একটি জন্মভার বহনে অক্ষম। অন্ততঃ হাজার বছর রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পন্থা জগৎকে শান্তি ও কল্যাণের পথে চালিত করবে। হিংসাদ্বেষ ও ঘৃণা-জর্জরিত পৃথিবীর রক্ষার পথ শ্রীরামকৃষ্ণ। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পঞ্চশীল নীতির উদ্বোধন করেছিলেন তারই যুগোপযোগী নবরূপায়ণ "যত মত তত পথ।" ক্ষমা, তিতিক্ষা ও পরমতসহিষ্ণুতাই সংসারে শান্তির সূত্র। শুধু ধর্ম- ও অধ্যাত্ম-শিক্ষাই দেন নি শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর আদর্শ ও উপদেশের আকৃতি ইদানীন্তন অথচ চিরন্তন, নিত্যধর্মী অথচ বিশ্বজনীন। ঘরোয়া কথায় এমন সুন্দর ও সরস করে আর কোন কবি শাশ্বত সত্যকে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন?

স্বামীজীর নিঃসংশয় ঘোষণা: "In order that a nation may rise, it must have a high ideal. You have got that in the person of Shri Ramakrishna." উচ্চ আদর্শ ভিন্ন কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণই সে-আদর্শ, যা অবলম্বনে ভারত আবার জগৎ-সভায় সম্মানের আসন লাভ করতে পারে, এবং জগৎকে শান্তি মৈত্রী ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর আজ আশি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই কালের ব্যবধানে পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হয়েছে পর পর দুটি বিশ্বগ্রাসী মহাসমর, অভ্যুদয় ঘটেছে সাম্যবাদী বিপ্লবের, জন্মপরিগ্রহ করেছে প্রচণ্ড শক্তিধর রুশ ও চীন রাষ্ট্র, আবিষ্কৃত হয়েছে বিশ্বধ্বংসী আণবিক বোমা ও অশেষবিধ অমোঘ মারণাস্ত্র। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার হয়েছে অভাবনীয় অগ্রগতি। মানুষের ভাগ্যাকাশ আজ ধ্বংসের করাল ছায়ায় আবৃত। পৃথিবী যেন কোন 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে'। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় জড়বাদী মানুষের অপারগতা বর্তমান যুগের নির্মম ট্র্যাজেডি। তাই মানুষকে আজ আবার মুখ ফেরাতে হবে তার ধর্ম- ও মর্ম-গুরুদের দিকে যাঁদের ত্যাগতপোজ্জ্বল পবিত্র জীবন ও আদর্শ মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়ে শান্তির স্নিগ্ধ চন্দন-প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারে। স্বাধীন ভারতের সম্মুখে প্রসারিত রয়েছে সাধক-প্রদর্শিত শান্তি, সাম্য ও সমন্বয়ের পথ। ভারত স্বাধীন কিন্তু স্বাধিকার-প্রমত্ত নয়। তার স্বাধীনতা সঙ্কীর্ণার্থক ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি নয়। জগতের যেখানে যত নিপীড়িত ও নিগৃহীত মানুষ তাদের সবার স্বাধীনতাই ভারতের কাম্য। পররাজ্য-লোলুপতা ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী। ভারতের সমৃদ্ধি শুধু ভারতেরই নয়। বহুজনহিতায় জগদ্ধিতায়।

ভারত কারো উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার-বিলাসী নয়। সে চায় সবাইকে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বন্ধনে বাঁধতে। পৃথিবীর নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মতবাদ ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্নতা সত্ত্বেও সব বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের সংশ্লেষণে এক অখণ্ড বিশ্বমানবতার পূজারী হচ্ছে ভারত। প্রেম, পরমতশ্রদ্ধা ও সহনশীলতাই আনতে পারে হিংসাদ্বেষখিন্ন পৃথিবীতে শান্তি ও কল্যাণ। সহাবস্থান একটা সাময়িক রাজনীতিক বা আন্তর্জাতিক নীতি মাত্রই নয়; "যত মত তত পথের" একটা বাস্তব ও বিপুল সম্ভাবনার আভাস; সৎ, সুন্দর, বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য জীবনের মূলস্বরূপ। জগতের রঙ্গমঞ্চে এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ভারতকে স্মরণ রাখতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত পুরুষ। অবিশ্বাসীর মন মেনে নিতে চায় না। যুক্তিবাদীরা নানা প্রশ্ন তোলেন। দৃঢ়চিত্ত যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথও নির্বিবাদে রামকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারেন নি। সন্দেহের প্রবল দোলায় আন্দোলিত হয়েছে তাঁর মন। নিজেকেই বারবার প্রশ্ন করেছেন—কে এই রামকৃষ্ণ? কী তাঁর প্রকৃত স্বরূপ? কোথা সেই ঐশ্বরিক বিভূতি? এ যে অতি সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ! পরমহংসদেব যখন নিরারোগ্য গলক্ষতরোগে প্রায় রুদ্ধবাক্ সে সময়েও নরেন্দ্রনাথের সেই পুরাতন সন্দেহের প্রাবল্য। ঠাকুর অন্তর্যামী। দ্বিধাহীন অস্ফুট কণ্ঠে নরেন্দ্রনাথের সব সন্দেহ দূর ক'রে বলেছিলেন, যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই আজ এই দেহে রামকৃষ্ণ, কেবলমাত্র বৈদান্তিক অর্থেই নয়। সংশয়ী ও যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথের দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছিল সেদিন। জগৎসমক্ষে সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ, নররূপী ভগবান "অবতারবরিষ্ঠ"। শাস্ত্রোক্ত নানা লক্ষণ মিলিয়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী পণ্ডিত সমাজকে যে রামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় করেছিলেন, আজ আধুনিক বিজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি তাই স্বীকার করল, মেনে নিল। এই নব অবতারত্বের স্বরূপ কি? তার বহির্লক্ষণ কি? মৎস-কূর্ম-বরাহ-নরসিংহ-বামন-পরশুরাম-রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-কল্কি অবতারের অলৌকিকত্ব প্রকট হয়েছে কি? শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে অবতারত্বের স্বরূপটি যেমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন তেমনিটি আর দেখা যায় না:

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনো বা ভয় ঠিক মানুষের মত। পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

এই প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের মনের কয়েকটি স্বাভাবিক প্রশ্ন:—

তা হলে সাধারণ মানুষে আর ভাগবত পুরুষে পার্থক্য কি? তাঁর নিজ জীবনে তিনি কি সাধন করতে পারেন? ভাগবত পুরুষের যে পরিচয় সর্বজনগ্রাহ্য, সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই যে, তাঁর বাণী হবে স্বচ্ছ, সহজ, সরল ও মর্মস্পর্শী। ভগবান বুদ্ধ, ন্যাজারেথের যীশুখৃষ্ট আর দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সমধর্মী। অবতার বা ভাগবত পুরুষ হবেন শাশ্বত সত্যের অভিব্যক্তা। দেশ, কাল, মানুষ সব কিছুর গণ্ডির ঊর্ধ্বে তাঁর বাণীর আকৃতি ও বিশ্বময়তা। আর, তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। He says what he is, and he is what he says. এই বিশেষ পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই রামকৃষ্ণ গৃহীত হয়েছেন বিজ্ঞান-যুগের অবতাররূপে।

বস্তুবাদী বিজ্ঞান ও যন্ত্রপ্রধান সভ্যতা এবং নানা রাজনীতিক ও সামাজিক মতবাদের

কোলাহলমুখর এই পরিদৃশ্যমান সংসারের অন্তরালে ব্রহ্মের অচল, অটল স্থিতি। ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌। রামকৃষ্ণের কথায় ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট· যিনি অদৃশ্য, যিনি প্রপঞ্চাতীত, যিনি অব্যক্ত—ধ্রুব, স্থির, নিশ্চল, নীরব ও নির্লিপ্ত। আবার, ব্রহ্মই ভুবনপ্লাবী, প্রকট ও প্রত্যক্ষ। জাগতিক কোলাহলের মধ্যেও বটে আবার বাইরেও বটে, সেই ব্রহ্মের বাণী ব্যক্ত ও অব্যক্ত। সেই বাণীর নিমিত্তই ব্রহ্মস্বরূপ মানবাত্মার উৎকণ্ঠা ও আকুলতা।

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভ'লো,
সেই তো তোমার ভালো॥
বিশ্বজনার পায়ের তলায় ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি,
সেই তো আমার তুমি॥

মহামানব, ভাগবত পুরুষ বা অবতার—যে নামেই বা যে ভাবেই তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করি না কেন,—তাঁর বাণীই সেই ব্রহ্ম-বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ সত্যোপলব্ধি। তিনি দিয়েছেন জগতকে সত্য- ও শান্তি-পথের নির্ভুল নির্দেশ। ন্যাজারেথের সেই দিব্যোন্মাদ যুবকের বাণী শতাব্দীর ব্যবধানেও কোটি কোটি মানুষের অন্তরে যেমন এনে দেয় শান্তি, সান্ত্বনা ও আশ্বাস, বাংলার নগণ্য পল্লী কামার-পুকুরের সেই ঈশ্বরপ্রেমিক গদাধরের আদর্শ ও উপদেশও তেমনি আজ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বহন করে এনেছে শান্তির বাণী, অমৃতের আস্বাদ, অক্ষয় জীবনের প্রতিশ্রুতি।

গুডউইন

স্বামী জীবানন্দ

ধন্য গুডউইন, তুমি কোন্‌ ভাগ্যবলে
এসেছিলে যুগাচার্য স্বামীজী-সকাশে,
এ মর-জগতে চির-অমর হইলে,
কত ঋণী সারা বিশ্ববাসী তব পাশে!
সাংকেতিক লিপিকার! রেখেছিলে ধরি
তাই মোরা পাইয়াছি স্বামীজীর বাণী,
জাগিছে চেতনা বিশ্বে মহাবাণী স্মরি
দিকে দিকে কণ্ঠে কণ্ঠে জাগরণ-ধ্বনি!

অম্লান কুসুম সম তোমার জীবন
স্বামীজীর পদে অর্ঘ্য, মহানন্দময়।
প্রাণোচ্ছল গতিশীল সুস্থ তনু মন
অভী-মন্ত্র-স্পর্শ পেয়ে একান্ত নির্ভয়!
অপূর্ব শরণাগতি, কর্মনিষ্ঠা তব
জাগায় মানবচিতে শক্তি অভিনব!

এসো দিশারী, পথ দেখাও

(ভারতের তরুণ বিদ্যার্থীদের উদ্দেশে)

স্বামী বুধানন্দ

(১)

তোমার মত অল্প বয়সের অনেক যুবকের প্রাণে—বলব কি খুলে, না তোমার আত্মসম্মানে লাগবে?—একটা গোপন কান্না আছে। সে কান্নাটির ভাষা এই: "এসো দিশারী, পথ দেখাও।" নানা মতের দ্বন্দ্বে অন্ধপ্রায় চেতনা আত্মস্ফূর্তির পথ খুঁজে পায় না। অনুভূতি নিয়ে তোমার প্রশ্ন শোনে এমন মানুষটি সহজে পাওয়া যায় না। তার পর আবেগের তোড়ে ত্রস্ত প্রশ্নগুলিও তোমার নিজের কানেই শোনায় অস্বাভাবিক ঝাঁজালো। তাই অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ভিড় বাড়ে মনে; একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে গিয়ে শেষে স্বচ্ছ ভাবধারার প্রবাহটি যায় বন্ধ হয়ে। তারপর অন্তরে কেমন একটা জ্বালা জমে ওঠে। নিজেকে একটা আচ্ছন্ন-বিচ্ছিন্ন-প্রচ্ছন্ন আগুনে বোমার মত মনে হয়। এমন সময় কোত্থেকে একটা শব্দ ভেসে আসে কল্পনায়। আর অমনি মনে হয়: আঃ তাইতো, বিদ্রোহী! আমি বিদ্রোহী! "বিদ্রোহ" কথাটা তোমার তরুণ মনে বেশ একটা ফিরে পাওয়া আত্মসম্মানের সমারোহ লাগায়, আর তার অভিব্যক্তি হয় নানা উৎকট কথায়, ভাবে ও কর্মে। সে ফিরিস্তি আর না-ই দিলুম। চারদিকে চেয়ে দেখো, ভূরি ভূরি নিদর্শন পাবে!

তাই তোমার তরুণ জীবনের আসল সমস্যাটির কথা হোক। কোথায় দিশারী খুঁজে পাই, যার নির্দেশ মেনে নেওয়া চলে জাগ্রত বুদ্ধির দীপ্তি দিয়ে!

তোমার প্রশ্নের জবাবে আর একটা প্রশ্ন করি: ধরো যদি দিশারী না মেলে তাহলে আমাদের কি পথ বেছে নেবার কোন উপায় নেই? বসে থাকতে হবে অজানা পুরুষের অশ্রুত পদধ্বনির আশায়?

বলবো: এতো হতাশ হবার কোন কারণ নেই। তোমার অন্তরেই এক জাগ্রত পুরুষ আছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা চলে, বোঝাপড়া চলে। তার কথা শোন।

বলবে: আমি সে জাগ্রত পুরুষকে জানি নে।

হতে পারে। তাহলে এসো আমরা আলোচনা করি ভাই-এ ভাই-এ। সব কথা তোমাকে মেনে নিতে হবে এমন কোন নাকে-খত নেই। দেখা যাক না আমাদের সামগ্রিক বুদ্ধির আলোকে কতটা দূর অবধি দেখা যায়। তারপর দিশারী যদি এসে যান ভাল। নয়তো চলবো পথ ভেবে বুঝে। না হয় দুটো চারটে ভুল-ভ্রান্তি হবে। তবু তো চলার পথে বেরিয়ে পড়া হবে! সে কি কম কথা, সত্যকে নিজে খুঁজে বের করা! একে যদি না বলব বীরত্ব, আর কাকে বলব!

(২)

তুমি ভাবছ: আমি শুধু ভাল হয়ে কি করব? সবই চলছে পথে। সবাই বলছে মিথ্যে কথা, আমি শুধু সত্যের ঢাকী হয়ে বোকা-রাজ সাজি কেন? সবাই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বাহবা লুটছে, আমি কেন হই ভালমানুষ গোবেচারাটি! যারা প্রার্থনা করে না তারা তো বেশ আছে, আমি কেন মরি হা ভগবান, হা ভগবান করে? লোক ঠকায় যারা তারা দেখছি দিব্যি উতরাচ্ছে, আমি মরি কেন

সদসদের বিচারে রুদ্ধশ্বাস হয়ে? যারা ঘুষ দেয় তারা বেশ সহজে নিজের কাজটি হাসিল করে নেয়। যারা দেয় না তাদের পা জড়িয়ে পড়ে নানা বাধায়। যারা তোয়াজ করে বড় বাবুদের তারা উঠে পড়ে উন্নতির উচ্চ সোপানে তড়তড় ক'রে। আর সোজা সাদা সৎ লোকগুলি খেটে মরে উন্নতির নিচের সিঁড়ির কাছে। যারা ঘুস খায় নির্বিচারে তাদের স্বভাব নষ্ট হলেও অভাবের গঞ্জনা ততটা নেই। হয়ত ইমারত গাড়ী অবধি জুটিয়ে নেয় তারা। মোট কথা ধরা না পড়লেই হল। বিচারের দংশন? ও একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলেই হয় মনটাকে; নয়তো দেবালয়ে কিছু সিন্নি বা দু-একটা সাধু ভিখিরী খাইয়ে দেওয়া।

ধর্ম অন্তরে আনে দ্বন্দ্ব। পথে দাঁড়ায় উন্নতির। আরও কত কি অসুবিধের সৃষ্টি করে। জীবনের তাজা মজাগুলিকে খেঁতিয়ে খেঁতিয়ে মেরে অসাড় করে ফেলে। যেখানে আছে রঙের আবেশ, সুরের গুঞ্জন, নেশার আমেজ সেখানে ধর্ম এসে দাঁড়ায়: নাকের ডগায় নিকেলের চশমা, শিরা-বহুল কৃশ হাতে লম্বা তেল মাখানো বেত আর বাঁধান দাঁতের কট কট শব্দ।

আর ঐ যাঁরা ধর্মকে পচা ইঁদুরের মতো ছুড়ে ফেলে দিয়ে সমাজ গড়ছে তাঁদের দেখো বলিষ্ঠ অগ্রগতির চেহারা। আর আমাদের দেশে কি হচ্ছে ধর্ম ধর্ম করে? না আছে ধর্ম, না আছে উন্নতি। জাহান্নামে যাচ্ছে সব। ধর্ম হচ্ছে অপশোষণের আর দুঃশাসনের যন্ত্র। তাই ধর্মকে বাদ দিয়ে আমরা মুক্ত জীবন গড়ব। বিধি-নিষেধের শেকল ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে, আধুনিক প্রাণপ্রচুর ভাবে জীবন গড়ব আমরা। আমাদের দরকার বুদ্ধির উৎকর্ষ, বৈজ্ঞানিক চেতনা।

(৩)

এই যদি তোমার ভাবধারা হয়ে থাকে তাহলে তোমায় ভাই ভাববার জন্যে দু-একটি কথা বলি। তুমি তো বুদ্ধিমান উদীয়মান তরুণ। এ কথাটি মানো তো যে, সুদূর-প্রসারী ফল ফলবে এমন কোন বিষয়ে সবদিক ভেবে বুঝে সিদ্ধান্তে আসতে হয়। গোঁ ধরে চলাটা ষাঁড়কে মানায়, তোমাকে মানায় না। কারণ থেকে কার্য হবে, বীজ থেকে হবে গাছ, গাছ থেকে হবে ফুল-ফল। তোমার কাজের ফল তোমাকে নিতে হবে। চালাকি করে বা গায়ের জোরে এটা এড়ান যাবে না। তুমি লঙ্কা খেলে আর মুজফ্‌ফরের জিভ জ্বলবে এ হবে না, তোমার জিভই জ্বলবে। জীবনে যে কাজই কর না কেন, ভাল মন্দ কর্ম-ফল তোমাকে নিতে হবে। এই গণচেতনার দিনেও এ সত্য এড়াবার জো নেই। গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরকে উড়িয়ে দিয়েও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন একথা: যেমন কর্ম তেমন ফল।

আর এও তো সত্য যে তুমি জীবনে সুখী, উন্নত ও সম্মানিত হতে চাও। যাদের বাহির দেখে তুমি ভাবছ তারা সুখী, তাদের কয়টি জীবনের কতটুকু তুমি জান? তাদের অন্তরের জ্বালা, ভীতি-দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নানা বিছের কামড় আছে কিনা তা তুমি অনুসন্ধান করে দেখেছ কি? যদি না করে থাক, একটু অনুসন্ধান কর। লোকের কথায় উজিয়ে বা তলিয়ে যেয়ো না। নিজের জাগ্রত বুদ্ধি সহায়ে তথ্য সংগ্রহ কর।

এমন লোক সব আছে যারা মুখে বলে এক কাজে করে অন্যরকম। মুখে বলবে ধর্ম মানে না—কারণ চায়ের আসরে সব বেসুরো হয়ে যায় তা না হলে—অথচ লুকিয়ে প্রার্থনা করে। মুখে ভগবানকে গালিগালাজ করে কিন্তু অন্তরে ভালবাসে।

আর যাদের তুমি ভেবেছ ধর্ম অনুসরণ করে হয়েছে তাদের জীবনের কতটুকু তুমি জান? বাইরে ধর্মধ্বজী আর ভেতরে চোর-বদমাস এমন লোক জগতে নেই বলে ভেবো না। কাজেই, হে বুদ্ধিমান, শুধু বাহির দেখে সিদ্ধান্তে এসো না। সব তথ্য সংগ্রহ করে অনুসন্ধান করো, যাচাই করো, বিচার করো—তারপর অনাসক্তভাবে বৈজ্ঞানিক নীতি শিক্ষা অনুযায়ী স্থির সিদ্ধান্ত করো।

আর দেখে শিখতে যদি হয় তবে তাদের কথাই শুধু ভাবছ কেন যারা সত্য অনুসরণ করে না, ধর্ম মানে না। যাঁরা সত্য অনুসরণ করে, ধর্ম মেনে জগৎবরেণ্য হয়েছেন তাঁদের কথা ভাবো না কেন। এমন লোক কি জগতে হয় নি নাকি? ধরো না কেন গান্ধীজীর জীবন। সত্যাশ্রয়ী হয়ে জগতে কি কাণ্ডটাই না করে গেলেন! মিথ্যাচারী বিপ্লবী নয়। সত্যাশ্রয়ীই বিপ্লবী। অভীঃ না হলে সত্যাশ্রয়ী হওয়া চলে না। ভীরুতা আর মিথ্যাচারের মাঝে খুব মিতালি। কাজেই এটা আমাদের বোঝাতে চেয়ো না যে মিথ্যাচারীরা অসমসাহসী মহামানব!

ভাবছো সেই সব সমাজের কথা যেখানে ধর্মকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উড়িয়ে দেওয়া এক কথা, উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলা বা ভাবা আর এক কথা। সকল গির্জা, মসজিদ, দেবালয়, মঠ, বিহার ভেঙে ফেলা, সকল ধর্মপুস্তক পুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও ধর্মের বিনাশ কখনো সম্ভব নয়। ধর্মের অনেক প্রকার বিজানা-প্রকাশ আছে। আবার অপ্রকাশ্যেও ধর্মের বেশে থাকা চলে। যেমন ধরো মস্কো সহরে বা পিকিং-এ রাত দুপুরে বা অন্ধকারে একজন প্রার্থনা করছে। কেউ যে করছে না, সরকার এ কথা কি করে জানবে? কি করে জানবে যে, একজনের দৃশ্যমান কর্ম ও দুঃখসুখের পশ্চাতে দেখা যাচ্ছে না এমন কোন ভাবধারা বয়ে বয়ে চলেছে? ঐ ভাবধারা সম্যক না জেনে ধর্ম থেকেই দুঃখ হয়েছে ও অধর্ম থেকেই সুখ হয়েছে এ কথা সিদ্ধান্তে আসা খুব একটা উঁচুদরের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক মনে কর কি?

আর একটা কথা মনে রেখো: যে সব সমাজ আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রের হুকুমে ধর্ম বর্জন করেছে বলে মনে হয় সে সমাজ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের জানা নেই। বলতে পারো নতুন রকমের একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অন্ততঃ একশ বছর না গেলে ঐ সব সভ্যতা সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তে আসার কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি কোথায় মিলছে?

তাছাড়া ধর্মের ওপর যে এতো খড়্গাহস্ত হয়ে আছ, একবার ভেবে দেখেছ কি: ধর্ম কি বস্তু? ধর্মের নামে যা কিছু চলে—অনেক কিছু অধর্ম ধর্মের নামে চলে—সব কিছু ধর্ম নয়। ভীষ্ম মহাভারতে ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন: যাতে সকলের উন্নতি হয়, নিরাপত্তা হয়, রক্ষণ হয় সেই ধর্ম। এই উন্নতিকে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বলে বুঝতে হবে। এই নিরাপত্তা ও রক্ষণ হবে জীবনের পরমপুরুষার্থ ও সর্বোচ্চ সার্থকতা লাভের জন্যে। যাতে এমনটি হয় না তা ধর্ম নয়। তুমি যদি আধুনিক যুগের মানুষ হও এমন ধর্মকে তুমি কি করে বর্জন করতে পার? এই সর্বোদয়ের স্বপ্ন ও সকলের কল্যাণ ব্যবস্থা ধর্মই আমাদের শিখিয়েছেন। এ একটি বিশেষ ভাববার কথা।

অধর্মকে ধর্ম বলে ধরে ও মেনে নিয়ে সেই অধর্মের ফলকে ধর্মের ফল বলে মনে করে জগতে অনেক লোক ধর্ম সম্বন্ধে নিরাশ হয়। যাঁরা সত্য ধর্ম জেনেছেন, জীবনে আচরণ করেছেন তাঁরা কিন্তু সকল দুঃখবিপর্যয়ের মাঝে ধর্মকেই

শুধু আশ্রয় করে থাকেন। তাঁদের মনের জোর কত। মাথা কেটে নাও তবু ধর্ম ছাড়বে না। আর এই ধর্ম না ছাড়াটা অল্পবুদ্ধি প্রাকৃত জনের ভাবালুতা নয়। এ হচ্ছে ক্রান্তদর্শীর অভ্রান্ত কর্ম-কুশলতা। এঁরা যথার্থ জেনেছেন যে সত্য ধর্ম ছাড়া ব্যষ্টি বা সমষ্টির কায়েমী ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের আর কোন ভিত্তি মানুষের ইতিহাসে আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি।

ধর্ম ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ গড়া হচ্ছে যে সব দেশে, তাদের মুখ্য ভাবধারা যদি বিশ্লেষণ করো দেখতে পাবে তাতে আছে সকলের কল্যাণব্যবস্থার জল্পনা, অন্যের জন্যে, সকলের জন্যে স্বার্থ-বর্জনের প্রস্তুতি, সবহারাদের সব পাইয়ে দেবার নির্মম সংকল্প আর অধর্মের মুখোসগুলি উপড়ে ফেলবার সাহস। এঁদের ভ্রান্তি আছে, ভাবচ্যুতি আছে, রক্ত-পিপাসা আছে, ক্ষমতা লিপ্সা আছে, এঁরা সব স্বার্থহীন মহাপুরুষ নন—মানি। কিন্তু এঁরা ধর্মেরই এক নির্মম প্রকাশকেই ধর্ম-বর্জনের মহাব্রতরূপে ধরে নিয়ে মহোৎসাহে পুরানো সব কিছুকে উল্টে পাল্টে নিয়ে লেগে আছেন, একথা হয়তো অনেকেই ভেবে দেখেন নি। শুনেছি রোঁমা রোঁলা স্বামী বিবেকানন্দের এক অনুগামীকে বলেছিলেন: বিবেকানন্দের কাজ রাশিয়াতে হচ্ছে! আমরা তাঁর সঙ্গে একমত না হতে পারি। কিন্তু এ মনীষী হয়ত বলতে চেয়েছেন যে, বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক ধর্মশিক্ষাকে ধর্মধ্বজীদের চেয়ে তথাকথিত "অধার্মিক"রাই বুঝি বেশী আচরণ করতে সক্ষম। সকলের দুটো ভাল খাওয়া-পরা-থাকা-চিকিৎসা-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে যে সমাজ বদ্ধপরিকর- এই কল্যাণচেষ্টাও যে একপ্রকার ধর্মাচরণ, মহাভারতে ভীষ্মের ধর্মব্যাখ্যা অনুযায়ী এ কথা মানতেই হবে, রুশবাসীদের সম্বন্ধে তোমার আমার যে মতই থাক না কেন।

ধর্ম জন্ম-বিপ্লবী। মিথ্যার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম চির অভীঃ; ভয়ের সঙ্গে ধর্মের কোন মিতালি নেই। ধর্ম সুখের চাটুকার, দুঃখে ভীরু, আরাম-পিয়াসী বা স্বার্থান্বেষী হতে আমাদের শিক্ষা দেয় না। ধর্ম করে আমাদের নির্ভীক সত্যান্বেষী, সাবলীল, সক্রিয়, নিঃস্বার্থ। সর্বোদয়ের ভিত্তি হচ্ছে জীবসত্তার একত্ব। ধর্মই আমাদের এ শিক্ষা দেয়। আধুনিক সমাজ-চেতনার পেছনে রয়ে গেছে এক বিশ্বব্যাপী ধর্ম-জাগৃতি। অধর্মের পেশাদারী এ কথা না মানলেও ধর্মের ঠিক মূর্ছা হচ্ছে না। আর ধর্মধ্বজীরা যে বলছে: জগৎটা অধর্মের ভারে রসাতলে ডুবছে, এও মানব পরিস্থিতির সত্য ব্যাখ্যা নয়। পৃথিবীতে আজ কত সত্যানুসন্ধান, গণ কল্যাণ-চিকীর্ষা যে চলছে তার হিসেব কয় জন রাখে?

জগতের যেখানে যতটুকু কল্যাণচেষ্টা ও লোকসংগ্রহের আগ্রহ রয়েছে সেখানে রয়েছে ধর্মের অধিষ্ঠান—কোথাও হয়ত বা মুখোস পরে।

(৪)

আর বলছ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জীবন গড়বে। খুব ভাল কথা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা কি? পরখ করে, গবেষণা করে, নিজে হাতে-কলমে যাচাই করে যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছানোকে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বলা যেতে পারে মোটামুটি ভাবে। এ মনোবৃত্তি গড়ে তোলার পেছনে কত শৃঙ্খলা, সূক্ষ্ম মনন, অনাসক্তি ও কঠোর আত্ম-নিয়োগ—এ সবের প্রয়োজন তা ভেবে দেখেছ কি? ধার্মিক হতে গেলেও অনুরূপ আত্মনিয়োগের প্রয়োজন আছে। তাই সতিকারের ধার্মিক ও সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ধর্ম সম্বন্ধে না পড়ে-ভেবে ধর্মের নিন্দা করাটা কিন্তু একটা উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক মনীষার পরিচয় নয়। উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক মনীষীরা ধর্মের মূল্য সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী মানেন। জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আয়েনষ্টাইন বলেছেন: বিজ্ঞান আমাদের শুধু আছে-বস্তু সম্বন্ধেই শিক্ষা দিতে পারেন; কি-হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদের কিছুই শিক্ষা দিতে পারে না। অথচ সমাজে বাঁচতে হলে কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে শিক্ষা ও উদ্যমে প্রবৃত্তি আমাদের চাই-ই চাই। এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা আমরা তা হলে কোত্থেকে পাব? আয়েনষ্টাইন জোরের সঙ্গে বলেছেন: এ শিক্ষা আমরা পাই ধর্ম থেকে। তাই তাঁর সুচিন্তিত মত, বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে পারস্পরিক পরিচিতি ও চিন্তা-বিনিময়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অন্যদিকে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে না পড়ে-ভেবে, বৈজ্ঞানিক মনন-শৃঙ্খলায় অপারগ তথাকথিত ধার্মিকরা যে বিজ্ঞানের নিন্দা করেন সেটাও একটা উঁচুদরের ধার্মিকতার পরিচয় নয়। যাঁরা উঁচুদরের ধার্মিক তাঁরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কারণ তাঁরা জানেন বিজ্ঞানও বহির্জগতে সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিবেকানন্দ এমন কথাও বলেছেন যে, ধর্মকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরীক্ষাধীন করা উচিত; করলে ধর্মের শক্তি বৃদ্ধি হবে।

আজকের দিনে সত্যিকারের আধুনিক তাঁকেই বলব যাঁর জীবনে মননে ধ্যানে কর্মে বৈজ্ঞানিক মনীষা ও ধর্মজিজ্ঞাসার মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে।

তুমি যে তাই আধুনিক হতে চাও এ খুব স্বাভাবিক ও খুব ভাল কথাও বটে। কেন হতে যাবে অতীতের জীর্ণ অসার অস্থি! হে বীর, প্রাণভরে বাঁচো আজকের এই দুর্যোগ-সুযোগ-ঘন দিনে। সেই সত্যিকারের আধুনিক যে কুসংস্কারকে বর্জন করে মার্জিত বুদ্ধি সহায়ে, সত্যানুসন্ধানী হয়ে জীবনসংগ্রামে নির্ভীকভাবে যুঝে চলেছে। তাই বুদ্ধিকে মার্জিত, উজ্জীবিত ও সূক্ষ্মদর্শী করা চাই। সত্যিকারের আধুনিক যেমন কুসংস্কারকে বর্জন করেন, তেমনি সুসংস্কারের রক্ষণপোষণও করেন। এ সু-সংস্কার ধর্মের এলাকা বা বিজ্ঞানের এলাকা থেকে আসতে পারে। জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য আমাদের সামগ্রিক অনুধাবন, গ্রহণ-বর্জন ও নিয়োগ-শক্তি চাই। জীবনের উৎকর্ষসাধনে সক্ষম এমন সত্য বা অনুপ্রেরণা ধর্মের এলাকা থেকে এলেই আমরা বাদ দেব কেন? আমরা সব কিছু নিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করব। আমরা সত্য বিজ্ঞানকে যেমন শ্রদ্ধা করব, সত্য ধর্মকেও তেমন শ্রদ্ধা করব।

(৫)

আজকের দিনের জীবনসংগ্রাম যতই জোরালো ঘোরালো হয়ে আসুক না, কিছুতেই ভয় পেয়ো না। ভয়ের চেয়ে মারাত্মক কুসংস্কার আর কিছু নেই। ওটা একেবারে নিজের চেতনা থেকে কেটে চিরতরে বাদ দাও। দুর্যোগই আত্মশক্তি-বিকাশের সুযোগ বলে জেনো। চির-সুন্দরকে অন্তরের গভীরে জাগিয়ে রাখতে হবে বিক্ষুব্ধ বীভৎসতার উদগ্র আক্রমণের মুখেও। বহু বেদন-চঞ্চলতার আক্ষেপ-বিক্ষেপের হ-য ব-র-ল জগতে শিবকে ও শান্তকে অন্তরে অনুভব করতে হবে, কর্মে ফোটাতে হবে—তবে তুমি শক্তিশালী আধুনিক। নয়তো তুমি প্রতিক্রিয়ার ক্ষণভঙ্গুর ক্রীড়নক। তোমার বীরত্বের দাম মেকি পয়সাটিও নয় যতই হোক না তোমার টাক-ফাটানো আত্মম্ভরিতা।

যদি সত্যিকারের আধুনিক হতে চাও আত্ম-শক্তিতে নির্ভরশীল হয়ে কালের মন্ত্র-আহ্বানকে

সোৎসাহে মেনে নিতে হবে। এ মেনে নেওয়ার অর্থ আর কিছু নয়ঃ নির্ভীক সত্যাচারী হয়ে সর্বপ্রযত্নে নিজের জীবন গড়ে নেওয়া। বিদ্যার্থী হিসাবে এই তোমার স্বধর্ম।

জানি তুবড়ির মত বলতে চাও ঝঙ্গসে উঠে: সমাজে এত দুর্নীতি, দুঃখ, অভাব, কুসংস্কার, দুরাচার, অত্যাচার; আমি কি করে স্বার্থপরের মত নিজেকে নিয়ে, নিজের জীবন গড়া নিয়ে থাকি ব্যস্ত? হবে না এ দেশ-দ্রোহ? জনগণের বিরুদ্ধে যে ধুরন্ধরেরা ষড়যন্ত্র করে তারা কিন্তু চায় এমনটি হয়।

বুঝতে পারছি তোমার ক্ষুরধার বুদ্ধি কাটছে কোন্ দিকে! কিন্তু আশাকরি এ কথার যৌক্তিকতা মানবে যে, অস্ত্রোপচার করতে হলে হাত হওয়া চাই নির্বীজাণু পরিষ্কার, চাই স্বচ্ছ যন্ত্রপাতি, সুদক্ষ দেহজ্ঞান, স্থির স্নায়বিক অবস্থা ও নির্ভরযোগ্য সহকারী। সমাজের দেহে যারা অস্ত্রোপচার করতে ছুটেছে তাদের কজনের হাত পরিষ্কার বল দেখি? কয়জনের আছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও স্থির স্নায়বিক অবস্থা? সহকারীরা খুব উপযুক্ত বেশ মানি!

সমাজের দুর্নীতি যদি সত্যি দূর করতে চাও, আগে বোঝ সুনীতি কি, তার কত রকম হের-ফের হতে পারে, তাকে কি করে কার্যকরী করা চলে; সুনীতি হাতে আনো, চরিত্রে ফোটাও। কুসংস্কার যদি নিষ্কাশন করতে চাও সুসংস্কারে তোমার স্ব-ভাব হতে হবে উদ্দীপ্ত। দুরাচারের কথা বলছ? যারা নিজেদের জীবনে সদাচার অভ্যাস না ক'রে দুরাচার দূর করতে হাতে মশাল নিয়ে ছোটে, তারা যে দিক দিয়ে যায় ছড়িয়ে যায় আরো শতগুণ অন্ধকার, ধ্বংস, দুঃখ, হিংসা, আর মূর্খতা।

চেয়ে দেখো চারদিকে কথাগুলি খাঁটি কিনা
তাই বলছিলামঃ এ-বেলা জীবন গড়ে নাও।

জীবন গড়ার তিনটি দিক আছেঃ শরীর গড়া, মন গড়া, আর সুপ্ত আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করা। বিদ্যার্থী অবস্থায় তোমার জীবন গড়া এই তিন ধারায় চলবে যদি সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র চাও।

যে অবস্থায়ই থাক না কেন সে অবস্থায় যথাসম্ভব শরীরে শক্তিসঞ্চয় করতে হবে। শক্তি-সঞ্চয়ের দুটি দিক আছেঃ অপচয় রোধ করা ও নিয়মিত উপজীব্য ও ক্রিয়া প্রয়োগে পেশীতে যে সুপ্ত শক্তি আছে তাকে জাগিয়ে তোলা। শরীর গড়তে হলে শরীরের যেমন যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, তেমনি আবার শরীরের উর্ধ্বেও মনকে রাখার দরকার আছে। যত উচ্চ ভাবের আশ্রয়ে মনকে রাখা যায় শরীরে শক্তিসঞ্চয়ের তত উৎসাহ জাগে। কারণ তখন মনে হয় এই শরীরে বাস করে জীবনের সকল পুরুষার্থ লাভ করতে হবে। যাঁরা সর্বোচ্চ ভাবাশ্রয়ে বিদ্যার্থী জীবন আত্মনিয়ন্ত্রণে গড়ে তোলেন তাঁদের বলা হয় ব্রহ্মচারী। এ ধারার জীবনকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য। জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার প্রস্তুতির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। এ ভারতের সনাতন সাধনার একটি শাশ্বত আবিষ্কার। পরখ করে দেখ না কেন এ আবিষ্কারের শক্তি কত।

জীবন গড়ার আর এক দিক মন গড়া। মানুষের মনটি একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু, এতে আছে অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা। মানবসভ্যতার সব কৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছে ঐ মন থেকে। আজ কেউ ভাবলঃ পাখীর মত উড়লে তো বেশ মন্দ হয় না। কয়দিন পরে দেখতে পেলে দুর্দান্ত বেগশালী আকাশচারী বিমান। মনের শক্তি একাগ্র করে মানুষ এই বহু বিষয়ের পেছনে যে এক সত্যবস্তু আছে—তা পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে। আর আবিষ্কার করে সব সময়ের

জন্যে সকল ভয়-দ্বন্দ্ব-সমস্যার ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে সব কথা না হয় থাক—কারণ ওসব তো আর "কাজের" কথা নয়!

"কাজের" কথাই না হয় হোক। আজকের জীবনসংগ্রামে যদি জয়ী হতে চাও তোমার নিজের মনের শক্তি ও সম্ভাবনাকে সযত্নে নিত্য বাড়াতে হবে। মনের শক্তি বাড়াতে হলে চাই মনকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা। বিদ্যার্থী হিসাবে তোমার স্বধর্ম জ্ঞান আহরণ। জগতের জ্ঞানভাণ্ডকে যতটা পার নিজস্ব করে নাও। জ্ঞান আহরণের কৌশল হচ্ছে মনের একাগ্রতা অভ্যাস করা আর গভীরভাবে ভাববার শক্তি আহরণ করা। পাঠ্য বিষয়ে পারদর্শী হয়ে, পাঠ্যাতীত নানা জীবন-বিষয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করতে শিখতে হবে। বুদ্ধিকে মার্জিত করা ও বিচারশক্তির উৎকর্ষ-সাধন যত হবে মন গড়ার কাজ তত এগিয়ে চলবে। ভাল-মন্দ, গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য, সত্য-মিথ্যা, ক্ষণস্থায়ী-চিরস্থায়ী—এ সব দ্বন্দ্বাহত বিষয় ভেবে বুঝে সুধীজনের শিক্ষার আলোকে কিন্তু নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসা চাই।

মানুষের সকল শক্তির উৎস তার আধ্যাত্মিক চেতনায়। বিদ্যার্থী যদি তার এই আধ্যাত্মিক চেতনার সন্ধান না পায়, অনেক জ্ঞান অর্জন করেও সে ভঙ্গুর ক্রীড়নকটিই থেকে যাবে। যারা ভগবানে বিশ্বাস করতে সক্ষম, আধ্যাত্মিক চেতনা জাগানো তাদের পক্ষে অনেকটা সহজ। বলতে পারো না-দেখা ভগবানকে যদি মেনে নিই বৈজ্ঞানিক চেতনাকে পোষণ করবো কি করে? কথাটা হচ্ছে: না দেখে তুমি অনেক কিছুই মানো শুধু ভগবানের বেলায় তুমি হঠাৎ বৈজ্ঞানিক সাজো। বৈজ্ঞানিকেরা যে সব কথা বলেন তুমি কি সে সব কথা নিজে আবিষ্কার করে নিয়ে মানো না-কি? বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারে বিশ্বাস করে তুমি মেনে নাও। ভগবানকে লোকে দেখেই তো বলেছেন: ভগবান আছেন। তবু এ ক্ষেত্রে অনুরূপ ভিত্তিতে ভগবান না মানার যৌক্তিকতা কি? পূর্বসূরীদের কাছ থেকে বিশ্বাসের পাত্রে জ্ঞানের প্রথম অবদান গ্রহণ না করে, জ্ঞানের কোন রাজ্যে প্রবেশের উপায় সাধারণ মানুষের নেই বলে জানবে।

যাক গে ভগবানের কথা! না-দেখা ভগবান মানো-না-মানো তাতে যায় আসে না। যদি সত্যকে মানো তবু আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করা চলবে। সত্যকে ধরে রাখতে হবে চিন্তায় ও কর্মে। আর সে জন্যে চাই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ও নিয়োগ। সত্যে অবস্থান করলে ক্রমে ফুটবে জন-সেবার অধিকার ও শক্তি। এ শক্তির উৎস অন্তরের পবিত্রতা। পবিত্রতা কি? মনের ঊর্ধ্বগতিই পবিত্রতা, যে ঊর্ধ্বগতি আপস-আলস্যে নেতিয়ে পড়ে না—সর্বদা আগুনের জিহ্বার মত ঊর্ধ্বমুখী। সত্যাশ্রয়ী হলে পবিত্রতা আপনি থেকে এসে যাবে—সে জন্যে ভাবতে হবে না। যারা চিন্তায় ও কর্মে পবিত্র নয় তারা নিজের বা অন্যের কল্যাণসাধনে অক্ষম। তারা যত বড় "নেতা"ই হউক না কেন তাদের নেতৃত্বে হবে সমস্যা জটিলতর, দুঃখ বাড়বে তাতে।

যত প্রকারে পার শক্তিচর্চা কর। যথাসাধ্য যত পার কায়িক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ কর। শক্তি ছাড়া সমৃদ্ধি নেই; সুখ নেই, শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই, সমস্যার সমাধান নেই। আদর্শ যার যত উঁচু হবে তার চাই তত উঁচুদরের শক্তি। দেহের শক্তিকে মনের শক্তি দিয়ে, মনের শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে সংযত সংহত করতে হবে। তবে তুমি মান-হঁস।

নিজেকে আধুনিক ভাবে গড়তে হলে, তিন ধারায় নিজেকে গড়ার সঙ্গে নিজের ভেতরে জাগাতে হবে একটি বলিষ্ঠ ও অনুভূতিশীল উচ্চ সমাজচেতনা। পাঠ্য পড়ার বাইরে অনেক কিছু পড়তে ভাবতে হবে। সমাজের, দেশের ও জগতের ঘটনা ও সমস্যাগুলিকে সত্য ও আদর্শের আলোকে আগে বুঝতে হবে, ধর্ম-সহকারে তথ্য আহরণ করতে হবে, অন্তরে উপচিকীর্ষু সেবাপর হয়ে জনগণের সর্বোদয়ের জন্যে প্রার্থনা ও ধ্যান করতে হবে। এই প্রস্তুতির পেছনে থাকবে বিনয়, নম্রতা ও প্রেম। ভাবতে পার বুদ্ধির ঔদ্ধত্যে : জগৎটা তুমি উল্টে পাল্টে ভেঙ্গে গড়ে দেবে। কিন্তু তোমাকে সে অধিকার কে দিয়েছে ? সেবার অধিকার আসে প্রেম ও পবিত্রতা থেকে। যে দিন তোমার অন্তরে সে প্রেমের উৎস ও পবিত্রতার গোমুখী খুলে যাবে সমাজ সে দিন তোমায় ডেকে নেবে তার নেতৃত্ব করতে। যতদিন সে সময়টি না আসে ততদিন মা যেমন শিশুকে লালনপালনে বড় করে তোলেন, তোমাকে নিজেকে তেমনি করে গড়ে নিতে হবে।

আসল কথা : হে ধীমান, বিদ্যার্থী অবস্থায় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব অবলম্বন করে, নিজেকে কায়িক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—বলিষ্ঠ-দ্রঢ়িষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ ভাবে গড়ে নাও। গড়া যতদিন না হয় কারো হাতের ক্রীড়নক হয়ে নিজের জীবনের ও দেশের সমস্যাগুলিকে জটিলতর করে তুলো না।

নির্ভীকভাবে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার শাস্তি মাথায় নেবার সাহস অর্জন করো। বর্জন করো সকল কাপুরুষতা, মিথ্যা ও অপ্রেম। সত্যের জন্যে, নিজের জন্যে, পরিবারের জন্যে, সমাজের জন্যে, দেশের জন্যে, মানবতার জন্যে নিজেকে রক্ষা করো। সে উপায়—শুধু সত্য ছাড়া কিছু না বলা বা না অনুসরণ করা। আগে হও সত্যাশ্রয়ী, সত্যব্রত। তারপর যখন জীবন গড়া হয়ে যাবে—তখন বিপুল পরাক্রমে সর্বব্যাপী প্রেমে ঝাঁপিয়ে পড়ো মানুষের সেবায়। তখন কর রাজনীতি, কর নেতৃত্ব। তখন তোমায় আমরা মাথায় করে নাচবো। কত দিব ফুলের মালা তোমার গলায়।

হে সৌম্য, তোমার পথ চেয়ে দেশে রয়েছে সাশ্রু-পলক।

নীলের ডাক

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আয় তুই আজ আয় একলা পাখী, আয় আয় আমার বুকের মাঝে।
দেখবি পাখী, এলে কাছে—বুকের মাঝেই আকাশ আছে।
মিথ্যে একা থাকিস রে তুই, জানিস না হায় তাই তো কিছুই,
"প্রেমেই মেলে মুক্তি"—শোন ঐ, তোরও বুকের বীণায় বাজে।
ভালোবাসাই আরাধনা, আমাকে জানার সাধনা,
প্রেমের বরেই বাঁধন কাটে, খাঁচা ভাঙে, মরা বাঁচে।
ভালোবাসে যে সে-ই জানে— পায় পাখা প্রাণ প্রেমের দানে,
সব হারালে সব মেলে—তুই আজো পাখী, জানিস না যে।

রাজগৃহ, রাজগীর

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

অনেক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, অনেক সমতল বন্ধুর ভূমি পার হয়ে আমাদের বাস ছুটে চললো। ক্লান্তি আসছিল। অগত্যা আমি বাসের সিটগুলির মধ্যিখানে যত্ন করে বিছানো খড় ও ত্রিপলের বিছানার উপরে আরাম করে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্ত শরীরটাতে ঘুমও জড়িয়ে আসতে দেরী করলো না। যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি পাঁচটা বাজে। পাঁচটাতেই সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আর আমাদের বাসও কখন রাজগীরে পৌঁছে গেছে।

একটা নাতিদীর্ঘ অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের বাস থামানো হোল। জানলা খুলে দিলাম। খোলা পথে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কেমন যেন একটা গায়েপড়া রসিকতা? কিন্তু এই রসিকতাকে বরদাস্ত না করলে বাইরের দৃশ্য দেখা যায় না। অতএব নান্যঃপন্থা বিদ্যতে। জানলা খুলে সেই পথে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম। চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে আলো জ্বলছে। যেন এক মহাকালেশ্বরের ঘনকৃষ্ণ বুকে মহামাণিক্য-খচিত মালার হীরে জ্বলছে। তারই পাশাপাশি সূচীভেদ্য অন্ধকার। এটা কি তিথি? কোন্ পক্ষ? কিছুই জানিনা। শুধু এটুকু জানি, পূর্ণিমা নয়।

রাজগৃহ—রাজগীর। কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস এখানে দারুণ মৌনী হয়ে আছে। কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডায় ইতিহাসের মৌনতা ভাঙবার ইচ্ছে হলো না। ইতিহাসকে সেই মুহূর্তে ইতি করে আমরা সব একযোগে ব্যস্ত হলুম রাত্রিবাসের ব্যবস্থার জন্য।

ঘণ্টাখানেক বাদেই জৈনধর্মশালাতে বেশ ছড়িয়ে বসা গেল। ছোটঘর। দরজা আছে। জানলা নেই। বন্ধ চারিদিক। ভেতরে অন্ধকার। কমজোরি বৈদ্যুতিক আলো কন্ধকাটার ঘোলাটে চোখের মতন মনে হচ্ছিল। বেশ ঠাণ্ডা। হাড়ে কাঁপুনি লাগছিল। তথাপি দু'দিনের পথে এই প্রথম ঘরের ভেতরে শোবার সুযোগ পেয়ে শ্রান্তদেহে ঘুম জড়িয়ে আসতে দেরী হলো না কারো।

দু'টার বেশী বাজেনি। সিনহাদার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম ইতিমধ্যেই পথে বেশ লোকের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। মানুষের শক্তির কাছে যে প্রকৃতির পদে পদে পরাজয় তা এই পথচারীদের দেখেই বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

আমাদের এই আসাযাওয়ার পথেই পড়লো বেণুবন, জাপানী মন্দির, সেই বৃদ্ধবট আর ভর-মিটরি। কিন্তু তখন আমাদের লক্ষ্য রাজগীরের কুণ্ড,—সপ্তজলধারা। উদ্দেশ্য স্নান করা। শৈত্যের ভাব সামান্যও কাটে নি। হাত পা ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপছিল। একবার মনে হলো একটু দেরী করে স্নান করতে এলেই হোতো। কিন্তু উষাস্নানই সর্বোত্তম। কাজেই সব অসুবিধা স্বীকার করেও কুণ্ডের দিকেই হাঁটতে লাগলাম।

যেতে যেতে নজরে পড়লো ঐ বটগাছের তলায় একদল নেপালী, ওদের স্বভাবতঃ অপরিচ্ছন্ন এবং সুঠাম দেহ নিয়ে গাছতলায় দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে। খোলা জায়গা। শীতের রাজ্য। অথচ সেদিকে ওদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

একদল গাধা নিয়ে একজন বিহারী চলেছে হেলেদুলে। গাধাগুলিও শীতে এমন অচঞ্চল যে দেখে মনে হয় যে, ওরা যেন খ্রীষ্টকে বহন করে নিয়ে গভীর সহিষ্ণু পদক্ষেপে চলেছে জেরিকো থেকে জেরুজালেমের পথে। দলবেঁধে চলেছে মেয়েরা। বাঙালী যে নয়, তা বেশভূষাতে এবং কথাবার্তাতেই বেশ স্পষ্ট, চলার ভঙ্গিতে প্রকট। ···সম্ভবতঃ এরা বিহারী।

এ-রকমের নানা দৃশ্যপট অতিক্রম করে আমরা এসে উপস্থিত হলাম কুণ্ডে, সপ্তধারার পাশে। বাইরে জুতো খুলতে হলো। তারপর কুণ্ডের চত্বরে ঢুকলুম। সাতটি ধারা থেকে অনর্গলভাবে গরমজল বার হচ্ছে।

জামাকাপড় খুলে ঐ ধারার নীচে বসে গেলুম। উষ্ণ জলধারা। প্রথমটা সহ্য হয় না। তার পরই আরাম। অপূর্ব, অভূতপূর্ব! অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। উঠতে ইচ্ছে হয় না। আমারই পাশে এসে বসে পড়লেন আরও তিন চারজন। নানা বয়সের সব লোক জন। সুঠাম দেহের এক বিজাতীয় ভদ্রলোক, মুখটা চেনাচেনা। মনে হলো, ইতিপূর্বে কোথায় যেন দেখেছি। তিনি তাঁর জর্মানসিলভারের ঘটি থেকে আমার মাথায় জল ঢেলে দিয়ে উচ্চারণ করলেন, "জয় সিয়ারাম!" আমি প্রতি উচ্চারণ করলাম, "জয় সিয়ারাম।" আশে-পাশের স্নানার্থীরা সমবেতকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "ওঁ, হরিঃ ওঁ তৎ সৎ।" মনে হলো যেন আমরা সবাই মিলে এক অমৃতধারায় অবগাহন করে চলেছি।

এদিকে বেলা বাড়তে লাগলো একে একে মানুষের আনাগোনাও শুরু হলো। ভারত-বর্ষেরই নানা স্থান থেকে নানান ধরনের লোক আসে এখানে—আসে মৃতকল্প বৃদ্ধবৃদ্ধার দল, গৃহহীন সন্ন্যাসী, গুপ্ত-উপগুপ্তের বংশধরেরা, সুযোগসন্ধানী চোর জুয়াচোর জালিয়াৎ, স্বাস্থ্যসন্ধানীর দল, নববিবাহিত দম্পতি। কারও জন্যই কোন বাধা রাখেনি রাজগীর।

রাজগৃহে কি কারো আসবার বাধা থাকা উচিত?

কোনদিন বাধা ছিল না। আজো নেই। অন্ততঃ তেমন কোন বাধানিষেধ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি।

দ্বিপ্রহরের সূর্য করুণা করেছিলেন। পথ চলতে এবারে সেই সকালের মতন কষ্ট হল না। কিন্তু পবনদেব বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। হু-হু করে বাতাস হাড়ের ভেতরে কাঁপন লাগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অকম্পিত মন নিয়ে আমরা একে একে সব দেখতে শুরু করলাম।

রাজগীর—রাজগৃহ।

এর কথা ইতিহাসে পড়েছি। পুরাণে পড়েছি। পড়েছি পালিসাহিত্যে এর গৌরবময় কাহিনীর কথা। আর আজ তাকেই প্রত্যক্ষ করছি। বইয়ের পড়ার সঙ্গে চোখের দেখাকে মিলিয়ে নিতে কোন কার্পণ্য করবো না। দেখা, শোনা, পড়া সব কিছু মিলিয়ে যে জ্ঞান তাইতো সম্পূর্ণ জ্ঞান। মহাবোধি। সেই মহাবোধি লাভে যেন কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি না ঘটে।

একটা পিচঢালা মসৃণ পথ রাজগীরের মধ্য দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণের পাহাড় বরাবর চলে গিয়েছে। এইটাই রাজগীরের প্রধান পথ। এই পথ ধরে এগিয়ে আমরা রাজগীরের দাতব্য চিকিৎসালয় দেখলুম। দূর থেকে হাইস্কুল দেখলুম। দেখলুম একটি যোগাশ্রম। পাশের একটা রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে একটা উঁচু টিলাতে অবস্থিত বার্মিজ মন্দির দেখলুম। এ মন্দির ১৯২৫ সালে একজন বর্মা-দেশীয় বৌদ্ধ পুরোহিত নির্মাণ করিয়েছেন।

বাহুল্যবর্জিত এই মন্দির বর্মীজীবনের সরলতার প্রতীক হয়ে বিরাজ করছে।

মন্দির পেরিয়েই পথের ধারে অজাতশত্রু গড়। এখানেই নাকি পরম প্রতাপশালী সম্রাট অজাতশত্রুর রাজধানী ছিল। রাজধানীকে প্রাচীন কালে বলতো রাজগৃহ। সেই থেকে রাজগীর রাজগৃহের স্মরণীয় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

অনেক শতাব্দীর ইতিহাস এখানে নিদ্রিত রয়েছে। পাশে তাকাতেই দেখলাম নোটিশ-বোর্ডে লেখা রয়েছে : "These massive walls of earth and stones round new Rajgriha about 3 miles in perimeter, were built by king Bimbisar or Ajatsatru in 6th-5th centuries B. C. The south-western corner of the fortified area was cutoff from a citadel surrounded by drybuilt walls of unhewn stones with gateways and bastions at intervals. Excavations have revealed antiquities dating from the 2nd century B. C."

সুদীর্ঘ এই দেওয়াল নীচ থেকে দেখে আনন্দ পেলাম না। পথ থেকে উঁচু টিলাতে উঠলাম। তারপর দুর্গপ্রাকারে। বিরাট প্রাকার। পুরোটা হাঁটতে গেলে সময় লাগবে। শ্রমের কথা বলাই বাহুল্য। খানিকটা হেঁটেই নেমে পড়লাম। এবারে কুণ্ডের দিকে হাঁটতে সুরু করলাম। যাব পাহাড়ে। মনের এই বাসনা। গভীরতম আকাঙ্ক্ষা।

কুণ্ডের পেছনেই পাহাড়।

রাত্রিবেলা দেখেছি নীচ থেকে, বৈদ্যুতিক আলোতে ঝলসিত। সেটা ছিল কৃত্রিম। এখন সূর্যের আলো লেগে চিকমিক করছে চূড়াগুলি। স্বচ্ছন্দ, সাবলীল। মনে হলো, পৃথিবীতে যেদিন মানুষ ছিল না সেদিন থেকে পাহাড় পর্বত অরণ্যানীর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক। সূর্যের সংসারে এরা হলো পরম আত্মীয়। কুণ্ডটাকে পেছনে ফেলে অপেক্ষাকৃত উঁচু ভাঙ্গা পার হয়ে উঠলুম এসে একটা টিলাতে। তামাটে রঙের রুক্ষ মৃত্তিকাস্তূপ। এই মৃত্তিকাস্তূপ পেরিয়েই পাহাড়ের সীমা।

ছোটবড় নানারকমের পাথরের চাঁই-এ পা ফেলে উঠতে লাগলাম। সামনের থেকে ক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। বেশ লাগছে।

কনকনে শীতটা অনেকটা কমে গিয়েছে। মাথার উপরে উঠেছেন সূর্যদেব। একদিকে ঠাণ্ডা হাওয়ার তোড় অন্যদিকে জোরালো সূর্যের তেজ,—দুটো মিলে সমস্ত আবহাওয়াটাকে একটা নাতিশীতোষ্ণ পরিতৃপ্তি দান করেছে। এগিয়ে চলেছি একটা স্বচ্ছন্দ, পরিচ্ছন্ন পরিতৃপ্তি ভরা মন নিয়ে।

সমতলভূমির লোক আমি।

পাহাড়ের সঙ্গে আমার দেখাশোনা কচিৎ, কখনো। অথচ আমাদের সভ্যতাসংস্কৃতির বিপুল প্রাণস্পন্দন এই পাহাড়েরই গায়ে গায়ে গহ্বরে গহ্বরে স্তব্ধ হয়ে আছে। পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়, পাদদেশের অরণ্যানীতে, পাহাড়ী নদী ও ঝর্ণার কলতানে ভারতী-মানসের নিয়ত কল্লোল। প্রবাহিত। তরঙ্গিত। আমাদের সভ্যতার পাদপীঠে প্রহরী হিমালয়ের স্বাক্ষর।

আমরা যে পাহাড়ে উঠছি তার অবশ্য একটা নাম আছে। সেটাই তার পরিচিতি। ...কিছুটা অগ্রসর হতেই কয়েকজন পথচারীর সাথে দেখা। তাঁরা উপর থেকে নীচে নামছিলেন। তাঁদের একজনকে ডেকে পাহাড়-টার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। হিন্দীতে জবাব দিলেন, "ইয়ে পাহাড় হ্যায় রতনগিরি"।

জানিনা, নামটা সত্য কিনা? তথাপি রতনগিরি নামটা ভাল লাগলো। পছন্দ হলো।

পাহাড়টার প্রভাতকালীন প্রশান্তি এবং সূর্যের আলো-ঝলকিত পাথরগুলির দ্যুতি, আশেপাশের ছোট ছোট উদ্ভিদের ক্ষুদ্র অথচ মহৎ ব্যাপ্তি মহামূল্য রত্নাগারের চেয়েও অধিক মূল্যবান হয়ে আমার দু'চোখের সামনে প্রকাশিত। কতকগুলি নুড়ি সূর্যের আলো লেগে চিকমিক করছিল। কয়েকটা কুড়িয়ে নিয়ে লুব্ধ বাসনাতে ওভারকোটের পকেটে রাখলাম। বেলা বাড়ছিল। আমরা উপর দিকে উঠছিলাম। যতই উঠছিলাম ততই পরিশ্রান্ত হচ্ছিলাম। শরীর অবসন্ন হয়ে আসছিল। কিন্তু মনের বাসনা, শেষ না দেখে থামব না। কাজেই মনের যেখানে ষোল আনা সাধ, সেখানে দেহের সাধ্য কি তা থেকে বিরত হয়?

খানিকটা উঠতেই একটা বিশ্রামের জায়গা পাওয়া গেল। সেখানে বসলুম গিয়ে কিছুক্ষণ। তারপর আধঘণ্টাটেক বাদে সামনের পাহাড়ের দিকে এগুতে লাগলাম। কিছুটা অগ্রসর হতেই রাস্তার একটি বাঁকে একটি মন্দির নজরে পড়ল।

মন্দিরটি সুবৃহৎ নয়। বৈশিষ্ট্যও তেমন নেই। মন্দিরের চারদিকে ছোট্ট সিমেণ্ট বাঁধানো পৈঠা। অনেকটা রোয়াকের মতন। একজন পূজারীর দেখা মিলল এখানে। বিহারী ব্রাহ্মণ। মধুরস্বভাব। সামনে অনেকগুলি মন্দিরের অস্তিত্বের কথা তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম।

যথার্থ নির্দেশ মতন এগিয়ে চললাম। এবারে আর খাড়া পাহাড় নয়। পথ সোজা। সরলরেখার মতন। কিছুটা এগুতে আর একটা জৈনমন্দিরের সঙ্গে দেখা হলো। এখানে হিন্দীতে লেখা আছে দিগম্বর জৈনমন্দির। মন্দিরটি ভাল করে দেখলাম। দূর থেকে কালো পাথরের মূর্তি, বিগ্রহ বলেই মনে হলো। আশী গজ প্রায় তফাতে একটা উঁচু বারন্দার উপরে দেখলাম আরও একটা মন্দির। মন্দিরটির ভিতরে ঢুকবার অবকাশ হলো না। দূর থেকে দেখে হাত জোর করে প্রণাম জানিয়েই বিদায় নিতে হলো।

পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালুম। কখন পাশে এসে বন্ধুবর গিরীন দাঁড়িয়েছেন জানিনা। হঠাৎ মন্তব্য কানে এলো, "এ যেন ভাই, তোমার এরিয়াল সারভে।"

এরিয়াল সারভে? ওর মন্তব্যটাকে ঠিক মেনে নিতে পারলুম না। কেননা আমার রাজগীর সফরতো কোন সাংবাদিক বা রাজনীতিবিদের দৃষ্টি নিয়ে নয়। আমি এসেছি একে জানতে, বুঝতে, উপলব্ধি করতে। অন্তর মিলালে যার অন্তরের পরিচয় তাকেই পেতে। এটা আমার একটা সেন্টিমেণ্টাল জার্নি। আমরা যে পাহাড়ে উঠছিলাম তারই দক্ষিণাংশের নাম গৃধ্রকূট। নামটা পরিচিত। রামায়ণ-মহাভারতের কোথায় যেন নামটা পেয়েছি মনে হলো। এই পাহাড়টাকেও দেখবার এক অপরিসীম বাসনা মনে চেপে বসলো। উত্তর ছেড়ে দক্ষিণের দিকে পা বাড়ালাম। ইতিহাসের ছায়াতপে রঞ্জিত এই গৃধ্রকূট। পালিসাহিত্যে পাওয়া যায় এইখানেই বুদ্ধ এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দের বাসস্থান ছিল। আজ অবশ্য মহাকাল তার কোন চিহ্ন রাখেনি। সব শেষ হয়ে গেছে সময়ের দুরন্ত স্রোতের মুখে।

গৃধ্রকূটের উচ্চতা বেশী নয়। এখানেও মন্দির আছে। তবে রত্নগিরির পারিপাট্য এতে নেই। এখানকার মন্দির জীর্ণ, ভগ্ন। বিরাট শূন্যতার মাঝখানে চিরমৌন জনশূন্য জীর্ণ দেবালয়। দেবতার বিগ্রহ কোথাও নেই। জানিনা, এখানে অন্তর্যামী অদৃশ্য হয়ে অবস্থিতি করছেন কিনা ?

আগে যা দেখেছিলাম তা ছিল জৈন মন্দির। এটি বৌদ্ধ। এত কাছাকাছি মন্দির-গুলির অবস্থান দেখে মনে হলো সত্যিকারের বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও অবস্থান তেমন দূরবর্তী নয়। এখানেও একজন বিহারী পুরোহিতের সাক্ষাৎ মিললো। সাধারণ পুরোহিতের সঙ্গে তাঁর কোন মিল নেই। কপালে নেই তিলক। হাতে উল্কি আঁকা নেই। পরনে নেই উত্তরীয়। গলায়ও উপবীত লক্ষ্য করলাম না। তবুও তিনি পুরোহিত। পুরোবাসীর যিনি 'হিত' করেন তিনিই তো পুরোহিত ; আমাদের মঙ্গলকামী ধর্ম-উপাসক। আলাপ করলাম।

জানিনা, এটাও এই পাহাড়েরই গুণ কি না ? এই পুরোহিত জীবন ও সংসারের অনেক দুঃখকষ্টের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এসেছেন। তথাপিও অটল আছেন এই গৃধ্রকূট পাহাড়েরই মতন। অবস্থা এঁর দুর-বস্থার কোল ঘেঁষেই আছে। সচ্ছলতা এঁর কোনদিন ছিল বলে আমার মনে হলো না। অর্থাৎ আর্থিক সচ্ছলতা বলতে যা বোঝায়। সামান্য একখানি গামছার বেশী অঙ্গবাস আর তাঁর কিছুই জোটেনি। এই শীতে গায়ে একটা গেঞ্জির বেশী কিছু তাঁর আশা করা অন্যায়।

ঐশ্বর্যের দুলাল সিদ্ধার্থ গৌতম ভোগ থেকে এসেছিলেন ত্যাগের পথে। কিন্তু যার জীবন চৈতন্যোদয়ের প্রথম প্রভাত থেকেই দেখেছে ধূসর বৈরাগ্যের একমাত্র পথকেই, তার কাছে ত্যাগের বিশেষ কোন অর্থ আছে বলে আমার মনে হলো না। আমি পারি নি মনে করতে।

কৌতূহলের শিখাকে উস্কে দিয়েই আমি একের পর এক প্রশ্ন করেছি ঐ পুরোহিতকে। জেনেছি বিহার সরকার থেকে ঐ পুরোহিত মাসোহারা পান মাত্র পনেরটি টাকা। আজকের দ্রব্যমূল্যের বাজারে এই মাত্র পনেরটি টাকায় গ্রাসাচ্ছাদনের যে কতটুকু হয়, আমার জানা সাধারণ গণিতে তার কোন সদুত্তর আমি খুঁজে পাই নি। লক্ষ্য করলাম আর্থিক প্রসঙ্গ তোলায় তিনি ক্ষুণ্ণ হন। কাজেই সে প্রসঙ্গ চাপা দেওয়াই আমি আমার তাৎক্ষণিক কার্য-করণ বলে স্থির করলাম। ওঁর কাছেই রাজগীরের প্রাচীনত্বের কথা জানতে চাইলাম। অল্পভাষী সদাচারী লোকটি আপন খুশির প্রসঙ্গ পেয়ে বলে চললেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে ইতিহাসের পাতা উন্মোচিত হতে লাগলো।

রাজগীরের প্রাচীন নাম গিরিব্রজ। মগধের রাজধানী ছিল এককালে। পালিসাহিত্যেও এর উল্লেখ আছে। রামায়ণে পাই—

চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্নাম গিরিব্রজম্॥
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ।
সুমাগধী নদী রম্যা মগধান বিশ্রুতা যযৌ
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালব শোভতে।

বসুরাজা গিরিব্রজ নামে উত্তরনগর নির্মাণ করলেন। মহাত্মা বসু কর্তৃক গিরিব্রজ নগর রচিত হয়েছিল বলে এর অপর নাম বসুমতী। এই যে পাঁচটি পর্বত দেখা যাচ্ছে চারিদিকে এই শোমানদী এ পাঁচটি প'তের মধ্য দিয়ে রমণীয় মালার মত শোভামানা হয়ে মগধদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

জরাসন্ধ মগধের পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন।

সুবিপুল পরাক্রমে তিনি অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করে পর্বতের গুহাতে আবদ্ধ রেখেছিলেন। পাশেই একটা চতুষ্কোণ পাহাড়ে ছাওয়া ঘর দেখে পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওটা কি?' তিনি জানালেন যে ওইটিই জরাসন্ধের কারাগার।

মহাভারতে মগধের নাম আছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে মগধের বর্ণনা জানিয়েছেন এবং তাতে রাজগৃহের স্বাস্থ্যের অনুকূল আবহাওয়ার কথা তিনি বিবৃত করেছেন।

পুরোহিত আমাদের কাছে অনেক কিছুই বললেন। ইতিহাসের অনেক অধ্যায়, পুরাণের অনেক কাহিনী তাঁর মুখ থেকে শুনলাম। মনে হচ্ছিল যেন এক বিরাট ন্যগ্রোধ-ছায়ার তলে বসে কোন এক আধুনিক বিষ্ণুশর্মা তাঁর ছাত্রদের কাছে একের পর এক কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছিলেন। অনেক কথাই তিনি বলছিলেন। কেবল নিজের কথা ছাড়া। সেখানে কোথায় যেন একটু দ্বিধা। একটু সংকোচ।

পালিসাহিত্যে রাজগৃহের অনেক কাহিনী লেখা আছে। বিপুল, বৈভার, গৃধ্রকূট, রত্নগিরি ইত্যাদি প্রতিটি পাহাড়ের নুড়িতে নুড়িতে যত কথা, যত ইতিহাস পালিসাহিত্যে তারই গ্রথিত সংকলনী। চীনা পরিব্রাজক হিউএন সাঙ, ফা-হিয়েন, ব্রহ্মদেশীয় পরিব্রাজক ইত্যাদি এর সম্বন্ধে কত কথাই তো বলেছেন। ইংরেজ পরিব্রাজকের কুটিল দৃষ্টিতেও রাজগীরের রূপ বেআব্রু হয়েছে। সে সব কথা ইতিহাসে আছে। যাক। আমার কাছে সে ইতিহাস মূল্যবান নয়। সে তথ্যের প্রয়োজন নেই আমার।

বুদ্ধের গরিমার দেশ রাজগৃহ। এখানে প্রভঞ্জনের দোলায়, জলধারার কুলুকুলু রবে নিয়ত বুদ্ধের নাম। বুদ্ধ! জ্ঞান! মহাবোধি! বুদ্ধজয়ন্তীতে একটা কবিতা লিখেছিলাম। এখানে দাঁড়িয়ে—সেইটি মনে পড়লো—

মানুষ তুমি, প্রেমিক তুমি, ভালবেসেছিলে এই ধরণীরে,
এই আদিম পৃথিবীকে সৌরমণ্ডলের বিচ্ছিন্নতায়।
একাকার হয়ে গিয়েছিলে তুমি অমিত ভাবাবেগে
হে অনন্ত অমৃতসন্ধানী, হে শ্রেষ্ঠী, হে গৌতম!
রাজগৃহ থেকে বৈশালী কোশলের ছায়াছায়া প্রান্তরে,
তোমার সুর ও ছন্দের নিয়ত প্রতিধ্বনি
সাঁচি, কুরুবক্ষে বিক্রমশীলায় এখনো শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ করে
প্রাণভরে, হৃদয়ের অর্গল উন্মুক্ত করে শুনি,
কেবলি শুনি তোমার তানের গম্ভীরা॥
সময়, স্মৃতি পুরানো হয়, ইতিহাস হয়।
কেবল তোমার আলাপ সঞ্চারী আর অন্তরা
শাশ্বতীর বাণী হয়ে আবার আত্মলীন মগ্ন চেতনাকে
নিয়ত সুরের মালা পরায়।
হে সুরসাধক, তুমি গান গাও
গান, গান আর গান॥

সিদ্ধার্থ গৌতমের কণ্ঠে একদিন যে গান শোনা গিয়েছিল সে গানের সুরে বান ডাকলো। চেতনার বান ডাকলো। কপিলাবস্তুর কোল থেকে ভারতের বিপুল বক্ষ ছাপিয়ে, হিমালয়ের প্রাচীর ছাপিয়ে তিব্বতে, চীনে, জাপানে, শ্যামে, কম্বোজে, বরভূদরে সেই বন্যা—সেই প্রাণের বন্যা উচ্ছল হোলো। করুণাধারায় সব ভেসে গেল।

রাজগীর সেই বন্যাপ্লাবিত ভূমিখণ্ড। বিম্বিসারপুত্র অজাতশত্রু বুদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন। সিংহাসনের দখল পেয়েই তিনি তাঁর প্রিয় পিতাকে বন্দী করে রাখলেন। আদেশ দিলেন, রাজগৃহে যেন কোথাও আর বুদ্ধের নামকীর্তন না হয়; যেন কোথাও না জ্বালানো হয় অহিংসার দীপাবলী।

প্রব্রজ্যার গরিমা নয়; ভোগবাসনা-বিলাসিতার গৌরবই রাজার গৌরব। অজাতশত্রু রাজা হয়েই বুদ্ধের অহিংসার বাণীকে হানলেন চরম আঘাত। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা পূজারিণী কবিতার কয়েকটি ছত্র মনে পড়ে :—

"অজাতশত্রু রাজা হল যবে
　　　　পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
　　　　মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
　　　　বৌদ্ধ শাস্ত্ররাশি।"

বৃদ্ধ পিতার প্রতি অজাতশত্রু অনেক অন্যায় করেছেন। তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে নির্মম আঘাত হেনেছেন। তারপর তাঁকে নির্বাসিত করেছেন। কিন্তু এমন এক স্থানে তিনি তাঁর পিতাকে নির্বাসিত করেছিলেন যে সেখান থেকে তাঁর চোখ চলে যেত গৃধ্রকূটের স্বচ্ছতার মধ্যে। মহান মৌনতার গভীরে। ইতিহাসে আর কোথাও এমন মহান শাস্তি দেবার ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। রাজগীরের ইতিহাস এই মহত্ত্বের ইতিহাস। এই ভীষণ গৌরবের আখ্যায়িকা। রাজগীরের পথে চলতে চলতে মনের মধ্যে এই গৌরবের ভাবনাই আছে। প্রতীতি হয় ভয়ানকের সাথে মহত্ত্বের॥

পাহাড়ের পথ ছেড়ে কখন সমতল ভূমিতে নেমে এসেছি খেয়াল নেই। ইতিহাস আর পুরাণের কাহিনী সমস্ত আচ্ছন্ন করেছে। ভুলে গেছি দিনযাপন আর প্রাণধারণের গ্লানি। চলেছি আর চলেছি। গৃধ্রকূট ছাড়িয়ে বৈভারের কাছে এসে পৌঁছাতেই একটা সুতোর মতন জলধারা নজরে পড়লো। অজাতশত্রুর প্রাকারের পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত এই জলধারা ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখী হয়েছে। এরই নাম সরস্বতী, তপদা। বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয়-ত্রিপিটক-খ্যাত তপদা। সময় অল্প থাকাতে সরস্বতীকে সঙ্গ দিতে পারলাম না অধিককাল। অন্তরে ক্ষোভ রয়ে গেল। কিন্তু সেই ক্ষোভে জ্বালা নেই। আছে বিধুর ম্লানতা। সরস্বতীর স্বচ্ছশীতল জলে অঙ্গ ধৌত করে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ আছে। আর আছে অধিক দেখার অনুরাগ। সরস্বতীর পশ্চিমে একটু দূরেই একটা স্তূপ। এটি কার তৈরী জানা নেই। হুয়েন-সাঙ কি বলেছেন, কি বলেছেন ফা-হিয়েন সাঙ, তা নিয়ে তর্কের ঝড় উঠুক তার্কিকমহলে। তর্কে প্রয়োজন নেই আমার। আমি জানি এ-স্তূপ রাজগীরেরই গৌরবরেখা। কালের স্বাক্ষর। মহাকালের বুকে মহামানবের প্রদীপ্ত পদাঙ্ক।

এই স্তূপেরই দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বৈতরণী। যুগযুগান্তের মানুষের মোক্ষ বৈতরণী। যার একধারে পরকাল; অন্যধারে ইহকাল। আর দু'কালের ব্যবধান দূর করবার সেতুস্বরূপ শ্মশান। বৈতরণীর তীরেই শ্মশান। আমরা যখন বৈতরণীর ঘাটে এসে দাঁড়ালাম তখন প্রখর মধ্যাহ্নকাল। অন্যের মনের খবর জানি না। আমার মনটা দারুণ দার্শনিক চিন্তায় ভরপুর। একদা একটা কবিতায় লিখেছিলাম—"বৈতরণীর পথ কতদূর, শক্তি নাহি আর।" আজ সেই বৈতরণীর তীরে দাঁড়িয়ে মনে হলো সত্যিই দেহে আর শক্তি নেই। অথচ মন চঞ্চল। বলছে, "এখনি অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা...... ।"

একটু বিশ্রাম করেই আবার চলা শুরু হলো। বৈতরণীকে যেমন স্বাগত জানিয়েছিলাম তেমনি বিদায় জানিয়ে এলাম বেণুবনে। যাকে দূর থেকে দেখেছি এবারে তার মুখোমুখি হলাম। বেণুবনের পাশেই একটা প্রকাণ্ড জলাশয়। তার ধারেই নোটিশ-বোর্ডে লেখা আছে—

Karanda Tank—This large tank may represent the Kalanda Nivapa in Venuvana or Bambco-grove, a favourite resort of Budha (B C. 563-483 B. C)।

করণ্ড হ্রদ বা কালান্দক নিবাপ। পালি ভাষায় নিবাপ শব্দের অর্থ জলাশয়। বুদ্ধদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই কালান্দক নিবাপ। চারদিকে বেণুবনে ছাওয়া এই শীতল হ্রদের ধারে এসে বুদ্ধদেব পরম শান্তি লাভ করতেন। দু'দণ্ড নির্জনে কাল কাটাতেন। কিন্তু আজ আর এখানে এলে মনে হয় না, "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।" আজ কালান্দক নিবাপের কালান্তর ঘটতে চলেছে। কাল পাঁকে কালান্দকের সব আচ্ছন্ন করেছে। ভোগবতী ধারা শুকিয়ে গেছে। চেষ্টা অবশ্য দেখলাম পঙ্কোদ্ধারের। কিন্তু তা এতই শ্লথ যে কতদিনে তা সম্পূর্ণ হবে জানি না।

রাজগীর বুদ্ধের গৌরবের যেমন, তেমন অগৌরবেরও দেশ। এখানে বুদ্ধকে হত্যা করার যে নির্লজ্জ প্রচেষ্টা হয়েছিল তা কে না জানে? বিম্বিসারের পুরাতন নগরের ধারে অজাতশত্রু এক উন্মত্ত কৃষ্ণকায় হস্তীর দ্বারা বুদ্ধকে হত্যা করবার যে কুৎসিত ষড়যন্ত্র করেছিলেন ফা-হিয়েনের বর্ণনাতে তার কথা আছে। আর তারই সাথে আছে ধর্মরতা কামিনী আম্রপালির কথা। আজ অবশ্য বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড ছাড়া কিছুই নেই দেখবার। নেই সেই পূজারিণীর দল। তবুও মনে হলো যেন কান পেতে শুনলে আজও শুনতে পাওয়া যায় ক্ষুধিত পাষাণের বাণী। আজও শোনা যায় সুভাষিত ধম্মপদের সূক্ত:—'আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুহি পরমম্ ধনম। বিশ্বাস পরম ঞাতি নিব্বানম্ পরমম্ সুখম।" এখানে এসে মনে হলো আমি যেন সত্যই আরোগ্য লাভ করেছি। আমি জরামুক্ত। আমি সন্তুষ্ট। আমার অন্তরে এখন পরম বিশ্বাস। আমি যেন পরম ব্রহ্মেরই একাংশ। সেই মহানির্বাণের পথ চেয়ে বসে আছি। গৃধ্রকূটের পাহাড় আমাকে এক সম্পূর্ণ পৃথক চিন্তায় মগ্ন করেছে। শুনতে পাচ্ছি কে যেন আমার কানের কাছে উচ্চারণ করছে:—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্ যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ ... ॥"

কলকাতায় ফিরে আসতে ইচ্ছে হলো না। মনে হলো কলকাতা যেন আমার এই হৃদয়কে স্থান দিতে পারে না সেখানে।

দূর থেকে বানগঙ্গা দেখলুম। দুর্গম পাহাড়ী নদী। এর এক পারে রাজগৃহের শেষসীমা আর এক পারে বর্তমান পাটনা। এই বানগঙ্গাতেই উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করে বুদ্ধদেবকে মারবার এক কুৎসিত ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

সময় সংক্ষিপ্ত থাকার জন্যে এই বানগঙ্গা দেখা হয় নি। মনটা তাই উদাস ছিল। বন্ধুবর আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ধরা পড়ে গেলাম। বললেন, "তোমাকে বড় উদাস দেখাচ্ছে?" মুখে বললাম—"কই না তো।" কিন্তু মনে মনে নিজের এই উদাসীনতাকে সমর্থন করে জনান্তিকে উচ্চারণ করলাম—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্যাম্।"

ফিরবার সময় এলো একসময়। রাজগীরে এসে যা যা দেখবার ছিল তার হয়তো অনেকই দেখা হলো না। যা পাব আশা করেছিলাম তা পেয়েছি কি না হিসাবের তাগিদ নেই। যা পেয়েছি তাতেই আমি তৃপ্ত। তাতেই সন্তুষ্ট। মন আমার ভরে গেছে। যখন আবার শূন্য হবে কোনদিন, সাধ আর সাধ্যের যোগ ঘটিয়ে সম্ভব হলে আবার হয়তো এসে কিছুদিন রাজগীরের এই রক্তিম সূর্যাস্তের ছায়াতেই শিবির রচনা করবো।

প্রাথমিক শিক্ষা—অগ্রগামী শিক্ষক-সৈনিকদের প্রতি আহ্বান*

ভগিনী নিবেদিতা

আমাদের সকলেরই ভাল করে জানা আছে যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শিক্ষার উপর। শিল্প ও বাণিজ্য যে কম দরকারী তা নয়, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে যেমন সকল বিষয়ে উন্নতি করা সম্ভব, অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট যেন সব পথ রুদ্ধ। আমরা একথাও জানি যে, শিক্ষাকে যথার্থ কার্যকরী করতে হলে নিম্নতম ও সাধারণ ক্ষেত্র থেকে উচ্চতম ও বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন পর্যন্ত সর্বস্তরে প্রসারিত করতে হবে। Technical Education বা কারিগরী শিক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমন Higher Research বা গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত: Higher Research অর্থাৎ উচ্চ গবেষণাকে লক্ষ্যগোচর না রেখে কেবল কারিগরী শিক্ষা বৃক্ষকাণ্ডবিহীন পল্লবিত শাখা অথবা মাটির নীচে প্রাণরসবাহী মূল শিকড় ব্যতীত অঙ্কুরিত পত্রপুষ্পের মতোই অবাস্তব। পুরুষের শিক্ষার যেমন আবশ্যক, নারীর শিক্ষারও অনুরূপ প্রয়োজন আছে। লৌকিক শিক্ষা বা অপরা বিদ্যার (Secular Education) ন্যায় ধর্মশিক্ষারও একান্ত আবশ্যক। এবং এই সকল শিক্ষার যে কোনটি

* ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে আগামী অক্টোবরে (১৯৬৭)। ইতিমধ্যেই চারিদিকে জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সাড়া জনসাধারণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের জাতীয় চেতনায় ভগিনী নিবেদিতার দান অসামান্য। তাঁর মহৎ চিন্তা ও কর্ম সমগ্র জাতীয় জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল। ভারতের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি তাঁর মর্মান্তিক জাতীয় সমস্যাগুলি অনুধাবন করেছিলেন এবং গভীর চিন্তা সহকারে সেগুলির সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়ে গিয়েছেন। এমন একটি সমস্যা হল 'জাতীয় শিক্ষা'। দেশ স্বাধীন হবার বহু বছর পরেও শিক্ষার লক্ষ্য বা প্রণালীর মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেছে একথা বলা চলে না। নিবেদিতা বলতেন, "হায়, শিক্ষণই তো ভারতের সমস্যা। কেমন করে প্রকৃত শিক্ষা—জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, য়ুরোপের নিকৃষ্ট অনুকরণের পরিবর্তে ভারতের প্রকৃত সন্তানরূপে তোমাদের গঠন করতে পারা যায়, তাই সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং মস্তিষ্কের উন্নতি-সাধন। তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে পরস্পরের মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগসূত্র স্থাপন।"

শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধগুলি তাঁর দেহত্যাগের পর Hints on National Education in India (ভারতে জাতীয় শিক্ষার ইঙ্গিত) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলির মূল্য বা কার্যকারিতা বর্তমানেও বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়নি, পাঠকমাত্রেই তা হৃদয়ঙ্গম করবেন। বর্তমান প্রবন্ধটি ঐ গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ "Primary Education : A Call for Pioneers"-এর অনুবাদ। —অনুবাদিকা

অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন হল 'জনশিক্ষা', আর এই শিক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই স্বনির্ভর হতে হবে।

আমাদের সভ্যতা কোনদিনই একজন নাগরিককে তার সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে পরাঙ্মুখ হয়নি। এ দেশে নিতান্ত দীন দরিদ্রও নিরন্নকে অন্ন দিতে কাতর হয়েছ দেখা যায়নি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, অন্নদান অপেক্ষা জ্ঞানদানের প্রয়োজন অধিকতর। দেশের সংহতিকে দৃঢ় শক্তিশালী করে তুলতে অন্য কোন পথ নেই। বাস্তবিক যদি জাতির একটি শ্রেণী বিশেষ কোন ভাবসমষ্টি থেকে সর্বপ্রকার মানসিক পুষ্টি সঞ্চয় করে এবং অবশিষ্ট বৃহত্তর অংশটি অন্য ভাবধারায় পুষ্ট হয় তবে তার অন্তর্লোকে যে ঐক্য নিত্য বিরাজিত তাকে বাইরের জীবনে কোথাও কার্যকরী করা যায় না। কিন্তু দেশের সকলেই যদি একই ভাষায় কথা বলে, একভাবে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতে শেখে, সমান ভাবাদর্শেই তাদের অনুভূতি প্রেরণা পায়, যদি সমগ্র জাতি যে কোন আদর্শে সমভাবে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত ও অভ্যস্ত হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় ঐক্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখনই আমরা জাতীয় সংহতি এবং তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্মশক্তি অর্জন করতে সক্ষম হব। সর্বজনীন শিক্ষার এই ধারা অবলম্বনেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং কেহই তখন আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করতে পারবে না।

এই উদ্দেশ্যসাধনে আমাদের স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে বলে দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা বলতে প্রথমতঃ লিখন পঠন ও গণিতবিদ্যা বোঝায়। যতদিন আমরা নিজেরাই এই ভার বহনে সমর্থ, ভাষার ভৌগোলিক সীমা বা প্রভেদ আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে ব্যবধানের সৃষ্টি না করলে এতদিন উড়িষ্যা বাংলা এবং বিহার এক ভাষাতেই কথা বলতো, একই বর্ণমালা ব্যবহার করতো এবং একই মহান সুসংবদ্ধ সাহিত্য প্রামাণিক হিসাবে উদ্ধৃত হতো। ভাষাসমস্যাকে সরল করবার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু করতে হবে, এবং সেজন্য কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত কোন প্রাণহীন প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা নিজেদের ক্ষীণ প্রচেষ্টা অনেক গুণ বেশী কার্যকরী এবং অনন্তগুণে শ্রেয়ঃ হবে।

নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা বহন করার অন্যতম সুবিধা এই যে, এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা সম্ভব। এতে বাইরের কোন শক্তিশালী প্রভাবের উপর নির্ভর করতে হয় না। কেন্দ্র-শক্তির যতই অদল-বদল হোক এবং পরি-বর্তনাদি হোক, যে উদ্যম জাতির ধমনীতে এইভাবে প্রবাহিত থাকে, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা কোথাও ব্যাহত হতে পায় না।

জনসাধারণকে শিক্ষাদান আমাদের একটি পবিত্র কর্তব্য বা ধর্ম—এই ভাবটি সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে জাতির মনে গেঁথে দিতে হবে। ভিক্ষাদানের আদর্শ আমাদের পূর্ব থেকেই রয়েছে। শিক্ষাদান সেই আদর্শের প্রসার মাত্র।

অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে একটি নিয়ম আছে। শিক্ষা সমাপ্ত হলে প্রত্যেক যুবককে তিন, চার বা পাঁচ বছর ধরে সামরিক বিভাগে কাজ করতে হয়, তাকে রীতিমত Barrack বা সেনানিবাসে গিয়ে সৈনিক তালিকাভুক্ত হয়ে খাঁটী সৈনিকের মতই পরিপূর্ণ সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তারপর সে স্থায়ী বেতনভুক সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হয়। নির্দিষ্ট কার্যকাল উত্তীর্ণ হলে সে

যখন সেনাবিভাগ থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে একজন সুশিক্ষিত সৈনিকে পরিণত হয়েছে। এর ফলে পরবর্তী জীবনে সে সর্বদাই স্বদেশ-রক্ষার্থে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধে সৈন্যদলের সঙ্গে যোগদান করবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

অনুরূপভাবে আমাদের একটি শিক্ষাসৈনিক-দল গঠন করতে হবে। শিক্ষা সমাপ্ত হলে প্রত্যেক ছাত্রকে তার স্বদেশবাসীর জন্য তিন বৎসর সময় উৎসর্গ করতে আহ্বান জানানো হবে। এমন একটি প্রস্তাবকে অসম্ভব মনে করবার কারণ নেই। অবশ্যই পাশ্চাত্য দেশে যেমন সামরিক বিভাগ বিধবার একমাত্র পুত্রকে সামরিক দায়িত্বপালন থেকে অব্যাহতি দেয়, তেমনি এখানেও যার উপার্জন সমগ্র পরিবারের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, তাকে এই শিক্ষাসংক্রান্ত সেবাকার্য থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। অপর পক্ষে যে ছাত্রটি শিক্ষাব্রতী হয়ে গ্রামে বাস করবে, গ্রামবাসীরা অনায়াসে তার ভরণপোষণের ভার বহন করতে পারবে। এইভাবে উক্ত শিক্ষাব্রতীর তিনবছর কার্যকাল উত্তীর্ণ হবার পর সে তার পুরাতন বিদ্যালয় বা কলেজ থেকে আর একজনকে আনিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত করে দিয়ে যাবে। কে জানে, এদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো অনাড়ম্বর সরল পল্লী-জীবনকে ভালবেসে স্বেচ্ছায় দরিদ্র শিক্ষকের জীবন বরণ করে আমরণ গ্রামেই কাটিয়ে যাবে! অধিকাংশই অবশ্য তিন বৎসরের ব্রত পালনান্তে শহরে প্রত্যাবর্তন করে অধিকতর জটিল নাগরিক জীবনে ফিরে যাবে। একদিকে শিক্ষা দেওয়ার কর্তব্য, অপরপক্ষে শিক্ষকের ভরণপোষণের দায়িত্ব—এইভাবে শিক্ষক ও যারা শিক্ষালাভ করবে উভয়ের সম্মিলনে একটি সুন্দর সামাজিক আত্মীয়তা বা ঐক্যবোধ গড়ে উঠবে। এইভাবে উপরি উক্ত আদর্শকে যদি একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে কার্যে রূপায়িত করা যায় তাহলেও সমগ্র জনসাধারণকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে ত্রিশ বৎসর লাগবে। কিন্তু এই সঙ্গে প্রাচ্য পদ্ধতিকে আমরা কদাচ উপেক্ষা করব না, যার বৈশিষ্ট্য হল সামান্যতম সমাজসেবাকেও আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রচারশীল করে তোলা। যে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সুপরিপক্কতা লাভ করেছে তাকে পুনরায় চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে ভারতবর্ষ কখনো ভোলে না। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর শিক্ষাদানের স্পৃহা জাগ্রত করবার প্রয়াসও চলবে। 'শিক্ষককে অন্নদান' এবং 'জনসাধারণকে জ্ঞানদান' একই আদর্শের দুই পিঠ এবং এক-সঙ্গে সমানভাবে তা শেখাতে হবে।

কোন রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানই এইরূপ একটি পরিকল্পনার ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করতে পারবে না। জনসাধারণের ও ছাত্রদের সম্মিলিত আবেগই কেবল এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে। কিন্তু ইহা অসম্ভব নয়। একথা সত্য যে, মৌলিক চিন্তার বা ভাবের প্রথম স্ফুরণ ঘটে শহরে, কিন্তু সেই ভাব প্রসারিত হলে তার সফলতা নির্ভর করে এই আদর্শের বেদীমূলে কতগুলি জীবন বলি দেওয়া যেতে পারে তার উপর। শেষ পর্যন্ত সব নির্ভর করবে কতগুলি মহৎ প্রাণ এই উদ্দেশ্য-সাধনে উৎসর্গীকৃত হবে তার উপরে। জীবন-দান ব্যতীত মানসক্ষেত্রে ছড়ানো আদর্শের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কতজন তাঁদের আরাম, আবাস, সুযোগ-সুবিধা এমন কি সমগ্র জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছেন?

সমালোচনা

MILITANT NATIONALISM IN INDIA—(1897—1917)—By Biman Behari Majumdar, M.A. Ph. D. ; published by General Printers & Publishers Ltd , 119, Dharamtala Street, Calcutta-13 ; p p. 202 + 10 ; Price Rs. 10/-

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জন্য প্রাণ-বলিদান ও ভয়হীন সংগ্রামশীলতার সে এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। পিস্তলের ধোঁয়া ও বোমার প্রবল বিস্ফোরণ সেদিন আকাশ-বাতাসকে যেভাবে আলোড়িত করিয়াছিল তাহা কালের দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক মূল্য ও তাৎপর্য ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিতেছে।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের কাহিনী লইয়া বাংলা ভাষায় যে সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে তাহার আয়তন নিতান্ত অল্প নহে। ইংরেজী ভাষায়ও এই বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই হয় বিপ্লবীদের স্মৃতিকথা, নয় আবেগ-উচ্ছ্বাসময় সঙ্গত শ্রদ্ধাঞ্জলি। ঐতিহাসিক গবেষণামূলক রচনায় এই আন্দোলনের স্বরূপনির্ণয় ও ইহার মূল্য-নির্ধারণের প্রয়াস কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। উপরোল্লিখিত গ্রন্থে ইতিহাস বিষয়ে খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার সেই অভাব দূর করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন।

লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবেদিতা-বক্তৃতামালায় ১৯৬৫ সালে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং ঐ বৎসরই তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে লালা লাজপত রায় শতবার্ষিকীতে যে বক্তৃতাগুলি করিয়াছিলেন তাহা এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। সে বক্তৃতাগুলির সহিত লেখক উপক্রমণিকা ও উপসংহারের অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। দুইশত দুই পৃষ্ঠার স্বল্পায়তন পুস্তকে সে অভ্যুত্থানের সমগ্র ইতিহাসকে বিবৃত করা সম্ভব নহে। লেখক সে প্রয়াস করেনও নাই। ভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পশ্চাতে স্বামী বিবেকানন্দের যে প্রেরণা গভীরতম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার নিরপেক্ষ ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণকে তিনি প্রধান লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক-জনোচিত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি তথ্যাবলীর নিপুণ পর্যালোচনা দ্বারা এ কার্যে গৌরবময় সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের সুচিন্তিত আলোচনা, বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা, ভারতের বাহিরে ভারতীয় বিপ্লবীদের আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিপ্লবী আন্দোলন প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের গতি ও প্রকৃতির একটি ইতিহাস-সম্মত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার রচনা বিপ্লবের আবেগ-সর্বস্ব গৌরবগাথা নহে। কিন্তু যুক্তিবিচার ও সংযত তথ্যসমাবেশের দ্বারা তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এই আন্দোলনের গৌরবময় রূপটি পাঠকের চিত্তে সংশয়াতীতরূপে ফুটিয়া ওঠে। এই আন্দোলনের দুর্বলতার দিকটিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণের উন্নয়নের যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহাকে বাস্তবে রূপদান না করা, বিপ্লবী নেতাদের কোন কোন ক্ষেত্রে আত্ম-

কলহ, জনসাধারণের বিরাগ সৃষ্টি করিয়া রাজনৈতিক ডাকাতি প্রভৃতি কিভাবে এই আন্দোলনের শক্তিক্ষয় করিয়াছিল, লেখক তাহাও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিপ্লবপ্রচেষ্টার যথার্থ মূল্যনির্ণয় করিতে গিয়া তিনি মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষাই এই বিপ্লবের জনক—ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে শ্রীঅরবিন্দ, ভাই পরমানন্দ, বীর সাভারকর প্রভৃতি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ব্যতিরেকে অধিকাংশ বিপ্লবীই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি গ্রন্থে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে সমালোচনা করিয়াছেন, লেখক যে তাহার কোন আলোচনা করেন নাই ইহা পাঠকের একটি আক্ষেপের কারণ। তবে ভারতীয় বিপ্লববাদের এই সুন্দর ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সমালোচনা রচনা করিয়া অধ্যাপক মজুমদার পাঠক-সম্প্রদায়কে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা অত্যুক্তি নহে।

—প্রেমবল্লভ সেন

জে. জে. গুডউইনের সমাধিস্থলে স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন

উটকামণ্ডে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে গত ২৩. ৪. ৬৭ তারিখ বিকাল সাড়ে চারটার সময় স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও ক্ষিপ্রলিপিকার স্বর্গত জে. জে. গুডউনের সমাধিস্থলের উপর নির্মিত একটি স্মৃতি-স্তম্ভের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সুসম্পন্ন হইয়াছে। সমাধিটি উটকামণ্ডের সেণ্ট টমাস গির্জার অন্তর্ভুক্ত সমাধিক্ষেত্রে অবস্থিত। স্মৃতিস্তম্ভটির উদ্বোধন করিয়াছেন কলিকাতার লর্ড বিশপ তথা ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের মেট্রোপলিটান রেঃ ডঃ আকদাসা ডি' মেল।

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সাধু, বহু বিশিষ্ট খৃষ্টান ধর্মনেতা, গির্জার সদস্য, বিভিন্ন ধর্মের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। স্থানীয় আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিষ্কামানন্দজী সকলকে অভিনন্দন জানাইয়া এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মনেতাদের সম্মেলনের গুরুত্ব জানাইবার পর রেঃ ডঃ ডি' মেল প্রার্থনান্তে স্মৃতিস্তম্ভটি উৎসর্গ করেন। তাঁহার ও সভাপতির ভাষণের পর ডঃ ডি' মেল, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী সম্ভবানন্দ ও স্বামী নিষ্কামানন্দ স্তম্ভমূলে বেদিতলে মাল্যদান করেন।

ধর্মার্থে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বিদেশী গুডউইনের সমাধিক্ষেত্রে এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে ধন্যবাদ জানাইয়া রেঃ ডি' মেল তাঁহার ভাষণে বলেন যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত ; আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। শুধু নিজ ধর্মাবলম্বীদেরই নয়,

যাঁহারা অন্য ধর্মাবলম্বী, যাঁহারা ধর্ম মানেন না, এমনকি যাঁহারা ধর্মদ্বেষী তাঁহাদেরও যেন আমরা ভালবাসিতে শিখি। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দই সারা ভারতের পথপ্রদর্শক। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিই কোন জাতিকে যথার্থ উন্নত করিতে পারে। গত বিশ বছরে ভারত এই নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। অনেক বড় বড় কল-কারখানা হইয়াছে, বহু পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের উন্নতি, ভারতের মহত্ত্ব কেবল এইসব বিরাট বিরাট কারখানা, বাঁধ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল নয়, যে সব মহান পুরুষ ও মহীয়সী নারী ভারতকে গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদেরই উপর উহা নির্ভরশীল। ভারতমাতা স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির মত সুসন্তান প্রসব করিয়াছেন; আমাদের সকলেরই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা উচিত, ভারতকে মহিমার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনে এদেশে আবার যেন ইঁহাদের মত মানুষ জন্মগ্রহণ করেন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলেন, স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া গুডউইনের রূপান্তর ঘটে, তিনি স্বামীজীর একজন বিশ্বস্ত ক্ষিপ্রলিপিকার ও শিষ্যরূপে তাঁহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতে স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যথাযথরূপে তাঁহার বাণীগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই আজ বিশ্ববাসী সেগুলিকে পাইতেছে। এজন্য সারা বিশ্বই এই স্বার্থহীন খৃষ্টানটির নিকট ঋণী। গুডউইনের অন্তরস্থ খৃষ্টধর্মের যথার্থ ভাবটির বিকাশই তাঁহাকে স্বামীজীর কাজের মাধ্যমে বিশ্বমানবের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিল। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য আজ সেণ্ট টমাস গির্জার প্রাঙ্গণে সমবেত এই বিভিন্ন ধর্মের লোকের সমবেত প্রচেষ্টা ভারতের ভূমিতে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়, অধিকতর ধর্মানুভূতি, সহনশীলতা, সহানুভূতি ও একত্বের দ্বার অবারিত করুক।

সমাধি-বেদির উপর গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত স্তম্ভটির উচ্চতা ১০ ফুট। শীর্ষদেশে মর্মরনির্মিত শুভ্র ক্রুশ-চিহ্ন খোদিত যে বেদিটির উপর স্তম্ভটি স্থাপিত, তাহার চারিদিকে চারিটি মর্মরফলক সন্নিবিষ্ট। গুডউইনের দেহত্যাগ-সংবাদ পাইবার পর স্বামীজী তাঁহার উদ্দেশে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন (Requiescat in Pace) একদিকে তাহা খোদিত রহিয়াছে। বাকী তিনদিকে গুডউইনের পরিচয়, উৎসর্গের বিবরণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংবাদ খোদিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্য যথাযথভাবে পরিচালিত হইতেছে।

উত্তরপ্রদেশে বান্দা জেলায় মাউ ও কারউই তহশীলে এবং বিহারে হাজারীবাগ জেলায় ইট-খোরী ব্লকে, মুঙ্গের জেলায় চকাই ও ঝাঝা ব্লকে এবং সাঁওতাল পরগণা জেলার মোহনপুর ব্লকে ৩১শে মার্চ, ১৯৬৭ পর্যন্ত এই সেবাকার্যে ১,২৭,৫৭৩ জনকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে:

চাল ১৫,৭৭৪ কেজি, গম ১,০৮,৬৫৮ কেজি, জোয়ার ১,২৭,০৬২ কেজি, শিশু-খাদ্য ২,৪০০ কৌটা, জমানো দুধ ১৬ কৌটা, ৬৭,৯৩৪টি ভিটামিন ট্যাবলেট, ধুতি ২,৮৫২ খানি, শাড়ী ৪,০৪৩ খানি, পোষাক (সুতী) ৭,২১২ খানি (নূতন ২,৫২৫, পুরাতন ৪,৬৮৭), তুলার কম্বল ৮,৯২৮টি, পশমী কম্বল ৩৭টি, গরম সোয়েটার ১৫৮টি, পশমী জ্যাকেট ৩৯টি, পশমী টুপী ১৭৫টি, লংক্লথ ৮৭৬ গজ, বিস্কুট ৬·২৫ কেজি, হরলিকস ৫১ পাউণ্ড, সুতী জামা ৯৭টি, চাদর ৮৮৪টি।

অবস্থার উন্নতি ঘটায় বান্দা জেলায় সেবা-কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উত্তর-প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় ১লা এপ্রিল হইতে একটি নূতন সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

দেওঘর বিদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষায়তন। ১৯৬৪-৬৫ এবং ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বিহারে মিহিজামে ছাত্রদের আবাসিক উচ্চবিদ্যালয়রূপে বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যনাথধামে ইহা স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র-রূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। প্রাচীন গুরুকুল আদর্শে পরিচালিত এই আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের চরিত্রগঠন এবং শরীর-মনের সুষম বিকাশ-সাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা সেণ্ট্রাল বোর্ড (নিউ দিল্লী) এর স্বীকৃতিলাভের পর বিদ্যাপীঠে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজীতে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার দুইটি ধারা বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রগণ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে উক্ত বোর্ডের সর্বভারতীয় উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারিবে এবং ভারতের যে কোন মহাবিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হইতে পারিবে। বিদ্যাপীঠের ছাত্রসংখ্যা ২৮৩। ভারতের ১০টি রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ এখানে অধ্যয়ন করে।

বিদ্যাপীঠে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সূচীকর্ম, বাগান করা প্রভৃতি শিখাইবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ব্যায়ামচর্চা, নানাপ্রকার খেলা, ড্রিল, ভ্রমণ, ক্যাম্পিং প্রভৃতি সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যাপীঠের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান – ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ স্টোরস্ এবং বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়।

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের ৮,৩৯৫ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক আছে। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক সংবাদপত্র এবং ৩৮টি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা লওয়া হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক মতে ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে মোট ১৫,০০৯ জন স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দরিদ্র রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে ৪,০৬৯ জন নূতন রোগী।

প্রতিবৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা প্রভৃতি সুন্দর-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের শুভাগমন

গত ২১শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শুভ পদার্পণ করেন। তাঁহার শুভাগমনে এই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ২৮শে মার্চ পর্যন্ত আশ্রম আনন্দমুখর হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মেখলীগঞ্জ, মাথাভাঙা ও জলপাইগুড়ির ভক্তবৃন্দ তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন।

গত ২৬শে মার্চ রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে সমাগত ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সন্ধ্যারতির পর স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী শ্রীরাম-কৃষ্ণের ভাবধারা ছায়াচিত্রযোগে আলোচনা করিয়াছিলেন।

বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে গত ১৩ই মার্চ হইতে ১৯শে মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে পূজা-পাঠ ভজনাদির পর স্বামী ভাস্বরা-নন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী অপূর্বানন্দজী। মধ্যাহ্নে সমবেত ভক্ত-মণ্ডলীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সারারাত শ্রীমন্দিরে ৺কালীমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ই ও ১৫ই তারিখে অনুষ্ঠিত "সংস্কৃত-বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী-সম্মেলনের" আলোচনা ও বক্তৃতার বিষয় ছিল—"যো রামঃ যশ্চ কৃষ্ণঃ স এবৈদানীং রামকৃষ্ণঃ"। ১৪ই অপরাহ্ণে ঐ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন কাশীর মহারাজ শ্রীমান্ বিভূতি নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এবং ঐ দিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কুলপতি ডঃ সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, এবং দ্বিতীয় দিনে সভাপতি ছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য। ঐ সম্মেলনে ছয় জন সংস্কৃতের বিশিষ্ট অধ্যাপক ভাষণ দিয়াছিলেন এবং ৩২ জন সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যার্থী প্রবন্ধ- ও বক্তৃতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করে। সম্মেলনে সম্পূর্ণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় সংস্কৃতভাষায় এবং ছয়শত টাকার সংস্কৃত গ্রন্থাদি প্রতিযোগীদের মধ্যে পারিতোষিকরূপে বিতরিত হয়।

১৭ই শুক্রবার সায়াহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয় ও সার্বভৌমভাব অবলম্বনে ভাষণ দেন প্রফেসার এস সি. দাশগুপ্ত।

রবিবার সাধারণ সভায় পৌরোহিত্য করেন কাশী বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি শ্রীবীরবল সিংহ। ঐ সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দেন—মীমাংসারত্ন পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্যম শাস্ত্রী, এবং হিন্দীতে বলেন—ডঃ বিশুদ্ধানন্দ পাঠক, ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন স্বামী অজয়ানন্দ এবং বাংলায় ভাষণ দেন স্বামী অপূর্বানন্দ।

চারিদিন অপরাহ্ণে এবং প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় রামনামসংকীর্তনাদির ব্যবস্থা ছিল।

জামসেদপুর : রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির আশ্রম-প্রাঙ্গণে গত ১৩ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব পূজা-হোমাদিসহ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৭শে সন্ধ্যায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভা আহূত হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে হিন্দী ভাষণ দেন স্থানীয় অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণকুমার মিশ্র। শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও সভাপতি মহারাজ বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন।

এতদুপলক্ষে ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে মার্চ আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভা প্রতিদিন সকালে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই মার্চ সভাপতিত্ব করেন টাটা স্টীল কোম্পানীর ডিরেক্টর শ্রীরুসি মোদি। সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী স্বামীজীর আদর্শে শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাণ্ডপার্টিসহ 'গার্ড অব অনার', আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ও সুশৃঙ্খল হইয়াছিল।

১৯শে মার্চ প্রাতে পুরস্কারবিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন টাটা কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কে. রাজা, এবং ২০শে মার্চ পৌরোহিত্য করেন টাটা কোম্পানীর শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা শ্রীযুক্ত বি. এন. সাক্সেনা। ১৯শে অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং ২০শে তারিখ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শিক্ষাপ্রসঙ্গে ভাষণ দেন।

১৮ই এবং ১৯শে দুই দিন সঙ্গীত-শিক্ষাসমিতি দ্বারা এবং শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরিচালনায় যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারত প্রব্রজ্যা সঙ্গীতসহকারে পরিবেশিত হয়। গীতি-আলেখ্য দুইটি খুবই মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৪শে মার্চ হইতে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক জন্মোৎসব মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২৪শে মার্চ শুক্রবার শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, ভজন ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত জনসভায় শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) সভাপতিত্ব করেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এবং সভাপতি মহোদয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে যুগোপযোগী সুন্দর ভাষণ দেন। সভান্তে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

২৫শে মার্চ শনিবার ধর্মসভায় স্বামী ঈশানানন্দজী এবং ডক্টর রমা চৌধুরী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও কথা প্রাণস্পর্শী-ভাবে আলোচনা করেন। সভান্তে স্বামী পুণ্যানন্দজীর পরিচালনায় রহড়া বালকাশ্রমের বিদ্যার্থিবৃন্দ কর্তৃক 'রামকৃষ্ণ-বাল্যলীলা' পরিবেশিত হয়।

২৬শে মার্চ রবিবার অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে জনসভার অধিবেশন হয়। স্বামী পুণ্যানন্দজী এবং সভাপতি মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় যুগাচার্য স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত করেন। সভার পর আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক 'তাল-বেতাল' নাটকাভিনয় শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করে।

২৭শে মার্চ জনসভায় আলোচিত বিষয় ছিল—শিক্ষা। সভায় পৌরোহিত্য করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। সভায় আশ্রমের কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে আশ্রমের ছাত্রগণ 'কর্ণার্জুন' নাটক অভিনয় করে।

কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৭ই এপ্রিল হইতে তিনদিনব্যাপী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজা, পাঠ, হোম, প্রসাদবিতরণ ও ধর্মালোচনা উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। ৭ই এপ্রিল ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুনীলকুমার গুইন এবং বক্তৃতা দেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু এবং স্বামী অন্নদানন্দজী। ৮ই এপ্রিল ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীলক্ষণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বক্তৃতা দেন স্বামী জীবানন্দজী ও ৯ই এপ্রিল ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী জীবানন্দজী এবং বক্তৃতা দেন স্বামী অন্নদানন্দজী। প্রতিদিন সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে সভাপতি ও বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। প্রত্যেক সভায় অন্যূন দুই হাজার নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

সভান্তে শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীহরিপদ কর 'সুরে কথামৃত', ভজনসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত ও পল্লীসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ৯ই এপ্রিল রবিবার সহর ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে সমাগত ২০টি হরিনাম-সংকীর্তন-সম্প্রদায় হরিনাম সংকীর্তন করেন। ঐ দিন প্রায় ছয় হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বেলঘরিয়াঃ গত ১৭ই হইতে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত চারিদিন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রম শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আনন্দমুখর ছিল। সুষ্ঠুভাবে পূজা সম্পন্ন হইয়াছে। পূজার কয়দিন দৈনিক প্রায় আট-নয় শত ভক্তসমাগম হইত। ১৯শে তারিখ, মহানবমীর দিন আশ্রমে দেড় শতাধিক সাধুর সমাগম হইয়াছিল। প্রতিদিনই সমাগত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় দুঃস্থগণের মধ্যে ১০৮ খানি শাড়ী ও ১০৮ খানি গামছা বিতরণ উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৪শে মার্চ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ ১৩২তম জন্মোৎসব আনন্দের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ, ভজন, পূজা, হোমাদির পর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা-শাসক মাননীয় এ, এম, নূরুল ইসলাম (সি, এস, পি) সাহেব। মাননীয় চিন্তাহরণ মল্লিক (ই, পি, সি, এস), শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন, প্রফেসর রামপ্রসাদ দেবনাথ, প্রঃ বিনোদ বিহারী দাস, জনাব ইউসুফ আলী, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মৃধা প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। ডাক্তার অরুণকুমার নাগ "শ্রীরামকৃষ্ণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাবলম্বনে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। সর্বশেষে আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী সুকুমার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয় ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের 'আমরা এমন শিক্ষা চাই যাহাতে চরিত্রগঠন হইতে পারে'—এই বিষয় অবলম্বনে একটি ভাষণ দেন।

জনাব নূরুল ইসলাম সাহেব তাঁহার সভাপতির ভাষণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার "যত মত তত পথ" বাণীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি আশ্রমের উন্নতির জন্য পাঁচশত এক টাকা দান করেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

আগরতলা (ত্রিপুরা) গাঙ্গাইল রোডে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৩ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসবে বিশেষ পূজাদির আয়োজন করা হয়। সকাল ৮ টায় দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে ১৫০টি ধুতি ও শাড়ী বিতরণ করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য।

১৪ই মার্চ আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের মুখ্য প্রশাসক শ্রীউমানাথ শর্মা। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ। শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীঅমূল্যকুমার লোধ-ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনায় যোগদান করেন।

১৫ই মার্চ আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত প্রায় ছয় হাজার ভক্তের মধ্যে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় 'রাণী রাসমনি' ছায়া-চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৬ই ও ১৭ই মার্চ 'কথামৃত' পাঠ ও কীর্তন-ভজনাদি হইয়াছিল। ১৮ই মার্চ আয়োজিত ধর্মসভায় সুন্দর ভাষণ দেন স্বামী গোকুলানন্দজী।

স্বামী জীবানন্দজী ১৯শে মার্চ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী, ২০শে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন-কথা এবং ২১শে তারিখে যুগাচার্য স্বামীজীর ভাবাদর্শ মনোজ্ঞভাবে পরিবেশন করেন।

স্বামী জীবানন্দ আরও কয়েকটি বক্তৃতা দেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য: বি.টি. কলেজে 'আদর্শ শিক্ষা ও স্বামী বিবেকানন্দ', সারদা-সঙ্ঘে 'নারীজাতির আদর্শ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী' এবং আশ্রম-বিদ্যালয়ে 'ছাত্রজীবনের আদর্শ'।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত মার্চ মাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, রামায়ণ-কীর্তন ও ধর্ম-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অনুপমানন্দজী। স্বামী চিদাত্মানন্দজী ও পরশিবানন্দজী মহারাজ ভাষণ দেন। হিন্দী তথা বাংলা ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। আশ্রমের কার্য-বিবরণীতে জানানো হয়, আশ্রমস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত বৎসর ৪১,২২২ জন রোগীকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে।

চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ সমিতির উদ্যোগে গত ২৪শে মার্চ হইতে পাঁচদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ধর্মসভায় অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান যুগ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরে 'গোপী-গীতা' কথা-কীর্তন হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় 'গৌরগোপাল' (নদীয়ালীলা) নাট্যাভিনয় উপভোগ্য হইয়াছিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীআনন্দকুমার চক্রবর্তী—'ধর্মসমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন; সভাপতি স্বামী জীবানন্দ মহারাজ তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া দেশবাসীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ধর্মভাবে অনু-প্রাণিত হইতে আহ্বান করেন। পরে পাঁচালী-

সম্বলিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডীলীলা'-কীর্তন হয়। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী 'রামায়ণ' গান করেন। শেষ দিন সন্ধ্যায় 'মহা উদ্বোধন' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা)-নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে মণ্ডপ সমিতি কর্তৃক একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

নাটশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম: গত ২৪, ২৫, ২৬শে মার্চ নাটশাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৪শে মার্চ পূজা-পাঠাদি হইয়াছিল। বিকাল ৪টায় সঙ্গীতানুষ্ঠান, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর রামায়ণগান গীত হয়।

২৫শে মার্চ, বিশেষ পূজার পর প্রায় দশ হাজার ভক্তকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রে রামায়ণগান হইয়াছিল।

২৬শে মার্চ, বিকালে ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সর্বানন্দজী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী। শ্রীতারাপদ মাইতি, শ্রীমদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য এবং বিশোকাত্মানন্দজী সভায় ভাষণ দেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবধারা আলোচিত হয়। সভান্তে আশ্রমসম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ধাড়া সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বেহালা শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের (পর্ণশ্রী, বেহালা) উদ্যোগে গত ১লা ও ২রা এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিবস সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিবস কীর্তনসহ পল্লীপরিক্রমা, পূজা প্রভৃতির পর বিকালে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বিষয়ে ভাষণ দেন, বিবেকানন্দ সঙ্গীতসজ্ঘ 'নচিকেতা' গীতি-আলেখ্য ও ভজনসঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং সন্ধ্যায় বেলুড় মঠের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ভাঙ্গামোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২রা এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মবার্ষিক মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রাতে পূজাপাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৪,৫০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন, বৈকালে স্বামী নির্জরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি মহারাজ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচনা করেন। রাত্রে আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়।

পরলোকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা ঢাকুরিয়ার ব্যানার্জিপাড়া-নিবাসী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ২৭শে চৈত্র, ১৩৭৩ সন, (১০ই এপ্রিল, ১৯৬৭) ৬০ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ধর্মপ্রাণ সদাচারনিষ্ঠ ও পরোপকারী ছিলেন।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া তাঁহার জন্মস্থান। প্রথম জীবনে প্রায় দশ বৎসর তিনি কাটোয়া কোর্টে ওকালতি করেন এবং পরে মৃত্যু পর্যন্ত কলিকাতা ম্যাকলাউড কোম্পানী লিমিটেড-এ একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

দিব্য বাণী

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ২।১।১০
মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১

—কঠোপনিষদ্

(বিশ্ব জুড়ে যেথা রয়েছে যত প্রাণী—ব্রহ্মা-আদি যত দেবতাগণ-মাঝে,
মানব-পশু-পাখী-মৎস্য-তৃণাদিতে, যেথা-ই চেতনার বিকাশ রহিয়াছে—
ভিন্ন চেতনায় চেতন নহে কেহ, একটি চেতনাই রয়েছে সব ঠাঁই,
একই চেতনারে, চেতন ব্রহ্মেরে, ভিন্ন মনাদিতে ভিন্ন মনে হয়—
বিবিধ আকারের বিবিধ বর্ণের অযুত দর্পণে একই সূর্যেরে
অযুত আকারের অযুত বর্ণের অযুত রবি বলি যেমন চিত লয়।
কারণোপাধি-মাঝে প্রকট ঈশ্বরও চেতনা লভে সেই একই চেতনায়!)

আমার মাঝে যেই চেতনা ঝলকিছে, ঈশ্বর-ও সেই চেতনা-ঝলকিত
চেতনা বহু নাই—সেথাও যে-চেতনা, হেথাও সেই একই চেতনা বিরাজিত।
একথা যেই জন পারে না জানিবারে, নানান উপাধিতে জড়িত চেতনায়
নানান জীব বলি' ভাবে ও দেখে যেবা, জগতে বার বার জনম লভি' হায়—
জনম-মরণের চক্রপথে ঘুরি'—মরণ হ'তে সে যে মরণ-দ্বারে যায়!
ব্রহ্ম ছাড়া আর নাহিক কোন কিছু—এ জ্ঞান নাহি লভি' নানা যে দেখে তার
একটি দেহ-নাশে আবার দেহ হয়—মরণ দেখা দেয় সমুখে বার বার!
(নিজ-স্বরূপ যার বিদিত হয় তার তখনি খুলে যায় চিরজীবন-দ্বার!)

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্ম কি 'অসত্য' ও 'ক্ষতিকর'?

গত ১৮ই মে তারিখের 'The Indian Nation' নামক দৈনিকপত্রে 'All Religions Are Un-true and Harmful' শিরোনামে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে জগতের বর্তমান সঙ্কটমুহূর্তে অনুধাবনযোগ্য অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান কয়েকটি কথা তিনি বলিয়াছেন। মানবজাতিকে বর্তমান আন্তর্জাতিক বিভীষিকার হাত হইতে বাঁচাইবার একটি নিঃসংশয় পথ তিনি দেখাইয়াছেন :

প্রতিবেশী মানবগোষ্ঠীকে নিজের চেয়ে বড় বা ছোট বলিয়া যেন না ভাবি আমরা – সবাইকে সমান বলিয়া ভাবিতে শিখি ; যেন মনে রাখি যে এই সাম্যভাবের অভাবই মারাত্মক সংঘর্ষের কারণ হয় ; বিশেষ করিয়া বর্তমান যুগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই সাম্যবোধ এখন সর্বাধিক প্রয়োজন। জগৎ আজ মুক্ত-হৃদয়, খোলা-মন মানুষ চায় ; দ্বন্দ্ব চায় না, চায় সহযোগিতা। চায় দলগত-বিরোধ-মুক্ত মানুষ। চায় মানুষের মধ্যে যুক্তি-উন্মুখতা, চায় উদার সহিষ্ণুতা ; চায় এমন মন, যাহা নূতন বা পুরাতন কোনওরূপ দলগত ভাবের কারাগারে বদ্ধ নয়, যাহা স্বাধীন। সেজন্য সর্বদেশের বালকদের শিক্ষা এমন ভাবে দিতে হইবে, যাহাতে পৃথিবীর সকল মানুষের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার পথ তাহার কাছে খোলা থাকে, কোন একটি বিশেষ চিন্তার প্রাচীরে তাহাকে জোর করিয়া রুদ্ধ রাখিয়া সেখানে অপর চিন্তার প্রবেশের পথ যেন বন্ধ করা না হয়। বর্তমানে সর্বত্রই এরূপ প্রাচীর তোলা হইতেছে, এবং তাহার ফলে বাল্যকাল হইতে একটি বিশেষ ভাবকে ভালবাসিতে ও অপর ভাবকে, তাহার ভালমন্দ না জানিয়াই, ঘৃণা করিতে শিখিয়া মানুষ সারা জীবনের জন্য অপরের সহিত মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হইবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিতেছে।

এ কথাগুলি খুবই যুক্তিপূর্ণ, এবং ইহাই যে এখন প্রয়োজন তাহাতে মানবকল্যাণকামী, বিশ্বশান্তিকামী কাহারো কোন দ্বিমত থাকিবার কারণ নাই। এ চিন্তাকে সারা জগতের মানুষ অনুধাবন করিয়া যতশীঘ্র কার্যে পরিণত করে, ততই কল্যাণ।

কিন্তু একথা বলিতে গিয়া এবং ইহার সমর্থনে যুক্তি দেখাইতে গিয়া তিনি একটি মারাত্মক অসত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন ; বলিয়াছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস সব ধর্মই অ-সত্য ও ক্ষতিকর।"

ইহার সমর্থনে যে যুক্তিগুলি তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা দেখিলে সকলেই সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক প্রথা এবং রাষ্ট্রশক্তিকর্তৃক ধর্মকে নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধিতে প্রয়োগ—এ সব কিছুকেই তিনি একসঙ্গে ধর্মের সঙ্গে তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন, এবং উহাদের দোষগুলি সবই ধর্মের দোষ বলিয়া ধরিয়া লইয়া ধর্মকে 'মিথ্যা ও ক্ষতিকর' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মজার কথা, কম্যুনিজমকেও তিনি ধর্ম বলিয়াছেন

এবং হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, মুসলমানধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের সমপর্যায়ে ফেলিয়াছেন; বলিয়াছেন, "আমার মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ও মুসলম'নধর্ম ও কম্যুনিজম্ সব ধর্মই অ-সত্য ও ক্ষতিকর

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ অতি প্রাচীন-কাল হইতে বিভিন্ন যুগে বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহারকারী সত্য (ঈশ্বর) সম্বন্ধে বা তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর সত্য—ঈশ্বর ও নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে, এক কথায় জীবন ও বিশ্বের চরম সত্য সম্বন্ধে যে সত্যগুলি আবিষ্কার করিয়াছে, সেগুলিকেই সাধারণতঃ আমরা 'ধর্ম' আখ্যা দিই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সব ধর্মই মানুষের দেহাতীত সত্তায় বিশ্বাসী। সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতি বা রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কোন আবিষ্কারকে ধর্মের সহিত একাসনে বসানো যায় না, 'ধর্ম' বলা তো যায়ই না।

ব্যাপক অর্থে দেখিলে ঈশ্বরে বা নিজের দেহাতীত সত্তায় বিশ্বাসী না হইয়াও নিঃস্বার্থভাবে অপরের জাগতিক দুঃখকষ্ট দূর করিয়া সকলের কল্যাণ-সাধনের প্রচেষ্টাও ধর্ম —কারণ তাহাতে অজ্ঞাতসারে হইলেও হৃদয়ের প্রসারের মাধ্যমে, স্বার্থকে ক্ষীণতর করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ স্বরূপ-উপলব্ধির পথেই অগ্রসর হয়। কিন্তু রাসেল সে অর্থে কম্যুনিজম্‌কে ধর্ম বলেন নাই, সাধারণ অর্থেই বলিয়াছেন।

ধর্ম কি ক্ষতিকর?

ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য এক কথা আর তার প্রয়োগ অন্য কথা, ইহা ঠিক। কিন্তু ধর্মের এই অন্তর্নিহিত সত্যের উপলব্ধির জন্যই জীবনে, সামাজিক ক্ষেত্রাদিতে তাহার প্রয়োগ। ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির উদ্দেশ্য ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের উপলব্ধির জন্য মানুষকে সহায়তা করা। যুগে যুগে মানুষের সামাজিক ক্ষেত্রে, আচরণের পারিপার্শ্বিকে পরিবর্তন ঘটে বলিয়া যুগে যুগে এগুলিরও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যলাভের সহায়তার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যখন কেবল রাষ্ট্রের প্রয়োজনে উহা প্রয়োগ করা হয়, তখন উহা ধর্মের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া আসে। উহা তখন ধর্ম নয়, রাষ্ট্রনীতি মাত্র।

রাসেল এরূপ প্রয়োগের কুফল দেখিয়া এবং ইহাকেই 'ধর্ম' বলিয়া ধরিয়া লইয়া ধর্মকে ক্ষতিকর বলিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন, "ধর্ম দুই ধরনের ক্ষতি করে। প্রথম, একটি বিশেষ মতে বিশ্বাস করিতেই হইবে। দ্বিতীয় কয়েকটি নীতি মানিতে হইবে। ধরিয়া লইতে হইবে, এই নীতির বিরোধী কিছু নাই; যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা ধ্বংস করিতে হইবে।"

"এই যুক্তিতে রাশিয়ায় কম্যুনিজম্ ছাড়া ছেলেদের আর কিছুই শেখানো হয় না, ইহার বিরোধী যুক্তিগুলিকে প্রবেশ করিতেই দেওয়া হয় না সেখানে। আমেরিকায় ক্যাপিটালিজম্‌ই শেখানো হয়, অন্যসব চিন্তাকে দূরে সরাইয়া রাখা হয়। ফলে, নিজ নিজ মতবাদেই শুধু সকলের বিশ্বাস অটল থাকে এবং মারাত্মক যুদ্ধের জন্য পটভূমি প্রস্তুত হয় এভাবে।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "এটা বা ওটা বিশ্বাস করিতেই হইবে—অনুসন্ধানে যদি বোঝা যায় যে তাহা সত্য নয় তাহা হইলেও—এই ভাব রাষ্ট্রীয় শিক্ষাকেও উদ্বুদ্ধ করে এবং ফলে শিক্ষার্থিগণের মনে একদেশী ভাব আসে। যাহারা এ বিশ্বাসে আস্থাহীন তাহাদের প্রতি, বিশেষ করিয়া যাহারা ধর্মোন্মাদ নহে তাহাদের প্রতি একটা ধর্মান্ধ আক্রোশ জন্মে তাহাদের মনে।"

ইহার মধ্যে ধর্মের দোষ যে কোথায়, খুঁজিয়া পাওয়া দায় দোষ তো পরিষ্কার দেখা যায় রাষ্ট্রপরিচালকদের নীতির ধর্মকে ইহার জন্য যদি অপব্যবহার করা হয় কোথাও, তাহা ধর্মের দোষ নয়, ইহার জন্য ধর্মকে 'ক্ষতিকর' বলা যায় না।

যেমন বিজ্ঞানকে ক্ষতিকর বলা যায় না রাষ্ট্রনেতাগণ মারণাস্ত্রের নির্মাণকার্যে উহার প্রয়োগ করেন বলিয়া বা মারণাস্ত্রনির্মাণ কার্যে যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদিগকে সেভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা দেন বলিয়া।

এই প্রসঙ্গে তিনি ধর্মের কয়েকটি নিশ্চিত ক্ষতিকর প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। সেখানেও কিন্তু হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের (ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের) সঙ্গে রাশিয়ায় কম্যুনিজম্‌কে এক পর্যায়ে ফেলিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দুদের 'গোমাতা-বোধ' এবং বিধবার পুনর্বিবাহে নিষেধ, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রতি ক্যাথলিকদের বিরূপ মনোভাব (যদি আদৌ এভাব ভবিষ্যতে কার্যকরী হয়) এবং কম্যুনিষ্টদের সংখ্যালঘু 'যথার্থ বিশ্বাসী-দের' 'ডিক্টেটরশিপ'—এসবই অনর্থক কষ্টের এবং শেষেরটি যুদ্ধকে অপরিহার্য করিয়া তোলার কারণ।"

প্রথম তিনটি প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ধর্মভাব-প্রণোদিত, ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবার সহায়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রচলিত। কিন্তু শেষেরটি নিছক রাষ্ট্রনীতি ছাড়া কি? ধর্মের সহিত ইহার সম্পর্ক কোথায়?

হিন্দুদের 'গোমাতা-বোধ' এবং বিধবাবিবাহ-নিষেধ ধর্ম-সংশ্লিষ্ট হইলেও যুগপ্রয়োজনে প্রযুক্ত মাত্র। সমাজিক অবস্থা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, সেই অনুসারে এই সব বিধি-নিষেধ-গুলিকে যুগোপযোগী করা হয়। একদা হিন্দু-ধর্মে গোবধ নিষিদ্ধ ছিল না। পরে প্রয়োজন-বোধে উহা নিষিদ্ধ হইযাছে। বিধবাবিবাহ সর্বক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল না, এখনও নিম্নবর্ণের মধ্যে উহা প্রচলিত। প্রয়োজন হইলে সমাজ উচ্চবর্ণের মধ্যেও যথাসময়ে উহার প্রচলন করিতে পারে, তাহাতে হিন্দুধর্মের হানি কিছু হইবে না। এসব বিধি-নিষেধ সমাজ-প্রয়োজনেই, ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। ভারতীয় শাশ্বত ভাবধারার সঙ্গে সুপরিচিতা, শিক্ষিতা, চিন্তাশীলা ভারতীয় নারীগণ যদি এ প্রথাকে সত্যই এ যুগে সমাজের ক্ষতিকর বলিয়া মনে করেন এবং ইহার প্রচলনে ধর্ম-জীবন ব্যাহত হইবে না বলিয়া স্থির করেন, তবে তাঁহারাই একদিন ইহার পুনঃপ্রচলন করিবেন। আর যদি এই উচ্চাদর্শকে ধরিয়া রাখাই কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন তো তাহাই করিবেন। উহা করা বা না করা কোনটাই মূল ধর্মের অঙ্গ নয়, সামাজিক প্রথার প্রয়োগ চিরপরিবর্তনশীল। তবে, স্বামীজী এপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই অনু-সরণে ইহা বলি—ত্যাগের, সংযমের আদর্শানু-সরণের আনন্দ ও শান্তির আস্বাদ যাঁহারা পান নাই, ভোগ্যবস্তু ও ভোগের সুযোগ লাভের আধিক্যই যাঁহাদের নিকট জাতির সভ্যতা ও উন্নতির একমাত্র মাপকাটি, সেই সীমিত-দৃষ্টি কাহারই—পাশ্চাত্যবাসীই হউন বা ভারতবাসীই হউন—এবিষয়ে কোন মতামত দিবার যোগ্যতা বা অধিকার নাই।

যে শিক্ষার ফলে আজ মানুষের মনে সাম্যভাব আসিতেছে না, অপর রাষ্ট্রের প্রতি সে হিংস্রভাবাপন্ন হইতেছে, শিক্ষার্থীদের মন পৃথিবীর সকল দেশের শুভকর চিন্তাগুলি আহরণ না করিতে পাইয়া একদেশী-ভাবাপন্ন

হইতেছে, এবং সেজন্য পৃথিবীতে শান্তি ব্যাহত হইতেছে. তাহার জন্য ধর্মকে 'ক্ষতিকর' বলা অযৌক্তিক।

পক্ষান্তরে, ধর্ম মানবের পরম কল্যাণাকর; কারণ মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করিবার এত বড় সহায়ক মানুষের আর নাই। মানুষের পক্ষে যাহা কিছু কল্যাণকর, তাহার সবকিছুরই উৎস ধর্ম। কারণ একমাত্র ধর্মই মানুষকে পরিপূর্ণভাবে স্বার্থহীন হইতে শিখাইতে পারে, অপরের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিতে শিখাইতে পারে। একমাত্র ধর্মই 'নিজেকেই সকলের মধ্যে' প্রত্যক্ষ করাইয়া মানুষের মনে যথার্থ সাম্যভাব আনিয়া দিতে সক্ষম। ধর্ম 'প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিতে' শেখায়, ধর্ম 'অপরের কল্যাণকে নিজেরই কল্যাণ' ভাবিতে শেখায়।

একমাত্র ঈশ্বরচিন্তায় বা নিজ স্বরূপের চিন্তায় মনের একাগ্র অভিনিবেশই মনে স্থায়ী শান্তি আনিতে এবং গভীর পরকল্যাণ-চিকীর্ষা জাগাইতে সক্ষম, জগতের আর কোন কিছুই নহে। বিরোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অশান্তি সবই আসে ধর্মহীনতা হইতে বা ধর্মের অপপ্রয়োগ হইতে।

ধর্মের এই অপপ্রয়োগ অবশ্য নূতন নয়, যুগে যুগে হইয়া আসিয়াছে এবং ইহারই ফলে জগতে বহু অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, 'ধরণী বারবার নররক্তসিক্তা হইয়াছেন'। ধর্মোন্মত্ততা ও ধার্মিকতা যে এক জিনিস নয়, তাহা আমরা সকলেই জানি।

কিন্তু তাই বলিয়া আমরা শান্তি খুঁজিতে যাইয়া শান্তিলাভের একমাত্র উপায়টিকে 'ক্ষতি-কর' বলিয়া যদি ঘোষণা করি এবং উহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হই, তাহা আমাদের সর্বনাশকেই টানিয়া আনিবে। করা যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে সর্বদেশে শিক্ষার মধ্যে যথার্থ ধর্মকে—সত্য সংযম এবং ঈশ্বর- বা আত্ম-বিশ্বাসকে—অনুপ্রবিষ্ট করানো, এবং ধর্মের অপপ্রয়োগ নির্মম-হস্তে রোধ করা।

ধর্ম 'অসত্য' বা যুক্তিবিরোধী নয়।

"যুক্তিই বলে একটির বেশী সত্য থাকিতে পারে না"—একথা সত্য, চরম সত্যের বেলা সত্য। কিন্তু চরম সত্য একটি হওয়া সত্ত্বেও মনোজগতে এবং জড়জগতে আপেক্ষিক সত্য যে বহু থাকিতে পারে এবং আছেও—আজ বিজ্ঞানই একথা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করা সত্ত্বেও কি করিয়া আমরা ভাবিতে পারি যে, "বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন কথা বলে বলিয়া যুক্তির দিক দিয়াই উহাদের ভিতর একটি ছাড়া আর সব মিথ্যা ?"

একবিন্দু রক্ত আমার সামনে রহিয়াছে। খালি চোখে আমি দেখিতেছি উহা সর্বত্র-সমপরিমাণ রক্তবর্ণ জলীয় পদার্থ। আমার সাধারণ দৃষ্টিশক্তি লইয়া দেখা এই পরিবেশে উহা 'লালরঙের জলীয় পদার্থ' ইহা সত্য। আবার এই সাধারণ দৃষ্টিতে প্রায়ান্ধকারে ঐ একই লালরঙের রক্তবিন্দুটি কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে। সে পরিবেশে তাহাও সত্য। আবার যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি বাড়াইয়া দেখিব, তখন ঐ একই রক্তবিন্দু সর্বত্র-সমপরিমাণ-রক্তবর্ণ নহে, তখন দেখিব প্রায়-স্বচ্ছ জলীয় পদার্থে কতকগুলি বিভিন্ন বর্ণের কণিকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, অবশ্য লালরঙের কণিকার সংখ্যারই আধিক্য সেখানে। সে পরিবেশে উহাই সত্য।

আবার বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে দেখিলে বুঝিব, লাল বা কোন নিজস্ব বর্ণই রক্তবিন্দুটিতে নাই (যদিও অন্ধকারে উহাকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিবার

সময় এই অ-সত্যটিই ভাবি আমরা—'উহার লালরংটি এখন দেখা যাইতেছে না'), আলোক-তরঙ্গ যখন আসে তখন সে উহাকে রক্তবর্ণের পোষাক পরায়, আবার চলিয়া যাইবার সময় পোষাকটি খুলিয়া লইয়া যায়। ইহাও সত্য।

আবার ধরিয়া লওয়া যাউক, আমরা আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আরো বাড়াইবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছি। ধরিয়া লওয়া যাউক, আমরা ইলেকট্রণ-প্রোটণ প্রভৃতিকে এবং শক্তিকেও দেখিবার মত উপায় আবিষ্কার করিয়াছি। তখন এই রক্তবিন্দুটিকেই অন্যরূপে দেখিব। দেখিব কয়েকটি দানামাত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছে, বা একমাত্র শক্তি ছাড়া উহার ভিতর আর কিছুই দেখা যাইতেছে না; কোন রং নয়, কোন জলীয় পদার্থ নয়, অন্য কোন কিছু নয়। ইহাও সত্য, বিজ্ঞানসম্মত সত্য।

এখন রক্তবিন্দুটির সত্যরূপ কোনটি? বলিতেই হইবে, আমাদের প্রত্যক্ষ করার যে বিভিন্ন পরিবেশে উহাকে যেসব বিভিন্নরূপে দেখি আমরা, সেই পরিবেশে সেগুলির সবই সত্য; যদিও যুক্তির দিক দিয়া (বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতেই) ইহাই চরম সত্য যে শক্তি ছাড়া আর কিছুই নাই সেখানে। শুধু সেখানে নয়, আমাদের বহুবিচিত্র রূপরসময় জগতের কোন বস্তুতেই নাই। এখন একই বস্তুকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে দেখিতে হয় বলিয়া সেগুলি মিথ্যা—এযুগে এ যুক্তি চলে না; আপেক্ষিক হইলেও এগুলি তৎকালে সবই সত্য—যেমন সাধারণ অবস্থায় আমাদের কাছে ইঁট মাটি জল সবই সত্য।

এখন যদি কেহ দাবী করেন: 'আমরা একটি নির্দিষ্ট পন্থাবলম্বনে আমাদের প্রত্যক্ষের শক্তি সত্য-সত্যই আরো বহুদূর বাড়াইতে পারি এবং সেভাবে প্রত্যক্ষের শক্তি বাড়াইয়া আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে সাধারণ অবস্থায় তুমি রক্তবিন্দুটির সে রূপ সত্য ভাবিতেছ, উহা তাহার যথার্থ রূপ নহে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া যাহা দেখিয়াছ তাহাও নহে, বৈজ্ঞানিকসত্য-ভিত্তিক বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে উহার যে রূপ কল্পনায় দেখিতেছ তাহাও নহে, আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি উহার ভিতর শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নাই। শুধু উহার ভিতর নয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুর ভিতরই নাই। তুমি যেমন এখন বিজ্ঞানের সত্য-ভিত্তিক যুক্তির আলোকে কল্পনায় দেখিতে পাও যে একই শক্তিকে বিভিন্ন অবস্থায় আমরা বিভিন্নরূপে দেখি, আমরা তেমনি সাক্ষাৎ ভাবেই দেখিয়াছি যে এক চৈতন্য-সত্তাকেই প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতার বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। চরম অবস্থায় উহাকে দেখা যায় শুদ্ধ-চৈতন্যমাত্ররূপে; প্রত্যক্ষের শক্তি স্বল্পমাত্র আবৃত থাকিলে সেই অদ্বয় নির্গুণ নিরাকার সত্তাকেই দেখা যায় রাম, কৃষ্ণ, কালী, মহম্মদ, যীশু প্রভৃতি বিভিন্ন নাম-রূপ-ও গুণ-বিশিষ্ট রূপে, আবার প্রত্যক্ষ-শক্তি আরো আবৃত হইলে তাঁহাকেই দেখি জগতের স্থূলসূক্ষ্ম বিবিধ বস্তুরূপে। আবার এইসব চিন্ময় ঈশ্বরীয় রূপের যে কোন একটিতে (নিজের রুচিমত) মন একাগ্র করার অভ্যাসের মাধ্যমে মানুষের অন্তরস্থ জ্ঞান ও শক্তি ক্রমবিকশিত হইয়া তাহার প্রত্যক্ষশক্তি বাড়াইয়া পরিণামে তাহাকে অদ্বয় চরমসত্য প্রত্যক্ষ করায়। আর আমি একা এরূপ দেখিয়াছি তাহা নয়, আমাদের মত চলিয়া বহুজন একইরূপ দেখিয়াছে, এবং তুমি নিজেও আমাদের নির্দেশমত চলিয়া নিজেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের উক্তির যাথার্থ্য পরীক্ষা করিয়া লইতে পার। সকলের জন্য ইহার

দ্বার অবারিত, যেমন অবারিত সকলের জন্যই বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিকে নিজে পরীক্ষা করিয়া লইবার দ্বার। আর এক কথা; বিজ্ঞানের চরম সত্য শিখাইতে হইলে তোমরা যেমন আপেক্ষিক সত্যের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীর শক্তি অনুযায়ী ধাপে ধাপে তাহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্য শিখাইতে শিখাইতে দীর্ঘকালের সাধনায় চরম সত্যকে ধারণা করার মত শক্তি সে অর্জন করিলে তখন তাহাকে উহা শেখাও, আমরাও তাহাই করি। সেজন্য প্রথমে ভগবান বা চরম সত্যকে নিজের পছন্দমত কোন একটি সাকাররূপে ভাবিতে শেখাই। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে সে নিজেই দেখে যিনি চার্চে বা মন্দিরে আছেন বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, তিনি আমার হৃদয়েও আছেন; পরে দেখে তিনিই সকলের মধ্যে, সব কিছুর ভিতরে আছেন। আর সব শেষে দেখে তিনি, আমি, বিশ্বজগৎ সবই একটি মাত্র নিত্য পরম আনন্দময় চৈতন্যসত্তায় একীভূত রহিয়াছে।'

নিজের এই প্রত্যক্ষের কথা যদি কেহ বলেন, আজ বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য ও যুক্তি বিশ্ব ও জীবনের চরম সত্যানুসন্ধানের পথে যে তীব্র আলোক ফেলিয়াছে তাহাতে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়, তাহাতে ইহাকে 'অ-সত্য' বলিয়া উড়াইয়া দিবার ক্ষমতা কোন যুক্তিরই নাই (এই সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া এই সত্যকে, সর্বধর্মমতোক্ত আপেক্ষিক ও চরম সত্যের সর্বত্রপ্রসারী সত্যকে নবতম সমর্থন দিয়া গিয়াছেন এবং বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নির্দেশিত পথে চলিয়া বৈজ্ঞানিকের মতই উহার যাথার্থ্য নিজেরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন), এবং নিজে পরীক্ষা করিয়া ফলাফল দেখিবার পূর্বে কোন বৈজ্ঞানিক-মনোভাবাপন্ন যুক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরই ইহাকে অ-সত্য বলিবার অধিকারই নাই।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন ধারণাশক্তি-সম্পন্ন লোকের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগুলির উদ্ভব। একই চরম সত্যকে বিভিন্ন স্তরের লোকের উপযোগী করিয়া বলা হইয়াছে। সেই আপেক্ষিক স্তরে উহার সবগুলিই সত্য।

ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও যে তাঁহার সৃষ্টিতে নেবুলা হইতে বর্তমান অবস্থায় আসিবার পরও হিটলার বা হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা যুক্তিবিরোধী কেন হইবে? শয়তান ও ঈশ্বর দুজনে মিলিয়া একজন মঙ্গলের ও অপর জন অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কথা সব ধর্ম বলে না। বেদান্ত বলে একই শক্তিদ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ সবই ঘটিতেছে এবং সৃষ্টির অন্তর্গত সব কিছুই কার্যকারণ-নিয়মের অধীন। যেমন জড়জগতের সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে, মনোজগতে, সূক্ষ্মজগতেও তাই। সৃষ্টির যে কোন ঘটনার ভালমন্দ উভয়েরই পিছনে কারণ কিছু আছে। এই নিয়ম সৃষ্ট হইয়াছে জগতের মূলে যে চরম সত্য (বা ভগবান) তাহা হইতে। কাজেই কার্যকারণ নিয়মের পারে যাহা অবস্থিত, সৃষ্টির কোন কিছু দ্বারাই তাহার সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া যায় না। ইহার জন্য ভগবানের সর্বশক্তিমত্তাতে সন্দিগ্ধ হইবার যুক্তিও কিছু নাই। তাঁহার যেমন ইচ্ছা তেমনি তিনি করিতে পারেন, আমাদের ইচ্ছামত নয়। তাছাড়া শুধুই কি অশুভের ক্রমবর্ধন হইতেছে জগতে? যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবমানবগণ কি আবির্ভূত হন নাই? মানুষ কি সামগ্রিকভাবে শুভ-অশুভের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া তাহার

স্বরূপের দিকে—ভগবানের দিকে—অগ্রসর হইতেছে না? "মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত অমঙ্গল কেন?"—এ প্রশ্নের সদুত্তর অবশ্য যুক্তিতে পাওয়া যায় না, সৃষ্টির পারে নিজকে লইয়া যাইতে পারিলে সেখানে উহার উত্তর পাওয়া যায়। যুক্তির পূজারী স্বামী বিবেকানন্দের মনও একদিন এই চিন্তায় অতি-বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, এবং বুদ্ধি তাঁহাকে কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই। একদিন সহসা তাঁহার মন উচ্চতর সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং সেখানে ইহার সদুত্তর পাইয়া তিনি তৃপ্ত হন।

ধর্ম অসত্য তো নয়ই, একমাত্র ধর্মই জগতের মূলে যে সত্য রহিয়াছে তাহার কথা মানুষকে শুনাইয়াছে। যে-বিজ্ঞানের আমরা বড়াই করি, তাহা সে সত্য হইতে এখনো বহু দূরে।

যুক্তিই পথপ্রদর্শক: বেদান্ত যুক্তিকে তৃপ্ত করে

একথা সত্য, শুধু ধর্মবিষয়ে কেন সব বিষয়েই সত্যাসত্য-নির্ণয়ের জন্য মানুষকে যুক্তির দ্বারস্থ হইতেই হয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যুক্তির অপব্যবহার যেন না হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ইংলণ্ডে প্রদত্ত 'যুক্তি ও ধর্ম' শীর্ষক বক্তৃতায় (বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, ২৩১ পৃঃ) বলিয়াছেন, "বর্তমান যুগে উহা (যুক্তির উপাসনা) অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে।... আধুনিক মানুষ প্রকাশ্যে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের গোপনপ্রদেশে এ বোধ জাগ্রত যে, সে আর 'বিশ্বাস' করিতে পারে না।" ধর্মের সত্যাসত্য নির্ণয় করার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, সব ধর্মেরই শাস্ত্র আছে এবং সেই শাস্ত্রের উক্তিই তাহার নিকট সত্য সম্বন্ধে চরম মীমাংসা। কিন্তু যখন দুইটি বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র পরস্পরবিরোধী বা বিভিন্ন কথা বলে বা আচরণের নির্দেশ দেয় (রাসেল এই প্রশ্নটির ভিত্তিতেই সব ধর্ম সত্য নয় বলিয়াছেন), তখন মীমাংসা কি ভাবে হইবে? স্বামীজী বলিয়াছেন, "গ্রন্থের দ্বারা নিশ্চয় নয়, কারণ পরস্পর-বিবদমান গ্রন্থগুলি বিচারক হইতে পারে না। কাজেই একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই সব গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বজনীন একটা কিছু আছে; একটা কিছু আছে, যাহা জগতে যত নীতিশাস্ত্র আছে, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর; একটা কিছু আছে, যাহা বিভিন্ন জাতির অনুপ্রেরণা-শক্তিগুলিকে পরস্পর তুলনা করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারে। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করি আর না করি, পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে আমরা যুক্তির দ্বারস্থ হই।"

কিন্তু যুক্তিও যদি যেখানে "আচার্যে আচার্যে বিরোধ" সেখানে বিচারে অক্ষম হয়, তখন? স্বামীজী বলিয়াছেন, তখন "মনুষ্য-প্রকৃতির কাছেই আমাদের আবেদন জানাইতে হইবে।" "মানুষই এই গ্রন্থগুলির স্রষ্টা। মানুষকে গড়িয়াছে এমন কোন গ্রন্থ এখনও আমাদের নজরে পড়ে নাই।" "তবু, একমাত্র যুক্তিই এই মানবপ্রকৃতির সহিত সরাসরি সংযুক্ত; সেজন্য যতক্ষণ উহা মানবপ্রকৃতির অনুগামী হয়, ততক্ষণ যুক্তিরই আশ্রয় লওয়া উচিত।" স্বামীজী তাই ধর্মের উপর যুক্তির প্রয়োগকে এযুগে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন—"আধুনিক কালের প্রত্যেক নরনারী যাহা করিতে চায়, আমি তাহাই বলিতে চাহিতেছি—সাম্প্রতিক জ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে ধর্মের উপর প্রয়োগ করিতে বলিতেছি।" "যুক্তির প্রথম নিয়ম এই যে বিশেষ-জ্ঞান সাধারণ-জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, সাধারণজ্ঞান ব্যাখাত হয় আরও

(বাকী অংশ ৩৩২ পৃষ্ঠায়)

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য*

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

এই আলোচনা-চক্রে যে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে আমরা সমবেত হয়েছি তা আজকের দিনে আমাদের জাতির সম্মুখে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—আমাদের ব্যক্তি- ও গোষ্ঠি-জীবনের সুরকে উচ্চগ্রামে বেঁধে তোলার সমস্যা। এই আলোচনা-চক্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়—"জাতীয় সংহতির ভিত্তিরূপে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য"। এর নয়টি বিভিন্ন শাখায় বিষয়টির বিভিন্ন দিক আলোচিত হবে। শাখাগুলির তালিকায় সর্বাগ্রে আছে আমাদের শাখার নাম; এই শাখাটি উদ্যোক্তাদের বিবেচনায় যা হল মুখ্য বিষয়টির ভিত্তি অর্থাৎ "নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য", তাই আলোচনা করতে আহূত হয়েছে। দেশ যাতে এ আলোচনার দ্বারা প্রকৃতই লাভবান হতে পারে সেজন্য আমি আপনাদের শ্রেষ্ঠ অবদানে একে সমৃদ্ধ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। যে দায়িত্ব আমরা স্কন্ধে নিয়েছি, তা অতি গুরু দায়িত্ব। আসুন, আমরা ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা-কালীন দীনতা ও স্থির সঙ্কল্প নিয়ে এ দায়িত্বপালনে অগ্রসর হই।

যে বিষয়ে আলোচনা করতে আজ আমরা আহূত তা শুধু ভারতে আমাদের ক্ষেত্রেই নয়, সারা পৃথিবীর, সকল দেশের, সব মানুষের স্বার্থের সঙ্গে অপরিহার্যরূপে জড়িত। কোন সমাজই তার অধিবাসীদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত না করে টিকে থাকতে বা অগ্রগতির পথে চলতে পারে না। আদিম বা উন্নত যে কোন সমাজের পক্ষেই এই সকল মূল্য সংহতিসাধনের মূল নীতি। একটি গৃহ নির্মাণ করতে গেলে যেমন পৃথক পৃথক ইঁটগুলিকে সিমেণ্ট দিয়ে জুড়তে হয়, ঠিক তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যসমূহ কতগুলি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-সত্তাকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সামাজিক সত্তা গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং তখন সেই সামাজিক সত্তা পৃথক পৃথক ব্যক্তি-সত্তার সমাবেশমাত্র থাকে না, ঠিক যেমন একটি নির্মিত গৃহ কতগুলি বিচ্ছিন্ন ইঁটের স্তূপমাত্র নয়।

কোন সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য উজ্জীবন করার সমস্যা এ মূল্যগুলির উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগায়। ঠিক এ ক্ষেত্রেই বর্তমান যুগে তীব্র মতভেদের উদ্ভব নিদারুণ বিভ্রান্তি ও তীক্ষ্ণ সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে এই সকল বহু বিভিন্ন বিরোধী মত দুইটি প্রধান পৃথক মতবাদে পরিণত হয়। প্রথম মতবাদটি এই সৃষ্টি, ধনার্জন, অর্জিত ঐহিক সম্পদরাশি উপভোগ এবং ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির সুযোগ অনুসন্ধানের উপর অনুচিত গুরুত্ব আরোপ করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মতবাদটি ওগুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়েও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তর অতিক্রম করে যে উচ্চতর মূল্য ও পরিতৃপ্তি আছে তারই দিকে মানুষকে পরিচালিত করে—পরিচালিত করে অধ্যাত্ম মুক্তি ও সংহতির

* "জাতীয় সংহতির ভিত্তিরূপে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য" প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য আহূত সর্বভারতীয় আলোচনা-চক্রের "নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য" শীর্ষক শাখায় ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদিকা—অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত।

অভিমুখে। মানুষই ঐহিক এবং ঐহিককে অতিক্রম করে তার উর্ধ্বে যে সকল মূল্য বিরাজ করছে তার স্রষ্টা, ভোক্তা এমন কি ধ্বংসকর্তাও। মানুষের প্রাধান্য সম্পর্কে এ সত্য ক্রমশই বর্তমান জগতে স্বীকৃতি পাচ্ছে। ভারতীয় চিন্তাধারা বরাবরই এ মত পোষণ করে এসেছে যে সর্বপ্রকার মূল্যের উৎস জড়পদার্থ নয়, মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মবস্তুই সকল মূল্যের উৎস। এ মত কয়েকজন আধুনিক চিন্তাবিদের নিকট থেকেও অনুমোদন লাভ করেছে, তাঁরা আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে "জড়পদার্থকে" একটি উপযোগী ও সুবিধাজনক ধারণা বলে গ্রহণ করলেও, 'জড়বাদ'কে মানুষের যান্ত্রিকতা-আনয়নকারী এবং তার ব্যক্তিত্বের মূল্য- ও সৌন্দর্য-হননকারী অশুভফলপ্রদ একটি অবৈজ্ঞানিক, অগ্রহণীয়, স্থূল ধারণা বলে মনে করেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রতিবাদমুখর ভাষায় (The Impact of Science on Society—সমাজের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব শীর্ষক পুস্তকের ৭৭ পৃঃ)—"আরাধ্য বস্তু হিসাবে যন্ত্র আধুনিক যুগে শয়তানের স্থান গ্রহণ করেছে এবং যন্ত্রের আরাধনা আধুনিক যুগের পিশাচ-সাধনা"··· "আর যাই-ই যান্ত্রিক হোক না কেন, মূল্য কখনও যান্ত্রিক হতে পারে না—এ কথা কোন রাজনীতি-দর্শনবেত্তার ভুলে যাওয়া উচিত নয়।"

এক শতাব্দী পূর্বে উচ্চারিত টমাস হাক্সলের আরও জোরালো ভাষায় (Methods and Results—'পদ্ধতি ও ফলাফল' নামক গ্রন্থের ১৬৪-১৬৫ পৃঃ) : "যদি দেখা যায় যে প্রকৃতির বিধান অনুধাবন করতে গেলে একপ্রকার পরিভাষা ও প্রতীক অন্যপ্রকার পরিভাষা ও প্রতীক অপেক্ষা অধিক উপযোগী তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের প্রথমটিই গ্রহণ করা সমীচীন। এবং যতক্ষণ আমরা স্মরণ রাখবো যে আমরা কেবল পরিভাষা এবং প্রতীকমাত্র ব্যবহার করছি, ততক্ষণ তাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।"

"কিন্তু যে বিজ্ঞানী দার্শনিক অনুসন্ধানের সীমাবদ্ধতার কথা বিস্মৃত হয়ে সূত্র ও প্রতীকের ধারণা হতে অবতরণ করে জড়বাদের কবলে পতিত হন, তিনি আমার মতে নিজেকে সেই গাণিতিকের পর্যায়ে নিয়ে যান, যিনি গাণিতিক সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যবহৃত 'X' এবং 'Y' প্রভৃতি সাংকেতিক চিহ্নগুলিকেই সত্যবস্তু বলে ধরে নেন, শুধু তাই নয়, ঐ গাণিতিকের তুলনায় তার আরও একটি অধিক অসুবিধার ব্যাপার আছে, তা হল এই যে গাণিতিকের ভুলের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন তাৎপর্য নেই, কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে নেওয়া জড়বাদের ভুলত্রুটি আমাদের জীবনের সব শক্তিকে এবং সব সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে দিতে পারে।"

নৈসর্গিক-পদার্থবিদ্যাবিদ আর, এ, মিলিকান তাঁর আত্মজীবনীতে (সমাপ্তিসূচক অধ্যায়) বলেছেন, "আমার মতে জড়বাদী দর্শনতত্ত্ব বুদ্ধিহীনতার চরম পরিচয়।"

বিশ শতকের প্রাণী-বিদ্যার আলোকে ক্রম-বিকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনাকালে জুলিয়ান হাক্সলেও (চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "ডারউইনের পরে ক্রমবিকাশবাদ" শীর্ষক গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে "ডারউইনীয় মতবাদের আবির্ভাব" শীর্ষক নিবন্ধ পৃঃ ২১) বলেছেন : "আমাদের বর্তমান জ্ঞানের আলোকে মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য শুধু বেঁচে থাকা নয়, সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, আঙ্গিকের জটিলতা বৃদ্ধি নয়,

কিংবা পারিপার্শ্বিকের উপর ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অর্জন নয়, মানবজাতির গোষ্ঠিগত জীবনের এবং পৃথকভাবে গোষ্ঠিভুক্ত ব্যক্তিদের সকল সম্ভাবনার অধিকতর পূর্ণতর উপলব্ধিই মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য।

মানবীয় স্তরে গুণের আবির্ভাবই ক্রম-বিকাশের অভিজ্ঞান—এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে হাক্সলে তাঁর "ক্রমবিকাশের দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন (পূর্বোক্ত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫১) "মানুষের ক্রমবিকাশ শুধু প্রাণী-তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার; এ ক্রমবিকাশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে কাজ করে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানসিক কার্য-কলাপ এবং মানসিক কার্যকলাপ সৃষ্ট বস্তুর স্ব স্ব পুনরুৎপাদন ও বৈচিত্র্যকরণ ঘটায়। এ মতানুসারে মানবীয় স্তরে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় মানসিক গঠনের প্রধান প্রধান নমুনা—জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের বিভিন্ন প্রকার নমুনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়; এগুলি শারীরিক বা জৈব সংগঠনের ব্যাপার নয়, এগুলি হল ভাবগত সংগঠনের ব্যাপার।" তিনি আরও বলেছেন (পৃঃ ২৬০-২৬১): "ক্রমবিকাশবিষয়ক সত্য আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য নির্দেশ করে, জড়পদার্থের উপর মনের আধিপত্য এবং গুণের নিকট পরিমাণের অধীনতা প্রকট করে।"

যদি মূল্যগুলি যান্ত্রিক বস্তু না হয়, যদি সেগুলি জড়-পরিবেশ-সঞ্জাত না হয়, তাহলে সেগুলি নিশ্চয়ই আত্মিক বস্তু এবং মানুষের সত্তার গভীরেই সেগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। ভারতীয় চিন্তাধারায় মনে করা হয়েছে যে জড় পরিবেশকে বুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে সত্তার গভীরতম প্রদেশ হতে মানুষ মূল্যগুলি সৃষ্টি করেছে। সত্তার গভীরতা হতে যতই মূল্যগুলির স্ফুরণ ঘটতে থাকে, ততই মানুষের বৌদ্ধিক, শিল্পীক এবং নৈতিক বিকাশ ও উন্নতি ঘটতে থাকে। মানবীয় বিকাশের ধারাই এই—গুণের অভিব্যক্তিই এক্ষেত্রে উন্নতির অভিজ্ঞান। প্রাক্-মানবীয় স্তরে গুণের উপর পরিমাণের আধিপত্যই পরিলক্ষিত হয়।

সমাজ-জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হতে উদ্ভূত। নীতিতত্ত্ব সেজন্য সমাজ-জীবনের পটভূমিকা হতে ও সমাজ-জীবনও নীতিসমূহ হতে অচ্ছেদ্য। এ হল মানুষের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করার পক্ষে সিমেন্টের মত পদার্থ যার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। এ হল সেই বস্তু যার দুটি দিকের একটি দিক, "অভ্যুদয়" বা সমাজ-কল্যাণের দিক 'ধর্ম' নামে ভারতীয় চিন্তাধারায় অভিহিত হয়েছে; এর অপরদিক সামাজিক স্তর ছাড়িয়ে আধ্যাত্মিক ব্যাপ্তির দিক, 'নিঃশ্রেয়স' বা আত্মিক মোক্ষের দিক। সেজন্য মহাভারত ধর্মকে 'অভ্যুদয়' অর্থে ধরে সংজ্ঞা দিয়েছেন—"ধর্ম হল সেই বস্তু যা সকলকে সংহত করে, সকলকে বাঁচিয়ে রাখে": ধারণাৎ ধর্ম ইত্যাহুঃ, ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।

নৈতিক বৃত্তি অন্যের জন্য ভালবাসা ও উদ্বেগের আকারে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে থাকে। এর সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেছে যীশুর সেই সুমহতী বাণীতে "প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসো"। এই বিশ্বসৃষ্টির বিবিধ বস্তুর মধ্যে নৈতিক বৃত্তিটি অনন্য তাৎপর্যপূর্ণ। দার্শনিক কাণ্ট বলেছিলেন—"আমাকে দুটি বস্তু বিস্ময়াভি-ভূত করে—ঊর্ধ্বে তারকাখচিত আকাশ আর অন্তরে নৈতিক বিধান।" মানবীয় সত্তার দৈহিক তথা জৈবিক স্তর ব্যতিরিক্ত এক অন্য স্তরের উদ্ঘাটন এই উক্তির দ্বারা সম্পন্ন

হয়েছে। মানুষের দৈহিক ও জৈবিক স্তরে অপরের অন্য উদ্বেগ সম্পূর্ণরূপে জন্মগত সম্পর্কের দ্বারা সীমিত। এই সম্পর্কসীমা ছাড়ালেই অপরের প্রতি সহানুভূতি শুকিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের নৈতিক আবেগ এই সঙ্কীর্ণ সম্পর্কের সীমা ছাড়িয়েই বিশেষ প্রকাশ লাভ করে থাকে। "প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসো" —এই আবেদনে মানুষের হৃদয় একটি প্রশ্ন-সহ সাড়া দিয়ে থাকে—"কে আমার প্রতিবেশী?" সমগ্র মানব-সমাজের নৈতিক অভিজ্ঞতা মানুষের হৃদয় হতে উত্থিত এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আশ্চর্য রকমের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছে। যে প্রতিবেশী বলতে নিজ রক্তসম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়জনদেরই বোঝে এবং এই ধারণানুযায়ী নিজ স্বার্থ রক্ষা করে চলে সেই অর্বাচীন সংসারী মানুষ হতে, যারা তাদের আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া ভালবাসার পরিধিতে সকল প্রাণীকে গ্রহণ করেন সেই বুদ্ধ, যীশু বা রামকৃষ্ণ পর্যন্ত এবং এ উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী অগণন ব্যক্তিবর্গের মধ্য দিয়ে আমরা আশ্চর্য-রকমের বিচিত্র নৈতিক অভিজ্ঞতা প্রকট হতে দেখি; এই বিপুল বিচিত্রতা আমাদের বৌদ্ধিক শক্তির এক পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়।

এইপ্রকার বিভ্রান্তিকর বিচিত্র উচ্চ-নীচ নৈতিক অভিজ্ঞতার অর্থানুসন্ধান করতে গিয়ে নীতিশাস্ত্র ক্রমে মানব-সত্তার জটিল অস্তিত্বকে এবং স্বতঃ-প্রতীয়মান ইন্দ্রিয়গত স্তরের ঊর্ধ্বে বিরাজিত আত্মিক সত্তার পরিমণ্ডলকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ইন্দ্রিয়ানুগ মানুষ প্রধানত স্বার্থ-কেন্দ্রিক হয় এবং প্রতিবেশীর জন্য তার ভালবাসা ও উদ্বেগ পাটোয়ারী বুদ্ধি এবং প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এই স্তরের নৈতিক অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুমোদিত নীতিতত্ত্ব সামাজিক চুক্তি-তত্ত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ অতি সুস্পষ্ট যে এধরনের নীতিতত্ত্বে সর্বপ্রকার নৈতিক অভিজ্ঞতা-জাত তথ্য স্থান পায় না। সামাজিক চুক্তির ক্ষেত্রেও যে মনোবৃত্তি একজনকে চুক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত করে তাও তার সত্তার ইন্দ্রিয়ের স্তর হতে উদ্গত নয়, তা উদ্ভূত আরও গভীরতর প্রদেশ হতে। সেই গভীরতর দিক হল মানুষের নৈতিক, শিল্পীক, বৌদ্ধিক সর্বপ্রকার মহৎ ভাবনার উৎসক্ষেত্র—মানবসত্তার আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল। একজন ইন্দ্রিয়ানুগ মানুষ যদি বাধাহীন ভাবে চলে, তাহলে সে নিজ সুবিধার্থে প্রয়োজন-সাধনের জন্য সামাজিক চুক্তি রক্ষা না করে তাকে ভঙ্গই করে ফেলবে। কিন্তু যে মানুষ নীতিবোধে প্রতিষ্ঠিত সে স্বার্থসিদ্ধি ও প্রয়োজন-সাধনের মনোবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠবে, অন্ততপক্ষে উঠবার জন্য প্রয়াস পাবে। এ প্রয়াস তার সত্তার এক উচ্চতর পরিমণ্ডলের অভিব্যক্তি—দীর্ঘকাল ধরে যা প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরেই যা প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল।

এ ধরনের তথ্য ও বিবেচনা থেকেই বেদান্তবাদে প্রতিফলিত ভারতীয় চিন্তাধারা জোর করে বলে যে যুক্তি-ভিত্তিক নীতিতত্ত্বের অনুমোদন কোন বাহ্য বস্তুর মধ্যে নয়, মানুষের সেই অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেই দেখবার প্রয়াস করা উচিত, যার উপরিদেশ হতে গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে; বেদান্তমতে যুক্তিসিদ্ধ নীতিতত্ত্বকে একটি পূর্ণায়ত মানব-তত্ত্ব-দর্শনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ ধরনের দার্শনিক অনুসন্ধান-প্রয়াস বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। যে কোন স্তর-ভিত্তিক তত্ত্বই সত্য-তত্ত্ব; কিন্তু সেই স্তরের মানুষ সম্বন্ধেই তা সত্য, সমগ্র মানব-

প্রকৃতি সম্বন্ধে তা সত্য নয়। প্রত্যক্ষবাদ-ভিত্তিক নীতিবাদগুলি যথা প্রেয়বাদ, সামাজিক চুক্তিবাদ, উদ্বুদ্ধ স্বার্থসাধনবাদ, হিতবাদ প্রভৃতি পূর্বোক্ত একদেশদর্শী নীতিবাদের শ্রেণীভুক্ত। অপরপক্ষে অতীন্দ্রিয়তাবাদ-ভিত্তিক সকল নীতি-তত্ত্বেই ত্যাগ ও আত্ম-বিলুপ্তি সাধনের উপর জোর দেওয়া হয়। এর থেকে প্রতিভাত যে মানুষের সত্তার উঁচু ও নীচু দিকের মধ্যে পার্থক্য আছে। এ উভয়প্রকার নীতিতত্ত্বই আত্মোপলব্ধির নীতিতত্ত্ব, অবশ্য "আত্ম" শব্দের অর্থের উপর উপলব্ধির প্রকৃতি নির্ভর করছে।

পূর্ণায়ত মানব-তত্ত্ব-দর্শন সর্বপ্রকার নৈতিক স্তরকে স্থান দেয় এবং ক্রমবিকাশের আলোতে এই বিভিন্ন নৈতিক স্তরের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পায়; জুলিয়ান হাক্সলের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি অনুসারে মানবীয় স্তরে এসে ক্রমবিকাশ আর জৈব বা প্রাণী-তত্ত্বের ব্যাপার থাকে না, তা পরিমাণের উপর গুণের আধিপত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক তথা সামাজিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উপরোক্ত সংজ্ঞানুক্রমে মানবীয় উন্নতি বলতে নিঃস্বার্থতা, সামাজিকতা-বোধ, অনাক্রমণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে পূর্ণতাপ্রাপ্তকেই বোঝায়। এ ধরনের নৈতিক মূল্য মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশের ফল। বেদান্ত-মতে এবং পূর্বোল্লিখিত আধুনিক চিন্তার কয়েকটি উচ্চতম দিক অনুসারে এ ধরনের উন্নতিই মানুষের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রকার উন্নতি।

বেদান্ত ঘোষণা করে যে অধ্যাত্ম-উন্নতি ব'লে মানুষের একপ্রকার উন্নতি আছে, দৈহিক বিকাশের চেয়ে তার এই আত্মিক বিকাশ অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। দৈহিক বিকাশ বংশগত উত্তরাধিকারিত্বের বিধান দ্বারা সীমিত। ক্রমবিকাশের প্রথম পদক্ষেপে এর প্রধান অভিব্যক্তি—প্রাণী-কোষের আবির্ভাব, আধুনিক প্রাণী-বিজ্ঞানীদের ভাষায় 'স্বয়ংবৃদ্ধিশীল পদার্থের' আবির্ভাব। কিন্তু ক্রমবিকাশ মানবীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে—সে হল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আবির্ভাব-পর্যায়; সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মানুষের নবলব্ধ চিন্তাশক্তি এবং অপরের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপনের মাধ্যম বাক্‌শক্তির সহায়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করে রাখার এবং অপরের হাতে তা হস্তান্তরিত করে দেওয়ার প্রক্রিয়া ঘটায়। যাকে প্রাণীতত্ত্ববিদেরা 'স্বয়ংবর্ধমান মন' বলে অভিহিত করে থাকেন সেই সংস্কৃতি হল বিশেষ করে মানবীয় স্তরের ব্যাপার, এর দ্বারা মানুষ বংশগত অথবা দৈহিক ক্ষেত্র ব্যতীত আর একটি ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকারিত্বের বিধানের বশবর্তী হয়, সে হল ঐতিহ্যের ক্ষেত্র। এই দ্বিতীয় উত্তরাধিকারিত্বই মানুষের অনন্যতা সৃষ্টি করেছে, এরই মাধ্যমে মানুষ সর্বপ্রকার দৈহিক সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয় এবং সচেতনতা ও সহানুভূতি বৃদ্ধির মাধ্যমে আপন ব্যক্তি-সত্তার অন্তহীন প্রসারতা লাভ করে। মানুষের এরূপ বিকাশের ব্যাপার শিক্ষা, নীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় উত্তরাধিকারিত্বের যে গুরুত্ব তার উপর প্রভূত আলোকপাত করেছে। জুলিয়ান হাকস্লের ব্যাখ্যানুসারে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছে ক্রমবিকাশ আর বংশগত বা প্রাণীতত্ত্বগত ব্যাপার না থেকে সাংস্কৃতিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সর্বপ্রকার নীতিগত মূল্য মূলত আধ্যাত্মিক মূল্য এবং মানুষের সত্তার অতীন্দ্রিয় পরিমণ্ডল হতে তার উৎপত্তি। এ পরিমণ্ডল 'ধার্মিকতা' বা নৈতিকবোধের জন্ম দেয়, এবং এ পরিমণ্ডল ইতর প্রাণী বা যে সব মানুষ ইন্দ্রিয়ানুগ

স্তরে থাকতেই ভালবাসে, তাদের আয়ত্তের অতীত ; ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ—মহাভারতকার সুস্পষ্টই বলেছেন। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু কোন মানুষের মধ্যেই অধ্যাত্মপ্রবণতার সম্পূর্ণ অভাব নেই। প্রত্যেক মানুষই জীবনের কোন না কোন সময়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় যাকে "অমৃতের আহ্বান" বলা হয়েছে তা শুনতে পান। কিন্তু যা ব্যক্তি- ও সমাজ-জীবনকে পঙ্কবদ্ধ করে তার সেই ইন্দ্রিয়ানুগ প্রকৃতি তাকে অবদমিত করে। যাঁরা সৃজনীশক্তিসম্পন্ন তাঁরা এই ইন্দ্রিয়ানুগতার উর্ধ্বে অবস্থান করেন। গুণ অর্জন করতে হলে এই জুলুমবাজ ইন্দ্রিয়ানুগ প্রকৃতিকে জয় করতে হয়। এ কাজ আধ্যাত্মিক শিক্ষার দ্বারা সম্পন্ন হয়। অংশত এ শিক্ষা সমাজের পটভূমিকায় পারস্পরিক সহানুভূতি ও নির্ভরশীলতার মাধ্যমে লাভ হয়ঃ পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ—গীতা বলেছেন। এ হল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্ম ও প্রচেষ্টার ক্ষেত্র যেখানে মানুষ শক্তি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সামাজিক দক্ষতা লাভে শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষার বাকী অংশ ধর্মের ব্যাপার, ধর্মকে এখানে মতবাদ, সম্প্রদায়, সামাজিক তথা রাজনৈতিক শীল ও আচরণ-বিধি হিসাবে না ধরে ধরতে হবে আধ্যাত্মিক সাধনা ও উপলব্ধি হিসাবে, যার মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিক দক্ষতা লাভ করে থাকে। প্রথমোক্ত রূপ শিক্ষার কৌশল মানুষকেই কেন্দ্রে স্থাপন করে, সকলের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে বৌদ্ধিক কার্যকলাপে তা বিন্যস্ত ; শেষোক্ত শিক্ষার কলাকুশলতা হল নির্জনে নীরবে মনঃসংযোগ ও ধ্যানযোগ সহায়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুপ্রবেশ করা। একটি সার্বিক অধ্যাত্মিকতা কর্ম ও ধ্যান, সমাজে বসবাসকারী মানুষ এবং নির্জনপ্রদেশবাসী মানুষ, কর্মরত মানুষ এবং পূজারত মানুষ—উভয়কেই স্থান দেয়, এই সার্বিক অধ্যাত্মিকতাই ভগবদ্‌গীতার অনবদ্য অবদান।

বৈদান্তিক মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণে স্বামীজী এরূপ সার্বিক অধ্যাত্মিকতার মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করেছেন, সে ব্যাখ্যায় সামাজিক তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বাহ্য নীতিমূল্যগুলি ধর্মের ক্ষেত্রের অন্তর্লোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধ্যাত্মিক মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেঃ "প্রত্যেক আত্মাই প্রচ্ছন্নভাবে দিব্যশক্তিসম্পন্ন, আমাদের লক্ষ্য হল প্রকৃতির—(বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা, সামাজিক তথা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সহায়তায়) বাহ্য ও (ধ্যান ও মনঃসংযোগ পদ্ধতির সহায়ে) আন্তর—এই উভয় প্রকার প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সেই দিব্যশক্তির বিকাশ ঘটানো। এরূপ সাধন কর···এবং মুক্ত হয়ে যাও।"

বর্তমানে আমাদের দেশ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যের পুষ্টিহীনতার পরিচয় প্রদান করছে। বিপুলসংখ্যক নরনারী শক্তি- ও পবিত্রতা-প্রদায়ী সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে। এ অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। তার চেয়েও দুঃখের কথা, গত দুই দশক ধরে স্বাধীন দেশের নরনারী হিসাবে আমরা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা সহায়ে নৈতিক পুষ্টি ও শক্তি অর্জন করতে পারিনি। এই সকল নৈতিক সুযোগ আমাদের জাতির আবালবৃদ্ধ নর-নারী কারও মনে যথেষ্ট পরিমাণে নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং সুনাগরিকত্বের গুণ সম্বন্ধে ধারণা ও সুরুচিবোধ জাগাতে পারেনি। পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্পর্শে

এসেও, তাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও এরূপ হয়েছে—যদিও পাশ্চাত্য দেশগুলি ঋষিত্ব বা আধ্যাত্মিকতার দাবী করতে পারে না, যদিও আমরা অতীত যুগ হতে এক মহা ঐশ্বর্যময় আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেছি এবং আমাদের সে ঐশ্বর্য বর্তমান যুগে আরও বেড়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষেত্রের মহাশক্তিধর পুরুষদের বাণী ও জীবনের অবদানে. তবুও নৈতিক মূল্যবোধ ও চারিত্রিক দক্ষতার দিক থেকে পাশ্চাত্য দেশ আমাদের চেয়ে অনেক বেশী আধ্যাত্মিক।

তেরশত বৎসর পূর্বে রাজকবি ভর্তৃহরি সমাজজীবনের বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের নমুনা সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছিলেন, আজও তা আমাদের বর্তমান সমাজের ব্যাধিনির্ণয়ে সহায়তা করে—

একে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ
স্বার্থান্ পরিত্যজ্য যে,
সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যমভৃতঃ
স্বার্থাবিরোধেন যে।
তেঽমী মানবরাক্ষসাঃ পরহিতং
স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে।
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং
তে কে ন জানীমহে॥

"একদল সৎপুরুষ আছেন যারা নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যের কল্যাণ সাধন করেন, বেশীর ভাগ মানুষ, সর্বসাধারণ, যদি নিজ স্বার্থ বিসর্জন না দিতে হয়, তবেই অন্যের কল্যাণ-সাধনে প্রয়াসী হয়। অপর এক শ্রেণী আছে, যারা নরাকৃতি হলেও রাক্ষসবিশেষ—'মানব-রাক্ষস', তারা নিজের স্বার্থের জন্য পরের কল্যাণ বলি দেয়। কিন্তু হায়, আমি তাদের কি আখ্যা দেব যারা লাভবান না হয়েও (যারা নিজেরাও লাভ করল না, অন্যকেও লাভ করতে দিল না কিছু) অপরের কল্যাণ হনন করে।" প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ, যাঁরা বিশ্বপ্রেম, আত্মবিসর্জন, ত্যাগ ও সেবার নীতি অনুসরণ করেন, তাঁরা সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, কিন্তু তাঁরাই পৃথিবীর লবণস্বরূপ সারবস্তু তাঁরা অন্যকে বাঁচানোর জন্য নিজে মৃত্যুবরণ করেন, এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আবার বেঁচে ওঠেন। সমাজের যারা বৃহত্তম অংশ, 'সামান্য' নামধেয় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, তারা যে নীতি গ্রহণ করে তা হল যাকে আধুনিক যুগে 'প্রবুদ্ধ স্বার্থপরতার নীতি' বলা হয়ে থাকে সেই নীতি। যারা সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে রত হয়, যারা শুধু অতীতের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের রীতি মাত্র নয়, আধুনিক কালে আবিষ্কৃত উৎকোচ-গ্রহণ, খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল মেশানো প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সমাজবিরোধী কার্যকলাপের রীতি গ্রহণ করে, এদেরই কবি ভর্তৃহরি "মানবরাক্ষস" এই যথার্থ নামে অভিহিত করেছেন। চতুর্থ ও শেষোক্ত শ্রেণী কবির হতাশাস্বরূপ হয়েছে, কারণ এ শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে নীতিবোধ-বিবর্জিত। আনন্দের বিষয় এরা সমাজের অত্যন্ত সংখ্যাল্প শ্রেণী, এরা উদ্দেশ্যহীন-ভাবে অসামাজিক, হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করে চলে।

আমাদের বর্তমান সমাজের সমস্যা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের ব্যাপক উদ্ভব, বিশেষ করে এ সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে বহুশতাব্দী-ব্যাপী পরাধীনতার অবসানে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হতে। আমাদের শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে এ সমস্যা সুকঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে। আজ আমাদের অতীত

যুগ হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং আধুনিক কালের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সমগ্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদকে একত্র সমাবেশ করতে হবে। জাতি হিসাবে আজ আমাদের কর্তব্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মপদে ভগবান বুদ্ধ যাদের 'ব্রাহ্মণ' বলে অভিহিত করেছেন সেই সংখ্যাল্প প্রথমোক্ত শ্রেণীকে রক্ষা করা, তাদের পুষ্টি সাধন করা; তারপর, দ্বিতীয় যে শ্রেণী প্রবুদ্ধ স্বার্থবুদ্ধিকে আশ্রয় করে চলে, তাদের আরও জ্ঞানালোকিত করা যাতে তারা তৃতীয় শ্রেণীতে অধঃপতিত না হয়; মানবরাক্ষসদের সংখ্যা অত্যন্ত সকীর্ণ করা কর্তব্য, যদি না তাদের একেবারে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়; পরিশেষে চতুর্থশ্রেণীর আবির্ভাবকেই ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

আমাদের কালের প্রয়োজনকে ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত "বেদান্ত ও ভারতীয় জীবনে তাহার প্রয়োগ" শীর্ষক ভাষণে নিম্নলিখিত উক্তিতে যে ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে তার চেয়ে তাকে আর ভাল করে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়:

"জগতে আরও আলো আনো, দরিদ্রের নিকট আলো নিয়ে এসো, ধনীর নিকটে আরও একটু বেশী করে এনো, কারণ এতে ধনীর দরিদ্রের চেয়ে বেশী প্রয়োজন আছে; মূর্খের কাছে আলো আনো, কিন্তু শিক্ষিতের কাছে তার চেয়ে আরও বেশী করে এনো, কারণ বর্তমান কালে শিক্ষার দম্ভ সীমাহীন হয়ে উঠেছে।"

আমাদের জাতির হাতে সে আলো আছে; জাতির নৈতিক স্বাস্থ্য ও শক্তি পুনরুজ্জীবনের মত আধ্যাত্মিক সম্পদ আমাদের রয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের, বিশেষ করে প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকের এ হল দায়, এ হল তার সুযোগ: সে সেই সম্পদরাশি ধারণ করবে, তার দ্বারা নিজে শক্তি লাভ করবে এবং সমগ্র জাতির দেহে সেই শক্তি সঞ্চারিত করে দেবে। স্বামীজীর বাণীই আজ আমাদের বজ্র আহ্বান হয়ে উঠুক—"ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌছুনো পর্যন্ত থেমো না।"

স্মরণে

শ্রীকুলদাপ্রসাদ প্রামাণিক

আলোকিত করে দাও জীবন আমার;
জগতের অন্ধকার সব ঘুচাবারে
কতনা প্রচেষ্টা তব নাহি অন্ত তার,
স্বর্গের সুষমা ঢালি দিতে মর্ত্যপুরে।

অমৃতের কণা-মাখা জীবন-ফলকে;
সুকোমল বক্ষে তব আনন্দ-নির্ঝর
স্বতঃ-উৎসরিত-ধারা উজ্জ্বল ঝলকে,
তৃষিত হৃদয় লাগি একান্ত নির্ভর।

আমার মানস-কুঞ্জে সিদ্ধিদাতা সম
করে নাও নিজ স্থান অক্ষয় অব্যয়;
তোমার পরম স্মৃতি অতি অনুপম,
জাগাও আমারে দেব, কর গো নির্ভয়।

কালের প্রবল স্রোতে যা গিয়াছে যাক
আমার হৃদয়ে তার স্মৃতিটুকু থাক।

ইলেকট্রণ

ডক্টর বিশ্বরঞ্জন নাগ

বহু প্রাচীন কাল থেকেই তড়িতের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল। কাঁচজাতীয় জিনিসকে সিল্ক দিয়ে ঘষলে যে এদের ছোট ছোট জিনিসকে আকর্ষণের ক্ষমতা জন্মে, এ ঘটনা খৃষ্টজন্মের অর্ধশতাব্দী পূর্ব হতেই জানা ছিল। কাঁচের বা সিল্কের এই অবস্থাকে বলা হত তড়িতান্বিত অবস্থা। তড়িতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হত, তড়িৎ হল একরকম ভারহীন আয়তনহীন তরল পদার্থ যা সব জিনিসে ছড়িয়ে আছে। এই তরল পদার্থ দু-রকমের—একটি ঋণাত্মক ও অপরটি ধনাত্মক তড়িৎ। সাধারণ অবস্থায় এই দু ধরনের তড়িৎ সব পদার্থে সমান পরিমাণে থাকে বলে পদার্থগুলি মনে হয় তড়িৎ-গুণহীন। কাঁচকে যখন সিল্ক দিয়ে ঘষা হয় তখন সিল্কের কিছু ঋণাত্মক তড়িৎ-পদার্থ কাঁচে চলে যায় এবং কাঁচের ঋণাত্মক-তড়িতের বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁচ হয় ঋণাত্মক-তড়িৎগুণযুক্ত এবং সিল্কের ধনাত্মক-তড়িতের পরিমাণ বেশী হয়ে যায় বলে সিল্ক হয় ধনাত্মক-তড়িৎগুণযুক্ত। পরবর্তীকালে এক ব্যাঙ নাচানো অধ্যাপকের পরীক্ষা থেকে তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্কৃত হয় এবং তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে তড়িতের কতগুলি বিশেষ গুণাগুণ জানা যায়। দেখা যায়, ধাতব লবণের দ্রবণের মধ্য দিয়ে যদি তড়িৎপ্রবাহ চালানো হয় তাহলে লবণের অণুগুলি ভেঙ্গে যায় এবং তড়িৎপ্রবাহ চালাবার জন্য দ্রবণে যে ধাতুর খণ্ড ঝোলানো থাকে, ধাতব পরমাণুগুলি তাতে জমা হতে থাকে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের তড়িৎপ্রবাহ নির্দিষ্ট সময় ধরে চালালে বিভিন্ন ধাতু বিভিন্ন পরিমাণে জমা হয়। দুটি ধাতু যে পরিমাণে জমা হয় সেই পরিমাণের অনুপাত হয় এদের পরমাণুর ভরের অনুপাতের সমান। বিভিন্ন পরমাণুর ভরের অনুপাত বহু আগে থেকেই রাসায়নিক মিলনের বিশ্লেষণ থেকে জানা গিয়েছিল। পরমাণুর ভরের অনুপাত ও জমা হওয়ার ধাতুর পরিমাণের অনুপাত সমান হওয়া থেকে স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, সবসময়েই কোন ধাতুর একটি পরমাণু জমা হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বিদ্যুৎ ব্যয়িত হয়। এও সন্দেহ করা যায় যে, যেমন পদার্থের অণু আছে তেমনি তড়িতের অণু আছে। একটি তড়িতের অণুকে আত্মসাৎ করেই একএকটি ধাতুর পরমাণু জমা হয়। এই তড়িতাণু বোঝাতেই বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রণ কথাটি ব্যবহার করতেন। যে দু-ধরনের তড়িৎ-পদার্থ কল্পনা করা হয়েছিল, ভাবা হত সেই দু-ধরনেরই ইলেকট্রণ আছে। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ধাতব লবণের দ্রবণের বিশ্লেষণ থেকে এভাবে ইলেকট্রণের পরিচয় পাওয়া যায় যে—ইলেকট্রণ হল তড়িতের একটি অণু। কিন্তু ইলেকট্রণের অন্য কোন গুণাগুণ জানা সম্ভব হয়নি এবং এর অস্তিত্বের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইলেকট্রণ ছিল বিজ্ঞানীদের কল্পনা।

সর্বপ্রথমে ১৮৯৭ খৃঃ অধ্যাপক টম্‌সনের পরীক্ষায় ইলেকট্রণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। টম্‌সন কম চাপের বায়ুর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন—কমচাপের বায়ুতে তড়িৎপ্রবাহ চালালে এক ধরনের রশ্মি পাওয়া যায়—যে রশ্মি আলোর ন্যায় ছবি তুলবার

কাগজে ছাপ ফেলতে পারে। এই তড়িৎ ঋণাত্মক-তড়িৎগুণযুক্ত এবং এর নাম হল ক্যাথোড রশ্মি। টম্‌সন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে–ক্যাথোড রশ্মি ঋণাত্মক-তড়িৎযুক্ত এক ধরনের কণার সমষ্টি। এই কণার তড়িতের পরিমাণ ও ভরের অনুপাত তিনি বার করেন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এর তড়িতের পরিমাণ ধাতব লবণের বিশ্লেষণ থেকে যে তড়িতাণুর পরিমাণ পাওয়া গিয়েছিল তার সমান, তাহলে কণাগুলির ভর দাঁড়ায় পদার্থের সবচেয়ে ছোট পরমাণুর বা হাইড্রোজেনের পরমাণুর ভরের প্রায় ১৮৬০ ভাগের একভাগ। ঐ বছরই অধ্যাপক টাউনসেণ্ড কৃত্রিম মেঘে তড়িৎ সঞ্চার করে আলাদাভাবেও ইলেকট্রণের তড়িতের পরিমাণ বার করেন। আরও বিশেষভাবে অধ্যাপক মিলিকান তড়িৎযুক্ত তৈল-কণা নিয়ে পরীক্ষা করে–তড়িতের যে সত্যি সত্যিই অণু আছে তা প্রমাণ করেন এবং এই অণুর তড়িতের পরিমাণও বার করেন। এই পরীক্ষাগুলি থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক ধরনের বস্তুকণা আছে যা স্বভাবতই ঋণাত্মক-তড়িৎগুণযুক্ত এবং যার ভর হল ৯×১০^{-৩১} কিলোগ্রাম ও তড়িতের পরিমাণ হল $১·৬\times১০^{-১৯}$ কুলম্ব। এই কণাগুলি হল ইলেকট্রণ।

ইলেকট্রণ আবিষ্কারের আগে পদার্থ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থা হল পরমাণু। পরমাণুতে পদার্থের সব গুণাগুণই বর্তমান থাকে এবং পরমাণু কখনই ভাঙ্গা যায় না বা পরিবর্তিত করা যায় না। ইলেকট্রণ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই ধারণায় পরিবর্তন এলো। ইলেকট্রণ একটি বস্তুকণা এবং পদার্থ থেকেই এর উদ্ভব। কাজেই ইলেকট্রণকে পদার্থের অংশ বলে স্বীকার করে নিতে হয়। প্রথমে ভাবা হয়েছিল ইলেকট্রণ পরমাণুরই অংশ। ধনাত্মক তড়িৎ পরমাণুর পুরো ব্যাপ্তিতে সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। ইলেকট্রণগুলি এরই মাঝে ইতস্তত ছাড়ানো থাকে, যেমন পুডিং-এ কিসমিস। পরবর্তীকালে ১৯১১ সালে অধ্যাপক রাদারফোর্ড (Rutherford) এক নূতন মতবাদের সূচনা করেন। তাঁর অনুমান অনুসারে পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হলেও এর একটি গঠন আছে। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি অংশ যার ভর পরমাণুর ভরের প্রায় সমান এবং যা স্বভাবতই ধনাত্মক তড়িৎগুণসম্পন্ন। এই অংশটির নাম হয় পরবর্তীকালে কেন্দ্রীন। ইলেকট্রণগুলি কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরছে বিভিন্ন কক্ষপথে—ঠিক যেমন সৌরমণ্ডলে সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলি ঘুরছে। রাদারফোর্ডের মতবাদ থেকে তেজস্ক্রিয়ার কয়েকটি ঘটনার ব্যাখ্যা হয়, তাই এই মতবাদ স্বীকৃত হয়। পরমাণুর এমনি গঠন ধরে নিলে সহজেই বোঝা যায় যে ইলেকট্রণ পরমাণুর অংশ হলেও, ইলেকট্রণের আলাদা অস্তিত্ব থাকতে পারে। ইলেকট্রণগুলি কেন্দ্রীন থেকে দূরে সরে এলে আলাদা কণার মত ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই ইলেকট্রণের জন্ম-রহস্যও বোঝা যায়।

রাদারফোর্ডের পরমাণুতত্ত্ব মোটামুটিভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হলেও অন্যান্য তড়িতের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একে স্বীকার করে নেওয়া চলে না। ইলেকট্রণ ঋণাত্মক-তড়িৎ-যুক্ত এবং কেন্দ্রীন ধনাত্মক-তড়িৎযুক্ত—স্বভাবতই আশা করা যায় বিপরীতধর্মী তড়িতের পরস্পরের আকর্ষণের জন্য ইলেকট্রণ ও কেন্দ্রীন পরস্পরকে কাছে টানবে। যদি ইলেকট্রণ বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে তাহলে এই আকর্ষণ সত্ত্বেও স্থায়িত্ব আসতে পারে—যে

ধরনের স্থায়িত্ব আছে সৌরমণ্ডলে। সৌরমণ্ডলে সূর্য অভিকর্ষক বল দ্বারা গ্রহগুলিকে আকর্ষণ করা সত্ত্বেও গ্রহগুলির ও সূর্যের মধ্যে দূরত্ব বজায় থাকে। পরমাণুর গঠনে স্থায়িত্বকে বোঝানোর জন্যই রাদারফোর্ড ধরে নিয়েছিলেন যে ইলেকট্রণগুলিও কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরছে। কিন্তু এই ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রণ পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে। কাজেই যে-ভাবে পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহ থেকে বেতারতরঙ্গ সৃষ্টি হয়, সেইভাবেই ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রণগুলি থেকে বেতারতরঙ্গ সৃষ্টি হওয়া উচিত। বেতারতরঙ্গ সৃষ্টি হলে ইলেকট্রণের শক্তি কমে আসবে—কেননা বেতারতরঙ্গের শক্তির উৎস হবে ইলেকট্রণের শক্তি। সে ক্ষেত্রে যেমন কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলে ঘর্ষণে শক্তি হারিয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে তেমনি ইলেকট্রণেরও কেন্দ্রীনের নিকটে চলে আসার কথা। তাই রাদারফোর্ডের তত্ত্বানুসারে ইলেকট্রণের স্থায়িভাবে কোন কক্ষপথে ঘোরার অনুমানকে স্বীকার করা যায় না। এই অসুবিধা পরমাণুকে বোঝার ব্যাপারে বিশেষ বাধা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। দৃশ্যজগতের অন্যান্য ঘটনা থেকেও এই রহস্যের সমাধানের কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক বোর (Bohr) তাই ইলেকট্রণের সাধারণ বস্তুজগৎ থেকে আলাদা এক গুণ আছে ধরে নিয়ে এই রহস্যের সমাধান করেন। তিনি বলেন যদিও তড়িৎপ্রবাহের সাধারণ ঘটনা থেকে মনে হয় কক্ষপথে বিচরণকালে ইলেকট্রণের শক্তি ব্যয়িত হবে তাহলেও ইলেকট্রণের ক্ষেত্রে কতগুলি বিশেষ কক্ষপথ আছে, যে কক্ষপথে চলার সময়ে ইলেকট্রণ থেকে কোন বেতারতরঙ্গ বিকীর্ণ হয় না এবং ইলেকট্রণের শক্তির কোনরকম পরিবর্তন হয় না। এই বিশেষ কক্ষপথগুলির দূরত্ব হাইড্রোজেনের পরমাণুর ক্ষেত্রে তিনি বার করেন। অধ্যাপক বোরের এই অনুমান থেকে বিভিন্ন গ্যাস উত্তপ্ত অবস্থায় যে বিশেষ বিশেষ রং বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করে তার ব্যাখ্যা হয়। তাপের শক্তি ইলেকট্রণ আত্মসাৎ করে কেন্দ্রীন থেকে দূরবর্তী কক্ষে চলে যায়; কেননা দেখা যায়, ইলেকট্রণের স্থায়ী কক্ষগুলির দূরত্ব যতই বেশী হবে ততই ইলেকট্রণের শক্তিও বেশী হবে। আবার স্বল্প শক্তির অবস্থায় ফিরে আসাও ইলেকট্রণের স্বভাব বলে নিজে নিজেই ইলেকট্রণ দূরবর্তী কক্ষ থেকে নিকটবর্তী কক্ষে ফিরে আসে এবং ফিরে আসার ফলে ইলেকট্রণের কিছু শক্তি উদ্বৃত্ত হয় এবং এই শক্তিই বিশেষ রংএর আলো হয়ে দেখা দেয়। এভাবে আলোর বিকিরণের বোধগম্য ব্যাখ্যা অধ্যাপক বোরের মতবাদ থেকে দেওয়া সম্ভব হয়, তাই ইলেকট্রণের এই একটি সাধারণজ্ঞান-বিরোধী গুণ যে, বিশেষ বিশেষ কক্ষে ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় পরিবর্তনশীল তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও ইলেকট্রণ কোন শক্তি না হারিয়ে স্থায়িভাবে থাকতে পারে, তা স্বীকার করা হল। পরবর্তী কালে আলোর বিকিরণ নিয়ে আরো বিশেষ ভাবে অনুশীলনের ফলে দেখা যায় যে ইলেকট্রণের আরো দুটি বিশেষ গুণ আছে—প্রথম হল সব সময়েই ইলেকট্রণ নিজের ব্যাসের চারদিকে ঘুরছে– ঠিক যেমন পৃথিবী তার অক্ষের চার পাশে ঘুরছে। দ্বিতীয় হল কোন পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রণ কখনই একই কক্ষপথে একইভাবে ঘুরতে থাকা অবস্থায় থাকতে পারে না। এই তিনটি গুণ ছাড়া আর একটি গুণ হল যে, সব ইলেকট্রণই সর্ব অবস্থায় একরকম। কোন পরীক্ষা দ্বারাই দুটি ইলেকট্রণকে আলাদা করে

ভাবা সম্ভব নয়। ভাবা যেতে পারে, দুটি ইলেকট্রণ থাকলে তাদের শক্তি বা গতিপথ থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু যখন পদার্থের মধ্যে বা সমষ্টিগতভাবে ইলেকট্রণ থাকে তখন এভাবে আলাদা করে দুটি ইলেকট্রণকে ভাবা যায় না। অতি সহজেই ইলেকট্রণ-দুটি পরস্পরের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। তাই আলাদাভাবে একটি ইলেকট্রণের কথা ভাবা সম্ভব হলেও কোন পরীক্ষার ফলাফল বুঝতে হলে সব ইলেকট্রণগুলিকে সমষ্টিগতভাবে ভাবা দরকার।

আপাতদৃষ্টিতে ইলেকট্রণের এই চারিটি গুণ, বস্তুজগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের যে ধারণা ছিল, তা থেকে আন্দাজ করা যায় না। কিন্তু এই গুণগুলি ধরে নিলে বিভিন্ন পদার্থের বিকীর্ণ আলোর রঙ এবং রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন পরমাণু-তৎপরতা, পদার্থের চুম্বকশক্তি এবং অন্যান্য আরও অনেক ঘটনার সহজ ব্যাখ্যা হয়। তাই ইলেকট্রণের এই গুণগুলিকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। ইলেকট্রণের এই গুণগুলি থেকে মনে হয় ইলেকট্রণ একটু অস্বাভাবিক ধরনের বস্তুকণা। কিন্তু ইলেকট্রণ যে বস্তুকণা সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের কারণ ঘটে না। বস্তুকণার ন্যায়ই ইলেকট্রণের ভর আছে। কোন বল প্রয়োগ না করলে ইলেকট্রণ (বস্তুকণার ন্যায়) অপরিবর্তিত গতিতে সরল রেখায় ছুটে চলে আবার বল প্রয়োগ করলে নিউটনের সূত্রানুসারেই ইলেকট্রণের গতির পরিবর্তন হয়। তাই ইলেকট্রণ আবিষ্কারের পরে বহুদিন পর্যন্ত মনে করা হত, ইলেকট্রণ একটি বস্তুকণা।

বস্তুকণার ন্যায় ইলেকট্রণের ভর থাকা বা ইলেকট্রণ বস্তুকণার গতির নিয়মগুলিকে মানা সত্ত্বেও বস্তুকণার একটি বিশেষ গুণ, এর সীমিত আয়তন, ইলেকট্রণের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়নি। কোন ভাবেই ইলেকট্রণের আয়তন মাপা যায় নি। তাই ইলেকট্রণকে বস্তুকণা বলে পুরোপুরি স্বীকার করে নেওয়াতেও একটু অসুবিধা ছিল। উপরন্তু এই সময়ে প্রমাণিত হয়েছিল আলোর দ্বৈত সত্তা। আলো-কে শক্তির কণা ভাবা যেতে পারে, আবার তরঙ্গরূপেও ভাবা যেতে পারে। কোন কোন পরীক্ষায় ইলেকট্রণের ব্যবহার, যেমন সরল রেখায় চলা, ছবির কাগজে ছাপ ফেলা, আলোরই মত। তাই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী দে ব্রগলী (De Broglie) মনে করেন যে হয়ত ইলেকট্রণ বস্তুকণা নয়, একধরনের তরঙ্গ। আলোর সঙ্গে সাদৃশ্য ধরে নিয়ে ইলেকট্রণ যদি তরঙ্গ হয় তাহলে এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কত হবে তা তিনি বার করেন। দেখা যায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে ইলেকট্রণের গতিবেগের ব্যস্তানুপাতিক। শ্রডিনজার (Schrodinger) ইলেকট্রণকে তরঙ্গ ধরে নিয়ে পরমাণুতে কেন্দ্রীনের নিকটে থাকায় ইলেকট্রণে কি কি শক্তি সঞ্চিত থাকতে পারে তা হিসাব করেন। দেখা যায় এই হিসাব বোরের সঙ্গেই মিলে যায়। আবার এই সময়ে ডেভিসন ও জার্মারের (Devison & Germer) পরীক্ষায় দেখা যায় যে যদি কোন ইলেকট্রণের সমষ্টিকে কোন ধাতুর চাদর থেকে প্রতিফলিত করা যায় তাহলে ইলেকট্রণগুলি বস্তুকণার মত প্রতিফলিত হয় না—একটি বিশেষ নিয়মে প্রতিফলিত ইলেকট্রণগুলি ছড়িয়ে পড়ে—ঠিক যেমনটি হয় রঞ্জনরশ্মি প্রলিফলিত হলে। টমসনও (Thomson) পরীক্ষায় দেখতে পান যে যদি কোন ইলেকট্রণের সমষ্টিকে অভ্রের চাদরের উপরে ফেলা যায় এবং চাদরটির পেছনে ছবি তুলবার কাগজ রাখা হয় তাহলেও ইলেকট্রণের সমষ্টি একটি বিন্দুতে দাগ না ফেলে কতগুলি বৃত্তাকার দাগের সৃষ্টি করে। রঞ্জনরশ্মিও ঠিক

এমনি করে। কিন্তু রঞ্জনরশ্মি আলোরই সমগোত্রীয় এবং রঞ্জনরশ্মিকে বিদ্যুৎচুম্বকতরঙ্গ ধরে নিয়ে এই ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা হয়। কাজেই ডেভিসন ও জার্মার এবং টমসনের পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে ইলেকট্রণও একধরনের তরঙ্গ। উপরন্তু ইলেকট্রণকে তরঙ্গ ধরলে কয়েকটি বিশেষ সমস্যারও সমাধান হয়। বোঝা যায় কেন ইলেকট্রণের আয়তন মাপা যায় না। কেন্দ্রীন থেকে বিশেষ দূরত্বে থাকলে ইলেকট্রণ কেন কোন শক্তি হারায় না, তারও সহজ ব্যাখ্যা হয়। ইলেকট্রণকে তরঙ্গ ধরে নিয়ে বিভিন্ন পদার্থের অণুর গঠনও বিশেষভাবে বোধগম্য হয়। তাই ইলেকট্রণের তরঙ্গরূপও স্বীকৃত হয়।

ইলেকট্রণ তরঙ্গ হলেও আলোর ন্যায়, বিদ্যুৎ-চুম্বকতরঙ্গ নয়। বলা হয়েছে যে ইলেকট্রণ কখনও কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করতে পারে না বা করলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সেই অবস্থান ধরা পড়ে না। পরীক্ষায় ধরা পড়ে ইলেকট্রণ কোন্ জায়গায় সর্বাপেক্ষা বেশীক্ষণ অবস্থান করে। বোরের নির্দেশিত কক্ষপথ হল এমন পথ যেখানে ইলেকট্রণের অবস্থানের সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশী। শ্রডিনজারের যে তরঙ্গ দ্বারা ইলেকট্রণের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় তাও বলে দেয় কোন্ স্থানে ইলেকট্রণের অবস্থানের সম্ভাবনা। ইলেকট্রণ যেন কেন্দ্রীনকে আবেষ্টন করে চলা-ফেরা করছে—কেন্দ্রীনের খুব নিকটে এবং বহুদূরেও কখনও কখনও চলে যাচ্ছে কিন্তু নির্দিষ্ট কক্ষপথের উপরই সবচেয়ে বেশী সময় থাকছে। ইলেকট্রণ বস্তুকণার মত ব্যবহার করে কিন্তু ঠিক যে কোন নির্দিষ্ট পথে বিচরণ করে তা নয়। বহু ইলেকট্রণকে একসঙ্গে দেখলে, বিশেষ করে মুক্ত অবস্থায় দেখলে মনে হবে এরা সরল রেখায় চলছে। কিন্তু যদি কোন পদার্থের মধ্যে দিয়ে যায় বা পরমাণুতে কেন্দ্রীনের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে তরঙ্গের ন্যায়ই ইলেকট্রণ ছড়িয়ে পড়ে। এর কোন নির্দিষ্ট অবস্থান বা গতিপথ ভাবা যায় না।

বর্তমানে ইলেকট্রণের এই দ্বৈতরূপই স্বীকৃত। ইলেকট্রণ হল স্বভাবতই ঋণাত্মক-তড়িৎযুক্ত পদার্থের একটি কণা। অন্যান্য বস্তুকণার ন্যায় গতিহীন অবস্থাতে ইলেকট্রণের ভর আছে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আয়তন নেই। আবার তরঙ্গের ন্যায় ইলেকট্রণ বহুদূর বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে থাকে। এই তরঙ্গের বিস্তৃতির দ্বারাই ইলেকট্রণের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। আলোর দ্বৈতসত্তার সঙ্গে ইলেকট্রণের দ্বৈতসত্তার সাদৃশ্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণা ইলেকট্রণ, এবং বস্তুজগতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এর অস্তিত্ব। কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানে এর সঠিক স্বরূপ সম্পর্কে কোন ধারণা বিজ্ঞানীদের নেই। আছে শুধু কয়েকটি গাণিতিক সংকেত, যার মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রডিনজারের সমীকরণ এই সংকেতগুলিকে অবলম্বন করেই বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রণের বিভিন্ন অবস্থার আচারব্যবহার নির্ধারণ করছেন—নির্ধারণ সঠিকও হচ্ছে কিন্তু এ থেকে 'সত্যিকারের ইলেকট্রণ কি', 'আমাদের ধারণায় একে আনা যাবে কি না' এইসব চিরন্তন প্রশ্নের কোন সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। আবার দরকারী ফলাফল শ্রডিনজারের সমীকরণ থেকে ধরা পড়ে বলে বিজ্ঞানীরা যেন এই সব দার্শনিক প্রশ্নকে আর প্রশ্রয়ও দিচ্ছেন না।

শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ*

ভগিনী নিবেদিতা

(১)

আমাদের জীবন হল বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়-ধারার একটি অঙ্গ। ছেলেমেয়েদের আমরা যে শিক্ষা দিয়ে থাকি, তার মধ্য দিয়ে সেই সমন্বয় সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তারই অনিবার্য অভিব্যক্তি ঘটে। এইভাবে দেশের যুবক-সম্প্রদায়কে কারিগরি-বিদ্যায় শিক্ষিত করার উপায় খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমেরিকা মনে করবে তার শিক্ষাপদ্ধতি অসম্পূর্ণ। অষ্ট্রেলিয়া সম্ভবতঃ তার শিক্ষাপদ্ধতি কৃষিভিত্তিক করতে উদ্যোগী হবে। বৈজ্ঞানিক যুগের শিক্ষা-পদ্ধতি বিজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করবে। আবার যারা প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের পক্ষপাতী তারা অপ্রচলিত প্রাচীন ভাষাসমূহের শিক্ষাপ্রদানের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করবে। দেখা যায় যে, দুটি বিভিন্ন যুগ শিক্ষাক্ষেত্রে পরস্পরকে অবিকল পুনরাবৃত্তি করে না; এর সহজ ব্যাখ্যা এই যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি তাদের সন্তান-সন্ততির মূল প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার বিভিন্ন ধারা নির্বাচন করে থাকে। কেন না, সেই মুহূর্তে জাতীয় জীবনে ঐগুলিই অত্যাবশ্যক।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে গুপ্ত-যুগে সংস্কৃত বিদ্যার পুনরভ্যুত্থানকালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানই ছিল যে-কোন ভদ্র-সন্তানের আভিজাত্যের পরিচায়ক। হাজার বছর পরে সেই স্তরের ব্যক্তিকে পারসিক ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হত। বর্তমানে ইংরেজী ভাষায় জ্ঞানলাভই হল মাপকাঠি। সুতরাং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উপায়ে সমস্তরের মানসিক ও সামাজিক আভিজাত্য লাভ হয়ে থাকে।

ভারতীয় সভ্যতার ভাগ্যক্রমে হিন্দুগণ সব সময়ে শিক্ষারীতির পশ্চাতে শিক্ষণীয় মনটিকে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেছেন—যে মনের সঙ্গেই শিক্ষার প্রধান সম্পর্ক। এই উপলব্ধিই বহুবিধ বিপর্যয় সত্ত্বেও অতীতে ভারতীয় প্রতিভাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাও এর ওপরেই নির্ভর করছে। ব্রাহ্মণ-যুগের শিক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত তরুণ মনকে সরাসরি একাগ্রতা শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত থাকবে, ততদিন যুগপরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত নানা বাধা-বিপর্যয় জয় করবার মতো সুপ্ত মনোবল ভারতবাসীর থাকবে। কিন্তু একবার এই একাগ্রতার সাধনা যদি অবহেলিত বা লুপ্ত হয় তবে জাতীয় বিশুদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতীয় মনোবল সাধারণ মানবজাতির পর্যায়ে নেবে আসবে এবং ধাবমান যুগের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের মাত্রা ও স্বাধীনতা অনুযায়ী তার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। বর্তমানে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভক্তিমুলক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে অদ্ভুত মনঃ-সংযমের শিক্ষা-লাভ করে থাকে প্রধানতঃ তারই জন্য হিন্দুর মেধা বা বুদ্ধিমত্তার (intellect) প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার ভবিষ্যতের জন্য শক্তির সঞ্চয়, ক্ষমতার সংরক্ষণ। যতই আমরা এদেশের ইতিহাস পাঠ করি, প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের অভাবনীয়তার মধ্যে জন্ম ও তাঁদের একক সাফল্যের দীপ্তিতে চমৎকৃত হই। সপ্তদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগতের নিউটনের মত দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ভাস্করাচার্য নিঃসংশয়ে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব উপলব্ধি

* 'Hints on National Education in India' হইতে অনূদিত।

করেছিলেন, যদিও তদানীন্তন সামাজিক পরিস্থিতি তাঁকে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে সহায়তা করেনি। বহির্জগতের অন্তরালে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ এক নারীসম্প্রদায়ের মধ্যে আকস্মিকভাবে বিকশিত হয়ে দেখা দেয় এক চাঁদবিবি। গত বিশ বছর ধরে নির্বিচারে কেরানীগিরির অনুশীলন সত্ত্বেও আমরা জগৎকে এমন সব ব্যক্তি উপহার দিয়েছি যাঁরা ধর্ম, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। নির্ধূম বারুদ ও শল্য চিকিৎসার উন্নতি কেবল জ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্রকেই প্রসারিত করেছে। ভারত সেখানে প্রমাণ করেছে যে জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন কিছু দান করবার শক্তি তার নিজের মধ্যে আছে।

এইগুলি হল ভারতীয় মনের সুপ্তশক্তির কতিপয় লক্ষণ। এরা যেন অকস্মাৎ-প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় যা সমগ্র বৃক্ষের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। এরাই আমাদের জানিয়ে দেয় ভারতবাসী অতীতে যা করেছে ভবিষ্যতেও তা করতে পারে। তাই যদি হয়, তার এই অমর প্রাণশক্তির জন্য আমরা ঋণী আমাদের পূর্বপুরুষগণের দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে, যে দৃষ্টিভঙ্গী যে-কোন যুগের বিশেষ বার্তাকে সমাদর করলেও মানসিক চর্চা ও উৎকর্ষকে কদাপি অবজ্ঞা করে নি। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, কোনও বিশেষ বিষয় শিক্ষা অথবা কোন একটি মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন অপেক্ষা একাগ্রতা-শিক্ষাই হল সর্বদা হিন্দুশিক্ষাপদ্ধতির ঈপ্সিত লক্ষ্য। মনঃসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাই জাতির ইতিহাস। তার মধ্যে মহাপুরুষগণের জীবনাবলী ঘটনামাত্র।

অতএব সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানপদ্ধতির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌গণের ভারতকে কিছু শিক্ষা দেবার নেই। বরং পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠত্ব হল কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে—এমন কি আত্মশিক্ষা বিষয়েও—সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল্য উপলব্ধির মধ্যে এবং তার শিক্ষা-পদ্ধতির ভিতর আনা প্রয়োজন ব'লে মনে হয় এমন কোন বিশেষ সমন্বয়ের মধ্যেও। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে দেখলে ভারতের পক্ষেই জার্মানী ও আমেরিকা অপেক্ষা তার জনসংখ্যার প্রতি-হাজারে অধিকসংখ্যক প্রতিভাবান্ ব্যক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু জার্মানী ও আমেরিকা জানে কিভাবে জাতীয় মানস-চেতনাকে (national mind) নিজ নিজ সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ বলা যায় যে, তারা সাধারণ গণমনকে সংগঠিত করতে পেরেছে এবং এই সংগঠিত গণমানসের সামনে তারা সমাধানযোগ্য সমস্যাগুলি উপস্থাপিত করেছে। চিন্তা করা যাক, এভাবে উত্তরের আশায় যে মনের কাছে এই প্রশ্ন তুলে ধরা হল, সেই মনের গুরুত্ব ও পরিধি, পরিমাণ ও শক্তি কতখানি। প্রশ্নটা কি? খুব সম্ভব প্রশ্নটি জাতীয় প্রকৃতি অনুযায়ী। কোন জাতির উপর অবিচার না করে আমরা অনুমান করতে পারি যে এ প্রশ্ন হল স্ব স্ব দেশের জনগণের সম্পদ ও উন্নতি সম্পর্কিত। ভারত তার সন্তানগণের সামনে যে বৈরাগ্য ও মুক্তির লক্ষ্য নির্দেশ করে, এ তেমন কোন নৈর্ব্যক্তিক বা জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য লক্ষ্য নয়। খুব সত্য কথা। অথচ জার্মানী ও আমেরিকার প্রত্যেক নাগরিকের সত্তায় তার দেশের উন্নতি নৈর্ব্যক্তিক লক্ষ্য রূপেই প্রতিভাত হয়। হিন্দুজাতিকেও প্রথমে অপরের জন্য স্থূলভাবে আত্মদমনের অভ্যাস করেই স্থূল-সম্পর্কহীন বৈরাগ্যের পথে আরোহণ করতে হয়। "অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভগবৎ-সকাশে পৌছতে গেলে যেমন বেদীর ধাপগুলি

প্রথমে অতিক্রম করতে হয়? ঠিক তেমন ভাবে হিন্দুর কাছেও তার পরিবারের চিন্তাই প্রাধান্য লাভ করা যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, সে বলবে যারা তার উপর নির্ভর করে আছে তারা যেন বিশ্বাসের সঙ্গে ন্যস্ত দায়িত্বস্বরূপ এবং সেই দায়িত্ব-পালনের মাধ্যমেই তাকে কর্মক্ষয় করে যথার্থ বিবেকের পথে উপনীত হতে হবে। তাহলে জার্মানী ও আমেরিকার অধিবাসিগণই বা কেন নিজেদের দেশ সম্পর্কে অনুরূপ উপলব্ধি করবে না? তাদের কাছে এটাই বা কেন জীবনবেদীতে উপনীত হবার সর্বোচ্চ ধাপ বলে গণ্য হবে না?

তাই যদি হয়, তবে প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার স্বজাতির স্বার্থের প্রতি আনুগত্যের আদর্শ সামনে রেখে তদনুযায়ী জীবিকা-অর্জনের জন্য পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে হবে। এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ না করলেও তাকে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে—এমন কি হিন্দুদেরও। পার্থক্য শুধু এই থাকবে যে, তার শিক্ষা বা চাকুরির ক্ষেত্রে কোন আদর্শ-প্রণোদিত আবেগ থাকবে না অথবা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জীবনে কোন উচ্চ কল্পনার অবকাশ থাকবে না।

পার্থিব বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান আহরণ মানুষের অন্তরাত্মাকে সব থেকে দীন করে। একটা জাতির পক্ষে অন্নসংস্থানের উপায় হিসাবে তার মানস উৎকর্ষকে কাজে লাগানোর চেয়ে অধঃপতন আর কিছু নেই। সত্যকে ভালবাসি এবং তাকে জীবনে লাভ করতেই হবে, কেবল এই কারণে যদি সত্যের অন্বেষণ না করি, তাহলে হৃদয় ও বুদ্ধির মহৎ তত্ত্বগুলির দ্বার আমাদের কাছে রুদ্ধ হয়ে থাকবে। পার্থিব বস্তুলাভের প্ররোচনায় মানুষ যতটা দূর যেতে পারে তার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। অন্য দিকে তার প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসা যদি এতদূর উন্নত ও খাঁটী হয় যে, সেই ভালবাসাই তাকে যতদূর সম্ভব উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় এবং যদি সে জানে এ তত্ত্ব যত সে উপলব্ধি করবে ততই তার নিজ পরিবারের জন্য না হোক, সেই বৃহত্তর আত্মীয় গোষ্ঠী—যাকে সে স্বদেশ বলে জানে—তার পক্ষে শুভ হবে তাহলে তার জনসেবার চেতনা তাকে অসীমের দিকে ধাবিত করবে। তেমন চেতনা তাকে মুক্তিই এনে দেবে, বন্ধন নয়। সে তাকে লক্ষ্যলাভ করিয়ে দেবে, তার গতিপথে কোথাও সীমারেখা টানবে না।

এই বিষয়ে পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের কিছু শিখবার আছে। কেন আমরা সমাজ-চেতনাকে শুধু নিজ পরিবার অথবা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব? কেন আমরা লক্ষ্যকে সম্প্রসারিত করব না, যার ফলে প্রত্যেকে অপর সকলের কল্যাণসাধনে তৎপর হবে এবং প্রয়োজন হলে নিজেকে, পরিবারকে, এমন কি তার বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীকে সমষ্টিকল্যাণের জন্য উৎসর্গ করতে সব শক্তি প্রয়োগ করবে? বীরের সংকল্প সর্বদাই আত্মোৎসর্গের প্রেরণা জাগায়। আমার ধারণায় যা উচ্চতম, মহত্তম এবং শ্রেষ্ঠ সত্যকামী বলে মনে হয়, তার সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু তা আত্মকল্যাণের জন্য নয়, জনকল্যাণের জন্য। হয়তো আমার ব্যক্তিগত ধ্বংসই হবে তার পরিণতি। টেলিগ্রাফ বসানোর কাজের জন্য হয়তো আমাকে সাঁতার দিয়ে পার হতে হবে বন্যায় প্লাবিত অঞ্চল। অথবা বন্ধুকে উদ্ধার করবার জন্য ঝাঁপ দিতে হবে মৃত্যুগহ্বরে। দুটোই মারাত্মক। পরিবারবর্গের কোন ব্যবস্থা না

করে তাদের দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্য পেছনে ফেলে রেখে যাব কি? দূর হোক এই সব সঙ্কীর্ণ স্বার্থচিন্তা। কর্তব্যের প্রতি ভারতের আদর্শ কি তা জগতের সামনে স্থাপন করবার জন্য আমি এবং তারা উভয়েই কি সাগ্রহে মৃত্যু বরণ করব না? জাতির মুখ উজ্জ্বল করবার জন্য একটি পরিবার কি সানন্দে অনশন করতে পারে না? বীরের সিদ্ধান্ত এক ঝলকে হয়ে যায়। তার কাছে বৃহত্তর আদর্শ সঙ্কীর্ণ আদর্শের চেয়ে অধিকতর প্রত্যক্ষ। মুহূর্তের মধ্যে সে অনন্তের পথ নির্বাচিত করে এবং সেই সিদ্ধান্তেই অবিচল থাকে চিরদিনের জন্য। ব্যষ্টিমনকে জাতীয় সমস্যার প্রতি একাগ্র করার ভেতর দিয়েই পাশ্চাত্য দেশ বহু সাধারণ মানুষকে বীরে পরিণত করে। এও একজাতীয় উপলব্ধি। সুতরাং ভারতীয় সমস্যার প্রতি ভারতীয় মনকে নিবিষ্ট করার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। এর জন্য আমাদের সেই মনঃসংযমের প্রাচীন রীতি ও অখণ্ড সার্বভৌম দৃষ্টির সঙ্গে তার পরিচয়—যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং যে বৈশিষ্ট্যের ওপর ভারতের শক্তি ও কৃষ্টি অতীতে নির্ভরশীল ছিল এবং ভবিষ্যতেও নির্ভর করবে—তাকে ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে না। কিন্তু বর্তমানে যেখানে আমাদের অধিকাংশ জনগণের মন ব্যক্তিগত জীবিকার্জনের উপযোগী পরিকল্পনায় ব্যাপৃত, সেই মনের একটা সচেতন ঐক্যবোধ—যার দ্বারা আমরা সাধারণকল্যাণ, সমষ্টিকল্যাণ, লাভ করতে পারি—তা লাভ করবার শ্রেষ্ঠ উপায়ের কথা চিন্তা করতে চাই। এই যে ব্যষ্টিকল্যাণের পরিবর্তে সমষ্টিকল্যাণ (যার ফলে ব্যষ্টিকল্যাণের পক্ষে উচ্চতর সোপানে আরোহণ সম্ভব), এ হল একটা উপায় যার বাস্তব সম্ভাব্যতা য়ুরোপে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক এবং দুর্লভ গুণাবলীর অধিকারী অধ্যাপকমণ্ডলীর ওপর আজকের য়ুরোপীয় ইতিহাসের গতি ততটা নির্ভর করছে না যতটা নির্ভর করছে যে গণমানসকে সে একত্র করে কতকগুলি কর্তব্য সংসাধনে নিযুক্ত করেছে তারই শক্তি ও গুরুত্বের ওপরে। জনশিক্ষার পদ্ধতি ও গুণবত্তা এই জনশক্তিকে এভাবে মুক্ত বা মুক্তি-উন্মুখ করেছে। সুতরাং ভারত ও তার জনসাধারণের পক্ষে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে আমাদের, ভারতবাসীদের, দেখতে হবে সেই শিক্ষার মূল উপাদানগুলি (essentials) বা সারাংশ কী।

(২)

যে কোন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় আমরা সহজেই তার তিনটি উপাদান পৃথক করতে পারি, যা অবশ্য সব সময় ধারাবাহিকভাবে পরিস্ফুট হয় না। প্রথমতঃ যদি কোন ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ফল পেতে চাই, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ঐ মনের শিক্ষাকালে তিনটি ক্রম বা ধাপ (stage) আছে: শিক্ষাগ্রহণের জন্য মনকে প্রস্তুত করা, ধারণার বা ভাবগ্রহণের জন্য তাকে শিক্ষিত করা এবং গভীরভাবে মনের বিকাশ-সাধন করা। আবার জ্ঞানের যে বিশেষ শাখা অবলম্বন ক'রে মন এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করবে তার ওপরে কোনক্রমেই নির্ভর করা চলবে না। শিক্ষাপদ্ধতির এই দিকটির অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ সব ঐতিহাসিক যুগে, বিশেষ করে বর্তমান যুগে আদর্শ ও ধারণার একটি

বিশিষ্ট ভাণ্ডার আছে—যা সমগ্রভাবে সমাজের সর্বসাধারণের জন্য; পরিণত বয়সে সুদক্ষ বলে পরিচিত হতে চায়, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিরই ঐ সাধারণ ভাণ্ডার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। সমগ্র শিক্ষার মূলবস্তু হিসাবে এই উপাদানটি সর্বজনগ্রাহ্য বলে ধরা যেতে পারে। শিক্ষার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এই উপাদান এবং বহু পরিশ্রমে একে আয়ত্ত করা যায়। শিক্ষা থেকে এই উপাদান বাদ দেওয়া স্পষ্টতই অসম্ভব। আসলে কিন্তু তিনটি উপাদানের মধ্যে এটি অন্যতম মাত্র। আর আশ্চর্যের কথা, যাকে আমরা প্রতিভা বলি সেই প্রতিভার বিকাশসাধনের পক্ষে এই উপাদানটি একান্ত অপরিহার্য নয়। জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এমন যুগ কখনো আসেনি, যখন শিক্ষার এই দিকটি আজকের মত এত বৃহৎ ও অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়েছে। জনৈক ব্যক্তি যেমন বলেছেন, 'ভূগোল, ইতিহাস, বীজগণিত এবং গণিতবিদ্যা প্রভৃতি যা কিছু শৈশবে উদ্বেগজনক ও বিরক্তিকর বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা এক গৌরবময় নগরীর প্রবেশ-দ্বারের চাবিকাঠিস্বরূপ। আধুনিক চেতনার এরাই হল মুক্তিদ্বার। যে ব্যক্তির ঐ বিষয়গুলিতে অধিকার আছে, শিক্ষিত গোষ্ঠির বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যোগাযোগস্থাপনের ভিত্তি সে লাভ করেছে।' তৃতীয়তঃ এই দুটি উপাদান তাদের সর্বোচ্চ স্তরে (highest degree) একত্র গৃহীত হলে তবেই মনকে প্রকৃত শিক্ষালাভের জন্য প্রস্তুত করবে (যদিও কোন ব্যক্তির মধ্যে শুধু দ্বিতীয় উপাদানটি অতি সাধারণভাবে থাকলেই তাকে শিক্ষিত বলে অভিহিত করা যায়)। এই উপাদানগুলি শিক্ষালাভের পক্ষে প্রাথমিক অবস্থার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। কোনক্রমেই এদের প্রকৃত শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলা চলে না। ঐগুলির সহায়তায় মন উপযুক্ত যন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্তু কোন্ বস্তু লাভ করবার যন্ত্র? এই মনের বার্তাই বা কী হবে? কী হবে তার অন্তর্নিহিত ভাবসত্তা? কোন্ বস্তু লাভ করবার জন্য মনের এত প্রস্তুতি? মানবত্বের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে তৃতীয় উপাদানটি অপর দুটিকে নিঃশেষে মুছে ফেলে। মনের উচ্চতর অথবা নিম্নতর যোগ্যতায় অন্তর্নিহিতভাবে তাদের স্বীকৃতিমাত্র থাকে। মানুষ তার গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হয়। অথবা একান্ত-ভাবে মনকে তদ্গত করেছে এমন কোন তত্ত্ব বা আদর্শের কাছে সে আত্মসমর্পণ করে এবং সেটিই তার জীবনের একমাত্র কাম্য (passion) হয়ে ওঠে। অথবা সে কোন একটি লক্ষ্য স্থির ক'রে তা লাভ করার সাধনায় ব্রতী হয় এবং অতঃপর শুধু তারই জন্য জীবনধারণ করে। বহুর স্তর পার হয়ে সে তখন একের স্তরে পৌঁছেছে। মন হিসাবে গ্রহণ করলে সে তখন একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক সত্তায় পরিণত হয়েছে। মানবসমাজের ঐশ্বর্যভাণ্ডারে কিছু দান করবার অধিকার সে তখন অর্জন করেছে।

ভারতের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই তিনটি উপাদানের প্রথম দুটিকে দৈবের হাতে সমর্পণ করে তৃতীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানটিকে সে সযত্নে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দেখেছে। সমভাবে পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য হল, সে তৃতীয়টিকে দৈবের হাতে সমর্পণ ক'রে প্রথম ও দ্বিতীয় উপাদানের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে নিযুক্ত।

তবে এই তিনটিরই নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে এবং শেষেরটি কোনক্রমেই তার ব্যতিক্রম নয়। উত্তেজনায় সদম্ভ প্রতিক্রিয়া, অবিরাম মানসিক কর্মতৎপরতা, অত্যধিক অস্থিরতা, এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বৌদ্ধিক

রূপান্তর, সরব আত্মপ্রতিষ্ঠা, তর্কপরায়ণতা ও ক্ষমতাপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা—এ সবই সুস্থ দ্বিতীয় ধাপের লক্ষণ হতে পারে। গুরুর যখন আবির্ভাব হয় অথবা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে এমন কোন আদর্শের উপলব্ধি হয় তখন প্রথম দিকে তীব্র সংগ্রাম দেখা দিলেও পরিণামে এমন অবস্থা আসে যখন অনুভূত হয় এক প্রগাঢ় প্রশান্তি। গুরুর মনে তত্ত্বটি যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে ঠিক সেইভাবে তাকে দেখা একান্ত আবশ্যক। হৃদয়মনকে গুরুর সঙ্গে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে এমনভাবে তাঁর সেবা করা প্রয়োজন, যাতে মনে হবে যেন তাঁর (গুরুর) নিজেরই হাত-পা কাজ করছে। গুরুর চিন্তা স্বকীয় করবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় নীরবে মনপ্রাণ সহযোগে তাঁর সেবা করে যেতে হবে—এই হল উপায়। এইকালে কোন বিদ্রোহের অবকাশ থাকবে না। পরিণামে গুরু দেন স্বাধীনতা, তিনি বদ্ধ করেন না। যদি তাঁর জন্য কোন ভাববিকাশের গতি রুদ্ধ করতে আমরা বাধ্য হই তবে সে হবে গুরুর নিকৃষ্ট সেবা। সবশেষে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে তিনি ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনে আমাদের আহ্বান করেন নি। তাঁর আহ্বান সত্যেরই নামে এবং সেই সত্যের যে-কোন রূপে আবির্ভাব ঘটতে পারে। প্রথমতঃ এটি অত্যাবশ্যক যে, গুরু কাজটিকে যে অবস্থায় রেখে অন্তর্ধান করবেন, আমাদের সেখান থেকে আরম্ভ করতে হবে। 'অহংবুদ্ধি'-বর্জিত হয়ে কঠোর পরিশ্রমে সেই আদর্শের রূপায়ণ প্রয়োজন—যে-আদর্শ তাঁর মধ্য দিয়েই আমাদের ভিতর অঙ্কুরিত হয়েছে। উপলব্ধি করতে হবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গুরুর সঙ্গে সম্পর্কের ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের সমগ্র জীবনের সার্থকতা।

গুরু হয়তো প্রচ্ছন্নই রয়ে গেলেন, জগতের দৃষ্টির সামনে প্রকটিত হলেন শিষ্য। কিন্তু শিষ্যের প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটি ভঙ্গী নির্দেশ করবে সেই গোপন পবিত্র উৎসটি যেখান থেকে তিনি শক্তিলাভ করেছেন। কেননা, অপরের মহিমা প্রকাশের জন্যই কাজ করা হচ্ছে, এই মনোভাব থেকেই মহত্তম শক্তির বিকাশ ঘটে। স্ত্রী তার স্বামীর জন্য যতখানি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কোন ব্যক্তি নিজের জন্য তত মহৎ-ভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। নিজের জন্যই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি—এই বোধ তার মহিমা ও অনুপ্রেরণাকে খর্ব করে। স্বীয় আধ্যাত্মিক চেতনার অহঙ্কার অপেক্ষা গুরুভক্তির মধ্য দিয়ে শিষ্য অধিক আনন্দ লাভ করে। পিতার মুখ উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা পুত্রকে তার নিজের যশ-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা অধিক আগ্রহী করে। এসব হল মানব-হৃদয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং ভারতবর্ষ এই অনাবিষ্কৃত রহস্যের উদ্ঘাটনেই নিজেকে নিয়োজিত করেছে। এইভাবে মহত্ত্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যাইহোক, বর্তমান যুগে জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে না হলে মহত্ত্ব বিষয়ে কিছু বলা কঠিন—শিক্ষার দ্বিতীয় উপাদানের অন্তর্ভুক্ত না হলে মহত্ত্ব চেনাও কঠিন। আধুনিক ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশের জন্য কতিপয় তথ্যাবলী সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। এই তথ্যভাণ্ডারের সারাংশ কী সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা কৌতূহলোদ্দীপক। তবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে বিষয়টি সমগ্রভাবে চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত। আমরা দেখতে পাই যে, সজ্জন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হল নিঃস্বার্থপরতা—রামকৃষ্ণ পরমহংস বোধ হয় এদেরই 'বিদ্বান্‌লোক' বলে অভিহিত করেছেন। এই দৃষ্টিতে এক কৃষক-রমণী হয়তো রাজ্যশাসনে নিযুক্ত কোন সাম্রাজ্ঞী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এমন কি, বুদ্ধির

ক্ষেত্রেও কৃষকপত্নীর মধ্যে তীক্ষ্ণ-বিচারবোধ, সূক্ষ্মদর্শিতা, সহজাত বুদ্ধি এবং অন্যান্য শত শত ক্ষমতা থাকার ফলে কোন উচ্চপদস্থ, ক্ষমতা-সম্পন্ন নারী তার অপেক্ষা যোগ্যতর বলে প্রতিপন্ন হতে পারে না।

জগদ্বরেণ্য কাহিনীগুলি কি মেষপালক ও গোপিকা-রমণীদের সম্পর্কেই রচিত হয় নি, অথবা সূত্রধর ও উষ্ট্রচালকদের সম্পর্কে? দেখা যায় যে, মন সুদূর বা অস্পষ্ট কোন বিষয়বস্তুকে কর্মক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করলে তার স্বীকৃতিলাভ দুরূহ। জগতের পরিচিত ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপৃত থাকলে অপেক্ষাকৃত সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। কোনও ভুটিয়া বালকের মধ্যে কবিত্বশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও সে হয়তো মূক ও অখ্যাত জীবন যাপন করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে। ইতিহাসের হোমার ও শেকস্পীয়রেরা সকলেই সমসাময়িক বিশ্বকৃষ্টির অংশীদার।

নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সমধিক সহায়ক কোন বুদ্ধিভিত্তিক সূত্র নির্ণয় করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা দমন করা উচিত—একথা আমাদের সকলেরই জানা আছে। কিন্তু যখন আমরা সুদূর আকাশে অবস্থিত স্থির নক্ষত্রমণ্ডলীর আয়তন ও দূরত্ব সম্বন্ধে কিছু জানব এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতে পারব, তখনই আমাদের পক্ষে উল্লিখিত আত্মসংযম নিঃসন্দেহে সহজ হবে। বৌদ্ধিক কার্যকলাপের দ্বারা চারিত্রিক উন্নতিলাভের যথেষ্ট সহায়তা হতে পারে। এছাড়াও পরিণত বয়সে আত্ম-প্রকাশের উপায় হিসাবে এই ধরনের কাজের প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধুমাত্র লিখতে ও পড়তে শেখা এবং তার মাধ্যমে কতিপয় ঘটনা মুখস্থ করারূপ যে বিদ্যাভাস তার সঙ্গে কৃষ্টির আদর্শকে অভিন্ন করে দেখতে চাই না। আমরা ভাল করেই জানি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি অপেক্ষা কথক ও মঙ্গল-গায়েনের সঙ্গে পরিচিত এক নিরক্ষর ভারতীয় পল্লীবাসীর মধ্যে সাহিত্যের অনুশীলন অনায়াসে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। অপরপক্ষে একথা ভুলে যেতে চাই না যে, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশসাধন আমাদের কর্তব্য। শিক্ষালাভের জন্য কোন প্রকার সুযোগ অবহেলা করা জনগণ-দেশ-ধর্মের প্রতি দায়িত্বপালনে সমুৎসুক যে-কোন হিন্দুর পক্ষে সঙ্গত হবে না। এ হল প্রাত্যহিক ঋষিযজ্ঞ এবং নরনারী উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য।

শিক্ষার তৃতীয় উপাদানটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে জগতে কবি ও বিদ্বৎমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। আধ্যাত্মিকতাই হল সেই আদর্শ—যে আদর্শ নিজস্ব করবার জন্য আমরা আত্ম-সমর্পণ করি, এখন যে আদর্শ আমাদের সমগ্র জীবন পরিব্যাপ্ত করে রাখে, যে আদর্শ লাভের জন্য আমাদের সমগ্র শিক্ষাদীক্ষা কেবল প্রস্তুতিমাত্র। নিজেকে তার কাছে নত করার অর্থ এখানে ত্যাগ। আমাদের উৎসাহ এক্ষেত্রে প্রচারকস্বরূপ। প্রকাশভঙ্গী এখানে অকিঞ্চিৎ-কর। আমাদের সমগ্র সত্তা এই বৌদ্ধিক প্রবল আকাঙ্ক্ষার প্রবাহে অবগাহনান্তে নবীন, ভাস্বর, সংযত ও আত্মনিয়ন্ত্রিত হয়ে নব কলেবর ধারণ করে। এর প্রতিদানে নিজের জন্য ধন, মান বা যশের প্রত্যাশাই হল একমাত্র পাপ। কিন্তু যে ব্যক্তি আদর্শের বৃহত্তর জীবনে নিশ্চিতরূপে প্রবেশ করেছে, বেশীদিন তাকে এই সব তুচ্ছ জিনিস ধরে রাখতে পারে না, অথবা তার জীবনকে একেবারে ব্যর্থ করে দিতে পারে না, কারণ

যে ভাবনার অনুসরণ সে ক'রে এসেছে তার তীব্রতা তাকে পরিচালিত করে, এমন কি, তার স্বার্থচিন্তা পর্যন্ত তিরোহিত হয়। মৃৎশিল্পী পলিসি (Palissy) ছিলেন একজন এ ধরনের আদর্শবাদী। তেমন একজন ছিলেন রেল-ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা ষ্টীফেনসন। ডিমের পরিবর্তে যিনি নিজের ঘড়িটি সিদ্ধ করেছিলেন সেই নিউটন হলেন তৃতীয় জন। কোন জাতি সাধারণ শিক্ষার মধ্য দিয়ে ঐ ধরনের কতজন অসাধারণ ব্যক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম তার সংখ্যার ওপরেই শেষপর্যন্ত তার উত্থান ও পতন নির্ভর করে। আজকের দিনে এই বিষয়ে ভারত সম্পর্কে কি বলা চলে? তার নিঃস্ব বিদ্বৎমণ্ডলী একথার উত্তর দিক! বিশ্বজনীন ভাবগ্রহণে সমর্থ তার জনসাধারণের যোগ্যতাই উত্তর দিক! বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত অদ্বৈতের ভেরী-নিনাদ তার উত্তর দেবে। বিজ্ঞান, কলা, ইতিহাস, শিল্পবিদ্যা, ব্যবসা, বাহ্য ও আন্তর ক্ষেত্রে মানুষের অভ্যুদয়—এ সবই সেই এক সত্যের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। এর যে-কোনটির ভেতর দিয়ে আসতে পারে জ্ঞানালোক, চরিত্রের রূপ ও গঠন এবং অনন্ত আত্ম-বিস্তৃতি যার অর্থ হল চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। এই সুযোগলাভের জন্য প্রথমে আবশ্যক ভাবের নিরূপণ। আদর্শকে সচেতন-ভাবে গ্রহণ করতে হবে। উন্মাদনা ও আত্মোৎসর্গের সুযোগ দিয়ে সাধারণ শিক্ষাকে পবিত্র অনুষ্ঠানের মর্যাদা দিতে হবে। একবার যদি এই তত্ত্বটি আমরা ধারণা করতে পারি, তাহলে দেখব সাধারণ লোক ও ধনী-সম্প্রদায়, স্ত্রীলোক এবং পুরুষ—এদের সকলের শিক্ষা-দান ব্যাপারে আমাদের পছন্দের কোন স্থান নেই—এটি আমাদের ইচ্ছাধীনও নয়, পরন্তু একটি অবশ্যপালনীয় দায়িত্বরূপে আমাদের উপর পরিন্যস্ত। মানুষের প্রকৃত সত্তা তার মন, শরীর নয়—আত্মা, মাংসপিণ্ড নয়। চিন্তা-ও অনুভূতি-শীল জীবনের মধ্যেই তার উত্তরাধিকার নিহিত। যে-কোন ব্যক্তির সম্মুখে উচ্চতর জীবনের দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া জীবহত্যা অপেক্ষা অনেক বেশী জঘন্য পাপ; কেননা এ দায়িত্ব হল আধ্যাত্মিক মৃত্যুর এবং আভ্যন্তরিক বন্ধনসৃষ্টির, যার পরিণাম অবর্ণনীয় ধ্বংস। বর্তমানে আমাদের সম্মুখে একটিমাত্র অবশ্যকর্তব্য আছে। সে কর্তব্য হল, প্রয়োজন হলে আমাদের প্রত্যেককে জীবন দিয়ে শিক্ষাকে সহায়তা করতে হবে বৃহত্তর অর্থে এবং সামান্য অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তার উভয়কেই, ছোট বড় সকল ক্ষেত্রেই।

রামচরিতমানসে কাক-গরুড়-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

পার্বতী ও গরুড়ের মানসিক অবস্থার তারতম্য

প্রসঙ্গক্রমে, একদিক দিয়ে দেখলে মনে হয়,—কি আশ্চর্য! যে শিব সংসার ভুলে, আহার-নিদ্রা ভুলে, একাসনে বসে পার্বতীর সাথে হরিকথাপ্রসঙ্গে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়ে দেন, তাঁর আজ কৈলাস ছেড়ে পার্বতীকে ছেড়ে, কুবেরের সাথে দেখা করবার এতই দরকার পড়ে গেল যে, কাজের তাগিদে, দু'দণ্ড বসে গরুড়ের সাথে ভাল ক'রে দুটো কথা বলারও আজ তাঁর ফুরসত নেই! অপরপক্ষে মনে হয়, রঙ্গচ্ছলে এইভাবের অবতারণা ক'রে রামচরিতমানসকার দু'টি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র অবলম্বনে অবস্থাভেদে আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিকাশ, অধ্যাত্মবিদ্যালাভের যোগ্যতার তারতম্য ও সেই সঙ্গে শ্রীভগবানের অহেতুক কৃপার নিদর্শন একসঙ্গে প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। দেখা যায়, পার্বতীর ক্ষেত্রে জন্ম-জন্মান্তরে শিব-সান্নিধ্যের ফলে হরিকথাশ্রবণে যে প্রীতির উদয় হয়েছিল এবং পরিণামে যে পরমানন্দ লাভ হয়েছিল, তাতেই এতদিনে তাঁর সকল সন্দেহের অবসান, সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল। অপরপক্ষে, গরুড়ের মন এখনও অশান্ত, "খেদখিন্ন", সমস্যাকাতর। মনের গুরুতর সমস্যাসকলের সমাধানই আজও তার পক্ষে একমাত্র না হলেও, সর্বপ্রধান লক্ষ্য। কোন শক্তিমান পুরুষের শক্তিপ্রভাবে আপন পীড়িত মনকে অচিরে রোগমুক্ত—সমস্যামুক্ত ক'রে নেবার অভিপ্রায়ে, তাঁর দিব্যদৃষ্টির বিমল আলোকপাতে নিজ মনের অন্ধকারকে দূর করবার উদ্দেশ্যে, ত্রিভুবন ঘুরতে ঘুরতে সে আজ তাই শিবের নিকট উপস্থিত। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই সে হয়ত আবার স্বস্থানে প্রস্থান করবে। যে যথার্থ বিষয়-বৈরাগ্যে, যে ঈশ্বর-প্রীতিতে মনের স্থিতি হয়, গতাগতি বন্ধ হয়ে যায়, মনের সে বৈরাগ্য, সে প্রীতি বুঝি তার এখনও লাভ হয় নি। অন্তর্যামী শিব তাই কি আজ তাকে দীর্ঘকাল-সাধুসঙ্গরূপ আহার ও ঔষধের ব্যবস্থা দিয়ে এখন বলছেন—

বিনু সতসঙ্গ ন হরিকথা তেহি বিনু মোহ ন ভাস।
মোহ গয়ে বিনু রামপদ ন দৃঢ় অনুরাগ ॥

সৎসঙ্গ না হলে হরিকথা হয় না। হরিকথা না হলে মোহ যায় না। আর, মোহ না গেলে রামপদে দৃঢ় অনুরাগ জন্মে না।

কিন্তু,

"The companionship of the saint is very rare indeed, it is extremely hard to recognise one, but its effect is infallible." (১)

তাই বুঝি স্বল্পকাল শিবসঙ্গের ফলে গরুড়ের বেদনা-কাতর মনে চৈতন্যের উন্মেষ দেখা যায়। আর, উত্তম বৈদ্য শিবও তাই তার নিকট কেবলমাত্র সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেই ক্ষান্ত না হয়ে, তাকে উপযুক্ত সাধুর সন্ধানও বলে দিচ্ছেন। এ সাধুটি আর কেউ নয়,—এ সেই ভূষণ্ডীকাক যার কথা পূর্বে শিব পার্বতীকে বলেছিলেন।

(১) স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি।

উত্তর দিসি সুন্দর গিরিনীলা।
তহঁ রহ কাকভুসুণ্ডি সুসীলা॥
রাম ভগতি পথ পরম প্রবীনা।
জ্ঞানী গুণগৃহ বহুকালীনা॥
রামকথা সো কহই নিরন্তর।
সাদর সুনহিঁ বিবিধ বিহঙ্গবর॥

উত্তরদিকে এক সুন্দর নীল পর্বত আছে, সেখানে সুচরিত্র কাকভূষণ্ডী বাস করে। সে রামপথের একজন পরম প্রবীণ পথিক—জ্ঞানী, গুণী এবং বহু প্রাচীন। সে নিরন্তর রামকথা বলে, আর নানাজাতীয় শ্রেষ্ঠ পাখীরা আদরে সে সব কথা শোনে। এরপর শিব বলছেন,—পার্বতি! তাকে বললাম—

জাই সুনহু তহঁ হরিগুণ ভূরী।
হোইহি মোহজনিত দুখ দূরী॥
মৈঁ জব তেহি সব কথা বুঝাই।
চলেউ হরষি মম পদ সিরু নাঈ॥

সেখানে গিয়ে খুব ক'রে হরিগুণগান শোন, তাহলে তোমার মোহজনিত দুঃখ দূর হবে। আমি যখন তাকে এমন ক'রে সব কথা বুঝিয়ে বললাম, তখন সে আমার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে আনন্দে [ভূষণ্ডীকাকের উদ্দেশ্যে] যাত্রা করল।

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো—মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ"

মনে হয় এই পর্যন্ত ব'লে শিব একটু চুপ করলেন। এই অবসরে কল্পনায় ভেসে ওঠে একখানি অপরূপ ছবি! শিব ও পার্বতী নীরবে মুখোমুখী বসে আছেন। একের দৃষ্টি অপরের প্রতি নিবদ্ধ। যে ভাবগঙ্গা ব্রহ্মলোক থেকে মর্ত্যে আসবার পথে, এতদিন ধরে শিবের জটাজাল-নিবদ্ধা হয়ে ছিল, আজ যেন সেই অপার্থিব ভাবধারা উত্তম অধিকারীর আকর্ষণে আকৃষ্টা হয়ে শিবমুখনিঃসৃত বাক্যধারারূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হতে চলেছে! আর, তৃষিত চাতকীর মত পার্বতী সেই মন্দাকিনীধারা আকণ্ঠ পান করেও যেন তৃপ্ত হতে পারছেন না! অখণ্ড মনোযোগের সাথে পার্বতী এতক্ষণ ধরে শিবের প্রত্যেকটি কথা শুনছিলেন, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিটি লক্ষ্য করছিলেন। মুখে একটিও কথা নেই। কিন্তু, শিব দেখলেন,—শিব বুঝলেন, সেই নির্বাক্ দৃষ্টিতে এখন যেন ভাষা ফুটে উঠেছে, আর বিস্ময়ের সুরে মিনতি ক'রে তা যেন বলতে চাইছে,—হে প্রভু! তুমি ত 'শুধু মন্নাথ নও, তুমি ত জগন্নাথ। তুমি ত শুধু মদ্গুরু নও, তুমি যে জগদ্গুরু। তোমার পক্ষে এমন কি অদেয় থাকতে পারে যার জন্য ব্যাকুল ভক্তকে অন্যের কাছে হাত পাততে হবে?—যার জন্য শ্রান্ত-ক্লান্ত গরুড়কে, তোমায় ছেড়ে ভূষণ্ডীকাকের কাছে যেতে হয়েছিল? এ কী আশ্চর্য কথা শুনছি ঠাকুর! অন্তর্যামী শিব যেন পার্বতীর এই অন্তরের ব্যথা—অকথিত কথা বুঝেই, মৃদু হেসে এখন তাই তাঁকে বলছেন—

তা তেঁ উমা ন মৈঁ সমুঝাবা।
রঘুপতিকৃপা মরম মৈঁ পাবা॥
হোহহি কীন্হ কবহু অভিমানা।
সো খোবই চহ কৃপানিধানা॥

রামকৃপার মর্মকথা আমি জানি; সেইজন্যই, উমা, আমি নিজে আর তাকে কোন তত্ত্বোপদেশ দিইনি। তার হয়ত কখনও কোন দিন অহঙ্কার অভিমান হয়েছিল। কৃপানিধান প্রভু যে তার সেই অভিমান নির্মূল করতে চান!

তারপর একটু থেমে, মিষ্টি ক'রে আবার বলছেন—

কছু তেহি তেঁ পুনি মৈঁ নাহিঁ রাখা।
সমুঝই খগ খগ হী কৈ ভাখা॥
প্রভুমায়া বলবন্ত ভবানী।
জাহি ন মোহ কবন অস

[কি জান পার্বতি!] তাকে আমার কাছে না রাখার আরও একটা কারণ হচ্ছে, পাখী পাখীর কথাই ভাল বুঝবে।

যাই হোক শিব পার্বতীকে বলে যাচ্ছেন—

জ্ঞানী ভগতসিরোমণি ত্রিভুবনপতি কর জান।
তাহি মোহমায়া নর পাবর করাই গুমান ॥

[গরুড়কে সামান্য মনে কোরো না,] সে জ্ঞানী ভক্তশিরোমণি স্বয়ং ত্রিভুবনপতির বাহন। [এমন যে গরুড়], তার মনেও মোহমায়ার প্রভাব; আর অধম মানুষ করে কিনা আত্মাভিমান!

ভক্তির মাহাত্ম্য—"কলিতে নারদীয়া ভক্তি" —শ্রীরামকৃষ্ণ

এবার শিবের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তুলসীদাস নিজের কথায় বলছেন—

সিব বিরঞ্চি কহু মোহই কো হই বপুরা আন।
অস জিয় জানি ভজহিঁ মুনি মায়াপতি ভগবান ॥

যেখানে শিব-বিরিঞ্চিকেই মায়া মোহিত ক'রে ফেলে, সেখানে আর অন্য বেচারীদের কথা কি? ব্যাপারটা এরূপ বুঝে, তাই মুনি [অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তিমাত্রেই অন্য প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে] মায়ার অধীশ্বর শ্রীভগবানেরই ভজনা ক'রে থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথা—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

তাবদ্রাগাদয়স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহং।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥

সেই একই কথা—ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া ভিন্ন মায়া-মোহের হাত থেকে পরিত্রাণের অন্য উপায় নেই।

এখানে একটু থেমে, জয়ধ্বনি ক'রে বলতে ইচ্ছা হয়,—ধন্য তুলসীদাস! ধন্য তোমার শিব-গড়া! জগদ্গুরু শিবের শিবত্ব যাঁর অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়ে না উঠেছে, এমন ক'রে শিব-চরিত্র অঙ্কন করা বুঝি বা তাঁর পক্ষে কোন মতেই সম্ভবে না। শিব! শিব!! শিব!!! একাধারেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। ব্রহ্মারূপে তিনিই শিষ্যের মনে, শরণাগতের মনে, নূতন নূতন ভাবধারা—ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেন। ভাব-তরঙ্গায়িত চিত্তসরোবরে ভক্তের হৃৎপদ্মে বিষ্ণু-রূপে অধিষ্ঠিত থেকে তিনিই সকল ভাবের স্থিতি-সাধন করেন। আবার, মহেশ্বররূপে, বিনাশের বিধাতারূপে, সেই তিনিই, সেই সকল ভাব-ধারাকে সকল স্থিতিশীলতা, সকল সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত ক'রে বিচিত্র-তরঙ্গভঙ্গে মহাসাগরাভিমুখে প্রবাহিত করেন, প্রেমের গণ্ডি চূর্ণ ক'রে ভক্তের সকল চিন্তা, সকল কার্যধারাকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করেন। অথচ, এত করেও যেন কিছুই করেন না। কোন কর্তৃত্বাভিমান তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ভোলা মহেশ্বর সব ভুলে যেন শব হয়ে রয়েছেন। সকল গুরুর গুরু হয়েও বিন্দুমাত্র গুরুবুদ্ধির প্রকাশ নেই। দেহের উজ্জ্বল-রজতকান্তি চিতাভস্মের আবরণে আবরিত ক'রে রেখেছেন। কেন তিনি গরুড়কে কাকের কাছে শিক্ষার জন্য, দীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তার কারণে বলা হচ্ছে—উভয়েই পাখী কিনা, পাখী পাখীর কথাই ভাল বুঝবে। যেন, যা নিতান্তই স্বাভাবিক, লোকে যেমন নিত্যই ক'রে থাকে, তিনিও তাই-ই করেছেন। এতে আর নূতনত্বই বা কি, আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? এমন নিরভিমান না হলে বুঝি অন্যের অভিমান দূর করা যায় না। মন থেকে এমন নিশ্চিহ্ন ক'রে জীবতত্ত্বকে না মুছে ফেলতে পারলে, বুঝি-বা সে মনে শিবত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না!

আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে মনে হয়, "সমুঝই খগ খগহী কৈ ভাখা" অর্থাৎ পাখী পাখীর কথাই ভাল বোঝে, একথা দ্বারা, ভগবান কেন মানুষকে শিক্ষা দিতে মানুষ হয়েই যুগে যুগে অবতীর্ণ হন. প্রকারান্তরে সেই তত্ত্বেরই অবতারণা ক'রে শিব এখন পার্বতীর পূর্ব প্রশ্নের আংশিকভাবে উত্তর দিচ্ছেন

রঘুপতিকৃপার মর্মকথা—একমাত্র শিবেরই গোচর

যা হোক, আবার গরুড়ের কথাতেই ফিরে আসা যাক। একটু আগেই আমরা শিবকে বলতে শুনেছি, পার্বতি, রঘুপতিকৃপার মর্ম আমি জানি। হয়ত বা গরুড়ের মনে কখনও কোন অহংকার-অভিমানের উদয় হয়েছিল; কৃপাময় প্রভু তার মন থেকে এখন সেই অহংকারের বীজ দূর করতে চান

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, হাসপাতালে নাম লেখালে, রোগের শেষ থাকতে ছেড়ে দেয় না। বলেছেন: গ্লাস-কেসের ভিতরের জিনিস যেমন ক'রে বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, মানুষের মনও তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাই! তাই তাঁরই পক্ষে স্বনামধন্য গিরিশ ঘোষের মত লোক-কে—যার "পাঁচসিকে পাঁচআনা" বিশ্বাসের কথা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে—বলা সম্ভব হয়েছিল—"তোমার মনে বাঁক আছে।" আবার নিজ অদ্বৈত সাধনার গুরু শিবকল্প-মহাপুরুষ পরমহংস তোতাপুরীরও মনে ক্রোধের উন্মেষ দেখে হেসে মাটিতে লুটোপুটি খাওয়া তাঁরই পক্ষে শোভা পেয়েছিল। তেমনি, যে গরুড়ের ত্যাগ-তপস্যায় নারদ তুষ্ট, ব্রহ্মা হৃষ্ট, পার্বতীর ত কথাই নেই—স্বয়ং শিবও কৃপাবিষ্ট, তারও মনের কোন কোণে অহংকার অভিমানের লেশ থাকতে পারে, তা কেবল সর্বান্তর্যামী পরম-গুরু শিবের পক্ষেই জানা সম্ভব, বোঝা সম্ভব। আর, গরুড়ের জীবনেও এখন ভবরোগ-নিরাময়ের শুভক্ষণ উপস্থিত, তাই সেও নির্বিচারে শিবের নিদানের বিধান আনন্দে মাথা পেতে নিতে পেরেছিল।

গরুড় যে কি অসাধ্য-সাধন করেছিল, যাকে শুধু নিয়তির গতি, বিধির বিধান বলেই ক্ষান্ত হওয়া চলে না, স্বয়ং শিবের কথায়, কৃপানিধান প্রভুর বিশেষ কৃপার ব্যবস্থাই বলতে হয়, সে কথা বুঝতে গেলে, প্রথমে ভালভাবে বোঝা দরকার—কে এই গরুড়? কি তার বৈশিষ্ট্য? আমরা পূর্বে দেখিছি, এই গরুড়ের সম্বন্ধেই শিব পার্বতীকে বলছেন,—"জ্ঞানী ভগতসিরোমণি ত্রিভুবনপতি কর জান।" জ্ঞানী, আবার যেমন-তেমন ভক্ত নয়,—ভক্ত-শিরোমণি, তারপর আবার ত্রিভুবনপতির বাহন, অর্থাৎ তিন লোকে যেখানেই বিষ্ণু সেইখানেই গরুড়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিভূতিযোগ-বর্ণনায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, "বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্"—পক্ষিগণের মধ্যে আমি বিনতা-নন্দন গরুড়। এমন যে গরুড়, শিবের নির্দেশে নিজ মনের সংশয়-সন্দেহ দূর করতে চলেছে এখন সে কার কাছে? শিব হতে শিবতর কে সে? সে আর কেউ নয়, সেই কাক-ভূষণ্ডী। শিবের কথায় "রামভগতি পথ পরম-প্রধানা" হলেও, জগতের চোখে, পাখীদের সমাজে, নিকৃষ্টতম প্রাণী,—বিষ্ঠা-চন্দনে যার ভেদ নেই, রূপেগুণে তুলনা নেই, সেই অস্পৃশ্য কাক! এই কাকের উদ্দেশ্যেই পরমার্থলাভের আশায় কৃতাঞ্জলি হয়ে চলেছে পক্ষিরাজ গরুড় স্বয়ং। সত্যই ত রঘুপতিকৃপার মর্মকথা একান্ত রাম-ভক্ত শিব ছাড়া এমন ক'রে আর কে জানে? ভক্তি যে "অন্দরমহল পর্যন্ত যায়!" কৃপানিধান

প্রভুর এমন নিদানের বিধান নীলকণ্ঠের কণ্ঠ ছাড়া আর কোন্ কণ্ঠেই বা উচ্চারিত হবে? সকল মান-অভিমানে, সকল বিচারবুদ্ধিতে এমন নিপুণভাবে—এমন নির্মমভাবে শূলাঘাত একমাত্র শূলপাণি ছাড়া কেই বা আর করতে সক্ষম?

"নমঃ শিবায় শিবতরায় চ"

শিবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে অবনতমস্তকে গরুড়ের এইরূপে শিবলোক থেকে শিবতর-লোক যাত্রার উল্লেখ ক'রে শিব এবারে পার্বতীকে বলছেন—

গয়উ গরুড় জহঁ বসই ভুসুণ্ডী।
মতি অকুণ্ঠ হরিভগতি অখণ্ডী॥
দেখি সৈল প্রসন্ন মন ভয়উ।
মায়া মোহ সোচ সব গয়উ॥

চলতে চলতে গরুড়, কাক-ভুষণ্ডী যে পর্বতের উপরে বাস করে তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। সেখানে ভুষণ্ডী-কাক কেমন ক'রে, কি মন নিয়ে বাস করে? সে কথায় বলা হচ্ছে, 'মতি অকুণ্ঠ হরিভগতি অখণ্ডী'—কুণ্ঠাহীন মন, অখণ্ড হরিভক্তি নিয়ে বাস করে। যে মনে কুণ্ঠা নেই, সেই মনে বাসই ত সত্যিকারের বৈকুণ্ঠবাস! আর যেখানে হরিভক্তি অখণ্ড, সেই মনই ত সত্যি সত্যি কুণ্ঠাশূন্য! এ হেন বৈকুণ্ঠ অথবা, স্থূলভাবে, যে পর্বতের উপরে কাক নিরন্তর হরিভক্তি নিয়ে বাস করে, তার দৃশ্য চোখে পড়তেই, একদিন তুলসী অথবা শিবই যাকে "খেদখিন্ন" মন আখ্যা দিয়েছিলেন, গরুড়ের সেই মন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আর সেই আলোকে মন থেকে মায়া-মোহ-শোকের সকল গ্লানি এককালে দূর হয়ে গেল—'হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো জ্বালামাত্র আলোকিত' হয়ে গেল! পূর্বকথা স্মরণে দেখা যায়, তুলসী এমনি করেই ভক্তির মাহাত্ম্য—সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন!

শিব গরুড়কে বলেছিলেন—

তবহিঁ হোই সব সংশয় ভঙ্গা।
জব বহুকাল করিয় সতসঙ্গা॥

অর্থাৎ, বহুকাল সৎসঙ্গ করলে, তবে তোমার মন থেকে সকল অবিশ্বাস, সকল সন্দেহ দূর হবে। কার্যতঃ কিন্তু দেখা গেল,—বহুকাল ক্ষণকালে পর্যবসিত হল।

অতঃপর গরুড় কাক-ভুষণ্ডীর সাহচর্যে কেমন ক'রে পরাভক্তি লাভ করেছিল, "রাম-চরিতমানস"-এ পরবর্তী পর্বে সেই পুণ্যকথা ও সেইসঙ্গে ভুষণ্ডী-কাকের কাকদেহপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে।

সীমার বেদনা

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

তোমারে চেয়েছি চোখের ভুবনে
রূপে রসে ক্ষণে ক্ষণে—
বস্তুর রূপ ভাবি অপরূপ
রূপাতীত কই মনে?
যা কিছু লভেছি—ভগ্ন, বিধুর
বিস্বাদ তাই সকল মধুর
প্রাণের কিনারে আসে না সুদূর
ভাসে নাকো বাতায়নে—
বস্তুর মুখ করেছে বিমুখ
অসীমেরে এ নয়নে!

যারে পেলে হায়, সব কিছু পাই
কে যেন জানায়—কেন যে হারাই
মোহের আকুতি চোখের মায়ায়
মিছে ধাঁধাঁ হানে মনে—
বস্তুরে ছাড়ি, দিতে নারি পাড়ি
আঁখি নামে নন্দনে!
তবু তো আকাশ চাই
মরণের ডালে দোলে রে জীবন
অবিরাম কুহরায়!

গুরুভক্ত গুডউইন

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার হালদার

"স্বামীজী যদি তাঁর জীবনটাই পরহিতার্থে দিয়ে দিতে পারেন—তবে আমি না হয় অন্ততঃ আমার পারিশ্রমিকটাই ছেড়ে দিলাম" —ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি সমাধিবান সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সপ্তাহকাল কাজ করার পর নিউইয়র্কে তার শিষ্য ও শিষ্যাগণ কর্তৃক প্রদত্ত পারিশ্রমিক প্রত্যাখ্যান করার সময় উপরোক্ত তাৎপর্য-পূর্ণ কথাকয়টি যিনি বলেছিলেন তিনি স্বামীজীর একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সেবক সাংকেতিক-লিপিকার মিঃ জে. জে. গুডউইন ছাড়া আর কেহ নহেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করার পর স্বামী বিবেকানন্দ রাতারাতি বিশ্ব-বিখ্যাত বেদান্তপ্রচারক-রূপে পরিচিত হন—এবং আমেরিকার নানা স্থান ও সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ-লিপি আসতে থাকে। একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে এরূপ ভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করা ও বক্তৃতা দেওয়া অসুবিধাজনক হলেও—স্বামীজী তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তি সহায়ে কিভাবে "Cyclonic Hindu Monk of India" (ঝঞ্ঝা-প্রতিম হিন্দু—ভারতীয় সন্ন্যাসী) অথবা "Warrior Monk of India" (বীর ভারতীয় সন্ন্যাসী)-রূপে আমেরিকার এক-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তোলপাড় করে যে অসাধ্য-সাধন করেছিলেন আজ তা কাহারও অজানা নেই।

স্বামীজী ছিলেন উপস্থিত-বক্তা এবং অনন্যসাধারণ শক্তি সহায়ে শুধু ধর্মবিষয়েই নয় পরন্তু ভারতের শিক্ষা, শিল্প, সমাজ এবং পৌরাণিক ইতিহাস সম্বন্ধেও অনর্গল বক্তৃতা করে শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। শুধু তাঁর সুবিখ্যাত চিকাগো-বক্তৃতার পরেই নয়—পরন্তু আমেরিকা পৌঁছবার পর এবং চিকাগো-বক্তৃতার পূর্ব থেকেও, তাঁর কত বক্তৃতা ও ভাষণ যে বোষ্টন, অ্যানিস্কুয়াম প্রভৃতি সহরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। কৃতী লেখিকা মেরী লুই বার্কের অনবদ্য সাহিত্যকীর্তি "Swami Vivekananda : New Discovery in America" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে বহু কষ্টে সংগৃহীত সে-সব মূল্যবান বক্তৃতা ও আলোচনার কিছু কিছু নিদর্শন আছে।

প্রথমতঃ স্বামীজী ভারতীয় সন্ন্যাসীদের আদর্শে ও প্রথায় বিনা-দর্শনীতেই এ-সব বক্তৃতা প্রদান করতেন, কিন্তু তৎপর আহার বাসস্থান যাতায়াত এবং অন্যান্য ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য এবং ঐশ্বর্য ও নিয়মানুবর্তিতার পীঠস্থান আমেরিকার সামাজিক জীবনের সাথে সমতা-রক্ষার জন্য এক বক্তৃতা-কোম্পানীর সাথে বন্দোবস্ত-ক্রমে সামান্য দর্শনীর বিনিময়ে এ সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করতেন। অল্প কিছু-কাল পরেই এতেও বেশ কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়, এবং প্রতারিত হবারও সম্ভাবনা দেখা দেয় বলে তিনি এই কোম্পানীর সাথে সম্পর্ক ছেদ করে আবার স্বাধীনভাবেই বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

শুধু বক্তৃতা দেওয়া নয়—কালক্রমে স্বামীজীর শ্রোতাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক প্রকৃত ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদের একান্ত অনুরোধে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে তিনি আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে স্থায়িভাবে ধ্যানধারণা শিক্ষা দেওয়ার ক্লাসও আরম্ভ করেন। আশ্চর্যের বিষয়, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত স্বামীজীর অমূল্য ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, আলোচনা ও ভাষণরাশি নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট ষ্টেনোগ্রাফার বা সাংকেতিক-লিপিকার ছিল না; কাজেই কত মূল্যবান তথ্য যে এভাবে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সে যাই হোক, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড প্রমুখ স্বামীজীর—কতিপয় দূরদর্শী শিষ্য-শিষ্যা ও অনুরাগী বন্ধু এ বিষয়ে অবহিত হন—এবং দু-এক জন প্রার্থীকে সাংকেতিক লেখকের কাজে পরীক্ষামূলকভাবে নিযুক্ত করে বিফলমনোরথ হয়ে অবশেষে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুআরি থেকে মিঃ জে. জে. গুডউইন নামক একজন সাংকেতিক-লিপিকারকে বেশ মোটা সাপ্তাহিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বামীজীর বক্তৃতা প্রভৃতি নোট করার কাজে নিযুক্ত করেন।

মিঃ গুডউইন একজন অবিবাহিত বৃটিশ যুবক এবং প্রথমশ্রেণীর সাংকেতিক-লিপিকার (Court Stenographer) ছিলেন এবং প্রতি মিনিটে তাঁর সাংকেতিক লিপি সহায়ে প্রায় ২০০টি শব্দগ্রহণে সক্ষম ছিলেন। কাজেই পারিশ্রমিকটাও যে তাঁর বেশ মোটা রকমই নির্দিষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মাত্র একসপ্তাহকাল স্বামীজীর ন্যায় একজন অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের বক্তৃতা গ্রহণ করে ও তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে এসে গুডউইনের ভাবধারায় যে পরিবর্তন এসে গিয়েছিল তা আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি; সাংকেতিক-লিপিকার মিঃ গুডউইনের মুখে কি অনাসক্ত কর্মযোগী-সুলভ উক্তি! "স্বামীজী যদি তাঁর জীবনটাই পরহিতের জন্য দিয়ে দিতে পারেন—তবে গুডউইন না হয় তার পারিশ্রমিকটা দিয়ে দিলে!"

অবশ্য ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জলন্ত প্রতিমূর্তি আধিকারিক পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে মিঃ গুডউইনের এ পরিবর্তনে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। জীবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মহাপুরুষদের প্রবল ইচ্ছাশক্তিই যেন ঐশী শক্তির সাথে মিলিত হয়ে এ সমস্ত "পূর্ব-নির্দিষ্ট" মুক্তাত্মাগণকে তাঁদের সহকারী ও সাহায্যকারী রূপে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। তারই প্রমাণ দেখতে পাই আমরা উপরোক্ত ক্ষেত্রে! শুধু এক সপ্তাহের মধ্যেই এ যেন কোর্ট-ষ্টেনোগ্রাফার মিঃ জে. জে. গুইউইনের স্বামীজীর একান্ত অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত শিষ্য "My Faithful Goodwin"-এ রূপান্তর! এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে গুডউইনের পূর্বে যে ক'জন সাংকেতিক-লিপিকারকে স্বামীজীর কাজে নিযুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল, পরীক্ষায় দেখা গেল তাঁদের কেহই স্বামীজীর ভাবধারা যথাযথ অনুসরণ করতে সক্ষম নন।

কিছুকাল নিউইয়র্ক কেন্দ্রে বক্তৃতা ও ক্লাস করার পর স্বামীজী মিঃ ষ্টার্ডি ও মিস মূলার প্রমুখ ইংলণ্ডের কতিপয় অনুরাগী শিষ্যের বারংবার অনুরোধ- ও আমন্ত্রণ-ক্রমে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে পারী হয়ে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ভ্রমণে আসেন। তথায় পৌছবার অব্যবহিত পরেই তিনি বক্তৃতা ও ক্লাস আরম্ভ

করেন। এসময় গুডউইন স্বামীজীর নিত্যসহচর-রূপে অবস্থান করতেন এবং একান্ত অনুরাগ- ও শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁর বক্তৃতা ও আলোচনা প্রভৃতির নোট নিতে থাকেন। স্বামীজীর ইংলণ্ডে পৌছিবার কিছুকাল পূর্বেই—তাঁর আহ্বানে স্বামী সারদানন্দ ভারতবর্ষ থেকে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য ইংলণ্ডে এসে মিঃ ষ্টার্ডির গৃহে অবস্থান করতে থাকেন; পরে যথাসময়ে গুডউইনও আমেরিকা থেকে তথায় এলে দুজনের মধ্যে খুবই হৃদ্যতা জন্মে।

তখন লণ্ডন সহরের পিকাডেলী অঞ্চলে ওয়াটার-পেইনটিং গ্যালারীতে স্বামীজীর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ প্রভৃতির বক্তৃতা চলছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি—গুডউইন তখন শুধু স্বামীজীর সাংকেতিক-লিপিকারই নন—পরন্ত তাঁর অনুগত সেবক ও একান্তসচীব-রূপেও কাজ আরম্ভ করেছেন। কোন্ দিন স্বামীজীর কি বক্তৃতা হবে তার বিবরণ পূর্বেই লিখে গুডউইন স্থানীয় কাগজের চার্চ-কলমে বিজ্ঞাপিত করতেন; স্বামীজীর কোথায় কোন্ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে, কে কখন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে আসবে, তাঁর বক্তৃতা কোন্ কোন্টা প্যামফ্লেট বা পুস্তকাকারে ছাপাতে হবে—ইত্যাদি সবকিছু কাজেরই বন্দোবস্ত গুডউইনকে করতে হত। সমসাময়িক কালের ঘটনার উপর রচিত দু-একখানি গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক মনোজ্ঞ বিবরণ ও তৎসহ গুডউইনের চরিত্র-মাধুর্যের পরিচয় মেলে।

তখনকার দিনে লণ্ডন সহরে ঘোড়ায় টানা বাসগাড়ীর প্রচলন ছিল। বক্তৃতার দিনে স্বামীজীর সহকারী-রূপে গুডউইনও একই বাসে বক্তৃতাস্থল পিকাডেলি অঞ্চলে ওয়াটার-পেইনটিং গ্যালারিতে যেতেন। মিঃ ষ্টার্ডি ও স্বামীজী বসতেন দোতলা বাসের সম্মুখভাগে, আর গুডউইন ও স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি বসতেন পেছনের দিকে। কখনও বা থাকত স্বামীজীর মুখে একটা পাইপ এবং তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট মিঃ ষ্টার্ডির সহিত নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে এবং মুক্তবায়ু সেবন করতে করতে গুডউইন ও দলবল সহ মহানন্দে বক্তৃতাস্থলের দিকে অগ্রসর হতেন।

স্বামীজীর এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা ছিল যার বলে তিনি আবশ্যকমত মুহূর্তমধ্যেই নিজের ভাব পরিবর্তন করে সাধারণ ভূমি থেকে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করতে পারতেন এবং পূর্বে তৈরী না হয়েই উপস্থিত-মত যে-কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ে উৎকৃষ্ট ভাষণ দিতে পারতেন; এজন্যই তাঁকে আমেরিকায় বলা হত "He is a speaker by divine right" ("বক্তৃতা দিতে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে)"। বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি হয়ত সাধারণ কথাবার্তায় লিপ্ত থাকতেন; বক্তৃতার সময় এলে তবেই গুডউইন স্বামীজীর কানে কানে কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা দেবার কথা কাগজে বিজ্ঞাপিত হয়েছে সেটা জানাতেন। প্রত্যক্ষ-দর্শীদের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায়, বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজীর সমস্ত হাবভাব ও চেহারায় বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হত, আর শ্রোতারা শুধু বক্তৃতাই শুনতেন না, সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পদও কিছু পেয়ে যেতেন বলে অনুভব করতেন।

সে যাই হোক, গুডউইন তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে স্বামীজীর মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথা যথাযথভাবে ধরে রাখতেন! কোন কোন দিন বা বক্তৃতান্তে ক্লান্ত হয়ে স্বামীজী গুডউইনের সাথে—কি বক্তৃতা দিলেন, বক্তৃতা

কেমন হল ইত্যাদি বিষয়ে হাল্কা ধরনের আলাপ করে শ্রম অপনোদন করতেন। যেদিন বক্তৃতা বিশেষভাবে জমে উঠতো সেদিন গুডউইনের আনন্দ আর ধরত না।

একদিন স্বামীজী তাঁর নানা ধরনের কাজের চাপে এক ডিউক বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে সান্ধ্যভোজের কথা একদম ভুলে গেছেন; হয়ত ২৫।৩০ মিনিট আগে হঠাৎ মনে হয়ে গেল যে নিমন্ত্রণে যেতে হবে। তখনই তাড়াহুড়ো করে গুডউইনের ডাক! "বাবা গুডউইন! সর্বনাশ হয়ে গেছে, এমন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে নেমন্তন্ন—তা একদম ভুলে গেছি। নিয়ে আয় তো বাবা শিগ্‌গির একটা ব্রাউহাম ডেকে।" হয়ত পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গাড়ী এসে গেল; আবার ডাকলেন, "বাবা গুডউইন! কোথায় গেল জুতোজামা? নিয়ে আয় তো বাবা ছড়ি ও টুপী—ধরিয়ে দে তো পাইপখানা।" যেমন যেমন বলা গুরুগতপ্রাণ গুডউইনও তেমনি ইংরেজ-জাতি-সুলভ তৎপরতার সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বামীজীর সবগুলি কাজই করে দিলেন; সর্বশেষে হয়ত ওভার-কোটখানা নিয়ে খট খট করে স্বামীজীকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন।

এরূপে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে জুন অবধি গুডউইনের দিনগুলি গুরুদেবের একান্ত সান্নিধ্যে এবং স্বামী সারদানন্দের সাহায্যে লণ্ডন সহরে বেশ আনন্দেই কাটছিল। কিছুকাল পরেই কিন্তু স্থানাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয় এবং নানা দিক দিয়ে খরচও বেড়ে যায়; এবং গুডউইনকে বেশ একটু কষ্ট করেই বাইরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে আসতে হত। একদিন তো গুডউইন বলেই ফেললেন—"স্বামীজী! আমার জন্য আপনার কতই না অসুবিধা হচ্ছে! তার চেয়ে বরং আমায় কিছু-কালের জন্য আমেরিকায় পাঠিয়ে দিন—সেখানে যেয়ে আপনার বই প্যামফ্লেট প্রচার প্রভৃতির কাজ কিছু কিছু করি এবং বাইরে কিছু রোজগারের পথও দেখি।" স্বামীজী তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত সহচরকে সাময়িক ভাবেও ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনায় মনে মনে বেশ একটু দুঃখিতই হলেন। কিন্তু সব কিছু বিবেচনা করে অবশেষে স্থির হল স্বামী সারদা-নন্দ প্রচারকার্যে নূতন দেশ আমেরিকায় যাচ্ছেন—তাঁর সাথে গুডউইনও যদি যায় তবে তাঁকে আবশ্যকমত সব বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তমত সত্যই একদিন জুনের শেষ সপ্তাহে গুডউইন তাঁর গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে স্বামী সারদানন্দের সাহায্যকারী-রূপে লণ্ডন থেকে আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন, এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে অবস্থান করতে লাগলেন। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে অনভ্যস্ত থাকায় স্বামী সারদানন্দের প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হত; গুডউইন কিন্তু তাঁর সাথে সর্বদা ছায়ার মতন থেকে তাঁকে নানাভাবে উৎসাহিত করতেন। একবার এক মস্ত তাঁবুতে বেশ কিছু লোকের সামনে স্বামী সারদানন্দকে বক্তৃতা করতে হয়; প্রথমতঃ তাঁর একটু আরষ্ট ভাব আসে, তার পরেই কিন্তু বক্তৃতা বেশ জমে যায়; গুডউইন কাছেই ছিলেন এবং বক্তৃতার সময় একটু একটু হাসছিলেন; পরে কারণ জিজ্ঞাসায় স্বামী সারদানন্দকে বলেছিলেন বক্তৃতাটি খুব ভাল হওয়ার জন্যই হাসছিলেন, অন্যকোন কারণে নয়। কোন কোন সভায় বক্তৃতাশেষে তৎ-কালীন আমেরিকান প্রথামত শ্রোতারা স্বামী সারদানন্দকে ভারতের নানা জটিল দার্শনিক

তত্ত্ব এবং পাদ্রিদের-প্রচারিত কাল্পনিক কুসংস্কার, যথা কুমীরের মুখে সন্তান-নিক্ষেপ প্রভৃতি উদ্ভট বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। গুডউইন স্বামী সারদানন্দের সাহায্যকল্পে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন এবং স্বামীজী-সম্বন্ধে পাদ্রিদের দ্বারা ঈর্ষা-প্রণোদিত নানারূপ অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে আবশ্যকমত জোর প্রতিবাদ করতেন। এ সময় স্বামী সারদানন্দের সহযোগে গুডউইন আমেরিকায় প্রচারকার্যও চালিয়েছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে মিসেস ওলিবুলকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী অন্যান্য কথার সঙ্গে বলেছেন—'গুডউইন ও সারদানন্দ যদি আমেরিকায় কাজের প্রসার করতে পারে তো ভগবৎকৃপায় তারা তাই করতে থাকুক।'

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে প্রায় দুমাসের জন্য স্বামীজী লণ্ডন থেকে সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানী ভ্রমণে চলে যান। সুইজারল্যাণ্ডে আল্পস পর্বতের তুষারমণ্ডিত শীর্ষগুলি তাঁকে তুষারমৌলী হিমালয়ের কথা মনে করিয়ে দিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুইজারল্যাণ্ডে এসে অবধি তিনি প্রায়ই গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। কিন্তু কঠোর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম থেকে সাময়িক বিশ্রামলাভের আশায় এখানে এসেও তাঁর বিশ্রামলাভের উপায় ছিল কি? আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতের কাজের প্রসারতার কথা চিন্তা করে নানারূপ জরুরী নির্দেশ দিয়ে এখানথেকেও তিনি শিষ্য ও গুরুভ্রাতাগণকে অনেক চিঠি লিখেছেন; গুডউইনও তাঁর নির্দেশ চেয়ে এ সময় তাঁকে চিঠি লিখতেন।

স্বামীজীর বিশাল পত্রাবলীর মধ্যে গুডউইনকে লেখা শুধু একখানা পত্রেরই সন্ধান পাওয়া যায়; ৮ই আগষ্ট ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে—সুইজারল্যাণ্ড থেকে লেখা এই সুদীর্ঘ চিঠিখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে স্বামীজী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সন্ন্যাসীর একান্ত কাম্য অনাসক্ত কর্মযোগ, চূড়ান্ত বৈরাগ্য ও অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে গুডউইনকে গীতা ও উপনিষদ্ থেকে উদ্ধৃতিসহ যে তত্ত্বোপদেশপূর্ণ চিঠিখানা লিখেছেন তার ভাব, ভাষা ও বিষয়-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হতে হয়। আরও আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে, স্বামীজীর ন্যায় যুগন্ধর পুরুষের একান্ত সান্নিধ্যে এসে কেবলমাত্র আট মাসের মধ্যেই গুডউইনের কি আশ্চর্য পরিবর্তন! মনে হয় কি ঐ আট মাস মাত্র সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম অতিক্রম করে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন, নয়ত স্বামীজীর ন্যায় অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন মহাপুরুষ – 'জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি' (গীতা)—'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ' (মুণ্ডক-উপনিষৎ) ইত্যাদি চূড়ান্ত বৈরাগ্যপূর্ণ শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতিসহ কোন অনধিকারী শিষ্যকে এমন একখানা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখতেন না।

সে যাই হোক, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের প্রচারকার্য সাময়িকভাবে শেষ করে স্বামীজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তাঁর বিশ্বস্ত সহচর গুডউইন ও ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারসহ ইটালী হয়ে ভারতাভিমুখে রওনা হন। ১৫ই জানুআরি স্বামীজী তাঁর শিষ্যবর্গসহ কলম্বোতে উপস্থিত হন এবং ২৬শে জানুআরি ভারতভূমি পাম্বান উপকূলে পদার্পণ করেন। তারপর তাঁর প্রতিপদক্ষেপে রাজকীয় অভ্যর্থনা এবং কলম্বো থেকে আলমোড়া অবধি ভারতীয় গণমানসে যে কি এক বিরাট উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল, "ভারতে বিবেকানন্দ" নামক গ্রন্থে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে। আর স্বামীজীর বিশ্বস্ত শিষ্য গুডউইন ছায়ার ন্যায় তাঁর সাথে সাথে থেকে স্বামীজী-মুখনিঃসৃত প্রায় প্রত্যেকটি

কথা ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এ শুধু সাংকেতিক-লিপিকারের কাজ নয়—এ গুরুর উদ্দিষ্ট কার্যে শিষ্যের সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন—যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে একান্তই দুর্লভ।

মাদ্রাজের 'Ice House'-এ এবং কলিকাতার গোপাললাল শীলের বাগানবাড়ী প্রভৃতি স্থানে স্বামীজীর সান্নিধ্যে বাসকালে গুডউইনকে দেখে অনেকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলেই ধারণা করতেন। তিনি একান্ত নিষ্ঠাবান এবং নিরামিষাশী ছিলেন এবং তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি ও চালচলন তৎকালীন গোঁড়া ব্রাহ্মণদেরও হার মানাত। মাদ্রাজে নাকি কেউ কেউ তাঁকে ধুতিচাদর-পরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলেই ভ্রম করতেন।

এরূপে স্বামীজীর সাথে কলম্বো থেকে আলমোড়া অবধি এমন কি সুদূর পাঞ্জাব ও কাশ্মীর পর্যন্ত সারা ভারত পরিক্রমা করে গুডউইন স্বামীজীর সমগ্র বক্তৃতা ও ভাষণের সাংকেতিক লিপি গ্রহণ করেন। তারপর মাদ্রাজে গিয়ে 'মাদ্রাজ মেল' নামক সংবাদপত্রের আফিসে কর্ম গ্রহণ করেন। এখানেই তিনি অসুস্থ হন। উতকামণ্ড সহরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২রা জুন তাঁর দেহান্ত হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সময়ের হিসেবে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুআরি থেকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত কিঞ্চিন্ন্যূন আড়াই বৎসর কাল স্বামীজীর সাংকেতিক-লিপিকাররূপে কাজ করে গুডউইন তাঁর অনবদ্য কর্তব্যনিষ্ঠা ও গুরুভক্তি সহায়ে জগতে অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শত সহস্র ভক্ত ও পাঠক অনন্তকাল ধরে গুডউইনের সশ্রদ্ধ অবদানের জন্য চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবেন। স্বামীজী-কৃত জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক এবং কলম্বো থেকে আলমোড়া অবধি প্রদত্ত সমগ্র বক্তৃতাবলী—এ সবই আমরা গুডউইনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছি। এ-স্থলে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে গুডউইন তাঁর নিজের এক বিশিষ্ট পদ্ধতিতে সাংকেতিক অনুলিখন গ্রহণ করতেন যা তিনি ছাড়া আর কেউ সাধারণ ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারতেন না; তাঁর দেহত্যাগের পরও বেশকিছু সাংকেতিক অনুলিখন তাঁর মার কাছে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু কেউ তার মর্মোদ্ধার করতে পারেন নি।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কাশ্মীর ও হিমালয় ভ্রমণে যাত্রার প্রাক্কালে আলমোড়া সহরে স্বামীজীকে গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এই দুঃসংবাদটি শোনামাত্র তিনি একান্ত বিষাদভরে দীর্ঘকাল তুষারমৌলী হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং বলে উঠেন—"আমার ডান হাত গেল; এই ক্ষতি অপরিমেয়! আমার প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার পাটও উঠে গেল!"

লোকান্তরিত গুডউইনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা ও কঠোর পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে স্বামীজী ইংলণ্ডে গুডউইনের জননীকে সান্ত্বনা দিয়ে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন; এই সঙ্গে তিনি "Requiescat in Pace" (শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম!)-শীর্ষক একটি স্বরচিত দ্বাদশ পঙ্‌ক্তির মর্মস্পর্শী কবিতাও প্রেরণ করেন কবিতাটি গুডউইনের অপূর্ব আত্মত্যাগ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং তাঁর প্রতি স্বামীজীর গভীর স্নেহের স্বাক্ষর বহন করে।

এই কবিতা থেকে চারটি লাইনের অনুবাদ :—

'সার্থক সাধনা তব আত্মত্যাগে হলে সিদ্ধকাম ;
অপার্থিব প্রেমরাজ্যে আত্মা তব লভুক বিশ্রাম !
মধুময় স্মৃতি তব দেশকাল করি একাকার
বেদীতলে পুষ্পসম করে যেন সৌরভ বিস্তার !"

উপরোক্ত প্রবন্ধরচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি :—
(১) Reminiscences of Swami Vivekananda—Advaita Ashrama, Calcutta.
(২) লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড।
(৩) স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
(৪) উদ্বোধন—কার্তিক, ১৩৭০
(৫) স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা'।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের দেশের স্মৃতি

শ্রীমতী গীতা রায়

১৯৬৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত-বার্ষিকী উৎসবে সারদা সঙ্ঘের কনফারেন্সের সময় আমার ঠাকুর ও মায়ের দেশে যাবার সুযোগ ঘটেছিল। যে পরম আনন্দ লাভ করেছি, সবত মনে ধরে রাখা যায় না—যে স্মৃতি আজ পর্যন্ত আছে এবং যা চিরকাল থাকবে আমার মনে, তাই লিখে রাখছি খাতার পাতায় আমার অপটু ভাষায়।

সকাল বেলা দুটি বাস তীর্থযাত্রীদের নিয়ে রওনা হল গন্তব্যপথে। সকলের মন ঠাকুর ও মায়ের নামে ভরপুর। সকালের শান্ত স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শে মন যেন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সকলেই ভাবছেন কখন সেই পুণ্য ভূমিতে মাথা স্পর্শ করবেন। আমোদর নদীর ওপর অস্থায়ী সেতুর ওপর দিয়ে খুব সন্তর্পণে আমরা এপারে এলাম। শুনেছি বর্ষায় যখন নদীর জল বাড়ে এই পথে বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে আমাদের গন্তব্যস্থানের পথ শেষ হয়ে এল—আমরা পৌঁছে গেলাম মহাপুণ্য-ভূমি ঠাকুরের দেশ কামারপুকুরে। ছোটবেলা থেকে এই কামারপুকুর সম্বন্ধে কত কাহিনী শুনেছি ও পড়েছি। আজ সেই কামারপুকুরেই দাঁড়িয়ে আছি! মন্দির তখন বন্ধ হয়ে গেছে। দর্শন পরে হবে। আমরা থাকার জায়গায় গিয়ে সব গুছিয়ে নিলাম। প্রসাদ পাবার ডাক এল। ঠাকুরের মন্দিরের সংলগ্ন খাবার জায়গাটিতে অনেকে একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেতে পারেন। আমরা সকলে আসন গ্রহণ করার পর পরিবেশন সুরু হল। খাওয়াশেষে আবার বিশ্রামের পালা। বিশ্রামের মধ্যে আশে পাশের অনেকের সঙ্গে আলাপপরিচয় হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে বেশ কিছুজন এসেছিলেন দক্ষিণ ভারতের নানান দেশ থেকে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আছেন আমি জানি এমন কোনো ভাষাই তাঁদের বোধগম্য নয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে হেসে মাথা নাড়লেন শুধু। তাঁদের দেখলে সত্যি আনন্দ হয়। কত দূর দেশ থেকে কত কষ্ট স্বীকার করে এই পুণ্যভূমি দর্শন করতে এসেছেন।

নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল খেয়ালই ছিল না। অবশেষে সদলবলে অনতিদূরে হালদার পুকুরে

অবগাহন করতে গেলাম। মস্ত বড় দীঘি। আমাদের অনেকের জলে নাবার সুযোগ হয় না—তাই দীঘির এই পরিষ্কার জল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না; পরদিন সকালে আবার এই দীঘিতেই নামতে পারব এই আশায় উঠে পড়লাম।

স্নানশেষে মন্দিরে ঠাকুরদর্শনে এলাম। পাশে রঘুবীরের মন্দির। এই দুইটি নতুন মন্দির তৈরী হয়েছে। তাছাড়া ঠাকুরের পুরোনো আবাস ঠিক তেমনিই করে রাখা আছে। শয়নঘরে আছে ঠাকুরের খাটটি, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ডাক পড়তে তাড়াতাড়ি দর্শন শেষ করে সকলে মিলে চলতে লাগলাম কামারপুকুরের দ্রষ্টব্য দর্শনাভিলাষে। এইসব স্থান দেখে মনে হচ্ছে আমরা সকলে সেই পুরোনো সময়ের মধ্যেই চলেছি। 'কামারপুকুর' ঠাকুরের জন্মভূমি আমাদের সকলের সামনে পবিত্র পুণ্যভূমির মতন বিরাজ করছে। মনে হচ্ছে এখনও ঠাকুরের স্পর্শ সব জায়গায় রয়েছে। বাড়ীগুলিরও সব মাটির দাওয়া ও ওপরে খড়ের ছাউনী। আশেপাশে বড় বড় গাছ শান্ত ছায়া বিস্তার করেছে। কিছু ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গ নিয়েছে। আমরা সকলে মনভরে চোখভরে দেখে নিচ্ছি। আমার পুনরায় আসা হবে কিনা কে জানে। যিনি দেখাতে নিয়ে গেছেন, তিনি অনেক পুরোনো স্মৃতি ও ঘটনা সমানে বলে চলেছেন। এমনভাবে বলছেন যেন এই সেদিনের ঘটনা সব। ঠাকুর এই সব জায়গাতে কত মুহূর্ত কাটিয়েছেন, কত হেসেছেন, কেঁদেছেন, কত কথা বলেছেন; আজ আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে!

সব শেষে এলাম ভূতির খালে। প্রথমেই শ্মশান দেখা যাচ্ছে। দূরে একটি বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে; সেখানে ঠাকুর রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। আশেপাশে লোকালয় নেই শুধু ধূধূ মাঠ। এক পাল গরু ধূলি উড়িয়ে লোকালয়ের দিকে চলেছে। আকাশে এক ঝাঁক পাখী উড়ে চলে গেল। সূর্য আবীর ছড়াচ্ছে। এরই মাঝে আমরা প্রকৃতির রূপ দেখে বিহ্বল হয়ে আছি। সকলেই বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছিলাম, হঠাৎ সকলের ফিরবার কথা স্মরণ হতেই নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। নিঃশব্দে অন্ধকার পথে সকলে এগিয়ে চলেছি। দূর থেকে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছি। অন্ধকার পথে আমরা মন্দিরে পৌঁছলাম। নাটমন্দিরের একধারে গিয়ে বসলাম। আরতির শেষে আমরা রাত্রির প্রসাদ পেয়ে নিজেদের আস্তানায় রাত্রের মতন আশ্রয় নিলাম। গেষ্টহাউসের বারাণ্ডায় পাশাপাশি অনেক বিছানা পড়েছে। মনে হচ্ছে একই পরিবারের লোক আমরা সকলে—আমার অতি আপনার জন। এখানে আমরা পরস্পরে কত সহজে মিশেছি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গল পাখীর ডাকে। ঘুম থেকে উঠেই মনে হল আজ যেতে হবে মায়ের দেশে জয়রামবাটীতে মাত্র ৩ মাইল দূরে। এস্থান ছেড়ে যেতে হবে ভেবে মন ব্যথায় ভরে উঠল—কিন্তু ক্ষণেকের জন্য। মায়ের দেশের ধুলো মাথায় করতে পারব ভেবে আনন্দও হল অনেক বেশী। মন্দির দর্শন করে জলখাবার খেয়ে বেলা প্রায় ৮টায় রওনা হলাম সদলবলে জয়রামবাটীর পথে। আমরা গ্রামপথ দিয়ে চলেছি। বাস এত উঁচু ও পথ এত সরু যে দু-পাশের গাছের ডালপালা আমাদের গায়ে এসে লাগছে। ওপর ডালের পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে খুব মজা লাগছে। বাসের শব্দে ছেলেমেয়েরা ছুটে

আসছে। গ্রামের বউ-ঝিরা যে যার কাজ ফেলে মাথায় ঘোমটা টেনে দেউড়ীতে এসে দেখছে। ওদের সহজ সরল দৃষ্টি দেখে খুব ভাল লাগছে। কেমন সরল ওদের হাসি! আমরা সহরের লোকেরা হাসতে ভুলে গেছি—প্রয়োজন বোধ না করলে হাসি না।

এই সব দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা কখন জয়রামবাটীর মাত্র ৩ মাইল পথ শেষ করেছি খেয়ালই হয়নি। মায়ের দেশে এসে প্রথমেই বোধ করলাম কামারপুকুরের মতন এত থমথমে ভাব নেই এখানে। মন্দিরের আশেপাশে অনেক বাড়ী সন্নিবেশিত আছে। আমরাও যেন মায়ের কাছে কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছি। মায়ের মন্দির দর্শন করে সকলে নিজের থাকবার জায়গা ঠিক করে নিলাম। জয়রামবাটীতে এসে দ্বিতীয়বার জলযোগ করতে হল। এযাত্রায় মুড়ি ও তেলেভাজা মনভরে খেলাম। বেলা দশটায় আমরা আশেপাশের স্থানগুলি দেখতে বেরুলাম। আমরা প্রথমে গেলাম মা যে বাড়ীটিতে অনেক বছর কাটিয়েছেন; সেখানে গৃহটি মিশনের তরফ থেকে শরৎ মহারাজ করিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের থাকবার সুবিধের জন্য। ঠাকুরের দেহ রাখার পর মা যখন জয়রামবাটীতেই ভাইদের সঙ্গে থাকতেন, সেই সময় এটি নির্মিত হয়। মায়ের কাছে ভক্তেরা আসতেন বলে ভাইদের সংসারে অসুবিধা হত। মা এই সংসারের উর্ধ্বে থাকলেও সংসারীদের মতন দুঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করেছেন। মায়ের এই অবস্থা দেখে মঠ থেকে এই কুঁড়ে ঘরটি তৈরী করা হল। মায়ের সঙ্গে কয়েকটি মহিলা আত্মীয় ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী থাকতেন সেবার জন্য। ব্রহ্মচারীরা মায়ের কাছে ঠিক ছেলের মতন হয়ে থাকতেন। মাকে এই আত্মীয়দের মধ্যে থেকে তাঁদের বিবাদ-বিসংবাদ, অভাব, অনটন সব কিছু নীরবে সহ্য করতে হত। সকলেই নিজেদের প্রয়োজনে মায়ের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতেন। কেউ কোনদিন তাঁকে এতটুকু বিচলিত হতেও দেখেননি। মা বলতেন, "সহের মতন গুণ নেই, সন্তোষের মতন ধন নেই।"

বেলা বাড়তে লাগল। মায়ের বাড়ী থেকে মায়ের ভাই-এর বাড়ীতে এলাম। এই সামান্য ঘরখানিতে মা দীর্ঘ দিন অতি সাধারণভাবে কাটিয়েছেন। তারপর গেলাম সিংহবাহিনী-মন্দিরে। মা এখানে প্রায়ই পূজো দিতে আসতেন। সেদিন ছিল বিশেষ কোনো পূজো, তাই মন্দিরে ভীড়। আমরা সকলে পূজো দিলাম এবং সঙ্গে সিংহবাহিনীর মাটি নিলাম। অবশেষে দ্বিপ্রহরের প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করতে গেলাম। আমি এলাম মায়ের বাড়ীতে; আরও সকলের সঙ্গে মায়ের বাড়ীর সংলগ্ন একটি কুঁড়েতে আশ্রয় নিলাম। ঠাণ্ডা মাটির স্পর্শে চোখ বুজে এল। কিছুক্ষণ পর অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে গল্পে যোগ দিলাম।

জয়রামবাটীতে এসে মনে হল, 'মা' সকলেরই মা। কলকাতায় উদ্বোধনকে মায়ের মন্দির না বলে মায়ের বাড়ী বলা হয়। মায়ের বাড়ীতে আসার অধিকার যেন সকলের; কোনো সময়-অসময় চিন্তা করত না কেউ। সে যুগে মাকে ভক্তেরা কত কাছে পেয়েছেন। মায়ের কাছে দুপুরবেলা মহিলারা কাজ সেরে এসে বসতেন, নানা সুখদুঃখের গল্প করতেন। নিজেদের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে আবার চলে যেতেন। সকলে যেন মায়ের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য, নির্বিচার স্নেহের জন্য আসতেন।

বিকেলে আমরা সদলবলে কোয়ালপাড়ায়

মুখে রওনা হলাম বাসে করে। মা কলকাতা যাবার পথে কোয়ালপাড়ায় যে বাড়ীতে বিশ্রাম করতেন, আমরা সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সেখানে মায়ের সময়ের এক মহিলা এখনও বাস করেন। তিনি সযত্নে মায়ের কেশ ও পদরেণু রক্ষা করেছেন; আমরা সকলে মাথায় ঠেকালাম। আমরা আরতির পূর্বেই জয়রাম-বাটীতে ফিরে এলাম। মায়ের মন্দিরে তখন আরতি সুরু হয়েছে। মাকে কমলা রং-এর শাড়ীতে যেন নূতনরূপে দেখছি। আরতির পর বরদা মহারাজ মার স্মৃতিকথা অনেক বললেন। তারপর আমরা প্রসাদ পেলাম রান্নাবাড়ীতে। এর পর শোবার পালা। মায়ের বাড়ীতে দক্ষিণীদের জন্য শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁদের পাশে আমি একটু জায়গা করে শুয়ে পড়লাম। মা ঐ দাওয়াতে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। শুয়ে শুয়ে ভাবছি—এখানে যা পেলাম তার কতটুকু চলার পথে সঙ্গে নিতে পারব!

আমরা কে কোথায় ছিলাম, আজ সকলে একজায়গায় মিলিত হয়েছি। কালকেই আবার কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ব। তবে এ স্মৃতিটুকু আমাদের থেকে যাবে। আমরা মেয়েরা একজায়গায় হলেই সাধারণত নিজের নিজের ঘরসংসারের কথা আলোচনা করি। কিন্তু মায়ের সংসারে এসে আমরা সকলে সংসারের কথা ভুলে ছিলাম। মায়ের কথা নিয়েই ছিলাম। পূর্বে মাকে এত আপন করে কখন যেন পাইনি। বহুদিন থেকে ইচ্ছে ছিল এখানে আসার।

ভোরে মঙ্গলারতি দেখার পর, আবার আমরা কামারপুকুর ফিরে এলাম। এখানে মধ্যাহ্নের প্রসাদ পাবার পর রওনা হতে হবে মহানগরী কলকাতার পথে। ঘুরতে ঘুরতে মন্দিরের কাছে এসে দেখলাম এক বৃদ্ধা বসে বাসন মাজছেন। বৃদ্ধা খুব বয়স্কা এবং ক্ষীণদেহ। বসে বসে ভাবছি কোন্ শক্তিতে এত বাসন মাজছেন! কথায় কথায় প্রকাশ হল—তিনি মায়ের কাছে সেবার জন্য ছিলেন। বৃদ্ধা বললেন: 'মা বলেছেন—এই জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবে না। তাই আজও মার কথা শুনে পড়ে আছি শত কষ্টতেও।' এই কথা শুনে মাথা নত হয়ে এল—এক সাধারণ নারীর কি বিশ্বাস! ওঁর কাছে সেকালের কিছু ঘটনাও শুনলাম।

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য

[স্বচ্ছন্দ অনুবাদ]*

ভাষ্যপ্রারম্ভঃ

পূর্বপক্ষ :—দেখ বাপু, মোটামুটি জগৎটাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখা যায়, যথা অস্মদ্-প্রত্যয়-গোচর "আমি" বা বিষয়ী (subject) আর আমি ছাড়া বাদ বাকী সব, বা যুষ্মদ্-প্রত্যয়-গোচর বিষয়। বিষয়ী (subject) স্বপ্রকাশ আর বিষয় পর-প্রকাশ্য। যেমন আলো ও অন্ধকার। একেবারে বিরুদ্ধস্বভাব। সুতরাং একটাকে আর একটা বলিয়া ভ্রম করিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই এবং এই সূত্রে বলা চলে যে, বিষয়কে যেমন বিষয়ী বলিয়া ভ্রম হওয়ার সঙ্গত কারণ নাই, তেমনি বিষয়ের ধর্ম বা গুণ যে জড়ত্ব তাহাকেও চিৎ বলিয়া ভ্রম হওয়ার সঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং আমরা অনাদি কাল হইতে যুষ্মদ্ প্রত্যয়-গোচর বিষয়কে, জড়কে, অস্মদ্-প্রত্যয়-গোচর "আমি" বা বিষয়ী বলিয়া ভ্রম করিয়া আসিতেছি—এরূপ কথা অসঙ্গত।

উত্তর পক্ষ :—তথাপি অনাদিসিদ্ধ অবিবেক-প্রভাবে অত্যন্ত বিলক্ষণ-স্বভাব হওয়া সত্ত্বেও অনাদিকাল হইতেই মানুষ আপনাকে দেহাদি বলিয়া মনে করিতেছে, আপনাতে দেহাদির ধর্ম আছে বলিয়া মনে করিতেছে; পক্ষান্তরে দেহাদিকে আপনি ও দেহাদিতে আপনার (পুরুষের, চিতের) ধর্ম আছে বলিয়া মনে করিতেছে। লোকসমাজে "আমি" ও "আমার" এই দুটি কথার ব্যবহার, ধর্মী ও ধর্মের মিথ্যা জ্ঞানবশতঃ ও সত্য মিথ্যা উভয় জড়িত। এই ব্যবহার অনাদিকাল হইতে প্রচলিত। অনাদি এই অর্থে যে বীজবৃক্ষবৎ ভ্রম ও ব্যবহার কোন্‌টি আদিতে তাহা নিশ্চয় করা যায় না।

এখন কথা হইতেছে এই ভ্রম (বা অধ্যাস) ব্যাপারটি বাস্তবিক কি? ইহার স্বরূপ কিরূপ?

ইহা এক প্রকার অবভাস। পূর্বদৃষ্ট কোনও বস্তু এখন স্মৃতিরূপে তোমার মনে আছে। সন্নিহিত কোনও বস্তুকে সেই স্মৃতিস্থিত বস্তু বলিয়া ভ্রম করাই হচ্ছে অধ্যাস। মোটের উপর কথাটা হইল এই যে এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া যে অবভাস বা জ্ঞান তাহাই অধ্যাস বা ভ্রম। পণ্ডিতেরা ঐ ভ্রম সম্বন্ধে নানারূপ মত পোষণ করেন। যথা—

"আত্মখ্যাতিঃ অসৎখ্যাতিঃ অখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথানির্বচনখ্যাতিঃ ইত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্॥"

যিনি যেরূপ মত পোষণই করুন, ইহা সর্ববাদিসম্মত যে এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা—এই ব্যাপারটাকেই সকলে ভ্রম বা অধ্যাস বলিয়া নির্দেশ করেন। শুক্তিকে রজতের মত দেখাইতেছে, একই চন্দ্র দুইটি চন্দ্রের মত দেখাইতেছে—এইরূপ ভ্রম।

পূঃ—ভাল, ভ্রম ব্যাপারটা বুঝাইলে। এখন বল দেখি, অবিষয় যে প্রত্যগাত্মা, কিরূপে তাহাকে দেহাদি বিষয় বলিয়া লোকে মনে করে? এবং বিষয়ধর্মকে (জরামরণ) প্রত্যগাত্মার

* অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

ধর্ম বলিয়া লোকে মনে করে? বিষয়রূপে যাহা অদূরে অবস্থিত তাহাকে অসন্নিহিত কোন বিষয়ান্তর বলিয়া ভ্রম লোকে করিয়া থাকে; কিন্তু সম্মুখস্থ দেহাদিকে অসন্নিহিত অবিষয় প্রত্যগাত্মা বলিয়া লোকে ভ্রম করিবে কেন?

উঃ—(১) প্রত্যগাত্মা একেবারে অবিষয় নহে, কেননা তাহা অস্মদ্-প্রত্যয়ের বিষয়; (২) তাছাড়া সকলেই তাহাকে "আমি" বলিয়া প্রত্যক্ষবোধ করিয়া থাকে। সুতরাং তোমার যুক্তি খাটিল না। তাছাড়া এরূপ কোন নিয়ম নাই যে প্রত্যক্ষস্থিত বস্তুকেই পরোক্ষ বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়। দেখ আকাশ কেহ দেখে নাই অথচ লোকে (ভ্রমবশতঃ) বলে, আকাশ নীলবর্ণ ও আকাশটা কড়াই-এর মত। অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ আকাশকে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ান্তর বলিয়া ভ্রম করে ও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ান্তরের ধর্ম আকাশের ধর্ম বলিয়া ভ্রম করে। নীলরঙের কটাহ উপুড় করা আছে বলিয়া ভ্রম করে। সুতরাং অবিষয় প্রত্যগাত্মাকে দেহাদি অনাত্ম বস্তু বলিয়া ভ্রম করা ঘটিতে পারে।

এইরূপ ভ্রমকে পণ্ডিতেরা অবিদ্যা নাম দিয়াছেন, এবং বস্তুস্বরূপ অবধারণ করিবার বিবেককে বিদ্যা নাম দিয়াছেন। বস্তুস্বরূপ বিবেক জন্মিলে দেখা যাইবে যে আসল বস্তুর দোষগুণ ভ্রমজনিত বস্তুকে স্পর্শ করে না এবং ভ্রমজনিত বস্তুর দোষগুণ আসল বস্তুকে স্পর্শ করে না। রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিলে। কিন্তু বিবেক হইলে দেখিবে রজ্জুর মধ্যে সর্পের দোষগুণ কস্মিন্‌কালেও ছিল না। তথা সর্পের মধ্যে রজ্জুর দোষগুণ কস্মিন্‌কালেও ছিল না।

এই অবিদ্যাহেতু প্রত্যগাত্মাকে অনাত্মা বলিয়া ও অনাত্মাকে প্রত্যগাত্মা বলিয়া ভ্রম সঞ্চার হইয়াছে ও এই ভ্রমহেতু লৌকিক ও বৈদিক কর্ম-ক্রিয়াদি চলিতেছে। সমস্ত বিধিশাস্ত্র, সমস্ত নিষেধশাস্ত্র ও সমস্ত মোক্ষশাস্ত্র ভ্রমাক্রান্ত বা অবিদ্যাগ্রস্ত লোকেদের জন্যই আছে।

পূঃ—বল কি? প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র অবিদ্যাশ্রয়ী জীবের প্রয়োজন-সাধক মাত্র! তবে বেদকে কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে?

উঃ—ভাবিয়া দেখ, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে অহং মম জ্ঞান না করিলে (অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ প্রত্যগাত্মা বোধ না করিলে) কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, কর্তার অভাব হইলে ইন্দ্রিয়াদির গতি আসে না সুতরাং কোন চিন্তা বা কোনও কর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম নিষ্পন্ন হয় না। যে দেহেন্দ্রিয়াদিতে কর্তৃত্ববোধ নাই (অর্থাৎ ভ্রম নাই) সে দেহ কর্ম করে না। অতএব ভ্রম বিদ্যমান না থাকিলে অসঙ্গ আত্মাকে কর্তৃত্বে নিযুক্ত করা যায় না। এ বিষয়ে পশুর সহিত মানুষের তফাৎ নাই। পশুরা লগুড়-হস্ত মনুষ্যের দিকে ভীতভাবে তাকায় ও "আমায় মারিবে" ভাবিয়া পলায়ন করে; আর তৃণহস্ত মনুষ্যের দিকে অনুরাগভরে অগ্রসর হয়। মানুষের বেলাও দেখ—কঠোরভাষী খড়্গহস্ত পুরুষের নিকট হইতে পণ্ডিত মনুষ্যেরাও পলায়ন করে ও তদ্বিপরীতে তাহার অভিমুখে গমন করে। সুতরাং মনুষ্য পশু উভয়েরই প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান বা বোধ ও ব্যবহার সমান অবিদ্যামূলক। তবে হ্যাঁ, শাস্ত্রীয় ব্যবহারে (অর্থাৎ যাহা সাধারণ ব্যবহার নহে, যেখানে বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহারের প্রয়োজন হয়) অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি কার্যে যেখানে পরলোকসম্বন্ধীয় বুদ্ধি বা ধারণা থাকা দরকার, সেক্ষেত্রে মনুষ্যেরাই

অধিকারী। তথাপি তাহাও অবিদ্যামূলক, কেননা তাহাতে মিথ্যাজ্ঞান অবলম্বনে কার্য হইয়া থাকে। বেদান্তবেদ্য ক্ষুৎপিপাসারহিত জাতিবর্ণাদিভেদশূন্য অসংসারী প্রত্যগাত্মা-বিষয়ক জ্ঞানের এখানে প্রয়োজন নাই। কেননা আত্মজ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে সেই আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা শাস্ত্রীয় উপরোক্ত কর্ম হওয়া অসম্ভব, ইহাতে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। ইহার উদাহরণ "ব্রাহ্মণো যজেত" এই শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী কর্মকারী ব্যক্তিকে বর্ণ, আশ্রম, বয়স, অবস্থাবিশেষ (অর্থাৎ শুচি হইয়া) অঙ্গীকার করিতে হইবে (অর্থাৎ নিজেকে ভ্রমহেতু ঐরূপ মনে করিতে হইবে)। অধ্যাস বা ভ্রম বলিতে ইহাই বোঝায় প্রথমেই তাহা বলিয়াছি। অবিদ্যাশ্রয়ীর কিরকম ভ্রম দেখ—পুত্রভার্যাদি ক্লিষ্ট হইলে ও অক্লিষ্ট থাকিলে, অবিদ্যাধীন লোক মনে করে 'আমি ক্লিষ্ট হইলাম ও আমি সুখ পাচ্ছি।' এখানে বাহ্য স্ত্রীপুত্রাদির ধর্মকে আমার ধর্ম বলিয়া ভ্রম করে। দেহধর্ম —স্থূলত্ব, কৃশত্ব, গৌরত্ব, তিষ্ঠন, গমন, লঙ্ঘন ইত্যাদিকে ভ্রমহেতু নিজের ধর্ম বলিয়া মনে করে। ইন্দ্রিয়ধর্ম—মূকত্ব ক্লীবত্ব, বধিরত্ব ইত্যাদিকে ভ্রমহেতু নিজের ধর্ম বলিয়া মনে করে। অন্তঃকরণ-ধর্ম—কাম সংকল্প বিকল্প ইত্যাদি ধর্মকে ভ্রমবশতঃ নিজের ধর্ম বলিয়া মনে করে। এইরূপে লোকে বাহ্যবস্তুকে, দেহকে, ইন্দ্রিয়কে, অন্তঃকরণকে ভ্রমবশতঃ কূটস্থ আত্মা বা সাক্ষী আত্মা বা প্রত্যগাত্মা বলিয়া মনে করে এবং বিপরীতক্রমে প্রত্যগাত্মাকে বাহ্য বস্তু, দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ বলিয়া মনে করে। এই ভ্রম অনাদি অনন্ত নৈসর্গিক মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ ও কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব-প্রবর্তক। এবং-বিধ অনর্থকারণ যে অবিদ্যা তাহার বিনাশের জন্য ও প্রত্যগাত্মার সহিত জীবের একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাই যে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তাহা আমরা বক্ষ্যমাণ শারীরক মীমাংসাতে (শরীরে যে জন্মে সে শারীর, তাহার বিষয়ক শারীরক অর্থাৎ জীব। অর্থাৎ জীবকে তাহার মীমাংসা) দেখাইব।

অনন্তের আহ্বান

শ্রীরাধাশ্যাম দাস

হঠাৎ জানিনা কেন কি কারণ ঘটে
প্রাণ-মন-চিত্ত মোর কেঁদে কেঁদে ওঠে।
অতিদূর-লীন ওই দিগন্তের পানে
অকারণে চেয়ে থাকি ব্যথাভরা প্রাণে।
মন মোর যেতে যায় সুদূরে মিলায়ে,
বন্ধহীন মুক্তপাশ বিহঙ্গম হয়ে।
কেন হেন অকারণে প্রাণ ছুটে ধায়
সীমাহীন অসীমের বন্ধ-হীনতায় !
ঐ কিগো অনন্তের চিরন্তন সুর,
তবে কেন কাছে এসে সরে যায় দূর ?

সমালোচনা

রাঙাজবা ঃ নজরুল ইসলাম। হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—বারো। পৃষ্ঠা ১০৮, মূল্য তিন টাকা।

কবি নজরুল ইসলামের ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সঙ্কলন এই কাব্যগ্রন্থটি সাধক ও কবিসমাজে অমূল্য উপহাররূপে সম্বর্দ্ধনা লাভ করবে। রামপ্রসাদ থেকে নজরুল অবধি শাক্তসাধনার যে কাব্যময় প্রকাশ আমাদের পরমগৌরবের বস্তু, তাতে বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষায়ই সমৃদ্ধি এনেছেন স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজীর Kali the Mother, নাচুক তাহাতে শ্যামা, Who knows How Mother Plays এবং নিবেদিতার The Vision of Siva, The Voice of the Mother প্রভৃতি কবিতায় ও কাব্যোপম রচনায় যে সংগ্রামময় মাতৃপূজার আদর্শ রয়েছে, বাঙালীর কালী-অনুধ্যানেরই ঐতিহ্যে তা গঠিত; তবু বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার ধ্যানস্পর্শে সর্বস্ববিসর্জনের মহা-শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী যে মৃত্যুরূপা মাতার আবির্ভাব ঘটেছে তার অনন্যতাও আমাদের স্মরণীয়।

সেদিক থেকে নজরুলের 'শ্যামা' অনেক পরিমাণে অভয়া বরদা মমতাময়ী দক্ষিণামূর্তি। কিন্তু মাতৃস্মরণের একাগ্রতা ও শরণাগতির নিশ্চিত অভিজ্ঞানে এই সংগীতাঞ্জলি আমাদের মুহূর্তে অভিভূত করে। নিখিলমানব যে এক বিশ্বজননীর সন্তান, সেকথা নজরুলের এই শ্যামা বা শাক্তসংগীতগুলির মতো এমন করে অনুভবের সুযোগ আমরা খুব কম গানেই পেয়েছি। অধ্যাত্ম উপলব্ধির একটি স্তরে এসে জাতি, বর্ণ, শ্রেণীর মিথ্যা আবরণ ঘুচে গিয়ে সর্বমানবের অন্তর্নিহিত ঐক্য যে কত প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ওঠে সে কথা এ কাব্যগ্রন্থের আদ্যন্ত বিধৃত। প্রথম পৃষ্ঠা খুলেই আপনি পাবেন—

> বল রে জবা বল।
> কোন্ সাধনায় পেলি
> শ্যামা মায়ের চরণতল।

পাতা উল্টে যেতে যেতে কবির দৃষ্টিতে মা ও মেয়ের দুই রূপের আভাসে জগজ্জননীর প্রকাশ চোখে পড়বে—

> মা হবি না মেয়ে হবি
> দে মা উমা ব'লে।
> তুই আমারে কোল দিবি না
> আমিই নেব কোলে।

অথবা (আমার) কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়
> কে দেবে তায় ধ'রে।
> (তারে) যেই ধরেছি মনে করি
> অমনি সে যায় স'রে।

আবার মায়ের বিশ্বময়ী রূপের আভায় ফুটে উঠবে তাঁর 'মহাকালী' নামের নতুন তাৎপর্য—

> মহাকালের কোলে এসে
> গৌরী হ'ল মহাকালী।
> শ্মশানচিতার ভস্ম মেখে
> ম্লান হ'ল মার রূপের ডালি॥
> তবু মায়ের রূপ কি হারায়
> সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্রতারায়
> মায়ের রূপের আরতি হয়
> নিত্য সূর্য প্রদীপ জ্বালি॥

একদিকে আগমনী ও বিজয়া গানের ঐতিহ্য, আর একদিকে কঠোর ব্যক্তিজীবনের আর্তি ও যন্ত্রণার পটভূমিতে অন্ধকারের অন্তরতম স্বরূপ কালী-চেতনার উদ্ভাসন—এ দুয়ের মিলনের মাতৃভাবসাধনার এই উদাহরণমালা আমাদের জাতীয় সম্পদ।

মাতৃভাবসাধনার কথা বলতে গেলেই এ যুগের শ্রেষ্ঠতম মাতৃপূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনে জাগে। স্বাভাবিক কারণেই নজরুল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিশেষ অনুরাগী। এই মাতৃভাবের সঙ্গীতসঙ্কলনে কেবল দুটি গান রামকৃষ্ণ- ও বিবেকানন্দ-বিষয়ক। গান দুটিকে এ সঙ্কলনে স্থান দিয়ে সঙ্কলয়িতা তাঁর পরিণত দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কবিতামূর্তি-রচনার দিক থেকে এরা চিরস্মরণীয়,—

সত্য যুগের পুণ্য স্মৃতি আনিলে কলিতে
তুমি তাপস,
পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পুণ্যতীর্থ-
বারি-কলস।
শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত]

অথবা

যজ্ঞাহুতির হোমশিখাসম
তুমি তেজস্বী তাপস পরম।
[বিবেকানন্দ-সঙ্গীত]

এসব চরণের আমোঘ সিদ্ধি মুগ্ধ ও বিস্মিত হৃদয়ে লক্ষ্য করার মতো।

কিন্তু মাঝে মাঝে ছাপার ভুলের দরুন অর্থবোধ ও ছন্দসৌকর্য দুইই ব্যাহত হয়। এমন একটি সঙ্কলন অভ্রান্ত হবে—এ বোধ হয় বেশি আশা নয়। তাছাড়া চৌষট্টি ও পচানব্বই-সংখ্যক গান দুটির মধ্যে প্রধানতঃ দুটি চরণের সংযোগ-বিয়োগের পার্থক্য, আসলে এরা পাঠান্তরের উদাহরণমাত্র। গানগুলির রচনাকাল (অন্ততঃ আনুমানিক) অবশ্য-প্রত্যাশিত, সেই সঙ্গে পরিশিষ্টে এ গানগুলির রেকর্ড এবং গায়কের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

বাহুল্যবর্জিত সরল প্রচ্ছদটি [শিল্পী শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী] প্রশংসনীয়। নজরুলের ভক্তিমূলক সঙ্গীতের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশন আজ একান্ত প্রয়োজন। —**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

বিবেকানন্দ-সংস্কৃত-বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী-স্মারকাঞ্জলি : প্রথম খণ্ড। স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, বারাণসী। পৃঃ ১৪০; মূল্য দু'টাকা।

বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভাষা, সংস্কৃত। দুইয়ের সমাহার তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃত তো শুধু একটি ভাষা নয়, এক মহান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক প্রতীকও বটে। আর সেই সংস্কৃতি যে প্রাণবন্ত এবং অদ্যাপি অফুরন্ত প্রেরণার উৎস – এই তথ্যের চূড়ান্ত প্রমাণ তথা প্রমাতা—স্বামীজী। বিশ্বভাষা ইংরেজীকে তাঁর প্রচারের মুখ্য মাধ্যম হিসাবে বেছে নিলেও, মাতৃভাষা বাংলার বলিষ্ঠতম গদ্যলেখক হওয়া সত্ত্বেও, অমোঘভাবে সংস্কৃতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বামীজী। সে-ব্যাখ্যার মূলকথা— (১) সংস্কার গড়ে তোলার জন্য সংস্কৃত অপরিহার্য এবং (২) জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভারতে আধ্যাত্মিক অধিকার অর্জনের কুঞ্চিকা সংস্কৃতে লভ্য।

এই পটভূমি স্মরণে রেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের উদ্যোগে অবিমুক্তপুরী বারাণসীতে দুটি সংস্কৃত আলোচনা-চক্র সাফল্যের সঙ্গে আয়োজিত হয়েছিল। তার অঙ্গ ছিল—বিশিষ্ট বক্তাদের ভাষণ, ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধ ও ভাষণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। সেগুলি থেকেই রামকৃষ্ণ-সাহিত্যে সুপরিচিত স্বামী অপূর্বানন্দজীর সম্পাদনায় এই সংকলন প্রস্তুত। বেদান্ত-ভাবনার ইতিহাসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দান সম্পর্কে, সরল সংস্কৃতে, নানা দিক থেকে প্রবীণ ও নবীনদের আলোকসম্পাতে সংকলনটি আকর্ষণীয়।

—**অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

Golden Jubilee Souvenir, 1966 : Ramakrishna Mission Calcutta Students' Home, Belgharia, Calcutta-56. Published by Swami Santoshananda, Secretary.

স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার্থী আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী-স্মারক-সংখ্যাটি বাংলাদেশের শিক্ষা-আন্দোলনের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রভাব ও সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও গৌরববোধের প্রত্যক্ষ উদাহরণ। জনসংখ্যা বা অর্থবলের চেয়ে মনুষ্যত্বের ভিত্তিই যে আজকের দিনে ভারতীয় শিক্ষাধারায় সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, এই বিদ্যার্থী আশ্রমের বিগত পঞ্চাশবৎসরের ইতিহাস আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। দরিদ্র, মেধাবী ও মনুষ্যত্বলাভে সমুৎসুক স্বল্পসংখ্যক আশ্রমিকদের নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রারম্ভ হয়েছিল। সেই সযত্ননির্বাচিত স্বল্প আয়তনের মধ্যে বিশাল ও গভীর ভাবধারা ধারণের আদর্শটি এ প্রতিষ্ঠানে আজও অক্ষুণ্ণ। ফলে, স্বদেশে ও বিদেশে, সংসারজীবনের কর্তব্য-পরায়ণতায় ও সন্ন্যাসের সর্বত্যাগের আদর্শে—এই প্রতিষ্ঠানের এমন অনেক ছাত্রকে আমরা জানি যাঁরা এদেশের সম্মান ও মহিমা উজ্জ্বলতর করেছেন। নানা বিপরীত তরঙ্গাভিঘাতে দোলাচলচিত্ত ছাত্রসমাজের ও তাদের অভিভাবকদের কাছে তাই কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে অধ্যাত্মজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার যে সম্মেলন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শরূপে এ প্রতিষ্ঠানে গৃহীত, তারই সঙ্গে মিল রেখে ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ক ইংরেজী ও বাংলা নিবন্ধ এ স্মারকগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের বিচারে অধিকাংশ প্রবন্ধই চিন্তাশীল পাঠক-সমাজের সমাদরণীয়। তবে, এ জাতীয় স্মরণিকায় যা সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ তা 'স্মৃতির আলোকে' অংশটিতে বিধৃত।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিদর্শকেরা এ আশ্রমের কর্মধারা সম্বন্ধে পরিদর্শকের খাতায় মন্তব্যসমেত স্বাক্ষর রেখেছেন। ঐতিহাসিক কৌতূহলের দিক থেকে ১৯২৪-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মন্তব্যের আংশিক উল্লেখ করছি—'I visited the Ramakrishna Mission Students' Home a few days ago and was exceedingly pleased with what I saw. Hostels of this kind are a crying necessity in a place like Calcutta." [কয়েকদিন আগে আমি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমটি দেখতে গিয়েছিলাম। যা দেখেছি তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এ ধরনের ছাত্রাবাস কলকাতার মতো জায়গায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়।]

এই ১৯৬৭-তেও সুভাষচন্দ্রের কথা সমান সত্য। বিদ্যার্থী আশ্রমের আদর্শে এমন আরো কিছু প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রয়োজন, যেখানে শিক্ষা মানে জীবনগঠন। আর জীবনগঠনের দ্বারাই সম্ভব জাতিগঠন। শোভন মুদ্রণে সুন্দর এই সংখ্যাটির বহুলপ্রচার প্রার্থনীয়

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের খরাত্রাণ সেবাকার্য

বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মত পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলাও দারুণভাবে খরা-পীড়িত। খরার জন্য এদুটি জেলার কয়েকটি বৃহৎ অঞ্চলের লোক খাদ্যের একান্ত অভাবহেতু দারুণ দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছে—অনাহারে কয়েকজনের মৃত্যুর কথাও শোনা যাইতেছে। সেখানকার জনসাধারণের দুঃখের মর্মান্তিক কাহিনী সংবাদপত্রের মারফত সকলেই অবগত আছেন।

বিহার ও উত্তরপ্রদেশে খরাত্রাণকার্যের গুরুভার এখনো আমাদের স্কন্ধে থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলাতেও সেবাকেন্দ্র খুলিতে রামকৃষ্ণ মিশন বাধ্য হইল। ইতিমধ্যে বাঁকুড়া জেলার হাতাসুরিয়া অঞ্চলে এবং পুরুলিয়া জেলার পারা অঞ্চলে সেবাকেন্দ্র খুলিয়া কাজ আরম্ভ করা গিয়াছে। এ কাজের জন্য মিশনের হাতে কোন তহবিল নাই; একাজে সাহায্যের জন্য আবেদনও এই সর্বপ্রথম করা হইতেছে। অর্থসাহায্য আসিতে আরম্ভ করিলে দুটি জেলাতেই সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

কিছুদিন পূর্বে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের খরাত্রাণকার্যে সহায়তার জন্য যেমন করা হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপ সহৃদয় জনসাধারণের নিকট বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার খরাত্রাণকার্য প্রয়োজনানুরূপ ও সুচারুরূপে পরিচালনাকল্পে অকৃপণহস্তে আমাদের অর্থসাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি। বলা বাহুল্য, সেবাকার্যে সহৃদয় জনগণ সর্বদাই মুক্তহস্তে দান করিয়া আমাদের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন।

এই খরাত্রাণকার্যের জন্য নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলির যে কোনটিতে অর্থ বা দ্রব্যাদি পাঠাইতে পারেন; প্রেরিত অর্থ ও দ্রব্যাদি ধন্যবাদের সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে; চেক পাঠাইলে 'Ramakrishna Mission' (রামকৃষ্ণ মিশন)—এই নামে চেক কাটিবেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করিবেন যে সাহায্যগুলি পশ্চিমবঙ্গে ত্রাণকার্যের জন্য প্রেরিত :—

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ
২। রামকৃষ্ণ মঠ, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩
৩। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯
৪। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পোঃ—বিবেকানন্দ নগর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
৫। রামকৃষ্ণ মিশন, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ
৬। রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লী ১
৭। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বে ৫২-এ.এস
৮। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, গুজরাট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্য যথাযথভাবে পরিচালিত হইতেছে। গত এপ্রিল মাসে দুর্ভিক্ষগ্রস্তদিগকে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়ঃ

(১) বিহারে হাজারীবাগ জেলায় ইটখোরী কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৯,৬৫৩ কেজি গম, ২০,৮৫৫ কেজি জোয়ার, ৭ খানি ধুতি, ৯টি স্থতী পোষাক এবং ৬০২টি পুরাতন স্থতী পরিচ্ছদ বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৫৭,৮৪২।

(২) বিহারে মুঙ্গের জেলায় চকাই ও ঝাঝা কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং সাঁওতাল পরগণা জেলায় মনোহরপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে .০,৩৪৯ কেজি চাল, ৪৪,১৭৪ কেজি জোয়ার, ৩৪৫ খানি ধুতি, ৪৯টি স্থতী পোষাক এবং ৩.৬ খানি চাদর ৯,১১১ জনের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

(৩) উত্তরপ্রদেশে মির্জাপুর জেলায় বেলাউনরী কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭,৫২৯ কেজি গম, ১২৫ কেজি গুঁড়া দুধ, ২২২ কেজি বিস্কুট, ৫,১৯৮টি ভিটামিন ট্যাবলেট এবং ঔষধপত্র বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা—২১,৭২৪।

অতএব ৩০.৪.১৯৬৭ পর্যন্ত বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে দুর্ভিক্ষপীড়িত দুঃস্থ জনগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিতরিত দ্রব্যের মোট পরিমাণঃ

(২৮৮ পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপক সাধারণজ্ঞানের দ্বারা; যতক্ষণ না আমরা বিশ্বজনীনতায় গিয়া পৌছাই, ততক্ষণ এইভাবেই চলিতে থাকে।" 'জ্ঞানের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, কোন বস্তুর ব্যাখ্যা অবশ্য উহার ভিতর হইতে আসা চাই।"…এই ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি ধারণা হইল বিবর্তনবাদ, দুটি ধারণাই একই মূল তত্ত্বের অভিব্যক্তি।" "এই দুইটি মূলতত্ত্বকে তৃপ্ত করিতে পারে, এমন কোন ধর্ম থাকিতে পারে কি? আমার মনে হয় পারে।" এই প্রসঙ্গে তিনি বেদান্তের নাম করিয়াছেন। বেদান্ত যে সত্যের কথা বলে তাহা সর্ববিধ যুক্তির সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারে। বেদান্তের সত্যের আলোকে দেখিলে আপাতদৃষ্টিতে অসত্য বলিয়া প্রতীত অপর ধর্মের উক্তিগুলির সত্যতাও সুপরিস্ফুট হয়। বেদান্তের সত্যের আলোকে দেখিলে আধুনিক বিবর্তনবাদ, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার, সব কিছুই ইহার অনুগ বলিয়া বোঝা তো যায়ই, এখন পর্যন্ত এসব পথে অনাবিষ্কৃত উচ্চতর সত্যের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। কারণ বেদান্ত একথা ঘোষণা করে যে, বিশ্ব ও জীবনের সব কিছুই একটি মূল সত্তার বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র। এনারজি, প্রাকৃতিক নিয়ম, মন, বুদ্ধি এবং উহাতে সীমিত চেতনা সবকিছুরই একত্বে সে পৌছিয়াছে। রাসেল যে সব বড় ধর্মের নাম করিয়াছেন হিন্দুধর্ম সেগুলির অন্যতম, এবং 'সব ধর্মের' অন্যতম তো বটেই; কাজেই বেদান্তের সত্যকে বাদ দিয়া, একপাশে সরাইয়া রাখিয়া এবং ক্যাপিটালিজম ও কম্যুনিজমকে ধর্মের পর্যায়ে ফেলিয়া 'সব ধর্মই অসত্য'—এরূপ ঘোষণা করা তাঁহার মত মনীষীর পক্ষে ছেলেমানুষী ছাড়া আর কি?

চাল ২৬,১২৩ কেজি, গম ১,৭৫,৮৪০ কেজি, জোয়ার (milo) ১,৯২,০৯১ কেজি, শিশু-খাদ্য ২,৪০০ টিন, জমানো দুধ ১৬ কৌটা, গুঁড়া দুধ ৭২৫ কেজি, ভিটামিন ট্যাবলেট ৭৩,১৩২টি, ধুতি ৩,২০৪ খানি, শাড়ী ৪,০৪৩ খানি, সুতী পোষাক (নূতন) ২,৫৭৩টি, সুতী পোষাক (পুরাতন) ৫,২৭৯টি, তুলার কম্বল ৮,৯২৮টি, পশমী কম্বল ৩৪টি, পশমী সোয়েটার ১৫৮টি, পশমী জ্যাকেট ৩৯টি, শিশুদের পশমী টুপী ১৭৫টি, লংক্লথ ৮৭৬ গজ, সুতী বেনিয়ান ৯৭টি, চাদর ১,২০০ খানি, বিস্কুট ২২৮.২৫ কেজি, হরলিকস ৫১ পাউণ্ড এবং প্রয়োজনমত ঔষধপত্র। সাহায্যপ্রাপ্ত দুঃস্থ ব্যক্তিগণের মোট সংখ্যা ২,১৬,২৫০।

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিহারে আরও দুইটি সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে—একটি হাজারীবাগ জেলায় চম্পারণ ব্লকে এবং অপরটি মুঙ্গের জেলায় জামুই ব্লকে।

পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় ভয়াবহ অন্নকষ্ট দেখা দেওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ ঐ অঞ্চলে দুইটি রিলিফ-কেন্দ্র খুলিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলায় হাতাসুরিয়া অঞ্চলে একটি এবং অন্যটি পুরুলিয়া জেলায় পারা অঞ্চলে।

কার্যবিবরণী

কনখল সেবাশ্রম হরিদ্বারের নিকটে সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থিত। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রমগুলির অন্যতম। উল্লেখযোগ্য যে এই আশ্রম যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালেই ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকেন্দ্ররূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে সেবাশ্রমের ৬৫তম বর্ষের (এপ্রিল, '৬৫—মার্চ, '৬৬) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৪৭টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,২০০ জন রোগী ভর্তি হয় এবং ১,০৬৬ জন আরোগ্যলাভ করে। অন্তর্বিভাগে ১১৬টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,১৫, ১০৫ (নূতন ২৬,৩২৬); অস্ত্রচিকিৎসা ২,১২৩, দন্তচিকিৎসা ৮৭।

ল্যাবরেটরিতে ৫,৩৩৯টি নমুনা পরীক্ষিত হয়। ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫২৮। ১,০৫০টি এক্স-রে তোলা হয়।

গ্রন্থাগারে ৫,৩২৩ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক রাখা হইয়াছে। রোগীদের জন্যও একটি লাইব্রেরী করা হইয়াছে। পাঠাগারে ৩৩টি সাময়িক পত্রিকা এবং ৬টি দৈনিক সংবাদপত্র লওয়া হয়।

প্রতিষ্ঠাসময় হইতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কনখল সেবাশ্রম জাতিধর্ম নির্বিশেষে আর্ত মানব-সাধারণের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া আসিতেছে। বিশেষ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কনখল হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি তপঃক্ষেত্রের সাধুসন্তগণ পীড়িত অবস্থায় এখানে সুচিকিৎসা ও সেবাযত্ন লাভ করিয়া থাকেন; যুগাচার্য স্বামীজীর নির্দেশে এই উদ্দেশ্যেই কনখলে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

টাকী: গত ৮ই এপ্রিল হইতে ১০ই এপ্রিল তিনদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বাত্রিংশদধিকশততম জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই এপ্রিল প্রাতে এক বিরাট শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে। ৮টায় শ্রীবসন্ত পাল ও তাঁহার সম্প্রদায় কীর্তন গান করেন। বেলা ৩টায় অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আশ্রম-

পরিচালিত দুইটি প্রাথমিক ও একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীচক্রবর্তী মহাশয় মহাভারত আলোচনা করেন পরে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস বাউল গান করেন। ৯ই এপ্রিল প্রাতে কীর্তন ও মধ্যাহ্নে হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে জনসভা হয়। শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও স্বামী গহনানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর 'সেবাধর্ম' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজীতে 'শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবে সত্যযুগের আগমন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১০ই এপ্রিল সকালে শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রামায়ণ গান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুত চক্রবর্তী মহাশয় রামায়ণ আলোচনা করেন। রাত্রে আশ্রম-বিদ্যালয়ের বালকগণ কর্তৃক '৪৯নং মেস্' কৌতুকাভিনয় ও 'প্রতাপসিংহ' নাটকাভিনয়ের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জলপাইগুড়ি: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৭ই এপ্রিল হইতে ৯ই এপ্রিল তিনদিনব্যাপী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাৎসরিক জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ৯ই এপ্রিল, রবিবার প্রায় ত্রিশ সহস্র নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের তিনদিনই পূজা এবং ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

৮ই ও ৯ই এপ্রিল বেলা ৩ ঘটিকায় কীর্তন পরিবেশিত হয়। তিনদিনই অপরাহ্ণে ধর্মসভার আয়োজন করা হয় এবং সভান্তে শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সুললিতকণ্ঠে রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন। উৎসব উপলক্ষে ৯ই এপ্রিল সহস্র সহস্র নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। একটি মনোরম মেলারও আয়োজন করা হইয়াছিল।

প্রথম দুইদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী চিদাত্মানন্দজী এবং প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত।

তৃতীয় দিনে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত এবং স্বামী চিদাত্মানন্দজী মহারাজ "বিশ্বসমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান" সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার আশ্রম-কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দানের পর এই দিনকার সভার ও উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউ ইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত কেন্দ্র—অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল:

ডিসেম্বর, ১৯৬৬: ভক্তিপথে একাগ্রতা; হিন্দুধর্মে ব্যক্তি ও নীতি; ঈশ্বরাবতারের রহস্য; দেব-মানব খৃষ্ট।

মার্চ, ১৯৬৭: ঈশ্বরকে খুঁজিও না, তাঁহাকে দর্শন কর; কর্তব্য ও স্বাধীনতা; শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান ধর্মসমস্যা; মৃত্যুই কি পরিণতি? অমৃতত্বের সন্ধানে।

এতদ্ব্যতীত উপনিষৎ অবলম্বনে ক্লাস করা হইয়াছিল।

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি: অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ। রবিবারের সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দেওয়া হইয়াছিল:

ফেব্রুআরি, ১৯৬৭: যতীশ্বর বিবেকানন্দ ও তাঁহার শাশ্বত বাণী; অবতারের লীলা-পার্ষদগণ; ভক্তিযোগ; কর্মযোগ।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও শুক্রবারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আলোচিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে গত ২রা এপ্রিল, রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের ১০৫তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় ১৫১ নং বিবেকানন্দ রোডস্থিত বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দিরের সভা-গৃহে, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে।

উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সোসাইটির সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজীর স্বাগতভাষণ এবং সোসাইটির সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যবিবরণী পাঠের পর স্বামী চিদাত্মানন্দজী বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি সকলে স্বামীজীর আদর্শ অনুসারে সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন, তবেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইবে। স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী বলেন, স্বামাজী ছিলেন সারা বিশ্বের, কিন্তু তথাপি তিনি স্বদেশকে কোন সময়েই ভুলিতে পারেন নাই, ভারতের দুর্দশাগ্রস্ত নরনারার জন্য তাঁহার ছিল গভীর স্নেহ। সভাপতি ডঃ মজুমদার তাঁহার ভাষণে বলেন যে, স্বামীজীর ভাবধারাই পরবর্তীকালে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী ও শ্রীঅরবিন্দের মাধ্যমে। তাঁহার ভাবানুসরণেই ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ।

পরিশেষে গ্রে-ষ্ট্রীট কালীকীর্তন সম্প্রদায় তাঁহাদের 'কালীকীর্তন' পরিবেশন করেন।

নতুন পুকুরঃ গত ২রা এপ্রিল স্থানীয় আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভজন, বিশেষ পূজা ও পাঠাদি হয়। দুপুরে প্রায় দেড় হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে 'স্বামীজীর বাণী' হইতে পাঠ হয়।

আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী জীবানন্দ মহারাজ এবং বক্তা শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সরল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় উপদেশ পরিবেশনে ভক্তমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন।

দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। পূজাদির পরে দুপুরে নরনারায়ণসেবা হয়। প্রায় দুই হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান।

বিকালে স্বামী মহানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান জিলা পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীনারায়ণ চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভান্তে শ্রীনরেশ মজুমদার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

টালিগঞ্জঃ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রে (১০ এ, ইন্দ্রাণী পার্ক) ৮ই ও ৯ই এপ্রিল তারিখে পালিত হইয়াছে।

৮ই এপ্রিল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া প্রভাতফেরী বাহির হয়। স্বামী শর্মানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তারূপে স্বামী গোকুলানন্দজী এবং স্বামী উদ্গীথানন্দজী সভায় যোগদান করেন। পরে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরিত হয়।

৯ই এপ্রিল সান্ধ্য আরাত্রিকের পর স্বামী গোকুলানন্দজী লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। সন্ধ্যায় ঝামাপুকুর নাট্য সমাজ কর্তৃক 'ভক্ত হরিদাস' কীর্তনাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

বাঁখাটি রামকৃষ্ণ জুনিয়ার হাই স্কুলে গত ২৮শে চৈত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি-উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রভাতফেরী, পূজা, হোমাদির পর পাঁচ-শতাধিক নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ মহারাজজীর পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি গণচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের বিভিন্ন দিকে গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে, গত ২৩শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রভাতফেরী, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, 'কথামৃত' পাঠাদির পর মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় আট হাজার ভক্ত নারায়ণকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে স্বামী আদিত্যানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় প্রধান অতিথি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

বিষ্ণুপুর : গত ২৩শে এপ্রিল, শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের ১০৪ তম জন্মতিথি উপলক্ষে বিষ্ণুপুর নিরঞ্জনানন্দ ধামে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইয়াছে। উৎসবের কার্যসূচী ছিল পূজার্চনা, চণ্ডীপাঠ, কীর্তন, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি। পূর্বাহ্ণে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণবাণী ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দের জীবনকথা' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গলীলাকীর্তন হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী জীবানন্দজী, স্বামী মুমুক্ষানন্দজী ও অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

দেউলটি : গত ৩০শে এপ্রিল হাওড়া জেলার দেউলটিতে (নাচক) বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, (বাঁকুড়দহ) নবারুণ সংঘ, (চককমলা) বাণী-বীথিকা ও আঞ্চলিক ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং নিবেদিতার জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক প্রদীপ কুমার সিংহ চৌধুরী। সমিতির সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন, এই অনুষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ বিহারের খরাত্রাণ তহবিলে অর্পণ করা হইবে।

সর্বভারতীয় আলোচনা-চক্র

'নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাতীয় সংহতির ভিত্তি'—এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ভারতীয় বিদ্যাভবন ও সংস্কৃত-বিশ্বপরিষদের উদ্যোগে গত মে মাসে বাঙ্গালোরে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণকে সভাপতি করিয়া একটি সর্বভারতীয় আলোচনা-চক্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করা হয়।

ভারতীয় বিদ্যাভবন, সংস্কৃত-বিশ্বপরিষদ, গান্ধী স্মারক নিধি ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বে-তে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। সংস্কার বিশ্বাস, ভারত জাগতিক বিষয়ে যতখানিই স্ব-নির্ভর হইয়া উঠুক না কেন, জাতীয় জীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী না আসিলে জাতি সুসংহত ও স্থির-উন্নতিশীল হইতে পারিবে না।

আলোচনা-চক্রটি আলোচনার বিষয়বস্তুকে ষোলটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর সভাপতিত্বে গত ৩১শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লীর ভারতীয় বিদ্যাভবনে ইহার প্রথম ও প্রধান বিষয় "নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য" আলোচিত হইয়াছে।

দিব্য বাণী

সর্বান্ বেদানধীয়ীত শুশ্রূষুর্ব্রহ্মচর্যবান্।
ঋচো যজূংষি সামানি যো বেদ ন স বৈ দ্বিজ ॥ ২৪৮।২
জ্ঞাতিবৎ সর্বভূতানাং সর্ববিৎ সর্ববেদবিৎ।
নাকামো ম্রিয়তে জাতু ন তেন ন চ বৈ দ্বিজঃ ॥ ৩
কামবন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনম্।
কামবন্ধনমুক্তো হি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৭ —মহাভারত, শান্তিপর্ব

সর্ববেদাধ্যায়ী যেই, ব্রহ্মচর্যব্রতধারী, গুরুসেবারত,
ঋক্ সাম যজুর্বেদ কণ্ঠস্থ যাহার—
কেবল তাহারি বলে ব্রাহ্মণ সে হয় না কখনো,
ব্রাহ্মণত্বে অধিকার আসে না তাহার।
সর্ববিদ্ সর্ববেদবিদ্ হইবার সাথে সাথে
প্রসারিত হয়ে যায় হৃদয় যাঁহার—সর্বভূতে যিনি দয়াবান—
আপন আত্মীয় বোধে সবা'পরে স্নেহ ঝরে যাঁর,
কামনাবিহীন যিনি, তিনিই ব্রাহ্মণ।
নিষ্কাম হইলে তাঁর ব্রাহ্মণত্বে আসে অধিকার।
নিষ্কাম সে মৃত্যুঞ্জয়ী— তার পাশে কোনকালে আসে না মরণ।
(জন্ম-মৃত্যু-কারাগারে বাঁধিয়া রাখার তরে)
বন্ধন বলিতে শুধু কামবন্ধন-ই মাত্র আছে,
বন্ধন বলিতে হেথা আর কিছু নাই—
কামবন্ধনেরে যিনি ছেদন করিয়া মুক্ত হন
ব্রহ্মজ্ঞান সদা তাঁর করায়ত্ত রয়।
(নিষ্কাম, হৃদয়বান, বেদবিদ্, ব্রহ্মনিষ্ঠ—ব্রাহ্মণের এই পরিচয়।)

কথাপ্রসঙ্গে

জীবনবীণায় সুর বাঁধা

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনবীণার সুর আলাদা আলাদা। মোটামুটি কয়েকটি ভাগে তা বিভক্ত করা যায় সত্য, কিন্তু বিস্তারিতভাবে দেখিলে দেখা যায়, কোনটির সঙ্গে কোনটি হুবহু মিলে না। মিলে শুধু তখন যখন যন্ত্রটি বাঁধা হইয়া যায় বিশ্বজীবনের সব সুর যে মূল তন্ত্র হইতে ঝঙ্কৃত হইয়া বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে তাহার সঙ্গে। উদাহরণ রূপে একটি ঘটনার অবতারণা করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জনৈক সন্ন্যাসীর মনে বহুদিন হইতে একটি দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। তিনি তখন কলিকাতায় থাকিতেন। অন্তর্দ্বন্দ্বটির নিঃসংশয় সমাধানের জন্য একদিন বেলুড় মঠে আসিয়া তিনি মন্দিরে গেলেন, সেদিনই ইহার সমাধানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণচরণে মনে মনে আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়া নীচে নামিলেন। মন্দির তখন মঠের পুরাতন বাড়ীতে, দোতলায়। নীচে নামিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী-সন্তান স্বামী শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বামী শিবানন্দ তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব চিরতরে মিটাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসীটি তখন স্বামী শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তো আপনাকে এ বিষয়ে কিছু বলি নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিয়াছি। আপনি জানিলেন কিরূপে?" উত্তরে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, "তারের যন্ত্র দেখেছ তো? যে যন্ত্রে অনেকগুলো তার একই পর্দায় বাঁধা থাকে, সেখানে সেগুলোর যে কোন একটাতে আঘাত করলেই সেই পর্দায় বাঁধা সব তারগুলোতেই ঝঙ্কার ওঠে। এও ঠিক সেই রকম জানবে।"

বহুবিচিত্র হইলেও মানুষের জীবনের ভাবধারার মধ্যে কতকগুলি মূল সুর আছে; যেমন কয়েকটি মাত্র পর্দা অবলম্বনে অসংখ্য রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়। কতকগুলি মূল ধর্ম পৃথিবীর সব মানুষের মনেই এক। বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব প্রকৃতির এক অদ্ভুত বিধান। যেমন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে দেহের আকৃতি দু-জনের ঠিক একরকম হয় না, অথচ দেহযন্ত্রের গঠন-প্রণালী, ক্রিয়া, ধর্ম প্রভৃতি সব মানবদেহেই এক

সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, প্রভৃতি সবই আমাদের জীবন-পরিকল্পনার অন্তর্গত। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন স্থানে মানুষ বিভিন্ন প্রকারে তাহা গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং এগুলির উন্নতিকল্পে বা অন্য প্রয়োজনবোধে এগুলিকে নূতন করিয়া গড়িবার বা এগুলির সংস্কার করিবার চেষ্টাও সর্বযুগে চলিয়াছে। বর্তমান যুগে কয়েকটি যুগান্তকারী জীবন-পরিকল্পনার সম্মুখীন হইয়াছে মানুষ। উহাদের ভিতর কয়েকটিকে আবার পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হওয়ার ফলে পৃথিবীব্যাপী সংঘর্ষের ও অন্তর্দ্বন্দ্বের আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে।

ক্যাপিট্যালিজম না কম্যুনিজম, ঈশ্বরবিশ্বাস-ভিত্তিক না নাস্তিক্যবাদ-ভিত্তিক সমাজ ও শিক্ষা—এই ধরনের বহু প্রশ্ন আজ জগতের সর্বত্রই ব্যষ্টিমনে জাগিতেছে। বিভিন্ন মতে দৃঢ়বিশ্বাসী রাষ্ট্রশক্তি এ সব প্রশ্নের মীমাংসা একভাবে করিতে চাহিতেছে। আজ পৃথিবীকে বিজ্ঞান ছোট একটি দেশের মতই করিয়া দিয়াছে বলা চলে—রাশিয়া-চীন-আমেরিকায়, আরব-ইসরাইলে, ভিয়েৎনামে যাহা

ঘটিতেছে তাহার আঁচ লাগিতেছে পৃথিবীর সব মানুষেরই মনে। সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে কঠোর বিভীষিকার মধ্য দিয়াই হউক, বা স্থির কল্যাণ-বুদ্ধি সঞ্জাত বিবেকের মধ্য দিয়াই হউক, একদিন আমাদের প্রশ্নের উত্তর বাস্তবরূপ লইবেই। মনে হয় ক্যাপিট্যালিজম ও কম্যুনিজমের ভিতরকার খারাপ জিনিসগুলি বাদ দিয়া এবং উহাদের ভিতরকার ভাল জিনিসগুলি লইয়া সেগুলির সমন্বিত রূপই হইবে ভবিষ্যৎ জগতের মানুষের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক রূপ আর সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি হইবে যে কোন আকারেই হউক ঈশ্বরবিশ্বাস-ভিত্তিক। কারণ ভাল-মন্দকে ঠিকভাবে চিনিয়া পৃথিবীর সব মানুষই একদিন ভালটিকে গ্রহণ করিবেই, এবং যাহা যুক্তিবিরোধী বা অবৈজ্ঞানিক নয়, অথচ হৃদয় যাহা চায়, তাহাও গ্রহণ না করিয়া পারিবে না। কিন্তু ব্যষ্টিগতভাবে মানুষের ততদিন এই দ্বন্দ্বের দোলায় দোলা ও সংঘর্ষের উৎকট সুরে জীবনকে ভরাইয়া তোলা ছাড়া আর কিছুই কি করিবার নাই ?

আছে, এবং দেশ জাতি-বর্ণ-মতবাদ-নির্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষই তাহা করিতে পারে, নিজনিজ জীবনকে রাষ্ট্র- ও সমাজ-নিরপেক্ষ ভাবে একটি নিঃসংশতায়, আলোকে, শান্তিতে ভরা সুরের পর্দায় বাঁধিতে সচেষ্ট হইতে পারে। মন যে কোন রাষ্ট্রে, যে কোন সমাজে যতই উদ্‌ভ্রান্ত, চঞ্চল অবস্থায় থাকুক না কেন, অভ্যাসের বলে উহাকে নিজের ইচ্ছামত পর্দায় বাঁধা যায়, ইহা সর্বজনীন সত্য। আমরা ইচ্ছা করিলে সকলেই প্রত্যহ প্রভাতে দৈনন্দিন কর্ম আরম্ভ করিবার পূর্বে অন্ততঃ একবার মনকে শান্ত ও চিন্তাশূন্য বা একাগ্র করিবার চেষ্টা করিতে পারি। যেমন দৈহিক ব্যায়াম করি, সেইভাবে ইহাকে মানসিক ব্যায়ামরূপে গ্রহণ করিতে পারি। ঈশ্বরে বিশ্বাসী যাঁহারা, মনকে ভগবৎচিন্তার মাধ্যমে একাগ্র করাই তাঁহাদের পক্ষে ইহার শ্রেষ্ঠ উপায়, বহুযুগ-পরীক্ষিত 'ডঙ্কামারা' উপায়। যাঁহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাঁহারা মনকে চিন্তাশূন্য করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, মনে যখনই যে চিন্তা উঠিতেছে তখনই উহা হইতে বিরত হইবার সজাগ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ইহা করিতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবার কারণ নাই। ইচ্ছা থাকিলে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য সময়ের অভাব হয় না; প্রতিদিনের জীবনে বহুবিধ নিত্যকর্মে আমাদের অনেক সময় দিতে হয়। ফল কি হয় না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যও অন্ততঃ কিছুকাল নিয়মিতভাবে ইহা করিয়া দেখিতে দোষ কি ?

কি হইবে ইহাতে ?—এই সামান্য প্রচেষ্টাই নিয়মিতভাবে ও যথাযথভাবে করিতে পারিলে লাভ হইবে প্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বেশী। জীবনের সুর বাঞ্ছিত পর্দাটিতে প্রতিদিন বাঁধা হইতে থাকিবে, বিশ্বজীবনের মূল সুরের সঙ্গে ক্রমশঃ মিলিতে থাকিবে। মন ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিবে ইহাতে, স্থিরভাবে কিছু ভাবিয়া উহার ভালমন্দ বুঝিবার যোগ্যতা প্রতিদিন বর্ধিত হইবে, মনের শক্তি বাড়িবে, এবং অতিরিক্ত লাভ হইবে—একটা অকারণ আনন্দের প্রলেপ মনে লাগিয়া থাকিবে। এভাবে মানসিক শক্তিকে ক্রমবর্ধিত ও উন্নততর পর্যায়ে লইয়া যাইতে পারিলে তখন যাহাই করি না কেন, আমরা তাহা আরও ভালভাবে করিতে পারিব, যাহাই ভাবি না কেন তাহা আরো ভালভাবে ভাবিতে পারিব। জীবনের সব কিছুর ভালমন্দ বুঝিবার, যাচাইয়া লইবার নিজস্ব শক্তিটুকু অন্ততঃ তখন আসিবে, অপরের কথায় অন্ধভাবে আর কোনকিছুর পিছনে ছুটিয়া জীবনের চরম বিপর্যয়ের পরে

বুঝিতে হইবে না যে ভুল করিয়াছি। আর প্রতিদিনের জীবন হইতে মনশ্চাঞ্চল্যজনিত অশান্তি ক্রমশঃ ইহাতে কমিতে থাকিবে; যেমন কোন পাত্রে রক্ষিত জল যদি শূন্য তাপমাত্রায় রাখা যায়, তাহা হইলে অনেকখানি তাপ দিবার পর তাহা ফুটিয়া উঠিবার মত অবস্থায় আসে, তেমনি মনকে যদি প্রতিদিনের কর্মারম্ভের পূর্বে একাগ্র করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে শান্ত অবস্থায় আনা যায়, দৈনন্দিন কর্মচাঞ্চল্য ও বিরোধ-সংঘর্ষাদির ফলে সে মনের বিরক্তি- ও তিক্ততা-পূর্ণ হইতে এবং যুক্তিবিচারের ও আয়ত্তের বাহিরে যাইতে অনেক সময় লাগিবে। প্রারম্ভে প্রশান্তির মাত্রা আরও গভীর করিয়া লইতে পারিলে উহার সে অবস্থা আসিবেই না। ইহাতে প্রতিদিনের জীবনে লাভবানই হইব আমরা।

পৃথিবীর সর্বত্রই একাগ্রতার অভ্যাসের মাধ্যমে এভাবে জীবনের সুর বাঁধিবার প্রচেষ্টা মানুষ যদি করিতে পারে, বিশেষ করিয়া শিক্ষার মাধ্যমে ইহার বহুল প্রসারের ব্যবস্থা, জীবন সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ বাস্তব অপেক্ষা আরো সূক্ষ্ম বাস্তবের সন্ধান সে সহজেই পাইবে, এবং জীবনপরিকল্পনার যে রূপগুলির কথা আজ বর্তমান জগৎ চিন্তা করিতেছে, তাহার ভাল ও মন্দ দিকগুলি বুঝিবার, তাহার গভীরে প্রবেশ করিবার শক্তি অধিক সংখ্যক মানুষের আসিবে, বিশ্বমানব যাহার প্রতীক্ষায় আছে, তাহার আগমনের পথ প্রশস্ততর হইবে।

ভারতের জাতীয় প্রাণের সুর

আমাদের, ভারতবাসীদের আর একটি কথা ভাবিবার আছে। বর্তমান সময়ে ইহা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। একটি সুরে আমাদের জাতীয় জীবন হাজার হাজার বছর ধরিয়া বাঁধা আছে—ধর্মের সুরে। সকাল-সন্ধ্যায় ভগবচ্চিন্তার মাধ্যমে মনকে একাগ্র করার প্রচেষ্টা আমাদের জাতির জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত। জাতির উপর বিভিন্ন যুগে কত বিপরীত ভাবধারার প্রচণ্ড আঘাত সত্ত্বেও, বর্তমান কালেও শিক্ষাব্যবস্থার এ বিষয়ে অবহেলা এবং জড়বাদের বিপুল প্রভাব সত্ত্বেও 'যাহার কুয়াশা ভেদ করিতে কিংবদন্তীও সঙ্কুচিত', সেই যুগ হইতে আজ পর্যন্ত একটি দিনও এমন যায় নাই যেদিন না সারা ভারত জুড়িয়া গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গৃহকোণে, মন্দিরে, পুণ্যতোয়া তটিনীতীরে, হিমাচলের কোণে প্রভাতে সন্ধ্যায় অগণিত চিত্ত প্রতিদিনের জীবনের অসংখ্য বহির্বিষয়ক চিন্তাকে দুহাতে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একাগ্র হইবার প্রচেষ্টা করিয়াছে ভগবচ্চিন্তায়, একলক্ষ্য হইয়া ধাবিত হইয়াছে শ্রীভগবানের দিকে—জপ-ধ্যান-প্রার্থনাদির মাধ্যমে চেষ্টা করিয়াছে বিশ্বজীবনের মূল সুরটির সঙ্গে নিজের জীবনের সুরকে বাঁধিবার।

ধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় জাতি জীবনের সুর বাঁধিতে চাহিয়াছে চিরদিন। ধর্ম প্রথমেই এই শিক্ষা দেয়—জীবনের কর্মক্ষেত্র যাহাই হউক, নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা মনকে স্থির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভারত তাই রাজার—রাষ্ট্রনায়কের—জীবনে ধর্মনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনের উপর জোর দিয়াছে সর্বাধিক; কারণ জনমনের উপর তাঁহার প্রভাব প্রচণ্ড। মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠির অর্জুনাদি আদর্শ ক্ষত্রিয়গণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মত বিষম কর্মে নিযুক্ত থাকা কালেও প্রত্যহ প্রভাতে কর্মারম্ভের পূর্বে স্নানাদির পর ভগবদারাধনা করিয়া লইতেন। আধুনিক কালে ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির বিপুল সহায়ক দুটি জীবনও একইভাবে

প্রত্যহ জীবনের স্থর বাঁধিয়া লইতেন কার্যারম্ভের পূর্বে। মহাত্মাজী নিয়মিত নিজস্ব সময় ছাড়াও প্রকাশ্য সভায় উহা করিতেন —সকলকে এবিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য। নেতাজী যুদ্ধ পরিচালনা কালেও নিয়মিত ভাবে উহা করিতেন। ভারতীয় জাতির জীবনের স্থর বাঁধিতে হইলে ধর্মের মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, এই পথেই বাধা স্বল্পতম। জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিকাদি উন্নতির জন্য কোন্ পথ অবলম্বনীয়, সে বিষয়ে আজ বিভিন্ন মত দেখা যাইতেছে। পথ আমরা যাহাই নির্বাচন করি না কেন, জীবনপরিকল্পনা যেভাবেই করি না কেন, কোনও ক্ষেত্র হইতে যেন আমাদের জীবনের স্থর বাঁধিবার সর্বোত্তম সহায়ক ও প্রেরণাদায়ী ধর্মকে বাদ না দিই। বরং জনমনে ধর্মজীবনকে উৎসাহিত করিয়া কিছু করিতে পারিলে তাহাই জাতীয় উন্নতিবিধানে সর্বাধিক ফলপ্রসূ হইবে।

ইহার বিপরীত কিছু করিবার সর্ববিধ প্রচেষ্টাই পরীক্ষামাত্রে এবং পরিণামে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। বছর পঁয়ত্রিশ আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কয়েকজন সাঁওতাল কুলি রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্রে কাজ করিত। খৃষ্টান মিশনারীগণ তাহাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন একজন সাঁওতাল চাঁদার জন্য আশ্রমবাসী জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট আসিল। তাহারা কালীপূজা করিবে। সন্ন্যাসীটি প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা তো খৃষ্টান, কালীপূজা করবে কি?" উত্তরে সে বলিল, "খৃষ্টান হয়েছি বলে ধর্ম ছেড়েছি নাকি?" ভারতীয় জাতির জীবনের মূল স্থরকে ধর্মহীন যে কোন পর্দায় বাঁধিতে গেলে তাহার পরিণাম ইহার বেশী কিছু হইবে না।

"সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে। ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান উপদেশ সমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী **পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস রূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া** দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি-জনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা ও সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা।

আলমবাজার মঠ,
১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ সাল

My dear old Mohanta of the Alambazar Math,

তোমরা নির্বিঘ্নে ৺রামনাথ দর্শন করিয়া মাদ্রাজ আসিয়াছ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। তোমাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে বড় বলবতী হচ্ছে। এখন কি করি বল দেখি? তুমি আমাকে ভুলে গেছ না একটু একটু মনে আছে? নূতন মোহান্তজী খুব energetically শ্রীশ্রীজীর সেবা করিতেছেন। তবে তাঁহার delicate health-এর দরুন ইচ্ছানুরূপ পারিতেছেন না। মঠে প্রায় উপস্থিত যাহারা আছে তাহাদের শরীর তত ভাল নয়। একটা গঙ্গাতীরে স্থান না হইলে বড় সুবিধা নয়। জানি না শ্রীশ্রীগুরুদেব কবে আমাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন।

তোমরা অনেকগুলিন একসঙ্গে জমিয়াছ, দেখো যেন তোমার কার্যের ক্ষতি না হয়। Duty is duty, একথা যেন সর্বদা স্মরণ থাকে। খরচপত্র যেন বিবেচনা করিয়া করিবে, কোনমতে বেশী না হয়। কাহারও whims শুনিয়া চলিবে না, you need not care for the opinions of others, only do your own duty which is proper and best. স্বামীজী বড় অসন্তুষ্ট হন যাহারা সাধন ভজন কিংবা work না করিয়া idly and aimlessly বেড়ায়। তিনি সম্প্রতি যাহা লিখিয়াছেন তাহা তোমাকে নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

"অমুকের কাছে যে টাকা········এ পর্যন্ত এসেছে তার হিসাব চেয়ে পাঠাবে। ধর্মপ্রচারের জন্য যে টাকা তাহা গুলতোন বেঁধে রামেশ্বর যাত্রা করে হেঙ্গামা করবার জন্য নহে, আমি অসুস্থ শরীরে টাকাটির উপর টাকাটি সংগ্রহ করছি আর ওদের রসবৃদ্ধি দেখে কে। যদি হিসাবপত্র না দেয় তবে তাকে recall করবে। আমি কাজ চাই—don't want any humbug, যাদের কাজ করবার ইচ্ছা নাই যাদু এইবেলা······।"

উপরোক্ত স্বামীজীর চিঠি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠ করে যাহা বিবেচনা হয় করিবে। এক একজন মনে করে যে তাদের জমা টাকা আছে দিতেই হইবে। মঠে সম্প্রতি স্বামীজী লিখেছেন, এক পয়সাও দেশভ্রমণের জন্য সখকরে দেওয়া হইবে না। তুমি খুব সাবধানে খরচা করিবে। অথবা······কে খরচ করিতে বলিবে। তুমি কোনরূপ চক্ষুলজ্জা করিবে না।

আমি দেখিয়াছি চক্ষুলজ্জা করে কাহাকেও please করা যায় না। খোকা কেমন আছে, তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে, আর আর সকলকে আমার ভালবাসা জানাইবে ও জানিবে। ইতি—

Affly yours
S B.

(২)

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা।

বাগবাজার,
৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

প্রিয় মোহান্ত,

তিন চার মাস পূর্বে তোমার বন্ধুদের মধ্যে বিতরণের জন্য এক প্যাকেট নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলাম, আশা করি তুমি তাহা পাইয়াছ। এ বৎসর উৎসবের আয়োজন একটু অস্বাভাবিক বিলম্বে শুরু হইতেছে। তুমি উৎসবের জন্য যতটা সম্ভব টাকা সংগ্রহ করিয়া তোমার সুবিধামত সত্বর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিও। দক্ষিণেশ্বরের জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে ত্রৈলোক্যবাবুর সর্তের সঙ্গে একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মঠনির্মাণের উদ্দেশ্যে নদীতীরস্থ বেলুড় গ্রামে ৪০,০০০৲ (চল্লিশহাজার) টাকায় ২০ (কুড়ি) বিঘা জমি ক্রয় করার চুক্তিপত্র লেখা হইয়াছে। যদি সেই জমিসংক্রান্ত দলিলপত্র এটর্ণি ও অন্যান্য আইন ব্যবসায়ীগণ অনুমোদন করেন তবে উহা একমাসের মধ্যেই ক্রয় করা হইবে। একথা তুমি গোপন রাখিও এবং যে পর্যন্ত আমরা ক্রয় না করি সে পর্যন্ত উহা প্রকাশ করিও না। তোমার কাজকর্ম কেমন চলিতেছে? আমাদের প্রিয় খোকা ও তুলসী কেমন আছে? রামেশ্বর হইতে গোপালদা ফিরিয়াছেন কি? আশাকরি ভগবানের আশীর্বাদে তুমি ভালই আছ! স্বামীজী আজকাল মঠেই বাস করিতেছেন। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানিবে।

প্রীতিবদ্ধ
ব্রহ্মানন্দ

পুনশ্চ: গোবিন্দানন্দের নিকট হইতে আমি একখানা পত্র পাইয়াছি কাজের চাপে তাহার পত্রের জবাব দিতে পারি নাই। উৎসবের পর তাহাকে লিখিব।

(স্বামী বিবেকানন্দকে লিখিত*)

শ্রীচরণ ভরসা।

The Math,
P.O.—Belur,
Dist.—Howrah, 29th April, 1898.

শ্রীচরণেষু,

গতকল্য নিত্যগোপালের পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। তোমার শরীর এখনও ভালরকম সারে নাই শুনিয়া আমরা যারপর নাই ভাবিত আছি, পত্রপাঠ কেমন থাক লিখিয়া সুখী করিবে।

কলিকাতায় ৪।৫ দিনের মধ্যে ১০।১২টি plague cases হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৮।১০টি মারা পড়েছে এবং বাকি (যাহারা) তাহাদের জীবনের আশা খুব কম ; Dr. Sasi প্রভৃতি analysis দ্বারা জানাইয়াছেন যে real plague. Govt. এখনও বাহিরে কিছু প্রকাশ করেন নাই। শীঘ্রই মন্তব্য বাহির করিবেন। এখন হইতে কলিকাতা হইতে বিস্তর লোক পলাইতেছে। একটা খুব panic হইয়াছে। বোধহয় ২।৪ দিনে অনেক লোক চলিয়া যাইবে।

অদ্য সকালে যোগেন মঠে আসিয়াছিল শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করিতে। Dr. Sasi এবং আমাদের অনেকের মত যে (তিনি) কামারপুকুরে গিয়া থাকেন। যদ্যপি শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় plague না spread করে এবং বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে আবার আসিবেন। এ বিষয়ে তোমার কি মত জানিতে পরিলে সেইরূপ কার্য করা যাইবে।

তোমার নিজের শরীর যদ্যপি দুর্বল থাকে তাহা হইলে Dr.-কে জিজ্ঞাসা করিয়া নীচে আসিবে, যদ্যপি Dr.-রা বলে যে ২।১ দিন অপেক্ষা করিতে (হইবে) তাহা হইলে না হয় অপেক্ষা করিবে। এখানে আসিয়া তুমি Mrs. Bull প্রভৃতির সহিত America চলিয়া যাও এইটী আমার ইচ্ছা। কলিকাতার report প্রত্যহ তোমাকে পাঠাইব। তুমি সেখানে একটু সাবধানে থাকিবে। আহারাদির কোন প্রকার অত্যাচার যেন না হয়। তুমি কেমন থাক প্রত্যহ একখানা করিয়া চিঠি নিত্যগোপাল দ্বারা লেখাইবে। Mrs. Bull প্রভৃতি তাহারাই বা কি করিবে এ বিষয় তুমি consider করিয়া তাহাদিগকে একখানা চিঠি আলাহিদা লিখিবে। তুমি আমাদের নমস্কার জানিবে। ইতি

দাস
Rakhal

---

* দার্জিলিং-এ

ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

আমাকে মাঝে মাঝে লোকে প্রশ্ন করে—ঠাকুর নিজে চলে গেলেন—মা ঠাকরুণকে রেখে গেলেন কেন?

শ্রীশ্রীমা 'নরেন' প্রভৃতি সন্তানদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রামকৃষ্ণ মিশন গ'ড়ে তুলেছেন। তিনিই ছিলেন কেন্দ্রশক্তি। শুধু তাই নয়, মঠমিশনের নানা দুরূহ সমস্যার সহজ মীমাংসা তিনি করে দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সংসারীদের কিভাবে চলতে হবে সে সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, বড়লোকের বাড়ীর দাসী মালিকের ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসা দেখায়; মুখে বলে—'এ আমার খুব ন্যাওটা', কিন্তু মনে জানে—এ তার কেউ নয়, তার নিজের ছেলে ভাঙা কুঁড়েতে তার জন্য কাঁদছে, মন প'ড়ে থাকে সেখানে; ঠিক তেমনি সংসারে সবাইকে 'আপন, আপন' বলবে কিন্তু জানবে ভগবানই একমাত্র আপনার। ঠাকুর আরও বলেছেন—নৌকা জলে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকাতে যেন জল না থাকে। তুমি সংসারে থাকো ক্ষতি নাই কিন্তু তোমাতে যেন সংসার না থাকে। এই হল সংসারীদের আদর্শ।

কিন্তু ঠাকুরের মধ্যে বিন্দুমাত্র সংসার ছিল না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সংসারের বাইরের লোক। কাজেই, সংসারীদের প্রতি এই সব উপদেশ দিলেও, নিজের জীবনে আচরণ করে দেখাবার সুযোগ তাঁর হয়নি। তাই, লোকে বলতে পারে—এ আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করা অসম্ভব; ঠাকুর শুধু মুখেই বলেছেন, নিজের জীবনে আচরণ করেন নি।

শ্রীশ্রীমা কিন্তু বাস করতেন সংসারের মধ্যে। বাড়ীতে তাঁর ভাইরা ছিলেন ঘোর সংসারী। মায়ের এক ভাইঝি ছিলেন খামখেয়ালী ও চিররুগ্না। এঁদের নিয়ে মা জয়রামবাটীতে সংসারীদের মতই নানা অশান্তির মধ্যে কাটাতেন। তার ওপর মাতৃচরণ-দর্শনপ্রার্থী ভক্তদের আসার বিরাম ছিল না। তাদের থাকার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় মাকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত। বাইরে থেকে দেখে মনে হত সাধারণ সংসারীর মতো তিনি বাড়ীর সব কাজ নিখুঁত ভাবে করছেন—কিন্তু মন ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন কিভাবে সংসারীর আদর্শ সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ জীবনে রূপায়িত করতে হয়। দু'হাতে ভগবানকে আঁকড়ে ধরে সংসার করার এই আদর্শ দেখাবার জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে রেখে গিয়েছিলেন।

এই সংসারে 'আমি আর আমার' এই বোধ থেকে যত দুঃখের সৃষ্টি হয়। এই 'আমি আর আমার' ছাড়তে না পারলে ঈশ্বরে মন যায় না। 'আমি আমি' ছেড়ে 'তুমি তুমি' না বলতে পারলে মন থেকে সংসার যাবে না। 'আমার ছেলে,' 'আমার স্বামী' ইত্যাদি না ভেবে তাঁদের ঈশ্বর-বুদ্ধিতে সেবা করতে হবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ

*কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৪.৪.৬৭ তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন—শ্রীমাধুর্যময় মিত্র

প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।"

"স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা স্বামীর জন্য নয়, কিন্তু আত্মার জন্যই স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে ; কারণ সে আত্মাকে ভালবাসিয়া থাকে। স্ত্রীর জন্যই কেহ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে।" স্বামীর মধ্যে, স্ত্রীর মধ্যে আত্মা আছেন বলেই তাঁরা প্রিয় হন। স্বামীজী যে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে বলেছেন, সেও এই একই জিনিস। সবারই মধ্যে নারায়ণ আছেন এই জ্ঞানে সংসার করতে হবে

ঠাকুর 'নরেন' প্রভৃতি ত্যাগী সন্তানদের খুব ভালবাসতেন, স্বামীজী একদিন ঠাকুরকে বললেন—আপনি রাতদিন 'নরেন, নরেন' করেন, শেষে আপনার জড়ভরতের অবস্থা হবে! বালকস্বভাব ঠাকুর চিন্তিত হয়ে মন্দিরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন। মা ব'লে দিলেন—তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিস তাই ভালবাসিস! যেদিন ওর ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না! এই নারায়ণজ্ঞানে সকলকে ভালবাসা, এইটাই হল মূল কথা।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখ। তার ফলে মনে নানা বাসনার বুদ্‌বুদ উঠছে। তা থেকে লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি হচ্ছে। এর ফলে আমরা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি। সর্বদা বিচার করে চলতে হবে ; মন থেকে বাসনা দূর না করলে সাধনভজন হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে ধ্যানযোগের উপদেশ দিলেন, অর্জুন তখন বলেছিলেন—"এই মন বাতাসের চেয়েও চঞ্চল। এই মনকে সংযত করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই ধ্যানযোগের উপদেশগুলি কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়।" উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—"অর্জুন, তুমি যা বলছ তা ঠিক, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে সংযত করা সম্ভব। আমি ধ্যানযোগে যা উপদেশ দিয়েছি তা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়।"

মানুষের মন একটা পুকুরের মতো। পুকুরের জল যখন শান্ত থাকে তখন তাতে চাঁদের প্রতিবিম্ব সুন্দরভাবে দেখা যায়। কিন্তু যদি পুকুরের জলে একটা ঢিল ছুড়ে ফেলা হয়, অমনি তরঙ্গ ওঠে। চাঁদের প্রতিবিম্ব আর স্পষ্ট দেখা যায় না। বাসনা হল ঐ ঢিল। আমাদের মনরূপ পুকুরে বাসনা-রূপ ঢিল অনবরত তরঙ্গের সৃষ্টি করছে, যার ফলে আমরা আমাদের স্বরূপকে জানতে বা দেখতে পারছি না। এই মনকে শান্ত ও সংযত করলেই আত্মানুভূতি সম্ভবপর। অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহায়ে এই মন শান্ত হয়। বাতাস না থাকলে প্রদীপের শিখা যেমন নিষ্কম্প থাকে, বাসনা না থাকলে মানুষের মনও সেইরূপ নিষ্কম্প হয়। যোগী পুরুষরা এইরূপ নিষ্কম্প মন নিয়ে আত্মোপলব্ধি করেন। আত্মোপলব্ধি মানে আমরা স্বরূপতঃ যা, তাই উপলব্ধি করা। আমরা স্বরূপতঃ আত্মা বা ব্রহ্ম। এই স্বরূপ-উপলব্ধির, নিজেকে আত্মা বা ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করার নামই আত্মোপলব্ধি।

মানুষ মরতে চায় না—এর কারণ কি? এর কারণ মৃত্যু তার স্বভাব-বিরোধী—সে জন্মমৃত্যু-রহিত, সে আত্মা। আত্মা সৎ অর্থাৎ সর্বকালে আছেন এবং অবিনশ্বর। এই বোধ তার মধ্যে আছে, তাই মানুষ মরতে চায় না।

মানুষ অজ্ঞানকে ঘৃণা করে, মানুষ সবকিছু জানতে চায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি

সবকিছু জানবার জন্য মানুষের অনন্ত আগ্রহ। এর কারণ তার আসল সত্তা যে 'চিৎ', অর্থাৎ সে যে জ্ঞানস্বরূপ, এই বোধ তার মধ্যে আছে।

মানুষ সর্বদা দুঃখকে পরিহার করতে চায়, আনন্দ খোঁজে। এই আনন্দের সন্ধান চলছে তার সকল কাজের মধ্যে। এর কারণ, সে যে আনন্দস্বরূপ এ বোধ তার মধ্যে আছে।

আমাদের এই প্রকৃত স্বরূপকে জানাই, সৎ-চিৎ-আনন্দ যে আমাদের সত্তা তা জানাই হল আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরলাভ।

এক হউক

ডক্টর মতিলাল দাশ

[ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত]

হে হুতাশন, প্রভু, তুমি কাম্য ফল দাতা,
ব্যাপ্ত তুমি বিশ্বপ্রাণে বিশ্বপ্রাণের পাতা!
বেদীর পরে ঋত্বিক সে করবে প্রজ্বালন
পূর্ণ কর মোদের যাহা কাঙ্ক্ষিত সব ধন। ১

তোমরা চল একসাথে সব একই কথা কহ
সবাই মিলে ভালবাসায় একটি হৃদয় বহ।
দেবতারা পূর্বে যেমন যজ্ঞভাগের লাগি'
একটি মতে মিশল সবে তেমনি রহ জাগি। ২

হোক তোমাদের মন্ত্র সমান হোক সমিতি তুল্য,
মন তোমাদের একই প্রকার হোক হে হৃদয় ফুল্ল
আনতে ঐক্য একই মন্ত্রে সবার দীক্ষা হবে
তোমাদেরি যজ্ঞকাজে একই হবি রবে। ৩

সংকল্প সে একই হবে তোমরা ব্রতী যত!
হোক তোমাদের হৃদয়গুলি একই ভাবে নত,
হৃদয়গুলি মিলুক সবার এক মিলনের সুরে,
একতার-ই ছন্দে সবার হৃদয় উঠুক পুরে। ৪

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনার ভূমিকা

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যাক।

একজন লোক ঘর থেকে একটা ভারি পিয়ানো বার করবে। ঠেলাঠেলি করে সেটাকে দরজার মাঝামাঝি এনেছে, তারপর আর পারছে না। এমন সময় অন্য একজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে এসে প্রথম লোকটিকে বললে, "ভাই, আমি কি তোমায় সাহায্য করতে পারি ?"

"ধন্যবাদ, খুব ভালো হয় তাহলে ?"

দ্বিতীয় লোকটি এসে হাত লাগাল। দুজনে মিলে খুব চেষ্টা করল। কিন্তু কী যে হল, পিয়ানোটা আর নড়েই না!

প্রথম লোকটি তখন বললে দ্বিতীয় জনকে, "ভাই, তুমি তো আমায় খুবই সাহায্য করলে কিন্তু কী আর করা যাবে বলো, পিয়ানোটা আর বার করা গেল না।"

"বার করা ?" সবিস্ময়ে বলল দ্বিতীয় ব্যক্তি, "তুমি এটাকে বার করতে চাইছ নাকি ? আমি তো এতক্ষণ এটাকে ভিতরে ঢোকাতেই সাহায্য করছিলাম!"

গল্পটি শুনেছিলাম স্বামী নিখিলানন্দজীর মুখে। কলকাতায় তাঁর এক বক্তৃতাকালে।

গল্পটির তাৎপর্য এই যে, কোন বিষয় আলোচনা করতে গেলে, কে কোন্ পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিষয়টি বিবেচনা করছেন সে-সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার নতুবা বিভ্রান্তি অনিবার্য।

॥ দুই ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনার প্রথমেই ঠিক করে নেওয়া দরকার কোন্ রামকৃষ্ণকে আমরা চাইছি ?

তিনি অনন্তভাবময়, একথা মনে রেখে সাধারণভাবে বলা যায় যে, তিনটি ইতিমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে (তথা যে-কোন অবতারকে) দেখা সম্ভব—(১) ঐতিহাসিক, (২) তাত্ত্বিক এবং (৩) মরমী। এই তিন দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে পারে। আবার একই ব্যক্তি ধাপে ধাপে, একটি থেকে আর একটিতে উত্তীর্ণ হতে পারেন। আবার একই জনের যুগপৎ তিনটি দৃষ্টিই সমন্বিতভাবে থাকতে পারে। যদিচ শেষোক্ত ক্ষেত্রে সেই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হবেন মুখ্যত মরমী বা প্রেমিক।

মরমীদের মনের চূড়ান্ত কথাটি এই রকম : "…কৃষ্ণের সত্যতা পৌরাণিক না ঐতিহাসিক এ নিয়ে মাথা বকানো নিষ্ফল, যেটা অনুধাবনীয় সেটা এই যে তাঁর আবির্ভাব চিরন্তন কিনা—তিনি বৃন্দাবন-বিহারী ছিলেন কিনা এ বিচারে কাজ কী—আমরা চাই হৃদয়ঙ্গম করতে তিনি আমাদের হৃদয়-বৃন্দাবন-বিহারী কিনা।…এই-ই হ'ল চিরন্তন কৃষ্ণ যিনি বলেছিলেন : 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—শুধু অবতারের চিন্ময় বিগ্রহে নয়—নাস্তিক্যের মৃন্ময় আধারে, অর্ধ-উন্মীলিত শিশু-নয়নের দৃষ্টিপথে - সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের হৃদয়ের সংশয়ান্ধকার ঝড়তুফানের গর্ভকোষে। 'জন্মাষ্টমী'-র অর্থ…এই-ই…।" (ভাগবতী কথা, ভূমিকা, পৃঃ ২২-২৩, শ্রীদিলীপকুমার রায়।)

মরমী ছাড়া কে বলতে পারেন নির্দ্বিধায়: "If it is proved that Christ is outside truth, I would prefer to be with Christ rather than with that truth."

ভাবার্থ: "যদি প্রমাণিত হয় যে, খ্রীস্ট সত্য-বহির্ভূত, তাহলে সেই সত্যকে পরিহার করে আমি খ্রীস্টের সামিল হব।"

এমন কথা শোভা পায় শুধু মরমীর মুখেই:
"ভগবান অন্বেষণে নাহি প্রয়োজন।
থাকে যেন প্রভু আর মার পদে মন॥"
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, পৃঃ ২১১)

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত হওয়া স্বাভাবিক হয় কয়েকটি কারণে।

প্রথমত, তিনি কালের দিক দিয়ে আমাদের খুব কাছের মানুষ। শ্রীযুক্ত ক্রিসটোফার ইশারউড-এর ভাষায়:

"Ramakrishna's teaching is our modern gospel. He lived and taught for us, not for men of two thousand years ago; and the Ramakrishna Movement is responsible for the spreading of his gospel among us, here and now." (Foreword, History of the Ramakrishna Math and Mission by Swami Gambhirananda, p ix.)

ভাবার্থ: "শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদত্ত শিক্ষাই আমাদের আধুনিক শাস্ত্র। তাঁর জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষাদান আমাদেরই জন্য, দু-হাজার বছর আগেকার মানুষদের জন্য নয়। আর রামকৃষ্ণ-আন্দোলন তাঁর বাণীপ্রচারের দায়ভাগী—আমাদের মধ্যে এখানে এবং এখন।"

অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন তিনি:

"...Ramakrishna's life, being comparatively recent history, is well documented. In this respect, it has the advantage over the lives of other, earlier phenomena of a like nature. We do not have to rely, here, on fragmentary or glossed manuscripts, dubious witnesses, pious legends." Ramakrishna and his Disciples, p l.)

ভাবার্থ: "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, তুলনামূলক বিচারে সাম্প্রতিক ইতিহাসের বিষয় বলে, তার সম্পর্কে পর্যাপ্ত নথিপত্র রয়েছে। এদিক দিয়ে দেখলে, অতীতের অনুরূপ সংঘটনগুলির তুলনায় তার অনুধ্যান সহজতর। এখানে আমাদের নির্ভর করতে হয় না—খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, টীকাকণ্টকিত, মন্তব্য-পরিকীর্ণ পাণ্ডুলিপি, সন্দেহজনক সাক্ষ্য বা শুভ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কথা ও কাহিনীর উপর।"

অনুরূপ কথা আরও সহজ ও ঘরোয়া ভাবে বলেছেন স্বামী শিবানন্দ, "কি বলছো হে! স্বয়ং ভগবান্ নরদেহ ধারণ ক'রে এসেছিলেন—এই তো সেদিনের কথা। আমাদের চোখের উপর সব কাজটা হয়ে গেল। কি কঠোর সাধনার অগ্নিই না তিনি প্রজ্জলিত করেছিলেন! এখনও তার আঁচ লোকের গায়ে লাগছে।" (শিবানন্দ-বাণী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩)

দ্বিতীয়ত, রামকৃষ্ণ-জীবনে, রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে একঘেয়েমির কোন স্থান নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের ভাষায়: "একঘেয়ে হওয়াটা হীনবুদ্ধির কাজ।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-২৮০)

তৃতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্পর্কে বিচারকে, যাচাইকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। তাঁর সন্তানরাও অনুরূপ মনোভাবই অবলম্বন করতেন তাঁর বিষয়ে। "ঐ দেবচরিত্র বুঝিবার জন্য আমরা নিজ-নিজ মন-বুদ্ধির প্রয়োগ করিলে উহাতে দূষ্য কিছুই নাই; কেবল ঠাকুরের চরিত্রের সবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছি—একথা মনে না করিলেই হইল।"—বলেছেন

পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ। (লীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ খণ্ড, নিবেদন, পৃঃ ৩)

আসলে, যদি কারও অনুসন্ধান আন্তরিক হয়, সংস্কারে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্বোপরি ঠাকুর যদি তাকে টানেন ("কৃপা বিনা অবতারে নাহি ধরিবার"—পুঁথি, পৃঃ ১৭৭) তাহলে যেভাবেই তার রামকৃষ্ণ-চর্চা শুরু হোক না কেন, অন্তে তা রামকৃষ্ণ-প্রেমে উপনীত হতে বাধ্য। এ অন্বেষণ স্বাদু স্বাদু পদে পদে। এ পরমান্নের প্রতি গ্রাসে ক্ষুন্নিবৃত্তি, তুষ্টি, পুষ্টি। যদি সংস্কারের দোষে, প্রচ্ছন্ন কামনা-বাসনার পিছুটানে, বিদ্যার গর্বে বা অহংকারের প্রাবল্যে—কেউ কিছুদূর এগিয়ে থেমে যান বা হটে যান, তাহলেও তিনি ততটুকু পরিমাণেও লাভবান হবেন।

মনে পড়ে স্বামী সারদানন্দজীর কথাঃ "...আমরা এ অদৃষ্টপূর্ব দেবমানবের কথা যতদূর জানি বলিয়া যাই, আর তুমি এই সকল কথা যতটা ইচ্ছা 'ন্যাজামুড়া বাদ দিয়া' নিজের যতটা 'রয় সয়' ততটা লইও, বা ইচ্ছা হইলে 'কতকগুলো গাঁজাখুরি কথা লিখিয়াছে' বলিয়া পুস্তকখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিত্য নূতন ফুলে 'বিষয়-মধু' পান করিতে ছুটিও। পরে সংসারে বিষম ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া যদি কখন 'বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'ল, কামাদি-কুসুমসকলে'—এমন অবস্থা তোমার ভাগ্যদোষে (বা গুণে ?) আসিয়া পড়ে, তখন এ অলৌকিক পুরুষের লীলাপ্রসঙ্গ পড়িও—নিজেও শান্তি পাইবে এবং আমাদের ঠাকুরেরও 'কদর' বুঝিবে।" (লীলাপ্রসঙ্গ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৫)

॥ তিন ॥

পূর্বোক্ত—ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক এবং মরমী দৃষ্টিকোণগুলি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে কীভাবে দেখা যেতে পারে ? আর সব ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও আমাদের পরম দিশারী স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভ্রাতৃবৃন্দ।

যেমন ধরা যাক, স্বামীজী ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছেন যখন বলেছেন, "বঙ্গদেশের সুদূর পল্লী-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নিরক্ষর বালক কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আত্মশক্তিবলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে তাহা দান করিয়া গেলেন—আর সে সত্যকে জীবন্ত রাখিবার জন্য কেবল কয়েকজন যুবককে রাখিয়া গেলেন।" (মদীয় আচার্যদেব, বাণী ও রচনা ৮ম, পৃঃ ৪০৮)

আবারঃ "এই ব্যক্তি তাঁর একান্নবর্ষব্যাপী একটা জীবনে পাঁচ হাজার বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে গেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাপ্রদ আদর্শরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন।" (বাণী ও রচনা, ৭ম, পৃঃ ১৮)

ইতিহাসের ভিত্তিতেই বলেছেন স্বামী সারদানন্দ, "ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানবজগতে আর কখনও দেখা যায় নাই।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০০)

ইতিহাস-চেতনা থেকেই বলেছেন স্বামীজী, "হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি ; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।...

"যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ

করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।" (হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৬)

অনুরূপ চেতনা থেকেই আরও বলেছিলেন তিনি, "...শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষাগ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে।" (বাণী ও রচনা, ৭ম, পৃঃ ১৮)

এই উক্তিরই সম্প্রসারিত রূপ : "... কোন মহান আদর্শপুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, এমন কি কোন কাজই করিতে পারে না। রাজনীতিক, এমন কি সামাজিক বা বাণিজ্য জগতের কোন আদর্শপুরুষ কখন ভারতে সর্বসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। উচ্চ অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী মহাপুরুষগণের নামে আমরা সম্মিলিত হইতে চাই—সকলে মাতিতে চাই। ধর্মবীর না হইলে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে আমরা এমন এক ধর্মবীর—এমন একটি আদর্শ পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে।...

"...আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন ; আর আমরা কিছু করি বা না করি, যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী তাহার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন।" (বাণী ও রচনা, ৫ম, পৃঃ ২১১-১২)

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর সন্তানদের সিদ্ধান্ত, স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায়, "...শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র জীবনের আমরা যতই অনুশীলন করিয়াছি, ততই উহাকে বৈদিক সার্বজনীন ও সনাতন অধ্যাত্ম ভাববৃক্ষের সারসমষ্টিসমুদ্ভূত প্রথমোৎপন্ন ফলস্বরূপেই নির্ধারিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। (লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ২)

স্বামীজী বলেছেন, "তাঁর জীবনটা একটা অসাধারণ আলোকবর্তিকা, যার তীব্র রশ্মি-সম্পাতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র দিক বা রূপ সত্যসত্যই বুঝতে সমর্থ হবে।" (বাণী ও রচনা, ৭ম, পৃঃ ১৪)। আবার, "বেদ-বেদান্ত পুরাণ-ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না।" (ঐ, পৃঃ ৪৪)

'জৃম্ভিত-যুগ ঈশ্বর' (যিনি যুগের ঈশ্বররূপে প্রকাশিত)—এই একটি শব্দে এ বিষয়ে স্বামীজীর তাবৎ চিন্তা সংহত। আর তা সোচ্চার তাঁর অপূর্ব প্রণাম-মন্ত্রে—

'স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥'

ধর্মের সংস্থাপক, সকলধর্মস্বরূপ, অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে রামকৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম করি। (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ২৫৬)

আর 'মমৈকশরণদাতা' রামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রেমিক স্বামীজীর আবেগমথিত কয়েকটি

১. 'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম'—তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু' করিয়াছি। (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩২৮)

২. "...না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া

একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম না-হয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই, কিছুমাত্রও নাই, তবে এ ছুনিয়া ঘুরে দেখছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই 'ভাবের ঘরে চুরি'। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করিব? একঘেয়ে বলো বলবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালোবাসি। আমার মতো অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি, মাফ করবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেবো? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।" (বাণী ও রচনা, ৭ম, পৃঃ ১৬১-১৬২)

৩. "তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে, বোকারাম?" (ঐ, পৃঃ ৬৪)

৪. "যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।" (ঐ, পৃঃ ৫০)

৫. "…আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটিই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি ··। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি —সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!···—যাই প্রভু যাই!" (বাণী ও রচনা, ৮ম, পৃঃ ১৩১-১৩২)।

৬. এই ভাবেরই কাব্যময় প্রকাশ—

"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে!
তব গতি নাহি জানি,
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপ-তপ সাধন-ভজন,
আজ্ঞা তব, দিয়েছি তাড়ায়ে;
আছে মাত্র জানাজানি-আশ,
তাও প্রভু কর পার।

প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
... ...
তত্ত্বজ্ঞের নহে এ বারতা।"

(বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ২৭২-২৭৩)

এখন তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমরা চাই প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে। যার অর্থ, আমরা চাই তাঁর ভক্ত হতে।

সেই সঙ্গে ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে চাই আমরা।

আরও চাই, তত্ত্বের দিক দিয়ে যথাসাধ্য বুঝে নিয়ে প্রণাম জানাতে অবতারবরিষ্ঠ রামকৃষ্ণকে।

কিন্তু আবার বলি—আমাদের যাত্রার শুরুতে ও সারায় আছেন প্রিয়তম শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই আমাদের নীড় এবং তিনিই আমাদের আকাশ।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রাচীন ভারত

শ্রীপিনাকেশ সরকার

(১)

শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একই সঙ্গে যুগজাতক এবং যুগাতিশায়ী। "সাম্প্রতে"-র জটিলতা এবং যন্ত্রণাকে তিনি রূপায়িত করে তোলেন এবং অতীত-ভবিষ্যতের সুদূর অধ্যায়ের অভিমুখেও তাঁকে অগ্রসর হতে হয়। কেননা, যিনি কবি তিনি শেষ পর্যন্ত এক অসীম অখণ্ড সত্যকেই পরিপূর্ণভাবে দেখতে চান, এবং সেই পূর্ণদর্শনের জন্য অনেক সময় খণ্ডিত কালসীমাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে তাঁর সহায়ক, অতীতের ঐতিহ্য তাঁকে দীক্ষিত করে তোলে বর্তমানের দর্শনে, ভবিষ্যতের ধ্যানে। একথা শুধুমাত্র রোম্যান্টিক কবিদের সম্বন্ধেই সত্য নয়, জগতের যে-কোনো মহাকবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মিলটন 'প্যারাডাইস লস্ট' এবং 'প্যারাডাইস রিগেইনড্'-এর কাহিনী-নির্বাচনে বাইবেলকেই আশ্রয় করেছিলেন; কালিদাসের একাধিক কাব্য-নাটকের উপাদান রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ, আর অতদূরে যাবারই বা কী প্রয়োজন? আমাদের মধুসূদন, যিনি বস্তুতঃ বাংলা কাব্যের একমাত্র 'মহা-কবি', তিনি সনেটগুলি ছাড়া বাকী সমস্ত কাব্যেরই উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন পুরাণ-মহাকাব্য থেকে।

অবশ্য এই অতীতপ্রীতি নানা সূত্রে দেখা দিতে পারে। প্রথমতঃ, অতীত যেখানে গতানুগত প্রথা, নির্জীব নিঃসহায় অনুবর্তন। যেমন—মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের তথাকথিত মহাকাব্যে। দ্বিতীয়তঃ, অতীতকে অবলম্বন করে যেখানে বর্তমানের ভাষ্য রচিত হয়। অতীত সেখানে উপকরণমাত্র, কবির আসল উদ্দেশ্য অতীতের শিলাখণ্ডগুলি-মাত্র গ্রহণ করে বর্তমানের মহামন্দির-রচনা। যেমন—মধুসূদনের মেঘনাদবধ কিংবা বীরাঙ্গনা কাব্যে। তৃতীয়তঃ, অতীত যেক্ষেত্রে কবির স্বপ্নচারণার আশ্রয়, তাঁর ক্লান্ত শ্রান্ত বিক্ষত হৃদয়ের কোমল উপশম, এমন কি আদর্শ জীবনের রূপ। যেমন—কীট্‌সের কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায়।

অন্যান্য যে-কোনো রোম্যান্টিক কবির মতোই রবীন্দ্রনাথ অতীতের ছায়াধূসর পথে বারংবার ফিরে গেছেন। সে অতীত একদিকে স্থানকালপাত্ররহিত 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশ', চূড়ান্তভাবে বিশুদ্ধভাবে পুরাতন। পুরাতন বললেও বোধহয় ভুল হবে, বলা উচিত 'অনন্ত'। 'অনাদিকালের হৃদয় উৎস' সেই অতীতের ঠিকানা। সে অতীতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, কাল নেই, পাত্র নেই। তার কোনো সুস্পষ্ট রূপচিত্র অঙ্কন করা যায় না। এই 'পুরাতন' একটি শাশ্বত, রূপহীন, দার্শনিক সত্যের মতো।

কিন্তু আরেক রবীন্দ্রনাথকেও আমরা চিনি, যিনি অতীতের একটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপশ্রী রচনা করে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। সে অতীতে ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল স্বপ্নকল্প নগরী, শ্যামচ্ছায়া-ঘন জনপদ—সমগ্রভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষ। আরও দূর অতীতে, আশ্রম-জীবনের সন্নিধানেও কবি ফিরে গেছেন। বেদ-উপনিষদের মন্ত্রধ্বনিত তপোবন-জীবনকে, সভ্যতার সেই অরুণলগ্নকেও কবি নানাভাবে স্মরণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ

বলে রাখা ভালো, অতীত ভারত বলতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, এবং কালিদাসের যুগের ভারতকেই বুঝিয়েছেন। সংঘর্ষচিহ্নিত পাঠান বা মুঘলযুগ তাঁকে বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। 'কথা ও কাহিনী'র অনেক কবিতায় পাঠান-মুঘল যুগের পটভূমি রয়েছে সত্য, কিন্তু সেখানে তিনি মূলতঃ আদর্শ-লোকের স্রষ্টা, বিশুদ্ধ স্বপ্নকল্পনা সেখানে নেই।

(২)

মানসী কাব্য রচনার সময় থেকেই অতীত-প্রীতির সূচনা এমন বললে ভুল হবে না। মানসীর 'একাল ও সেকাল' কবিতায় বর্ষার মেঘমেদুর সজলগম্ভীর রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতে করতে কবির চেতনা ফিরে গেছে অতীতের স্বপ্নমধুর উৎসে। বিশেষতঃ কালিদাসের কাল এবং বৈষ্ণব কাব্যে বর্ণিত প্রাচীন বৃন্দাবনকেই কবিহৃদয় লীলাঙ্গনরূপে নির্বাচন করেছে। বলা বাহুল্য, এর পেছনে রয়েছে 'মেঘদূত' এবং বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ্মপ্রভাব। 'পত্র' কবিতাতে 'মেঘদূত' কবিতায় এই অতীতমোহ সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম উজ্জ্বল রেখায় সুপরিস্ফুট হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে 'নবমেঘদূত' রচনা করেছেন, 'মেঘদূতে' বর্ণিত প্রাচীন ভারতের জীবনচিত্রকে প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করে তুলেছেন, অথচ তার মধ্যে কোনো সচেতন প্রয়াসের চিহ্ন নেই। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিবিচিত্রা তাঁকে এমনভাবে আবিষ্ট করেছিল যে তাকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ উপাদানের মতোই গ্রহণ করেছিলেন। 'মেঘদূতে'র অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি আক্ষরিকভাবে কালিদাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মেঘদূতে'র অষ্টম স্তবকের প্রায় সবটুকু এবং নবম স্তবকেরও কিছু কিছু অংশ কালিদাসের আক্ষরিক অনুসরণ। 'মেঘদূত' রবীন্দ্রনাথের অতীতপ্রয়াসী কল্পনার একটি সার্থক সৃষ্টি।

প্রাচীন ভারতের এই মায়ামেদুর কল্প-জগৎকে রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'কল্পনা' কাব্যে। 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে বর্ষাচিত্র অঙ্কন করেছেন, সেখানে পরিস্ফুট হয়েছে কালিদাসীয় ভারতবর্ষের পটভূমি। ঋতুসংহার, মেঘদূত এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দের বর্ণসম্পাতে রবীন্দ্রনাথ এখানে যে পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন তা সর্বতোভাবে কালিদাসের যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'ক্ষণিকা'র একাধিক কবিতাও (সেকাল/ জন্মান্তর) প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের কবিতাতে ঠিক এই ধরনের কল্পলোক সৃষ্টির আবেগতপ্ত বাসনা দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতবর্ষের উল্লেখ সেক্ষেত্রে হয় তো আছে, কালিদাসের প্রভাবও কিছু কম নেই—কিন্তু কবি সেখানে মুখ্যতঃ রূপদর্শী নন, তত্ত্বদর্শী। প্রসঙ্গতঃ 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বিচ্ছেদ' কিংবা 'সানাই' কাব্যের 'যক্ষ' কবিতার কথা মনে করা যেতে পারে। দুটি কবিতাতেই বিরহ-তত্ত্বের পরিস্ফুটনই কবির লক্ষ্য। কালিদাসের যুগের ভারতবর্ষের যে উল্লেখ আছে তা মেঘদূতের অনুগত হলেও, সেই কল্পলোকসৃষ্টির বিশদ আকাঙ্ক্ষা (যা মানসীর 'মেঘদূতে' বা 'কল্পনা' কাব্যে আমরা দেখেছি) এখানে অনুপস্থিত। বলা যেতে পারে, শেষপর্বের কবিতায় কালিদাসের যুগ রোম্যান্টিক কবির কাছে আর সেই তীব্র জীবনবাসনার তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয় নি—হয়, কবির বিভিন্ন বক্তব্যের অনুষঙ্গে এসেছে, নতুবা চিত্রগীতময়ী বিশদ বর্ণনার বদলে এক প্রতীকী মহিমায় উপস্থিত হয়েছে।

(৩)

প্রাচীন ভারতবর্ষ যে কবির কাছে শুধুমাত্র কল্পবিলাসের আশ্রয় ছিল না, তা যে একটি গভীর বিশ্বাসের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল তা 'চৈতালি'-কাব্যরচনার যুগ থেকেই পরিস্ফুট হতে শুরু করেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের কবি-প্রতিনিধি কালিদাসের কাব্যেই আধুনিক কবি শাশ্বত প্রাচীন ভারতকে দেখতে পেলেন। তবে মনে রাখতে হবে, প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি কবির এই অনুরাগ মূলতঃ কালিদাসের কাব্য ও নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কবির এই অনুরাগ যে কাব্য থেকেই সংক্রামিত, তত্ত্ব বা ধর্মপ্রণালী থেকে নয়, তার বাহ্য প্রমাণ তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি থেকেই পাওয়া যেতে পারে—

"আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বারবার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই।"

[আত্মপরিচয় : ৬-সংখ্যক প্রবন্ধ]

'চৈতালি' কাব্যের একাধিক কবিতায় তপোবন-জীবনাদর্শের বন্দনাগীতি গাওয়া হয়েছে। যেমন 'তপোবন' কবিতায়—

"মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাত বায়ে,···
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা, পক্বকেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।"

'বনে ও রাজ্যে', 'সভ্যতার প্রতি', 'বন', 'প্রাচীন ভারত' প্রভৃতি কবিতাতেও প্রাচীন জীবনাদর্শেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শকে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। এখানেও অবশ্য কালিদাসের স্তুতিমূলক কয়েকটি কবিতা আছে (যেমন—'কালিদাসের প্রতি', 'কাব্য', 'মানসলোক'), কালিদাসকে অনুসরণ করে কয়েকটি কবিতায় কল্পলোক-সৃষ্টির প্রয়াস আছে (যেমন—'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'মিলনদৃশ্য', 'কুমারসম্ভব গান'), কিন্তু মুখ্যতঃ কল্পচারণা অপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই এই সময় থেকে রবীন্দ্রকাব্যে অধিকতর প্রাধান্য পেতে শুরু করে। রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন—"Aesthetics ছাড়িয়া এখন Ethics সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে।"

'কথা ও কাহিনী' প্রেরণার দিক থেকে প্রাচীন ভাবাদর্শ এবং আকারে ও অবয়বে প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের অনুসরণ করেছে। এগুলির আবির্ভাব ভারতীয় ত্যাগ ও শক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত কবিমানস থেকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের যে সহজ অবস্থানভূমিতে একদিকে ছিল রাজ্যলিপ্সা, ধর্মবিদ্বেষ, হত্যা, ব্যভিচার, ঈর্ষা প্রভৃতি এবং অন্যদিকে ক্ষমা, ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা, ধর্মসাধনা, নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ— রবীন্দ্রনাথ সেই পাপপুণ্যের যুগ্ম প্রতিষ্ঠাপীঠে দাঁড়িয়ে এই দ্বৈত জীবনলীলার সঙ্গে একটি গভীর একাত্মতা অনুভব করেছেন। বিশেষতঃ 'কথা'-য় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা, ধর্মসাধনা ও সাধারণ পারিবারিক জীবনসমস্যা কবিসত্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ধর্মের দৃপ্ত অনুশাসন ও ইতিহাসের অরোধ্য ঘটনাসঙ্কট—এই দ্বিবিধ প্রেরণায় মানবমনের বিচিত্র প্রতিক্রিয়াই 'কথা'য় বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধযুগ-সম্পর্কিত কাহিনীর মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'মূল্যপ্রাপ্তি'

ও 'নগরলক্ষ্মী'—এই পাঁচটি কবিতাই উল্লেখ্য। বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ কবিতাগুলিতে নিবিড় ছায়াপাত করেছে। 'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় সুপ্রিয়ার সংযত আত্মআবিষ্কারে বৌদ্ধধর্মের শান্তরসাস্পদ দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। 'পূজারিণী' ও 'অভিসার' কবিতাদ্বয়ে সৌন্দর্যের ও আবেগের বর্ণময়তা সঞ্চারিত হয়েছে। 'পূজারিণী'র প্রথমাংশেই বিম্বিসার-অজাতশত্রুর ধর্মাদর্শের বৈপরীত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচিত হয়েছে—

"অজাতশত্রু রাজা হল যবে
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।"

এই বিরোধের প্রেক্ষাপটেই শ্রীমতীর সকরুণ আত্মদানের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মসাধনা থেকেও কবি প্রেরণা সঞ্চয় করেছেন। 'প্রতিনিধি' কবিতায় শিবাজির গুরু রামদাসের ভিক্ষাব্রত সম্বন্ধে সংশয়-নিরসন, গুরুর প্রতি রাজ্যসমর্পণ ও গুরুর প্রতিনিধিরূপে নিষ্কামভাবে রাজ্যপরিচালনার দুরূহ দায়িত্ব-গ্রহণ—এই আদর্শময় আখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে। 'অপমান বর'-এ কবীরের ঈশ্বরসাধনায় সম্মান-বিমুখতা ও অহেতুক নিন্দাবরণ—রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনদর্শনের অনুরূপ হিসাবে সমর্থন লাভ করেছে। এছাড়াও 'স্বামীলাভ' ও 'স্পর্শমণি' কবিতাদুটি মধ্যযুগের ভারতবর্ষের আদর্শসুন্দর মাহাত্ম্যের পরিচায়ক।[১]

১ মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ত্যাগ ও আদর্শমহিম রূপটি রবীন্দ্রনাথকে বারংবার আকর্ষণ করেছে; কবিতায় নানাভাবে সেই আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'শুচি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নানসমাপন' কবিতাগুলি স্মরণীয়।

'কথা'র অবশিষ্ট কবিতাবলীতে ইতিহাসের তীব্র প্রাণস্রোত ও দুরূহ জীবনসমস্যার প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। শিখজীবনের আদর্শ অবলম্বনে লেখা 'গুরুগোবিন্দ', 'শেষ ভিক্ষা', 'বন্দীবীর' কবিতাগুলি স্মরণীয়। স্বদেশ-চেতনার মহামন্ত্রে উদ্বোধিত কবিসত্তার পরিচয় এই কবিতাগুলি বহন করে। এই কবিতাবলীতে রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসকেই গ্রহণ করেছেন এবং তার বর্ণাঢ্য রূপচিত্রণ অপেক্ষা আদর্শ-অনুসন্ধানেই অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। রাজপুত ও মারাঠা জীবন অবলম্বনে লেখা 'নকলগড়', 'হোরিখেলা', 'বিবাহ' 'রাজবিচার', 'মানী', 'বিচারক' কবিতাগুলি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য।

'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলির বিষয়বস্তু প্রায়ই অতীতযুগের ইতিহাসাশ্রয়ী, বর্তমান জীবন থেকে সুদূর ব্যবধানে সন্নিবিষ্ট, এবং উদার ও মহান ভাবের বাহন। এখানে কবির রূপতন্ময়তার কোনো নিদর্শন নেই, বরং মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেশপ্রীতি ও বীরত্ব, মহৎ আত্মত্যাগ ও নৈতিক সমুন্নতির আদর্শটিকে কবি আবিষ্কার করেছেন।

নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়মাস। উপনিষদের প্রতি কবির স্বকীয় অনুরাগ এই সময় থেকেই যথার্থ পরিস্ফুট হতে শুরু করে। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যাদর্শের ও ধর্মাদর্শের প্রতি অনুরাগ মোটামুটি ১৩০৩ থেকেই কবিচিত্তকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। তার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ 'নৈবেদ্য' কাব্যে আমরা প্রথম রবীন্দ্রনাথের গভীর ভগবদনুরাগের পরিচয় পেলাম। এর পূর্বে কবি ইতস্ততঃভাবে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা

করলেও বাহ্য প্রেরণার বশবর্তী হয়েই তা করেছেন, মনে হয় এত গভীরতায় তাঁর মন তখনো প্রবেশ করে নি। নৈবেদ্যের ব্রহ্মসঙ্গীত-গুলি এদিক থেকে অনেক পরিমাণে স্বতঃ-উৎসারিত বলা যেতে পারে।

নৈবেদ্যের চতুর্দশপদী কবিতাগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্বন্ধে কবির দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে। এখানে কবি শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতের রূপচিত্র অঙ্কন করে বা সেই যুগের স্তুতিরচনা করেই ক্ষান্ত হন নি—এখানে তিনি প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শকেই বর্তমান জড়তাগ্রস্ত ভারতবর্ষের মুক্তির পন্থা বলে মনে করেছেন। কবি এখানে বারংবার বর্তমান ভারতের পাশ্চাত্য-মোহ-গ্রস্ত অবিবেকী জীবন-ধারাকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনধর্মের ত্যাগ ও তিতিক্ষার মন্ত্রে।[২] ৬০-সংখ্যক কবিতায় সেই প্রাচীন ভারতের মর্মকথাকে, উপনিষদের একটি মন্ত্রকে কবি স্মরণ করেছেন—

"একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্‌প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।'"

জীবনের উপান্তে এসেও এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েই কবি বলতে পেরেছেন—

"জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর
দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃত-রূপে বিশ্বের প্রকাশ।"
(রোগশয্যায় : ২৫-সংখ্যক কবিতা)

নৈবেদ্যের ৯৪-সংখ্যক সনেটে প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্যাগের শিক্ষাকেই পরম অভিজ্ঞান স্বরূপ জেনেছেন কবি। তাই বলেছেন—

"ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল;
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখ সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষ বিভিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথ-কে আকর্ষণ করেছে তার জীবনের বিভিন্ন পর্বে। কখনো তা হয়ে উঠেছে শুধু কল্পনার চারণতীর্থ,

২ এই তপোবন-আদর্শের সুন্দর ব্যাখ্যা আছে 'শান্তি-নিকেতন' প্রবন্ধমালার প্রথম খণ্ডে 'আশ্রম' ও 'তপোবন শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে।

(ক) "এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূত-কালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে—সর্বভূতেষু চাত্মানং—আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করছে।"
[শান্তিনিকেতন—প্রথম খণ্ড : পৃ : ২৩০]

(খ) "যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি...... মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়মে'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা; ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।"
[সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থের ভূমিকা : 'রবীন্দ্র-জীবনী' দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬]

আবার কখনো বাস্তব জীবনসমস্যায় প্রপীড়িত সমাজের প্রস্থানভূমি—আদর্শ-জীবনের আশ্রয়। কখনো সুদূর অতীতকে তিনি উজ্জ্বল বর্ণবিভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যে রোমান্টিকের স্বভাব-ব্রতে, আবার কখনো সেই অতীতের ভাবাদর্শ-টুকুকে সক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু জীবনপীঠে। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সার্থক, কারণ ভারতবর্ষ তাঁর কাছে এক অখণ্ড সত্যবোধ হয়ে দেখা দিয়েছিল, ঐতিহ্যের রসকে তিনি মর্মকোষে ধারণ করেছিলেন আজীবন। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে প্রাচীন ভারত তাই একটি জীবন্ত সত্যরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং সেই সত্যের সার্থকতম প্রকাশ ঘটেছে নিঃসন্দেহে তাঁর বিভিন্নযুগের কবিতাধারায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা-নিধান হে রামকৃষ্ণ, জাগো হে হৃদয়-তীরে
স্বার্থ, দ্বন্দ্ব সবই যে আজিও আছে অন্তর ঘিরে।
জীবনে আঁধার আসিছে নামিয়া
আলোর রেখাটি দেখে না তো হিয়া—
হেথায় সেথায় ঘুরিয়া কেবল আঁধারে আসিছে ফিরে॥

উঠিয়াছে ঝড়, উঠেছে তুফান—তরীতে চলেছি একা
সে তরী ভিড়াতে যত চাই, হায়, কূল নাহি যায় দেখা
হৃদয়েতে জাগো ওগো ভগবান
চেতনা-আলোকে ভাসাও এ প্রাণ
সব আঁধারের হোক অবসান সে-আলো-সাগর-তীরে॥

ভগিনী নিবেদিতার দান

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ভগিনী নিবেদিতার ভারতকে স্বদেশ বলিয়া মনেপ্রাণে বরণ করা সম্ভবতঃ বিশ্ব-ইতিহাসের অদ্বিতীয় ঘটনা। ইংলণ্ডের কৃষ্টি-উদ্যান হইতে সংগৃহীত এই নির্মল কুসুম ভারত-মাতার রাতুল চরণে যখন নিবেদিত হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে তাহা এক মাহেন্দ্রক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

বহুমুখী প্রতিভা, সুবিশাল হৃদয়, শুচিশুভ্র চরিত্র আর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া এই শ্বেতাঙ্গিনী বিদুষী যেদিন ভারতবর্ষের সাগর-তীরে আসিয়াছিলেন সেদিন হইতেই তিনি আমাদের 'আত্মার আত্মীয়' হইয়া উঠিয়াছিলেন। জন্মসূত্রে বিদেশিনী হইলেও, তিনি হইয়া উঠিয়াছিলেন ভারতের একান্ত আপনার লোক। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাই যথার্থই বলিয়াছিলেন, 'She was an Indian through and through'. তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে পরমাত্মীয়ার বিয়োগব্যথায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখনী, চোখের জলে লিখিয়াছিলেন :

"এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া
গেলে, হায়,
চ'লে গেলে অল্প-আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়
দেহ রাখি' শৈলমূলে—শংকরের অঙ্কে
মৃতা সতী!
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী
মোদের পুণ্যবতী!"

স্বামী বিবেকানন্দের মানসদুহিতা, রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাশ্বেতা, শ্রীঅরবিন্দের দীপশিখা; আর শ্রীশ্রীমার আদরিণী খুকী নিবেদিতার ভারতীয় সংস্কৃতিতে দান কতখানি, নিবেদিতার জীবন-কাহিনীর সহিত যাহার এতটুকু পরিচয় আছে তিনিই, তাঁহার অকুণ্ঠ জীবনভরা অবদানের আংশিক পরিচয় পাইলেও এই প্রশ্ন করিতে দুঃসাহসী হইবেন না। আবার এত অপরিমেয় তাঁহার দান যে তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ত্রুটিহীন ভাবে উপস্থাপিত করা সত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাস্তবিক ঈশ্বরপ্রেরিত দেবদূতীর ন্যায় এই 'সত্য-শিব-সুন্দর-নন্দিনী', কল্যাণময়ী রমণী ভারতবর্ষ আর ভারতবাসীর জন্য যথাসর্বস্ব দান করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অত্যুক্তি হয় না অবনীন্দ্রনাথের সেই স্পষ্টোক্তি: "ভারতবর্ষকে যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সব চেয়ে বড়"।[১] স্বামী সারদানন্দও এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া লিখিয়াছেন: "পাশ্চাত্যের যে সকল মহাপ্রাণা রমণী দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত ভারতের কল্যাণে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন।"[২] উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের অভিজাত নোবল-পরিবারের দুলালী মার্গারেট আজন্ম পাশ্চাত্য ভোগ-বিলাসময় পরিবেশে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার পরিবেষ্টনে মানুষ হইয়াও কি ভাবে

---

১ 'জোড়াসাঁকোর ধারে'।

২ শ্রীসরলাবালা দাসী প্রণীত 'নিবেদিতায়' স্বামী সারদানন্দ-লিখিত 'ভূমিকা'।

যে দরিদ্র ভারতবর্ষের জন্য আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। বস্তুতঃ এমন কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়ার ইতিহাস, দূরকে আপন এবং পরকে ভাই করিবার এবিধ আশ্চর্য সত্য-কাহিনী, আত্মবিলোপের এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা পুনরাবৃত্তিশীল ইতিহাসেও একাধিকবার ঘটে নাই। এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের দুর্গতি মোচনের জন্য নিবেদিতার সেই নীরব কর্মযোগ আর সরব আকুলতা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছিলেন : "নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।" গুণমুগ্ধ কবি লিখিয়াছিলেন : "ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয় ইহা বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমরা হয়-ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি লাভ করি নাই।" "ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।" এই তপস্বিনী নারীর মহৎ হৃদয় তাঁহার ত্রিকালদর্শী গুরু বহু পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ।" তিনি লিখিতেছেন, "তার ভেতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশঃ, কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় অতি উদার, পবিত্র···নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসে নি।" বস্তুতঃ তিনি শুধু হৃদয় উজাড় করিয়া দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান বা প্রতিষ্ঠা লাভের কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার ছিল না।

প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না নিবেদিতা ভারতে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দের এই কথা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে এদেশে ব্যাপক স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার সর্বাগ্রে প্রয়োজন ; সমগ্র ভারতের সর্ববিধ কল্যাণ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের যৌথ শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই সম্ভব হইতে পারে। বিহঙ্গ যেমন একটিমাত্র পক্ষের সাহায্যে উড়িতে পারে না, তেমনি শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যেই শিক্ষাবিস্তার করিলে দেশ উন্নত হইবে না।

তাঁহার শিক্ষাদর্শ তাঁহার আচার্যদেবের শিক্ষারই অনুবর্তী ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার সহিত তাঁহার সম্যক পরিচিতি ছিল। স্বামী তেজসানন্দের উক্তি প্রণিধানযোগ্য "নিবেদিতা আজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া এবং দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত পরিচিতা হইয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন ভারতীয় নারীর শিক্ষাবেদীমূলে তাহা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[৩] এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, তাঁহার রচিত শিক্ষা-সম্পর্কিত নিজস্ব মতবাদপুষ্ট 'Hints on National Education'—গ্রন্থটি আজও বিদ্বজ্জন-মহলে সমাদৃত হইতেছে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বোস পাড়া লেনে'র ক্ষুদ্র বালিকা বিদ্যালয়টি আদর্শ একটি শিক্ষায়তন হিসাবে পরিগণিত হইতেছে।

শিক্ষা বলিতে নিবেদিতা শুধুমাত্র পুঁথি-সর্বস্ব বিদ্যাকে বুঝিতেন না। শিক্ষার্থীর মনের স্বাধীন ও সাবলীল পরিমার্জন ও বিকাশ, বিদ্যার্থীর সুপ্ত শৌর্যবীর্য ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, মনের উচ্চচিন্তার রুদ্ধ অর্গল মুক্ত-করণ ইহাই ছিল তাঁহার শিক্ষাদর্শের মূল কথা

---

৩ ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ

রবীন্দ্রকাব্যে প্রাচীন ভারত

শ্রীপিনাকেশ সরকার

(১)

শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একই সঙ্গে যুগজাতক এবং যুগাতিশায়ী। "সাম্প্রতে"-র জটিলতা এবং যন্ত্রণাকে তিনি রূপায়িত করে তোলেন এবং অতীত-ভবিষ্যতের সুদূর অধ্যায়ের অভিমুখেও তাঁকে অগ্রসর হতে হয়। কেননা, যিনি কবি তিনি শেষ পর্যন্ত এক অসীম অখণ্ড সত্যকেই পরিপূর্ণভাবে দেখতে চান, এবং সেই পূর্ণদর্শনের জন্য অনেক সময় খণ্ডিত কালসীমাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে তাঁর সহায়ক, অতীতের ঐতিহ্য তাঁকে দীক্ষিত করে তোলে বর্তমানের দর্শনে, ভবিষ্যতের ধ্যানে। একথা শুধুমাত্র রোমান্টিক কবিদের সম্বন্ধেই সত্য নয়, জগতের যে-কোনো মহাকবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মিলটন 'প্যারাডাইস লস্ট' এবং 'প্যারাডাইস রিগেইনড্'-এর কাহিনী-নির্বাচনে বাইবেলকেই আশ্রয় করেছিলেন; কালিদাসের একাধিক কাব্য-নাটকের উপাদান রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ, আর অতদূরে যাবারই বা কী প্রয়োজন? আমাদের মধুসূদন, যিনি বস্তুতঃ বাংলা কাব্যের একমাত্র 'মহা-কবি', তিনি সনেটগুলি ছাড়া বাকী সমস্ত কাব্যেরই উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন পুরাণ-মহাকাব্য থেকে।

অবশ্য এই অতীতপ্রীতি নানা সূত্রে দেখা দিতে পারে। প্রথমতঃ, অতীত যেখানে গতানুগত প্রথা, নির্জীব নিঃসহায় অনুবর্তন। যেমন—মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের তথাকথিত মহাকাব্যে। দ্বিতীয়তঃ, অতীতকে অবলম্বন করে যেখানে বর্তমানের ভাষ্য রচিত হয়। অতীত সেখানে উপকরণমাত্র, কবির আসল উদ্দেশ্য অতীতের শিলাখণ্ডগুলি-মাত্র গ্রহণ করে বর্তমানের মহামন্দির-রচনা। যেমন—মধুসূদনের মেঘনাদবধ কিংবা বীরাঙ্গনা কাব্যে। তৃতীয়তঃ, অতীত যেক্ষেত্রে কবির স্বপ্নচারণার আশ্রয়, তাঁর ক্লান্ত শ্রান্ত বিক্ষত হৃদয়ের কোমল উপশম, এমন কি আদর্শ জীবনের রূপ। যেমন—কীট্সের কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায়।

অন্যান্য যে-কোনো রোম্যান্টিক কবির মতোই রবীন্দ্রনাথ অতীতের ছায়াধূসর পথে বারংবার ফিরে গেছেন। সে অতীত একদিকে স্থানকালপাত্ররহিত 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশ', চূড়ান্তভাবে বিশুদ্ধভাবে পুরাতন। পুরাতন বললেও বোধহয় ভুল হবে, বলা উচিত 'অনন্ত'। 'অনাদিকালের হৃদয় উৎস' সেই অতীতের ঠিকানা। সে অতীতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, কাল নেই, পাত্র নেই। তার কোনো সুস্পষ্ট রূপচিত্র অঙ্কন করা যায় না। এই 'পুরাতন' একটি শাশ্বত, রূপহীন, দার্শনিক সত্যের মতো।

কিন্তু আরেক রবীন্দ্রনাথকেও আমরা চিনি, যিনি অতীতের একটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপশ্রী রচনা করে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। সে অতীতে ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল স্বপ্নকল্প নগরী, শ্যামচ্ছায়া-ঘন জনপদ—সমগ্রভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষ। আরও দূর অতীতে, আশ্রম-জীবনের সন্নিধানেও কবি ফিরে গেছেন। বেদ-উপনিষদের মন্ত্রধ্বনিত তপোবন-জীবনকে, সভ্যতার সেই অরুণলগ্নকেও কবি নানাভাবে স্মরণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ

বলে রাখা ভালো, অতীত ভারত বলতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, এবং কালিদাসের যুগের ভারতকেই বুঝিয়েছেন। সংঘর্ষচিহ্নিত পাঠান বা মুঘলযুগ তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। 'কথা ও কাহিনী'র অনেক কবিতায় পাঠান-মুঘল যুগের পটভূমি রয়েছে সত্য, কিন্তু সেখানে তিনি মূলতঃ আদর্শ-লোকের স্রষ্টা, বিশুদ্ধ স্বপ্নকল্পনা সেখানে নেই।

(২)

মানসী কাব্য রচনার সময় থেকেই অতীত-প্রীতির সূচনা এমন বললে ভুল হবে না। মানসীর 'একাল ও সেকাল' কবিতায় বর্ষার মেঘমেদুর সজলগম্ভীর রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতে করতে কবির চেতনা ফিরে গেছে অতীতের স্বপ্নমধুর উৎসে। বিশেষতঃ কালিদাসের কাল এবং বৈষ্ণব কাব্যে বর্ণিত প্রাচীন বৃন্দাবনকেই কবিহৃদয় লীলাঙ্গনরূপে নির্বাচন করেছে। বলা বাহুল্য, এর পেছনে রয়েছে 'মেঘদূত' এবং বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ্মপ্রভাব। 'পত্র' কবিতাতে 'মেঘদূত' কবিতায় এই অতীতমোহ সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম উজ্জ্বল রেখায় সুপরিস্ফুট হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে 'নবমেঘদূত' রচনা করেছেন, 'মেঘদূতে' বর্ণিত প্রাচীন ভারতের জীবনচিত্রকে প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করে তুলেছেন, অথচ তার মধ্যে কোনো সচেতন প্রয়াসের চিহ্ন নেই। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিবিচিত্রা তাঁকে এমনভাবে আবিষ্ট করেছিল যে তাকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ উপাদানের মতোই গ্রহণ করেছিলেন। 'মেঘদূতে'র অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি আক্ষরিকভাবে কালিদাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মেঘদূতে'র অষ্টম স্তবকের প্রায় সবটুকু এবং নবম স্তবকেরও কিছু কিছু অংশ কালিদাসের আক্ষরিক অনুসরণ। 'মেঘদূত' রবীন্দ্রনাথের অতীতপ্রয়াসী কল্পনার একটি সার্থক সৃষ্টি।

প্রাচীন ভারতের এই মায়ামেদুর কল্প-জগৎকে রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'কল্পনা' কাব্যে। 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে বর্ষাচিত্র অঙ্কন করেছেন, সেখানে পরিস্ফুট হয়েছে কালিদাসীয় ভারতবর্ষের পটভূমি। ঋতুসংহার, মেঘদূত এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দের বর্ণসম্পাতে রবীন্দ্রনাথ এখানে যে পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন তা সর্বতোভাবে কালিদাসের যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'ক্ষণিকা'র একাধিক কবিতাও (সেকাল/ জন্মান্তর) প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের কবিতাতে ঠিক এই ধরনের কল্পলোক সৃষ্টির আবেগতপ্ত বাসনা দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতবর্ষের উল্লেখ সেক্ষেত্রে হয় তো আছে, কালিদাসের প্রভাবও কিছু কম নেই—কিন্তু কবি সেখানে মুখ্যতঃ রূপদর্শী নন, তত্ত্বদর্শী। প্রসঙ্গতঃ 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বিচ্ছেদ' কিংবা 'সানাই' কাব্যের 'যক্ষ' কবিতার কথা মনে করা যেতে পারে। দুটি কবিতাতেই বিরহ-তত্ত্বের পরিস্ফুটনই কবির লক্ষ্য। কালিদাসের যুগের ভারতবর্ষের যে উল্লেখ আছে তা মেঘদূতের অনুগত হলেও, সেই কল্পলোকসৃষ্টির বিশদ আকাঙ্ক্ষা (যা মানসীর 'মেঘদূতে' বা 'কল্পনা' কাব্যে আমরা দেখেছি) এখানে অনুপস্থিত। বলা যেতে পারে, শেষপর্বের কবিতায় কালিদাসের যুগ রোম্যান্টিক কবির কাছে আর সেই তীব্র জীবনবাসনার তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয় নি—হয়, কবির বিভিন্ন বক্তব্যের অনুষঙ্গে এসেছে, নতুবা চিত্রগীতময়ী বিশদ বর্ণনার বদলে এক প্রতীকী মহিমায় উপস্থিত হয়েছে।

(৩)

প্রাচীন ভারতবর্ষ যে কবির কাছে শুধুমাত্র কল্পবিলাসের আশ্রয় ছিল না, তা যে একটি গভীর বিশ্বাসের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল তা 'চৈতালি'-কাব্যরচনার যুগ থেকেই পরিস্ফুট হতে শুরু করেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের কবি-প্রতিনিধি কালিদাসের কাব্যেই আধুনিক কবি শাশ্বত প্রাচীন ভারতকে দেখতে পেলেন। তবে মনে রাখতে হবে, প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি কবির এই অনুরাগ মূলতঃ কালিদাসের কাব্য ও নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কবির এই অনুরাগ যে কাব্য থেকেই সংক্রামিত, তত্ত্ব বা ধর্মপ্রণালী থেকে নয়, তার বাহ্য প্রমাণ তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি থেকেই পাওয়া যেতে পারে—

"আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বারবার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই।"

[আত্মপরিচয় : ৬-সংখ্যক প্রবন্ধ]

'চৈতালি' কাব্যের একাধিক কবিতায় তপোবন-জীবনাদর্শের বন্দনাগীতি গাওয়া হয়েছে। যেমন 'তপোবন' কবিতায়—

"মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাত বায়ে,...
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা, পক্বকেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।"

'বনে ও রাজ্যে', 'সভ্যতার প্রতি', 'বন', 'প্রাচীন ভারত' প্রভৃতি কবিতাতেও প্রাচীন জীবনাদর্শেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শকে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। এখানেও অবশ্য কালিদাসের স্তুতিমূলক কয়েকটি কবিতা আছে (যেমন—'কালিদাসের প্রতি', 'কাব্য', 'মানসলোক'), কালিদাসকে অনুসরণ করে কয়েকটি কবিতায় কল্পলোক-সৃষ্টির প্রয়াস আছে (যেমন—'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'মিলনদৃশ্য', 'কুমারসম্ভব গান'), কিন্তু মুখ্যতঃ কল্পচারণা অপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই এই সময় থেকে রবীন্দ্রকাব্যে অধিকতর প্রাধান্য পেতে শুরু করে। রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন—"Aesthetics ছাড়িয়া এখন Ethics সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে।"

'কথা ও কাহিনী' প্রেরণার দিক থেকে প্রাচীন ভাবাদর্শ এবং আকারে ও অবয়বে প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের অনুসরণ করেছে। এগুলির আবির্ভাব ভারতীয় ত্যাগ ও শক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত কবিমানস থেকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের যে সহজ অবস্থানভূমিতে একদিকে ছিল রাজ্যলিপ্সা, ধর্মবিদ্বেষ, হত্যা, ব্যভিচার, ঈর্ষা প্রভৃতি এবং অন্যদিকে ক্ষমা, ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা, ধর্মসাধনা, নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ—রবীন্দ্রনাথ সেই পাপপুণ্যের যুগ্ম প্রতিষ্ঠাপীঠে দাঁড়িয়ে এই দ্বৈত জীবনলীলার সঙ্গে একটি গভীর একাত্মতা অনুভব করেছেন। বিশেষতঃ 'কথা'-য় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা, ধর্মসাধনা ও সাধারণ পারিবারিক জীবনসমস্যা কবিসত্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ধর্মের দৃপ্ত অনুশাসন ও ইতিহাসের অরোধ্য ঘটনাসঙ্কট—এই দ্বিবিধ প্রেরণায় মানবমনের বিচিত্র প্রতিক্রিয়াই 'কথা'য় বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধযুগ-সম্পর্কিত কাহিনীর মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'মূল্যপ্রাপ্তি'

ও 'নগরলক্ষ্মী'—এই পাঁচটি কবিতাই উল্লেখ্য। বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ কবিতাগুলিতে নিবিড় ছায়াপাত করেছে। 'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় সুপ্রিয়ার সংযত আত্মআবিষ্কারে বৌদ্ধধর্মের শান্তরসাস্পদ দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। 'পূজারিণী' ও 'অভিসার' কবিতাদ্বয়ে সৌন্দর্যের ও আবেগের বর্ণময়তা সঞ্চারিত হয়েছে। 'পূজারিণী'র প্রথমাংশেই বিম্বিসার-অজাতশত্রুর ধর্মাদর্শের বৈপরীত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচিত হয়েছে—

"অজাতশত্রু রাজা হল যবে
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।"

এই বিরোধের প্রেক্ষাপটেই শ্রীমতীর সকরুণ আত্মদানের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মসাধনা থেকেও কবি প্রেরণা সঞ্চয় করেছেন। 'প্রতিনিধি' কবিতায় শিবাজির গুরু রামদাসের ভিক্ষাব্রত সম্বন্ধে সংশয়-নিরসন, গুরুর প্রতি রাজ্যসমর্পণ ও গুরুর প্রতিনিধিরূপে নিষ্কামভাবে রাজ্যপরিচালনার দুরূহ দায়িত্ব-গ্রহণ—এই আদর্শময় আখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে। 'অপমান বর'-এ কবীরের ঈশ্বরসাধনায় সম্মান-বিমুখতা ও অহেতুক নিন্দাবরণ—রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনদর্শনের অনুরূপ হিসাবে সমর্থন লাভ করেছে। এছাড়াও 'স্বামীলাভ' ও 'স্পর্শমণি' কবিতাদুটি মধ্যযুগের ভারতবর্ষের আদর্শসুন্দর মাহাত্ম্যের পরিচায়ক।[১]

'কথা'র অবশিষ্ট কবিতাবলীতে ইতিহাসের তীব্র প্রাণস্রোত ও দুরূহ জীবনসমস্যার প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। শিখজীবনের আদর্শ অবলম্বনে লেখা 'গুরুগোবিন্দ', 'শেষ ভিক্ষা', 'বন্দীবীর' কবিতাগুলি স্মরণীয়। স্বদেশ-চেতনার মহামন্ত্রে উদ্বোধিত কবিসত্তার পরিচয় এই কবিতাগুলি বহন করে। এই কবিতাবলীতে রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসকেই গ্রহণ করেছেন এবং তার বর্ণাঢ্য রূপচিত্রণ অপেক্ষা আদর্শ-অনুসন্ধানেই অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। রাজপুত ও মারাঠা জীবন অবলম্বনে লেখা 'নকলগড়', 'হোরিখেলা', 'বিবাহ' 'রাজবিচার', 'মানী', 'বিচারক' কবিতাগুলি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য।

'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলির বিষয়বস্তু প্রায়ই অতীতযুগের ইতিহাসাশ্রয়ী, বর্তমান জীবন থেকে সুদূর ব্যবধানে সন্নিবিষ্ট, এবং উদার ও মহান ভাবের বাহন। এখানে কবির রূপতন্ময়তার কোনো নিদর্শন নেই, বরং মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেশপ্রীতি ও বীরত্ব, মহৎ আত্মত্যাগ ও নৈতিক সমুন্নতির আদর্শটিকে কবি আবিষ্কার করেছেন।

নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়মাস। উপনিষদের প্রতি কবির স্বকীয় অনুরাগ এই সময় থেকেই যথার্থ পরিস্ফুট হতে শুরু করে। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যাদর্শের ও ধর্মাদর্শের প্রতি অনুরাগ মোটামুটি ১৩০৩ থেকেই কবিচিত্তকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। তার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ 'নৈবেদ্য' কাব্যে আমরা প্রথম রবীন্দ্রনাথের গভীর ভগবদনুরাগের পরিচয় পেলাম। এর পূর্বে কবি ইতস্ততঃভাবে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা

১ মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ত্যাগ ও আদর্শমহিম রূপটি রবীন্দ্রনাথকে বারংবার আকর্ষণ করেছে; কবিতায় নানাভাবে সেই আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'শুচি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নানসমাপন' কবিতাগুলি স্মরণীয়।

করলেও বাহ্য প্রেরণার বশবর্তী হয়েই তা করেছেন, মনে হয় এত গভীরতায় তাঁর মন তখনো প্রবেশ করে নি। নৈবেদ্যের ব্রহ্মসঙ্গীত-গুলি এদিক থেকে অনেক পরিমাণে স্বতঃ-উৎসারিত বলা যেতে পারে।

নৈবেদ্যের চতুর্দশপদী কবিতাগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্বন্ধে কবির দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে। এখানে কবি শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতের রূপচিত্র অঙ্কন করে বা সেই যুগের স্তুতিরচনা করেই ক্ষান্ত হন নি—এখানে তিনি প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শকেই বর্তমান জড়তাগ্রস্ত ভারতবর্ষের মুক্তির পন্থা বলে মনে করেছেন। কবি এখানে বারংবার বর্তমান ভারতের পাশ্চাত্য-মোহ-গ্রস্ত অবিবেকী জীবন-ধারাকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনধর্মের ত্যাগ ও তিতিক্ষার মন্ত্রে।[২] ৬০-সংখ্যক কবিতায় সেই প্রাচীন ভারতের মর্মকথাকে, উপনিষদের একটি মন্ত্রকে কবি স্মরণ করেছেন—

"একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্‌প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।'"

জীবনের উপান্তে এসেও এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েই কবি বলতে পেরেছেন—

"জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর
দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃত-রূপে বিশ্বের প্রকাশ।"
(রোগশয্যায় : ২৫-সংখ্যক কবিতা)

নৈবেদ্যের ৯৪-সংখ্যক সনেটে প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্যাগের শিক্ষাকেই পরম অভিজ্ঞান স্বরূপ জেনেছেন কবি। তাই বলেছেন—

"ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখ সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষ বিভিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথ-কে আকর্ষণ করেছে তার জীবনের বিভিন্ন পর্বে। কখনো তা হয়ে উঠেছে শুধু কল্পনার চারণতীর্থ,

২ এই তপোবন-আদর্শের সুন্দর ব্যাখ্যা আছে 'শান্তি-নিকেতন' প্রবন্ধমালার প্রথম খণ্ডে 'আশ্রম' ও 'তপোবন শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে।

(ক) "এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূত-কালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে—সর্বভূতেষু চাত্মানং—আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করছে।"
[শান্তিনিকেতন—প্রথম খণ্ড : পৃ : ২৩০]

(খ) "যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি...... মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই মিলেনিয়মে'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা; ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।"
[সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থের ভূমিকা : 'রবীন্দ্র-জীবনী' দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬]

আবার কখনো বাস্তব জীবনসমস্যায় প্রপীড়িত সমাজের প্রস্থানভূমি—আদর্শ-জীবনের আশ্রয়। কখনো সুদূর অতীতকে তিনি উজ্জ্বল বর্ণবিভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যে রোমান্টিকের স্বভাব-ব্রতে, আবার কখনো সেই অতীতের ভাবাদর্শ-টুকুকে সক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু জীবনপীঠে। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সার্থক, কারণ ভারতবর্ষ তাঁর কাছে এক অখণ্ড সত্যবোধ হয়ে দেখা দিয়েছিল, ঐতিহ্যের রসকে তিনি মর্মকোষে ধারণ করেছিলেন আজীবন। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে প্রাচীন ভারত তাই একটি জীবন্ত সত্তারূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং সেই সত্যের সার্থকতম প্রকাশ ঘটেছে নিঃসন্দেহে তাঁর বিভিন্নযুগের কবিতাধারায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা-নিধান হে রামকৃষ্ণ, জাগো হে হৃদয়-তীরে
স্বার্থ, দ্বন্দ্ব সবই যে আজিও আছে অন্তর ঘিরে।
জীবনে আঁধার আসিছে নামিয়া
আলোর রেখাটি দেখে না তো হিয়া—
হেথায় সেথায় ঘুরিয়া কেবল আঁধারে আসিছে ফিরে॥

উঠিয়াছে ঝড়, উঠেছে তুফান—তরীতে চলেছি একা
সে তরী ভিড়াতে যত চাই, হায়, কূল নাহি যায় দেখা
হৃদয়েতে জাগো ওগো ভগবান
চেতনা-আলোকে ভাসাও এ প্রাণ
সব আঁধারের হোক অবসান সে-আলো-সাগর-তীরে॥

ভগিনী নিবেদিতার দান

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ভগিনী নিবেদিতার ভারতকে স্বদেশ বলিয়া মনেপ্রাণে বরণ করা সম্ভবতঃ বিশ্ব-ইতিহাসের অদ্বিতীয় ঘটনা। ইংলণ্ডের কৃষ্টি-উদ্যান হইতে সংগৃহীত এই নির্মল কুসুম ভারত-মাতার রাতুল চরণে যখন নিবেদিত হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে তাহা এক মাহেন্দ্রক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

বহুমুখী প্রতিভা, সুবিশাল হৃদয়, শুচিশুভ্র চরিত্র আর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া এই শ্বেতাঙ্গিনী বিদুষী যেদিন ভারতবর্ষের সাগর-তীরে আসিয়াছিলেন সেদিন হইতেই তিনি আমাদের 'আত্মার আত্মীয়' হইয়া উঠিয়াছিলেন। জন্মসূত্রে বিদেশিনী হইলেও, তিনি হইয়া উঠিয়াছিলেন ভারতের একান্ত আপনার লোক। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাই যথার্থই বলিয়াছিলেন, 'She was an Indian through and through'. তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে পরমাত্মীয়ার বিয়োগব্যথায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখনী, চোখের জলে লিখিয়াছিলেন :

"এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া
গেলে, হায়,
চ'লে গেলে অল্প-আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়
দেহ রাখি' শৈলমূলে—শংকরের অঙ্কে
মৃতা সতী!
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী
মোদের পুণ্যবতী!"

স্বামী বিবেকানন্দের মানসদুহিতা, রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাশ্বেতা, শ্রীঅরবিন্দের দীপশিখা; আর শ্রীশ্রীমার আদরিণী খুকী নিবেদিতার ভারতীয় সংস্কৃতিতে দান কতখানি, নিবেদিতার জীবন-কাহিনীর সহিত যাহার এতটুকু পরিচয় আছে তিনিই, তাঁহার অকুণ্ঠ জীবনভরা অবদানের আংশিক পরিচয় পাইলেও এই প্রশ্ন করিতে দুঃসাহসী হইবেন না। আবার এত অপরিমেয় তাঁহার দান যে তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ত্রুটিহীন ভাবে উপস্থাপিত করা সত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাস্তবিক ঈশ্বরপ্রেরিত দেবদূতীর ন্যায় এই 'সত্য-শিব-সুন্দর-নন্দিনী', কল্যাণময়ী রমণী ভারতবর্ষ আর ভারতবাসীর জন্য যথাসর্বস্ব দান করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অত্যুক্তি হয় না অবনীন্দ্রনাথের সেই স্পষ্টোক্তি : "ভারতবর্ষকে যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সব চেয়ে বড়"।[১] স্বামী সারদানন্দও এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া লিখিয়াছেন : "পাশ্চাত্যের যে সকল মহাপ্রাণা রমণী দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত ভারতের কল্যাণে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন।"[২] উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের অভিজাত নোবল-পরিবারের দুলালী মার্গারেট আজন্ম পাশ্চাত্য ভোগ-বিলাসময় পরিবেশে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার পরিবেষ্টনে মানুষ হইয়াও কি ভাবে

---

১ 'জোড়াসাঁকোর ধারে'।

২ শ্রীসরলাবালা দাসী প্রণীত 'নিবেদিতায়' স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'ভূমিকা'

যে দরিদ্র ভারতবর্ষের জন্য আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। বস্তুতঃ এমন কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়ার ইতিহাস, দূরকে আপন এবং পরকে ভাই করিবার এবিধ আশ্চর্য সত্য-কাহিনী, আত্মবিলোপের এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা পুনরাবৃত্তিশীল ইতিহাসেও একাধিকবার ঘটে নাই। এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের দুর্গতি মোচনের জন্য নিবেদিতার সেই নীরব কর্মযোগ আর সরব আকুলতা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছিলেন : "নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।" গুণমুগ্ধ কবি লিখিয়াছিলেন : "ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয় ইহা বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমরা হয়-ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি লাভ করি নাই।" "ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।" এই তপস্বিনী নারীর মহৎ হৃদয় তাঁহার ত্রিকালদর্শী গুরু বহু পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ।" তিনি লিখিতেছেন, "তার ভেতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশঃ, কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় অতি উদার, পবিত্র···নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসে নি।" বস্তুতঃ তিনি শুধু হৃদয় উজাড় করিয়া দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান বা প্রতিষ্ঠা লাভের কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার ছিল না।

প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না নিবেদিতা ভারতে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দের এই কথা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে এদেশে ব্যাপক স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার সর্বাগ্রে প্রয়োজন; সমগ্র ভারতের সর্ববিধ কল্যাণ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের যৌথ শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই সম্ভব হইতে পারে। বিহঙ্গ যেমন একটিমাত্র পক্ষের সাহায্যে উড়িতে পারে না, তেমনি শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যেই শিক্ষাবিস্তার করিলে দেশ উন্নত হইবে না।

তাঁহার শিক্ষাদর্শ তাঁহার আচার্যদেবের শিক্ষারই অনুবর্তী ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার সহিত তাঁহার সম্যক পরিচিতি ছিল। স্বামী তেজসানন্দের উক্তি প্রণিধানযোগ্য "নিবেদিতা আজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া এবং দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত পরিচিতা হইয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন ভারতীয় নারীর শিক্ষাবেদীমূলে তাহা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[৩] এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, তাঁহার রচিত শিক্ষা-সম্পর্কিত নিজস্ব মতবাদপুষ্ট 'Hints on National Education'—গ্রন্থটি আজও বিদ্বজ্জন-মহলে সমাদৃত হইতেছে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বোস পাড়া লেনে'র ক্ষুদ্র বালিকা বিদ্যালয়টি আদর্শ একটি শিক্ষায়তন হিসাবে পরিগণিত হইতেছে।

শিক্ষা বলিতে নিবেদিতা শুধুমাত্র পুঁথি-সর্বস্ব বিদ্যাকে বুঝিতেন না। শিক্ষার্থীর মনের স্বাধীন ও সাবলীল পরিমার্জন ও বিকাশ, বিদ্যার্থীর সুপ্ত শৌর্যবীর্য ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, মনের উচ্চচিন্তার রুদ্ধ অর্গল মুক্ত-করণ ইহাই ছিল তাঁহার শিক্ষাদর্শের মূল কথা।

---

৩ ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ

দূরদর্শিনী নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন, শিক্ষা শুধু জাতীয়তাবোধ জাগাইবে না; ইহা দেশ-গঠনমূলকও হওয়া চাই। জাতীয়তাভিত্তিক শিক্ষাই ছিল নিবেদিতার অন্তরের কথা। কারণ, তাহার বদ্ধমূল ও নির্ভুল ধারণা ছিল শিক্ষার প্রথম ও প্রাথমিক সোপানেই আন্তর্জাতিকতার স্থান নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিবেদিতার এই 'অদৃশ্য দান'কে আপাতঃদৃষ্টিতে সামান্য মনে হইলেও নিকট ভবিষ্যতের মানুষ ইহার পূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের প্রতি ছিল নিবেদিতার অকৃত্রিম অনুরাগ। প্রসঙ্গক্রমে বলা বিধেয়, উইম্বলডনে "রাস্কিন স্কুলে" অধ্যক্ষা-হিসাবে কাজ করিবার সময় ঘটনাচক্রে তাঁহার সহিত ভুবনবিখ্যাত শিল্পী অবেনজান কুকের সাক্ষাৎকার হয় ও চিত্র ও ভাস্কর্য বিষয়ে বহু গভীর আলোচনা হয়। পরবর্তীকালে, ভারতে আসিয়া তিনি ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে এতদূর বিমোহিত হন যে তৎকালীন তরুণ শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে অজন্তায় পাঠাইয়া 'সুপটু পটুয়ার লীলায়িত তুলিকায়' অঙ্কিত গুহাচিত্রসমূহ অঙ্কন করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্রযোগে অনুরোধ জানান। নিবেদিতা-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে লিখিয়াছিলেন "...নন্দলালদের কত ভালবাসতেন তিনি, কত উৎসাহ দিতেন... নিবেদিতা নইলে নন্দলালের যাওয়া হতো না অজন্তায়। কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি।"[৪] শিল্পী অসিতকুমারও একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে বলেছেন, "আমরা তখনকার কয়েকজন জাতীয় শিল্পকলার পুনরুদ্ধারের জন্য যে কাজ করেছি তাতে ভগিনী নিবেদিতার উৎসাহ যে বল দিয়েছে তা লিখে বোঝানো অসাধ্য"। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীগিরিজা শংকর রায়চৌধুরী নিবেদিতার এই শিল্প-জগতে অসীম দান প্রসঙ্গে লিখিতেছেন: "ভগিনী নিবেদিতা এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিকে সূতিকাগার হইতে বাহির করিয়া ইহার সুদীর্ঘ শৈশবকালে এই নবজাত শিশুকে যে-রূপ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহে লালন পালন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই বিদেশিনী মহিমময়ী মহিলার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে যদি বাঙ্গালী জাতি করজোড়ে দণ্ডায়মান না হয়, তবে তাহার ললাটে অকৃতজ্ঞতার কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। ইতিহাসে যে সম্মান ভগিনী নিবেদিতার প্রাপ্য, আমরা এ যাবৎ তাঁহাকে তাহা দিয়া আসি নাই।"[৫]

ভগিনী নিবেদিতার দান যে কত বেশী আর তাহা কত বিচিত্র আর বিভিন্নভাবে তিনি তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে করিয়া-ছিলেন সে কথা ভাবিলে বিস্ময়ে হতবাক হইতে হয়। আজকের দুনিয়ার মানুষ, যে সমস্ত পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে যাইয়া ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের অনেকেরই জানা নাই যে এই সমস্ত মনীষিবৃন্দের পশ্চাতে সকলের অলক্ষিতে থাকিয়া এক মহীয়সী নারী কত গোপন প্রেরণাই না যোগাইয়া-ছিলেন। ১৭ নং বোসপাড়া লেনের যে ক্ষুদ্র কক্ষে ছিল নিবেদিতার বাস, সেখানে,

৪ জোড়াসাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ

৫ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ('শ্রীঅরবিন্দ'-নামক) প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

সেই গৃহ-প্রাঙ্গণে ভারতের তৎকালীন প্রায় সমস্ত দিক্‌পাল ব্যক্তিরই আগমন হইয়াছিল। সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ও যদুনাথ সরকার, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, শিল্পকলা-বিশারদ অবনীন্দ্রনাথ ও তদানীন্তন উদীয়মান শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিত হালদার, সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডন সোসাইটির সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক দীনেশ সেন, স্বদেশ-প্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বিপিনচন্দ্র পাল, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির নাম ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখনীয়। প্রেরণার প্রতিমূর্তি নিবেদিতার নিকটে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, দেশসেবক, সমাজসংস্কারক ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রগতিশীল চিন্তানায়কগণ প্রেরণার ইন্ধন সংগ্রহ করিয়াছেন। উত্তর জীবনে ইঁহারা দ্ব্যর্থবোধহীন ভাষায় অকুণ্ঠিতভাবে সে ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র যেদিন (১০ই নভেম্বর, ১৯১৭) 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন, সেইদিন তিনি নিবেদিতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইয়া ভাবঘনকণ্ঠে বলিয়াছিলেন: "আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে এই মহীয়সী নারীর প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি।"

স্বামী বিবেকানন্দের পরলোক গমনের পর নিবেদিতার কর্মধারা নূতন একটি খাতে বহিতে শুরু করে। তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল তাঁহার ভাবী কর্মপন্থা নিশ্চিতভাবে তিনি ইহা বুঝিলেন যে রাজনীতিক পরাধীনতার নাগপাশ ভারতের উন্নতির পথের প্রধান অন্তরায়; রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ভিন্ন ভারতের দ্রুত উন্নতি সুদূর-পরাহত। ফলে শীঘ্রই তিনি সাগ্রহে নিজেকে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইল। ইহার জন্য তাঁহার কোনরূপ ভাবের পরিবর্তন হইল না। কারণ, ভারতের সার্বিক উন্নতির প্রাথমিক পর্যায়ে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই পথই সর্বতোভাবে অনুসরণীয়। অচিরেই নিবেদিতা তৎকালীন বিশিষ্ট সংবাদপত্রসমূহে* বিবিধ ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন, ছুটিয়া চলিলেন এক বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে অন্যটিতে। অর্ধজাগরিত ভারতবাসীর কর্ণকুহরে শুনাইলেন দেশাত্মবোধের অগ্নিমন্ত্র, অন্তরে জ্বালাইলেন স্বাদেশিকতার তীব্র অনল। তাঁহার এই সময়কার কার্যধারা সম্পর্কে বলিতে যাইয়া প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখিতেছেন··· "her invaluable writings and speeches inspired thousands of young men with a burning passion to lead higher, truer and nobler lives". এ সময় তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ হইয়া উঠিয়াছিল স্বাদেশিকতার আগুন পোহানোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'ফায়ারপ্লেস্'। সুসাহিত্যিক গিরিজাশংকর মহাশয় বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে নিবেদিতার এই সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "অরবিন্দ বিংশ শতাব্দীর প্রথমে 'আর্য' পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন,

---

* সংবাদপত্রসমূহের নাম: প্রবাসী, ডন, মডার্ন রিভিউ, নিউ ইণ্ডিয়া, নিউ ওয়ার্লড, অমৃতবাজার, হিন্দু, মহারাষ্ট্র, ইন্দুপ্রকাশ। বিদেশী পত্রিকার নাম: বোষ্টন, হেরাল্ড; ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ।

ডন সোসাইটি ছিল তাহার বীজ। এশিয়া এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার একটা প্রেরণা ইহাতে ছিল এবং এই প্রেরণা আসিয়াছিল ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে। অরবিন্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে ভগিনী নিবেদিতা ডন-সোসাইটির তরুণ যুবকদের মধ্য দিয়া নূতন জাতীয়তা-বোধের সঙ্গে বিপ্লবাত্মক রাজনীতি বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত প্রচার করিয়াছিলেন প্রচুর।"[৭] সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে নিবেদিতার নাম মুক্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আমাদের মতন সাধারণ মানুষের প্রতি এক দেবীর অহেতুকী ও অমলা ভালবাসার কথা, নিষ্কাম ও অশেষ অবদানের কথা লিখিবার চেষ্টা করিলাম। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার সর্বস্ব দিয়াছেন। তাঁহার অদেয় কিছু ছিল না, তিনি ছিলেন নিবেদিতা। হৃদয়পাত্র শূন্য করিয়া তিনি শুধু নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের নাম ভারতের প্রতি গৃহকোণে যতদিন মুখরিত হইবে নিবেদিতার নামও ততদিন কেহ ভুলিতে পারিবেন না। বিবেকানন্দের এই মানসকন্যা বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য-জয়ের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন।

মনীষী রোঁমা রোঁলার সেই কথাটি বার বার মনে পড়িতেছে :

"The future will always write her name of initiation, Sister Nivedita, to that of her beloved master—as St. Clara to that of St. Francis".

৭ ৫ নং দ্রষ্টব্য।

বেলুড় মঠে সন্ধ্যায়

শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী

বেলা যায় ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশে,
যেতে হয় তাই যাই ডাক দেয় কিসে!
অদূরে চলেছে গঙ্গা সমুদ্রের কাছে,
যাত্রীদের নৌকাগুলি ঘাটে লাগা আছে।
ভিজে ভিজে মাটি আর মাঠভরা ঘাসে,
অশোক চন্দন তরু উল্লাসেতে হাসে;
এখানে মায়ের স্মৃতি, পৌরুষ ওখানে
উন্মনা অবাক মনে শান্ত করে আনে।

সন্ধ্যার বন্দনা গীতি, পাখোয়াজ সুর
ভেসে ভেসে চলে যায় দূর হতে দূর।
চন্দ্রমলি গোলাপেরা ফোটে মগ্ন মনে,
কেন জানি মনে হয় হেথায় এক্ষণে,
ঘরছাড়া শিশু আমি ফিরেছিনু নীড়ে,
অন্ধকারে প্রহরীরা ডাক দেয় ধীরে॥

শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ*

(৩)

ভগিনী নিবেদিতা

শিক্ষাসম্পর্কে আমাদের ধারণার মধ্যে একটা প্রাণ থাকা চাই। একটা অখণ্ড ঐক্য-বোধ থাকা চাই। শিশুকে তার হৃদয়, মন, ইচ্ছাশক্তি সব মিলিয়ে সমগ্রভাবে দেখতে হবে। যতক্ষণ কোন ব্যক্তির অনুভবশক্তি ও জীবনের লক্ষ্যনির্বাচন নিয়ন্ত্রিত না হয়, ততক্ষণ সে শিক্ষিত পদবাচ্য নয়—বুদ্ধিবৃত্তি-প্রসূত যে কৌশলগুলি সে আয়ত্ত করেছে তার দ্বারা সজ্জিত হয়েছে মাত্র। ঐ কৌশল অবলম্বনে সে অন্নসংস্থান করতে পারে, কিন্তু তার আবেদন হৃদয়স্পর্শী বা জীবনপ্রদ হয় না। তাকে কোন ক্রমেই মানুষ বলে অভিহিত করা চলে না; সে একটি বুদ্ধিমান বানর মাত্র। মানুষ হবার জন্য, মনুষ্যত্ব এবং পৌরুষ লাভের জন্য না হয়ে শিক্ষা যদি কেবল নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জাহির করবার জন্য, অথবা জীবিকানির্বাহের জন্য হয় তাহলে তা এই বিপদকেই ডেকে আনে। সুতরাং শিশুকে প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষা দেবার সময় আমরা তার অন্তরের কাছে আবেদন করব। জ্ঞানের উন্নতি-পথে আরোহণের প্রত্যেকটি ধাপে শিশুর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি যেন ক্রিয়া করে। আমরা যেন কখনো তাকে কোলে করে নিয়ে লক্ষ্যের দিকে উচ্চতর ধাপে তুলে না দিই, সে যেন নিজেই ওপরে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। আমাদের কাজ হবে শিশুর সামনে মাত্র ততটুকু বাধা রেখে দেওয়া যার ফলে (সে বাধা অপসারণ করবার জন্য) তার ইচ্ছা শক্তি সক্রিয় হয়; আবার ঐ বাধা এত অল্প হওয়া চাই, যাতে সে নিরুৎসাহ না হয়। যখন জ্ঞান আহরণের সময় এবং অর্জিত জ্ঞানের পশ্চাতে একটি ব্যক্তিত্ব বা মন কাজ করে, তখন অপরের নিকট শিক্ষাগ্রহণের পরিবর্তে সে নিজেই নিজেকে শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থী তখন নিরাপদ, সে নিজেই নিজের শিক্ষাভার গ্রহণ করতে পারে। বুদ্ধি পরিণত হয়েছে—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই প্রত্যেক বালককে বিদেশে পাঠানো হয়ে থাকে। তাকে যেন নীতির সাগরে নিক্ষেপ করা হল—সে স্বয়ং সঙ্কটের তুফান ও প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করবে বলে। আমরা ধরে নিই যে, সে সাঁতার দিতে জানে। কিন্তু এই ধারণা সুনিশ্চিত করবার জন্য আমরা কি করেছি?

পথ একটিমাত্র আছে। শিক্ষার প্রথম বৎসরগুলিতে মনে রাখতে হবে যে, অনুভূতিকে সংযত করা অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। ধীশক্তির ক্রমবিকাশের জন্য শিক্ষা-পদ্ধতির যে কোনও দিক অপেক্ষা মহৎভাবে চিন্তা এবং উদারভাবে ও সৎভাবে লক্ষ্যনির্বাচন সহস্রগুণে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। যে বালকের অন্তরে এই শক্তি যথার্থই বিদ্যমান এবং যথার্থই প্রবল, সে যে-কোন পরিস্থিতির মধ্যে সেখানে যতটা করা সম্ভব ততটা ভাল কাজই করবে। যে বালকের মধ্যে এ বস্তুটির অভাব সে সংশয়াকুলচিত্ত হতে বাধ্য; সংশয় মানে কেবল ভ্রান্তি হতে পারে অথবা এর অর্থ হতে পারে নৈতিক অবনতি।

বর্তমানে আমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক পিতামাতা ও শিক্ষক হৃদয়বৃত্তির এই অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করেছেন। তা হলে আমাদের ছেলেমেয়েদের

* 'Hints on National Education in India' গ্রন্থ হইতে অনূদিত।

উপর এত অন্ধভাবে আমরা আস্থা স্থাপন করি কিসের উপর নির্ভর ক'রে? শিশুর বিবেক ও ভাবপ্রবণতার উপর তার গৃহ, পরিবার, ধর্ম ও স্বদেশ সাধারণভাবে যে প্রভাব বিস্তার করে, কতকটা অজ্ঞাতসারে তার উপরেই আমরা ভরসা করি। সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল নৈতিক প্রতিভা বিদ্যমান, তার ফলেই বিগত দুই তিন পুরুষ ধরে ছাত্রগণের মধ্য থেকে বহু সজ্জন ব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছে। (শিক্ষাপদ্ধতির উপর) পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবের অত্যধিক গুরুত্বের জন্যই বিদেশী শিক্ষক এখানে এত অবাঞ্ছিত। শিক্ষার মতবাদ সম্পর্কে আমাদের কোন স্বদেশবাসীর যতই অজ্ঞতা থাকুক, সে অনায়াসে আমাদের ভাবাবেগপূর্ণ জীবনের সঙ্গে সুর মেলাতে পারে। তার দৈব-ক্রমে উচ্চারিত এক-আধটি কথায় শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক উৎসের দ্বার খুলে যেতে পারে, যেখানে আন্তরিকভাবে শুভাকাঙ্ক্ষী কোন বিদেশী তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো ব্যর্থ হবে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে চরিত্রগঠনের উপযোগী কোন প্রভাব বিস্তার করতে অসমর্থ, সেও ঘটনাক্রমে সেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে যদি সে এবং আমরা একই ভাবলোকের অধিবাসী হই। কোন বিদেশীর পক্ষে ঐরূপ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করার সম্ভাবনাই কম। অন্য দেশের যোগ্যতম ব্যক্তি অপেক্ষা আমাদের স্বদেশের একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তিও আমাদের শিক্ষার জন্য যোগ্যতর স্কুল মাস্টার হতে পারে—এ কথা সত্য।

একবার এই নীতিকে স্বীকার করে নিলে আমরা আর ঘটনাচক্রের অধীন থাকব না। বিদ্যালয় শিশুকে গড়ে তুলছে কিনা, গৃহ থেকে লক্ষ্য করা হবে। এমন কি, কোন অজ্ঞ জননী যদি তাঁর সন্তানকে ভালবাসতে ও সেই ভালবাসা অনুযায়ী কাজ করতে শিক্ষা দিতে পারেন, তবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিৎ বলা হবে। এই জন্যই বর্তমান যুগের অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তি তাঁদের জননীর অবদানের এত সপ্রশংস উল্লেখ করে থাকেন। ব্রতর মাধ্যমে বালিকাগণের শিক্ষালাভের প্রাচীন পদ্ধতি হৃদয়ের আবেদনপূর্ণ, আর এই আবেদনই সেখানে শিক্ষার একমাত্র দৃঢ়ভিত্তিরূপে গৃহীত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সূত্রপাতেই এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে, এবং তার ফলে সে শিক্ষায় পারিপার্শ্বিক প্রভাব-বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিরই বিকাশ ঘটেছে। অতঃপর ভারতীয় জনসাধারণ এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর করবে না। এখন তারা উপলব্ধি করবে যে—সত্য বলতে কি গত কয়েক বৎসর ধরে তারা উপলব্ধি করছে— শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর বিবেকের কাছে আত্মোৎসর্গের মহৎ নীতির দ্বারা সমর্থনযোগ্য প্রতিপাদন করতে হবে; এবং এই আত্মত্যাগের নীতির অর্থ হল—শিশুকে তার নিজের মঙ্গলের জন্য নয়, পরন্তু জন-দেশ-ধর্মের জন্য উন্নত হতে হবে—পাশ্চাত্য দেশে যেমন বলা হয়, ব্যক্তির উন্নতি তার সমগ্র গোষ্ঠীর জন্য।

বিদ্যালয়ে পাঠাবার সময় মা তাঁর শিশু-সন্তানকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কেন বিদ্যালয়ে যাচ্ছ?' এবং শিশু বিভিন্নভাবে এই উত্তরই দেয়—'মানুষ হতে শিখব যাতে তোমাদের সাহায্য করতে পারি'; বয়স ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে তার উত্তর আরও অর্থ-ও আগ্রহ-পূর্ণ হয়। এই ভাবকে কেন্দ্র করে যার সমগ্র শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা বা স্বার্থপরতার প্রবেশের আশঙ্কা নেই।

সেবার আকুলতা, নিজের এবং স্বদেশবাসীর

উন্নতিসাধনের ইচ্ছা, সকলকে উচ্চ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করে দেওয়া—এই হল বর্তমান কালের যথার্থ ধর্ম। আর সব কিছু হল ব্যক্তিগত ধারণা, তত্ত্বকথা এবং মতবাদ। এখানেই রয়েছে জলন্ত বিশ্বাস ও কর্মের প্রেরণা। ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত ও সজাগ কোন কর্ম দিয়ে প্রত্যেকটি দিন আরম্ভ করা উচিত। কিছুক্ষণ মৌন অবলম্বন, একটি স্তব, প্রার্থনা বা একটি প্রণাম—এর যে কোন একটি যথেষ্ট কার্যকরী অনুষ্ঠান বলে স্বীকৃত হতে পারে। উপাস্যের নিকটে নয় আমাদের নিজেদের নিকটেই উপাসনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। যে কোন একটি প্রতীক হলেই চলে, কোন প্রতীক না থাকলেও ক্ষতি নেই। এই কারণেই আমাদের পূর্বপুরুষগণ সপ্ততীর্থের জল, তীর্থস্থানের পবিত্র রজ, গুরুর পদচিহ্ন অথবা মাতৃপূজার বিধান দিয়েছেন। এসবই আমাদের মনে 'জন-দেশ-ধর্মের' ইঙ্গিতই বহন করে আনে, যে জন-দেশ-ধর্মের নিকট আমরা নিজেদের উৎসর্গ করি, যার সেবাই আমাদের সর্বপ্রকার উদ্যমের মূল প্রেরণা। 'কোন ব্যক্তিই কেবল নিজের জন্য বাঁচতে পারে না', এ-তত্ত্বকে যতটুকু আমরা জীবন-রূপায়িত করি, আমাদের জীবন ততটুকুই মহৎ। এই ভাবকে যতটুকু আমরা শিক্ষার লক্ষ্য করব—আমাদের শিক্ষা ততটুকু সার্থকতা লাভ করবে।

রামচরিতমানসে কাক-গরুড়-কথা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

(২য় পর্ব)

ভুষণ্ডী সন্দর্শন

পূর্বে বলা হয়েছে, যে পর্বতে ভূষণ্ডীকাক কুণ্ঠাহীন মন ও অখণ্ড হরিভক্তি নিয়ে বাস করে তার কাছাকাছি পৌছিতেই গরুড়ের মনে পরমানন্দের উদয় হয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সকল মায়া-মোহ-শোক এককালে অন্তর্হিত হয়েছিল। সে কথার উল্লেখ ক'রে শিব বলতে লাগলেন, "পার্বতি, সরোবরে স্নান ও জলপান ক'রে গরুড় আনন্দিত মনে সেই বটগাছের তলায় এসে উপস্থিত হ'ল যেখানে বসে বুড়ো বুড়ো পাখীরা দিনের-পর-দিন ভূষণ্ডীর মুখে সুমধুর রামচরিতকথা শোনে। সেদিন ভূষণ্ডী সবেমাত্র রামকথা আরম্ভ করতে যাচ্ছে এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে পক্ষিরাজ গরুড়কে সেখানে উপস্থিত হ'তে দেখে সকলেরই খুব আনন্দ হ'ল। ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ভূষণ্ডী তাকে সাদর-সম্ভাষণ জানাল এবং বসবার জন্য ভাল দেখে আসন পেতে দিল; তারপর অনুরাগের সাথে পূজার্চনা ক'রে মধুরবাক্যে বলল—

নাথ কৃতারথ ভয়উ মৈঁ তব দরসন খগরাজ।
আয়সু দেহু সো করউঁ অব প্রভু আয়হু কেহি কাজ॥

হে নাথ, হে পক্ষিরাজ, তোমার দেখা পেয়ে আমি কৃতার্থ হলাম। হে প্রভু, তুমি যে কাজের জন্য এসেছ, আদেশ কর, তা করি।

কাকের কথা শুনে মিষ্টি ক'রে গরুড় উত্তর দিল—

সদা কৃতারথ রূপ তুম্হ কহ মৃদুবচন খগেস।
জে হি কৈ অস্তুতি সাদর নিজ মুখ কীন্হি মহেস॥

[কাক, আজ আর নতুন ক'রে তুমি কি কৃতার্থ হবে?] তুমি ত সর্বদাই কৃতার্থ হয়েই আছ, যেহেতু স্বয়ং মহেশ্বর অতি আদরের সাথে নিজমুখে তোমার গুণগান[১] করেছেন।

সুনহু তাত জেহি কায়জ আয়উঁ।
সোসব ভয়উ দরস তব পায়উঁ॥
দেখি পরম পাবন তব আশ্রম।
গয়উ মোহ সংসয় নানা ভ্রম॥

[কাজের কথা জিজ্ঞাসা করছ?] হে তাত, শোন, তোমার দেখা পেতেই যে কাজের জন্য এসেছিলাম তা সিদ্ধ হয়েছে। তোমার পরম-পাবন আশ্রমের দৃশ্য চোখে পড়তেই মন থেকে সকল মোহ, সকল সংশয়, সকল ভ্রম দূর হ'য়ে গেছে।

অব শ্রীরামকথা অতি পাবনি।
সদা সুখদ দুখপুঞ্জ নসাবনি॥
সাদর তাত সুনাবহু মোহী।
বারবার বিনবউঁ প্রভু তোহী॥

হে তাত, এখন আমাকে সেই পরমপবিত্র, সর্বদা-সুখপ্রদ, সর্বদুখনাশন শ্রীরামকথা দয়া ক'রে শোনাও। হে প্রভু, তোমাকে বার বার মিনতি ক'রে বলছি।

স্বল্প ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততাও শাশ্বত মুক্তির প্রসূতি—(স্বামী বিবেকানন্দ)

ঈশ্বরীয় কথায় প্রীতি না জন্মিলে মন শুদ্ধ হয় না, আবার মন শুদ্ধ না হ'লে ঈশ্বরীয় কথায় প্রীতি জন্মে না। গরুড় পূর্বে পরমজ্ঞানী রামভক্ত শিবের দর্শন পেয়েছিল। তাঁর নির্দেশমত ভূষণ্ডীকাকের আশ্রম-সন্নিধানে উপস্থিত হ'তেই মনে এখন যে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হ'ল, তাতে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও সাত্ত্বিক বুদ্ধির প্রকাশ এবং সকল শোকতাপের অবসান ঘটেছিল। এই অনুভূতির ফলেই এখন রাম-কথাকে "সদাসুখদ" ও "দুখপুঞ্জ নসাবনি" এবং "রামপথের প্রবীণ পথিক" ভূষণ্ডীকাককে পরম শ্রদ্ধাভাজন ও নিতান্ত আপনার জন বলে বোধ করতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, শিব গরুড়কে বলেছিলেন—"দীর্ঘকাল সাধুসঙ্গ করলে তবে তোমার মন থেকে সকল সংশয় দূর হবে।" কাজেই, গরুড়ের মনের এই যে অকস্মাৎ ভাবান্তর উহা শিবের বিধানে, সাধুত্তম ভূষণ্ডী-কাকের সঙ্গের ফলে কেমন ক'রে শাশ্বতমুক্তি অথবা পরাভক্তিতে পরিণত হয়েছিল, অতঃপর ক্রমে ক্রমে সেই কথারই অবতারণা করতে দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে, আশ্রমাগত পক্ষিরাজ গরুড়ের প্রতি পরমভাগবত ভূষণ্ডীকাকের সৌজন্য দেখে মনে প'ড়ে যায়—

"যদ্যপি যাও তুমি ভবসিন্দু পার,
তথাপি না ছাড়িও লোকাচার।"

আর, অপর পক্ষে খগরাজ গরুড়ের নিরভিমানতা স্মরণ করিয়ে দেয় সেই বৈষ্ণবোচিত লক্ষণের কথা—"উত্তম হইয়ে আপনারে মানে তৃণাধম···।"

যা হোক, শিব বলতে লাগলেন—

সুনত গরুড় কৈ গিরা বিনীতা।
সরল সুপ্রেম সুখদ সুপুনীতা॥
ভয়উ তাসু মন পরম উছাহা।
লাগ কহই রঘুপতি গুণগাহা॥

গরুড়ের বিনীত সরল প্রেমপূর্ণ সুখদায়ক ও সুপবিত্র কথা শুনে কাকের মনে পরম

(১) এখানে 'অস্তুতি' অর্থে মূল অনুবাদানুযায়ী স্তব না বলে 'গুণগান' বলা হ'ল।

উৎসাহের সঞ্চার হ'ল; সে রঘুপতির গুণগান করতে আরম্ভ করল।

এইভাবে একে একে নারদের অসীম মোহের কথা, রাবণের জন্মকথা, শ্রীপ্রভুর রামরূপে অবতার হওয়ার কথা গান ক'রে, পরে সে একমনে উৎসাহের সাথে শ্রীরামচন্দ্রের বাল-চরিত-কথা[২] নানাভাবে বর্ণনা করতে লাগল। পরে ক্রমে ক্রমে দশরথের রাজসভায় ঋষি-বিশ্বামিত্রের আগমন, হরধনুভঙ্গ, শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ, পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন, বনবাস-কালের নানা বিচিত্র ঘটনা, মায়াসীতা হরণ, সুগ্রীবের সাথে মিত্রতা, সেতুবন্ধন, রামরাবণের যুদ্ধ, সীতাউদ্ধার ও অবশেষে সকলের সাথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ইত্যাদি সমস্ত কথাই, [হে পার্বতি] তোমাকে আমি আগে যেমন যেমন বলেছিলাম, তেমনি ভাবেই 'ভূষণ্ডী' গরুড়ের নিকট বর্ণনা করল। শুনতে শুনতে গরুড়ের মনে পরম উৎসাহ দেখা দিল, সে আবেগভরে বলে উঠল—

গয়উ মোর সন্দেহ সুনেউ সকল রঘুপতি চরিত।
ভয়উ রামপদ নেহ তব প্রসাদ বায়সতিলক ॥

রঘুপতির কথা শুনে আমার সকল সন্দেহ দূর হয়েছে। হে কাকশ্রেষ্ঠ, তোমার কৃপায় রামচরণে আমার ভক্তিলাভ হ'ল।

ইতিপূর্বে প্রথম পর্বে শিব ও পার্বতীর ক্ষেত্রে যেমনটি দেখা গিয়েছিল, ঠিক যেন সেই একই ঘটনার, একই কথারই পুনরাবৃত্তি চলেছে! তফাতের মধ্যে বক্তা ও শ্রোতার চেহারাটা মাত্র বদলেছে। শিবের বদলে এবারে ভূষণ্ডীকাক, আর পার্বতীর বদলে গরুড়। পূর্বে শিবকে সম্বোধন ক'রে পার্বতীকেও শেষ পর্যন্ত অবিকল এইরূপই বলতে শোনা গিয়েছিল।

তুম্ হরী কৃপা কৃপায়তন অব কৃতকৃত্য ন মোহ।
জানেউঁ রামপ্রতাপ প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ ॥

হে কৃপাময়, তোমার কৃপায় আমি আজ কৃতকৃতার্থ হলাম। আমার আর কোন মোহ নেই। হে প্রভু, চিদানন্দস্বরূপ রামচন্দ্রের শক্তির কথা আমি জানতে পেরেছি।

এরপর, শিবের কথানুসরণে দেখতে পাওয়া যায়, পার্বতীর মতই বিগতসন্দেহ গরুড় এখন কৌতুহলবশতঃ অথবা তত্ত্বজিজ্ঞাসাচ্ছলে ভুষণ্ডীকে প্রশ্ন করছে—

মোহি ভয়উ অতি মোহ প্রভুবন্ধন রন মহুঁ নিরখি
চদানন্দ সন্দোহ রামু বিকল কারণ কবন ॥

যুদ্ধের মাঝে প্রভুর বন্ধনদশা দেখে আমার বড়ই মোহ উপস্থিত হয়েছিল এই ভেবে যে, চিদানন্দস্বরূপ রামও বিকল হ'য়ে পড়েছেন! এর কারণ কি? কেন এমনটি হয়েছিল?

পরক্ষণে নিজ প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেওয়া হচ্ছে—

দেখি চরিত অতি নর অনুসারী।[৩]
ভয়উ হৃদয় মম সংসয় ভারী ॥
সোই ভ্রম অব হিতকর মৈঁ জানা।
কীন্হ অনুগ্রহ কৃপানিধানা ॥

সত্যিই হুবহু মানুষের মত আচরণ দেখে আমার মনে খুব সন্দেহ হয়েছিল। এখন বুঝছি সেই ভুলই আমার পক্ষে হিতকর হয়েছে। কৃপানিধান আমাকে এইভাবেই অনুগ্রহ করেছেন।

দেখা যায়, যাকে আমরা সচরাচর মোহ বলি, উহাতে অবস্থাবিশেষে মানুষকে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে দেয়। কিন্তু মায়ার কুহক অস্ত

(২) শ্রীরামচন্দ্রের বালমূর্তিই ছিল তুলসীদাসের ইষ্ট-মূর্তি, তাই রামচন্দ্রের বালচরিত কথাতেই তুলসীর সমধিক প্রীতি দেখা যায়।

(৩) এখানে চরিতকথাটির অনুবাদে "আচরণ", ও "অতিনর অনুসারী" অর্থে, মূল অনুবাদানুযায়ী "অতিশয় মানুষের মতই" না ব'লে,"হুবহু মানুষের মত" বলা হ'ল।

না হ'লে এ রহস্য ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ভক্তপ্রবর গিরিশ-চন্দ্রের পরিণত জীবনের কথা—যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অপার্থিব স্নেহের কথা স্মরণ করে তিনি বলছেন,—"পা টিপতে দিয়েছেন, মনে করেছি ভ্যালা বিপদ! এখন দেখছি গুরুকৃপায় সে সব ত সাধনা হয়ে গেছে।" মোহমুক্ত গরুড়ও এতদিনে এ তত্ত্বের আভাস পেয়ে, নিজ জীবনে রামকৃপার মর্মকথা উপলব্ধি ক'রে কৃতার্থ হ'য়ে, প্রাণের আবেগে তাই এখন ব'লে চলেছে—

জো অতি আতপ ব্যাকুল হোঈ।
তরুছায়াসুখ জানই সোঈ॥
জোঁ নহি হোত মোহ অতি মোহী।
মিলতেউঁ তাত কবন বিধি তোহী॥

[দেখ] যে ব্যক্তি রোদের প্রখর তাপে কষ্ট পেয়েছে গাছের ছায়ায় যে কি সুখ তা সে-ই জানে। যদি আমার এমন গুরুতর মোহ উপস্থিত না হ'ত, তাহলে হে প্রিয়, বল দেখি কেমন ক'রে তোমার সাথে দেখা হ'ত?

সুন তেউঁ কিমি হরিকথা সুহাঈ।
অতিবিচিত্র বহুবিধি—তুম্হ গাঈ॥

[আর] যে অতি-বিচিত্র কথা নানাপ্রকারে তুমি গান করলে, সেই সুন্দর হরিকথাই বা কি ক'রে শুনতাম বল ত?

সন্ত বিসুদ্ধ মিলহিঁ পরিতেহি।
চিতবহিঁ রাম কৃপা করি জেহী॥
রামকৃপা তব দরসন ভয়উ।
তব প্রসাদ মম সংসয় গয়উ॥

রামচন্দ্র যাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন, বিশুদ্ধ-চরিত সাধুদের সাথে তারই দেখা হয়। রাম-কৃপাতেই তোমার দর্শন পেয়েছি, আর তোমার কৃপাতেই আমার সংশয়-সন্দেহ দূর হয়েছে।

সুনি বিহঙ্গপতিবাণী সহিত বিনয় অনুরাগ।
পুলকগাত লোচন সজল মন হরষেউ অতি কাগ॥

খগপতির এইরূপ বিনয় ও অনুরাগপূর্ণ কথা শুনে ভুষণ্ডীর শরীরে পুলক দেখা দিল, চোখে জল এল, মন উল্লসিত হয়ে উঠল।

এই অবসরে শিব একবার পার্বতীকে নিজ মনের কথাটি ব'লে নিচ্ছেন—

স্রোতা সুমতি সুশীল সুচিকথারসিক হরিদাস।
পাই উমা অতি গোপ্য অপি সজ্জন করহিঁ প্রকাস॥

[দেখ উমা] সুমতি, সুশীল, পবিত্র তত্ত্বকথার রসগ্রহণে সমর্থ[৪] এমন হরিভক্ত শ্রোতা পেলে সজ্জনেরা পরম গুহ্যকথাও[৫] প্রকাশ ক'রে থাকেন।

যা হোক, এইরূপে শরীরে পুলক, চোখে জল, হৃদয়ে আনন্দ নিয়ে কাক ভুষণ্ডী অতঃপর গরুড়কে বলতে লাগল -

সব বিধি নাথ পূজ্য তুম্হ মেরে।
কৃপাপাত্র রঘুনায়ক কেরে॥
তুম্ হহি ন সংসয় মোহ ন মায়া।
মোপর নাথ কীন্হি তুম্হ দায়া॥
পঠই মোহ মিস খগপতি তোহী।
রঘুপতি দীন্হি বড়াঈ মোহী॥

হে নাথ, সকল রকমেই তুমি আমার পূজ্য। তুমি রঘুনাথের কৃপাপাত্র। তোমার আবার সংশয়-সন্দেহ কি? [বলতে গেলে বলতে হয়] তুমি আমার উপর দয়াই করেছ। হে খগরাজ, মোহের অছিলা করে তোমাকে এখানে পাঠিয়ে রঘুপতি আমার মত দীনজনকে বাড়িয়েই তুলেছেন।

(৪) "সুচিকথারসিক" এর অর্থ এরূপ হ'লেই যেন ঠিক মনে হয়। আর, (৫) "অতি গোপ্য অপি" কথার অর্থেও "অতি গোপনীয় কথাও" এরূপ না ব'লে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত কথার অনুসরণে "পরমগুহ্যকথাও" বললেই বোধহয় ভাল শোনায়।

ভূষণ্ডী কর্তৃক নানাভাবে মায়ার প্রভাব বর্ণন

তুম্হ নিজ মোহকথা খগসাঈঁ।
সো নহিঁ কছু আচরজ গোসাঈঁ॥
নারদ ভব বিরঞ্চি সনকাদী।
জে মুনি নায়ক আত্মবাদী॥
মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহী।
কো জগ কাম নচাব ন জেহী॥
তৃষ্ণা কেহি ন কীন্হ বৌরহা।
কেহি কর হৃদয় ক্রোধ নহিঁ দহা॥

হে খগরাজ, তুমি যে নিজের মোহের কথা বললে, হে গোসাঁই, ওতে ত আশ্চর্য হবার কিছু নেই! নারদ বল, শঙ্কর বল, ব্রহ্মা বল, সনকাদি আত্মবাদী মুনিগণই বল—মোহ যাঁকে কখনও অন্ধ করেনি, কাম যাঁকে কখনও নাচায়নি, বিষয়তৃষ্ণা যাঁকে কখনও পাগল ক'রে তোলেনি, ক্রোধ যাঁর হৃদয় কখনও দগ্ধ করেনি,—এমন কে আছে বলত?

উপরের এবং পরবর্তী কয়েকটি দোঁহায় প্রত্যেকটি কুপ্রবৃত্তির কুফল কেমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে তাহা লক্ষণীয়। মোহের কাজ আবরণ করা—বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করতে না দেওয়া। তাই মোহ বস্তুতঃ মানুষকে অন্ধই করে। কামনা মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না, কেবলই প্রলোভনের পিছনে ঘোরায়। আবার, বিষয়তৃষ্ণা যখন নানা দিক থেকে টানাটানি আরম্ভ করে, তখন বিক্ষিপ্ত মন একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। তারপর, যখন কামনা প্রতিহত হওয়ার ফলে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে, তখন সেই আগুনে অন্তরের সকল সুকোমল বৃত্তিগুলি পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। আরও লক্ষ করবার বিষয়, প্রথমে মোহের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে মনে হয়, এই মোহ অথবা অজ্ঞানই যে সকল অনর্থের মূল, প্রকারান্তরে তুলসীদাস সেই কথারই এখানে অবতারণা করেছেন।

জ্ঞানী তাপস সূর কবি কোবিদ গুনআগার।
কেহি কৈ লোভ বিড়ম্বনা কীন্হি ন এহি সংসার॥

জ্ঞানী, তপস্বী, শূর, কবি, পণ্ডিত অথবা গুণী, এদের মধ্যে এমন কে আছে, যাকে এ সংসারে লোভ কখনও না কখনও বিড়ম্বিত না করেছে?

শ্রীমদ বক্র ন কীন্হ কেহি, প্রভুতা বধির ন কাহি।
মৃগলোচনি লোচনসর কো অস লাগ ন জাহি॥

ধনের অহঙ্কার কাকে না বাঁকা করেছে? প্রভুত্ব কাকে না বধির করেছে? এমন কে আছে, যাকে মৃগনয়নীর নয়নবাণ কখনও বিদ্ধ করেনি?

গুনকৃত সন্যপাত নহিঁ কেহী।

এমন কে আছে যে কখনও ত্রিগুণজনিত সান্নিপাতে ভোগেনি?

মানুষের শরীরে সর্বদাই পিত্ত শ্লেষ্মা ও কফের অধিকার। যখনই এই তিনের সমতার অভাব ঘটে, তখনই শরীরে সান্নিপাতিক বিকার দেখা দেয় তেমনি সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণই মানুষের মনে নিয়ত ক্রিয়াশীল। এদের অসামঞ্জস্যবশতই মানুষের চিত্তবিকার ঘটে থাকে। মনে হয়, ভবরোগের উত্তম বৈদ্য তুলসীদাস "গুনকৃত সন্যপাত" অর্থে তুলনামূলক ভাবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন।

জোবনজ্বর কেহি নহিঁ বলকাবা।
মমতা কেহি কর জস্ন ন নসাবা॥

যৌবন-জ্বর কাকে না প্রলাপ বকিয়েছে? এমন কে আছে, আসক্তি যার যশ নষ্ট না করেছে?

মচ্ছর কাহি কলঙ্ক ন লাবা।
কাহি ন সোকসমীর ডোলাবা॥

চিন্তাসাঁপিন কো নহিঁ খায়া।
কো জগ জাহি ন ব্যাপী মায়া॥

মাৎসর্য কাকে না কলঙ্কিত করেছে? শোকের বাতাস কাকে না দোল খাইয়েছে? চিন্তাসাপিনী কাকে না দংশন করেছে? জগতে এসে মায়ায় মুগ্ধ হয়নি এমন কে আছে?

কীট মনোরথ দারু সরীরা।
জেহিন লাগ ঘুণ কো অস ধীরা॥
সুত বিত লোক ঈষণা তীনী।
কেহি কৈ মতি ইন্হ কৃত ন মলীনী॥

জীবের শরীর যেন কাঠ, আর মনোরথ (আশা) যেন কীট (ঘুণ)। যার এই দারুময় শরীরে আশারূপ ঘুণ না ধরেছে, এমন ধীর ব্যক্তি কে আছে? এই আশাকীটের আবার তিনটি রূপ—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা—এদের দ্বারা যার মতি মলিন হয়নি এমন কে আছে?

এই কীট বা ঘুণের উপমাটির বিশেষত্বও লক্ষণীয়। কাঠে যে ঘুণ ধরে, উহা কাঠের মধ্যেই জন্মায়, উহা কাঠেরই ধর্ম। তেমনি মানুষের আশা বা বিষয়তৃষ্ণাও মনের মধ্য থেকেই জন্মায়, ওকে মনেরই ধর্ম বলা যায়।

ব্যাপি রহেউ সংসার মহুঁ মায়াকটক প্রচণ্ড।
সেনাপতি কামাদি ভট দম্ভ কপট পাখণ্ড॥

মায়ার প্রচণ্ড সৈন্যদল সংসার জুড়ে রয়েছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, এরা হচ্ছে সেনাপতি; আর দম্ভ, কপটতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি সৈন্যদল।

সো দাসী রঘুবীর কৈ সমুঝৈ মিথ্যা সোপী।
ছুট ন রামকৃপা বিনু নাথ কহউঁ পদ রোপী॥

এমন যে মায়া, সে রঘুনাথের দাসী। [আর দেখ] জ্ঞান হ'লে এমন মায়াকেও মিথ্যা ব'লে বোধ হয়। কিন্তু রামের কৃপা না হ'লে মায়া ছুটে না, হে নাথ, এ কথা আমি দৃঢ়তার সাথেই বলছি।

জো মায়া সব জগহি নচাবা।
জাসু চরিত লখি কাহু ন পাবা॥
সোই প্রভু ভ্রূবিলাস খগরাজা।
নাচ নটী ইব সহিত সমাজা॥

এমন যে মায়া, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলকেই নাচাচ্ছে, যার চরিত্র আজ পর্যন্ত কেউই বুঝে উঠতে পারেনি, হে খগরাজ, সেই মায়া প্রভুর ইঙ্গিতমাত্রেই নিজ দলবল নিয়ে নটীর মত নাচতে থাকে।

এখানে ভুষণ্ডীকাকের মুখ দিয়ে তুলসী এই কথাই বলতে চাইছেন যে, ঈশ্বরকৃপায় যখন মানুষের আত্মজ্ঞান লাভ হয়, কেবল তখনই সে আর মায়ার ক্রীড়নক না হয়ে, এই ভব-রঙ্গমঞ্চে দ্রষ্টারূপে মায়ার বিচিত্র লীলাভিনয় দর্শন ও সম্ভোগ করতে সমর্থ হয়। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য

[স্বচ্ছন্দ অনুবাদ]*

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১।১।১

এখানে অথ শব্দ মানে অনন্তর। আরম্ভ অর্থে ইহার ব্যবহার হয় নাই, কেননা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার সকলের নাই। মঙ্গল অর্থ ধরিলে সমন্বয় হয় না। অনন্তর অর্থ ধরিয়া লইলে বুঝিতে হইবে—কাহার অনন্তর? ধর্ম-জিজ্ঞাসা যেমন পূর্বকৃত বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা করে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ব্যাপারে সেরূপ কিসের অপেক্ষা?

পূঃ—কেন, স্বাধ্যায়?

উঃ—পূর্বে বলিয়াছি ধর্মজিজ্ঞাসা স্বাধ্যায় বা বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা করে। এখন যদি বলি ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উভয়ই স্বাধ্যায় অপেক্ষা করে, তবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিশেষ অপেক্ষণীয় বস্তু কি তাহা বলা হইল না, শুধু সাধারণ অপেক্ষণীয় বস্তুর উল্লেখ হইল মাত্র।

পূঃ—আমি বলি স্বাধ্যায়, তারপর ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও তারপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—এইরূপ নিয়ম হইবে।

উঃ—কোথায় এরূপ বিধি আছে? যজ্ঞ-কার্যে বিধি আছে বটে "অগ্রে নিহত পশুর হৃদয়-মাংস লইয়া হোম করিবে, অনন্তর তাহার জিহ্বা লইয়া হোম করিবে," কিন্তু এরূপ কোন নিয়ম আছে কি যে অগ্রে ধর্মজিজ্ঞাসা করিবে, তারপর ব্রহ্ম জানিবে? উহাদের ভিতর অগ্র-পশ্চাৎ-ক্রম নাই, যেহেতু উহাদের ফল ও লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। ধর্মসাধনের ফল অভ্যুদয়; তাহা অনুষ্ঠানসাধ্য; ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল মুক্তি; তাহা অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ। ধর্মজিজ্ঞাসায় ব্যাপার ভব্য অর্থাৎ তাহা জন্য বা সাধনবশতঃ হয়—পুরুষ-ব্যাপারের অধীন। আর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ব্যাপার হইতেছে ভূত (অর্থাৎ হইয়াই রহিয়াছে)—নিত্যসিদ্ধ, সুতরাং তিনি পুরুষ-ব্যাপারের অধীন নহেন। ধর্ম ও ব্রহ্ম এই দুই বিষয়ে যে সকল নিয়োজক বা বিধি-বাক্য আছে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মবিষয়ক চোদনাগুলি (উপদেশগুলি) বলে "ইহা কর", "ইহা করিও না" অর্থাৎ কর্মে নিয়োগ করে—আর ব্রহ্মবিষয়ক চোদনাসকল কেবল বলে "ইহা জান", "তাহাকে জান"। সুতরাং ধর্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কোনও ক্রম-নিয়মের অঙ্গীভূত নহে।

পূঃ—তবে অনন্তর অর্থে তুমি কি বুঝাইতে চাহ?

উঃ—এমন কিছু হইবে যাহার অনন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সম্ভব হইবে। যথা—(১) নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক (নিত্য ও অনিত্য বস্তু চিনিতে পারা); (২) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ (ইহ ও অমুত্র যাহা যাহা ফলভোগ হইতে পারে তাহাতে বিরাগ); (৩) শমাদি সাধন-ষটক (শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা); (৪) মুমুক্ষুত্ব। এই সব শর্ত বিদ্যমান থাকিলে ধর্ম-জিজ্ঞাসার পূর্বে বা পরে যে-কোন সময়েই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা চলিতে পারে। তদ্বিপরীতে নহে। অতএব অথ মানে এই চতুর্বিধ শর্ত সিদ্ধ হইবার পর।

এবার বলি অতঃ শব্দের অর্থ। অতঃ মানে এই হেতু অর্থাৎ ক্রিয়াপর স্বর্গাদি ফলের অনিত্যতা-হেতু ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরম পুরুষার্থ-সাধনতা-হেতু, যথা "কৃষিকর্মাদি দ্বারা প্রাপ্ত ফল

* অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

(শস্য) অনিত্য, তেমন যজ্ঞাদি দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফলও অনিত্য; পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞ পরম-পুরুষকে প্রাপ্ত হন।"

এবার বলি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কথার অর্থ। ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। ব্রহ্ম মানে পরসূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা জন্মাদি যাহা হইতে। ব্রহ্ম অর্থ জাতি বর্ণ বা ব্রহ্মদেবতা বুঝিতে হইবে না। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মানে ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা হইবে না, কর্মে ষষ্ঠী হইবে যথা ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা।

জানিবার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মকে জানা মানে অবগতি। এই ব্রহ্মাবগতি হইলে নিঃশেষে সংসার-বীজরূপ অনর্থ নাশ হয়, তাই ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করা পরমপুরুষার্থের জন্য ইচ্ছা।

পূঃ—যদি ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ হন, তবে তিনি ত জানাই, বেশী করিয়া কি জানিবে? যদি অপ্রসিদ্ধ হন, তবে জানিবার ইচ্ছা হইলেও তিনি অবিজ্ঞেয়।

উঃ—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহা অপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এই অর্থ হইতেই নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধত্বাদি বিশেষণ আসে। সকলেই 'আমি'র অস্তিত্ব স্বীকার করে। 'আমি নাই' এরূপ প্রতীতি বা ধারণা করিতে গেলেও আমি বাঁচিয়া থাকিয়াই ঐরূপ ধারণা করি। এই "আমি"ই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম এই হিসাবে অর্থাৎ সকলের আত্মা-রূপে (আমি হিসাবে) প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি সম্পূর্ণ জানা নহেন। ব্রহ্ম বিশেষভাবে জ্ঞাত নহেন। সাধারণতঃ লোকে নিজেকে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ বলিয়া জানে। কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সমষ্টিকে প্রকৃত আমি মনে করে। কেহ বা মনকেই আত্মা বলেন। কেহ বা ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই আত্মা বলেন। কেহ মনে করেন আত্মা নাই, শূন্যতাকেই আত্মা বলেন। কেহ কেহ বলেন, দেহ ভিন্ন আত্মা একজন আছেন, তিনিই দেহাশ্রয়ী হইয়া সংসারী কর্তা ও ভোক্তা হন। কেহ বলেন, না, আত্মা কর্তা নহেন, শুধু ভোক্তা। অপরেরা বলেন, এই সংসারী দেহাশ্রয়ী আত্মা ছাড়া অন্য এক স্বতন্ত্র, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর আছেন, তিনিই সংসারী আত্মার খাঁটি স্বরূপ। সংসারীটি মাত্র ভোক্তা। এইরূপ যুক্তি, যুক্ত্যাভাস, বাক্য ও বাক্যাভাস অবলম্বন করিয়া বহু মত আছে। অতএব বিচার ব্যতীত 'আমি'মাত্র বোধসম্বলিত অপূর্ণ ও অসংস্কৃত অবগতির দ্বারা পরমপুরুষার্থ-রূপ মোক্ষ নিশ্চয় হয় না। এইজন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সূত্রে বেদান্তবাক্যমীমাংসা ও তৎ-অবিরোধী তর্ক দ্বারা আত্মা বা আমি-র বিশেষ জ্ঞানের প্রস্তুতি করা যাইতেছে।

সুতরাং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য হইলেন। এখন ব্রহ্মের লক্ষণ কি? ভগবান সূত্রকার তাই দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন:

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥১।১।২

উঃ—যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হয়। সূত্রকার শ্রুতির নির্দেশ ও বস্তুর স্বভাব অনুসরণ করিয়া প্রথমে জন্ম শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতিনির্দেশ, যথা—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মগ্রহণ করিয়াছে)। এই বাক্যে জন্ম স্থিতি ও বিনাশের ক্রম দেখানো হইয়াছে। বস্তুর স্বভাব যথা, জন্ম দ্বারা লব্ধ-সত্তাক বস্তুরই পরে স্থিতি ও তৎপর বিনাশের সম্ভব হইতে পারে। অস্য মানে প্রত্যক্ষ ও সন্নিহিত ইদং-শব্দ-বাচ্য জগৎ। সম্বন্ধে ষষ্ঠী অর্থাৎ ইহার (জগতের) জন্মাদি। যতঃ শব্দের দ্বারা কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। নানা নাম-রূপ দ্বারা অভিব্যক্ত, অনেক কর্তৃ-

ভোক্তৃ-সংযুক্ত, দেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়া-ফলের আশ্রয়—এই যে জগৎ, যাহার রচনাশৈলী মনের দ্বারা অচিন্ত্য, তাহার জন্ম স্থিতি ও বিনাশ যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান মূল কারণ হইতে ঘটে, তাহাই ব্রহ্ম। বস্তুর স্বভাবের আরও তিনটি অবস্থা যাস্ক কর্তৃক কথিত হইয়াছে, যথা হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম কিন্তু তাহারা জন্মস্থিতিবিনাশের অন্তর্ভুক্ত। জগতের স্থিতিকালে ঐ তিনটি ঘটে।

জগতের যে সমস্ত লক্ষণ উপরে বলা হইয়াছে, ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত জগতের, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ব্যতীত (১) অচেতন প্রকৃতি হইতে বা (২) পরমাণু হইতে বা (৩) শূন্য হইতে বা (৪) কোনও জন্মমরণশীল সংসারী জীব হইতে উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ সম্ভব নহে। জগৎ-উৎপত্তির জন্য, বিশেষ দেশ-কাল-নিমিত্ত-রূপ উপাদানের আবশ্যকতা-হেতু আপনাআপনি জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও বলা যায় না।

পূঃ—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'—এই শ্রুতি জগতের অস্তিত্ব হইতে জগদতিরিক্ত এক ঈশ্বররূপ অনুমান করিয়াছেন।

উঃ—না, তাহা নহে। বেদান্তবাক্যরূপ কুসুমসকলকে গ্রথন করাই এই সকল সূত্রের উদ্দেশ্য। সূত্রের দ্বারা বেদান্তবাক্য আহরণ করত এই সকল সূত্রে মীমাংসিত ও বিচারিত হইয়াছে। বিচারের ফলে প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্রহ্মাবগতি হয়। অনুমানাদি প্রমাণান্তরের দ্বারা নহে। অবশ্য ব্রহ্মই যে জগতের কারণ—এরূপ নানা বেদান্তবাক্য আছে। সুতরাং ঐ সব বেদান্তবাক্যের অবিরোধী ও পরিপোষক অনুমান যদি থাকে ত থাকুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমরা অনুমান বা যুক্তিকেও শ্রুতির সহায়কারী বলিয়া মনে করি। যেমন শ্রুতিতে আছে—"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ", "যেমন পণ্ডিত মেধাবী লোক জিজ্ঞাসা করিয়া এবং অনুমান সাহায্যে গান্ধার দেশে উপস্থিত হইতে পারেন। ঠিক সেইরূপ আচার্যবান পুরুষ আচার্যের উপদেশ সহায়ে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।" দেখা যাইতেছে—শ্রুতিতে পুরুষ-বুদ্ধিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ধর্মজিজ্ঞাসা ব্যাপারে অবশ্য শ্রুত্যাদি (অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা) একমাত্র প্রমাণ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যাপারে শ্রুত্যাদি সহায়কারী প্রমাণ এবং অনুভব প্রধান প্রমাণ; কেননা বিষয়টি বস্তুতন্ত্র এবং বস্তুর অনুভবের অবসানে আর শ্রুত্যাদির সহায় অনাবশ্যক। ক্রিয়ানিষ্পাদ্য ব্যাপারে অনুভবের অপেক্ষা নাই, তাই শ্রুত্যাদিই একমাত্র প্রমাণ। যেহেতু ক্রিয়া পুরুষসম্পাদ্য, তাই পুরুষ উহা করিতে পারে, না করিতে পারে এবং হয়ত অন্যরকমেও করিতে পারে; সুতরাং ক্রিয়ার ফললাভ সম্পূর্ণ পুরুষের অধীন, পুরুষতন্ত্র। যথা পুরুষ হাঁটিয়া যাইতে পারে, ঘোড়ায় যাইতে পারে আবার না-ও যাইতে পারে। যেমন আছে "অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শী যজ্ঞপাত্র লইবে না—এরূপও চলিতে পারে আবার ষোড়শী যজ্ঞপাত্র লইবে—এরূপও চলিতে পারে।" "হোমকার্য উদয়কালে কর্তব্য বা অস্তকালে কর্তব্য।" ধর্মকার্যস্থলে বিধি বা নিষেধ সমস্তই অর্থবস্তু। বিকল্প উৎসর্গ ও অপবাদ প্রত্যেকটিরই সার্থকতা আছে। কিন্তু যাহা বস্তু ব্যাপার, তাহা হয় অস্তি, নয় নাস্তি, নয় অন্যপ্রকারে অস্তি—ইহার যে কোন একটি যে বলিবে, ইহা তোমার সাধ্য নাই, কেননা ইহা বস্তুর অধীন বস্তুটি যেমন ঠিক তাই; পুরুষতন্ত্রাধীন নহে, বস্তুতন্ত্রাধীন। একটা স্থাণুকে তুমি স্থাণু বলিবে, অপরে পুরুষ বলিবে, অপর কেহ অন্যবস্তু বলিবে, তাহা হয় না। পুরুষ বলা বা অন্য বস্তু বলা মিথ্যা জ্ঞান, আর স্থাণু বলা

সত্য জ্ঞান। সুতরাং বস্তুবিষয়ে জ্ঞান বস্তু-তন্ত্রাধীন। ব্রহ্মবস্তুও বস্তু বলিয়া বস্তুতন্ত্রাধীন।

পূঃ—ব্রহ্ম যদি একটি বস্তু হন তবে তাহা অন্য প্রমাণ দ্বারাও (যথা অনুমান দ্বারা) সিদ্ধ হইবে। সুতরাং বেদান্তবাক্য (অর্থাৎ আচার্যের উপদেশ বা শাস্ত্রের প্রমাণ) বিচারণা অনর্থক।

উঃ—না, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অবিষয়। ইন্দ্রিয়াদি স্বভাবতঃ বহির্বিষয়মুখী, ব্রহ্মবিষয়মুখী নহে। যদি ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের বিষয় হইতেন, তবে জগৎরূপ কার্যের কারণ ব্রহ্ম বলা যাইত, কিন্তু যেহেতু কার্যাংশটুকু মাত্র ইন্দ্রিয়ের বোধ্য হয়, তাই জগৎরূপ কার্যের কারণ ব্রহ্ম হইবেন বা অপর কেহ হইবেন, ইত্যাকার সংশয় থাকে। সেজন্য জন্মাদি সূত্র দ্বারা বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মই কারণ। অনুমানবলে ইহা জানিতে পারা যায় না, তাহা উপরে বলিয়াছি।

পূঃ—এই সূত্রের লক্ষীভূত সেই বেদান্ত-বাক্যটি কি ?

উঃ—"বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন, 'ভগবান, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন।' বরুণ বলিলেন, 'যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে, যদ্দ্বারা জীবিত থাকিতেছে, আবার শেষে যাহাতে যাইয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাই ব্রহ্ম'।" এইরূপে প্রশ্ন-প্রতিবচনের পর যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহা এই :—"এই সকল ভূত আনন্দ হইতে জন্মিতেছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকিতেছে এবং অন্তকালে আনন্দেতে লীন হইবে।" এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বেদান্তবাক্যও আছে, যাহা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান জগৎ-কারণ ব্রহ্মের অববোধক।

জগৎ-কারণত্বের দ্বারা ব্রহ্ম, জগতের মধ্যে যত কিছু আছে, সমস্তই জানেন, বলা হইল, তাহাই দৃঢ় করিবার জন্য তৃতীয় সূত্রে বলিতেছেন :

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ১৷১৷৩

শাস্ত্র, অর্থাৎ ঋক্ যজু সাম ও অথর্বাদি বেদ-সমূহ, যাহা সর্ববিদ্যার আকর এবং প্রদীপবৎ সর্বাবভাসক, সেই শাস্ত্রের যিনি যোনি অর্থাৎ কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। ঈদৃশ ঋগ্বেদাদি সর্ববিদ্যার আকর বা সর্বজ্ঞত্বগুণান্বিতস্বরূপ শাস্ত্রের জনয়িতা সর্বজ্ঞ ছাড়া সম্ভবে না। লোকসমাজে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, যে যে শাস্ত্র যাহার যাহার দ্বারা কৃত, সেই সেই পুরুষ অবশ্য সেই সেই শাস্ত্র অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী হইবেন। যেমন পাণিনিকৃত ব্যাকরণে যে-জ্ঞান নিহিত আছে, স্বয়ং পাণিনি তদপেক্ষা অনেকবেশী জানিতেন। অতএব অনেক শাখাসমন্বিত, দেব তির্যক মনুষ্য, এবং বর্ণ আশ্রম প্রভৃতি বিভাগহেতু সর্বজ্ঞানের আকর, সুতরাং সর্বজ্ঞতুল্য ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রসমূহ যে মহৎ বস্তু হইতে আবির্ভূত হইয়াছে সে মহৎ বস্তু যে সর্বজ্ঞ হইতেও সর্বজ্ঞ, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এই যে ঋগ্বেদ তাহা সেই মহৎভূত হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনা আয়াসে বাহির হইয়াছে", সেই মহৎভূত নিশ্চয়ই নিরতিশয় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

অথবা নিম্নোক্তরূপেও এই সূত্রের অর্থ করা যায়। উপরোক্ত প্রকার ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যাহার যোনি, বা কারণ বা জানিবার উপায়। ব্রহ্মস্বরূপ অবগতির একমাত্র উপায় হইতেছে শাস্ত্র। শাস্ত্রপ্রমাণের বলেই জানা যায় যে, জগতের জন্মস্থিতি ও ভঙ্গের কারণ হইতেছে ব্রহ্ম। সেই শাস্ত্রবাক্য যথা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি পূর্বসূত্রব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

পূঃ—পূর্ব সূত্রেই যখন বলিয়াছ যে শাস্ত্র-প্রমাণের বলেই জানা যায় যে, জগতের জন্ম-

স্থিতিভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম তবে এখন আবার এই নূতন সূত্রের প্রয়োজন কি ?

উঃ—পূর্ব সূত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয় নাই যে, শাস্ত্রপ্রমাণের বলেই জানা যায় যে জগতের জন্মস্থিতিভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম। সেখানে মাত্র বলা হইয়াছে যে, জগতের জন্মস্থিতিভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম। পূর্ব পক্ষ আশঙ্কা করিতে পারে যে, অনুমানের দ্বারা এইরূপ জানা যায়। তাই এখানে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইল শাস্ত্ররূপ যোনি হইতেই ব্রহ্মস্বরূপের অবগতি হয়।

পূঃ—একথা মানিনা। জৈমিনি বলিয়াছেন, "বেদ হইতেছে ক্রিয়া-প্রতিপাদক। যাহার ক্রিয়াবিষয়ে সার্থকতা নাই সেই পদ বা বাক্য অনর্থক। সুতরাং বেদান্ত-অংশে ব্রহ্মের লক্ষণ-প্রতিপাদক কিছু বাক্য থাকিলেও তাহার আনর্থক্যই সূচিত হয়। যে বস্তু সিদ্ধ হইয়াই রহিয়াছে, তাহার শাস্ত্রীয় প্রতিপাদন প্রয়োজন নাই, যেমন প্রত্যক্ষ বস্তুসমূহ। আবার দেখ—ব্রহ্ম সর্বাবস্থায় একরস হওয়ার জন্য তাহার হেয়-উপাদেয় নাই। এইরূপ হেয়-উপাদেয়-রহিত বস্তু সম্বন্ধে শাস্ত্র যদি কিছু বলেও তাহার সার্থকতা নাই। জৈমিনির মতে—এ সকল স্থলে, অর্থাৎ যেখানে বেদের বাক্যসমূহ হেয়কে বর্জন ও উপাদেয়কে আদর করা রূপ কোনও পুরুষার্থ-জ্ঞাপক কথা বলে না এমত স্থলে সেই সব বাক্য বিধির সহিত, ক্রিয়ার সহিত একযোগে অর্থ প্রকাশ করে। যাহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু তাহার কোনও কর্তা বা ক্রিয়া বা বিধির অপেক্ষা নাই। এইরূপ বস্তুর উল্লেখ থাকিলে, তাহা ক্রিয়াবিধির শেষ অর্থাৎ প্রাপ্ত ফল হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডস্থ ব্রহ্মসূচক বাক্যাবলীকে উপাসনাদি কর্মপর ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং শাস্ত্রকে ব্রহ্মস্বরূপ অবগতির উপায় বলিয়া লইতে পার না।

উঃ—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়াই, সূত্রকার চতুর্থ সূত্রে বলিতেছেন :

তত্তু সমন্বয়াৎ ১।১।৪

[অর্থাৎ শাস্ত্রমাধ্যমে ব্রহ্মাবগতির বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষ যাহা বলিয়াছেন তাহার জবাবে সূত্রকার বলিতেছেন, সমস্ত বেদান্তবাক্যের সমন্বয় করিলে এই তাৎপর্যই বাহির হয়]

তু মানে পূর্বপক্ষের শঙ্কানিরাস হেতু বলিতেছি। তৎ মানে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়-কারণ ব্রহ্ম, যেমন বেদান্তশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। কীরূপে ? সমন্বয় করিয়া। সমস্ত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য এই এক অর্থ প্রতিপাদন করে। যথা "হে সৌম্য, অগ্রে অদ্বিতীয় এক সদ্‌বস্তুই ছিলেন," "অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ইহা একমাত্র আত্মস্বরূপ ছিল," "সেই ব্রহ্ম এই (এই জগৎ)। ইনি পূর্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন ; ইনি অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন। অথবা, তাঁহার কারণ নাই, সুতরাং তিনি কার্য নহেন, জন্য নহেন ; তাঁহার অন্তরও নাই, বাহিরও নাই অর্থাৎ তিনি একরস" ; "এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি সকলের অনুভূয়মান" ; "এসমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত" ইত্যাদি। এই সকল বেদান্তবাক্যে যে সকল পদ বা শব্দ আছে তাহাদের ব্রহ্মপরতা বিষয়ে নিশ্চয় হইলে। অর্থান্তর কল্পনা করা অযুক্ত হইবে। করিলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা দোষ হইবে। [পদের শ্রুতিমাত্র যে অর্থবোধ হয় তাহার বর্জন শ্রুতহানি দোষ ও যে অর্থবোধ হয় না তাহার গ্রহণে অশ্রুতকল্পনা দোষ হয়।]

পূঃ—পদগুলি ব্রহ্মপর বটে, তবে তাহা উপাসনা বা কর্মকারীকে নিজস্বরূপ মাত্র বুঝাইয়া দেয়।

উঃ—মাত্র বুঝাইয়া দেয় না, ব্রহ্মবিজ্ঞান করাইয়া দেয়। "তৎ কেন কং পশ্যেৎ"—"সে

সময়ে কে দেখিবে, কি দিয়া দেখিবে কাহাকে দেখিবে” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, তখন অর্থাৎ ব্রহ্মাবগতির পর কোনরূপ কর্ম, কারক, ক্রিয়াদির বোধ থাকে না। নিজ-স্বরূপ বলিয়া তুমি কি ব্রহ্মকে পরিনিষ্ঠিত বস্তু-বৎ (সিদ্ধবস্তু) বলিতে চাও? এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণই এবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ইহাই বলিতে চাও?

পূঃ—হ্যাঁ, এবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ অবান্তর।

উঃ—তত্ত্বমসি ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মভাবের কথা আছে। এইরূপ জ্ঞান স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে। ইহা শাস্ত্র ছাড়া অবগত হওয়া যায় না।

পূঃ—আমি যদি স্বরূপতঃ হেয়- ও উপাদেয়-রহিত একরস হইলাম, তবে শাস্ত্র দ্বারা আমার কোন্ পুরুষার্থ সাধন হইবে?

উঃ—বাপুহে, নিজস্বরূপকে হেয়-উপাদেয়-রহিত ব্রহ্ম বলিয়া জানিলে সর্বক্লেশ দূর হইবে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধিত হইবে।

পূঃ—যদি বলি যে অন্যত্র দেবতাপর বাক্যাদিতে যেমন দেবতার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া উপাসনার বিধি আছে, এক্ষেত্রেও সেরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করা আছে, উপাসনাবিধির লভ্য শেষ ফল হিসাবে।

উঃ—তাহা বলিতে পার না। ব্রহ্মস্বরূপ হেয়-উপাদেয়-শূন্য হওয়া হেতু এক্ষেত্রে উপাসক ও উপাসনা বিধি প্রযোজ্য হইবে না। কেননা ব্রহ্ম ও আত্মা এক বলিয়া জানিলে কোনরূপ দ্বৈতবোধের প্রবেশ সম্ভব হইবে না।

পূঃ—কর্মকাণ্ডোক্ত বেদবাক্যসকলের প্রমাণত্ব নির্ভর করে তাহাদের বিধিসংস্পর্শ আছে বলিয়া। তোমার জ্ঞানকাণ্ডোক্ত আত্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বলিতেছ এখানে দ্বৈতের প্রবেশ নাই সুতরাং বিধি বা ক্রিয়ার ব্যাপার নাই, অথচ বলিতেছ শাস্ত্রমাধ্যমেই ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ জানিতেছ। শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ একথা কীরূপ?

উঃ—যতক্ষণ অবগতি না হয় ততক্ষণ শাস্ত্র-মুখেই স্বরূপ জানিতে হয়। এ ব্যাপারে বিধি-সংস্পর্শ কেন থাকিতে পারে না তাহা উপরে বলিয়াছি। অতএব জ্ঞানকাণ্ডোক্ত ব্রহ্মস্বরূপের ক্ষেত্রে বিধিসংস্পর্শ না থাকিলেও শাস্ত্রপ্রমাণ সম্ভব হইবে। ব্রহ্ম ভৌতিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, সেহেতু তজ্জাতীয় অনুমানেরও বিষয় নহে, সুতরাং শাস্ত্রই এক্ষেত্রে প্রমাণ।

পূর্ব (মীমাংসক):—ধরিলাম শাস্ত্রমুখেই ব্রহ্মকে জানা যায়। কিন্তু, তোমাকে মানিতে হইবে যে, বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করে না। কর্মবিধির অথবা উপাসনা-বিধির অঙ্গরূপেই তাঁহাকে প্রতিপাদন করে। যেমন যূপ ও আহবনীয় এই দুইটি বস্তু অলৌকিক বা অপ্রসিদ্ধ। শাস্ত্র উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিভাবে? না কর্মবিধির অঙ্গভাবে।

উঃ—কেন এরূপ তাৎপর্য মনে করিতেছ?

পূঃ—প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি এই দুইটির কোনও পথে অবশ্যই শাস্ত্র উপদেশ করিবে। শাস্ত্র, হয় প্রবৃত্ত করাইবে, নয় নিবৃত্ত করাইবে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ছাড়া কেবল জ্ঞান বা কেবল বস্তুস্বরূপজ্ঞাপন—শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। দেখ, শাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ পণ্ডিতগণ এরূপ কথাই বলিয়াছেন, “ক্রিয়াবিষয়ক বোধ জন্মানই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, ইহাই সর্বত্র দৃষ্ট হয়”, “চোদনা কি? না ক্রিয়াপ্রবর্তক বাক্য,” “তাহার অর্থাৎ ক্রিয়ার বা ধর্মের জ্ঞান জন্মানই উপদেশ। অর্থাৎ ধর্মজ্ঞাপক বিধিবাক্যই অপৌরুষেয় উপদেশ। অন্য সকল বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ অগ্রাহ্য,” “সেইহেতু, প্রসিদ্ধ অর্থবোধক পদসকলকে ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যের সহিত

মিলিত করিয়া একযোগে অন্বয় করিতে হয়।" সুতরাং পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত করায় এবং বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করায়, যখন শাস্ত্রের সার্থকতা স্থির হইয়াছে, তখন বিধিবিশেষ হিসাবে ছাড়া অন্যকিছুকে স্বতন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা অপব্যাখ্যা। বেদান্তবাক্যসকলকে এই সাধারণ নিয়মে ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের তাৎপর্য নির্ধারণ করিতে হইবে। বেদান্তবাক্যও বিধিপর হইবে। যেমন স্বর্গকামীকে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া করিতে হয়, সেইরূপ অমৃতকামীর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত।

উঃ—পূর্বেই বলিয়াছি—দুইটি জিজ্ঞাসা বিলক্ষণ, বিভিন্ন। কর্মকাণ্ডে জিজ্ঞাস্য ধর্মপ্রাপ্তি কিরূপে হয়। আর জ্ঞানকাণ্ডে জিজ্ঞাস্য—নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ পূর্ব হইতেই প্রাপ্তসিদ্ধ ব্রহ্ম। অতএব অনুষ্ঠানসাপেক্ষ ধর্মফল হইতে জ্ঞানফল বিলক্ষণ হইবে।

পূঃ—এরূপ হইতে পারে না। কার্যবিধির অঙ্গ বা প্রযুক্তি হিসাবেই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যথা "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", "য আত্মা অপহতপাপ্মা, সোঽন্বেষ্টব্যঃ। স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ", "আত্মা ইত্যেব উপাসীত", "আত্মানমেব লোকমুপাসীত", "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—এই সমস্ত বাক্যের উপদেশ বা বিধি বিদ্যমান বলিয়া জিজ্ঞাসু জানিতে আকাঙ্ক্ষা করে "কে এই আত্মা?" "কি সেই ব্রহ্ম?" সেজন্য আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ-বোধক বাক্যসকল রহিয়াছে। যথা, ব্রহ্ম নিত্য সর্বজ্ঞ সর্বগত নিত্যতৃপ্ত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। তিনি বিজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন। তাঁহার উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক মোক্ষফল লাভ হয়। এইভাবে বেদান্তবাক্যসকলকে করণীয় বিধির অনুগত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা, শুধু "সপ্তদ্বীপা বসুমতী" "ঐ রাজা যাইতেছে" জানিয়া যেমন পুরুষের হানি বা লাভ কিছুই হয় না, বেদান্তবাক্যসকল ক্রিয়ার অঙ্গ নহে বলিয়া জানিলে তাহাদের আনর্থক্যই প্রতীত হইবে।

উঃ—অবগতিমাত্রই যে কিরূপে ফলোদয় হয় তাহা তোমাকে বলিতেছি। ইহা সর্প নহে, রজ্জু—ইহা জানার সঙ্গেসঙ্গেই ভ্রান্তি-জনিত সর্পভয় নিরস্ত হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমি অসংসারী কূটস্থ সাক্ষী—এই জ্ঞান হওয়ামাত্রই সংসারভীতি নিরস্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

মা কালী

স্বামী গীতানন্দ

দুই নিয়েই হচ্ছে 'দুনিয়া'; যতক্ষণ পর্যন্ত এক রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও নেই, তুমিও নেই, জগৎও নেই; কি যে রয়েছে, তাও মুখে বলা যায় না। কারণ, বলতে গেলেই একজনকে বলতে হবে এবং একটা বিষয় সম্বন্ধে বলতে হবে। সুতরাং দুই এসে গেল। তাই বলছিলাম যে দুই না হলে জগৎ-সংসার চলে না

অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ইচ্ছা হল—"আমি একা, আমি বহু হব।" এই হল সৃষ্টির আরম্ভ। "আমি বহু হব"—অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্রহ্ম নিজেকেই অনেক রূপে সৃষ্টি করলেন, কারণ তিনি ছাড়া তো দ্বিতীয় কিছু নেই।

ব্রহ্ম এবং শক্তি অভেদ। যখন তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলে ভাবা হয়, তখন ব্রহ্ম বলা হয়।

আর যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন বলে ভাবা হয়, তখন তাঁকেই শক্তি বলা হয়, কালী বলা হয়। একই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন — যেমন সাপ আর তার তীর্যক গতি, দুধ আর তার ধবলত্ব। তাই রামপ্রসাদ গান ধরলেন :

'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'

ব্রহ্মের এই স্থিরত্ব এবং চঞ্চলত্ব—একই সঙ্গে কালীর প্রতিমায় রূপ নিয়েছে। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন এবং তাঁরই উপর শিবের শক্তি কালী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে চলেছেন। শিব অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলেই কালী তাঁর উপর এই জগৎ-প্রপঞ্চ নিয়ে খেলা করছেন।

পুরুষ এবং প্রকৃতি এক সঙ্গে না হলে কোন কাজই হয় না। প্রকৃতিই কাজ করে যান, আর পুরুষ স্থির হয়ে থাকেন; কিন্তু পুরুষকে ছাড়া প্রকৃতি আবার কাজও করতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন উপমা দিয়েছেন : 'বাড়ীর গিন্নী কাপড়ে হলুদ মেখে চারিদিকে ছুটোছুটি করে সব কাজকর্মের তদারক করছেন, আর মাঝে মাঝে কর্তার কাছে গিয়ে হাতমুখ নেড়ে সব বলে যাচ্ছেন। কর্তা হুঁকো টানতে টানতে সব শুনে যাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে দুই একবার হুঁ হুঁ করে সায় দিয়ে যাচ্ছেন।' সৃষ্টি যতক্ষণ, ততক্ষণ ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তিকে আলাদা বলে বোধ হলেও মূলতঃ ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ।

কালীরূপ হল দশমহাবিদ্যার মধ্যে একটি রূপ। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ করবেন। পৃথিবীর সবাই আমন্ত্রিত হয়েছেন, কেবল হন নাই তাঁরই এক মেয়ে উমা এবং তাঁর স্বামী শিব। কারণ শিব পাগলের মত ঘুড়ে বেড়ান, ভাঙ্গ খান আর ভিক্ষা করেন ইত্যাদি। শিব হচ্ছেন ভোলানাথ, নিমন্ত্রণ করেন নাই—বয়েই গেল; প্রজাপতি দক্ষেরই যজ্ঞ পূর্ণ হবে না; শিবহীন যজ্ঞ কখনও হয়! কিন্তু মেয়ে উমা তা শুনবেন কেন? বাবা এত বড় যজ্ঞ করছেন, আর তিনি যাবেন না তা কি হয়! উমা যেতে চাইলেন দক্ষের যজ্ঞসভায়। শিব নিষেধ করলেন, "যখন নিমন্ত্রণ করেন নাই, তখন ওখানে গিয়ে কাজ নেই—যেয়ো না উমা যাবার জন্য জিদ করতে লাগলেন শিবও কিছুতেই যেতে অনুমতি দেবেন না। তখন উমা শিবের সামনে দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করলেন। প্রথমেই কালীমূর্তি। শিব ঐ মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন—দেখেন সেদিকে রয়েছেন আর এক ভয়ঙ্কর মূর্তি—তারা। এইভাবে শিব যে দিকেই ঘুরে দাঁড়ান, সেই দিকেই দেখেন এক এক মূর্তি। অবশেষে শিব বাধ্য হয়েই অনুমতি দিলেন।

ধ্যানে মা কালীর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা যেমন ভয়ঙ্কর, আবার তেমনি অদ্ভুত! প্রথমেই বলা হয়েছে মা করালবদনী, আবার পরেই বলেছে মুখমণ্ডল 'সুখপ্রসন্ন।' রুদ্র এবং মধুর ভাবের অপূর্ব সমন্বয় এই কালীমূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। মা দিক্‌বসনা; গায়ের রং ঘন মেঘের মত কালো এবং কেশপাশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সুন্দর বলতে যে ধারণা আমাদের রয়েছে, তাতে মা কালীর এই রূপ, আর যাইহোক, সুন্দর বলা যায় না। কিন্তু যাঁরাই মায়ের এই রূপের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, তাঁরা বলেছেন, 'মায়ের রূপে ভুবন আলো', 'এ বড় আশ্চর্য কালো'। মায়ের চার হাত— বাম দিকের দুই হাতে নরমুণ্ড এবং খড়্গ আর ডান দিকের দুই হাতে বর এবং অভয় মুদ্রা। গলায় রয়েছে নরমুণ্ডমালা। মা জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছেন শিবের উপর। এইরূপে মা কালীকে চিন্তা করা হয়। একদিকে খড়্গ

আবার অন্যদিকে বর এবং অভয়—পালন এবং বিনাশের প্রতীক। আর মাতৃমূর্তি, তাই সৃষ্টিরও প্রতীক। বিরুদ্ধ ভাবের অপূর্ব সমাবেশ হয়েছ এই কালীমূর্তিতে। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারী ঈশ্বরের সব ভাবেরই সমাবেশ এখানে। ঈশ্বরের সৃষ্টি ও পালন এদুটি রূপ গ্রহণ করে সাধারণতঃ তাঁর যে বিনাশের ভয়ঙ্কর রূপটিকে আমরা ভুলে থাকতে চাই, কালী হচ্ছেন মুখ্যতঃ সেই ভয়ঙ্করের প্রতীক; কালীর উপাসনা হচ্ছে তাই ভয়ঙ্করের উপাসনা। স্বামীজী কালীর রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা জীবন্ত এবং ভয়প্রদ। কবিতাটি লিখে স্বামীজী বাহ্য সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান। সেই কবিতাটির কয়েকটি লাইন (অনুবাদ):

"করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড
বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর
পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে
বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে
আসে।"

এদিক থেকে দেখতে গেলে মাকে পাবার অধিকারী, তাঁর যোগ্য সাধক জগতে খুবই কম। তবুও মাকে ডাকবার অধিকার তো সকলেরই রয়েছে, আর কালীরূপের মধ্যেই রয়েছে বহু ভাবের সমাবেশ। মাতৃভাব তো আছেই। সুতরাং সাধক মায়ের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয় পায় না—জানে ভয়ঙ্করী হলেও ইনি মা।

শিবকে যদি আমাদের পরমাত্মা-রূপে কল্পনা করা যায় তা হলে, কালী হচ্ছেন আমাদের প্রকৃতি—মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়। শিব শবের মত পড়ে রয়েছেন—আত্মা নির্বিকার। বাইরের চাঞ্চল্য তাঁকে স্পর্শ করে না। আর এই আত্মার উপর অধিষ্ঠিত হয়েই মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় আদি নৃত্য করে চলেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ যখন হঠাৎ সেই পরমাত্মার সম্মুখীন হয়, তাঁকে স্পর্শ করে ফেলে, তখন তার সমস্ত চাঞ্চল্য থেমে যায়, যেন লজ্জায় সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়—যেমন মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন শিবের ওপর জিভ বার করে। যখন আত্মার সাথে অনাত্মার মিলন হয়, পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার, তখনই কালীর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

অনাদি কাল থেকেই কত সাধক ভগবানকে কালীরূপে দর্শন করেছেন। ভগবান বিভিন্নরূপে ভক্তের সামনে উপস্থিত হন—কালী তাঁরই একটি বিশেষ রূপ। রামপ্রসাদ মাকে এইরূপে দর্শন করেছেন। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও কালীরূপে তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সাথে কথা কয়েছেন। আরও কত সাধক, কে তার খবর জানে!

যতক্ষণ পর্যন্ত না দর্শন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্তই কালী এবং ভগবানের বিভিন্ন রূপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে অথবা রামপ্রসাদের কাছে এ ব্যাখ্যা অর্থহীন। তাঁদের কাছে মা-ই পরম সত্য, তাঁকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ভগবানের রূপের ব্যাখ্যার প্রয়োজন ততক্ষণই, যতক্ষণ না তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারছি। তাঁকে দর্শন করলে এসবই—মনবুদ্ধি পর্যন্ত দূরে পড়ে থাকে

স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১২ই জুন সকাল ৭-৩৫ মিঃ সময়ে ৺কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ ৮৩ বৎসর বয়সে 'ক্রনিক ইউরেমিয়া' রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ চলা-ফেরার সামর্থ্য তাঁহার প্রায় ছিল না।

বারাণসীর মণিকর্ণিকাঘাটে গঙ্গাগর্ভে তাঁহার দেহ সলিল-সমাহিত করা হয়। এই উপলক্ষে গঙ্গাতীরে বহুসংখ্যক সাধুর সমাগম হইয়াছিল।

স্বামী প্রেমেশানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য; তাঁহার রচিত অনেকগুলি পুস্তক আজিও এই নাম বহন করিতেছে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীহট্ট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র শ্রীহট্ট জেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-প্রচারের কাজে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার উচ্চ আদর্শনিষ্ঠ, তপঃপূত, নিঃস্বার্থ সেবারত সহজ সরল জীবনের সংস্পর্শ মানুষকে উচ্চাদর্শে আকৃষ্ট করিত; তাঁহার পূত জীবনের সংস্পর্শে আসার ফলে বেশ কয়েকজন যুবক অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন।

কিছুকাল তিনি ঢাকা ও সারগাছি আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুকাল বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যও ছিলেন। উত্তরাখণ্ডে থাকিয়া তিনি কয়েক বৎসর তপস্যা ও সাধনভজনে অতিবাহিত করেন।

কর্মজীবন হইতে অবসরগ্রহণের পর দীর্ঘ কয়েক বৎসর কাল তিনি সারগাছি আশ্রমে বাস করিয়াছেন। এখানে দূরদূরান্ত হইতে সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ তাঁহার নিকট সমাগত হইতেন—তাঁহার আজীবন-সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক জীবনের সংস্পর্শে নিজ নিজ জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভের আশায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ে বাংলায় তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কয়েকটি সুললিত ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতও তিনি রচনা করিয়াছেন; সঙ্গীতগুলি রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত ও অতি সমাদৃত। তাঁহার জীবনে উচ্চ আদর্শবাদের সহিত ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের সমভাবে প্রসারের জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।

তাঁহার দেহত্যাগে আমরা একজন উন্নতজীবন, হৃদয়বান, মিষ্টভাষী সন্ন্যাসীকে হারাইলাম, যাঁহার সমীপাগত হইলেই মন-প্রাণ ভরিয়া যাইত।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে মিলিত হইয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

সমালোচনা

The Concept of Self: Kamala Roy: Pp 305, Price Rs. 20/— Published by Firma K. L. Mukhopadhayay, 6/1A Banchharam Akrur Lane. Calcutta-12

আলোচ্য গ্রন্থখানি মূলতঃ লেখিকার একখানি গবেষণা-গ্রন্থ। এই গবেষণার ফলেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল্. উপাধি পেয়েছেন। গ্রন্থখানির মধ্যে সর্বত্র লেখিকার অধ্যয়নের ব্যাপ্তির ও গভীর মনন-শীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের মত পরিবেশনে তিনি নির্ভীক ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থখানি মোটামুটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আত্মার স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-সম্পর্কের দিক থেকে, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তত্ত্ববিদ্যার দিক থেকে ঐ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখিকা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্দের মতবাদ অসামান্য নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। লেখিকার মূল সিদ্ধান্ত আলোচ্য গ্রন্থের ২৭৪-৩০০ পৃষ্ঠার মধ্যে পাওয়া যাবে। প্রথমে আত্মার অবিষয়তা প্রমাণ করে লেখিকা দেখিয়েছেন যে মানুষের অনুভূতির নিরবচ্ছিন্নতা ও অখণ্ডতা সম্যক্ ব্যাখ্যা করতে হলে প্রয়োজন হচ্ছে দুটি তত্ত্বের সমন্বয়; একটি হোল অদ্বৈত-বেদান্তের সাক্ষি-চৈতন্য, অপরটি আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের গতিশীল অচেতন-বাদ। অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে লেখিকা প্রমাণ করেছেন যে 'অচেতন' আসলে চৈতন্যহীন নয়; অচেতন অতি-চেতনের সঙ্গে অভিন্ন (পৃঃ ২৮৯)। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ব-বাদীদের 'অচেতন-'কে অবিষয় রূপে উপলব্ধি করা যায় না বলেই 'অচেতন'-কে শুদ্ধ চৈতন্য নামে অভিহিত করা সুকঠিন। লেখিকার মতে, অদ্বৈত-বেদান্তের সাক্ষি-চৈতন্য নিষ্ক্রিয়; সেইজন্য শুধু সাক্ষি-চৈতন্যের সাহায্যে আত্মার বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্নতা ও অখণ্ডতা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব, 'গতিশীল অচেতন' হচ্ছে সাক্ষি-চৈতন্যের পরিপূরক। অচেতনের গতিশীলতার সাহায্যেই অনুভবের নিরবচ্ছিন্নতা ব্যাখ্যা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। লেখিকা 'সাক্ষী'র সঙ্গে 'অন্তঃকরণ-বৃত্তি'র সম্পর্ক যদি আরও গভীরভাবে, বিশ্লেষণ করে দেখতেন, তাহলে 'সাক্ষি-চৈতন্য নিষ্ক্রিয়' —এই অভিযোগ হয়ত আনতে হত না। সাক্ষী জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার মধ্যে অনুস্যূত; কিন্তু অন্তঃকরণ-বৃত্তি শুধু জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের মধ্যে কাজ করে। আসলে, অদ্বৈত-বেদান্ত-মতে অন্তঃকরণ-বৃত্তির সাহায্যেই জীবের অনুভূতির নিরবচ্ছিন্নতা ও ক্রিয়াশীলতা ব্যাখ্যা করা যায়।

সমালোচকের চোখে বইখানির মধ্যে যে যে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, তার কয়েকটির প্রতি পাঠকের ও লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লেখিকার মতে ডেকার্ট 'সন্দেহাত্মক' ও 'মিথ্যা' একই অর্থে ব্যবহার করেছেন (পৃঃ ৯৪)। কিন্তু ডেকার্টের বইগুলি পড়লে এই মত যুক্তিসহ বলে মনে হবে না। রয়েস্ 'আইডিয়া'-র আন্তর তাৎপর্য আত্মার অবিষয়তা-প্রসঙ্গে আলোচনা করেননি; কাজেই লেখিকার

সমালোচনা (পৃঃ ৯৩) অবান্তর বলে কোন কোন পাঠকের মনে হতে পারে 'Royce grants his ideas an External Meaning as well,' (পৃঃ ৯৩) এই বাক্যে ideas কথাটি "ideas"—এই ভাবে প্রকাশ না করলে অর্থ বোঝা যায় না। কাণ্ট 'Subjectivity' কথাটি আত্মার ক্ষেত্রে প্রায় 'অবিষয়' অর্থে ব্যবহার করেছেন—লেখিকা এই মত পোষণ করেন (পৃঃ ৯৫)। এখানেও পাঠকের মনে বিভ্রান্তি ঘটবার আশঙ্কা আছে। কারণ, কাণ্ট কখনও বিষয় ছাড়া বিষয়ীর কথা ভাবেননি। সেইজন্য তাঁর মতে analytic unity ও synthetic unity পরস্পর নির্ভরশীল। লেখিকা অদ্বৈত-বেদান্ত-মত উল্লেখ করে বলতে চাইছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টির মূলে কোন উদ্দেশ্য নেই (পৃঃ ২৭৮); অথচ পরের পৃষ্ঠাতেই (পৃঃ ২৭৯) লেখিকা বলছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টির মূলে রয়েছে গতিশীলতা ও উদ্দেশ্য। সাক্ষি-চৈতন্যের কাজ কি? এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখিকা মন্তব্য করেছেন যে শাংকর বেদান্তে জীবের অনুভূতির নিরবচ্ছিন্নতা ও সমন্বয় সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে অবহেলা দেখান হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তের গ্রন্থগুলি পড়লে অবশ্য দেখা যায় যে জীবের অনুভূতির নিরবচ্ছিন্নতা, অখণ্ডতা ও ঐক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে অধ্যাসের সাহায্যে। ২৭৬ পৃষ্ঠার ১৩—১৪ পঙ্‌ক্তিতে 'those' ও 'these' শব্দদুইটির প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত নয়।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই রুচিসম্মত। প্রত্যেক দর্শনানুরাগী পাঠকের মনে বইখানি আশা ও আনন্দের সঞ্চার করবে।

—অমিয়কুমার মজুমদার

প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ বিবৃতিসমেত)—রাজানক ক্ষেমরাজ বিরচিত। অনুবাদক: শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী। প্রকাশক: মৃদুলকান্তি সেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৬০ + ৮৵. ; মূল্য দুই টাকা।

'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্' প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শৈব সাহিত্যে এই গ্রন্থের স্থান অতি উচ্চে। জীব স্বরূপতঃ শিবই, তাহা যখন গুরুকৃপায় জানিতে পারে অথবা স্ব-স্বরূপ প্রত্যভিজ্ঞাত হয়, তখনই জীব শিবত্বে নিমজ্জিত হয়। জীবের একান্তকাম্য মোক্ষলাভের জন্যই প্রত্যভিজ্ঞা বা জীব-শিবের অভেদত্ব-প্রত্যক্ষের আবশ্যকতা।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির মূলানুগ সুন্দর অনুবাদ পাঠ করিলে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকেরও শৈব দর্শন অনুশীলন করিবার আগ্রহ হইবে। স্বনামখ্যাত দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থখানির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত 'প্রাক্‌কথন' (ভূমিকা) লিখিয়া দিয়া ইহার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়াছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংস্কৃত-প্রসার-গ্রন্থমালা'র মধ্যে 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্' গ্রন্থখানি স্থান লাভ করায় আমরা আনন্দিত।

হিমালয়ের চারধাম—স্বামী শ্যামলানন্দ। শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ ভট্টনগর, হাওড়া হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৯ ; মূল্য দুই টাকা।

'হিমালয়ের চারধাম' পুস্তকে প্রধানতঃ কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী—এই চারধামের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে, এতদ্ব্যতীত পথের অন্যান্য তীর্থের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। গল্প বলার মত করিয়া বিষয়বস্তু পরিবেশিত হওয়ায় পড়িতে বেশ ভাল লাগে। শুধু পর্যটকের দৃষ্টি লইয়াই ভ্রমণকাহিনী পরিবেশিত হয়

নাই, শ্রদ্ধাভক্তির ভাব সমগ্র পুস্তকখানিতে পরিস্ফুট। তীর্থযাত্রীরা অনেক বিষয়ে পুস্তকটির মাধ্যমে পথনির্দেশ পাইবেন—যথা, কোন্ তীর্থে কিরূপ সুবিধা অসুবিধা, বাস-রুট, হাঁটা-পথ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কিছু দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি তীর্থ-যাত্রীদের সঙ্গে রাখার যোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ-পত্র—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সংকলিত। **প্রকাশক:** ব্রহ্মচারী অব্যক্তচৈতন্য, ডি ২৩।৬ হাতিফটক, বারাণসী। পৃষ্ঠা ৬৩+১৩; মূল্য দুই টাকা।

মহাপুরুষগণের লিখিত পত্রাবলীর মাধ্যমে তাঁহাদের স্বরূপ এবং উচ্চ চিন্তাধারা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করিতে পারা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের ৪৯ খানি মূল্যবান পত্র তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সংকলিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দেখিয়া আমরা আনন্দিত। গ্রন্থারম্ভে পূজ্যপাদ মহারাজ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

Fire from the Flint Eternal—Published by Sri Ramakrishna Premananda Ashrama, Antpur, Hooghly. Pp. 10 ; price 25 p.

আলোচ্য পুস্তিকাখানি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিময়ী বাণীর সংকলন। স্বামীজীর ভাবাদর্শ, কর্তব্য, প্রার্থনা, শিক্ষা, নারীজাতির আদর্শ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বাণীগুলি বর্তমান সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত হইয়াছে। পকেট-সাইজ পুস্তিকাটি তরুণ সম্প্রদায়ের সর্বদা সঙ্গে রাখিবার উপযুক্ত।

ঠাকুর হরিদাস—রামকিঙ্কর দাস সংকলিত। শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর ট্রাষ্ট, শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ, স্বর্গদ্বার, পুরী হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬৫; মূল্য পাচ টাকা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ ও পরিকর ঠাকুর হরিদাসের স্থান ভক্তিজগতে অতি উচ্চে। তিনি ছিলেন ভক্তশিরোমণি। কত লৌহময় জীবন যে তাঁহার স্পর্শমণির স্পর্শে কাঞ্চন-জীবনে পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থখানি মহাভক্ত শ্রীহরিদাসের একখানি প্রামাণিক জীবনচরিত। সংকলনকর্তা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত—এই গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রধানতঃ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস ভক্ত পাঠক-গণের নিকট গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

(১) অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ, (২) মমতাময়ী মা সারদা, (৩) শ্রদ্ধার্ঘ্য (স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীতালেখ্য), (৪) বৈয়াসকী বাসুদেবাষ্টমী—শ্রীসুধীরকুমার দত্ত, বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা ১৭, ৩৩, ২১, ২০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গীতি-আলেখ্যগুলি বহুস্থানে পরিবেশিত হইয়া অসংখ্য শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়াছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় সুধী লেখকের মহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও রচনামাধুর্য কিরূপ। যে উদ্দেশ্যে পুস্তিকাগুলি রচিত, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় আমরা লেখককে অভিনন্দন জানাইতেছি।

আরুণি (১৯৬৬-৬৭)—নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পত্রিকা, প্রকাশক: সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৯০।

'আরুণি'তে প্রকাশিত অধিকাংশ লেখা পঞ্চম হইতে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের। বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রত্যেকটি লেখা সযত্নকৃত এবং সুসম্পাদিত। ছোটদের রচনাগুলিতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পরিস্ফুট।

ফাল্গুনী (১৯৬৬-৬৭)—নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয় পত্রিকা, প্রকাশক: সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা।

এ বৎসরের সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত 'ফাল্গুনী' পত্রিকাটিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা: ভগিনী নিবেদিতা, একটি কাল্পনিক সংলাপ, অংশীদারী কারবার, A visit to Heaven, Vidyasagar.

পত্রিকাখানি ইহার পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পত্রিকা—(তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৬৭) প্রকাশক: সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, কামারপুকুর, হুগলী। পৃষ্ঠা ১০৪+২৪।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মস্থান শ্রীধাম কামারপুকুরে নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য বিজ্ঞান ও কৃষি—এই ত্রিধারা-সমন্বিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের আলোচ্য পত্রিকাখানিতে তরুণ ছাত্র-লেখকদের লেখায় চিন্তাধারার নিজস্বতা দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন বিষয় বস্তু অবলম্বনে রচিত শিক্ষকগণের অনেকগুলি ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ এবং কয়েকটি বাংলা কবিতা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ছবিগুলি ইহার শোভাবর্ধন করিয়াছে। আমরা পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

Viveka (March, 1967)—The Vivekananda College Magazine—Published by Prof. K. Srinivasam, Vivekananda College, Madras 4

মাদ্রাজের বিবেকানন্দ কলেজের নাম সারা ভারতে সুপরিচিত। এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লিখিত সুচিন্তিত রচনাবলী 'বিবেক' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাটির কয়েকটি বিভাগ: ইংরেজী, তামিল প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি ভাষা, হিন্দী, সংস্কৃত। প্রত্যেক বিভাগেই অনেকগুলি করিয়া লেখা দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজী বিভাগটিই সর্বাপেক্ষা বড়—পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪। কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত 'College Day' বিবরণীতে মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মধারার একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

আশ্রম (১৩৭৩)—রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম। প্রকাশক: কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৬০।

এবারের বার্ষিক পত্রিকাখানিতে আশ্রম-পরিচালিত মহাবিদ্যালয় এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। অধ্যাপক ও শিক্ষকবৃন্দের রচনাবলী সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

স্মরণিকা (১৩৭৩)—সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ৭৬বি, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০ পৃষ্ঠা ৫০।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকাটিতে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। এই স্মরণিকা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও যুগাচার্য স্বামীজীর প্রতি সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের খরাত্রাণ সেবাকার্য

'উদ্বোধন' ও অন্যান্য পত্রিকা মারফৎ আপনারা অবগত আছেন, রামকৃষ্ণ মিশন গত মে মাস হইতে বাঁকুড়া জেলায় হাট-আস্থরিয়া অঞ্চলে ও পুরুলিয়া জেলায় পরা অঞ্চলে খরাত্রাণ সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। এছাড়া আরও তিনটি অঞ্চলে—বাঁকুড়া জেলার দধিমুখী ও খাণ্ডারী এবং পুরুলিয়া জেলার হুরা অঞ্চলে মিশনের সেবাকার্য সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং বাঁকুড়া জেলার আরও কয়েকটি অঞ্চলে সেবাকার্যের প্রসারের কথা চিন্তা করা হইতেছে।

এ পর্যন্ত এই সেবাকার্যের জন্য ৯৭,০০০৲ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে; আসিয়াছে মাত্র ২৯,৫০০৲। এ অবস্থায় কাজ বাড়ানো সমীচীন না হইলেও ঐ সব অঞ্চলের লোকের নিদারুণ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া মিশন ইহা না করিয়া পারে নাই।

সেজন্য জনসাধারণের নিকট পুনরায় অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। পূর্বে তাঁহারা যেমন মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া আমাদের সেবাকার্য সফল করিয়াছেন, এবারও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না নিশ্চয়ই।

এই খরাত্রাণ কার্যের জন্য নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলির যে কোনটিতে অর্থ বা দ্রব্যাদি পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। চেক পাঠাইলে 'Ramakrishna Mission' এই নামে লিখিতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময়, পশ্চিমবঙ্গের খরাত্রাণ সেবাকার্যের জন্য যে উহা প্রেরিত, তাহা উল্লেখ করিবেন।

মধ্যবিত্ত জনসাধারণও যাহাতে অনায়াসে সাহায্য করিতে পারেন সেজন্য ৫৲ টাকার ও ১৲ টাকার কুপন ছাপানো হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে উহা পাওয়া যাইবে।

এই সব কেন্দ্রের যে কোনটিতে সাহায্য পাঠাইতে পারেন:

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

২। রামকৃষ্ণ মঠ, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৩। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯

৪। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পোঃ—বিবেকানন্দ নগর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

৫। রামকৃষ্ণ মিশন, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

৬। রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লী-১

৭। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বে ৫২-এ.এস.

৮। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, গুজরাট।

বেলুড়,
৩০. ৬. ৬৭

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্য যথাযথভবে পরিচালিত হইতেছে। গত মে মাসে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়:

(১) **বিহারে** (ক) হাজরীবাগ জেলায় ইটখোরী ও চম্পারণ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৭,০৮৫ কেজি গম, ১৩,৯২৮ কেজি বাজরা, ১ খানি ধুতি, ৩০টি পোশাক, ১ খানি গরম কম্বল, ১২৩টি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১৫,৬১১। হান্টারগঞ্জ ব্লকে ৩,৫৬৭ জনকে কলেরা ইঞ্জেকশন দেওয়া হইয়াছে।

(খ) সাঁওতালপরগণা জেলায় রিখিয়া কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মুঙ্গের জেলায় জামুই, ঝাঝা ও চকাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬১,৬২৯ কেজি গম, ৫৪৮ কেজি জোয়ার, ১,০০০টি মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট, ১৫০ কেজি গুঁড়া দুধ, ২৫ পাউণ্ড জেলি, ৫৪টি ধুতি ও শাড়ী ইত্যাদি, ৩১৮ খানি কম্বল, ১০০টি শিশু-পরিচ্ছদ, ১,১৭৯টি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা--১০,৮৬৬।

(২) **উত্তর প্রদেশে** মির্জাপুর জেলায় কানহারা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২৬,৪৩৯ কেজি গম, ৬৯৫ কেজি গুঁড়া দুধ, ১০৭ কেজি বিস্কুট, ৩৭·৫ কেজি শিশু খাদ্য, ২০,৩০২টি ভিটামিন ট্যাবলেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৫,১৮১।

(৩) **পশ্চিমবঙ্গে** (ক) পুরুলিয়া জেলায় পরা ও ঝাপড়া সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৬৯·৫ কেজি চাল বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৫১৩।

(খ) বাঁকুড়া জেলায় হাট-আস্থরিয়া সেবা-কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,০০১·৫ কেজি গম ২,৮৫৮ জনকে বিতরণ করা হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় দধিমুখী নামক স্থানে আরও একটি সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী এবং রামহরিপুরে সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইতেছে।

কার্যবিবরণী

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ বার্ষিক কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লণ্ডনের এই কেন্দ্রটি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বামী ঘনানন্দজী মহারাজ কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ৬৮নং ডিউকস অ্যাভেনিউ, মাসওয়েল হিল, লণ্ডন এন. ১০-এ নিজস্ব ভবনে উঠিয়া আসে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ৫৪ নং হল্যাণ্ড পার্ক, লণ্ডন ডব্লিউ. ১১-তে একটি নূতন বাড়ী ক্রয় করিয়া সেখানে শাখাকেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে লণ্ডনের প্রধান কেন্দ্র এবং শাখা - উভয় স্থানে নির্ধারিত কর্মধারা যথারীতি অনুসৃত হইয়াছে।

লণ্ডন প্রধান কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত 'Vedanta for East and West' পত্রিকাখানি ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ১,০০০ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের পুস্তকাবলী কেন্দ্র হইতে বিক্রীত হইয়াছে।

ক্রেতাগণের মধ্যে অনেকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের এবং ইউ. এস. এ., নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী।

কমনওয়েলথ সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া গত ১১ই জুন, ১৯৬৬ লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী মহারাজ ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের সন্নিকট সেন্ট মার্টিন্‌-ইন-দি-ফিল্ডস-এ বিভিন্ন ধর্মের আলোচনানুষ্ঠানে হিন্দুধর্মের আলোচনা-সভাটি পরিচালনা করেন এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এই সভায় ব্রিটেনের মাননীয়া রানী, ডিউক-অব-এডিনবার্গ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

মার্লবরো-ভবনে যে সম্বর্ধনা-সভা হইয়াছিল বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী ঘনানন্দজী তাহাতেও যোগদান করেন। এই সভাতেও রাজপরিবার উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬ ওয়েস্টমিনিস্টারের ডিন-এর আমন্ত্রণে ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবে-তে মানবীয় অধিকার দিবসে (Human Rights Day) স্বামী ঘনানন্দজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ করেন।

স্বামী ঘনানন্দজী জুরিখ, এথেন্স, গ্রেজ-স্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্ত কেন্দ্র (প্যারিস হইতে ২২ মাইল) ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন এবং ধর্মালোচনা করেন। পূর্ব লণ্ডনে একটি বিদ্যালয়ে তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

স্বামী পরাহিতানন্দ ৫৪ নং হল্যাণ্ড পার্কে ৩৪টি রবিবাসরীয় সভার পরিচালনা করেন। লিসেস্টারে এবং অন্যান্য স্থানে ও সাদামটন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১৩টি বক্তৃতা দেন।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী, দুর্গাষ্টমী, খৃষ্টজন্মদিনও যথারীতি উদ্‌যাপন করা হইয়াছে। উৎসবসমূহে এবং অনুষ্ঠিত ক্লাস-সমূহে যোগদানকারী শ্রোতৃবৃন্দের মোট সংখ্যা আট সহস্রাধিক হইবে। লণ্ডনের উভয় আশ্রমে অনুরাগীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৩—মার্চ, ১৯৬৬) প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার ১২ মাইল উত্তরে প্রশস্ত ৭০ একর ভূখণ্ডের উপর এই কেন্দ্রে বিভিন্ন শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই আবাসিক বিদ্যার্থী আশ্রম ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ৩৭টি নিরাশ্রয় অনাথ বালককে লইয়া আরম্ভ করা হয়, বর্তমানে ইহা পশ্চিমবঙ্গের একটি আদর্শ ও অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত। এখানে ৭৩১টি অনাথ বালক সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে এবং ১৫১টি বালক খরচ দিয়া থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবার সুযোগ লাভ করিতেছে। ইহা ছাড়া বেসিক ট্রেনিং কলেজের ২১২ জন ছাত্র, ২৩ জন গ্রন্থাগারিকতা-শিক্ষণকেন্দ্রের ছাত্র এবং ২০ জন ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজের ছাত্রও আশ্রমিক ছাত্রগণের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ১,১৩৭। দশজন ত্যাগব্রতী এবং ২৭৬ জন বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মী ছাত্রদের দেখাশুনা ও শিক্ষাদান করেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education): রহড়া আশ্রম বুনিয়াদী শিক্ষার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। এই বিভাগে অনেকগুলি বিদ্যায়তন রহিয়াছে। একটি প্রাক্‌-বুনিয়াদী (নার্সারি) বিদ্যালয়, ৩ হইতে ৫ বৎসরের ছেলেদের

জন্য, ছাত্রসংখ্যা ৪৫; ৫টি ইউনিট-সমন্বিত জুনিয়র বেসিক স্কুল, ৬ হইতে ১১ বৎসরের ছেলেদের জন্য, ছাত্রসংখ্যা ৮৩৩; ৪টি ইউনিট-সমন্বিত সিনিয়র বেসিক স্কুল, ছাত্রসংখ্যা ৪৫৮। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৬। স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কারুশিল্প, সূচীশিল্প, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, কৃষি প্রভৃতি শিখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১১৬ জন শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষালাভ করেন।

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিষয় নির্বাচনের জন্য চারটি ধারা আছেঃ বিজ্ঞান, সাহিত্য, যন্ত্র- ও শিল্প-বিদ্যা, বাণিজ্য। ছাত্র-সংখ্যা ৩৭৪, শিক্ষক-সংখ্যা ৪১।

বিবেকানন্দ শতবার্ষিক মহাবিদ্যালয় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে খোলা হইয়াছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৩১৩। ১০০ জন বিদ্যার্থী লইয়া একটি ছাত্রাবাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এবং ভোকেশন্যাল স্কুলে ২৯২ জন শিক্ষালাভ করিতেছে।

জেলা গ্রন্থাগারটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিয়াছে, ইহার পুস্তকসংখ্যা ১১,৬৮৬ এবং গ্রাহকসংখ্যা ১,০০০।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে গুরুকুল প্রথায় পরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে থাকিয়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পায়। আংশিক ব্যয় বা পূর্ণ ব্যয় বহনকারী নৈতিক শিক্ষা-গ্রহণেচ্ছু কিছুসংখ্যক ছাত্রও এখানে থাকে। আহার-বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পুস্তকাদি—ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাত্রেরা এখানে পাইয়া থাকে। প্রাচীন গুরুকুল প্রথার সহিত আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সমন্বয়ের আদর্শে গঠিত এই শিক্ষায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্রগঠনেরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় অঞ্চলে সমাজসেবার কাজেও বিদ্যার্থীরা অংশ গ্রহণ করে।

আলোচ্য বর্ষশেষে মোট ৯৩ জন আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে ছিল ৬৯ জন; ১৪ জন আংশিক এবং ১০ জন পূর্ণ খরচ বহন করিয়াছে। বিদ্যার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৪ জন এম. এসসি. পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারজনই উত্তীর্ণ হইয়াছে; একজন ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের গ্রন্থাগারে ৩,২০০ খানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ রাখা হইয়াছে। ২০টি সাময়িক ও ৬টি দৈনিক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ। সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ৩ বৎসরের ডিপ্লোমাকোর্স-এ শিক্ষাদান-কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। বর্তমান বৎসরে শিল্প-পীঠের ছাত্রসংখ্যা ৭২০।

উৎসব সংবাদ

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ও আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক উৎসব গত ১১ই মে হইতে ১৫ই মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১১ই মে সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বেলুড় মঠের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডঃ অসিত বন্দোপাধ্যায়, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী ও সভাপতি মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দানে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। সভাপতি মহারাজ বলেন যে স্বামীজীর বাণীর জীবনরূপায়ণই বর্তমান সর্ববিধ সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায়। সভার পর কলিকাতার "নিবেদন সঙ্গীত শিক্ষার আসর কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যলীলা গীত হয়।

১২ই মে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সাধনানন্দজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জীবনের বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য ও তাঁহার সহ-শিল্পিবৃন্দ স্বামী-অভেদানন্দ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন।

১৩ই মে রবীন্দ্র জন্মোৎসব-সভায় আশ্রমের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ রবীন্দ্র-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা বিদ্বৎবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। রেকর্ড-শিল্পী শ্রীসলিলকুমার মিত্র বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর পরিবেশন করেন। রাত্রে বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়ের পরিচালনায় ভারতশ্রী বিশ্বনাথ দত্ত প্রমুখ বেঙ্গল জিম্‌নাসিয়ামের সভ্যবৃন্দ ও আশ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়।

১৪ই মে ছাত্রদিবস। এই দিন সকালে আশ্রমের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে আবৃত্তি, বিতর্ক ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হয়। অপরাহ্নে কৃপাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায় কীর্তন করেন। পরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এবং স্বামী পুণ্যানন্দজীর প্রধান আতিথ্যে ছাত্রদের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে সিকদার বাগান সঙ্গীতসমাজের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' যাত্রাভিনয় হয়।

১৫ই মে সোমবার পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান পরিদর্শক শ্রীসুনীল রায়। রাত্রে শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রামায়ণকথা পরিবেশনের পর পাঁচদিনব্যাপী উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-বার্ষিকী উৎসব গত ৬ই জুন হইতে ১২ই জুন পর্যন্ত সপ্তাহকাল অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৬ই ও ৭ই জুন রাত্রে স্থানীয় মঠাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে আলোকচিত্র সহযোগে প্রাঞ্জল ভাষায় দুইটি ভাষণ প্রদান করেন। ৮ই ও ৯ই জুন রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার অধ্যক্ষ শ্রীগণেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের সুপরিচালনায় 'সাধককবি রামপ্রসাদের গীতি-আলেখ্য এবং রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন ধর্মমূলক বিষয়বস্তু অবলম্বনে তরজাগান পরিবেশিত হয়।

৯ই, ১০ই ও ১১ই জুন রাত্রি ৭॥ টায় বেলুড় মঠাগত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী যথাক্রমে জননী সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও ও যুগাচার্য বিবেকানন্দের আদর্শে ত্যাগ, সেবা, সংযম, শৃঙ্খলা ও পবিত্রতার মাধ্যমে জীবনগঠনই যে বর্তমান যুগধর্ম—একথা তিনি যুক্তিসহায়ে উপস্থাপিত করেন। এই তিন দিনই জন-সাধারণের উপস্থিতিতে সভা-প্রাঙ্গণ পূর্ণ ছিল। ১০ই, ১১ই ও ১২ই জুন বক্তৃতান্তে বর্ধমান-

নিবাসী শ্রীঅহিভূষণ ঠাকুর ও তাঁহার সম্প্রদায় কর্তৃক সঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন, রাবণবধ ও মহিষাসুরবধ অতি সুনিপুণভাবে বর্ণিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১১ই জুন রবিবার প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর ভজন, পাঠ, পূজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং দুপুরে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়

কাটিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহের বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চল হইতে বহু ভক্তের উপস্থিতি আশ্রমটিকে এই কয়দিন আনন্দমুখর করিয়া রাখিয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৬৫-মার্চ হইতে ১৯৬৬-এপ্রিল) পাইয়া আমরা আনন্দিত।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত পূজাপাঠ, ভজন ও ধর্মালোচনাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীতুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ১,১০০ খানি পুস্তক রাখা হইয়াছে। ১৫টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হইতেছে। বয়স্কদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৭,৫৭৮ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহায়তায় ৬৫,৯৬৮ জনকে (অধিকাংশই শিশু) গুঁড়া দুধ হইতে দুগ্ধ তৈরী করিয়া বিতরণ করা হয়।

আশ্রমটির ক্রমোন্নতিতে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন।

উৎসব-সংবাদ

ডিব্রুগড়ঃ গত ৭ই এপ্রিল হইতে ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত দিবসত্রয় ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে "শ্রীসারদা-সংঘ' কর্তৃক এখানে বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। তিন দিনই অনুষ্ঠিত সভায় প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণার হৃদয়গ্রাহী ভাষণ সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে। প্রঃ বেদপ্রাণা প্রথম দিন আলোচনাসভায় শ্রীশ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন জনসভায় ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগময় জীবনের এবং সমকালীন যুগে তাঁহার প্রভাবের উপর আলোকপাত করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রথম দিনের সভায় সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীগৌরীপ্রভা চালিহা। দ্বিতীয় দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযোগীরাজ বসু।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ২১শে ও ২২শে এপ্রিল স্থানীয় শক্তিসংঘ প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২১শে তারিখে শোভাযাত্রা, পূজার্চনা, প্রসাদবিতরণ, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি হয়। পরে বিবেকবাণী গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় জনসভায় প্রধান অতিথি স্বামী গোকুলানন্দজী, প্রধান বক্তা অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও সভাপতি উপাধ্যক্ষ শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজীর ভাবধারার বিভিন্ন দিক লইয়া হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। পরে পরিষদের

সভ্যগণ কর্তৃক "মহাভারতী" নাটিকা অভিনীত হয়।

২২শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এক ছাত্রসম্মেলন হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় জনসভায় প্রধান অতিথি শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। পরে ব্যায়ামকৌশল এবং "শ্রীরামকৃষ্ণ" ও "ভগিনী নিবেদিতা" গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। এই দিনের জনসভা ও উৎসবে পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে ১লা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ ও ১২ই বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব পূজা-পাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা ও ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১লা বৈশাখ অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীজ্যোতির্ময়নন্দ (সভাপতি), স্বামী উপানন্দজী ও অধ্যাপক শ্রীসুশান্তকুমার দাস শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

২রা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শিশু উন্নয়ন পরিকল্পনার চলমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হইয়া স্থানীয় বালক-বালিকাদের মধ্যে একটি শিক্ষা-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা বৈশাখ ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা, কথামৃত পাঠ ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

১২ই বৈশাখ সকালে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী অমলানন্দজী ও শ্রীহৃষীকেশচন্দ্র মাইতি (সভাপতি) শিক্ষায় ধর্মের স্থান এবং ব্যক্তিগত- ও সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। বিকালে স্থানীয় বালক-বালিকাদের নিকট স্বামী অমলানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেন।

১২ই হইতে ১৫ই বৈশাখ, সকালে ও বিকালে প্রব্রাজিকা কৃষ্ণপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা স্থানীয় চারিটি বালিকা বিদ্যালয়ে এবং কয়েকটি জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী, শ্রীশ্রীমা, ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

দেলুয়া (পাবনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-শ্রমে ৮ই হইতে ১৬ই বৈশাখ পর্যন্ত যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানীয় অসংখ্য ভক্ত জাতিবর্ণনির্বিশেষে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। জনসভায় যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্যাধ্যক্ষ স্বামী সুধানন্দ, বাগেরহাট (খুলনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী সুকুমার এবং অধ্যাপক শ্রীগৌরচন্দ্র পোদ্দার শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ব্রহ্মচারী সুকুমার ভাগবত পাঠ করেন। ঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা, ৺ভবতারিণীমাতার অর্চনা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষপূজা, পাঠ, ভজন, দরিদ্র নারায়ণের সেবা, ২৪প্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৬ই ও ৭ই মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন প্রাতে পূজাপাঠ এবং বৈকালে অনুষ্ঠিত সভায় বেলুড় মঠের স্বামী জীবানন্দ মহারাজ "যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব জীবন ও বাণী" প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় দিন "যুগসমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি সকলকে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে বলেন। সর্বশ্রী অনাদিমোহন গোস্বামী, সুরজমল আগরওয়ালা, দীনবন্ধু মণ্ডল, ভবানী-শঙ্কর ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ ভাওয়াল, শিবদারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তা সংক্ষেপে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন।

দিব্য বাণী

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্॥ ৩।২৯।২১
যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ২২

সর্বভূতেই রয়েছি সবার অন্তরাত্মা হইয়া
সেথায় আমারে অবহেলা করি কেবল প্রতিমা গড়িয়া
পূজিলে আমায় তাহা তো বিড়ম্বন!
(প্রতিমা আমার সবাকার দেহ-মন)—
ঈশ্বর আমি আত্মা সবার রয়েছি ভুবন জুড়িয়া—
সেথায় আমারে অবহেলা করি প্রতিমায় শুধু পূজে যে
মূঢ় সেই জন, মরে সে কেবল ভস্মে আহুতি ঢালিয়া!

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৩
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥ ২৪

—শ্রীমদ্ভাগবত

অপরের দেহ-দেউলে আমায় দ্বেষ করে অভিমানী যে,
আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া অপর সবারে ভাবে যে,
লোকের নিন্দা করি চলে অনু'খন,
শান্তি কখনো পায় না তাহার মন;
প্রতিমায় মোরে পূজিলেও শত উপচারে শত ভাবে সে
তাহার সে পূজা কোনকালে হায় তুষিতে পারে না আমারে—
(সবাকার হৃদি-মন্দিরে আমি সদাই বিরাজ করি যে!)

কথাপ্রসঙ্গে

কর্ম ও কর্মযোগ

কর্ম জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত

কর্ম আমাদের সকলকেই করিতে হয়, কর্ম ছাড়া জীবনধারণ করা যায় না। কর্ম বলিতে স্থূলভাবে কি বুঝায় তাহা আমরা সকলেই জানি। অন্তরে বা বাহিরে কোন পরিবর্তন ঘটানোর নামই কর্ম। মাঠে জমি চাষ করা, কারখানায় যন্ত্র-চালানোও কর্ম; আলাপ-আলোচনা-পরামর্শদানও কর্ম; নিভৃতে চিন্তাও কর্ম। আবার আরও সূক্ষ্মস্তরে 'আমি কিছু করিতেছি না' এ বোধও কর্ম।

আমরা সকলেই জানি, কোন জাতির জনগণের কর্মশক্তি, কর্মদক্ষতা ও প্রতিদিনের কর্মের পরিমাণই সেই জাতির উন্নতির পরিমাপক, উহার সমষ্টিই জাতির শক্তি, জাতির সম্পদ।

প্রয়োজনের দিক দিয়া কুশলকর্মী ও অকুশলকর্মীর কর্মের মধ্যে অনেক প্রভেদ। জাতির বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে যথোপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মে কুশলী করিতে এবং তাহাদের কর্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, কর্মবিভাগ করিয়া বাঞ্ছিত দিকে উহা প্রয়োগ করিতে যে জাতি যত নিপুণ, সে জাতি তত উন্নত হয়, ইহাও সর্বজনবিদিত। ব্যক্তিগত উন্নতিও নির্ভর করে ব্যক্তির কর্মকুশলতা, কর্মশক্তি এবং উহার প্রয়োগের পরিমাণের উপর। কর্ম তাই আমাদের জীবনের সঙ্গে, আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতিগত উন্নতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

কর্মের জন্য শক্তির বিকাশ চাই-ই

কর্ম করিতে হইলে শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ চাই—নতুবা কর্ম হয় না। স্থূলজগতেও না, সূক্ষ্মজগতে—মনোজগতেও না, প্রকৃতির কোথাও কোনও স্তরে না। জড় বস্তুর তো বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাই হইল—শক্তি উহাকে ঠেলিয়া না দিলে নিজে সে নড়িতেই পারে না; আবার একবার নাড়া পাইলে শক্তির দ্বারা বাধা না পাওয়া পর্যন্ত নিজে নিজে থামিতেও পারে না। কাজেই যে কোন পরিবর্তনের জন্য শক্তির বিকাশের প্রয়োজন অনিবার্য। স্থূলজগতের মতো মনোজগতেও তাই। মানস-সাগরে তরঙ্গ তুলিতে হইলে বা উত্থিত তরঙ্গরাজিকে শান্ত করিতে হইলে উভয়ক্ষেত্রেই শক্তির প্রয়োজন। জড়জগতে এই শক্তিকে আমরা 'এনারজি' বলি, মনোজগতে বলি ইচ্ছাশক্তি।

জগতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্মী তাঁহাদের মধ্যে তাই সর্বত্রই বিপুল ইচ্ছাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। কারণ কর্মে কুশলতালাভ করিতে হইলে, দেহমনকে কর্মে নিয়োজিত করিতে ও বাঞ্ছিত সময় পর্যন্ত নিযুক্ত রাখিতে হইলে ইচ্ছাশক্তি ছাড়া তাহা ঘটানো অসম্ভব। যাঁহার ইচ্ছাশক্তি যত বেশী তিনিই একার্যে তত বেশী সফল হইবেন।

ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য তাই একান্ত প্রয়োজন এই কয়টি বিষয়:—দৈহিক ও মানসিক শক্তির উদ্বোধন এবং শিক্ষার দ্বারা কর্মকুশলতা অর্জন করিয়া উহার প্রয়োগ; আর জাতীয় উন্নতির জন্য ইহা ছাড়াও প্রয়োজন ব্যষ্টিশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা ও কর্মবিভাগ করিয়া উহার প্রয়োগ করা।

কর্ম—জড়বাদ ও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিতে

জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী জাতির মধ্যে কর্ম বিষয়ে এপর্যন্ত কোনওরূপ মতদ্বৈধ নাই। বিশেষ করিয়া হিন্দুধর্ম ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নতির প্রয়োজনে এবিষয়গুলির প্রত্যেকটিতে বিশেষভাবে নজর দিয়াছে।

কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ইহার উপরে আরও একটি প্রয়োজনের কথা বলে। জাগতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শক্তির উদ্বোধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেজন্য কর্ম সকলকেই করিতে হইবে। কারণ একমাত্র কর্মেরই মাধ্যমে শুধু জাগতিক উন্নতি-পথেরই নয়, আধ্যাত্মিক পথেরও প্রাথমিক বাধা তামসিকতাকে, জড়তাকে কাটাইয়া ওঠা সম্ভব। কিন্তু তামসিকতাকে কাটাইয়া উঠিয়া বিপুল প্রাণস্পন্দনের, বিপুল শক্তির বিকাশ ঘটাইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেই কাজ শেষ হইল না—ইহাই ধর্মের কথা, অধ্যাত্মবাদের কথা। মানুষের জাগতিক কল্যাণও যে শুধু শক্তির স্ফুরণ ও তাহার নিপুণ প্রয়োগের ফলে ঘটিবেই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? শক্তির পরিমাণ ও প্রয়োগদক্ষতার মতই কোন্ দিকে উহাকে প্রয়োগ করিলে যথার্থ কল্যাণলাভ হইবে, তাহা নিশ্চিতভাবে স্থির করিয়া সেইদিকেই মাত্র উহার প্রয়োগ করিলে এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। নতুবা সাময়িক প্রলোভন- বা অজ্ঞান-বশে, অথবা জানিয়াও বাধ্য হইয়া ভুল দিকে উহার প্রয়োগ করিলে তাহাতে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই আসিবে।

আজ জগতের প্রায় সর্বত্রই ইহা ঘটিতেছেও। বর্তমান যুগ সামগ্রিকভাবে মানবজাতির জাগরণের যুগ। যে সব জাতি এতদিন জড়তা-আচ্ছন্ন ছিল, তাহারা সকলেই উহা কাটাইয়া উঠিতেছে; পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ আত্ম-সচেতন হইতেছে, প্রাণোচ্ছল হইতেছে। রাজসিকতা বিকাশোন্মুখ বা বিকসিত হইতেছে সর্বত্রই। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই দেখা যাইতেছে উহার প্রয়োগ ঘটিতেছে এলোমেলো ভাবে - যাহার যেদিকে ইচ্ছা সে সেদিকেই প্রয়োগ করিতেছে এই বিপুল সদ্য-উন্মুক্ত শক্তিকে। ফলে, ইচ্ছার অভাবে নয়, প্রয়োগের সঠিক দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারার জন্যই বহুক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফললাভ হইতেছে না অথবা বিপরীত ফল ফলিতেছে। কর্মচঞ্চল আমরা হইতেছি কিন্তু অনেক সময় বৃথাকর্মে অথবা অপকর্মে আমরা ব্যস্ত বেশী—উহাতে না হইতেছে নিজের, না হইতেছে অপরের কল্যাণ। বহুক্ষেত্রে সর্বনাশও ঘটাইতেছি অপরের, নিজের সর্বনাশের দ্বারও অধিকতর উন্মুক্ত করিতেছি।

অধ্যাত্মবাদী তাই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন শক্তির উন্মেষের দিকে যতখানি, শক্তিপ্রয়োগের দিঙ্‌নির্ণয়ের দিকেও ততখানি বা ততোধিক। যদি আমরা নিজেদের, জাতির, মানবজাতির সকলেরই কল্যাণকামী হই, আমাদের কর্ম তো করিতে হইবেই "ধৃতি- ও উৎসাহ-সমন্বিত" হইয়া অনলসভাবে, সেই সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক সব কর্মশক্তিকে চালিতও করিতে হইবে নিশ্চিতরূপে জানা যথার্থ কল্যাণ-পথে—স্বার্থপরতা যে পথে কমে বা নির্মূল হয় সেই পথে। স্বার্থপরতা অপরের কল্যাণসাধনের পথে বাধা তো দেয়ই, নিজের পরমকল্যাণলাভের পথেও বাধা হয়

এই দিকটিতে কর্মশক্তিকে সদাপ্রযুক্ত রাখিতে হইলে, অধ্যাত্মবাদ বলে, তোমাকে "অনহংবাদী" হইয়া কর্ম করিতে হইবে, কেবল "ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ" হইলেই চলিবে

না। অহংকারই স্বার্থপরতার মূল ভিত্তি। তোমাকে কাজ করিতেই হইবে, কিন্তু তাহা কেবল নিজের জন্য নয়; অপরের জন্যও তোমাকে ভাবিতে হইবে। খণ্ডিত দৃষ্টি নয়, একটা সামগ্রিক, বিশ্বজনীন, সর্বকালিক দৃষ্টি লইয়া কর্ম করিতে হইবে। যে কর্মচক্রদ্বারা সমগ্র জগৎ বিধৃত, যাহা মানুষের সমাজকে, জীবনকে, সমগ্র প্রাণিজগৎকে এমনকি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহারই অঙ্গ-বিশেষ তোমার কর্ম—এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং যথাসাধ্য তাহাতে সহায়তা করিতে হইবে তোমার কৃত কর্মের দ্বারা; যে জ্ঞান-ভাণ্ডার তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছ, তাহার বর্ধন ও পুষ্টি যেন তোমার কৃত কর্ম দ্বারা ঘটে; তোমার পূর্বপুরুষগণের জীবনব্যাপী কর্মের ফলে, পূর্বগ মহাজ্ঞানিগণের সাধনার ফলে আজ তুমি এ যুগে জন্মের জন্যই উন্নত জীবনপরিকল্পনার, উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছ, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা যেন তোমার কর্মে প্রকাশ পায়; যে সূক্ষ্ম শক্তি, যে নিয়ম তোমার কর্মের ফল প্রসব করাইতেছে, তাহার প্রতি, তাহার অধিকারীর প্রতিও যেন কৃতজ্ঞতা জানায় তোমার কর্ম; আর তোমার কর্মলব্ধ ফলের ভাগ অপর মানুষকেও দিতে হইবে; -তোমাকে ঋষি-যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ নৃযজ্ঞ সবই করিতে হইবে। ইহা না করিয়া যে কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, নিজের উদরপূরণের জন্য কর্ম করে, সে কি মানুষ নাকি?—"স্তেন এব সঃ"—সে তো চোর - জগতের, সমাজের মাঝে থাকিয়া সে তাহার সুবিধাটুকুই কুক্ষিগত করে, বিনিময়ে যাহা দেওয়া উচিত তাহা দেয় না। তাহার দৃষ্টি সীমিত, তাহার আত্মা স্বার্থ-সঙ্কুচিত। অপরের তো দূরের কথা, নিজের কল্যাণপথও সে চিনিতে পারে না।

অধ্যাত্মবাদ তাই কর্মের উপর যতখানি জোর দেয়, ততখানি জোর দেয় মানুষকে নিঃস্বার্থপর করিতে। আর, ইহার একমাত্র স্থিরনিশ্চিত উপায় যাহা, তাহাকেই তাহার কর্মের গতিপথরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়—কর্ম কর এবং সেইসঙ্গে অপরের ও তোমার মধ্যে যে কোন প্রভেদ নাই ইহা জানিতে ও সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। কারণ যতক্ষণ না তুমি এ বোধে স্থিত হইবে, ততক্ষণ 'অহং'-এর, স্বার্থের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। এ বোধের দিকে যত তুমি অগ্রসর হইবে, ততই তোমার স্বার্থপরতা কমিবে। ইহা ছাড়া আর কোন কিছুই, কোন নীতিই, কোন বাধ্যবাধকতাই, কোন শক্তিই তোমাকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর করিতে পারিবে না। এ বোধ ছাড়া কোন নীতির স্থায়িভাবে দাঁড়াইবার ভিত্তিই নাই। এ ভিত্তি ছাড়া কোন মত-বাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নাই; সে মতবাদ অবলম্বনে মানবজাতির নিরাপত্তার নিশ্চয়তাই বা কোথায়?

কর্মযোগ

যাহার অনুসরণ, যেদিকে অগ্রগমন মানুষের স্বার্থপরতা কমাইয়া দেয়, যাহা অপরের সঙ্গে নিজেকে এক বলিয়া দেখিতে শিখায়, তাহাকেই আমরা ধর্ম বলি, আধ্যাত্মিকতা বলি, ভগবৎ-পরায়ণতা বলি। কর্মকে সর্বদা এপথে পরিচালিত না করিলে সে কর্ম দ্বারা তামসিকতার অপসারণ হইবে ঠিক কথা, কিন্তু তাহা দ্বারা ব্যক্তিগত ও জাতিগত সাময়িক উন্নতিও হইতে পারে, আবার তাহারই ফলে পরিণামে বিপরীত কিছুও ঘটিতে পারে যাহা

ব্যক্তিকে ও জাতিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ। তাই ধর্মের কথা হইল, কর্ম এবং নিজের সর্বগত স্বরূপকে জানিবার চেষ্টা একই সঙ্গে কর—"একহাতে ভগবানকে ধরে আর এক হাত দিয়ে কাজ কর"— ইহারই নাম কর্মযোগ, যাহা অবলম্বনে জাগতিক উন্নতি তো হয়ই, অধিকন্তু সেই সঙ্গে মানুষ পশুভাবপ্রধান স্তর হইতে যথার্থ মনুষ্যত্বের স্তরে, এবং সেখান হইতে দেবত্বের স্তরে উন্নীতও হয়।

ধর্মের দিকে, আধ্যাত্মিকতার দিকে, নিঃস্বার্থপরতার দিকে কর্মকে নিয়োগ করিবার উপায়কেই গীতায় বলা হইয়াছে যোগ, কর্মের কৌশল—"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" যোগস্থ হইয়া কর্ম করা মানে সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, লাভ-লোকসান প্রভৃতিতে মনের স্থৈর্য ঠিক রাখিয়া কর্ম করা। এরূপ করিবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে মনের শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়, তামসিকতা নিশ্চিহ্ন হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবচ্চিন্তার ফলে এই শক্তি উন্নীত হইতে থাকে শক্তির সর্বোচ্চ বিকাশে, সাত্ত্বিকতায়। ফলে সত্য অধিকতর-ভাবে পরিস্ফুট হইতে থাকে তাহার অন্তরে; ক্রমে সে এই বোধের দিকে আগাইয়া যাইতে থাকে যে, এক অনন্ত সর্বব্যাপী সত্তার সঙ্গে সে এক, তার প্রতিবেশিগণও তাহাই, সব মানুষই তাহাই। এই ভাবে কৃত কর্ম ব্যক্তিগতভাবে পরমতম কল্যাণলাভের, ভগবানলাভের বা আত্মজ্ঞানলাভের পথে—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—আগাইয়া দিতে থাকে তাহাকে, এবং সেই সঙ্গে সমাজ দেশ ও সমগ্র মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী যন্ত্রেও পরিণত করিতে থাকে। যে স্বার্থহীন, নিজের জন্য যে কিছুই চায় না, অর্থ, উচ্চপদ, নাম, যশ কিছুই না, অথচ যে প্রচণ্ডভাবে কর্মরত, তাহার দেহ-মনের মত জগৎকল্যাণ সাধনে সমর্থ যন্ত্র আর কি হইতে পারে?

কৃষ্ণার্জুন

ইহারই নাম কর্মযোগ। গীতায় যে পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কর্মযোগে নিযুক্ত করিয়াছেন, যে কোন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে, আধুনিক চিন্তার দৃষ্টিকোণ হইতেও, তাহার তুল্য সর্বজনীন আদর্শ মেলা ভার। (মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ইহা অপেক্ষাও উচ্চ আদর্শ আছে, যেখানে সর্ববিধ দায়িত্বের, সর্ববিধ কর্মের উর্ধ্বে মানুষ উঠিয়া যায়, কিন্তু তাহার অধিকারীর সংখ্যা অতি অল্প।) সেখানে যেমন্ এই কর্মযোগের মাধ্যমে কিভাবে মানুষ দুঃখ ও মৃত্যুকে জয় করিয়া নিত্য, আনন্দময় পরম-ধাম প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা দেখানো হইয়াছে, তেমনি দেখানো হইয়াছে কিভাবে নির্মমহস্তে স্বার্থকে বলি দিয়া জনকল্যাণকেই কর্মযোগ মূল লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করায়। ব্যক্তি-কল্যাণ এবং সমাজ- ও দেশ-কল্যাণকে একই সূত্রে গাঁথা হইয়াছে ইহাতে, কোনটিকেই অবহেলা করা হয় নাই। গীতা উক্ত হইয়াছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারম্ভের ঠিক পূর্বক্ষণে। ইহার পূর্ব অংশ, পটভূমি এবং পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা আছে মহাভারতে, গীতা যে গ্রন্থের অংশবিশেষ। সেখানে জাতির কল্যাণের দিক হইতে ব্যক্তিগত-ভাবে ও রাষ্ট্রগতভাবে কর্মের জন্য যাহা প্রয়োজন, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির নিজ নিজ কর্মে কুশলতা অর্জন, জনগণের কর্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা ও কর্মবিভাগ করা প্রভৃতি সবই দেখানো হইয়াছে। গীতায় প্রধানতঃ দেখানো হইয়াছে এই কর্মকে কিভাবে কর্মযোগে পরিণত করিতে হয়, তাহারই কৌশল। অর্জুন ক্ষত্রিয়। জনগণের কল্যাণ-

সাধন তাঁহার কর্তব্য। কিন্তু সে কর্তব্যসাধন এখানে ঘোর কর্মরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে: তাঁহার আত্মীয়গণই অন্যায়কারী, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু অর্জুন তাহা করিতে চাহিতেছেন না, আত্মীয়গণের প্রতি মমতায় তাঁহার হৃদয় আবিষ্ট হইয়াছে, সে হৃদয়-দৌর্বল্যের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিতে চাহিতেছেন কর্তব্য অবহেলা করিয়া। আর, ইহাকেই তিনি মোহবশতঃ ধর্ম বলিয়া ভাবিতেছেন; ভাবিতেছেন, এ যুদ্ধ না করিলেই ধর্মাচরণ করা হইবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতা-সিংহনাদে মোহাচ্ছন্ন অর্জুনকে জাগাইলেন, তাঁহার এই দুর্বলতা কাটাইয়া দিলেন। বলিলেন, আপাত-দৃষ্টিতে ইহাকে ধর্ম বলিয়া তোমার মনে হইলেও ইহা ধর্ম নহে, ইহা দুর্বলতা, স্বার্থপরতা মাত্র। তোমার কর্তব্য কর্ম এই যুদ্ধ তোমাকে করিতেই হইবে, নিজের হৃদয় তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেও সেদিকে চাহিলে চলিবে না, প্রয়োজন হইলে নিজের সব কিছু আহুতি দিতে হইবে এই জনকল্যাণ-যজ্ঞে—ইহাই এই পরিস্থিতিতে তোমার পক্ষে ধর্ম, এই "ঘোর কর্মে" লিপ্ত না হওয়াই অধর্ম। তবে ইহার সঙ্গে আর একটি কাজ কর, 'যোগস্থ' হইয়া ইহা কর, তাহা হইলে তুমি যাহা চাও "শ্রেয়ঃ", ভগবান-লাভ, তাহাও এই কর্মের মধ্যমেই হইবে। যোগস্থ হইয়া কাজ করা মানে স্বার্থকে নিঃশেষে বলি দিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করা (স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, Throw self over-board and work), কর্মের অনিবার্য ফলরূপে সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, জয়-পরাজয় আদি আসিয়া যখন তোমার মানসসাগরকে অবসাদে বা উল্লাসে বিক্ষুব্ধ করিতে চাহিবে, তখন উহাকে জোর করিয়া শান্ত রাখিবার চেষ্টা কর; স্বার্থ-বুদ্ধির, "অহং"-এর জন্যই এই বিক্ষোভ হয়। আর ভগবানকে স্মরণে রাখিয়া কাজ কর। ইহাই কর্মকে কার্যযোগে পরিণত করার কৌশল।

ধর্মের দোহাই দিয়া আমরা যখন কর্মত্যাগের অনধিকারী হইয়াও কর্তব্যকে অবহেলা করিতে চাই, কর্ম হইতে দূরে থাকিতে চাই, তখন যেন একথা স্মরণ করি আমরা; ধর্ম জাতিকে মোহাচ্ছন্ন করে, মানুষকে ঝিমাইয়া দেয়, একথা ভাবিয়া ধর্মকে কর্ম হইতে দূরে রাখিতে বলিবার পূর্বেও।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, এখানে মানুষের স্বভা-বের একটি দিক অতি স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে গীতার এই পটভূমিকায়, যে স্বভাবটির দোষগুলিই ধর্মের দোষ বলিয়া সাধারণের চোখে প্রতিভাত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ এ দিকটিতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্জুন যখন আত্মীয়গণের প্রতি মমতাবশতঃ কর্তব্য অবহেলা করিতে চাহিতেছেন, যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না, তখন ইহা তাঁহার দুর্বলতাপ্রসূত হইলেও নিজের সে দুর্বলতাকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিতেছেন তিনি —নানা যুক্তি দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, এ যুদ্ধ করাটাই মহা অধর্মের কাজ। অধিকাংশ মানুষই ইহা করে; নিজের দুর্বলতাকে আদর্শের আবরণে ঢাকিয়া অপরের নিকট দেখাইতে চায় যে, সে যাহা করিতেছে তাহাই আদর্শ, তাহাই ধর্ম (স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, তাহারা চায় "to idealise the real")।

ভারতের বর্তমান অবস্থা

এই ধরনের তামসিকতা ও "মিথ্যাচার" এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। ভারতের মজ্জায় মজ্জায় সাত্ত্বিক ভাব, ধর্মভাব অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এখনো তাহা আচ্ছন্ন হইয়া আছে তামসিকতায়। তাই

অর্জুন যেভাবে উচ্চ আদর্শের দোহাই দিয়া কর্তব্যকে, "ঘোর কর্মকে" এড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ করিয়া থাকি অধিকাংশ স্থলে। তামসিকতার জন্য কর্ম-তৎপর হইতে পারি না, কর্তব্যকে অবহেলা করি, এমন কি নিজ আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকেও এড়াইয়া যাই অথচ কথায় সাত্ত্বিক ভাবের একটি আবরণ টানিয়া দিই এই অপারগতার উপর। ইহা ধর্মও নহে, কর্মযোগ তো নহেই, কর্মও নহে। ইহার ফলে না হয় জাগতিক, না হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি। গীতার ভাষায় বলা যায় ইহা "মিথ্যাচার"—মন বিষয়-বাসনাহীন, বিষয়চিন্তাহীন হইবার পূর্বে ত্যাগের আদর্শের দোহাই দিয়া কর্মে অবহেলা করা যথার্থ ত্যাগ নহে, উহা নিজেকে ও অপরকে প্রতারণা করা মাত্র। বলা বাহুল্য, যাঁহারা জ্ঞানী, ত্যাগের যথার্থ অধিকারী, ধর্ম তাঁহাদের কখনও কর্মের স্তরে নামিয়া আসিতে বলে না। শ্রীকৃষ্ণও বলেন নাই। যদি তাঁহাদের কর্ম করিতে দেখা যায়, জানিতে হইবে সে ভগবদিচ্ছায়, লোকশিক্ষার জন্য। যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং করিয়াছেন, যেমন আচার্যগণ ও অবতারগণ—বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, আচার্য শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ করিয়াছেন ত্যাগের পথে পরমধামে পৌঁছিবার পর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া।

অপর দিকে যেখানে তামসিকতা কাটিয়া কিছু রাজসিকতা আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সেখানেও এলোমেলোভাবে কর্মোন্মত্ত হইতেছি আমরা। তামসিকতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগের এবং বিকশিত রাজসিকতা রূপ তেজীয়ান অশ্বের রাশ টানিয়া তাহাকে সর্বাঙ্গীণ, সর্বজনীন কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য এবং সে স্তরকেও ছাড়াইয়া মানবতার, শক্তির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিবার জন্য অপরিহার্য উপায় কর্মযোগকে অবহেলা করিয়া 'অকুশল' ভাবে কর্মোন্মত্ত হইতেছি আমরা। ভগবচ্চিন্তাকে, আত্মচিন্তাকে বাদ দিয়া কর্ম করিতেছি। মানুষের উচ্চতর অবস্থাকে ভুলিয়া কর্ম করিতেছি। বর্তমান জগতের প্রচণ্ডশক্তিশালী জাতিগুলি যেভাবে কর্ম করিতেছে, তাহারই হুবহু অনুকরণ করিতে চাহিতেছি।

বর্তমান জগৎ কিন্তু এভাবে কর্মোন্মত্ত হওয়ার ফলে কী বিষম অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা চিন্তাও করিতেছি না আমরা। জাতি-গুলির অভ্যন্তরেই এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতির অতন্দ্রকর্মলব্ধ প্রচণ্ড শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে বিভিন্ন দিকে; বহুক্ষেত্রে বিপরীত দিকে। ইহার অনিবার্য ভবিষ্যৎ সংঘর্ষ। সে সংঘর্ষ যে কী ভয়ানক, তাহা কল্পনারও অতীত। বিভিন্নমুখী এই শক্তিপ্রয়োগের দিকগুলিকে কেন্দ্রাভিমুখী করিতে পারিলে, বিশ্ব ও জীবনের চরম সত্যের অভিমুখী করিতে পারিলে যে ক্ষেত্র হইতেই যে ভাবেই উহা প্রযুক্ত হউক না কেন, সংঘর্ষ কখনো হইবে না। শেষ লক্ষ্যে, কেন্দ্রে অবশ্য মিলিত হইবে সবগুলিই কিন্তু সেখানে সংঘর্ষের ভয় নাই, কারণ উহা সর্ববিধ শক্তির উৎস হইয়াও শক্তির অতীত, চির শান্ত। সেই লক্ষ্যের কথা স্মরণ রাখিয়া সেই লক্ষ্যলাভের চেষ্টাই যোগ, "কর্মের কৌশল"

কৃষ্ণার্জুনই আবার গীতাসিংহনাদ করিয়াছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপে

দিগ্‌ভ্রান্ত রাজসিকতার বিপুল বিকাশে ভারতের রাজশক্তি যেদিন ভারতকে কল্যাণবর্ত্ম হইতে টানিয়া লইতে চাহিয়াছিল, ভারতের সেই দুর্যোগক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া অর্জুনকে প্রধান অবলম্বন করিয়া আবার তাহার দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। তখন

তো তবু রাজসিকতায় বিকাশ ছিল, কর্মতৎপর জাতি জাগতিক বিষয়ে সমৃদ্ধ, উন্নত ছিল। আধুনিক কালে ভারত যখন কল্যাণপথও ভুলিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে রাজসিকতা হইতেও নীচে নামিয়া ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেই সময় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপে ভারতের ভাগ্যবিধাতার পুনরাবির্ভাব ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দকে প্রধান অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ জাতিকে উন্নতির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় পরিস্নাত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহারই আদেশে লোকশিক্ষারূপ কর্মে অবতীর্ণ হইয়া বহুভাবে আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন অনলস কর্মের মাধ্যমে এই ঘোর তামসিতাকে কাটাইবার জন্য এবং সেই সঙ্গে বারবার সাবধান-বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন, এই কর্মোদ্ভূত শক্তি যেন কল্যাণের পথেই প্রযুক্ত হয়, কর্ম যেন কর্মযোগ হয়, ভগবানকে, ধর্মকে আঁকড়াইয়া সব কিছু করি যেন আমরা। আমাদের রাজসিকতা সেইদিন হইতেই ক্রম-বিকসিত হইতে শুরু করিয়াছে। এই সময়ই আমাদের সজাগ থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন, উহা যেন দিগ্‌ভ্রান্ত না হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হয়, ভগবানকে আঁকড়াইয়া থাকে।

ভারতের চিরসারথি, ভারতের অন্তরাত্মা ভারতের নিজস্ব যে পথকে যুগোপযোগী নবালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, সেই পথে চলিয়া আমরা যেদিন "জগতের সর্বাধিক উন্নতিশীল জাতিগুলির মত জাগতিক বিষয়ে উন্নত" হইতে পারিব, এবং সেই সঙ্গে "অন্তরস্থ দেবত্ব"-কেও প্রকটিত করিতে পারিব, সেদিন আমরা শুধু ভারতকেই গৌরবের শীর্ষদেশে আসীন করিব না, দিগ্‌ভ্রান্ত বর্তমান বিশ্ব-মানবের চিত্তে কর্মযোগকে যথার্থ বিশ্বকল্যাণের পথ বলিয়া দৃঢ়াঙ্কিত করিয়াও দিতে পারিব।

"করিষ্যে বচনং তব"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

গীতাশাস্ত্রের বক্তা যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথাপি শ্রোতা অর্জুনের গীতার নানা অধ্যায়ে বিকীর্ণ সংশয়, বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ পরিজ্ঞাপক প্রশ্ন ও উক্তিগুলি গীতার উপদেশ-মালাকে বুঝিবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্জুনের কথাগুলি বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সম্পূর্ণ ধারণা করা যায় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপসংহারে গীতাকে তাঁহার এক তরফা বক্তৃতা না বলিয়া অর্জুনকে বলিলেন, "ধর্মং সংবাদ-মাবয়োঃ"—ইহা হইল তোমার এবং আমার উভয়ের কথাবার্তা—যে কথাবার্তার উদ্দেশ্য মানুষকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা।

এই মোক্ষশাস্ত্রের বিকাশে তুমি এবং আমি দুজনেই শিল্পী। আমি যখন গাহিতেছিলাম তুমি তখন তাল দিতেছিলে, গীতা তোমার এবং আমার দ্বৈতসঙ্গীত।

গীতার অনুধ্যানে অনেক সময়ে অর্জুনের ছোট ছোট বাক্যগুলি আমাদিগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, কেননা উহারা আমাদেরই হৃদয়ের গভীর জিজ্ঞাসা, আকাঙ্ক্ষা এবং অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের ব্যাকুল উক্তি—'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (২।৭) (শরণাগত আমাকে শিক্ষা দাও) —শাশ্বতকালের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা হইয়া রহিয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের 'যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্' (৩।২) —(যাহাতে নিশ্চিতশ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি) সাধনজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রবল ভাবে সচেতন করে। পরমশ্রোয়োলাভই যে মানুষের সকল কর্মের উদ্দেশ্য সে বিষয়ে আমরা অবহিত হই। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে অর্জুনের জিজ্ঞাসা 'অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং?' (৩।৩৬) (কাহার প্ররোচনায় মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন অন্যায় কার্যে রত হয়?) আমাদের চিত্তের নিত্যকার দ্বন্দ্বের প্রশ্ন। ইচ্ছা হয় করি, অথচ করিতে পারি না; মনে হয় আলোক কিন্তু সম্মুখে গেলে দেখি অন্ধকার; সুখ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে যাই, ধরিলে দেখি দুঃখ; প্রতিপদে এই সংঘর্ষ কে উপস্থাপিত করে? এই আশা-নিরাশা জয়-পরাজয় স্বাধীনতা-বন্ধন রূপ দ্বন্দ্ব কি জীবনের চিরন্তন সঙ্গী, না ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় আছে? শ্রীকৃষ্ণ ঐ অধ্যায়ের ৩৭ হইতে অন্তিম ৪২ শ্লোক পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু সেই উত্তরের অনুধ্যানের পূর্বে অর্জুনের প্রশ্নটির গভীরতা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের নিজেদের সীমাবদ্ধতা, অসহায়তা এবং বন্ধনদশা যদি ঠিক ঠিক আমরা বুঝিতে পারি তবেই ঐ অবস্থা হইতে মুক্তির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা সম্ভবপর। শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহৃত তিন-প্রকার মাছের কথা স্মর্তব্য। জালে কখনও পড়ে না এমন চালাক মাছ, জালে পড়িলেও চেষ্টা করিয়া পালাইয়া যায় এমন দ্বিতীয় শ্রেণীর মৎস্য এবং জালে পড়িলেও জালে যে পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে কোন হুঁস নাই এমন তৃতীয় শ্রেণীর মূর্খ মাছ। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং বহুতর কৃতিত্ব সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা যে বস্তুতঃ ঐ মূর্খ মাছের সামিল অর্জুনের 'অথ কেন' প্রশ্ন আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছে।

এইভাবে গীতার অন্যান্য অধ্যায়ে বিকীর্ণ অর্জুনের উক্তিগুলি তলাইয়া দেখিলে আধ্যাত্ম-সাধনার বহু মূল্যবান ইঙ্গিত আবিষ্কার করা যায়।

এই প্রবন্ধে আমরা বিশেষ করিয়া ১৮শ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোকে অর্জুনের "করিষ্যে বচনং তব" উক্তিটি আলোচনা করিব গীতায় ইহা অর্জুনের শেষ উক্তি বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন এই উক্তি দ্বারাই সমাপ্ত হইয়াছে। গীতার বাকী ৫টি শ্লোক হইল সঞ্জয় উবাচ—পরিদর্শক ও উপন্যাসক সঞ্জয়ের হৃদয়োচ্ছ্বাস।

করিষ্যে বচনং তব—হে প্রভু, হে আমার পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সখা, হে তত্ত্বদ্রষ্টা আচার্য, তোমার কথা আমি পালন করিব। তিনটি শব্দের এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি গীতাশাস্ত্রের সার্থক উপসংহার। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ দ্বারা যদি গীতা সমাপ্ত হইত তাহা হইলে প্রশ্ন থাকিয়া যাইত যে যেজন্য শ্রীকৃষ্ণ মুখ খুলিয়াছিলেন, রণক্ষেত্রের কোলাহলের মধ্যে তপোবনের শাস্ত্রোপন্যাসে রত হইয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইল কিনা, শ্রীকৃষ্ণের বাণী অর্জুনের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া মর্মে প্রতিধ্বনিত হইল কিনা। অর্জুনের ঐ কথা দিয়া গীতা শেষ হওয়াতে আমাদের উক্তপ্রকার প্রশ্নের আর অবসর রহিল না। আমরা বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অরণ্যে রোদন হয় নাই। অর্জুনের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা মিটিয়াছে, ভয় কাটিয়াছে, তিনি নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সাধনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন—করিষ্যে বচনং তব, তোমার কথা শুধু শুনিব না, করিব। হাজার হাজার লোকে শোনে কিন্তু করিতে চায় কয়জন? "সে দুচার জনা, (ও তার) নয়নে যে যায়গো চেনা।" অর্জুন সেই দুচার জনার মধ্যে। ভগবানের বাণীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা তিনি আচরণের দ্বারা প্রমাণ করেন, শুধু ঘাড় নাড়িয়া, ধূপধুনা জ্বালিয়া, 'আহা' 'আহা' বলিয়া প্রকাশ করেন না। ইহা বড় সহজ কথা নয়। আমাদের বহুকালসঞ্চিত আলস্য, স্বার্থপরতা, ভোগলালসা ও আত্মম্ভরিতা আমাদিগকে ভগবদ্‌বাণী পালন করিতে দেয় না। শ্রেয়ঃ কি তাহা বুঝিতে পারিয়াও আমরা আচরণ করি না, ভগবান আমাদের দায়িত্ব লইতে চাহিলেও আমরা তাঁহার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। নিজেরাই কর্তৃত্ব করিতে চাই। 'করিষ্যে বচনং তব' এই ভ্রান্তির প্রতিষেধক। শ্রেয়স্কামী বলেন, আমি নিজের মলিন অহঙ্কারের নির্দেশে আর পথ চলিতে যাইব না, গর্তে পড়িয়া হাতপা ভাঙ্গিব না। হে ভগবান, এখন হইতে তোমার নির্দেশে পথ চলিব। তোমার সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করিব। 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু' ইহাই হইবে এখন হইতে আমার জীবনসঙ্গীত।

কেনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ডে দেবতাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইবার আখ্যানটি বড়ই শিক্ষাপ্রদ। ব্রহ্মের শক্তিতে দেবতারা বিজয় লাভ করিয়াছেন কিন্তু বিজয়োৎসবের উন্মাদনায় তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজেদেরই অহমিকার ডঙ্কা পিটিতেছেন। ব্রহ্ম ছদ্মবেশে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত। দেবতারা অগ্নিকে পাঠাইলেন আগন্তুকের তথ্যানুসন্ধানের জন্য। অগ্নিকে দেখিয়া ছদ্মবেশী ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? অগ্নি অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, আমার পরিচয় ত্রিভুবনে সকলেই জানে। নূতন করিয়া আবার কি পরিচয় দিব? আমি সর্বদাহক জাতবেদা অগ্নি। ছদ্মবেশী হাসিয়া বলিলেন, বটে? তা বেশ, এই তৃণগাছিটি দগ্ধ করুন তো।

অগ্নি সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহা পোড়াইতে পারিলেন না। লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দেবসংসদে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন। ছদ্মবেশীর অনুরূপ প্রশ্নে বায়ু বুক ফুলাইয়া

বলিলেন, আমি সর্বশোষক মাতরিশ্বা বায়ু। ব্রহ্ম পূর্বোক্ত তৃণগাছাটি বায়ুর সম্মুখে স্থাপন করিয়া বায়ুকে বলিলেন, এইটি নড়ান দেখি।

বায়ু ভয়াবহ প্রভঞ্জনরূপে বহিতে লাগিলেন কিন্তু তৃণগাছটি নড়িল না। বায়ু সরমে মরিয়া গিয়া পলাইলেন। তখন আসিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। ছদ্মবেশী তৎপূর্বেই তিরোহিত হইয়াছেন। ইন্দ্রের অহঙ্কার বিষম আহত হইল। আকাশে সর্বাভরণভূষিতা জগজ্জননী উমা আবির্ভূতা হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, বৎস, যাহা জানিতে চাও তাহা বলি শোন। ছদ্মবেশে যিনি আসিয়াছিলেন তিনি সর্বনিয়ন্তা ব্রহ্ম। তাঁহারই শক্তিতে তোমরা জয়লাভ করিয়াছিলে, কিন্তু উহা ভুলিয়া গিয়া নিজদেরই মাহাত্ম্য প্রচারে রত হইয়াছিলে। ইহা সর্বনাশকর বিভ্রান্তি। ঐ বিভ্রান্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে আসিয়া তোমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিলেন। এখন হইতে আর আমি আমি করিও না। সকল কর্ম, সকল সার্থকতা, সকল উল্লাসের পশ্চাতে সর্বকারণ ভগবানকে ধরিতে শেখ। এই সংসার তাঁহারই অঙ্গুলি-হেলনে চলিতেছে। ঈশ্বরই যন্ত্রী, জীব যন্ত্র মাত্র। যত কিছু কাজ তাহা তাঁহারই কাজ। যত কিছু বৈভব উহা তাঁহারই ঐশ্বর্য। যত কিছু গৌরব তাহা তাঁহারই মহিমা।

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যা, পথ কি তাহা আবিষ্কার করা নয়, যে পথ পাইয়াছি সেই পথে চলিবার দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাব। আমাদের কাঁচা আমি আমাদিগকে শ্রেয়ের অনুসন্ধান হইতে টানিয়া রাখে, বিপথে চলিতে প্ররোচিত করে। কবি কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ঘুচাও চোখের জলে।

ভগবানের চরণে আমাদের মাথা নত না হইলে, আঘাতের পর আঘাত খাইয়া চোখের জলে আমাদের ঝুটা পলকা অহঙ্কার ধৌত না হইলে সত্যের অভিযান ও উপলব্ধি সম্ভবপর নয়। কে বলিতে পারে 'করিষ্যে বচনং তব'? যাহার মাথা নত হইয়াছে, যাহার আত্মম্ভরিতা ঘুচিয়াছে। অর্জুন প্রথমে মাথা আকাশে তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের ভুল শুধরাইতে চাহিয়াছিলেন। অনেক ধমক খাইয়া, অনেক উপদেশ শুনিয়া এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সেই মাথা নীচু হইল। তখন বলিলেন, করিষ্যে বচনং তব। তোমার কথা পালন করিব। নিজের অহমিকাকে দাবাইয়া রাখিয়া, নিজের সুখ দুঃখ লাভ লোকসানের হিসাব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যিনি ভগবদিচ্ছাকে অনুসরণ করিতে পারেন তিনি ধন্য। তিনি ভগবানের যথার্থ প্রিয় সন্তান। পরমশ্রেয়োলাভ তাঁহার পক্ষে সুনিশ্চিত।

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন—Thy will be done—হে প্রভু, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। শিষ্যেরা ইহার মর্ম খ্রীষ্টের জীবৎকালে সামান্যই বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। কিন্তু প্রভুর অন্তর্ধানের পর নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অনেক দ্বন্দ্ব লাঞ্ছনা অত্যাচার সহিয়া ধীরে ধীরে তাঁহারা এই মহামন্ত্র সুস্থিরভাবে অবলম্বন করিতে পারিয়া-ছিলেন। আমি নই তুমি, আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা। তোমারই চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম, তোমারই মঙ্গলহস্তের ক্রীড়নক

হইলাম। যেভাবে চালাইবে সেই ভাবে চলিব, যেভাবে নাচাইবে সেই ভাবে নাচিব। খ্রীষ্টের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের পরবর্তী জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই এই মন্ত্র কী আশ্চর্যভাবে তাঁহাদের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—করিষ্যে বচনং তব। এই সঙ্গীত সাধিয়া কী শক্তি, কী উৎসাহ, কী পবিত্রতা, কী ভালবাসা তাঁহাদের চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল! দেশ দেশান্তরে সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের জীবন খ্রীষ্টের জীবনালোকে প্রদীপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মতো, বুদ্ধের মতো, খ্রীষ্টের মতো, শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ভাগবত পুরুষরা যখন মানুষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান এবং বলেন তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্—তোমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-চেষ্টা-ক্রিয়া আমাকে সঁপিয়া দাও, Follow me—আমাকে অনুসরণ কর, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগকে টিটকারী দি, কেহ কেহ কৌতূহলবশে তাঁহাদের আশে পাশে ঘুরি, কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভালবাসিয়া ফেলি, তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করি এবং একদিন তাঁহাদের নিশান আমাদের কাঁধে তুলিয়া লই, বলি,—করিষ্যে বচনং তব। তখন হইতে শুরু হয় আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের যথার্থ সার্থকতা। তখন হইতে আমাদের চোখের সম্মুখ হইতে পর্দার পর পর্দা সরিয়া যায়। আমাদের হৃদয়ের নিষ্ফল শতধা-প্রসারিত বিক্ষেপসমূহ গুটাইয়া আসিতে থাকে, সদা-চঞ্চল ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি শান্ত হইয়া আসে, বুদ্ধি নিয়ত-পরিবর্তনশীলের পশ্চাতে চির-অপরি-বর্তনীয়কে ধরিতে পারিয়া ধন্য হয়।

জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া আমরা কত না ছুটিয়াছি, কত হাতপা ছুঁড়িয়াছি, কত কৃতিত্ব অর্জনে ব্যস্ত হইয়াছি, কত দিকে কত ভালবাসা কুড়াইতে গিয়াছি কিন্তু শান্ত হইতে পারিয়াছি কি? না, পারি নাই। পরিশ্রমই সার হইয়াছে, একবার হাসিয়া দশবার কাঁদিয়াছি, একটু হাঁটিয়া উপর্যুপরি হোঁচট খাইয়াছি, এক পয়সা জিতিয়া দশ পয়সা হারিয়াছি। এবার যদি ডাক আসিয়া থাকে তো সর্বপ্রযত্নে উহা যেন শুনিতে পারি, শুনিয়া যেন বলিতে পারি, করিষ্যে বচনং তব। পুরাতন মানুষের মৃত্যু হউক—যে মানুষ চিরকাল কেবল নিজের মূঢ় অহঙ্কারের ক্রীতদাসত্ব করিয়াছে। নূতন মানুষ জন্ম গ্রহণ করুক—যে শ্রীভগবানকে সকল কর্তৃত্ব দিয়া তাঁহার বাণীকে জীবনে মূর্ত করিয়া তুলিবে। যাহা কিছু সে করিবে ভগবানের উপাসনা বলিয়া করিবে, ভগবানের প্রীতির জন্য করিবে। তাহার সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে ভগবৎ-চেতনা বিচ্ছুরিত হইবে, তাহার প্রতিটি চিন্তা শ্রীভগবানের সত্যে বিধৃত থাকিবে। এই পৃথিবীতে তাহার জন্য স্বর্গ নামিয়া আসিবে। মনুষ্যশরীরে দেবত্ব লাভ করিয়া সে ত্রিলোকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

রামচরিতমানসে কাক-গরুড়-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

এতক্ষণ নানাভাবে মায়ার প্রভাব বর্ণনা করার পরে, এবারে কেন এবং কিভাবে ভগবান নরদেহে অবতীর্ণ হন কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব তাঁকে চিনে উঠতে পারে না, ভূষণ্ডী সখেদে গরুড়কে সে কথা নানা উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বলতে লাগল—

ভগতহেতু ভগবান প্রভুরাম ধরেয়ু তনুভূপ।
কিয়ে চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ ॥

[দেখ] ভক্তের জন্য ভগবান, প্রভু রাম নৃপতি-দেহ ধারণ ক'রে সাধারণ মানুষের মতই আচরণ ক'রে কেমন পরম-পাবন চরিত্র স্থাপন করলেন।

জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবঈ আপুন হোই ন সোই ॥
অসি রঘুপতি লীলা উরগারী।[৬]
দনুজবিমোহনি জনসুখকারী ॥

যেমন কোন নট যখন নানা বেশ ধ'রে নৃত্য করে তখন অবিকল সেই সেই ভাবই দেখায়, যদিও ওর কোনটাই তার আপন ভাব নয়।

[নটের ন্যায়] হে উরগারি, রঘুপতির এই লীলা আসুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে মোহ-জনক, কিন্তু ভক্তজনের নিকট সুখদায়ক।

নয়ন দোষ জা কহুঁ জব হোঈ।
পীতবরন সসি কহুঁ কহ সোঈ ॥
জব জেহি দিশিভ্রম হোই খগেসা।
সো কহ পচ্ছিম উয়উ দিনেসা ॥

হে খগপতি, যার যখন চোখের দোষ হয় [অর্থাৎ কামলা রোগ হয়] সে তখন বলতে থাকে চাঁদ হলদে রং-এর। কারও যখন দিকভ্রম হয়, সে তখন বলে, সূর্য পশ্চিমে ওঠে।

নৌকারূঢ় চলত জগ দেখা।
অচল মোহবস আপুহি লেখা ॥
বালক ভ্রমহিঁ ন ভ্রমহিঁ গৃহাদী।
কহহিঁ পরসপর মিথ্যাবাদী ॥

যে নৌকায় চড়ে চলেছে, সে দেখে যেন পৃথিবীটাই চলছে, আর মোহবশে নিজেকে স্থির মনে করে। বালকেরা যখন ঘূর্ণীপাক খায়, তখন বস্তুতঃ তারাই ঘুরতে থাকে, ঘরবাড়ী ঘোরে না। কিন্তু [এ না বুঝে] তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলতে থাকে।

এবার "উপ-মা" ছেড়ে মা-এর কথা বলা হচ্ছে—

হরিবিষৈক অস মোহ বিহঙ্গা।
সপনেহুঁ নহিঁ অজ্ঞান প্রসঙ্গা ॥
মায়াবস মতিমন্দ অভাগী।
হৃদয় জবনিকা বহুবিধি লাগি ॥
তে সঠ হঠবস সংসয় করহীঁ।
নিজ অজ্ঞান রামপর ধরহীঁ ॥

হে গরুড়, হরিবিষয়ে মোহও এইরূপই। তাঁর মধ্যে স্বপ্নেও মায়ামোহের লেশমাত্র নেই। মায়ার বশ মন্দমতি হতভাগ্য লোকেরা—যাদের অন্তরে মায়ার নানা পরদা পড়ে আছে—সেই

(৬) এখানে "উরগারী" কথাটি লক্ষণীয়। রামচন্দ্রকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে গরুড়ের সংশয়-সন্দেহ সম্বন্ধে এমন কথার অবতারণা হ'তে চলেছে বলেই তাকে "খগপতি," "খগরাজ" না ব'লে, "উরগারী" ব'লে সম্বোধন করা হচ্ছে মনে হয়।

সব দুষ্টমতিরাই জেদের বশবর্তী হয়ে সংশয়-সন্দেহ ক'রে থাকে, আর নিজ নিজ অজ্ঞানতাই রামের উপর আরোপ করে মাত্র [অর্থাৎ আপন আপন ভাবানুযায়ী তাঁকে মোহিত, শোকগ্রস্ত, বদ্ধ প্রভৃতি ভাবে দেখে থাকে]।

এমনি ক রে, বদ্ধজীব মাত্রকেই এবং সেই সঙ্গে গরুড়কেও, সংশয়-সন্দেহের দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের বিশুদ্ধ চরিত্রে দোষদর্শন করতে দেখে ক্ষুব্ধস্বরে ভূষণ্ডী বলতে লাগল—

কাম ক্রোধ মদ লোভ রত গৃহাসক্ত দুখরূপ।
তে কিমি জানহিঁ রঘুপতিহিঁ মূঢ় পরে তমকুপ॥

কাম ক্রোধ অহংকার ও লোভে মত্ত, দুঃখময় সংসারে আসক্ত হ'য়ে যারা অন্ধকূপে পড়ে রয়েছে, কেমন ক'রে তারা রঘুপতিকে জানবে?

বলতে বলতে কিন্তু কথার সুর বদলে গেছে; ভর্ৎসনার স্থলে এবারে গভীর সমবেদনা দেখা দিয়েছে—

নির্গুনরূপ সুলভ অতি সগুন ন জানহিঁ কোই।
সুগম অগম নানা চরিত সুনি মুনি ভ্রম হোই॥

প্রভুর নির্গুণরূপ বরং সুলভ (সহজগম্য), কিন্তু সগুণরূপ কেউই জানে না [অর্থাৎ ঠিক ঠিক জানতে বা বুঝতে পারে না], কেননা এতে সুগম্য অগম্য নানা চরিত্রের [অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ভাবসকলের] সমাবেশ, যা দেখে শুনে [সাধারণ লোকের কথা কি?] মুনিগণেরও মতিভ্রম হ'য়ে যায়।

জেহি বিধি মোহ ভয়উ প্রভু মোহী।
সো সব কথা সুনাবউঁ তোহী॥

[দেখ, এই মায়া মোহের প্রভাবে আমাকেও কম ভুগতে হয়নি] যেমন ক'রে মায়া এক সময়ে আমাকেও মোহিত করেছিল, হে প্রভু, সে-সব কথাও তোমাকে আমি শোনাব।

"সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥"

আমরা পূর্বে শিবকে বলতে শুনেছি—শ্রোতা যদি বুদ্ধিমান, সুশীল, ভক্তিমান এবং ঈশ্বরীয় কথার মর্মগ্রহণে সমর্থ হয়, তাহলে সাধুরা তার কাছে পরম গুহ্যকথাও প্রকাশ ক'রে থাকেন।

তাই এখন পূর্বকৃত দোষের জন্য অনুতপ্ত, রামকথায় শ্রদ্ধাবান গরুড়কে আদর ক'রে ভূষণ্ডীকে বলতে শোনা যায়—

রামকৃপাভাজন তুম্হ তাতা।
হরিগুণপ্রীতি মোহি সুখদাতা॥
তাতেঁ নহিঁ কছু তুম্হহি দুরাবউঁ।
পরম রহস্য মনোহর গাবউঁ॥

হে প্রিয়, তুমি রামের কৃপাভাজন। যে-হরিগুনগান আমাকে সুখ দেয়, তাতে তোমারও প্রীতি আছে। তাই, তোমার কাছে কিছু গোপন করব না; সেই মনোহর পরম-রহস্যকথা তোমার নিকট গান করব।

সুনহু রামকর সহজ সুভাউ।
জন অভিমান রাখহিঁ কাউ॥
সংসৃতমূল সূলপ্রদ নানা।
সকল সোক দায়ক অভিমানা।

রামচন্দ্রের সহজ স্বভাবের কথা শোন। ভক্তজনের কোন অভিমানই তিনি থাকতে দেন না। এই অহঙ্কার-অভিমানই পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতির কারণ—নানা দুঃখপ্রদ। আর, সকল শোকের কারণই হচ্ছে এই অহঙ্কার-অভিমান।

পরম-রহস্যকথাই বটে! যাঁর পেটে কোন কথা থাকেনা, এমন যে নারদ, তিনি সে কথাটি গোপন ক'রে গেলেন, সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যা খুলে বললেন না, এমন কি স্বয়ং শিবও নিজে সোজাসুজি কিছু না ব'লে যেজন্য

পক্ষীরাজ গরুড়কে কাকভূষণ্ডীর কাছে পাঠিয়েছিলেন, কালপূর্ণ এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত দেখে ভূষণ্ডী এখন সেই পরম-রহস্যকথা গরুড়কে শোনাচ্ছে। রকম দেখে মনে হয়, তুলসী যেন প্রকারান্তরে এই কথাই বলতে চাইছেন—অহঙ্কার-অভিমানের লেশ থাকতেও বুঝি বা বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক এমন কি শিবলোক পর্যন্তও যাওয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ অহঙ্কার-অভিমান-শূন্য না হ'লে শিবত্ব-লাভ হয় না, —পরমজ্ঞান—পরাভক্তি—পরাশান্তির অধিকারী হওয়া যায় না!

যা হোক ভূষণ্ডী ব'লে চলেছে—

তাতেঁ করহিঁ কৃপানিধি দূরী।
সেবকপর মমতা অতি ভূরী॥
জিমি সিসুতন ব্রন হোই গুসাঈঁ।
মাতু চিরাব কঠিন কী নাঈঁ॥
জদপি প্রথম দুঃখ পাবই রোবই বাল অধীর।
ব্যাধিনাসহিত জননী গণত ন সো সিসুপীর॥

সেইজন্যই ত কৃপানিধি এই অহঙ্কার-অভিমান সমূলে দূর ক'রে দেন। সেবকের প্রতি যে তার অসীম মমতা! হে গোসাঁই, শিশুর শরীরে ফোড়া হ'লে মা কেমন কঠিন হ'য়ে তাকে চিরে দেন! যদিও প্রথমে ব্যথা পেয়ে শিশু অধীর হ'য়ে কেঁদে ওঠে, তবুও কিন্তু মা রোগমুক্তির জন্য তার ঐ ব্যথা গ্রাহ্যই করেন না।

তিমি রঘুপতি নিজদাস কর হরহি
　　মান হিত লাগি।
তুলসিদাস ঐ সে প্রভুহিঁ কস ন
　　ভজসি ভ্রম ত্যাগি॥

তেমনি করেই [অর্থাৎ বেদনা দিয়েও] রঘুপতি নিজদাসের মান-অভিমান হরণ করেন—তার হিতের জন্যই।

এখানে এসে মনশ্চক্ষে দেখা যায়, বুঝি বা অন্তরের কানে শোনাও যায়—ভূষণ্ডীকাকের মুখোস প'রে এতক্ষণ রামকৃপাকথা বলতে বলতে ভাবাবেগে অভিভূত তুলসী যেন আর আত্ম-সংবরণ ক'রে উঠতে পাচ্ছেন না! ভাবের আতিশয্যে স্থান-কাল-পাত্রের বোধ হারিয়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠে বলছেন—"তুলসিদাস ঐ সে প্রভুহিঁ কস ন ভজসি ভ্রম ত্যাগি।" ওরে মূঢ় তুলসী! এমন করুণাময় প্রভুকে একটুখানি মায়ার ঘোর, একটুখানি ভ্রান্তি ছেড়ে কেন তুই এখনও ভজনা করতে পাচ্ছিস নে?

কাকভূষণ্ডীর আত্মকথা

সে যা হোক, এরপর দেখা যায়, মনের খেদেই হোক আর মনের আনন্দেই হোক, ভূষণ্ডী নিজের অজ্ঞতা ও সেই সাথে কখন কিভাবে রামচন্দ্রের কৃপার পরশ পেয়েছিল সেই সব নিজ অপরোক্ষানুভূতির কথা বলতে আরম্ভ করেছে। কেমন ক'রে সে রামচন্দ্রের জন্মোৎসব দেখতে অযোধ্যায় গিয়ে সেখানে পাঁচ বছর ধ'রে বালক রামচন্দ্রের সঙ্গ করেছিল, তার অলৌকিক রূপ-মাধুরী দেখে নয়ন-মন সার্থক করেছিল, একে একে সে-সব কথা সে গরুড়কে শোনাল। তারপর রামের শিশুসুলভ ভাব দেখতে দেখতে এক সময়ে সে রামকে সামান্য মানবশিশু মনে ক'রে কেমন ক'রে মায়ার কবলে পড়েছিল, আবার রামের কৃপাতেই এই ব্যাপার অবলম্বনেই ত্রিভুবনে সর্বত্রই রামের মঙ্গল হস্ত দেখতে পেয়েছিল সে-সব কথা ব'লে, পরে ভাবাবেশে রামচন্দ্রের উদরমধ্যে প্রবেশ ও ব্রহ্মাণ্ডদর্শনের কথাও সবিস্তারে বর্ণনা ক'রল।

আমরা দেখেছি, গরুড়ের আগমনের পরেই ভূষণ্ডী একবার তাকে আদ্যোপান্ত রামচরিতকথা শুনিয়েছিল। দেখা যায়, তখনকার সে কথা ছিল যেন অসাধারণ হয়েও সাধারণ। কিন্তু

গরুড়ের সাথে অন্তরঙ্গতা হবার পরে, তাকে উপযুক্ত অধিকারী জেনে আজ যে পরম-রহস্যময় রামকথা তাকে শোনান হচ্ছে—সে কথা কাকের প্রাণের কথা—নিজ অনুভূতির কথা।

একে একে ভূষণ্ডী ব'লে যেতে লাগল—বালক রামচন্দ্রের বিভূতি দর্শনে কেমন ক'রে সে মাটিতে প'ড়ে ত্রাহি ত্রাহি ব'লে চিৎকার ক'রে উঠেছিল, আর তা দেখে রামচন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। তারপর, সে যখন অণিমা-লঘিমাদি সিদ্ধাই, এমন কি জ্ঞান-বৈরাগেরও প্রার্থনা না ক'রে, শুদ্ধাভক্তির প্রার্থনা জানাল—

ভগত কলপতরু প্রণতহিত কৃপাসিন্ধু সুখধাম।
সোই নিজ ভগতি মোহি প্রভু
দেহু দয়া করি রাম॥

হে ভক্তকল্পতরু, সেবকের হিতকারী সকল সুখের আলয়, কৃপাসিন্ধু রাম, হে প্রভু দয়া ক'রে তোমার পাদপদ্মে আমার ভক্তি দাও, তখন রামচন্দ্র পরম আনন্দিত হ'য়ে তাকে ভক্তিধনের অধিকারী ত করলেনই, অধিকন্তু তাকে জ্ঞান-বৈরাগ্য এমন কি যোগমার্গের রহস্য উপলব্ধির ক্ষমতাও দান করলেন এবং সেই সঙ্গে মায়াজনিত সকল ভ্রম হতেও মুক্তিদান করলেন।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ হয় স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি—"পূর্ণভক্তির উদয়ে পূর্ণজ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে।"

এর পরে, শাস্ত্রসম্মত ঈশ্বরবিষয়ক যে-সকল সিদ্ধান্তের কথা রামচন্দ্র তাকে বলেছিলেন, ভূষণ্ডী সে-সবও গরুড়কে শুনিয়ে অবশেষে ব'লল—

নিজ অনুভব অব কহউ খগেসা।
বিনু হরিভজন ন জাহি কলেসা॥
রামকৃপা বিনু সুনু খগরাঈ।
জানি ন জাই রাম প্রভুতাঈ॥

হে খগপতি, আমার নিজের অনুভব থেকেই তোমাকে বলছি—হরিভজন ছাড়া দুঃখ নিবারণের অন্য পথ নেই। আর, হে খগেশ! শোন, এ কথাও তোমায় বলে রাখছি রামকৃপাবিনা রামের মহিমা জানা যায় না।

আরও দেখ,

জানে বিনু ন হোই পরতীতী।
বিনু পরতীতী হোই নহিঁ প্রীতি॥
প্রীতি বিনা নহি ভগতি দৃঢ়াঈ।
জিমি খগপতি জলকৈ চিকনাঈ॥

না জানলে বিশ্বাস হয় না। আবার বিশ্বাস না হ'লে প্রীতি হয় না। প্রীতি না জন্মিলে ভক্তি দৃঢ় হয় না। [ভাসা-ভাসা ভক্তি কেমন জান ?] যেমন জলের চেকনাই। (অর্থাৎ হাওয়া লেগে একটুখানি রদ্দুরের তাপে অল্পজল শুকিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার চাকচিক্যও লোপ পেয়ে যায়, তেমনি)।

এইরূপে ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্বকথা, রামচন্দ্রের অসীম মহিমার কথা কীর্তন ক'রে, অবশেষে ভূষণ্ডী গরুড়কে ব'লল—

রাম অমিত গুনসাগর থাহ কি পাবঈ কোই।
সন্তন্হ সন জস কছু সুনেউঁ তুম্হহিঁ সুনায়উঁ
সোই॥

রামচন্দ্র অসীম গুণসাগর, কে তার ইয়ত্তা করবে? সাধুদের কাছে যা একটু কিছু শুনেছিলাম, তোমাকে তাই-ই শোনালাম

ভাববস্য ভগবান সুখনিধান করুনাভবন।
তজি মমতামদমান ভজিয় সদা সীতাপতিহি॥

ভগবান ভাবের বশ। তিনি সুখনিধান, করুণার বরুণালয়। মায়া-মমতা, মান-অভিমান ছেড়ে নিরন্তর সীতাপতির ভজনা কর।

শিব এরপর পার্বতীকে বলছেন—

সুনি ভুসুণ্ডিকে বচন সুহায়ে।
হরষিত খগপতি পঙ্খ ফুলায়ে॥

নয়ননীর মন অতি হরষানা।
শ্রীরঘুবর প্রতাপ উর আনা॥

ভূষণ্ডীর মনোহর কথা শুনে গরুড় আনন্দে পক্ষবিস্তার ক'রল। তার চোখ জলে ভরে গেল, মনে বড় আনন্দ হ'ল, অন্তরে রঘুবীরের মহিমা স্ফুরিত হ'ল।

পছিল মোহ সমুঝি পছিতানা।
ব্রহ্ম অনাদি মনুজ করি মানা॥
পুনি পুনি কাগচরণ সির নাবা।
জানি রামসম প্রেম বঢ়াবা।

পূর্বে তার যে মোহ উপস্থিত হয়েছিল আর তার ফলে অনাদি ব্রহ্ম রামচন্দ্রকে সামান্য মানুষ ভেবে যে মহাভ্রমে পড়েছিল, সে কথা বুঝতে পেরে সে অনুতপ্ত হ'ল। ভূষণ্ডীকাককে সে এখন রামেরই সমান জ্ঞান ক'রে তার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হ'ল ও পুনঃ পুনঃ তার চরণে প্রণাম করতে লাগল।

সাধনপথে গুরুর একান্ত প্রয়োজনঃ গরুড়ের অভিমান-নাশ ও গুরু-ইষ্ট অভেদ দর্শন

তারপর, ভূষণ্ডীকে উদ্দেশ্য ক'রে গরুড় বলতে লাগল—

গুরুবিনু ভবনিধি তরই ন কোঈ।
জোঁ বিরঞ্চি শঙ্কর সম হোঈ॥
সংসয় সর্প গ্রাসেউ মোহি তাতা।
দুখদ লহরি কুতর্ক বহু ব্রাতা॥
তব সরূপ গারুড়ি রঘুনায়ক।
মোহি জিআয়েউ জন সুখদায়ক॥
তব প্রসাদ মম মোহ নসানা।
রামরহস্য অনুপম জানা॥

যদি কেউ ব্রহ্মা অথবা শঙ্করের সমানও হয় তবু সে গুরু বিনা সংসারসাগর পার হ'তে সমর্থ হয় না। হে তাত, সংশয়রূপ সর্প যখন আমাকে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল, কুতর্করূপ দুঃখতরঙ্গের অভিঘাতে যখন আমি বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, তখন তুমিই, যাঁকে আমি স্বরূপতঃ ভক্তজনের আনন্দদানকারী, সংশয়-সন্দেহ-রূপ সর্পের নাশ-কারী স্বয়ং রঘুপতি বলেই মনে করি, আমাকে এই মোহের গ্রাস থেকে রক্ষা করলে![৭] হে প্রভু! তোমার প্রসাদেই আমার সকল মোহের নাশ হ'ল। আমি অনুপম রামরহস্য অবগত হ'তে পারলাম।

ভূষণ্ডী কর্তৃক কাকদেহ প্রাপ্তির ইতিহাস-বর্ণন ও কাক-গরুড়-কথার সমাপ্তি

দেখা যায়, রামরহস্যবিদ তুলসী এতক্ষণে যেন তাঁর মূল বক্তব্য শেষ ক'রে ফেলেছেন। কাজেই এর পরের যে সব কথোপকথন, কাকের পূর্বজীবনের ঘটনাবলীর বিবরণ ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা না ক'রে, মাত্র আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই বর্তমান প্রবন্ধটি শেষ ক'রে ফেলা যাক।

আমরা পূর্বে দেখেছি, সকল তত্ত্বকথা শোনার পরে পার্বতী কৌতুহলবশতঃ শিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এমন যে হরিভক্ত তার কিনা কাকের দেহ! এ কেমন কথা? ভূষণ্ডীর কাছে গরুড়েরও সেই একই প্রশ্ন—

তুম্হ সর্বজ্ঞ তজ্ঞ তমপারা।
সুমতি সুসীল সরল আচারা॥
জ্ঞান বিরত বিজ্ঞান নিবাসা।
রঘুনায়ক কে তুম্হ প্রিয় দাসা॥
কারণ কবন দেহ যহ পাঈ।
তাত সকল মোহি কহউ বুঝাই॥

৭ এখানে শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত মহাশয়ের অনুবাদ অনুযায়ী "ভক্তের সুখদায়ক রঘুনাথ তোমার মত গারুড়ি অর্থাৎ সাপের ওঝা দিয়া আমাকে বাঁচালেন" এরূপ না ব'লে গরুড়ের তৎকালীন মনোভাব ও পূর্বাপর সামঞ্জস্য রেখে এরূপ অর্থ করা হ'ল।

তুমি সর্বজ্ঞ তত্বজ্ঞ অজ্ঞানশূন্য সুমতি সুশীল; তোমার আচার-ব্যবহার সরল, তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যের আবাসস্থল, রঘুনাথের প্রিয় দাস। হে তাত, আমাকে সকল কথা বুঝিয়ে বল, এমন হয়েও তুমি কি কারণে এরূপ [কুৎসিত] দেহ পেয়েছ ?

গরুড়ের প্রশ্নের উত্তরে জাতিস্মর ভূষণ্ডী নিজের পূর্ব পূর্ব জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে করতে কেমন ক'রে সে দুর্বুদ্ধিবশতঃ পরমজ্ঞানী লোমশমুনির অভিশাপে কাকদেহ প্রাপ্ত হয়েছিল সেই কথাপ্রসঙ্গে অতঃপর ব'লল--

মুনি ক্রোধভরে বললেন—

সঠ স্বপচ্ছ তব হৃদয় বিসালা।
সপদি হোহু পচ্ছী চণ্ডালা॥

দুষ্ট, তোমার হৃদয় বিশাল, কিন্তু তুমি স্বপক্ষপাতী। অতএব তুমি পক্ষিকুলে কাক হয়ে জন্মাও।

লীনহ পাপ মৈঁ সীস চড়াঈ।
নহিঁ কছু ভয় ন দীনতা আঈ॥

আমি মুনির অভিশাপ মাথা পেতে নিলাম; আমার মনে কোন ভয় বা দীনতা এল না।

কিন্তু, মন ক্রম বচন মোহি জন জানা।
মুনিমতি পুনি ফেরী ভগবানা॥
রিষি মম সহনসীলতা দেখী।
রামচরণ বিশ্বাস বিসেখী॥
অতি বিসময় পুনি পুনি পছিতাঈ।
সাদর মুনি মোহি লীন্হ বোলাঈ॥
মম পরিতোষ বিবিধবিধি কীন্হা।
হরষিত রামমন্ত্র তব দীনহা॥

ভগবান আমাকে মন কার্য ও বাক্যে নিজের জন জেনে মুনির মতি ফিরিয়ে দিলেন। ঋষি আমার সহনশীলতা, বিশেষ ক'রে রামচরণে বিশ্বাস দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হ'য়ে বার বার অনুতাপ করতে করতে আদর ক'রে আমাকে কাছে ডেকে নিলেন। নানাপ্রকারে তিনি আমাকে খুশী করতে চেষ্টিত হলেন ও অবশেষে আনন্দের সাথে রামমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

ভগতীপচ্ছ হঠ করি রহেউঁ দীন্হি মহারিষি সাপ।
মুনি দুর্লভবর পায়উঁ দেখহু ভজনপ্রতাপ॥

কেবল জেদ করেই আমি ভক্তিপথ সমর্থন করেছিলাম, তাই মহর্ষি আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। আবার সেই তাঁর কাছ থেকেই দুর্লভ বর [রামমন্ত্রে দীক্ষা] লাভ হ'ল। দেখ, ভজনের কি প্রতাপ।[৮]

শ্রীমৎ তুলসীদাসের মত সুমহান সাধক অথবা ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে ভক্তিপথের সকল প্রকার গোড়ামি অথবা সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে এরূপ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিশেষভাবেই লক্ষণীয়।

সে যা হোক, অভিশাপের সাথে সাথে ভূষণ্ডী লোমশমুনির এরূপ আশীর্বাদও পেয়েছিল যে, ইচ্ছামাত্রেই সে কাকশরীর ত্যাগ ক'রে অন্য যে-কোন শরীর ধরতে পারবে। এমন অমোঘ আশীর্বাদ পেয়েও কেন সে এতদিন তুচ্ছ কাকদেহ পরিত্যাগ করেনি, সে প্রশ্নের উত্তরে আবেগভরে ভূষণ্ডীকে বলতে শোনা যায়—

তা তেঁ যহ তন মোহি প্রিয় ভয়উ রামপদ নেহ।
নিজ প্রভু দরসন পায়উঁ গয়উ সকল সন্দেহ॥

[কেমন ক'রে এ দেহ ছাড়ি বল!] এ দেহ যে আমার অতি প্রিয়। এই দেহতেই যে আমি রামপদে ভক্তিলাভ করেছি—এই দেহতেই যে আমার প্রভুর দর্শন পেয়েছি—আমার সকল সংশয়-সন্দেহের অবসান ঘটেছে!

জয় ভাগবত-ভক্ত-ভগবান!

৮ মনে হয় এখানে এরূপ অর্থও করা চলে—কিন্তু দেখ রাম-ভজনের কি প্রভাব, যার ফলে এরূপ অভিশাপ সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত আমার মুনিগণের পক্ষেও দুর্লভবর [অর্থাৎ রামমন্ত্রে দীক্ষা] লাভ হ'ল।

সনাতন ধর্ম*

স্বামী অভেদানন্দ

[স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জানুআরি মাসে আমন্ত্রিত হইয়া জামসেদপুরে পদার্পণ করেন। সেই সময় তাঁহাকে 'মিলনী' মণ্ডপে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় শহরের জনসাধারণ উপযুক্ত মর্যাদা ও উৎসাহে বিপুলভাবে সংবর্ধনা করেন। সভায় টাটা ইস্পাত কারখানা ও চতুষ্পার্শ্বস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গণ্যমান্য দেশীয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সংবর্ধনার উত্তর প্রদানকালে তিনি যে ভাষণ দেন তাহাই ১৯২৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে 'Sanatana Dharma' নামে মুদ্রিত হয়।]

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ, টাটানগরবাসী বন্ধুগণ, অদ্য সন্ধ্যায় আপনারা আমার প্রতি যে সকল প্রীতিপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং শহরে উপনীত হওয়ামাত্র যেরূপ সমারোহে আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন তজ্জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। বিগত ২৫ বৎসর আমি আমেরিকায় কাজ করেছি। আমার জগৎবরেণ্য গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজ আমার পূর্বে এই কাজ আরম্ভ করেছিলেন; আপনারা তা জানেন। তিনিই প্রথম সন্ন্যাসী, যিনি সাগর পার হয়ে নূতন পৃথিবীতে পদার্পণ করেন এবং চিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩ খৃঃ) সনাতন ধর্মের (বৈদিক ধর্ম ও বেদান্ত দর্শনের) প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই বিরাট সম্মিলনে পৃথিবীর সকল অংশ থেকে ধর্মের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক, ধর্মতত্ত্বে উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি এবং খ্যাতিমান প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিরাও তথায় উপস্থিত হয়ে স্বকীয় ভাবধারা ও ধর্মনীতি জগৎ সমক্ষে প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই সকল স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ তো ছেলেমানুষ! তিনি যদিও পূর্বে কখনও সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন নাই তথাপি সভাপতির নির্দেশে শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে সহজ সরল ভাষায় স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত সামান্য কয়েকটি কথাতে কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। তাঁর কথা লোকের প্রাণে উৎসাহ, প্রীতি ও সহানুভূতি জাগরিত করল; ইহা বৈদিক ধর্মের সেই মহান প্রতিনিধিরও হৃদয় স্পর্শ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলেন। আপনারা সকলেই জানেন, সনাতন ধর্মের অর্থ চিরন্তন ধর্ম। এই ধর্মের কোনও প্রতিষ্ঠাতা নাই। ইহাকে কেন চিরন্তন ধর্ম বলা হয়? ধর্ম দ্বারা আমরা কতকগুলি গ্রহণীয় বা বিশ্বাস্য তত্ত্ব বা মতবাদ বুঝি না, বুঝি আত্মবিজ্ঞান; যা দ্বারা আমাদের যথার্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যথা—আমরা এই জগতে কেন এসেছি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? মৃত্যুর পরে কোথায় যাব? আমাদের মন যে সকল প্রশ্নে বিচলিত হয় তার সমাধান করা ধর্মের অবশ্যকর্তব্য।

* মূল ইংরেজী ভাষণ হইতে অনূদিত। অনুবাদক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও গ্রন্থে কতকগুলি কথা লিখিত হবে, আর তদ্দ্বারা আমাদের মনের প্রশ্নগুলির উত্তর পাই বা না পাই সেগুলিকে ধ্রুব সত্যরূপে গ্রহণ করতে হবে, ধর্মের অর্থ ইহা নয়; কথাগুলি আপ্তবাক্য হতে পারে, নাও হতে পারে। ধর্মদ্বারা জন্ম মৃত্যু সমস্যার সমাধান বোঝায়। বেদ ব্যতীত অন্য কোথাও আমরা উক্ত সমাধান খুঁজে পাই না। আমাদের ঋষি ও সত্যদ্রষ্টা পূর্বপুরুষগণ সর্বপ্রথম জগৎকে ঐ সমাধান দান করেন। উক্ত সত্যদ্রষ্টাগণ খৃষ্টের বহু শতাব্দী পূর্বে বর্তমান ছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা সে সময় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বর্তমানকালের সভ্যতার নেতৃস্থানীয় জাতিদিগের পূর্বপুরুষগণ সে সময় তাদের দেহে উল্কি অঙ্কিত করত ও গুহায় ও জঙ্গলে বাস করত। সেই সুদূর অতীতেই আমাদের পূর্বপুরুষ বৈদিক ভারতের মহান ঋষিরা সনাতন সত্য উপলব্ধি করেন এবং সর্বকালে সকল মানবের মন যে-সব সমস্যা দ্বারা বিচলিত হয় তার সর্বপ্রথম সমাধান আবিষ্কার করেন। ইহা ঈশ্বরের নিকট থেকে অনুপ্রেরণারূপে আসে, তাঁদের অন্তরে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করে ও আমাদের জীবাত্মা যেসকল নিয়মের অধীন তা প্রকাশ করে। যে ধর্মকে আমি আত্মবিজ্ঞান আখ্যা দিয়েছি তা কোনও ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয়। সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই প্রতিষ্ঠাতা আছে। খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশু-খৃষ্টের জীবন ও বাণী উক্ত ধর্মের ভিত্তি। বর্তমানে সভ্যজগতে বৌদ্ধধর্মের অনুগামীরা সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ। উক্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা রাজ-পুত্র সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জীবন, চরিত্র ও বাণী রউপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত। খৃষ্ট- ও বৌদ্ধ-ধর্ম-বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মেরও প্রতিষ্ঠাতা আছে। মহম্মদ মুসলমান ধর্ম, জরথুষ্ট্র জরথুষ্ট্র-ধর্ম প্রবর্তন করেন। আপনারা দেখেছেন সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই প্রতিষ্ঠাতা আছে, কিন্তু সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নাই। সকল মানবাত্মার নিয়ন্তা শাশ্বত আধ্যাত্মিক নিয়মই ইহার ভিত্তি। এই সকল আধ্যাত্মিক নিয়ম মানুষের সৃষ্টি নয়। অন্য যে সব নিয়ম আমাদের বাহ্য অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে তাহা হয়ত মানুষের তৈয়ারী হতে পারে, কিন্তু যে সকল আধ্যাত্মিক নিয়ম আমাদের জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা নিত্য। এই নিয়মগুলিই সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্ব। সুতরাং আমাদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলি। আমাদের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আমেরিকায় চিকাগোতে বিশ্বমেলায় ইহা ব্যাখ্যা করেন।······

২৫ বৎসর পূর্বে খৃষ্ট ধর্ম যেরূপ ছিল আজ সেরূপ নাই। বৈদিক দর্শন যে সনাতন সত্যের মৌলিক তত্ত্ব শিক্ষা দেয় তাহাই আজ উহার ভিত্তি; বেদে যেরূপ আছে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ভগবান এক, পণ্ডিতগণ তাঁকে বহু নামে ডাকেন। অতএব এই সকল আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের খৃষ্টান সায়েন্টিষ্ট, 'নিউ থটিষ্ট' (নব চিন্তাবিদ) ও প্রেততত্ত্ববিদগণ গ্রহণ করেছে। তাদের মন বেদান্তের নূতন আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। এগুলি আমরাই তাদের মধ্যে প্রচলন করেছি। এবং ইউরোপীয়রাও ধীরে ধীরে একই আদর্শ প্রাপ্ত হচ্ছে। অধুনা ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক খৃষ্টান সায়েন্সগীর্জা ও নিউ থট মন্দির দেখা যাবে। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ও স্যার ওলিভার লজ প্রভৃতির ন্যায় প্রেততত্ত্ববিদেরা আমাদের বেদান্তের উপদিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক অধ্যাত্মবাদ শিক্ষা দেয় যে, আত্মা

অবিনশ্বর এবং মৃত্যুর পরে আমরা অনন্ত দুঃখে নিপতিত হই না। স্যার ওলিভার লজের কথাই ধরা যাক। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁর লেখা বই 'রেমণ্ড' পাঠ করলে দেখতে পাবেন তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আমাদের যে বন্ধুরা মৃত ও পরলোকগত তাদের সাথে আমরা খবরাখবর করতে পারি। এবং এইরূপ উক্তির জন্য তিনি গর্ববোধ করেন। ক্যালিফর্নিয়া স্যানফ্রান্সিস্কোতে গত বৎসর তিনি যে ভাষণ দেন তা আমার শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। বিশপ কর্তৃক আনীত এই মহাপ্রাণ প্রবীণ ভদ্রলোক খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে, বন্ধুগণ, মৃত্যুর পর আমরা নরকে যাই না পরন্তু সুখ ভোগ করতে থাকি এবং আমাদের শক্তি আছে যাহার সাহায্যে আমরা আমাদের মৃত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। বন্ধুগণ, ইহা গোঁড়া খৃষ্টধর্ম-বহির্ভূত এক পদক্ষেপ। গোঁড়া খৃষ্টান কখনও এই চিন্তা করতে দেবে না যে আপনি মৃত বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। বরং তাদের মতে তারা সবাই এখন নিদ্রিত এবং শেষ-বিচারের দিন একজন দেবদূতের ভেরীনিনাদে জাগ্রত হবে ও তাদের পাঞ্চভৌতিক দেহসহ উত্থিত হয়ে স্বর্গে যাবে। বহু শতাব্দীব্যাপী এই মতবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু পরিবর্তন এসেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায়তনে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয় এজন্য কৃতিত্ব তারই বেশী। কিন্তু ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়বাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিচ্ছে এবং জডবাদ মানবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। উহা জড়ের উৎস খুঁজে পায় না অথচ জড়বহির্ভূত কোন কিছুকে অস্বীকার করে।

খৃষ্টান সায়েন্টিস্টরা কিন্তু উল্টো—জড়ের অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং বেদান্ত যেমন বলে, জড় বা জড়জগৎ হ'ল মায়া বা প্রপঞ্চ, খৃষ্টান সায়েন্টিস্টরাও সেইরূপ একে অলীক বলে। তাদের মতে আপনাদের ভৌতিক দেহও অলীক ও দেহের ব্যাধিরও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। কারন আপনারা ব্যাধি রোগ দুঃখ ও ক্লেশ থেকে মুক্তস্বভাব। এখানে বলে রাখি, বেদ এই ধারণা শিক্ষা দেয় এবং বেদান্তদর্শন দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে যে, 'আত্মা দুঃখ, ক্লেশ, ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে মুক্ত।'

আত্মাই আমাদের সত্য পরিচয়। ইহাই সনাতন সত্য; কেহ বলে ব্রহ্ম, কেহ বলে পরমাত্মা। ইহাই শক্তি, শাক্তদিগের মা ভগবতী; শৈবের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু। খৃষ্টানরা এই সত্যকেই স্বর্গস্থ পিতা বলে। নানকের শিষ্যগণ ইহাকে সনাতন সত্য বলে। বৌদ্ধরা ইহাকে বুদ্ধ ব'লে থাকে এবং মুসলমানেরা একই সত্যকে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লা বলে। সুতরাং বন্ধুগণ, মৌলিক সত্যে কোনও প্রভেদ নাই—কারণ সত্য এক। খৃষ্টান মুসলমান বা হিন্দু সকলে একই সত্যের আরাধনা করে, যা অদ্বয়। সত্য এক, একথা যখন লোকে ভুলে যায়, তখনই ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করে এবং পৌত্তলিকের ঈশ্বর, খৃষ্টানের ঈশ্বর, মুসলমানের ঈশ্বর, বৈষ্ণবের ঈশ্বর ও শৈবের ঈশ্বর ইত্যাদি বলা সুরু করে। ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর—কিন্তু কে ইঁহারা? ধর্ম কি এই শিক্ষা দেয় যে এতগুলি ঈশ্বর আছেন? একজন গোঁড়া খৃষ্টান বলতে পারে, কেন পৌত্তলিকের ঈশ্বর উপাসনা করবে? খৃষ্টানের ঈশ্বরই উপাসনা করা উচিত; খৃষ্টানের ঈশ্বর শ্বেতাঙ্গ ও পৌত্তলিকের ঈশ্বর কৃষ্ণাঙ্গ। বন্ধুগণ, খৃষ্টানের ঈশ্বর, হিন্দুর ঈশ্বর, মুসলমানের ঈশ্বর ব'লে কিছু নাই। কারণ ঈশ্বর এক এবং তাঁকেই সকল জাতি পূজা করে। তিনি উপাধিশূন্য। যাঁকে

মুসলমানেরা আল্লা ব'লে উপাসনা করে সেই একই ঈশ্বরকে পার্শীরা আহুরমাজদা নামে ডাকে। সেই একই সত্য বৈষ্ণবের বিষ্ণু, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি বা আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। সকল ধর্মমতের বিভেদের সামঞ্জস্য একমাত্র ঈশ্বরের একত্বরূপ মৌলিকত্বের উপর নির্ভরশীল। আমাদের সনাতন ধর্ম এই মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং সনাতন ধর্ম জগৎময় প্রচার করা কর্তব্য।

জড়বাদ কখনও প্রাণে শান্তি দিতে পারে না। ব্যবসাদারী পৃথিবীতে দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা আনবে—বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে যেমন দেখা গেছে। জড়বাদ ও ব্যবসাদারীর ফল ঐ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরে এখন নবযুগ সুরু হয়েছে, ব্যবসাদারী আর থাকবে না। আমরা জগৎকে দেখিয়েছি যে সাংসারিক অভ্যুদয়ের জন্য আমরা জীবন ধারণ করি না, উদ্দেশ্য অন্য বস্তু লাভ। আমাদের জীবনোদ্দেশ্য সর্বব্যাপী অদ্বয় শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করা। প্রশ্ন হতে পারে কিরূপে ইহা লাভ সম্ভব? প্রথমতঃ শিক্ষা করতে হবে যে প্রাণ একটিই। মানুষ, প্রাণী, গাছগাছড়া যতসব দেখছি—প্রত্যেক ব্যষ্টিপ্রকাশে কি স্বতন্ত্র প্রাণ আছে? না; বহুবিধ বৈদ্যুতিক আলোর মত একই প্রাণশক্তির প্রবাহ সর্বত্র বিদ্যমান। একথা কি বলা চলে যে একটি আলো এক প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির আলো, অপরটি ভিন্ন এবং তৃতীয়টি আবার বিভিন্ন রকমের শক্তির? একই বিদ্যুৎ এতগুলি বাতিতে আলো দিচ্ছে আর একই বিদ্যুৎ শুধু আলো উৎপন্ন করে না উত্তাপ ও গতিও উৎপন্ন করে। দেখুন, রাস্তায় গাড়ি বিদ্যুতে চলে, বৈদ্যুতিক চুল্লীতে আহার্য প্রস্তুত হয় এবং বৈদ্যুতিক আলোতে পুস্তক পাঠ করা যায়। এই সব বিভিন্ন প্রকাশ একই বিদ্যুৎশক্তির। সুতরাং বন্ধুগণ, সকল মনুষ্যদেহে এই প্রাণ-শক্তির প্রকাশ; এমন কি সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেও। উক্ত প্রাণশক্তি এক, আমার বা আপনার কারও নয়; এই প্রাণ অবিনশ্বর। প্রাণহীন পদার্থ কিছুই নাই। সবই প্রাণবন্ত এবং প্রাণ বা জীবনীশক্তি সর্বব্যাপী। ইহাই আণবিক কার্যকারিতার হেতু; ইলেকট্রনের গতির কারণ। ইহা থেকেই ইলেকট্রন, আয়ন, অণু ও পরমাণুর উৎপত্তি। একই প্রাণশক্তি তথাকথিত জড়জগতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং উহারা প্রাণীজগতে মন ও ইন্দ্রিয়শক্তি রূপে, চিন্তা ও বিচারশক্তি রূপে প্রকাশিত। বেদান্তে আমরা বহুত্বে একত্বের ভাব দেখি—সব কিছু সেই এক অনন্ত উৎস থেকে উদ্ভূত। প্রাণশক্তির উৎপত্তি উহা থেকেই এবং একই উৎস থেকে মন, বুদ্ধি, বাক্‌শক্তি আস্বাদনশক্তি, স্পর্শশক্তি প্রভৃতি উদ্ভূত এবং যা কিছু ইথার-জাতীয়, বায়বীয়, তরল ও কঠিন সেই সকলও।

পদার্থ ও মন সেই একই উৎস থেকে এসেছে যাকে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে থাকি। সুতরাং বন্ধুগণ, কিরূপে বহু ঈশ্বর থাকা সম্ভব—মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্শীদের ঈশ্বর থেকে কি হিন্দুর এক ভিন্ন ঈশ্বর? কেন বিবাদ, কেন একে অপরকে ঘৃণা করা? বিবিধ নামে ও বিভিন্ন মূর্তিতে ঈশ্বর একই, এই উপলব্ধি সহায়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের একে অন্যকে ভালবাসা উচিত। মানুষ হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান হোক সে ঈশ্বরেরই সন্তান, ইহাই সনাতন সত্য এবং আমাদের একে অন্যকে অবশ্য আলিঙ্গন করা এবং খৃষ্টান, মুসলমান বা পার্শীকে নিজের ঠিক ভাই মনে করা কর্তব্য। যীশুখৃষ্টেরও আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে পুরুষ-পরম্পরা এই শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। এই বাণী সর্বপ্রথম

ভারতেই ঘোষিত হয় এবং ইহাই ভবিষ্যতে ইউরেপীয় জাতিগুলিকে পরিচালিত করবে। আজ তারা এই সত্য গ্রহণেচ্ছু হয়ে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করছে। এবং আজ খৃষ্টানধর্ম, অর্থাৎ গোড়া খৃষ্টধর্মের কথা বলছি, পশ্চাতে স্থান নিতে বাধ্য। যেখানে বিজ্ঞানের জয়, সেখানে বেদান্তের সনাতন ধর্মেরও বিজয়।

... ...

সুতরাং বন্ধুগণ, পৃথিবীময় সনাতন ধর্মের পতাকা বহন করে নিয়ে গিয়ে ইহার সত্য প্রচার করুন। হিন্দু ব্যতীত অন্য কোনও জাতি উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা প্রাপ্ত হয় নাই এবং হিন্দুরাই সমগ্র পৃথিবীর ধর্মাচার্যদিগের পথ-প্রদর্শক। স্বামী বিবেকানন্দ পথ প্রস্তুত করেন, আমি তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করেছি এবং আপনারা আমাদের অনুগামী হউন। এগিয়ে আসুন এবং সকল জাতিকে দেখান যে, প্রাচীনকালের ঋষি ও মহাপুরুষদের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আপনারা এই সত্যের উত্তরাধিকারী হয়েছেন এবং এই যুগেও আপনারাও ঐরূপ জীবনে উন্নীত হতে সক্ষম। পাশ্চাত্যের লোকদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা প্রায় নাই বলা চলে। তাদের উপাসনার সময়াভাব। তারা সপ্তাহে একবার ভজনালয়ে যায়, নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মসভায় যায়। কিন্তু বন্ধুগণ, মানবজাতির মধ্যে একমাত্র আমাদেরই খাওয়াদাওয়া নিদ্রা প্রভৃতির ভিতর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গভাবে ধর্ম ওতপ্রোত। আমরা ধর্মকে ভালবাসি। এই আদর্শ সমগ্র পৃথিবী জয় করবে। ইউরোপীয় জাতি জাগতিক বিষয়ে আপনাদের অধীশ্বর হতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আপনারা তাদের প্রভু। আপনারা মানবজাতির সমক্ষে প্রমাণ করুন, তরবারির শক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তি বড়। আজ হয়ত আপনারা একথা পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারেন কিন্তু কাল যদি আত্মিক শক্তি প্রকাশ করতে পারেন, যদি এই উপলব্ধি হয় যে আপনারা অমৃতের পুত্র, ঈশ্বরের প্রেম আপনাদের মধ্যে প্রকটিত হচ্ছে তবে আপনারা জগতের কর্তৃত্বলাভে সমর্থ হবেন। এইখানেই আমাদের শক্তি এবং কেহ ইহা আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। আত্মার শক্তি তরবারির শক্তি অপেক্ষা অধিক। অন্য জাতিকে জয় করা চলে, তাদের দেশ দখল করা যায়, তরবারির আঘাতে প্রতিবেশীকে হত্যা করে তার যথা সবস্ব লুণ্ঠন করা সম্ভব, কিন্তু হে বন্ধু, তাতে সুখশান্তি আসবে না। কিন্তু যদি স্বীয় মন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জয় করা যায় তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট অপেক্ষাও বড় হওয়া সম্ভব।

মহান আলেকজাণ্ডার একজন দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তিনি একটি বৃক্ষতলে এক উলঙ্গ দরিদ্র সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁর সাথে তিনি পরিচিত হতে ইচ্ছা করেন। সন্ন্যাসীকে তার নিকটে আনার জন্য তিনি অনুচরদের পাঠান। যোগী সন্ন্যাসী কিন্তু স্থান ত্যাগ করলেন না। অনুচরগণ যখন আলেক-জাণ্ডারকে জানাল যে যোগী আসতে অসম্মত, আলেকজাণ্ডার হুকুম করলেন, 'না এলে, তাকে হত্যা কর।' এই সংবাদ যোগীটিকে জানান হলে তিনি বলেন, "আলেকজাণ্ডার মিথ্যাবাদী, ক্রীতদাস। সে পৃথিবী-বিজেতা নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লিপ্সার ক্রীতদাস; আর মিথ্যাবাদী ; কারণ সে আমাকে হত্যা করতে পারে না। 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।' অস্ত্র আমাকে ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি দাহ করতে পারে না, জল আমাকে আর্দ্র করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না। আমি অমর,

অক্ষয়, জন্মমৃত্যুরহিত। সুতরাং কেহ যদি বলে আমাকে বধ করবে, তবে সে মিথ্যাবাদী।" মহান আলেকজাণ্ডার অনুচর-প্রমুখাৎ এই কথাগুলি শ্রবণান্তর এই মহাপুরুষের নিকট শির অবনত করেন ও বলে ওঠেন, 'এই সাধু বিশ্বের প্রকৃত কর্তা ও প্রভু।'

আপনারা প্রত্যেকেই উক্ত মহাপুরুষের ন্যায় হতে পারেন—যথার্থ প্রভু—যদি উপলব্ধি হয় যে আপনাদের অন্তরে ঈশ্বর বাস করেন, আপনারা সর্বশক্তিমানের জীবন্ত বিগ্রহ। এখন আপনারা মনে করেন যে ঈশ্বর মেঘলোকের উর্ধ্বে কোনও দূর স্বর্গে বাস করেন, আপনাদের অন্তরে নয়। এটি কেমন ধর্ম? ঈশ্বর সর্বব্যাপী, আত্মার অস্তিত্ব সর্বত্র। তিনি আপনাদের অন্তরে বাস করেন। ঈশ্বরকে আত্মারূপে অনুভব করতে প্রয়াসী হন এবং জীবনের প্রতিটি দৈনন্দিন কার্যে দেবত্ব প্রকাশিত করুন। তিনিই চিরন্তন সত্য, তাঁহার অস্তিত্ব জগতের সর্বত্র। সৌরজগতে, নক্ষত্রলোকে ও যুগপৎ সকল প্রাণীর অন্তরে তিনিই বাস করেন। যে এই শাশ্বত সত্য অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করে, সে অসীম শান্তি ও অনন্ত সুখলাভ করে। বেদান্তের শিক্ষা ইহাই। অবশ্য আমরা পৃথিবীর সর্বত্র এ শিক্ষা দান করব। অধিকন্তু ইহাও আমাদিগকে উপলব্ধি করতে হবে যে সকল মানুষই সেই দিব্য সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ। মানুষই ঈশ্বর; কোনও মানুষ-ভ্রাতার সহিত যদি দুর্ব্যবহার করা হয়, সে ঝাড়ুদার, মেথর বা পারিয়া যাই হোক না কেন, তবে তা ঈশ্বরের সঙ্গে দুর্ব্যবহারেরই সমতুল্য।

এদের কারও অপেক্ষা আমাদের নিজদিগকে বড় মনে করার অধিকার নাই। সকলের মধ্যে একই ঈশ্বর বাস করছেন। আমাদের শাস্ত্র, বেদ, দর্শন ও বেদান্তের শিক্ষা হল, যে একই দেবত্ব সকলের মধ্যে দর্শন করে সেই-ই সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ভগবদ্গীতায় আছে:—যে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ, হাতী, গরু, কুকুর ও পারিয়ার মধ্যে একই ব্রহ্মদর্শন করে সেই জ্ঞানী। সুতরাং বন্ধুগণ, আপনাদের ধর্মের শিক্ষা অনুসরণ করুন। এবং স্মরণ রাখুন এই সকল পারিয়া ও নীচ জাতির মানুষ ব্রাহ্মণেরই সমতুল্য, কারণ ঈশ্বর তাদের মধ্যেও আছেন। আমরা যদি সকলের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন না করতে পারি তবে দোষ কার?

যে ব্রাহ্মণ এই সনাতন সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ সে ব্রাহ্মণই নয়, অপর পক্ষে যে ব্যক্তি এই সত্য উপলব্ধি করে সে নীচজাতিসম্ভূত হলেও, যে ব্রাহ্মণ সনাতন ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে না তার চেয়ে বড়। সুতরাং বন্ধুগণ, আমাদের ধর্ম মহৎ ও উদার এবং উহাতে এই সব জাতিভেদ এবং মতবাদ বা বর্ণবৈষম্যের স্থান নাই। একত্বই মৌলিক নীতি। সকল জাতিই এই সত্য গ্রহণ করবে এবং এই মহান উপদেশাবলী কার্যে পরিণত দেখলে শ্রদ্ধাবনত হবে সেখানে। এখন যুক্তরাষ্ট্রে এমন বহু লোক আছে যারা যে কোনও সত্যের প্রচারককে গ্রহণ করবে এবং তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নেতাদের একজন ভেবে বরণ করবে। বেদান্তদর্শন তার কাজ করেছে, কিন্তু এখনও তা শেষ হয় নাই। আমরা মাত্র আরম্ভ করেছি। আমেরিকায় বর্তমানে অন্য স্বামীজীরা আছেন। তাঁরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠিত মিশনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা অভিনন্দনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামোল্লেখ করেছেন। তিনি আমার গুরুদেব। আমি তাঁর দর্শনলাভের গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন করেছি, তাঁর উপদেশ শুনেছি এবং দুই বৎসর তাঁর সেবাধিকার পেয়েছি। আমাদের সংঘের স্বামী

বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য স্বামীজীদের ন্যায় আমিও তার শ্রীচরণতলে আশ্রয় পেয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্তবিগ্রহ আপনাদের সম্মুখে যে সকল আদর্শের বর্ণনা দিচ্ছিলাম সেই সকলই আমরা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। খৃষ্টানরা এসে যখন তাঁর ঐরূপ ঈশ্বরানুভূতি প্রত্যক্ষ করত তারা তখন তাদের প্রভু যীশুখৃষ্টের সম্মুখে যেরূপ প্রণত হয় তাঁকেও সেইরূপ প্রণতি জানাত এবং ঈশ্বরের নিকটে যেরূপ প্রার্থনা করে তাঁর নিকটও তেমনই প্রার্থনা করত। মুসলমানেরা আসত এবং তাঁকে তাদের শ্রেষ্ঠ সাধু ও ইসলামের অনুপ্রাণিত আচার্য মনে করত। বৌদ্ধরা তাঁর মধ্যে তাদের বুদ্ধের আদর্শ দেখত এবং শাক্ত ও বৈষ্ণবেরাও তাঁর ভিতরে তাদের উচ্চতম আদর্শের পরিচয় পেত। শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মধ্যেই ঈশ্বরদর্শন করতেন এবং তাঁর শিক্ষা ছিল অতি উদার যা খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু বা বৌদ্ধ সকলেই অনুসরণে সক্ষম।

সুতরাং বন্ধুগণ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার। আমাদের যখন এমন একজন আচার্যের প্রয়োজন উপস্থিত হল, নিজ জীবনে যিনি জ্ঞান ও ধর্মসমূহের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, তখন তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। তিনি নিজ জীবনে তা দেখিয়েছেন তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ধর্মসমন্বয়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত যখন তাঁর নিকট আসি, খৃষ্ট বা বুদ্ধের ন্যায় কোনও আচার্যকেই আমরা বিশ্বাস করতাম না। আমরা ছিলাম অজ্ঞেয়বাদী ও বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু যখন তাকে দেখলাম এবং তাঁর জীবন দিনে রাতে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন তাঁর মধ্যে আমরা কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও অন্যান্য অবতারের প্রকাশ দেখতে পেলাম। তিনি প্রায় সর্বক্ষণই ঈশ্বরানুভূতিতে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তাঁর জীবনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সংসারী লোকের ন্যায় বস্তুতান্ত্রিক বা ব্যবসায়ী আদর্শ অনুসরণ করতেন না, বরং ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ইহাই ছিল তাঁর আদর্শ। আপনারা প্রচুর সম্পত্তির মালিক ও অতুল সম্পদের অধিকারী অথবা বহু সন্তানের জনক হউন না কেন, কিন্তু যদি ঈশ্বরোপলব্ধি বা বিশ্বজনীন আত্মার সহিত আপনাদের সম্বন্ধ উপলব্ধি না হয়ে থাকে তবে আপনাদের জীবন বৃথা। এই বিষয় তাঁর স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার একই সঙ্গে তিনি ছিলেন অতীব প্রযুক্তিকুশলী, স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। এইরূপ গুরুর শিষ্যগণ প্রয়োগকুশল নিশ্চয়ই হবে, স্বপ্নবিলাসী হবে না। তারা মহান কর্মী। তারা আদর্শের জন্য কর্ম করে। তাদের আদর্শ কর্মযোগ। কর্মযোগ নিঃস্বার্থ কর্মের পথ। তাদের জীবন জগতের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত এবং নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা মুক্তির পথপ্রদর্শক। কর্মযোগ অন্তর পবিত্র করার উপায় শিক্ষা দেয়, সংস্কৃতে তাকেই চিত্তশুদ্ধি বলে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পূর্বে প্রথম সোপান চিত্তশুদ্ধি। যীশুখৃষ্ট এই কথাই কি কম্বুকণ্ঠে বলেন নাই, "যাদের অন্তর পবিত্র তারাই ভাগ্যবান, কারণ তারা ঈশ্বর দর্শন করবে।" ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শন উভয়ের জন্য অন্তরের পবিত্রতা প্রয়োজন। অতএব বন্ধুগণ, সকলের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা আপনারা চিত্তশুদ্ধি করতে পারেন ; ইহা উপলব্ধি করুন, জীবনে যে সব কর্ম করছেন তা পরমেশ্বরেরই উপাসনা।

ভগবদ্গীতা বলে : "যে কোন কর্ম কর, যে কোন ত্যাগ কর, সব বিনাসর্তে ঈশ্বরে সমর্পণ কর।" এই প্রণালীতে অন্তর শুদ্ধ হবে এবং অন্তর শুদ্ধ হলে ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শনের

অধিকার আসবে। তখন সনাতন ধর্মাদর্শে পৌছিবেন। অতএব সকল কর্ম, শারীরিক, মানসিক বা লোকহিতকরই হোক, নিজের জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা না করে সম্পাদন করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে। আমাদের সনাতন ধর্ম অন্য একটি বিষয় শিক্ষা দেয়; আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, সকল মানুষই একটি যন্ত্র যার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করছেন।

ঋগ্বেদে আছে—ঈশ্বরের অসংখ্য চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও মস্তক আছে। যখন এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হয় তাঁর অন্তরের ভগবানকে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য; মরণশীল সত্তাকে আপনার অভিবাদন না দিয়ে অমৃতকে দিন, তিনিই প্রকৃত মানুষ। আমাদের প্রথা বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের প্রণাম করা। ইহার অর্থ আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যে ঈশ্বর বাস করেন তাকেই প্রণাম জানাই; অধিকন্তু আপনাদের উপলব্ধি করা কর্তব্য, যে কোন কাজ আপনার ভ্রাতা, প্রতিবেশী বা দেশের জন্য করেন তা উপাসনাই এবং এই আদর্শ মনে রেখে নিজেদের কাজ করে চলা ও পৃথিবীতে বাস করা উচিত। যদি ভগবৎপ্রেমে ও মানবপ্রীতিতে কাজ করেন তবে এই জীবনেই ঈশ্বরলাভের অধিকারী হবেন এবং মৃত্যুর পরে, সেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবেন যা পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থেই বর্ণিত আছে। তখন জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য লাভ হবে। এবং তখন উপলব্ধি হবে যে আপনি মরণশীল নন, মৃত্যুহীন প্রাণ; পরমাত্মার সাথে একত্ব উপলব্ধি হবে। মুক্তিতেই আপনার জন্মগত অধিকার, এতদিন আপনার শক্তির অপচয় করেছেন পার্থিব বিষয়ে আপনার মনকে আবদ্ধ রেখে এবং নিজকে অন্য মরণশীল প্রাণীর দাস মনে ক'রে, এই বোধ তখন আসবে। আমরা সকলে মুক্তিলাভের জন্য জন্মগ্রহণ করেছি। মুক্তিই সকলের লক্ষ্য এবং মোক্ষ আমাদের ধর্মের উচ্চতম আদর্শ। মোক্ষ অর্থ মুক্তি। মুক্তি শুধু জাগতিক কার্যে স্বাধীনতা বুঝায় না, সকল বন্ধন, সকল দৈহিক ও মানসিক অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্তি ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি বুঝায়। পুরাকালে মহান ঋষিগণ এই আদর্শ রেখে গেছেন এবং একই আদর্শ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংঘে কর্মরত তাঁর শিষ্যগণও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন……।

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীভবতারিণীর চরণে প্রার্থনা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নিত্য নিত্য দ্রব্যমূল্য
এমনি করে বাড়বে যদি,
কোথায় বল থামবে জাতির
দুর্গতির হায় এই পরিধি ?
সে শৃঙ্খলা, শান্তি কোথা ?
নিরাপত্তা কথার কথা।
উদ্বেগ, অভাব, উৎকণ্ঠা যে
লেগেই আছে নিরবধি।

২

লুটপাট আর ডাকাতি খুন
নাই প্রতিকার, ঘটছে নিতি,
লোক যে হল উদ্বেজিত
দিনে দিনে বাড়ছে ভীতি।
এ যন্ত্রণা ঘুচাও মাগো !
রক্ষা কর, তুমি জাগো,
দাও মা অভয়, দাও মা আশা,
দাও ভরসা এই মিনতি।

৩

এ দুর্দশার দায়িত্ব কার ?
আমরা জানি তুমিই দায়ী,
তুমি বিপদ-তারিণী মা—
তোমার কাছেই বিচার চাহি।
'ভাগের মা যে পায়না গঙ্গা'
তাইতো মনে দারুণ শঙ্কা,
নূতন শক্তি লভুক জাতি
তোমার কৃপায় অবগাহি।

কৃপাভিক্ষা

শ্রীকালিদাস রায়

দিগন্ত পানে চেয়ে থাকি তব
হেরিতে অভয় পাণি,
কান খাড়া করে থাকি প্রভু, তব
শুনিতে আশার বাণী !
ভুল করেছিনু, তাহার দণ্ড
হবে কেন প্রভু এত প্রচণ্ড ?
মার্জনা করি অনুতপ্তেরে
কাছে লও প্রভু টানি !
অপরাধ কত করেছি চরণে প্রভু—
শাসন করেছ, তাড়ন করেছ,
ক্ষমা তো করেছ তবু !
আজি কেন হলে কৃপায় কৃপণ !
আমি অসহায়, আমি অশরণ,
রুদ্রমূর্তি সম্বরি ধর
স্নেহময় রূপখানি।

সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শন

অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেখা যায় যে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে দুইটি মত সারা ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই দুটি মত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) ও যুক্তিবাদ (rationalism)। প্রত্যক্ষবাদ অনুসারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একমাত্র জ্ঞানার্জনের উপায়। যাহা প্রত্যক্ষ করা একেবারে সম্ভব না তাহা আমাদের জ্ঞানগোচর হতে পারে না। যেমন ঈশ্বর, আত্মা, পরজন্ম ইত্যাদি। যুক্তিবাদীরা বলেন যে প্রত্যক্ষের বিষয় জ্ঞানের আধার হতে পারে না, কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান অনেকক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক ও সকলের প্রত্যক্ষ সমান নয়। প্রত্যক্ষের দ্বারা সার্বভৌম জ্ঞান হতে পারে না। বুদ্ধিবিবেচনার সাহায্যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। এই দুই মতের সমন্বয় করবার চেষ্টা মহামতি কাণ্ট করেছিলেন। তাঁর মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সামগ্রী যোগায় কিন্তু ঐ সামগ্রী বা মালমশলা দিয়ে জ্ঞানের কাঠাম প্রস্তুত করা সম্ভব হয় বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে। বুদ্ধিবৃত্তি ঐ সামগ্রী স্বীয় বৃত্তির আধারে শ্রেণীগত ক'রে জ্ঞান জন্মায়, অতএব দৃশ্যমান জগৎ বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্ট বস্তু। প্রত্যক্ষের বহির্ভূত বস্তু, যেমন ঈশ্বর বা আত্মা একটা ধারণামাত্র, জ্ঞানের বিষয় নয়।

জগতের সত্তা সম্বন্ধেও দুইটি মত প্রকট দেখা যায়। এই দুই মত বিজ্ঞানবাদ (idealism) ও বস্তুতন্ত্রবাদ (realism)। বিজ্ঞানবাদ অনুসারে জগৎ বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞান বহির্ভূত বা অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। বাহিরে যে সব বস্তু দেখিতে পাই সে সবই বিজ্ঞানের প্রকাশ। বিজ্ঞানের বাহিরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

বস্তুতন্ত্রবাদী বলেন যে বস্তুর অস্তিত্ব কোন মানসিক ক্রিয়া বা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। এই জগৎ জ্ঞাতার আবির্ভাবের পূর্বে ছিল এবং আপন নিয়ম অনুসারে চলে। মানুষ নিজেই জগতের অংশ, তার মন প্রকৃতির পরিণাম, অতএব জগৎ মনের উপর নির্ভরশীল নয়। বস্তু বিজ্ঞানপ্রসূত বা তাহার প্রকাশ—এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত।

হেগেল বলেন, এক অখণ্ড চৈতন্য প্রকৃতি ও আত্মার আধার। ঐ অখণ্ড চৈতন্যের দুইভাবে প্রকাশ—একদিকে প্রাকৃতিক ঘটনা ও অপর-দিকে প্রত্যক্ চৈতন্যের ক্রমবিকাশ। এই জন্য সব ক্ষেত্রেই দুটি বিপরীত ভাবের উদয় দেখা যায়, কিন্তু ঐ দুই ভাব (thesis & antithesis) উচ্চতর সমন্বয়ে মিলিত হয় (synthesis)। অখণ্ড চৈতন্য প্রকৃতি ও আত্মার সমন্বয়-রূপে প্রতিভাত।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য দর্শনের এইরূপ অবস্থা ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ নূতন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষভাগে ঐ নব দৃষ্টিসম্ভূত দার্শনিক মতবাদ পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। ফ্রান্সে বার্গসোঁ এই মত ব্যক্ত করেন যে বিচারবুদ্ধি (reason) কখনও সক্রিয় সত্যের আবিষ্কার করতে পারে না। বিচারবুদ্ধি বস্তু বা বিষয়কে খণ্ড খণ্ড আকারে পরিণত করে ও যে সত্যের সন্ধান পায় তাতে প্রাণের স্পন্দন মেলে না, নিছক জড়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাণশক্তির

প্রবাহ রুদ্ধ বা প্রতিহত হলে কখনও জীবনের সত্যতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বিচারবুদ্ধির সমগ্র দৃষ্টি নাই, অতএব তা ত্যাগ করে স্বজ্ঞার (intuition) সাহায্যে প্রাণের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

ইতালীয় দার্শনিক ক্রোসে-ও স্বজ্ঞার সার্থকতা স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর দৃষ্টিতে কলা, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বজ্ঞার সৃজনী শক্তির প্রতি অবহিত হয়ে সত্তার বাস্তবরূপ উপলব্ধি করতে হবে। কালপ্রবাহে চিৎপদার্থের পরিবর্তনে ঐ সৃজনী শক্তির নানা রূপের উদ্ভব হয়।

ইংলণ্ডের বার্টরাণ্ড রাসেল যুক্তিবাদের বিরোধী নন। তিনি বস্তুতন্ত্রবাদী কিন্তু বস্তু ও মন এই দুই পৃথক সত্তার অনুমান না করে ঘটনা-প্রবাহের অন্তর্গত বিষয়গুলির বিভিন্ন সম্বন্ধে মন ও বস্তুরূপে প্রকাশ অনুমোদন করেন। তাঁর পূর্বে আরনষ্ট মাক্ ঠিক অনুরূপ তথ্যের সমর্থন করেন। তাঁর মতে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়গুলি পারস্পরিক সম্বন্ধে বস্তু বা পদার্থরূপে প্রতিভাত ও দর্শকের সম্বন্ধে মানসিক ঘটনারূপে প্রকাশিত।

রাসেল অনেকবার তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি পদার্থবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের সমন্বয় স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর চরম কৃতিত্ব দেখা যায় তাঁর নূতন তর্কশাস্ত্রের প্রণয়নে। তিনি পুরাতন তর্কবিজ্ঞানের অসারতা দেখিয়ে নব তর্কশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেছেন।

আমেরিকার ডিউই (Dewey) তর্কশাস্ত্রের একটা নূতন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে আরিষ্টটলের পদ্ধতিতে ন্যায় বিচার মানুষের কর্মক্ষেত্রে নিষ্ফল। অতএব ন্যায় বিচার বা তর্কের একটা নূতন রীতি অনুসরণ করা দরকার। অর্থাৎ তর্ক পরীক্ষামূলক (experimental) হওয়া চাই। কোন সত্য মানিয়া লওয়া চলে না। যাহা আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রকট তাহার উপর নির্ভর ক'রে বিচার বিবেচনা করা দরকার। অভিজ্ঞতা (experience) মানস নয়। আমাদের কর্মধারায় অভিজ্ঞতা আসে ও পথপ্রদর্শক হয়। বিচারবুদ্ধি (reason) কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নয়। যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হয় তখনই reasoning or thinking অর্থাৎ বিচার-বিবেচনার আবশ্যক হয়। সত্য-মিথ্যা-নির্ধারণ এই বিচারের সার্থকতার উপর নির্ভর করে।

ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে বিজ্ঞানবাদের যথেষ্ট প্রসার দেখতে পাওয়া যায়। কাণ্ট ও হেগেলের পর ব্রাডলি, বোসাঙ্কে, গ্রীন প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বিচারবুদ্ধিকে জ্ঞানার্জনের ধ্রুব উপায় বলেছেন। এই জগৎ Spiritual বা বিজ্ঞানাত্মক। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন বিষয়েই আস্থা থাকে না, কারণ দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি সমস্তই দ্বন্দ্বাত্মক। সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসন হয় Absolute বা অক্ষর চৈতন্যে। ব্রাডলির এই মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় (immediate expericence) বিভিন্ন বস্তুর একত্র সমাবেশ-জনিত একটা অখণ্ড সত্তার আভাস পাওয়া যায়। Absolute বা অক্ষরে সমস্ত বস্তুর রূপান্তর (transformation) হয়, এই মত ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তিনটি বিভিন্ন মতের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। জার্মানীর হুজেরলের Phenomenology বা সাক্ষাৎরূপতত্ত্ব, হাইডেগারের Existentialism বা অস্তিমানতাতত্ত্ব এবং ভিয়েনার কার্নাপের Logical Positivism বা বিধিবদ্ধ দৃষ্টতথ্যবাদ।

হুজেরলের (Husserl) সিদ্ধান্ত এই যে

অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। পূর্বতন দার্শনিকরা ঐ দুটিকে পৃথক কোঠায় রেখে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন এবং কৃত্রিম উপায়ে সেগুলি দূর করার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তু পৃথক শ্রেণীভুক্ত নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বিষয়াত্মক। ব্রেনটানো ও মাইনং অনুরূপ মত প্রচার করেছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়া বস্তুকে অবলম্বন করে চলে, অতএব বস্তুহীন মানসিক ক্রিয়া সম্ভব নয়। হুজেরল বলেছেন অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তুকে একত্রে নিতে হবে (bracketed together)। আমাদের সংজ্ঞান কেবলমাত্র চেতনাপ্রবাহ নয়। বিষয়-বস্তু-সমন্বিত অভিজ্ঞতার আধার। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে যদি ঐ অভিজ্ঞতার যথার্থ রূপ নির্ণয় করতে পারি। যখনই আমরা বাক্যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকি তখনই ভাষার প্রভাবে ঐ অভিজ্ঞতার বিকৃতরূপ পাই। এই মত আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের অনুরূপ। প্রাচীন নৈয়ায়িকরা জ্ঞান ও ভানের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। ভান একটা অখণ্ড চৈতন্য যেটা সাক্ষাৎ তথ্যরূপে প্রতীত হয়। ভাষায় যখন ঐ তথ্য সম্বন্ধে কোন উক্তি করা হয় তখন উহা খণ্ডিত হয় অর্থাৎ প্রমাতৃচৈতন্য ও প্রমেয়চৈতন্য বা জ্ঞাত ও জ্ঞেয় রূপে প্রতিভাত হয়। অখণ্ড চৈতন্য জ্ঞানের আধার হয়ে পড়ে। অখণ্ড অভিজ্ঞতাকে কোন তর্কের আওতায় আনা যায় না। সেটা একটা তথ্যমাত্র, যাহার আধারে জ্ঞানের উদ্ভব হয়।

হুজেরল বলেছেন অভিজ্ঞতা বিষয়াত্মক অর্থাৎ প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই বস্তুমুখী। অতএব তত্ত্বনির্ণয়কালে ঐ তথ্যের অবিকৃত রূপ দেখান একমাত্র উপায়। কাজেই তাঁর অনুসন্ধান-রীতিকে descriptive বলা হয়েছে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ রূপের বিশ্লেষণ। এই জগৎ ভিন্ন সত্তা নয়, আমরা জগতের অংশ ও আমাদের অভিজ্ঞতা জগতের অন্তর্গত। এই কারণে হর্ষবিষাদ, ভয়ভাবনার অভিজ্ঞতা হয়।

অস্তিমানতাতত্ত্ব—আমাদের অস্তিত্ব জগতের অস্তিত্ব থেকে ভিন্ন নয়। হুজেরলের এই অভিমত তাঁর শিষ্য হাইডেগারকে (Heidegger) প্রভাবিত করে। তিনি মানুষের বিদ্যমানতার সমস্যাসমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। "আমি আছি"—এর অর্থ কি? ফরাসী দার্শনিক দেকার্ট বলেছেন যে আমি মননশীল, অতএব আমি আছি। মননশীলতাই আমার অস্তিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু তিনি ব্যক্তিবিশেষ বা আমার নিজের অস্তিত্ব জগতের সম্বন্ধযুক্ত নয়, এই মত ব্যক্ত করেন। আমি আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তাঁকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল। দেকার্টের যুক্তি খণ্ডন ক'রে অস্তিমানতাতত্ত্ববাদী বলেন যে আমার অস্তিত্ব একটা সত্তায় (Being) অধিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, আমার অস্তিত্ব কোন মৌলিক উপকরণে গঠিত একথা বলা চলে না, কারণ আমি আমাকে অতিক্রম করে বর্তমান থাকি। "আমি এই" একথা বলা চলে না। কারণ আমার অস্তিত্বের বিকাশ সময় বা কালসাপেক্ষ। কালের প্রবাহে আমার অস্তিত্বের বিকাশ। আমি নানাভাবে ও নানারূপে নিজের অস্তিত্বের উপলব্ধি করি। সম্ভাব্য বাস্তবিকতার পূর্বগামী (possibility precedes actuality)।

এই জগতে আমার অস্তিত্ব এমন নিবিড় ভাবে জড়িত যে আমি পৃথক সত্তায় বিধৃত বা সমাহিত এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অতএব দেকার্টের নিঃসঙ্গ জীবাত্মার মত আমার অস্তিত্ব

কল্পনা করা অলীক। মানুষের অস্তিত্বকে ব্যাপিয়া এক বিরাট সত্তা (Being) আছে। মানুষের অতিবর্তন (transcendence) ঐ সত্তার পরিচায়ক।

মানুষ এক শূন্যতার সম্মুখীন হওয়ায় ভয়-ভাবনার উদয় হয়। ভয়ভাবনা (anxiety) শূন্যতার (nothing) পরিচায়ক। জগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় হর্ষবিমর্ষ, দুর্ভাবনা প্রভৃতির অনুভূতি হয়।

Dasein (is there)—মানুষের অস্তিত্ব যে অতিবর্তী (transcendent) তারই স্বাক্ষর। এই অতিবর্তন সম্ভাব্যসমূহের একটা সুসম্বন্ধ গঠনরূপে প্রকাশিত। কিন্তু হাইডেগার ব্যক্তি-বিশেষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নির্বাক। কির্কেগার্ড (Kierkegaard) অস্তিমানতাতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করেন। তিনি প্রতি মানুষের অস্তিত্ব ও তার স্বাধীনভাবে কাজ করার ওপর জোর দেন। কিন্তু হাইডেগার মানুষের অস্তিত্বকে কাল-প্রবাহের (Time) অন্তর্গত জেনে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যের (possible) একটা ক্ষেত্ররূপে ব্যাখ্যা করেছেন। "এখন দুটো বেজেছে"—এই উক্তিতে "এখন" এই শব্দের অর্থ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মিলিত রূপ।

জার্মানীতে আর একজন বিখ্যাত অস্তি-মানতাতত্ত্ববাদী কার্ল জ্যাসপার্স (Karl Jaspers) "পরা" সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে পরা সত্তার (trans-cendent Being) সাংকেতিক লিপি (Cypher script) এই দৃশ্যমান জগৎ (phenomenal world)। ধর্ম বা চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধীয় প্রতীকগুলি ঐ সাংকেতিক লিপির অনুরূপ। প্রতীক মাধ্যমে পরা সত্তার ও আমার অস্তিত্বের লেনদেন হয়। প্রতীক মানুষের যে সব ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করে তাতে পরা সত্তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

ফ্রান্সে গ্যাব্রিয়েল মার্শেল ও জঁা পল সার্টার (Gabriel Marcel & Jean Paul Sartre) অস্তিমানতাবাদী। মার্শেল বলেন যে বর্তমান কালে মানুষ নিজেকে কতকগুলি বৃত্তির (function) সমষ্টি মনে করে। বাস্তব সত্তার কোন চেতনাই তার নাই। কিন্তু কতকগুলি জৈব. সামাজিক ও মানসবৃত্তির সমষ্টি কোন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত নয় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষের জীবনকে শূন্যময় করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের সত্তা পরা সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। এই কথা স্মরণ করে আমরা মানুষের জীবন-রহস্য বুঝতে সক্ষম হব।

কিন্তু সার্টার কর্মরত মানুষের কর্মের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কর্মই মানুষের সত্তার পরিচায়ক। সার্টার কোন পরম সত্তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে জীবনধারণ মৃত্যুবরণ করার একমাত্র নিশ্চিত উপায়, এটা আমাদের অবিদিত নয়। কর্ম করে জীবনধারণ করতেই হবে যদিও অবশেষে মৃত্যুবরণ অনিবার্য।

Transcendence বা অতিবর্তনের প্রত্যক্ষ নিদর্শন বিপ্লব (revolution)। যে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আছে তাকে অতিক্রম ক'রে মানুষ বেঁচে থাকে। পুরাতনের আওতায় থেকে জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। বিধিব্যবস্থা মানুষের জন্য, মানুষ বিধিব্যবস্থার দাস নয়। মানুষের অস্তিত্বের বিকাশ অতিবর্তন-প্রথায় হয়ে থাকে। মানুষ জীবনের মূল্য সৃষ্টি করার স্বাধীন কর্তা।

এখন আমরা বিধিবদ্ধ দৃষ্টতথ্যবাদের আলোচনা করব। ফরাসী দার্শনিক কম্‌ৎ (Comte) দৃষ্টতথ্যবাদ (positivism) প্রচার করেছিলেন। তিনি মানুষের জীবনবিকাশের

কয়েকটি স্তর ঐতিহাসিক দৃষ্টি অনুসারে ভাগ করেছেন। প্রথমে ধর্মসম্বন্ধীয় আচারব্যবহার ও অন্ধবিশ্বাস, পরে তত্ত্ববিচার সম্বন্ধে বিভিন্ন কল্পনাবিলাস, এবং অবশেষে বিজ্ঞানচর্চা ও প্রত্যক্ষ তথ্য অনুসরণ ক'রে যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি-স্থাপন। বিজ্ঞানের জন্ম ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান দৃষ্টতথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অবস্থাতে দৃষ্টতথ্যবাদের (positivism) জন্ম হয়। বিজ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী ছিল। তত্ত্ববিচারও কল্পনায় সীমিত ছিল। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে মানুষ প্রত্যক্ষ তথ্য অন্বেষণে আগ্রহী হয়।

কিন্তু এই অর্থে আজকাল positivism শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। দৃষ্টতথ্যবাদের অর্থ—যে প্রত্যক্ষ ঘটনার ভিত্তিতে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তার বিচার করা। হিউম (Hume) প্রথমে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জ্ঞানের উপাদানকে impresssion (এখনকার ভাষায় sense data) বলেছেন। আমাদের জ্ঞানের দুটি বিভাগ আছে—(১) আমাদের ধারণাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধীয় জ্ঞান (২) প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান। এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রথমটিতে কেবলমাত্র সমানার্থক শব্দযোজনা (tantology) আছে, এই কথা উইতেনষ্টাইন (Wittgenstein) বলেছেন। তর্কশাস্ত্রের মীমাংসাগুলি ও গণিত-শাস্ত্রের হিসাবগুলিতে এরূপ শব্দযোজনা দেখা যায়। তর্কশাস্ত্রের ক=ক এবং গণিতে ৭+৫=১২ উহার উদাহরণ। এই সব ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার হয় না, বস্তুর সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু কাণ্ট বলেছেন যে জ্ঞানের প্রসার হয়; যেমন ৭+৫=১২, '১২'—'৭' বা '৫' নয়, এ দুয়ের যোগফল। কিন্তু এই মত সমর্থিত হয়নি, কারণ '৭' এর অর্থ সাতবার '১', '৫'এর অর্থ পাচবার '১' ও '১২'র অর্থ বারোবার '১'। অর্থাৎ একেরই পুনঃ পুনঃ গণনা।

Wittgenstein-এর মতে প্রত্যক্ষ বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। 'Facts' বা প্রত্যক্ষ বিষয়সমূহ বিচ্ছিন্ন, পরমাণুবৎ (atomic) এবং উহাদের সম্বন্ধ ভাষায় প্রকাশ করার কয়েকটি রীতি তিনি দেখিয়েছেন। Russell এই মত অনুসরণ ক'রে প্রত্যক্ষ বিষয়, যেমন "লাল পোচড়া," "এইত এখন," "ওখানে শব্দ," শব্দ যোজনায় ব্যক্ত করার পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Principia Mathematica-তে তিনি গণিতশাস্ত্রের নৈয়ায়িক ভিত্তি ব্যাখ্যা করেছেন।

ঠিক এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মরিজ স্লিক (Maurtiz Schlick) ও রুডলফ কার্নাপ (Rudolf Carnap) বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। কার্নাপের প্রধান উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য একটা ভাষার কাঠাম প্রস্তুত করা। তিনি Russell-এর মত sense data language অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ভাষা গঠন না ক'রে বিজ্ঞান যে ভাষায় তার অনুসন্ধান করেছে তার নিয়মগুলি নির্ণয় করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ প্রকাশের ভাষা সৃষ্টিতে অনেক অসুবিধা আছে। সেইজন্য যে সব শব্দ বস্তুকে বোঝায় সেইসব শব্দকে মৌলিক শব্দরূপে প্রয়োগ ক'রে পদবিন্যাস সুসঙ্গত করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কার্নাপ ভাষার বিশ্লেষণ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। একদিকে ভাষার আকৃতি (form) গঠন করার উদ্দেশ্য, অপর দিকে যে সব বস্তু শব্দের দ্বারা লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে আমাদের পদরচনা সার্থক হয়েছে

কি না তার বিচার করা। প্রথমটি Syntax বা বাক্যরচনার বিধি ও দ্বিতীয়টি Semantics বা শব্দার্থবিদ্যা। যদি বলা যায় "পরমতত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ" —এই বাক্যে (Sentence or proposition) বস্তুর কোন নির্দেশ নেই কারণ "পরমতত্ত্ব" বা "পূর্ণাঙ্গ" শব্দমাত্র, কোন প্রত্যক্ষবস্তুর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। অতএব "পরমতত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ" এই বাক্যের প্রতিপাদন (verification) সম্ভব নয়। যদি কোন বাক্য বা পদ প্রতিপন্ন করার কোন সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সেই বাক্য অর্থশূন্য (meaningless) এবং পরিত্যাজ্য।

এই যুক্তির ওপর নির্ভর করে কার্নাপ সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অধিবিদ্যামূলক প্রশ্নগুলিকে নিরর্থক বলে বাতিল করে দিয়েছেন। দর্শনশাস্ত্রের কোন ভিত্তি নেই। ঐ শাস্ত্রের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক বাক্যগুলির নব তর্কশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বিশ্লেষণ করা। (logical analysis of scientific propositions)।

মরিচ স্‌ক্লিক বস্তুতন্ত্রবাদ ও দৃষ্টতথ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। বস্তুতন্ত্রবাদ (realism) বহির্জগতের বাস্তবতা স্বীকার করে। বস্তুর বাস্তবতা মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। দৃষ্টতথ্যবাদ (positivism) ঐ বাস্তবতার (reality) কোন অনুসন্ধান করে না। ইহার দৃষ্টিতে বিজ্ঞানই (Science) একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস্য, কারণ বিজ্ঞানের বিচার দৃষ্টতথ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়। যে কোন সত্য প্রতিপাদন করার একমাত্র উপায় দৃষ্টতথ্যের আধারে সত্যের পরীক্ষা করা।

ইংলণ্ডের এ, জে, আয়ার (A. J. Ayer) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Language, Truth and Logic লিখে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এই পুস্তকে তিনি তত্ত্বশাস্ত্র (metaphysics) বাতিল করেছেন, কারণ তত্ত্ববিষয়ক সকল প্রশ্নই নিরর্থক। তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রধান ভ্রান্তি ভাষাগত। চলতি ভাষায় বলা হয় পাথর আছে, লোহা আছে। যদি এইভাবে বলা যায় আত্মা আছে, তাহলে "আছে" এই শব্দের অর্থ কি পাথর "আছে" বললে যে অর্থ হয় তার অনুরূপ? পাথর আছে অর্থাৎ দেশকালসমন্বিত এক বস্তু যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু "আত্মা আছে" বললে সেই অর্থ হয় না।

আয়ার বাক্য বা পদের (proposition) বিশ্লেষণ করেছেন নূতন বিধি অনুসারে। যদি "এটা লাল", "ওটা হলদে" এই দুই মৌলিক বাক্য (basic or protocol propositions) লওয়া যায়, তাহলে 'এটা লাল অথবা ওটা হলদে" এই যুগ্ম বাক্যের অর্থ হবে—"না-লাল এবং না-হলদে" এই বাক্যের নিরসন, অর্থাৎ ঐ যুগ্ম বাক্য মিথ্যা হবে যদি "এটা লাল" এবং "ওটা হলদে" দুই বাক্যই মিথ্যা হয়। পুনরায় ঐ যুগ্ম বাক্য সত্য হবে যদি (১) "এটা লাল", "ওটা হলদে" দুটো বাক্যই সত্য হয় অথবা (২) যদি "এটা লাল" সত্য হয় এবং "ওটা হলদে" মিথ্যা হয়, অথবা (৩) যদি "এটা লাল" মিথ্যা হয় এবং "ওটা হলদে" সত্য হয়।

কোন পদ (proposition) সত্য বা মিথ্যা তা নির্ণয় করতে হলে প্রত্যক্ষ বিষয়ের আধারেই করতে হবে। আমরা সেই বাক্যকে সত্য বলি যার প্রত্যক্ষবিষয়ের সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু যদি কোন বাক্য প্রত্যক্ষতথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহলে সেই বাক্য বর্জন করা চলে না, যদি তার প্রতিপাদনের (verification) কোন সম্ভাবনা থাকে। একটি পদ verified না হলেও verifiable হতে পারে, অতএব উহা পরিত্যাজ্য নয়। "মৃত্যুর পর আত্মা থাকে" এই বাক্য প্রত্যক্ষতথ্যের দ্বারা প্রমাণিত নয়, কিন্তু যদি ভবিষ্যতে কোন প্রত্যক্ষতথ্য পাওয়া যায় তাহলে ঐ বাক্য মিথ্যা বা অর্থহীন বলা চলে না।

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য

(স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)*

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূঃ—রজ্জুস্বরূপ শ্রবণের দ্বারা যেরূপ সর্পভ্রান্তি দূর হয়, ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণের দ্বারাই যদি সেরূপ সংসারিত্ব-ভ্রান্তি দূর হইত, তবে তোমার কথা মানিতাম। পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণ করিয়াও, দেখিতেছি লোকের সুখদুঃখ ও সংসারধর্ম থাকিয়াই যায়। আবার দেখ, শাস্ত্রেও এই জন্যই শ্রবণের পরে মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশ করিয়াছে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্মকে কর্ম বা উপাসনা বিধির শেষ ফল হিসাবেই শাস্ত্রে উপপাদন করা হইয়াছে।

উঃ—না। কর্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে বিলক্ষণ তাহা বলিয়াছি। কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ কর্ম, তাহাদের ধর্ম বলে, তাই সূত্র হইয়াছে "অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা।" হিংসাদি অধর্ম পরিহর্তব্য, এ হিসাবে অধর্মও জিজ্ঞাস্য। উক্ত অর্থ ও অনর্থ নামক ধর্মাধর্মের ফল প্রত্যক্ষ সুখ ও দুঃখ যাহা ব্রহ্মা হইতে স্থাবর সমস্ত জীব বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগে শরীর বাক ও মনের দ্বারা উপভোগ করিয়া থাকে। এরূপ শুনা যায় যে মনুষ্য হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত ব্যক্তিভেদে সুখের তারতম্য আছে। সুতরাং সুখের মূলকারণ ধর্মেরও তারতম্য আছে। ধর্মের অল্পাধিক্য হেতু বুঝা যায় যে অর্থিত্ব (কামনা) ও সামর্থ্যেরও অল্পাধিক্য আছে। সেই জন্যই শাস্ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদের বিদ্যাসমাধিবিশেষ-সামর্থ্যে (চিত্তস্থৈর্যের সামর্থ্যের যোগে) উত্তরপথে যাইবার কথা (দেবযানমার্গে) আছে। আবার শুধু ইষ্টাপূর্ত ও (ধনদানাদি) দত্তকর্মকারীদের ধূমাদি-ক্রমে দক্ষিণাপথে (পিতৃযান) গমনের কথা আছে। সেখানেও সুখের অল্পাধিক্য ও সেই কারণে সুখ-প্রাপক কর্মেরও অল্পাধিক্য আছে। ইহা "যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা" (যে পর্যন্ত ধর্মফল থাকে সে পর্যন্ত বাস করিয়া) এই বাক্য হইতে জানা যায়। মনুষ্য, নারকী জীব ও নিকৃষ্ট স্থাবর সকলেই অল্প হইলেও সুখভোগ করিয়া থাকে এবং উহা তাহার ধর্ম বা বৈধকর্মের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। অন্যপক্ষে, উর্ধ্বলোকস্থ বা অধোলোকস্থ প্রত্যেক শরীরীর-ই অল্পাধিক পরিমাণে দুঃখ আছে। ইহার কারণ বিধি বিরুদ্ধ কর্ম (অধর্ম) এবং কর্মীদের তারতম্য। এই প্রকারে, অবিদ্যাদি (অবিদ্যা, কাম, কর্ম, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ) দোষ-দুষ্ট শরীরীদের ধর্মাধর্মের অল্পাধিক্য হেতু সুখদুঃখ-তারতম্যপূর্ণ অনিত্য সংসারভোগ ঘটিয়া থাকে। ইহা শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। তথা শ্রুতি "সশরীর পুরুষের প্রিয় আর অপ্রিয়ের হাত হইতে নিস্তার নাই"—এই কথা বলিয়া পূর্ব-বর্ণিত সংসারের রূপ বলিয়াছেন। আবার "অশরীর পুরুষকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না"—এই শ্রুতিবাক্য অশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয়-স্পর্শ নিষেধ করিয়া জানাইতেছে যে, মোক্ষনামক অশরীর-ভাব চোদনা-লক্ষণ ধর্মের কার্য বা উৎপাদ্য নহে। ধর্মের উৎপাদ্য প্রিয় ও অপ্রিয়, পুণ্য ও পাপ। উহাদের প্রতিষেধ নহে। অশরীরত্ব ধর্মের দ্বারা উৎপাদ্য নহে,

* অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

কোন কিছুর দ্বারাই উৎপাদ্য নহে, কেননা উহা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। যথা শ্রুতি—

"অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥"

"অপ্রাণো হি অমনাঃ শুভ্রঃ," "অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ।" অতএব অশরীরত্ব রূপ মোক্ষ-ফল নিত্যসিদ্ধ, কোন অনুষ্ঠানের ফল নহে।

পূঃ—ভাল, নিত্য বলিতে বাধা কি? বিকারশীল হইলেও, অল্পাধিক্য হইলেও যদি বস্তুকে চিনিতে পারা যায়, তবে ত নিত্যই হইল। যেমন, পৃথিব্যাদিকে জগন্নিত্যতাবাদিগণ পরিণামী অথচ নিত্য বলেন; যেমন সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।

উঃ—মোক্ষাখ্য অশরীরত্ব সেরূপ নহে। ইহা সর্বপ্রকার বিকাররহিত, ব্যোমবৎ সর্বব্যাপী, নিত্যকূটস্থ, পারমার্থিক, নিরবয়ব, স্বয়ংজ্যোতি, নিত্যতৃপ্ত—যাহাতে ত্রিকালে ধর্মাধর্ম ও তাহার ফল পুণ্যপাপ বা প্রিয়াপ্রিয় বা সুখদুঃখ সম্ভাবিত হয় না। যথা শ্রুতি "অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্র অধর্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ" (ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম হইতে ভিন্ন, পুণ্যাপুণ্য হইতে ভিন্ন, ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন) বক্ষ্যমাণ জিজ্ঞাসা সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে। সুতরাং যদি শাস্ত্রে কর্তব্যবিশেষ-উৎপাদ্যরূপে ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তবে অনুষ্ঠানসাধ্য বলিয়া মোক্ষফল নিশ্চয়ই অনিত্য হইবে। কেননা উপরি-উক্ত বর্ণনা অনুসারে কর্মফলের নানারূপ অল্পাধিক্যের মধ্যে বড়জোর মোক্ষ একটি অধিক উৎকৃষ্ট কর্মফল মাত্র। কিন্তু সমস্ত মোক্ষবাদিগণ বলেন যে মোক্ষ এরূপ নহে। ইহা নিত্য একরূপ। অতএব কর্তব্য-উৎপাদ্য হিসাবে ব্রহ্মের উপদেশ যুক্তিসঙ্গত হয় না।

তাছাড়াও দেখ শাস্ত্রে কি বলিয়াছে। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে", "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি", "অভয়ং বৈ জনক! প্রাপ্তোঽসি", "তদাত্মানমেবা-বেদহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ", "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"—এই সমস্ত শ্রুতির মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই মোক্ষ পাওয়ার কথা বলিয়াছে, মধ্যে তৃতীয় কোন কার্যান্তর নাই। তথা "বামদেব ঋষি আত্মজ্ঞানের পর বুঝিয়া-ছিলেন, আমিই মনু, আমিই সূর্য হইয়াছিলাম" ইত্যাদি, আরও শ্রুতি-বলে জানা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞান ও সর্বাত্মভাবের মধ্যে তৃতীয় কোন কার্যান্তর নাই। 'যেমন দাঁড়াইয়া গান করিতেছে' বলিলে স্থিতির ক্রিয়া ও গান করার মধ্যে তৃতীয় কার্যান্তর না-থাকা বুঝা যায়, ইহাও সেইরূপ। "তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপার দর্শন করাইতেছ। হে ভগবন্, আমি ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছি যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। হে ভগবন্, আমি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত; আপনি আমাকে শোক হইতে উত্তীর্ণ করুন। ভগবান সনৎকুমার সেই মৃদিতকষায় অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণকে অজ্ঞানের পরপার দেখাইলেন"—এই সকল শ্রুতি মোক্ষের প্রতিবন্ধ যে অজ্ঞান, তাহার নিবৃত্তিটিকেই আত্মজ্ঞানের ফল দেখাইতেছেন। একথা আচার্য গৌতমের ন্যায়োপবৃংহিত সূত্রেও আছে। যথা "দুঃখজন্ম-প্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদ-নন্তরাপায়াদপবর্গঃ" (মিথ্যাজ্ঞান—রাগদ্বেষাদি দোষ-প্রবৃত্তি-জন্ম-দুঃখ এইভাবে পরপর অপায়ের মানে নাশের দ্বারা অপবর্গ হয়)। ব্রহ্মাত্মৈক্য-

বিজ্ঞান দ্বারা এই মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে।

এই ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞান সম্পৎ-উপাসনা নহে। যেমন "মন অনন্ত, বিশ্বদেব অনন্ত, সুতরাং মনকে উপাসনা করিলেই প্রসিদ্ধলোক জয় করা যায়।" ইহা অধ্যাস উপাসনাও নহে। যথা "মনই ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবে" "আদিত্যই ব্রহ্ম, এইরূপ উপদেশ আছে।" ইহা বিশিষ্টক্রিয়াসাদৃশ্য-রূপ সম্বর্গ-উপাসনা নহে। যথা "বায়ু সংবরণ করেন বলিয়া সম্বর্গ। প্রাণও সংবরণ করেন বলিয়া সম্বর্গ।" জীব ও ব্রহ্মের একাত্ম-জ্ঞান এরূপ বিশিষ্টক্রিয়া-সাদৃশ্য-রূপী নহে। হবি-সংস্কার, যেমন যজ্ঞ-কার্যের অঙ্গ, জীব-ব্রহ্ম-ঐক্য-ব্যাপার সেরূপ কর্মাঙ্গ-সংস্কাররূপী নহে। ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানকে উপরোক্ত সম্পৎ কি অধ্যাস কি কর্মাঙ্গসংস্কার-রূপে, যে-কোন ভাবে গ্রহণ করিতে গেলে, "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই সব শাস্ত্রবাক্য যাহারা ব্রহ্ম এবং জীবের অভেদত্ব প্রতিপাদন করে, তাহাদের উপর পীড়নকরত ঐরূপ অর্থ বাহির করিতে হয়। অপিচ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"—এই বাক্যে যে অজ্ঞাননিবৃত্তি-ফলের কথা আছে তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—এই বাক্য দ্বারা যে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সম্পদাদি-পক্ষে এইরূপ অর্থের সামঞ্জস্য করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞান সম্পদাদি-রূপ নহে। আরও বুঝা যায় যে ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষতন্ত্রাধীন নহে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় যে ভৌতিক বস্তু, সেই বস্তুবৎ বস্তু-তন্ত্রাধীন। এবম্ভূত যে ব্রহ্ম এবং তৎজ্ঞান, সেখানে কর্মের অনুপ্রবেশ কল্পনাই করা যায় না।

পূঃ—বটে, তবে বিদিক্রিয়াটি কি ক্রিয়া নহে? উপাসনা-ক্রিয়া বা উপাস্তি-ক্রিয়া কি মানস-ক্রিয়া নহে?

উঃ—বিদিক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। যথা "ব্রহ্ম বিদিত হইতেও আলাদা, অবিদিত হইতেও আলাদা", "যেনেদং সর্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ।" উপাস্তি-ক্রিয়া বা উপাসনারূপ মানসক্রিয়ার দ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায় না। যথা "তিনি বাক্যের দ্বারা উক্ত হন না, অথচ বাক্য তাঁহার দ্বারা উদিত হয়," "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদি-দমুপাসতে" (তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, যিনি ইদন্তা-রূপে উপাসনার যোগ্য হন না)।

পূঃ—ব্রহ্মকে যদি একেবারে অবিষয় বলিয়া বর্ণনা করিতে চাও, তবে তাঁহাকে শাস্ত্রমুখে জানার বিষয় বলিবে কেন?

উঃ—শাস্ত্র ইদন্তা-রূপে ব্রহ্মকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না। শাস্ত্র শুধু অবিদ্যাকল্পিত ভেদকে নিরাস করে। শাস্ত্র প্রমাণ করে যে, প্রত্যগাত্মা অবিষয়; ব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মা অভেদ। অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের কোনই ভেদ নাই। তিনই এক। তথাচ শাস্ত্র—"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥" (যে বলে জানি না সেই জানে, যে বলে জানি সে জানে না); "ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেৎ ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ। ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" (চক্ষুর দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রুতির শ্রোতাকে শোনা যায় না, জ্ঞাতার বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না)। অতএব অবিদ্যা-কল্পিত সংসারিত্বের নিবর্তন হইলেই (জ্ঞানের দ্বারা) নিত্যমুক্ত আত্মস্বরূপ প্রকাশ পাইবেন। মোক্ষস্বরূপে তাই অনিত্যত্ব-দোষ পড়ে না।

যদি মোক্ষ কোনও উৎপাদ্য ব্যাপার বা বিকার্য ব্যাপার হইত, তবে বলিতে পারিতে যে

কায়িক বাচিক বা মানসিক কোন-না-কোন কার্য দ্বারা ইহা হইয়াছে। সে পক্ষে মোক্ষকে অনিত্য বলিতে নিশ্চয়ই পারিতে। উৎপাদ্য ঘটাদি বস্তু বা বিকারশীল দধ্যাদি বস্তুকে কেহ কখনও নিত্য হইতে দেখে নাই। ইহা কোন প্রাপ্তির ব্যাপার নহে যে পূর্বে ছিল না, পরে পাইলাম। স্বাত্মস্বরূপ পূর্ব হইতেই ছিল ও আছে, সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তি ক্রিয়ার ফল হইবে না। যদি ধরাও যায় যে ব্রহ্ম স্বাত্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্ত, তথাপি যেহেতু ব্রহ্ম সর্বগত, সেজন্য আকাশের মত তিনি সর্ববস্তু প্রাপ্ত হইয়াই রহিয়াছেন। মোক্ষ বা ব্রহ্মকে সংস্কার্য ক্রিয়াফল হিসাবেও লইতে পার না। কেননা, সংস্কার-ক্রিয়া বল কাহাকে? না বস্তুতে যখন কোনও গুণ চড়াই বা ঘর্ষণ দ্বারা কোন দোষ দূর করি। ব্রহ্ম সর্বাধার, (আধেয় নহেন সুতরাং তৎবহির্গত কিছুই নাই) সুতরাং তৎবহির্গত গুণ পাইবে কোথায়? নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মের কোন দোষই নাই। সুতরাং ব্রহ্মকে বা মোক্ষকে সংস্কার্য ফল বলিতে পার না।

পূঃ—যদি বলি, নিত্যমুক্তত্ব বা মোক্ষ, আত্মারই ধর্ম, তবে তাহা আবৃত থাকে, সংস্কার্য ক্রিয়া দ্বারা আবরণ দূরীভূত হয়। যেমন দর্পণ ঘর্ষণের দ্বারা পুনঃ ভাস্বরত্ব লাভ করে।

উঃ—তাহা হয় না। আত্মা কখনও ক্রিয়ার আশ্রয় (অর্থাৎ কর্তা) হন না। যদি ক্রিয়ার আশ্রয় হইতেন, তবে বলিতে পারিতে যে ঘর্ষণ-ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা লাভবান হইলেন। আত্মা ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত হইলে তিনি বিকার্য হইবেন। "অবিকার্যোঽয়মুচ্যতে" ইত্যাদি বাক্য ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বাধিত হয়। তোমার নিশ্চয়ই সে অভিপ্রায় নাই। সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মা কোন ক্রিয়ার আশ্রয় (কর্তা) হইতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, অপরের কৃত ক্রিয়ার দ্বারা অপর ব্যক্তি সংস্কার্য হইতে পারেন, কিন্তু আত্মা সে ক্রিয়ার বিষয় নহে বলিয়া অপরের কৃত ক্রিয়া আত্মার সংস্কার করিবে না।

পূঃ—বাপুহে, স্নানাচমনাদি ক্রিয়ার দ্বারা জীব শুদ্ধ বা সংস্কৃত হয় না?

উঃ—অবিদ্যাগৃহীত, দেহাদির দ্বারা সংহত আত্মার ওরূপ শুদ্ধি হয়, প্রত্যগাত্মার হয় না। স্নানাচমনাদি ক্রিয়ার আশ্রয় (কর্তা) দেহ, দেহের উপর তাহার ফল। সুতরাং তদ্দ্বারা দেহাত্মবাদী অবিদ্যাগ্রস্ত সংহত জীবের সংস্কার হইতে পারে। যথা, দেহাশ্রিত চিকিৎসা-ক্রিয়ার দ্বারা ধাতুবৈষম্য নিবৃত্ত হইলে দেহাভিমানী জীবেরই আরোগ্য-ফল জন্মে,—"আমি রোগশূন্য হইয়াছি" এতদ্রূপ বুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ স্নানাচমনাদি ক্রিয়ার দ্বারা যে বস্তুতে বা দেহাদিতে "আমি শুদ্ধ হইয়াছি" এইরূপ বুদ্ধি জন্মে, সেই দেহাভিমানী সংহত জীবই সংস্কৃত হয়, অপর কেহ নহে। সেই সংহত ও দেহাভিমানী জীবই বা অহংকর্তাই সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন করে এবং সেই সব কর্মের ফলভোগ করে। "জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটির একটি ফলভোগ করে, অন্যটি কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন করেন"—এই মন্ত্র উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ। "বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত যে অহংকর্তা তাহাকেই মনীষিগণ ভোক্তা কহেন"; তথা "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ব-ভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥" (সেই এক দেবতা সমস্ত জীবের মধ্যে মায়া দ্বারা গূঢ়ভাবে থাকেন। তিনিই সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সকলের কর্মের অধ্যক্ষ (সাক্ষী), সর্বভূতের আশ্রয়। তিনিই নির্গুণ, সাক্ষী ও সকলের চেতয়িতা); "স পর্যগাৎ শুক্রম্ অকায়ং অব্রণং

অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্"—এই দুই মন্ত্র ব্রহ্মের নিত্যশুদ্ধতা, সর্বব্যাপিতা ও অনাধেয়তা (আধেয় নহেন, সর্বাধার) দেখাইতেছে। ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। সুতরাং মোক্ষ সংস্কার্য নহে। সুতরাং ব্রহ্মে বা মোক্ষে ক্রিয়া-প্রবেশের অল্পমাত্রও পথ দেখাইতে পারিবে না। মোক্ষে জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়ার গন্ধমাত্রও প্রবিষ্ট করাইতে পারিবে না।

পূঃ—জ্ঞানও একপ্রকার মানসী ক্রিয়া।

উঃ—না। দেখ ক্রিয়া কাহাকে বলি। যাহা বস্তুর স্বরূপ বিষয়ে নিরপেক্ষ কিন্তু পুরুষের চিত্ত ও ব্যাপারের অধীন। উদাহরণ দেখ—"যে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি গৃহীত হইবে, বষট্‌কর্তা বা হোতা সেই দেবতার ধ্যান করিবেন", "মনের দ্বারা সন্ধ্যাদেবতাকে ধ্যান করিবে।" ধ্যান, চিন্তন, ইত্যাদি মানস ক্রিয়া। ইহা পুরুষতন্ত্রাধীন, পুরুষ করিলেও করিতে পারে, না-ও করিতে পারে; অন্যথাও করিতে পারে। জ্ঞান বস্তুবিষয়ক জ্ঞান; বস্তুটি যেরূপ জ্ঞানও সেইরূপ হইবে। সুতরাং বস্তুতন্ত্রাধীন। এখানে পুরুষ ইচ্ছা করিলে এইরূপ জানিব - নয় জানিব না—নয় অন্যথা জানিব—এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহাকে ক্রিয়া বলিতে পার না। তারপর মানসী। জ্ঞানের মানসত্বেও তফাৎ আছে। "হে গৌতম, পুরুষ অগ্নি, স্ত্রীও অগ্নি"—এই মন্ত্রে পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রতি যে অগ্নিবুদ্ধির নির্দেশ আছে, তাহা মানসব্যাপার বটে, ক্রিয়ার্থ এরূপ উপদেশ বলিয়া ক্রিয়াও বটে আবার পুরুষতন্ত্রের অধীন, যেমন পুরুষ ইচ্ছা করিলে অগ্নিবুদ্ধি করিতেও পারে, নাও পারে আবার অন্যথা করিতেও পারে। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি, তাহার সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই; উহা পুরুষতন্ত্রাধীনও নহে। উহা প্রত্যক্ষের বিষয় যে বস্তু তাহার তন্ত্রাধীন, বস্তু যেমন, তেমন বুদ্ধি—ইহাই জ্ঞান, ইহা ক্রিয়া নহে সমস্ত প্রমাণাদির বিষয় (শুধু প্রত্যক্ষের বেলা নহে) যে বস্তু তাহার বেলায় এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব যথার্থ ব্রহ্ম বা আত্মবিষয়ও জ্ঞান, ক্রিয়া নহে। ব্রহ্ম বা আত্মা বস্তুর অধীন, ক্রিয়া বা ক্রিয়াবিধির অধীন নহে। ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যে কুর্যাৎ শ্রূয়াৎ ইত্যাদি বিধিলিঙের প্রয়োগ থাকিলেও ঐসব বিধি বাস্তবিক প্রযোজ্য হয় না, যেমন প্রস্তরাদির উপরে ক্ষুরের তীক্ষ্ণতা ব্যর্থ হয়, সেই প্রকার অহেয় অনুপাদেয় বস্তুবিষয়ে বিধির কার্যকারিতা ব্যর্থই হইয়া থাকে।

তবে যে শাস্ত্রে বিধিচ্ছায়াবৎ বাক্য আছে, যথা "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", তাহার উদ্দেশ্য স্বাভাবিক বিষয়মুখী প্রবৃত্তিকে বিষয়বিমুখী করা। যে পুরুষ "আমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট যেন না হয়" এইরূপে প্রবৃত্তি-স্রোতে ধাবমান হয়, তাহার এতদ্দ্বারা আত্যন্তিক পুরুষার্থ লাভ হয় না; এই আত্যন্তিক পুরুষার্থকামী পুরুষকে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগবশতঃ স্বাভাবিক যে বহির্বিষয়ক প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইতে বিমুখ করিয়া প্রত্যগাত্মস্রোতের দিকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এইরূপ বিধিচ্ছায়া-জাতীয় উপদেশ, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ"। আত্মাকে অন্বেষণকারী প্রবৃত্তিকে অহেয় অনুপাদেয় আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন, যথা "যাহা কিছু আছে, সবই এই আত্মা," "যখন তাহার এ সমস্তই আত্মা বলিয়া প্রতীত হইবে, তখন সে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে? কাহাকে জানিবে," "বিজ্ঞাতাকে কি ভাবে জানিবে" "এই আত্মাই ব্রহ্ম" যদিও আত্মজ্ঞানে কর্তব্যতা-বোধের প্রাধান্য নাই (কেননা, হেয়কে দূরীকরণ এবং উপাদেয় অর্জন করার প্রশ্ন নাই, সেহেতু করণীয়ও কিছু নাই), তথাপি যেহেতু আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলে

কৃতকৃত্যতা-লাভের দ্বারা সমস্ত কর্তব্যতা-বোধের হানি হয়, সেজন্য এ সিদ্ধান্ত অস্মদ্মতের অলংকারস্বরূপ। তথাচ শ্রুতি, "আত্মানং চেৎ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ইতি" "পুরুষ যখন আপনাকে প্রত্যগাত্মা বলিয়া জানে, তখন সে আর কি ইচ্ছা করিয়া, কাহার তৃপ্তির জন্য এই শরীরের অনুগত হইয়া জ্বর ভোগ করিবে?" তথাচ স্মৃতি, "এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত"—"এই আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া প্রকৃত বুদ্ধিমান হও ও কৃতকৃত্য হও"; অতএব ব্রহ্ম বা মোক্ষ, বিধির বা ক্রিয়ার বিষয় একেবারেই নহে।

পূঃ—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সম্বন্ধীয় বিধি বা ক্রিয়া-ফল হিসাবে ছাড়া, কেবল বস্তুবাদী বেদভাগ কোথায়?

উঃ—এরূপ বলা যায় না। ঔপনিষদিক পুরুষ বা প্রত্যগাত্মা অন্যশেষ বা ক্রিয়া-শেষ লভ্য ফল নহে। সেই ঔপনিষদিক পুরুষ প্রথম হইতেই বর্তমান, ক্রিয়ার যে চারিটি ফল লভ্য হয় (যথা উৎপাদ্য, বিকার্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য) তাহার প্রত্যেকটি হইতে বিলক্ষণ (পৃথক, স্বতন্ত্র), অসংসারী স্বস্বরূপস্থ হইয়া নিত্য বর্তমান। তাহাকে কেহ "নাই" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। ইহাকে আত্মা বলা হইয়াছে; আত্মাকে কেহ "নাই" বলিতে পারে না। যে "নাই" বলিবে, সে নিজেই যে আত্মা। আবার যে বলিবে, আত্মাকে যখন আমরা সকলেই "অহং" বা "আমি" বলিয়া জানি, তখন উপনিষৎ ছাড়া জানা যায় না, এ কেমন কথা? না, তাহাও বলিতে পার না, কেননা আমি যে এই "আমি"-জ্ঞানের সাক্ষী তাহা আমরা জানিনা, তাহাই উপনিষদ্‌বেদ্য, এবং তাহাই প্রত্যগাত্মা।

অহং-প্রত্যয়ের বিষয় যে কর্তা "আমি", তাহা হইতে স্বতন্ত্র, তৎসাক্ষী, সর্বভূতস্থ হওয়া সত্ত্বেও এক, কূটস্থ, নিত্যবর্তমান পুরুষকে, সর্বাত্মাকে কর্মকাণ্ডস্থ বিধিজ্ঞানের দ্বারা বা তর্কযুক্তিদ্বারা কেহ জানিতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেও কেহ পারে না, আবার তাঁহাকে কৃতিসাধ্য বলিয়া স্থির করাও যায় না। এই কূটস্থ সাক্ষী আত্মাকে (মুখ্য "আমি"কে) কিছুতেই হান (নষ্ট) করা যায় না, আবার ইহাকে বাড়ানো-ও যায় না, সেইহেতু ইনি হেয়-উপাদেয় রহিত। এই মুখ্য-"আমি" ছাড়া সমস্ত বস্তুই বিনাশশীল ও বিকারশীল। এই মুখ্য-আমি বিনাশের কারণ না থাকায় অবিনাশী, বিকারের কারণ না থাকায় নিত্য কূটস্থ, অতএব নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব। সেই-হেতু "পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" "সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি"—এইসব বেদান্তবাক্য দ্বারা এই পুরুষকে ঔপনিষদিক বিশেষণে ভূষিত করিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, এই পুরুষকে প্রাধান্যের সহিত উপনিষদেই প্রকাশ করা হইয়াছে। অতঃপর বস্তুপর বেদভাগ নাই, এরূপ ভাষণ দুঃসাহসের কর্ম।

শাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ পণ্ডিতগণের বিধান "ক্রিয়া-বিষয়ক বোধ জন্মানই বেদের অর্থ",—ইহা বিধি-নিষেধ-সংক্রান্ত ধর্মজিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গের কথা।

অপিচ, যদি নিতান্তই অক্রিয়ার্থ শব্দের আনর্থক্য অঙ্গীকার কর, তবে কর্মকাণ্ডোক্ত দধি ও সোম প্রভৃতি শব্দেরও আনর্থক্য স্বীকার করিবে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিষয়ে অপ্রযোজক দধি সোম প্রভৃতি যদি বেদ ভব্যার্থে (কার্যার্থে) উপদেশ করিতে পারেন, তবে কূটস্থ নিত্য বস্তুর উপদেশ করিতে পারিবেন না কি হেতু?

ক্রিয়ার্থ উপদিশ্যমান বস্তুটি কি ক্রিয়া হইয়া যাইবে? যদি বল, দ্রব্য ক্রিয়া হইবে না কিন্তু তাহা ক্রিয়ার সাধক হইবে, এই জন্য বেদে তাহার উল্লেখ আছে। বেশ কথা এখন আমার বক্তব্যও তাহাই। বস্তু, ক্রিয়া না হইলেও ক্রিয়ার্থ হইবে অর্থাৎ প্রয়োজন সাধন করিবে। অজ্ঞাত আত্মবস্তুর উল্লেখ বা উপদেশও প্রয়োজনসাধক হইবে। সেই আত্মাকে জানিয়া সংসারহেতু যে মিথ্যাজ্ঞান তাহার নিবৃত্তিই হইতেছে প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে কর্মকাণ্ডীয় বস্তুর ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডীয় বস্তু সমভাবে ক্রিয়ার্থ বা প্রয়োজনসাধক হইতেছে। আর এক যুক্তি দেখ :—"ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ"—এই যে উপদেশ, ইহা না বস্তু, না ক্রিয়া (ক্রিয়ার নিষেধ), কোন ক্রিয়ার সাধকও নহে। ক্রিয়ার বা প্রয়োজনের সাধক হইল না বলিয়া, এই উপদেশকে নিরর্থক বলিয়া গণ্য করা উচিত। অবশ্য কেহই উহাকে নিরর্থক বলিয়া গণ্য করিবে না। এখানে "ন" প্রত্যয় ব্যবহার দ্বারা কোনও ক্রিয়ার সাধকত্ব বা প্রয়োজনের সাধকত্ব বুঝাইতেছে না, শুধু স্বভাব-প্রাপ্ত-হনন-অনুরাগ বিষয়ে নিবৃত্তি বা ঔদাসীন্য বুঝাইতেছে। "নঞ্" প্রত্যয়ের স্বভাব এই যে ইহা স্ব-সম্বন্ধীয়ের অভাব বোধ করায়; এইরূপ অভাব-বোধই তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্যের কারণ হয়। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া নিজেই উপশমপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অভাব-বুদ্ধিও ভ্রান্তিমূলক হনন-অনুরাগ নষ্ট করিয়া অবশেষে নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে "ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না"—ইত্যাদি স্থলে হননক্রিয়ার নিবৃত্তি অর্থাৎ হননক্রিয়ার প্রতি ঔদাসীন্যই ন-কারের অর্থ। প্রজাপতি-ব্রত প্রভৃতি (এই ব্রতের উপদেশ—উদয়কালের আদিত্যকে দেখিবে না। এস্থলে অভাব-বুদ্ধি খাটিবে না—এই উপদেশ ক্রিয়ার সাধক)। কয়েকটি স্থল ছাড়া প্রায় সর্বত্রই ন-কারের অর্থ নিষেধ। অতএব বুঝিতে হইবে, যাহা পুরুষার্থের অনুপযুক্ত, কেবলমাত্র উপাখ্যান ও অতীত ঘটনার বর্ণনা, তাহাই অনর্থক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

পূর্বে যে বলিয়াছিলেন, "বেদান্তবাক্য-সকলকে কর্তব্যবিধির অনুগত করিয়া লইতে হইবে। নতুবা 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী'—এইরূপ বস্তুস্বভাব জানিয়া যেমন পুরুষের লাভ বা ক্ষতিনিবারণ হয় না, সেইরূপ বেদান্তবাক্য-সকলকে ক্রিয়ার অঙ্গ বা সাধন বলিয়া লইতে হইবে।" ইহার জবাবও উপরোক্ত বিচারেই রহিয়াছে। অপিচ, তুমিও "ইহা রজ্জু—সর্প নহে" এইরূপ বস্তুমাত্র-কথনের ফল দেখিয়াছ।

পূঃ—বারংবার ব্রহ্মশ্রবণ করিয়াছে এরূপ ব্যক্তিও পূর্বের ন্যায় সংসারী রহিয়াছে। সুতরাং রজ্জু-স্বরূপ-কথন তুল্য ব্রহ্মস্বরূপ-কথন হইতে পারে না।

উঃ—শরীরাদিতে অভিমানকারী পুরুষের ব্রহ্মস্বরূপ-শ্রবণের পরও দুঃখভয়াদি সংসারিত্ব দেখা যায়, কিন্তু যে বেদপ্রমাণ-জনিত ব্রহ্ম বলিয়া, নিত্যসিদ্ধকূটস্থ বলিয়া নিজেকে জানিয়াছে, তাহার ঐরূপ শরীরাদিতে অভিমান নিবৃত্ত হওয়ায় তাহার আর মিথ্যাজ্ঞান-নিমিত্ত সংসারিত্ব তথা দুঃখভয়াদি থাকে না। তুমি কিছুতেই দেখাইতে পারিবে না। "এ ধন আমার" এই-রূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট ধনী গৃহস্থের ধনাপহারজনিত দুঃখ হয়, কিন্তু ঐরূপ ধনাভিমানবিহীন ধনী গৃহস্থের ধনাপহার-নিমিত্ত দুঃখ হইবে না। কুণ্ডলধারী পুরুষের কুণ্ডলিত্ব-অভিমানবশতঃ সুখবোধ করিতে দেখা যায়, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যখন কুণ্ডলের সহিত কুণ্ডলিত্ব-অভিমান পরিহার করে, তখন তাহার কুণ্ডল-ধারণের সুখ থাকে না। তথাচ শ্রুতি "অশরীরং বাব সন্তং ন

প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ”—শরীর-অভিমানশূন্য ব্যক্তিকে কি প্রিয়, কি অপ্রিয় স্পর্শ করে না।

পূঃ—ও, শরীর পতিত হইলে তখন অশরীরত্ব হইবে, জীবিতকালে হইবে না, ইহাই বলিতে চাও?

উঃ—না, “আমি শরীর”—এইরূপ মিথ্যা-বুদ্ধিকেই আমি সশরীর বলিয়াছি। শরীরকে “আমি” মনে করি—ইহাই ত সশরীরের লক্ষণ। অশরীরত্ব নিত্যসিদ্ধ এবং ইহা কোন কর্মনিমিত্ত জন্মায় না, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

পূঃ—বুঝিয়াছি, পুরুষের কৃত ধর্মাধর্মনিমিত্ত সশরীরত্ব জন্মায়, ইহাই বলিতেছ।

উঃ—এরূপ সিদ্ধান্তে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয়। যথা শরীর ব্যতীত ধর্মাধর্ম হয় না আবার ধর্মাধর্ম ব্যতীত শরীর হয় না—এই দোষ হয়। পরন্তু এই দোষ পরিহারার্থ যে অনাদিত্ব-কল্পনা তাহাও গ্রহণযোগ্য নহে। অন্ধগুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উপদেশ যেমন বস্তুনির্ণয়ে অসমর্থ, অনাদিত্ব-কল্পনাও সেইরূপ। ধর্মাধর্মের কর্তা কখনও আত্মা নহেন, সুতরাং তাঁহার বাস্তবিক কখনও সশরীরত্ব বা শরীর-সম্বন্ধ হয় না। আত্মার ক্রিয়া-সম্বন্ধ না থাকায় তাঁহার কর্তৃত্বও উপপন্ন হয় না।

পূঃ—কেন রাজকর্মচারী যাহা করেন, তাহা সন্নিধানস্থ রাজারই কর্তৃত্ব বলিয়া ধরা হয়। সেইরূপ আত্মা কিছু করুন বা না করুন, সন্নিধান থাকাতেই তাঁহার কর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে।

উঃ—ভৃত্যকে বেতন দেওয়া হয় বলিয়া স্বামি-ভৃত্য-সম্বন্ধ। আত্মা বেতন দিয়া শরীরকে ভৃত্য নিয়োগ করিয়াছেন—এরূপ সম্বন্ধ নাই বা কল্পনা করা যায় না। মিথ্যা অভিমানই এক-মাত্র প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধের হেতু। এতদ্দ্বারা আত্মার যজ্ঞ-কর্তৃত্বেরও নিষেধ হইল।

পূঃ—মিথ্যাজ্ঞান না বলিয়া গৌণ (গুণ-সম্বন্ধীয়) জ্ঞান বল। আত্মা দেহ-ব্যতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও দেহাদিতে আত্মার গুণ-সম্বন্ধ বোধ করিয়া দেহাদিকে “আমি” মনে করেন।

উঃ—এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না। দেখ সিংহের মতন কেশরাদি বা আকৃতি না থাকিলেও যখন আমরা পুরুষসিংহ বলি, তখন পুরুষকে সিংহ বলিয়া ভ্রম করি না। তখন শৌর্য ক্রৌর্য ইত্যাদি সিংহগুণ তাহাতে আছে বলিয়া পুরুষ-সিংহ বলি। অর্থাৎ দুইটি জানা প্রসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে মুখ্য বস্তুর কতকগুলি গুণ অপর বস্তুতে দেখিলে তাহাকে পূর্ব বস্তুর নামে অভিহিত করি। এরূপ না হইয়া যদি মন্দ অন্ধকারবশতঃ কোন স্থাণুকে পুরুষ বলি, তবে তাহা ভ্রান্তি হইবে। যদি শুক্তিকাকে দৃষ্টির দোষবশতঃ বা আলোর অল্পতাবশতঃ রজত বলি, তাহা ভ্রান্তি হইবে। কেননা একটা বস্তু জানি, অপর বস্তু জানি না। সেইহেতু স্থাণুকে পুরুষ ও শুক্তিকে রজত বলিয়াছি। যদি নিঃসংশয়ে জানিতাম, তবে স্থাণু ও শুক্তিই বলিতাম। সেই-রূপ যখন আত্মা ও অনাত্মার নিঃসংশয় বিবেক থাকে না, তখন সাদৃশ্যাদি-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে যখন আমরা দেহাদি-সংঘাতকে “আমি” বলি, তখন তাহা গুণসম্বন্ধীয় বা গৌণ হইতেই পারে না। পণ্ডিত ব্যক্তিগণও যাঁহারা আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞ, তাঁহাদেরও অজ্ঞ রাখালের মত দেহাদিতে “আমি” শব্দপ্রয়োগ দেখা যায়, কেননা, তখন তাঁহারা “আমি” ও দেহাদি-সংঘাত যে বিবিক্ত তাহা বোধ করেন না, অবিবিক্ত-ভাবে দেহাদিকে “আমি” বলিয়া থাকেন। অতএব, যাঁহারা বলেন, দেহাদিও আছে আর দেহবিবিক্ত আত্মাও আছেন, তাঁহারা যখন দেহাদিতে “আমি” প্রত্যয় ব্যবহার করেন তখন গৌণ সম্বন্ধবশতঃ করেন না।

কেননা তখন তাঁহাদের দুইটি পৃথক বস্তুর প্রত্যয় থাকে না। সুতরাং দেহাদিতে অহংবুদ্ধি মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান-নিমিত্ত সশরীরত্ব; সুতরাং ইহাও সিদ্ধ হইল যে তত্ত্ব-জ্ঞানীর জীবিতকালেও অশরীরত্ব হইতে পারে। ব্রহ্মবিদ্-বিষয়ে শ্রুতিবাক্য যথা—"যেমন পরিত্যক্ত সর্পত্বক বল্মীক-স্তূপে শয়ান থাকে, অশরীর অমৃত ব্যক্তির শরীরও তদ্রূপ থাকে।" "তখন তিনি চক্ষু থাকিতেও অচক্ষু, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণ, বাগিন্দ্রিয় থাকিতেও অ-বাক্, মন থাকিতেও অমনা, প্রাণ থাকিতেও অপ্রাণই হন।" স্মৃতিও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতে গিয়া স্থিতপ্রজ্ঞের সর্বপ্রকার প্রবৃত্তি-সংস্কন্ধ নিবৃত্ত হয় বলিয়াছেন। অতএব জ্ঞাতব্রহ্ম পুরুষের কখনই যথাপূর্ব সংসারিত্ব থাকে না। যাঁর থাকে, তিনি নিশ্চিত ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হন নাই।

পূঃ—আচ্ছা, শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধি দ্বারা ইহাই কি বুঝায় না যে ব্রহ্ম বিধির অঙ্গ? সুতরাং শুধু ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ধারণ করিয়াই বেদান্তের তাৎপর্য পর্যবসিত হয় না।

উঃ—এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। ব্রহ্মের স্বরূপ-অবগতির জন্যই যেমন শ্রবণ, মনন-নিদিধ্যাসনও সেই একই উদ্দেশ্যে। ব্রহ্ম-অবগতির দ্বারা যদি অন্য কোন প্রয়োজন সাধিত হইত তবে ইহাকে বিধি-শেষ বা ক্রিয়াঙ্গ বলা যাইত। এস্থলে তদ্রূপ নহে। শ্রবণের উদ্দেশ্য যেমন অবগতি, মনন-নিদিধ্যাসনেরও উদ্দেশ্য অবগতি। অতএব শাস্ত্রমাধ্যমে বা শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা যে ব্রহ্ম-অবগতি, তাহা বিধিশেষ বা ক্রিয়াঙ্গ হিসাবে নহে। অতএব বেদান্তবাক্য-সমন্বয় দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, শাস্ত্র ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র-ভাবে প্রমাণ করে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়াই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বলিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্রারম্ভও উপপন্ন হইল। বিধিপরত্ব বা বিধিশেষত্ব হিসাবে ব্রহ্ম যদি বেদে উপস্থাপিত হইতেন, তবে "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে যে-শাস্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহার পরে দ্বিতীয় পৃথক শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকিত না। যদি একান্তই মানস-ধর্মের বিচার প্রসঙ্গ-সূত্রে ব্যাসদেব লিখিতেন, তবে "অথাতঃ পরিশিষ্টধর্মজিজ্ঞাসা" বলিয়া লিখিতেন। যেমন জৈমিনী "অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা"র পরও লিখিয়াছেন "অথাতঃ ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থয়োঃ জিজ্ঞাসা" জৈমিনীর ব্রহ্মাত্মৈকত্ব প্রতিজ্ঞাত ছিল না বলিয়া, যুক্তিযুক্তভাবেই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বলিয়া ব্যাসদেব পৃথক শাস্ত্রারম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত বিধি, সমস্ত প্রমাণ বলবৎ থাকে, যতক্ষণ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান প্রকাশ না পায়। অহেয়-অনুপাদেয়-অদ্বৈত-প্রত্যগাত্মা-অবগতির পর সমস্ত প্রমাণ, প্রমাতা লোপ পায় এবং তদ্বিষয়ও লোপ পায়। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়াছেন, "আমি সৎ ব্রহ্ম কূটস্থ আত্মা এই বোধ হইলে পর, পুত্রকলত্রাদির বাধ হয়, অর্থাৎ গৌণাত্মার (পুত্র ক্লিষ্ট হইলে আমি ক্লিষ্ট হই এবংবিধ অহং-প্রত্যয়কে গৌণাত্মা বলে) বাধ হয়—এবং আমি কর্তা, দেহাদি-সংহত বস্তু এইরূপ মিথ্যাত্মারও বাধ হয়। সুতরাং তখন আর কোন প্রকার ব্যবহারই থাকিতে পারে না। আত্মবিজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত প্রমাতা আত্মাকে প্রমাণের দ্বারা অন্বেষণের কথা উঠে, কিন্তু বিজ্ঞাত হইলে সেই প্রমাতাই পাপদোষাদি-রহিত পরমাত্মা হন। দেহে অহংবুদ্ধি ভ্রম হইলেও যেমন জ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য, লৌকিক ব্যবহারও তেমন আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য।"

নিবেদিতা-সাহিত্যে হুইট্‌ম্যানের প্রভাব

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নিবেদিতার একখানি ছোট পুস্তিকা সে-কালে উপহার পেয়েছিলাম। কতকগুলি ছোট ছোট প্রবন্ধের গুচ্ছ। ভক্ত রামপ্রসাদের ও রামকৃষ্ণের উপরে দুটী প্রবন্ধ গোড়াতেই আছে। একটী প্রবন্ধের নাম An Intercession. গোড়াতেই উদ্ধৃত রয়েছে মার্কিন কবি ওয়াল্‌ট্‌ হুইট্‌ম্যানের বিখ্যাত Song Of The Open Road কবিতার কয়েকটী লাইন, যার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে বৈরাগীর একতারার ঝঙ্কার। আরও দু'একটী প্রবন্ধ স্বরু হয়েছে হুইট্‌ম্যানের কবিতা দিয়ে। নিবেদিতার চিন্তাধারার উপরে ওয়াল্‌ট্‌ হুইট্‌ম্যানের এই প্রভাব লক্ষ্য করবার বিষয়।

নিবেদিতার জন্ম খ্রীষ্টান পরিবারে, খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের দেশে। খ্রীষ্টের ভাব-ধারায় অনুস্যূত আবহাওয়ার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে এখানে ওখানে মণি-মুক্তার মধ্যে ছড়ানো রয়েছে খ্রীষ্টের বাণী। বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

খ্রীষ্টের অনুরাগিণী নিবেদিতা কবি হুইট্‌-ম্যানেরও অনুরাগিণী ছিলেন—এই আবিষ্কারও আমাদিগকে বিস্মিত করে না। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক লুই ষ্টিভেন্‌সন্‌ (Robert Louis Stevenson) হুইট্‌ম্যানের কাব্যের উপরে নূতন আলোকপাত করেছেন। কবির Leaves of Grass-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে একজায়গায় ষ্টিভেন্‌সন্‌ লিখেছেন : There is much that is startingly Christian in Leaves of Grass. 'লিভ্‌স্‌ অফ্‌ গ্রাস্‌'এ এমন অনেক-কিছু আছে যাদের মধ্যে খ্রীষ্টের বাণীর চমকপ্রদ প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই নিঃসংশয়ে। যারা ষোলআনা মন দিয়ে ঈশ্বর চাইবে, তাদের জন্য খ্রীষ্ট যে-পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন সে-পথে আরাম নেই, সুখ নেই, আত্মীয়স্বজনের মধুর সান্ত্বনার বাণী নেই। সে-পথ হচ্ছে ত্যাগের কঠিন পথ ; সে পথে যারা চলবে না, অনন্ত জীবনের পথে তাদের বিদ্রূপ, সে-পথে মৃত্যু। খ্রীষ্ট বললেন, To save one's life one must lose it. জীবন যদি রক্ষা করতে হয় তবে জীবনকে হারাতেই হবে। কারণ মৃত্যু থেকেই আসে জীবনের প্লাবন। Verily, verily I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die it abideth alone ; but if it die it bringeth forth much fruit. "আমি তোমাদের নিশ্চয়, নিশ্চয় ক'রে বলছি, গমের দানা মাটিতে প'ড়ে মরে না গেলে সে একাই থেকে যায়। কিন্তু মাটির মধ্যে মরলে অনেক ফসল ফলায়।" এই creative renunciation-এর বাণীই খ্রীষ্টের বাণী! হুইট্‌ম্যানও এই মহান মৃত্যুর সুরে সুর মিলিয়ে গাইলেন,

"Know that the young man who composedly perill'd his life and lost it has done exceedingly well for himself without doubt,"

"একথা জেনে রাখো, যে যুবক প্রশান্তচিত্তে জীবনকে বিপন্ন ক'রে প্রাণবলি দিলো সে নিঃসংশয়ে নিজের কল্যাণ ক'রে গেল!"

এই ত্যাগেরই স্তবগান ভারতবর্ষের কবির কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে! অমৃতের পথকে তিনি দুঃখের পথ বলেই বর্ণনা করেছেন।

"চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।"—বলাকা

ফ্রান্সের চিন্তাশীল ক্যাথলিক লেখক ফ্রাঁসোয়া মোরে (Francois Mauriace) God and Mammon বইতে একই কথা লিখলেন : In reality the people who look for comfort and consolation and ease in their religion clutter up the threshhold without entering the building. For those who understand it and love it, the spiritual life may be said to be a terrific and terrifying adventure. There may be no playing with the Cross. ক্রস্ নিয়ে কিছুতেই ছেলেখেলা চলবে না। আধ্যাত্মিক জীবন একটা অভিযান, যা নিঃসন্দেহে বিপদসঙ্কুল এবং বিঘ্নবহুল। ধর্মের রাস্তায় যারা আরাম খোঁজে, সুখের কামনা করে, তারা তো সেই পরম উপলব্ধির মন্দিরে ঢুকবার আগেই দরজা বন্ধ করে দেয়।

নিবেদিতার গুরুর কণ্ঠেও বৈরাগ্যের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। কতকাল পরেও স্বামীজীর সেই কম্বুকণ্ঠের বাণী আমাদিগকে চমকে দেয় : What then can satisfy man? Not gold. Not joy. Not beauty. One Infinite alone can satisfy him… সেই উপনিষদের চিরন্তন বাণী : ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।

হুইট্‌ম্যানের মৃত্যুর এক বৎসর পরে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে বক্তৃতা করেন। হুইট্‌ম্যানের মৃত্যুতিথি ২৬শে মার্চ, ১৮৯২। স্বামীজী চিকাগোতে প্রথম বক্তৃতা করলেন ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। বিবেকানন্দ মার্কিন কবির গুণগ্রাহী ছিলেন। কবিকে বলতেন মার্কিন সন্ন্যাসী। হুইট্‌ম্যানের চিন্তাধারার প্রভাবে আমেরিকার চিত্তভূমি আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল। সেই চিন্তাধারার মধ্যে বেদান্তের প্রতিধ্বনি স্পষ্টই শুনতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আমেরিকা যে এমন সহজে স্বামীজীকে গ্রহণ করেছিল, তার জন্য হুইট্‌ম্যানের ভাবসম্পদ নিঃসংশয়ে বহুল পরিমাণে দায়ী।

নিবেদিতা স্বামীজীর প্রভাবে বৈরাগ্যের দুর্গম পথকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু যাদের পিছনে আমরা ফেলে আসি তাদের মন থেকে সরানো সহজ নয়। তারা অজ্ঞাতসারে আমাদের মনকে টানে, তাদের মুখচ্ছবি স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, আমাদের হৃদয়ে বিষাদের মেঘ ঘনিয়ে আসে। নিবেদিতা জীবনের এমনি এক একটা মুহূর্তে হুইট্‌ম্যানের কবিতা পড়ে বৈরাগ্যের পাষাণ-কঠিন পথে চলবার প্রেরণা পেতেন, এই কথাই তাঁর প্রবন্ধগুলি পড়বার সময়ে আমার মনে হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের মাত্রা

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

সামাজিক জীবনে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনার্য-সংস্কৃতির প্রভাব আর্যেরা কোনদিনই উপেক্ষা করতে পারেননি। আর্যদের কাছে পরাজিত হলেও অনার্য-সংস্কৃতি আর্যদের ভাবজীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। পুরাণেও তাই তার ছায়া দেখা যায়।

এই সব পুরাণ কালক্রমে হিন্দুদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে এমনই একাত্ম হয়ে যায় যে, তারপর থেকে যে ভাষাতেই সাহিত্যচর্চা শুরু হয় তাতেই এই পুরাণগুলির প্রভাব পড়তে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই পুরাণের প্রভাব তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে দেখি আমাদের বাংলা ভাষার মঙ্গলসাহিত্যের সীমানাকে জুড়ে।

মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবীকে সংস্কার করে পুরাণের চরিত্র করে তোলার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। সংস্কৃত পুরাণে আমরা যে সমস্ত দেবদেবীর পরিচয় পাই, তাঁরা সকলেই বৈদিক দেবদেবী নন। কিন্তু বৈদিক দেবতার সম্মান ও চরিত্রসম্পদ তাঁরা সকলেই পেয়েছেন —মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেবতার অখণ্ড মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। সংস্কৃত পুরাণে দেখি ভক্তজনের ব্যাকুল প্রার্থনা শুনছেন দেবদেবীগণ আবির্ভূত হয়ে। বৈদিক দেবতাদের এই কল্যাণময়ী শক্তি দেখা যায় পুরাণে। অবশ্য দেবীর প্রাধান্য তেমন বেশী দেখা যায় না।

পুরাণে দেখি ভীত আর্ত মানুষ দেবতার কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

পুরাণের এই আদর্শ মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক, উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতিতে সচেতনভাবে অনুসৃত হয়েছে। একই পরিবেশ ও উদ্দেশ্য হওয়ায় উভয়ের রীতিও প্রায় সমধর্মিতা লাভ করেছে। মঙ্গলকাব্যকারগণ পুরাণকে সচেতন-ভাবে অনুসরণ করেছেন দেববন্দনার ক্ষেত্রে—একের থেকে বহু দেবতাকে বন্দনা করা হয় মঙ্গলকাব্যের ভূমিকায়। মঙ্গলকাব্যের এই দেবখণ্ডের বন্দনা-অংশে দেবতা-রূপে শ্রীচৈতন্যদেবও স্থান পেয়েছেন। কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে পুরাণের ভাষা পর্যন্ত অনূদিত হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনাতে মূল কাঠামোটি অনুসৃত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের দুটি অংশ—দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডের অবতারণা দ্বারাই এখানে বাস্তবকে ছাড়িয়ে অবাস্তব এবং সম্পূর্ণ দৈবী আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়। একমাত্র নরখণ্ডেই দেব-নিরপেক্ষ মনুষ্যশক্তি ও সৃষ্টির পরিচয় আছে।

সংস্কৃত পুরাণে দেবতার অলৌকিক লীলা দেবসমাজে ও ভক্তসমাজে তাঁদের মহিমার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। মঙ্গলকাব্যেও দেবতার পূজা-প্রচারই লক্ষ্য, এমনকি এই আদর্শে মঙ্গল-কাব্যের নামকরণের মধ্যেও পুরাণের অবি-সংবাদিত প্রতিষ্ঠার প্রমাণ মেলে। যেমন পদ্ম-পুরাণ। পদ্মপুরাণের সংস্কৃতরূপে আমরা মনসার যে সাক্ষাৎ পাই, মনসামঙ্গলেও অনেক-স্থানে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের যে শাখাগুলিকে পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের শাখা বলা হয় তাদের নামকরণেই

প্রমাণিত হচ্ছে, এরা কতদূর পুরাণ-প্রভাবিত। পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে পড়ে গৌরী-মঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল ইত্যাদি।

নারায়ণদেব তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যের নামকরণে বলেছেন,—

"পদ্মপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে
নারায়ণদেব পাঁচালী রচিছে।"

সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণীয় প্রভাব মঙ্গলকাব্যেই নয়, অন্যকাব্যেও আছে। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম যে বিশিষ্ট রূপাঙ্গিক লাভ করেছে—শ্রীকৃষ্ণের যে মধুরলীলা বৈষ্ণব-সাধারণের উপজীব্য, তা মুখ্যতঃ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে গৃহীত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব-সাধক এবং রসজ্ঞদের কাছে বিশেষ সমাদৃত। গীতগোবিন্দের উপর ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ে গীতগোবিন্দের রাসলীলার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় এবং গীতগোবিন্দের রাধার উল্লেখ ভাগবতে নেই। কিন্তু একজন প্রধানা-গোপিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথম শ্লোকের সাথে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ১৫শ অধ্যায়ের প্রথম ৮টি শ্লোকের প্রায় হুবহু মিল আছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। বাংলার বৈষ্ণবরসবেত্তারা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করেননি। করেছেন মধুরস্বভাব প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপকে। এই কৃষ্ণই পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যের নায়ক এবং দেবতা। দেব-চরিত্র বর্ণনার সাধনায় বৈষ্ণবকাব্যসাহিত্য পুরাণের কাছে ভাগবতের ব্রজলীলা বৈষ্ণবসাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য। কেবল তাই নয়, মধ্যযুগের প্রারম্ভে মালাধর বসু-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের সার্থক অনুবাদ বলে গণ্য হয়ে থাকে। এর কিছু পূর্বে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'ও ভাগবত-প্রভাব স্বীকৃত হয়ে থাকে। তবে এর কাব্যমূল্য যাই হোক না কেন, বৈষ্ণব-সমাজে ভক্তিকাব্য বলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' ভাগবতাশ্রয়ী ভক্তিপূর্ণ কৃষ্ণকথা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অবশ্য এই ভক্তিবাদের সূচনায় 'গীত-গোবিন্দ' এবং সার্থকলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণবিজয়। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে এটিই ভক্তের রচিত প্রথম কাব্য। এ-কাব্য ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের তিনটি শাখা—(১) অনুবাদসাহিত্যের শাখা, (২) বৈষ্ণব-কাব্যের শাখা ও (৩) মঙ্গলকাব্যের শাখা। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুটি শাখার উপরে পুরাণের প্রভাব অনস্বীকার্য। সুতরাং বাংলার জাতীয় জীবনের উপরেই সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব অনস্বীকার্য। পৃথিবীর সর্বজাতির সাহিত্যের আদিযুগেই ধর্মের একাধিপত্য স্বীকৃত। বাংলা-সাহিত্যের প্রথমযুগেও পুরাণপ্রভাব স্বাভাবিক কারণে এসে পড়েছে। স্বকীয় চিন্তাধারা যতদিন না মৌলিকত্ব অর্জন করেছে ততদিন প্রাচীন প্রভাবই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাংলাসাহিত্যের অনুবাদশাখাটি প্রত্যক্ষ-ভাবে পৌরাণিক শাখার অনুবাদ। ভারতবর্ষের দুটি বিখ্যাত মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত সে যুগের জীবনচেতনারই প্রকাশ। এই রামায়ণ-মহাভারতকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ অনুবাদশাখা বিবর্তিত। সুতরাং পুরাণ শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনেও তার ছায়া বিস্তার করেছে। দেবীমাহাত্ম্যমূলক মঙ্গলকাব্যে দেবী-ভাগবতের প্রভাব আছে।

ষোড়শ শতকের জীবনীসাহিত্যও শ্রীমদ্‌-ভাগবতের অনুকরণে। বৃন্দাবনদাস স্পষ্টই বলেছেন—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥"

বাংলাসাহিত্যের অন্যতম জীবনীগ্রন্থ হিসেবে চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটির সম্মান স্বীকৃত। চৈতন্য-দেবের জীবন অবলম্বনে অনুরূপ একটি পুরাণ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন বৃন্দাবনদাস

পুরাণ ও মহাকাব্য জাতির ভাবজীবনে একটি স্থায়ী দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করে। তাই আমাদের জাতীয় প্রবণতা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যের মূলেও সবচেয়ে কার্যকরী উপাদান হলো পৌরাণিক কাব্য ও পুরাণ। সুতরাং বাংলা-সাহিত্য স্বকীয়তা লাভ করলেও বাঙালীর ভাবজীবনে তার জীবনাদর্শের মধ্যে, ন্যায়-নীতি-ধর্মবোধের মধ্যে পুরাণের পরোক্ষ প্রভাব আছে।

এখন ঐ প্রভাব কিছু কমেছে। তবে একেবারে দূরবর্তী হয়েছে এ-কথা বলা যায় না। কারণ প্রত্যেক যুগেই মানুষ পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত। তাই আধুনিক প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিকদের মজ্জায় মজ্জায় পুরাণের আদর্শনিষ্ঠা বর্তমান। তাই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যেও তার প্রতিফলনই চরমভাবে। কাহিনীর বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, চরিত্রসৃষ্টিতে সর্বত্রই এই আদর্শনিষ্ঠা, মহিমাবোধ অপ্রত্যক্ষ-ভাবে গভীর প্রভাব রেখে গেছে হয়তো রাখবেও আরো অনেক অনেক দিন।

নাও মা তুমিই টেনে

(গান)

শ্রীরণজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ভক্ত-জীবন দাও মা আমায়, দিন গেল মোর হেলায় খেলায়
হল না তোর ভজন,
অহংকারে রইনু মেতে, বৃথাই এ জীবন ॥
হৃদয় মাঝে আছ তুমি জানবো কোথা থেকে
অহংকার যে আঁধার হয়ে আছে তোমায় ঢেকে।
বাহিরে তাই ঘুরে মরি, মন বোঝে না তীর্থ করি,
ঘুচিয়ে দাও মনের আঁধার মাগো আমার জগৎ-জীবন ॥
(মাগো) কেঁদে কেঁদে ডাকব যত, মনের আঁধার কাটবে তত,
(ওমা) মন দিয়েছ 'মত্ত হাতী', হাওয়ার সাথে করে গমন।
(এখন) নাও মা তুমিই টেনে তারে বেঁধে তোমার কৃপার ডোরে
(সে মন) ডাকুক শুধু মা মা বলে, ভাবুক তোমার অভয় চরণ ॥

সমালোচনা

শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন—ডক্টর শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক: ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণলাল দাম, খড়্গপুর (খারিদা)। পৃষ্ঠা ৫৫০+১৩; মূল্য ১২.৫০।

অধ্যাত্ম-সাধনা ও চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুধর্মে অশেষ স্বাধীনতা বিদ্যমান; সেইজন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাধক ও মহাপুরুষগণের নব নব চিন্তার বিকাশ ঘটিয়াছে, ফলে বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র এবং সাধনমার্গে বিভিন্ন মত ও পথের উৎপত্তি হইয়াছে। অগণিত মুমুক্ষু ও আধ্যাত্মিক রসপিপাসু মানব এই সব দর্শনশাস্ত্রের চর্চা করিয়া এবং সাধনপথে সাধন করিয়া জীবনে কৃতকৃত্য হইয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার ভগবান শ্রীনিম্বার্কাচার্য ছিলেন স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী। শ্রীনিম্বার্ক-প্রবর্তিত মতবাদ 'নিম্বার্কদর্শন' বা 'নিম্বার্ক-বেদান্ত' নামে সুপ্রসিদ্ধ। নিম্বার্কানুবর্তী সকল আচার্যই 'নিম্বার্কবেদান্ত' মত অবলম্বন করিয়া থাকেন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য ও শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত কিছুই আলোচ্য গ্রন্থে সবিস্তার সন্নিবেশিত। সুধী গ্রন্থকার শ্রীনিম্বার্কের আভির্ভাব-কাল সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সাধুবাদের যোগ্য। গ্রন্থ-প্রণয়নে যে মনীষা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা চিত্তাকর্ষক।

গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়-পরিচিতি, শ্রীনিম্বার্কাচার্যের জীবন, আবির্ভাব-কাল ও তাঁহার রচিত গ্রন্থের বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্বার্কদর্শন-পরিচয়, প্রমাণ-সমীক্ষা, নিম্বার্কদর্শনে জীব জগৎ ব্রহ্ম ও মোক্ষ এবং তৃতীয় খণ্ডে নিম্বার্কদর্শনে সাধন ও উপাসনা-প্রণালী, দার্শনিক জগতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের স্থান প্রভৃতির বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। পরিশিষ্টে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে সহায়কারী ১৫৪ খানি পুস্তকের নাম দেওয়া হইয়াছে।

এই গবেষণা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার পাণ্ডিত্যের পুরস্কার-স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় দার্শনিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই গ্রন্থ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ছাপা এবং বাঁধাই ভাল।

বৈরাগ্যশতকম্—অনুবাদক: স্বামী ধীরেশানন্দ। প্রকাশক: স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। পৃষ্ঠা ১৫৪+৮; মূল্য দেড় টাকা।

মহাকবি ভর্তৃহরি-বিরচিত 'শতক' গ্রন্থত্রয়ের অন্যতম 'বৈরাগ্যশতকম্' ভারতীয় মনীষার অত্যুজ্জ্বল সাক্ষ্য; ইহার সাহিত্যিক, মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আবেদন সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পাঠকদিগের চিত্তে পূর্ববৎ দেদীপ্যমান! কিন্তু বৈরাগ্যোদ্দীপক এই শতক গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এতকাল দুর্বোধ্য ও আস্বাদনের অযোগ্য বিবেচিত হইত। স্বামী ধীরেশানন্দজী উক্ত গ্রন্থের সটীক বঙ্গানুবাদ করিয়া তাঁহাদের নিকট উহা বোধগম্য করাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অনূদিত গ্রন্থের পরিচিতি-অংশে যোগিরাজ ভর্তৃহরির আবির্ভাব-কাল ও সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস বর্ণিত। মূল গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বৈরাগ্য

একশতটি শ্লোকে তৃষ্ণাদূষণ, বিষয়-পরিত্যাগ-বিড়ম্বনা, যাচ্ঞা-দৈন্যদূষণ, ভোগাস্থৈর্য-বর্ণন প্রভৃতি ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশ্য উক্ত গ্রন্থের বহু প্রকার শ্লোকক্রম, শ্লোকসংখ্যা ও পাঠভেদ পরিদৃষ্ট হয়। অনুবাদক তাঁহার অনুবাদে টীকাকার পণ্ডিত রামচন্দ্র বুধেন্দ্র-স্বীকৃত সংখ্যা ও ক্রমাদিই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যান-ভেদস্থলে কখন কখন কৃষ্ণশাস্ত্রিকৃত টীকারও অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও সঙ্গতি-বোধই পরিস্ফুট! অনূদিত গ্রন্থের প্রায় শেষাংশে অকারাদি বর্ণক্রমে মূল শ্লোকগুলির একটি সূচী প্রদত্ত হওয়ায় পাঠকদিগের খুবই সুবিধা হইবে। পরিশেষে মনস্বী অনুবাদক 'বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস' শীর্ষক শাস্ত্রীয়-বিচার-সম্বলিত স্বরচিত একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ সংযোজন করায় উক্ত অনুবাদ-গ্রন্থখানির মর্যাদা ও উপযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আলোচ্য অনুবাদ-গ্রন্থে অধিকাংশ মূল সংস্কৃত শ্লোকে পাদান্ত কমা-চিহ্ন (,) ও বিসন্ধি-প্রয়োগ-প্রদর্শন সংস্কৃত রুচি- ও রীতি-সম্মত নহে। অন্বয় ও অন্বয়ার্থ প্রায়শঃ অনুবাদ-মুখী হইলেও কোন কোন স্থলে অন্বয়ের পদক্রমে ইতরবিশেষ হইয়াছে এবং তজ্জন্য অর্থভেদও ঘটিয়াছে। সন্ধিভঙ্গের দ্বারা সরলীকরণের ও অন্বয়ার্থ-প্রদর্শনের পূর্বে প্রতি-শ্লোকের কেবলমাত্র যথাযথ অন্বয় প্রদর্শন করিলে পদ্যের গদ্যে পরিণমনটি সুষ্ঠুভাবে লক্ষ্য করা যাইত এবং মূলের বোধে আরও সৌকর্য সাধিত হইত।

আবশ্যকস্থলে শব্দবিশেষের মর্মার্থ ও শ্লোকের আশয় প্রদর্শন এবং পাদটীকা-সংযোজনের দ্বারা আলোচ্য অনুবাদগ্রন্থের মান উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। মূলের শৃঙ্গারবোধক বাক্যগুলির বিস্পষ্ট অনুবাদের পরিবর্তে কেবলমাত্র তাৎপর্যপ্রদর্শন সমীচীন হইয়াছে। অন্যথা বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্মাইয়া অনেকেরই আলোচ্য গ্রন্থপাঠ নিষ্ফল হইত, সন্দেহ নাই।

—শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীম-কথা—স্বামী জগন্নাথানন্দ। মিত্র ও ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত পৃষ্ঠা ৪৭০+১২ ; মূল্য দশ টাকা।

শ্রদ্ধেয় স্বামী জগন্নাথানন্দ প্রণীত "শ্রীম-কথা" একখানি সুবৃহৎ জীবনী-গ্রন্থ ; কিন্তু প্রচলিত অর্থে জীবনী-গ্রন্থ বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহার ব্যতিক্রম। গ্রন্থের প্রথমাংশে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত,—যিনি মাষ্টার মহাশয় বা আরও সংক্ষেপে শ্রীম নামে খ্যাত,—তাঁহার জীবন-কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। অল্প পরিসরে শ্রীম'র এই জীবনকাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের একটা বহুদিনের অনুভূত অভাব পূরণ করিল। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গের অন্যতম। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের" সঙ্কলয়িতা ও পরিবেশক শ্রীম'র নাম লক্ষ লক্ষ নরনারীর শ্রদ্ধার বস্তু। কিন্তু শ্রীম'র নিষ্ঠা ও তপস্যাপূত জীবন-কথার প্রচার একরকম হয় নাই বলিলেও চলে। তাই স্বামী জগন্নাথানন্দের এই গ্রন্থখানি সর্বতোভাবেই অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীম-কথা এক নূতন আঙ্গিকে লিখিত তথ্য-নিষ্ঠ ও সুখপাঠ্য জীবনালেখ্য। শ্রীশ্রীঠাকুরকে মাষ্টার মহাশয় যেমনটি দেখিয়াছিলেন, যেমনটি তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শুনিয়াছিলেন, হুবহু তেমনটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার অমর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" গ্রন্থে। যে ধৈর্য ও অনুরাগ লইয়া শ্রী-ম এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন

করিয়াছেন, তাহার মূল্য কঠোর তপশ্চর্যারই অনুরূপ। স্বামী জগন্নাথানন্দজীও সেই একই আঙ্গিকে শ্রীম-কথা রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের সার্থক ফলশ্রুতি। মাষ্টার মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সমকালীন এবং উত্তরকালের অসংখ্য ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য বহু জ্ঞানী-গুণী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ-নিবেদিত-প্রাণ শ্রীম জ্ঞানকল্পতরু শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী অবলম্বন করিয়াই অবিশ্বাসীর সংশয় ও সন্দেহের নিরসন এবং প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন। নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন খুব কমই। "কথামৃতের" মতই শ্রীম-কথা সহজ রসের আধার। ভাবে ও ভাষায় বইখানি বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। বইখানির বহুল প্রচার সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হইবে।

—নিখিলরঞ্জন রায়

গীতা-গুঞ্জন ঃ অধ্যাপক সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম.এ. ডি. লিট্, দর্শনাচার্য, ভাগবত-রত্ন। প্রকাশক—শ্রীরাধেশ্যাম আগরওয়ালা, বোলপুর। পৃষ্ঠা—৫৬; মূল্য—২·২৫ টাকা।

গীতা সর্বোপনিষদের সার। বহুবার আমাদের জীবনে কর্তব্য লইয়া সমস্যা দেখা দেয়, ধর্ম ও কর্মের মধ্যে বিরোধ বাধিতে চায়। এমনি একটি সমস্যার পটভূমিতে গীতা উক্ত হইয়াছে, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে সমস্যার নিঃসংশয় সমাধান দিয়াছেন—'মামনুস্মর যুধ্য চ' —ভগবানলাভকে জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া জ্ঞান, ভক্তি বা যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কর্তব্য করিয়া যাও। গীতার যে কোনরূপ আলোচনা তাই আমাদের পক্ষে পরম কল্যাণকর। 'গীতা-গুঞ্জনে' গ্রন্থকার গীতা হইতে মাঝে মাঝে মূল শ্লোক লইয়া সেগুলির এবং তৎসহ সংযোজিত কথা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সমগ্র গীতার মূল ভাবটি পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা প্রসংশনীয়।

সমবায় ঃ লেখক জেরী ভূরীস এবং অ্যালী সি. ফেলডার (জুনিয়ার)। প্রকাশক ঃ ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-৬৪।

বহুচিত্র-শোভিত সুমুদ্রিত 'সমবায়' পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমেরিকা ও ভারতের জনসাধারণ নিজেদের কল্যাণসাধনে কিরূপে সমবেতভাবে প্রচেষ্টা করে, নিপুণবিবৃতির মাধ্যমে এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাডসিল কর্তৃক লিখিত ভূমিকাটি সুচিন্তিত নিবন্ধ। ভূমিকা ছাড়া পুস্তিকাটিতে এগারোটি পরিচ্ছেদ আছে। আমেরিকার গণতন্ত্রে সমবায়ের সূচনা ও সম্প্রসারণ-সম্বন্ধে সহজবোধ্য ভাষায় বিস্তৃত চিত্তাকর্ষক আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে সমবায়ের অবস্থাও আলোচনা করা হইয়াছে। আমেরিকায় সমবায়-ব্যবস্থার ধীর ক্রমিক উন্নতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়, কিন্তু ভারতবাসী এখনও সমবায়ের ব্যাপারে পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বিহারে, উত্তরপ্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্য যথাযথভাবে পরিচালিত হইতেছে। গত ২৫.৭.৬৭ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় প্রদেশপাল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার জেলায় মিশন-পরিচালিত হাট-আসুরিয়া সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

গত জুন মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়ঃ

(১) **বিহারে** (ক) হাজারীবাগ জেলায় ইটখোরী ও চম্পারণ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৯০,৭৩৫ কেজি গম, ২৪,১৭৭ কেজি জোয়ার, ৮৪৬ কেজি চাল, ১৩,৪২০ গ্রাম বিস্কুট, ৮ পাউণ্ড হরলিকস, ৩৩ খানি পরিধেয় বস্ত্রাদি, ১৬,০০০ ভিটামিন ট্যাবলেট বিতরিত হইয়াছে। সাহায্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১৮,১৫১।

চিকিৎসাঃ ১১,৯৩১ জনকে কলেরা ইঞ্জেকশন এবং ৪৮৫ জনকে বসন্তের টিকা দেওয়া হইয়াছে।

প্রতাপপুরে একটি নূতন সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

(খ) সাঁওতাল পরগণা জেলায় রিখিয়া সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মুঙ্গের জেলায় জামুই, ঝাঝা ও চকাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৯,৫৪৭ কেজি গম, ৭৫০ কেজি জোয়ার, ৬৩ কেজি ভুট্টাদানা, ৫৪৪ খানি চাদর ও শাড়ী, ৬৬৮ খানি কম্বল, ১,৭১৪ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১১,৬৪৭।

(২) **উত্তরপ্রদেশ** মির্জাপুর জেলায় কানহারা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২৬,৮৪৬ কেজি গম, ৭৪৭ কেজি গুঁড়া দুধ, ২০৬ কেজি বিস্কুট, ৬৮০ বোতল শিশুখাদ্য, ৭,৭০০ ভিটামিন ট্যাবলেট এবং অন্যান্য ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৫,৮৪২।

(৩) **পশ্চিমবঙ্গে** (ক) পুরুলিয়া জেলায় পরা, ঝাপড়া, হুড়া, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, বালিতোড়া এবং নাডীহা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭,০১৮·৫ কেজি চাল, ৭,৭৭১ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১,৯৭২।

(খ) বাঁকুড়া জেলায় হাট-আসুরিয়া, দধিমুখা এবং খাণ্ডারী সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৩,৮৯৩·৭৫ কেজি গম বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৪,৩২৫।

বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী ও রামহরিপুরে সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। রামহরিপুর হইতে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে সাহায্য দেওয়া হইতেছেঃ

কাপিষ্টা, পিরুরাবনী এবং সহরজোড়া।

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মালদহ জেলাতেও দুর্ভিক্ষত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিদর্শনের পর নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে জুন মাসেই সেবার কাজ শুরু করা হইয়াছেঃ

মঙ্গলবাড়ী, ভাবুক, বৈরগাচি, পাকুয়াহাট।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের তিনজন ছাত্র মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই বৎসর এম. এ. (সংস্কৃত), এম. এস-সি. ও বি. এস-সি পরীক্ষায় (গণিত) প্রথম স্থান এবং চারজন ছাত্র বি. কম. পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বৎসর সাহিত্যশাখায় (Humanities Group) প্রথম স্থান এবং পাঁচজন বিভিন্ন শাখায় প্রথম দশজনের মধ্যে পাচটি স্থান অধিকার করিয়াছে।

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের একজন ছাত্র উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্কনবিদ্যা (Fine Arts Group) শাখায় প্রথম স্থান এবং দুইজন যথাক্রমে বিজ্ঞানশাখায় চতুর্থ এবং শিল্পশাখায় (Technical Group) সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের বিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৫—মার্চ, ১৯৬৬) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মথুরা রোডের উপর নূতন প্রশস্ত ভবন-সমূহে ইহা স্থানান্তরিত হয়। সেবাশ্রম একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল; এখানে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, রেডিওলজি, প্যাথলজি প্রভৃতি সুপরিচালিত বিভাগ আছে। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে চক্ষুরোগীসহ ২,৫২৭ জন রোগী ভর্তি হয় এবং ১,৮৬৬ জন আরোগ্য লাভ করে। চক্ষু-অস্ত্রোপচার সহ মোট ৯২৯টি অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালের ১০৩টি শয্যার মধ্যে গড়ে দৈনিক ৭১টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল।

আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ২,১৭,৭৮৯ জন রোগী (পুরাতন ১,৭৮,৯৫২) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগীসহ মোট ১,২২২ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৩৫।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫,১৯৮ ও ১৫,৬৩৬। এক্স-রে বিভাগে ১,২৩৪টি এক্স-রে করা হয় এবং ল্যাবরেটরিতে ৮,০০১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ফিজিও-থেরাপি বিভাগে ৭৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

উল্লেখযোগ্য যে, বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিভাগটি হইল চক্ষু-বিভাগ; চক্ষুরোগে আক্রান্ত সহস্র সহস্র রোগী এখানে চিকিৎসালাভ করিয়া নিরাময় হইতেছে।

মালদহ : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মালদহে মঠ-শাখা একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থাপিত হয়; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইহা বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জনহিতকর কার্যের জন্য মিশন-শাখাটি খোলা হয়।

মঠ-বিভাগে নিত্য পূজার্চনা ও ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা এবং উৎসবাদি সুষ্ঠু-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মিশন-বিভাগে বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের কাজই প্রধান মিশন-শাখা কর্তৃক নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি পরিচালিত হইতেছে :

(১) ১০০টি শিশু ছাত্র-ছাত্রীকে লইয়া দুইটি নার্সারি বিদ্যালয়, (২) ২২৫টি ছাত্র-ছাত্রী-সমন্বিত একটি প্রাথমিক বুনিয়াদী স্কুল, (৩) ৬২৮টি ছাত্র-সমন্বিত একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, (৪) মিশন-প্রতিষ্ঠিত বাস্তুহারা কলোনীতে ১৪২টি ছাত্র-ছাত্রীযুক্ত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, (৫) গ্রামে আদিবাসী সাঁওতাল ও অন্যান্য অনুন্নত বালক-বালিকাদের

জন্য গাজোল থানার—চিৎকোলে, মালদহ থানার—নারায়ণপুরে, ইংরেজবাজারের—অমৃতি মোহনপাড়ায় এবং বামনগোলা থানার —চেংনাডাঙ্গায় ২৫৬টি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আর বয়স্কদের জন্য ৪টি সামাজিক ও বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র, (৬) মহিলা-দের জন্য কুটিরশিল্প—সেলাই, রেশমের ঝুটকাটা, ছবি বাঁধানো, খেলনা তৈয়ারি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'সারদা শিল্প-নিকেতন' নামে শহরে দুইটি স্কুল, (৭) 'বিবেকানন্দ শিশুসঙ্ঘ' নামে ছোট ছেলেমেয়েদের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও সর্ববিধি উন্নতির জন্য একটি ক্লাব এবং মফস্বলে ইহার দুইটি শাখা (মেম্বার-সংখ্যা —৩১০), (৮) কলেজ ও উচ্চবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের জন্য একটি ছাত্রাবাস।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ২২টি ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে কলেজের একটি ছাত্র কৃতিত্বের সহিত অনার্স-সহ বি. এ. পাস করিয়াছে। কতিপয় মেধাবী দরিদ্র ছাত্র এবং সাঁওতাল ও আদিবাসী ছাত্র বিনা-ব্যয়ে এখানে আহার ও বাসস্থানের সুযোগ পাইয়া শিক্ষালাভ করিতেছে।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি এবং নারায়ণপুর ও চিৎকোলে দুইটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিতরণ কেন্দ্র আছে। আলোচ্য বর্ষে ৪৬,১৯৯ জনকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪,৭৫১ জন নূতন রোগী।

আশ্রমে ২,০৮৬ খানি পুস্তক-সমন্বিত একটি গ্রন্থাগার আছে। আলোচ্য বর্ষে পাঠকগণ ২,৮০৩ খানি বই বাড়ীতে লইয়া পড়িয়াছেন। পাঠগারে পাঠকসংখ্যা প্রত্যহ গড়ে ৩৫।

বহু দরিদ্র নরনারীকে সাময়িক অর্থ ও বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করা হয়। অমৃতির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা গত অক্টোবর মাস হইতে চালু করা হইয়াছে।

মিশন-কেন্দ্র কর্তৃক ১০৬টি মধ্যবিত্ত-পরিবার-সমন্বিত একটি উদ্বাস্তু-কলোনী শহরের এক সুদৃশ্য অংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখান-কার অধিবাসীরা বর্তমানে স্বাবলম্বী হইয়া স্বাধীন নাগরিকরূপে বসবাস করিতেছেন।

বাঁকুড়া : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সেবা-শ্রমের ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

মঠ-বিভাগের কার্যধারা :

(১) মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এখানে নিত্য পূজার্চনা, উপাসনা, প্রার্থনা ও ভজনাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(২) স্থানীয় জনসাধারণের আধ্যাত্মিকতা লাভের সহায়তায় ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ৫৫০টি ধর্ম-ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আছে। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা—৩,৪৮৫। পাঠাগারে ৩৭টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়।

(৪) জগতের মহাপুরুষগণের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথাযথ-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

মিশন-শাখার কার্যাবলী :

(১) মিশন কর্তৃক তিনটি দাতব্য হোমিও-প্যাথিক ঔষধ-বিতরণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়। ইহাদের একটি গ্রামে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৫৪,০৬৯ জন চিকিৎসিত হইয়াছে।

(২) অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য একটি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই বিদ্যালয়ে ১৩৩ জন বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে।

(৩) কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। প্রতিদিন ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থীদের জন্য ধর্ম-ক্লাস করা হইয়া থাকে।

(৪) কয়েকজন দরিদ্র ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত কেন্দ্র—অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল:

অক্টোবর, ১৯৬৬: শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিশ্বজনীন বাণী; রাজযোগ-সহায়ে একাগ্রতা; জ্ঞানযোগের বিচার-সহায়ে একাগ্রতা, মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা; মানুষের স্বরূপ কি?

নভেম্বর,'৬৬: বিশ্বাস; মৃত্যুর পারে জীবন; যোগের মাধ্যমে শান্তি; আধ্যাত্মিক সেতুর তিনটি খিলান।

এপ্রিল, '৬৭: শ্রীরামকৃষ্ণ—বর্তমান জগতের আলোক। শ্রীরামকৃষ্ণ—জগজ্জননীর বাণীরূপ; আধ্যাত্মিক জীবন ও সামাজিক দায়িত্ব; যোগ ও আন্তর জীবনের নীতি; মৌনতার আরোগ্যকারিণী ও সৃজনী শক্তি।

মে, '৬৭: ঈশ্বর, আত্মা ও বিশ্ব; সাকার হইতে নিরাকারে; ধর্মীয় জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন; বুদ্ধের শান্তি ও জ্ঞানের বাণী।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে কঠোপনিষৎ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে ক্লাস করা হইয়াছিল।

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া: স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি: অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ; সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল:

ডিসেম্বর, ১৯৬৬: পরমপুরুষরূপে সত্তা; যে স্বর্গ আমরা স্পর্শ করিতে পারি; মনের সীমান্ত প্রদেশ; সার্থক জীবনযাপন; জ্ঞান ও প্রেমের মূর্তি স্বামী প্রেমানন্দ; শান্তি কোথায়? ঈশ্বরাবতার যীশুখৃষ্ট।

জানুআরি, ১৯৬: বর্তমান ভারতের মহীয়সী সাধিকা; প্রথমের কাজ প্রথমে; সাকারের মাধ্যমে নিরাকারে; মৃত্যুর পূর্বে যাহা আমরা অবশ্যই করিব; মনের সহিত যুদ্ধ; উন্নতির সোপানে আত্মার আরোহণ; আলোকপ্রদ জীবন; বিশ্ব—আত্মার অভিক্ষেপ।

ফেব্রুআরি, '৬৭: স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয় ও মন; স্বর্গীয় ভাবে জগৎ পূর্ণ; সত্তানুভূতির অভ্যাস; কিরূপে যোগী হওয়া যায়? কর্মবিধান ও ঈশ্বরমহিমা; স্পর্শাতীতকে স্পর্শ করা; ধারাবাহিক ধ্যান।

মার্চ, '৬৭: ধর্মের নব দিগন্ত; জাগ্রত মনের গুরুত্ব; ধ্যানযোগ; বাহিরে কিছুই নাই, সবই অন্তরে; ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে আধ্যাত্মিক জীবন; মানবজাতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের দান; বেদান্ত ও রহস্যবিদ্যা; পুনর্জন্ম ও দ্বিতীয় জন্ম; স্বামী বিবেকানন্দ ও ভবিষ্যৎ ভারত।

এপ্রিল, '৬৭: দৈনন্দিন জীবনকে কিরূপে আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ করা যায়; ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করুন; দেখ, আমি তোমাদিগকে সুসমাচার দিতেছি; আমাদের জীবনকে উপাসনায় পূর্ণ করা; শক্তির উৎস; আধ্যাত্মিক জীবনে পরিবেশের প্রভাব; আমাদের 'আমি'র প্রকৃত স্বরূপ; কিভাবে আমরা 'আত্মা'কে হারাইব না; ঈশ্বরানুভূতি কাহাকে বলে।

মে, '৬৭: শব্দ হইতে শব্দাতীত; আত্মজ্ঞানের ভিত্তি; জীবনের কেন্দ্রে উপস্থিত

হওয়া; আত্মার আত্মাকে উপাসনা; আন্তর সমন্বয়; আমরা কেন আছি এবং আমাদের স্বরূপ কি? বুদ্ধ ও বেদান্ত; কাল অনন্ত; স্বামী বিবেকানন্দের ভাব কি বিশ্ব গ্রহণ করিবে?

পুরাতন মন্দিরে 'অবধূত গীতা' আলোচিত হয়।

উৎসব-সংবাদ

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রভাত-ফেরী, পূজা-পাঠাদি, শোভাযাত্রা ও আশ্রম-প্রাঙ্গণে ২২শে এবং ২৩শে মে ধর্মসভা হয়। ২২ তারিখে আশ্রম বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী। সভার পূর্বে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ড্রিল, বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌশল, ব্রতচারী নৃত্যাদি দেখানো হয়। ২৩ তারিখের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী। সভান্তে প্রায় দেড় হাজার ভক্তকে হাতে হাতে বোঁদে প্রসাদ দেওয়া হয়। ২৪শে মে হরিণবাড়ী যুধিষ্ঠির বিদ্যানিকেতনে এবং ২৫শে মে নটেন্দ্রপুর নটেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে ধর্মালোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী মহেন্দ্রানন্দজী, স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী এবং স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দজী। সভার পূবে 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী। স্থানীয় নেতা শ্রীহরিপদ বাগুলি এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাসও বক্তৃতাদি দেন। সভান্তে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সমাজ-শিক্ষা বিজ্ঞান কর্তৃক পরিচালিত ছায়াচিত্র-প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রহ্লাদচরিত্র, মহাভারত ও ঠাকুর-স্বামীজীর জীবন-আলেখ্য আলোচিত হয়।

২৬শে মে মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক 'রানা প্রতাপ' নাটক অভিনীত হয়।

প্রচারকার্য

গত জানুআরি মাস হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ সারদা সঙ্ঘ—ডিগবয়, রামকৃষ্ণ আশ্রম—ডিগবয়, বিবেকানন্দ বিদ্যালয় —ডিগবয়, রামকৃষ্ণ আশ্রম—তিনসুকিয়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম—যোরহাট, বেঙ্গলীক্লাব—যোরহাট, গোলাঘাট, ফারকাটিং, ডিমাপুর রামকৃষ্ণ সোসাইটি—নাগাল্যাণ্ড, রেলওয়ে হাইস্কুল—ডিমাপুর, পুরানাবাজার কাছারী বস্তি, ডিমাপুর দুর্গাবাড়ী, দেশবন্ধু হাইস্কুল—হোজাই, রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি—গৌহাটী, বেঙ্গলী হাইস্কুল—গৌহাটী, রেলওয়ে হাইস্কুল—গৌহাটী, হিন্দী হাইস্কুল- গৌহাটী, বিশ্বহিন্দু পরিষদ—গৌহাটী, বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ইনিষ্টিটিউট, নিউবঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ইনিষ্টিটিউট, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র—পাণ্ডু, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে 'ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা', 'ভারতের নারী ও মাতা সারদাদেবী', 'জাতীয় উন্নতিতে ধর্মের স্থান' ও 'আচার্য বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে মোট ৩০টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৪টি আলোকচিত্র-সহযোগে দেওয়া হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও সারদা মন্দিরের (বাগবাজার, কলিকাতা-৩) ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ—১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের সুমুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নভেম্বর শ্রীশ্রীকালীপূজার পুণ্যদিবসে জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী কর্তৃক এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়। সেই শুভ অনুষ্ঠানে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ অবস্থা হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহা ঠিক ঠিক একটি বিদ্যালয়ের রূপ লাভ করে। ভগিনী নিবেদিতা ভারতে নারীজাতির মধ্যে আদর্শ শিক্ষা-বিস্তারে কিভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এই বিদ্যালয় তাহার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-কেন্দ্ররূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে এবং দীর্ঘকাল সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট ইহার পরিচালনাভার রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের উপর অর্পিত হয়। হস্তান্তরিত হইবার পর হইতে ইহা রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিচালিত হইতেছে।

অবৈতনিক প্রাথমিক বিভাগে প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রাথমিক বিভাগটি স্বতন্ত্র ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ে বিষয়-নির্বাচনের জন্য তিনটি ধারা আছে: সাহিত্য, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান (Home Science)। এখানে দরিদ্র ছাত্রীরা বিনা-বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করে।

নিবেদিতা ছাত্রীসঙ্ঘ কর্তৃক সভাসমিতি, উৎসব, বিতর্ক, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা প্রভৃতি পরিচালিত হয়।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ৭,৭৫৯; ১৪টি সাময়িক পত্রিকা ও ৩ খানি সংবাদপত্র রাখা হয়।

শিল্পবিভাগ: ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'পুরস্ত্রী বিভাগ' নাম দিয়া দরিদ্র মহিলাগণকে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং এই বিভাগটি খুলিয়াছিলেন। বর্তমানে এখানে সূচীশিল্প, দরজীর কাজ, মোজাবোনা, খেলনা তৈরী, তাঁত-বোনা, চামড়ার কাজ প্রভৃতি শিখাইবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

যে সব বালিকা আবাসিক ছাত্রী-হিসাবে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে চায়, তাহারা সারদামন্দিরে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। বর্তমানে ৪৭ জন ছাত্রীর মধ্যে ৪ জন বিনা-ব্যয়ে থাকে এবং ৪ জন আংশিক খরচ বহন করে।

জন্মাষ্টমী, রামনবমী, দোলযাত্রা, বুদ্ধপূর্ণিমা, শংকরাচার্যের জন্মতিথি, খৃষ্টজন্মদিন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

গয়া: রামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্যবিবরণী (১৯৬২-৬৫) আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

পুণ্যতীর্থ গয়াধামে এই আশ্রমটিতে নিত্য পূজা ও ভজনাদি ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই

চলিয়া আসিতেছে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত-বার্ষিকী যথোপযুক্ত মর্যাদাসহকারে উদ্‌যাপন করা করা হয়। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সময় দরিদ্রনারায়ণসেবা করা হইয়া থাকে। একটি নৈশ বিদ্যালয়, একটি গ্রন্থাগার এবং একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ২১,৭০৫ জনকে ঔষধ দেওয়া হয়।

উৎসব-সংবাদ

পাঁচগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম নামে একটি আশ্রম স্বামীজীর জন্মতিথিতে (১লা ফেব্রুআরি) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে দুইদিন ধর্মসভা ও প্রায় বারশত ভক্তের মধ্যে প্রসাদবিতরণ হয়।

২৩ ও ২৪শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সুখদানন্দ মহারাজ সভাপতিত্ব করেন।

আশ্রমে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় এব' একটি অবৈতনিক পুস্তকাগার পরিচালিত হইতেছে।

কালীঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ১২ই হইতে ১৫ই মে তিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, পাঠ, কীর্তন ও রামায়ণগান প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রথম দিন সন্ধ্যায় ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী জীবানন্দজী মহারাজ, বক্তৃতা করেন অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। পাঠ ও সংগীতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন বাউল সম্রাট শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, রামায়ণভারতী শ্রীমতী সুমতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। উৎসবান্তে কয়েক শত ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

হুগলী: গত বুদ্ধ-পূর্ণিমাতিথিতে হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কর্তৃক হুগলী 'বিবেকানন্দ ভবনে' অনুষ্ঠিত সভায় বুদ্ধের জন্ম-তিথি পালিত হয়। সভায় বুদ্ধের জীবন ও বাণীর উপর আলোকপাত করেন শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বড়ুয়া, শ্রীসুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন। সভান্তে সঙ্ঘের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক "জগজ্জ্যোতি" গীতি-আলেখ্য পরিচালিত হয়।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পরিচালনায় গত বুদ্ধপূর্ণিমার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী ভবনে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন করেন। ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। সাধারণ বিভাগ, মহিলাবিভাগ, শিশুবিভাগ, গবেষণাবিভাগ ও পাঠ্যপুস্তক-বিভাগ-সমন্বিত এই গ্রন্থাগারটির উপযোগিতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রধান অতিথি শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ মহিলাসমিতি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

চাকুলিয়া: স্থানীয় ভক্তগণের সহযোগিতায় গত ১৯. ৬. ৬৭ তারিখে সিংভূম জেলার চাকুলিয়ায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা অর্চনা এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, স্বামী অপ্রমেয়ানন্দ, স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য এবং শ্রীযতীন্দ্রনাথ কর এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, জননী সারদা-দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারা

সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচশতাধিক লোককে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

খড়িবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৪শে হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই কয় দিন নিত্যপূজা, পাঠ, রামায়ণ ও কীর্তনগান, চলচ্চিত্রপ্রদর্শন ও বাউলসঙ্গীত উৎসবের অঙ্গ ছিল। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বৈকাল ৬ টায় স্বামী অমৃতত্বানন্দের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ ধর্ম-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া ঐদিন দ্বিপ্রহরে সহস্রাধিক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শিবতোষ দাশগুপ্তের দেহত্যাগ

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট শিবতোষ দাশগুপ্ত গত ২৫শে জুন, ১৯৬৭ দ্বিপ্রহরে কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। টাটা কোম্পানীর কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দাস্তুর কোম্পানীর কলিকাতায় উপদেষ্টা ইঞ্জিনীয়ার-রূপে তিনি কাজ করিতেছিলেন। প্রথম প্রেসিডেন্ট সত্যেশ গুপ্ত মহাশয়ের দেহত্যাগের পর হইতেই তিনি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি প্রার্থনা করি।

ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !! ওঁ শান্তিঃ !!!

মাতঙ্গিনী দেবীর দেহত্যাগ

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মন্ত্রশিষ্যা মাতঙ্গিনী দেবী ৭৬ বৎসর বয়সে গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ৬·৪০ মিনিটে তাঁহার কসবা-স্থিত নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

গত দুই বৎসর যাবৎ পক্ষাঘাতে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !! ওঁ শান্তিঃ !!!

দিব্য বাণী

জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়শমনীং সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং
নিত্যানন্দোদয়েশাং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাদয়াঢ্যাং।
মিথ্যাকার্যানুরাগাদনুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসঙ্ঘৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥ ৭

তুমি যে জননী মোর ভবভয়-নাশিনী,
নিত্যানন্দোদয়-বিধায়িনী, ঈশানী,
শাস্ত্র-অর্থময়ী, লীলাময়ী, সদয়া,
সর্বসিদ্ধিপ্রদা—জানি নি তা জননি!
ভাবি নি তোমার কথা; অনুরাগভরে মা,
মিথ্যাকার্য করি নিশিদিন বিফলে
সদাই সকল দিকে বহু দুখে ভুগেছি!
ক্ষম অপরাধ মোর, প্রকটিত-দশনে!
যথেচ্ছ-রূপিণি মা—কামরূপে! করালে!

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিরামা
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুনপকুলশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা।

সংসারস্যৈকসারা মনসি ন চ কদা ভাবিতা ভাবনাভিঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৮

প্রলয়-জলদ সম শ্যামশোভাময়ি মা !
খড়্গ-মুণ্ডধরা, বরাভয়-দায়িনি !
নিবিড়-মুক্তকেশি ! শবশির-মালিনি !
দীর্ঘ আয়ত কম সরসিজনয়নি !
জগতে তুমিই সার—একথা তো কখনো
ভাবি নি, করি নি তোমা ধ্যান হৃদি-কমলে !
তুমি যে জননী মোর— অপরাধ নিও না,
ক্ষম অপরাধ মোর প্রকটিত-দশনে !
যথেচ্ছ-রূপিণি মা—কামরূপে ! করালে !

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননীজঠরগস্তাবদালব্ধদেহঃ
ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্মহেতুস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থা জগদিদমখিলং ত্বামৃতে নাস্তি মাতঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১৩

—অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম্—শঙ্করাচার্য

পিতার শরীর হতে জননীর জঠরে
আসিয়া যেদিন হতে পেয়েছি এ দেহ মা,
ঈশ্বরী, কর্ত্রী মা সেই হতে তুমি যে,
(আমার এ 'আমি'-রূপে তুমিই তো জননি,)
করাতেছ সবকিছু অন্তরে থাকিয়া !—
অদৃষ্টরূপা তুমি, প্রবৃত্তি তুমি মা,
তুমিই তো বিষয়েতে, ইন্দ্রিয়সকলে,
চিত্তে বুদ্ধিরূপে তুমিই তো উদিতা,
তুমি ছাড়া কিছু নাই এ নিখিল ভুবনে !
ক্ষম মোর অপরাধ প্রকটিত-দশনে !
যথেচ্ছ-রূপিণি, মা—কামরূপে, করালে !

কথাপ্রসঙ্গে

'মৃত্যুর উপাসনা'

"মৃত্যুকে উপাসনা করিতে সাহস পায় কয়জন? এস, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

নির্ভীকতাই জীবনকে সর্ববিধ উন্নতির পথে আগাইয়া লয়, মানুষের অন্তরস্থ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। যাহা অনিবার্য তাহা সমীপাগত হইলে, এমনকি মৃত্যুও আসিলে কাপুরুষের মত ভীত, পলায়নপর না হইয়া সাহসের সহিত তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে অতিক্রম করার চেষ্টা বা অসম্ভব ক্ষেত্রে তাহাকে বীরের মত বরণ করাই 'মানুষের' ধর্ম, ইহাতে সন্দেহ কি?

কিন্তু মৃত্যুর উপাসনা কেন? মৃত্যু বলিতে সাধারণতঃ যাহা আমরা বুঝি তাহা আমাদের সব কিছুর চির-অবসান। নিজের অস্তিত্ব আমাদের দেহ-সীমিত, মনবুদ্ধি-সীমিত; দেহ ছাড়া, মনবুদ্ধি ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব যে থাকিতে পারে, তাহা আমরা ভাবিতেই পারি না। আমাদের দেহের অবসান তাই আমাদের চিরবিলুপ্তির কথাই মনে করাইয়া দেয়। আমাদের অস্তিত্ব বলিতে, উন্নতি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা তো এই মৃত্যুর সঙ্গে, মৃত্যুর দিকে টানিয়া লওয়া প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করিয়াই আমরা লাভ করি। আমাদের দেহের, আমাদের মনের, আমাদের সভ্যতার সব উন্নতিই তো আমরা লাভ করিয়াছি এই লড়াই-এর মাধ্যমে। তবে মৃত্যুর উপাসনা কেন?

সাধারণ প্রত্যক্ষের এই পরিবেশে দাঁড়াইয়া এই মৃত্যুর উপাসনার কথা স্বামীজী বলিতেই পারেন না, বলেনও নাই; বরং ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন বহুস্থানে, বহুভাবে। স্বামীজী নিজেই ইহার উত্তর দিয়াছেন, "ভীষণের পূজা কর, মৃত্যুর উপাসনা কর। বাকী সবই বৃথা; সমস্ত চেষ্টাই বৃথা। ইহাই শেষ উপদেশ। কিন্তু ইহা কাপুরুষের মৃত্যুবরণ নয়, আত্মহত্যাও নয়—ইহা শক্তিমান পুরুষের মৃত্যুবরণ, যিনি সব কিছুর অন্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়া দেখিয়াছেন ও জানিয়াছেন যে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্য নাই।"

আমরা আপেক্ষিক সত্যের প্রায় নিম্নতম স্তরে জ্ঞানের সীমা আবদ্ধ রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হই। এখানে আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সীমিত, আমাদের আনন্দের অধিকাংশই দেহসীমিত; আমরা ধরিয়া লই চিরদিনই এসব থাকিবে। নিজের দেহ-ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা সম্বন্ধে, উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান বা উহা লাভের ইচ্ছাও থাকে না। এই স্তরে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই কাপুরুষের মৃত্যুবরণ, প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নকমাত্র হইয়া বাধ্য হইয়া মৃত্যুবরণ। আমরা এখানে 'আমি দেহ' 'আমার সুখদুঃখ', 'আমার মান'—এসব মানিয়া লই, আমাদের উপর বাহ্য- ও অন্তঃ-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ মাথা পাতিয়া লই, অসংখ্য জাগতিক বস্তুর বিভিন্নতাকে, মানুষে-মানুষে বিভিন্নতাকে মানিয়া লই। এই নিম্নতম আপেক্ষিক সত্যবরণই কাপুরুষতার জন্ম দেয়, বুদ্ধিকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া 'অধর্মকে ধর্ম' বলিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতা বলিয়া ভাবিতে শেখায়; ইহাই জাগতিক

বিষয়সম্ভোগকে জীবনের সর্ববিধ পরিকল্পনার শীর্ষদেশে রাখে, ঘোর স্বার্থপরতার জন্ম দিয়া পরিবার, সমাজ ও দেশের সেবাকে পরিণামে নিজের সেবায় পরিণত করে। দৈহিক মৃত্যুর বহুপূর্বেই ইহা মানবতার মৃত্যু ঘটাইয়া মানুষকে পশুত্বের সমপর্যায়ে টানিয়া আনে, ব্যক্তিগত- ও জাতিগত-ভাবে আচরণে পর্যন্ত হিংস্র শ্বাপদতুল্য করিয়া তোলে।

বিশ্বজীবনের অন্তর্নিহিত নিরাবরণ সত্যকে জানিয়া উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রচেষ্টাই, মানবতার সর্বোচ্চ বিকাশের সাধনাই 'মৃত্যুর উপাসনা'। আমাদের যাহা স্বরূপ, আমরা আসলে যাহা, তাহা দেহ-মন প্রভৃতি হইতে, 'জীবন' হইতে, জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট সবকিছু হইতে পৃথক, মৃত্যু তাহাকে কখনো স্পর্শ করিতে পারে না; আর সব কিছুরই মৃত্যু একদিন ঘটিবেই, আর সবই মৃত্যুকবলিত। ইহা জানিয়া এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রচেষ্টায় যাহা আমরা নহি, যাহার কেশপাশ স্পষ্ট হইবার মুহূর্ত হইতেই মৃত্যুর হস্তধৃত, তাহা হইতে 'আমি'- বা 'আমার'-বোধের বন্ধনকে শিথিল করার, জ্ঞানাসি সহায়ে স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ববিধ দেহাত্মবোধকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রচেষ্টারই নাম মৃত্যুকে ভালবাসা। নিজের দেহের প্রতি, নিজের সুখ-দুঃখ-মান-অপমানের প্রতি, নিজের ইচ্ছা বা মতামতের প্রতি মমতা ত্যাগ করার—এক কথায় 'আমি'-বোধের মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার নামই 'মৃত্যুকে ভালবাসা'। এই জন্য স্বামীজী সর্বত্যাগের, সন্ন্যাসেরও অপর নাম দিয়াছেন 'মৃত্যুকে ভালবাসা'। এদিক দিয়া দেখিলে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে জনসেবাকেও স্বামীজীর 'মৃত্যুর উপাসনা' বলা যায়। তাঁহার উপদিষ্ট জনসেবা কোন ক্ষেত্রেই জড়বাদসীমিতবুদ্ধির জনসেবা নয়—জড়কে অস্বীকার করিয়া জড়ত্বের আবরণমধ্যস্থ সত্যের, চৈতন্যময়ী মাতৃরূপার সেবা—তাঁহারই চরণে আত্মবলিদান। ইহাই অন্য নামে, "ত্যাগ ও সেবা" নামে আমাদের জাতীয় আদর্শ। ইহারই কথা তিনি বলিয়াছেন তাঁহার ভারতমন্ত্রে, "ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।······তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।"

ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে, সত্যলাভেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সমাজরূপী মায়ের চরণে আত্মবলিদানের মাধ্যমে 'মৃত্যুর উপাসনা'ই আমাদের সর্ববিধ কল্যাণের, সর্ববিধ উন্নতির পথ। জনসেবার, দেশসেবার যে রূপ আজ অন্যায় অত্যাচার উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতেছে, বহু ক্ষেত্রে সৎ, নিরপরাধ এমনকি দেশের যথার্থ কল্যাণকারীকেও নিপীড়িত করিতেছে, তাহা মৃত্যুর চিরকবলিত জড়ের আবরণ সরাইয়া সমাজের জনগণের মধ্যে বিরাট মহামায়াকে—নিজেরই স্বরূপকে—দেখিবার প্রচেষ্টার অভাবের ফল। ভারতের কল্যাণে মা যেন তাঁহার অসির আঘাতে এই অজ্ঞানের আবরণ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেন।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীপ্রভুশরণম্

(আলমবাজার) মঠ

রবিবার, (9th May, 1897)

ভাই শশী,

অনেক দিন হইল তোমায় পত্রাদি লিখি নাই, ক্ষমা করিও। মঠের নিয়মাদির কথা বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ। প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা পর্যন্ত ধ্যান। তারপর স্তবপাঠ ধারাবাহিকরূপে, এক একজন এক একদিন পাঠ করে, তারপর Delsarte[১] হয়, তৎপরে হালুয়া ভক্ষণ ইত্যাদি। আমি প্রত্যুষেই স্নান করিয়া পূজাদি করিতেছি। ভাই, ঠাকুরপূজা বড় কঠিন কাজ দেখিতেছি। বিকালে ৫টা হইতে ৬টা হরিভায়া গীতা-class করেন। আচার্যের ভাষ্য হইতেছে, তৃতীয় অধ্যায় আগামীকল্য আরম্ভ হইবে। আরতির পর পুনর্বার একঘণ্টা ধ্যান ও পরে question class হয়। মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রভুর কথাও হইয়া থাকে এবং একদিন গান হয়। মোটের উপর মঠের কার্য আজকাল অতি সুন্দরভাবে চলিতেছে।

স্বামী নরেন্দ্রনাথ আলমোড়ার নিকটে একটি নির্জন বাগানে আছেন। প্রথম তথায় গিয়া ভাল ছিলেন না, আজকাল বেশ ভাল আছেন, বল পাইয়াছেন—এইরূপ চিঠি লিখিয়াছেন। যোগানন্দ ভায়া বস্রিসার নিজ বাটীতেই আছেন, ভাল নাই। অচ্যুতানন্দ (গুণা), G. G., তারকদাদা, নিরঞ্জন, লাটু, Goodwin এবং বস্রিসার ২।৩টী ভাই স্বামীজীর সঙ্গে থাকে।

নিত্যানন্দ (চাটুজ্যে), অখণ্ডানন্দ ও সুরেন (অমৃত বোসের ভাইপো) মহুলায় দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-কার্য করিতেছে। কালীভায়া বিলাতে বেশ কার্য চালাইতেছেন, Mrs. Sevier সিমলা পাহাড় হইতে এখানে চিঠি লিখিয়াছে।

গত mail-এ শরৎ ভায়ার চিঠি আসিয়াছে, ভাল আছে। কার্য বোধ হয় আত সুন্দর রকমেই চলিতেছে। Kidi গত মঙ্গলবার মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়াছে। আমাদের আর আর সকল খবর তাহার মুখে শুনিও। আমরা সকলে ভাল আছি। আমাদের সকলের ভালবাসা ও নমস্কারাদ তুমি জানিও এবং গুপ্তকে জানাইও। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কামারপুকুরে ভাল আছেন।

ভবনাথ ভাল নাই, কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আছে। স্বামীজী চিকিৎসার জন্য ১০০৲ টাকা দিয়াছেন এবং দরকার হইলে আরও দিবেন, কহিয়াছেন।

---

১ একপ্রকার ব্যায়াম

তোমার মঠ নাকি খুব সচ্ছলভাবে চলিতেছে। এ মঠ ভিক্ষা করিয়া চালাইবার হুকুম গতকল্য আলমোড়া হইতে আসিয়াছে। তোমার কুশলাদি লিখিয়া সুখী করিবে। যে ঔষধ গিয়াছে তাহা খাইবার—জানিও। ঘাসের মত ও কাঠের মত যে ঔষধ তাহা ভিজাইয়া খাইবার এবং শোলার মত যাহা তাহাও খাইবার, কানাই কিনিয়া আনিয়াছিল। উহা তেলের ঔষধ নহে।

ইতি

দাস বাবুরাম

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণ ভরসা

মঠ (নীলাম্বরবাবুর বাড়ী)

বেলুড়

রবিবার, ৬ই মার্চ, '৯৮

ভাই শশী,

অনেক দিন হইল তোমার চিঠি পাইয়াছিলাম। কিন্তু নানা কার্যে ব্যস্ত থাকায় উত্তর-দানে দেরী হইল, ক্ষমা করিবে।

প্রিয়তম নরেন্দ্রনাথ তোমার চিঠি পড়িয়া ও তোমার কার্যের বিবরণ শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছে। তোমার উপর মহা খুশী এবং তোমায় চিঠি লিখিয়াছে; তাহা এতদিনে বোধ হয় পাইয়াছ। তাহার শরীর তত ভাল নহে। অসুখ সম্পূর্ণ সারে নাই। তবে থমথমে হয়ে আছে, কমবার মুখ। শরীর সবল আছে, স্ফূর্তিরও কম নাই। তাই তাহার হৃদয় কি উদার হইয়াছে! জগতের লোকের জন্য সর্বদা চিন্তিত।

তিথিপূজার দিন সুশীল পূজা ও সুধীর তন্ত্রধারকের কার্য করিয়াছিল। ঐ দিন শতাধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ একটি সুন্দর আরতির গান রচনা করিয়াছে ঃ

খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়,
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময় ॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার ।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ
গাহিছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার ॥

সকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ মস্তকে জটা, কর্ণে কুণ্ডল, গাত্রে বিভূতি ধারণ করায় এক অপূর্ব শোভা হয়েছিল। আমরা অনেকেই ঐরূপ সাজিয়াছিলাম। রাত্রি ১২টা পর্যন্ত পূজা-হোমাদি হইয়াছিল। ঐদিন গঙ্গা ও সুরেন মহলা হইতে একমণ ওজনের দুই

ছানাবড়া লইয়া হাজির। স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম কি?'—এ সম্বন্ধে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তোমায় একখানি পাঠাইব।

গত রবিবার দাঁ-দের বাগানে মহোৎসব আদি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—প্রায় অন্য বৎসরের তুল্য। ঐদিন নূতন জায়গায় নরেন্দ্র নিজে ঠাকুর লইয়া গিয়া পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। এবং পায়সান্ন ভোগ হইয়াছিল। গতকল্য ঐ জায়গাটী ৩৯০০০৲ হাজার টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে। শ্বেতপাথরের মন্দির ও প্রকাণ্ড বাটী তৈয়ারের আয়োজন হইতেছে। শীঘ্রই কার্য আরম্ভ হইবে। দেখে শুনে লোকে অবাক হইয়াছে। তাঁর কার্য তিনিই করেন। লোক না পোক, ··· হিংসায় মরে। মঠে আজকাল অনেক লোক—শরৎ, হরিভায়া, তারকদাদা, সুশীল, সুধীর, হরিপ্রসন্ন, কানাই, নন্দ, কালীকৃষ্ণ, অজয় নামে একটী নূতন লোক, গুপ্ত, আর নিত্যানন্দ—ইনিই পূর্ববঙ্গে গিয়া প্রায় ৫০।৬০টী শিষ্য করিয়া আসিয়াছেন। তাদের গুটিকত মহোৎসবে আসিয়াছিল। এইবার কলিকাতায় lecture হইবে। আগামী শুক্রবারে Miss Noble Star Theatre-এ lecture দিবে। তাহার পরে শরৎ lecture দিবে। নরেনের বড় ইচ্ছা কলিকাতা মাতায়, ইচ্ছা হলেই কার্য। হাজারিবাগ অঞ্চলে শীঘ্রই এখান হইতে দুইজন প্রচার ও উপনিবেশ-স্থাপন জন্য যাইবে। এই রবিবারে ভবানী (ব্রহ্মবান্ধব) আসিয়াছিল। আগামী রবিবারে রামবাবুর বাগানে নরেন যাইবে। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমরা আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবে। তুলসী, খোকা, দাদা ও শুকুলকে আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানাইবে। ইতি

দাস
বাবুরাম

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা

বেলুড় মঠ
৫ই ডিসেম্বর (১৯০০)

পরমপ্রিয় ভাই শশী,

আজ কয়েকদিন হইল তোমার এক চিঠি পাইয়াছি, কিন্তু কুড়েমির জন্য জবাব দিতে পারি নাই। ক্ষমা করিও, ভাই। আর আট নয় দিনের মধ্যেই হরিপদ তোমার কাছে যাইবার জন্য যাত্রা করিবে। তাহার সঙ্গে তোমার ঔষধাদি পাঠান হইবে। সব যোগাড় হয়েছে। আর যদি কিছু দরকার হয় শীঘ্র শরৎকে লিখিও। তোমার শরীর এখন কেমন আছে?

পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ৫।৭ দিনেই বোধ হয় কলিকাতায় আসিবেন। বাটী ভাড়া হইয়াছে। দেশে তাঁর শরীর ভাল নাই।

শ্রীমান স্বামীজী এখন Constantinople-এ আছেন। বোধ হয় এখন ঐ অঞ্চলে কিছুদিন বেড়াইবেন। তাঁহার শরীর তত ভাল ছিল না, এখন মন্দ নাই, গত mail-এ চিঠি আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখাল ভায়ার শরীরও অসুস্থ, হয় পেট খারাপ, নয় সর্দি—একটা না একটা আছেই। কোথাও যাবার ভারি ইচ্ছা ও দরকার, কিন্তু যাবার যো নেই, মকদ্দমার জন্য। জায়গা হলেই মামলা সঙ্গে সঙ্গে। Municipality tax ধরেছে প্রায় কিছু কম ২০০্ টাকা। আমরা বলচি public place of worship—এখানে tax হতে পারে না; কাজেই মামলা এখন হচ্ছে হুগলীতে। রাখাল এই নিয়ে বড়ই ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। ২৮শে জানুয়ারী দিন পড়েছে। শরতের আমাশয় ভাল আছে, কোথাও change-এ যাবার ইচ্ছা। কোন্ দিকে যাবে তার স্থির নেই। তারকদা ১৬ মাস দার্জিলিং-এ কাটিয়ে এখানে মাসাধিক হল এসেছেন। তুলসীও প্রায় ১৫।২০ দিন এসেছে। তার শরীর ঔষধ খেয়ে একটু ভাল আছে। আর এলাহাবাদ, নাগপুর ঘুরে হরিপ্রসন্নও পৌচেছে। সুধীর শরীর সারাবার জন্য কাশী গিছলো, কিন্তু রোগা হয়ে ফিরে এসেছে। গোপাল দাদা আজ তিন দিন হলো দ্বারকাধাম-দর্শনে যাত্রা করেছেন। খোকা গঙ্গার সঙ্গে ভাবদায় আছে। আর সারদার ভাই আশু বৈরাগ্য করবার জন্য প্রয়াগে গেছে। আর আর সকলে আপাতত ভাল আছে। জ্বরজারি মঠে এবার খুব কম, কিন্তু চাকরদের ভিতর আমাশয় রোগটা কিছু বেশী।

মাষ্টার মহাশয় আছেন ভাল, তোমার কথা প্রায় জিজ্ঞাসা করেন। গিরিশবাবুর একটি কন্যা ছিল, তাও সম্প্রতি গিয়াছে। বাস্তবিক বড়ই কষ্টের কথা। তিনি মাদ্রাজে যাইতে ইচ্ছা করেন। সেদিন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আর আর সকল ভক্ত ভাল আছেন। তুমি দিনকতকের জন্য মঠে এলে আমরা সকলেই খুব খুশী হব। আসা কি চলে না? এই ত রেলে আসবার বেশ সুবিধা। তুমি নৈলে মঠ মিট্‌মিট্ করে। ২।৫ দিনের জন্য এলে হল কি? জান এখানে শীত পড়েছে, কাজেই ফুল কমেচে। বকফুল এখন আসর রেখেছেন, নানা জাতের গোলাপ বসান হয়েছে। কিছুদিন পরেই খুব ফুল হবে। রাখাল ও গোপালদাদার গোলাপের উপর ভারি নজর।

পালং শাক আজকাল অনেক হয়েছে। মুলা হবে মন্দ নয়। এবার বর্ষার জন্য অন্য ফসল ভাল হলো না। বেগুন একেবারে বিগড়ে গেছে। কাঁচকলা মন্দ হচ্ছে না, তোমার দরুন কলা অনেক ফলেছে, এখনও পাকে নাই।

আমেরিকার খবর তুমি যেমন পাচ্ছ, আমরাও তেমনি। আমার ভালবাসা ও প্রণাম তুমি জানিবে। কানাই কেমন আছে? তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে। ইতি—

দাস বাবুরাম

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কথোপকথন

স্বামী ধীরেশানন্দ

28.5.56

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজ, শশী মহারাজ ও মহারাজ — এই তিন জনের নিকট আমি বিশেষ ঋণী। জীবনের দীর্ঘ ১২ বৎসর দক্ষিণদেশেই কেটেছে। শশী মহারাজ বলতেন, 'আমার দুটি বাসনা ছিল— মহারাজ ও শ্রীমাকে দক্ষিণদেশে আনা। ...তা হয়ে গেছে, এবার আর শরীরের জন্য ভাবি না।' সর্দি, Bronchitis, T.B. — ডাক্তার দেখাবেন না, কারণ তাহলেই শুয়ে পড়তে হবে। মা এসেছেন। তাঁর ব্যবস্থাদি কে করবে? মার ওদেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থার strain-এই ওঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এল। ডাক্তার বলেছিল—'কি করেছেন? এ যে একেবারে advanced stage. আর দু'মাস বড়জোর বাঁচবেন।'..."

29.5.56

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী বললেন, "Madras Math-এ মহারাজ। দেবমাতার লেখা স্বামীজীর 'Inspired Talks' ছাপা হয়েছে। মহারাজের খুব উৎসাহ। সব কাগজে Review-র জন্য পাঠাতে বলছেন। মহারাজ বললেন শশী মহারাজকে, 'এ বইটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।' মহারাজই এ বই বিক্রীর সব ব্যবস্থা করেন। একদিন শশী মহারাজের সঙ্গে কথা হচ্ছে। মহারাজ বললেন, 'একখানা কপি মাদ্রাজের Hindu কাগজে পাঠাও। তাদের Review-র cutting সহ ঐ বই আবার Bombay-র কাগজে পাঠাও।' শশী মহারাজ বললেন, 'না, ওদের cutting-সহ পরে পাঠাবার কি দরকার? একসঙ্গেই সব জায়গায় পাঠানো হোক।' এ নিয়ে ৪।৫ মিনিট কথা-কাটাকাটি। মহারাজ একেবারে হঠাৎ গুম্ হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন, 'আমি কি foolish, তোমাকে গেছি suggestion দিতে' ইত্যাদি!—Tense atmosphere. বোঝ ব্যাপার! কথাগুলি শশী মহারাজের ভিতরে কি রকম আঘাত করছে! শশী মহারাজও চুপ করে বসে আছেন। মহারাজ আমায় বললেন—'ওরে, পাঁজিটা নিয়ে আয় তো।' আমি যন্ত্রের মত এনে দিলাম। ৩।৪ দিন পর যাবার দিন ঠিক করলেন। আমাকে দিয়ে postcard আনিয়ে চিঠি লেখালেন। পুরী যাবেন। চিঠি Mount Road-এর পোস্ট অফিসে post করতে আদেশ দিলেন। শশী মহারাজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তিনি আমার হাত থেকে postcard নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আমি তো stunned! মহারাজ জিজ্ঞেস করলে কি বলব? ভাগ্যিস্ মহারাজ আর কিছু জিজ্ঞেস করেননি। ১ দিন, ২ দিন, ৩ দিন যায়। মহারাজ শশী মহারাজের সঙ্গে কোন কথা বলেন না। শশী মহারাজ রোজ সকাল-সন্ধ্যায় মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ করেন। হাত-জোড় করে মহারাজ ভাল আছেন কি না জিজ্ঞেস করেন। মহারাজের কোন কথা নেই। 3rd day-তে শশী মহারাজ একেবারে পা-জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মহারাজ, আমায় ক্ষমা করো; তোমার ইঙ্গিতমাত্রে কত শশী ভেসে যায়!'

মহারাজ বললেন, 'আরে শশী-ভাই, কি কচ্ছ! ওঠ ওঠ।'

মহারাজ জল হয়ে গেলেন। দুই গুরু-ভায়ে কি ভালবাসা!

... ...

দেবমাতা বাজারে যাচ্ছেন মহারাজের জন্য তরকারী কিনতে। মহারাজ কচি ঢ্যাঁড়স ভালবাসতেন। দেবমাতা মঠের কাছেই এক বাড়িতে থাকতেন।

আমি বললাম, 'Get some lady's fingers.'

দেবমাতা তো হেসেই আকুল। আমি অপ্রস্তুত। মঠে এসে একটা ঢ্যাঁড়স নিয়ে তাকে দেখালুম। তখন আরও হাসি। আমি বললুম, 'মাদ্রাজীরা আমাকে এ জিনিসের এই ইংরেজীই তো শিখিয়েছে। রগড় আর কি! আমেরিকায় ওরা ঢ্যাঁড়সকে বলে okra.'

মঠে মহারাজ বৈকালে আমায় ডেকে নিতেন বেড়াবার সময়। কল্যাণেশ্বর-দর্শনে যাচ্ছেন। রাস্তার মাঝে একটা ইট-খণ্ড পড়ে আছে। মহারাজ পা-দিয়ে সেটা রাস্তার পাশে ফেলে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন দেখে আমি সেটা হাতে ধরে ফেলে দিলাম। মহারাজ বললেন, 'এটা ঠাকুরের কাছে শিখেছি।'—ওই ইটটাতে কত লোকের অসুবিধা হত তো!

কাশী থেকে মঠে এলাম—মাদ্রাজ যেতে হবে। আমি, গিরিজা ও খগেন মার কাছ থেকে গেরুয়া নিয়ে জয়রামবাটী থেকে হেঁটে কাশী গিয়েছিলাম। সকলেই শুনেছে তো! বুড়ো গোপালদা আমায় ছেলেমানুষ দেখে বললেন—'ওহ্! এ সেই ছেলেটি যে কাশী হেঁটে গিয়েছিল। এ কি পারবে শশী মহারাজের সঙ্গে থাকতে?' শশী মহারাজ খুব strict কিনা! সেখানে তামাক খাওয়া চলবে না জেনে Madras-এর আগের স্টেশন Basin Bridge-এ খুব সিগারেট খেয়ে নিয়ে মনকে বললাম—'ব্যস্, এই নাও শেষ।' Madras-এ মহারাজ যাবার পর গড়গড়া, তামাকের ছড়াছড়ি। আবার তামাক খাওয়া ধরি। পড়বি তো পড় একেবারে শশী মহারাজের সামনে—একেবারে হুঁকো হাতে! তখ্খুনি মহারাজের কাছে নালিশ— মহারাজ, এদেশে তামাক খাওয়া নিন্দনীয়। এই জিতেন তামাক খায়। ওকে মানা কর। ও চা কফি যা খুশি থাক, তামাক খেতে মানা কর।' মহারাজ চুপ করে শুনে বললেন—'তাতে কি হয়েছে? আমি তো ১২ বছর বয়স থেকেই তামাক খাই।'

শশী মহারাজের ইচ্ছা মহারাজকে দিয়ে ঠাকুরের পুজো করান। তাকে-তাকে আছেন। অমনি তো রাজি হবেন না। মহারাজ স্নান করে বুকে কাপড় জড়িয়ে আসছেন—শশী মহারাজ দু'হাত প্রসারিত করে রাস্তা আগ্‌লে মহারাজকে হাতজোড় করে বলছেন—'মহারাজ, আজ তোমায় ঠাকুরের পুজো করতে হবে; তুমি পুজো করলেই আমার এতদিনের পুজো করা সার্থক হবে।'

মহারাজ—আরে, না না। এ কি বিপদে ফেলছো বল দিকিন্, আমি মন্ত্র-তন্ত্র জানি না।

শশী মহারাজও ছাড়েন না। অবশেষে মহারাজ পুজোর ঘরে ঢুকলেন। আমরা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব। শশী মহারাজ দরজা টেনে দিলেন। মহারাজ মিনিট পনর পরে পুজো সেরে বেরিয়ে এলেন।

মহারাজের জন্য ফল আসত। ফুরিয়ে গেছে। বলাতে শশী মহারাজ বললেন—'ঠাকুরের ফল নাই? তাই থেকে দাও।' ঠাকুরের জিনিসের অগ্রভাগ কি করে দিই!

শশী মহারাজ—তোরা সব মূর্খ। মহারাজ খেলেই ঠাকুরের খাওয়া হবে।

তাই করা হল। মহারাজের ওপর এঁদের কি শ্রদ্ধা!

ঠাকুরের ভোগ দিতেন পুরো আধঘণ্টা। ভোগ দিয়ে বাইরে হাতজোড় করে পাইচারি করতেন আর বলতেন—'প্রাণবল্লভ প্রভু তুমি আমার!' পুনঃ জোরে—'প্রাণবল্লভ প্রভু তুমি আমার!'

Madras Math-এ ঠাকুরের উৎসব। মহারাজ গোলমাল ভালবাসতেন না। তাঁকে আগেই খাইয়ে-দাইয়ে সামনের এক বাড়িতে দুপুরে বিশ্রামের জন্য রাখা হয়েছে। আমি সঙ্গে। তামাক-টামাক কখন কি লাগে! মহারাজ প্রায়ই অন্তর্মুখ থাকতেন। ঘরের মধ্যে বসে স্বগত কি বলছেন—'তখন কি এত জানতে পেরেছিলাম…?' আমি ভাবছি আমায় ডাকছেন। বারান্দা থেকে ভিতরে গেলাম। বললাম, 'আমায় ডেকেছেন, মহারাজ?' মহারাজ বললেন, 'না।'

দলে দলে লোক—জজ-টজ কত লোক যাচ্ছে ঠাকুরের উৎসবে, তাই দেখে স্বগতোক্তি করছিলেন। মহারাজ বললেন—'কাশীপুর বাগানে দেহত্যাগের ৩।৪ দিন আগে ঠাকুর আমায় দেয়াল থেকে তাঁর সমাধিস্থ বসা-ফটো এনে দিতে বললেন।…আমি ফুলও নিয়ে এলুম। ঠাকুর ঐ ছবি মাথায় ঠেকালেন, বুকে ঠেকালেন, তারপর একটি একটি করে ফুল দিয়ে পূজো করলেন। বললেন—এ-ছবি ঘরে-ঘরে পূজো হবে। তাই দেখছি। তখন কি এত জানতে পেরেছিলাম?'

শশী মহারাজ কি সেবাই ঠাকুরের করেছিলেন! কাশীপুরে বালিশের ওপর বালিশ দিয়ে উঁচু করে ঠাকুর হেলান দিয়ে থাকতেন, আর শশী মহারাজ নিজের শরীর দিয়ে পেছনে ধরে রাখতেন। সেই অবস্থায় একহাতে পাখা দিয়ে ঠাকুরের মাথায় বাতাস করতেন। এমনি রাতের পর রাত!"

এসো মা

(গান—ভৈরবী)

স্বামী প্রেমেশানন্দ

শত কোটি শশী হাসে মায়ের চরণ-নখরে।
আলো করে কালরূপ হৃদয়-কন্দরে॥
প্রীতির সাগর উছলে নয়নে
উজল কপোল প্রসন্ন বয়ানে
(আমার) মনে হয় রাখি নয়নে নয়নে
বাঁধি' হৃদি-কারাগারে
তাঁরে চিরদিন তরে॥

বাঞ্ছা বাঁধা পড়ে হৃদয় মাঝারে
কটি মনোহর হর-মন হরে
উরু চারু অতি, চরণ-যুগল
হৃদি বিয়াকুল করে
তাহে চাহে মিশিবারে॥

এসো এসো অয়ি ভুবনমোহিনি
সর্বস্ব আমার, আমার জননী
(তুমি) ফিরে চাও যদি, কৃপা কর যদি
পড়ুক অশনি শিরে
আমি স'ব সাধ করে॥

ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি-সঞ্চয়ন*

স্যর যদুনাথ সরকার

[অনুবাদক—ব্রঃ জ্ঞানচৈতন্য]

১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সৌভাগ্য হয়। তিনি তখন স্যর জগদীশ বোস ও ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বুদ্ধগয়াতে ছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্র, শিল্প এবং লোক-কাহিনীর উপর তাঁর তীব্র সন্ধানী আলোকপাত আমাদের মুগ্ধ করে দিত; ডঃ ঠাকুরের কাছে উহা অধিক সমাদর লাভ করত। ভারতের ঐ সব মহান ঐতিহ্যে প্রকাশের ভঙ্গিমা কবির যদিও সুন্দর হত তবুও তিনি বলতেন যে, নিবেদিতার বাচনভঙ্গী মর্মস্পর্শী এবং বস্তুর নিগূঢ় রহস্য-প্রকাশের ক্ষমতা তাঁর অসীম। গোধূলি বেলায় আমরা বোধিদ্রুমতলে ধ্যানে বসতাম' আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধ যে বোধিবৃক্ষমূলে বসে নির্বাণ লাভ করেছিলেন—এই গাছটি হল তারই মূল বংশধর। অনেকেই জানেন যে, সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ঐ গাছের একটি শাখা কেটে সিংহলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাজা টিসা সেখানে তা প্রোথিত করেন। বোধিবৃক্ষের অনতিদূরে বজ্রক্ষোদিত একখানি বড় মণ্ডলাকার পাথর দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে—উহা ইন্দ্র বুদ্ধকে দিয়েছিলেন। অনেকেই হয়ত ভগিনী নিবেদিতার বইগুলির উপর ঐ বজ্রপ্রতীকটি দেখে থাকবেন। ঐ প্রতীকটি দেখে নিবেদিতা বলেছিলেনঃ এই বজ্রপ্রতীকটি ভারতের জাতীয় প্রতীক হওয়া উচিত। এর তাৎপর্য হল—মানুষ যখন মানুষের সেবায় সব কিছু উৎসর্গ করে এবং ভগবদ্বুদ্ধিতে কর্ম করে তখন সে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী হয়। ঐ প্রতীকটি যে কতখানি বীরত্বব্যঞ্জক নিবেদিতা তা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রতীকটি ভারত থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তিব্বতীয় বৌদ্ধদের মধ্যে উহার প্রচলন রয়েছে।

ঐ সময়ে আমরা নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে বের হতাম। একদিন সুজাতার প্রশ্ন উঠল। সুজাতা খুব সম্ভব উরুবেল গ্রামাধ্যক্ষের মেয়ে ছিল। একটা গাছের নীচে উপবিষ্ট শীর্ণকায় বুদ্ধকে সে স্বর্ণপাত্রে খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করেছিল। কথা বলতে বলতে আমরা সেদিন (এখনকার) উরুবেল নামক গ্রামে পৌছালাম। নিবেদিতা বলে উঠলেনঃ এই এই সেই উরুবেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুজাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন এবং বললেন যে সুজাতা ছিল আদর্শ গৃহী, প্রকৃত সন্ন্যাসীর প্রয়োজন মেটানোই তার কর্তব্য। ভাবোচ্ছ্বাসে নিবেদিতা একতাল মাটি তুলে নিলেন এবং আবেগের সঙ্গে বললেন, "This, the home of Sujata, was sacred soil." অর্থাৎ এই হল সুজাতার জন্মভূমি—এ মাটি অতি পবিত্র।

বর্তমানে যে আন্দোলনের নাম হয়েছে Aggressive Hinduism, উহা নিবেদিতার দেওয়া। আমি aggressive শব্দটা পছন্দ করি না। আমি উহাকে Active Hinduism

* ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা থেকে অনূদিত

বলতে ইচ্ছা করি। কারণ aggression-এর সঙ্গে খানিকটা জোর-জবরদস্তির ভাব রয়েছে। উহার অর্থ হচ্ছে—স্বার্থপরতা, নিয়মলঙ্ঘন এবং অপরকে ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করা, যেমন বর্তমানে (১৯৪৩ এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে) জাপান ও জার্মানী করছে। যাঁরা দর্শনশাস্ত্রাদি পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে সেখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়—Passivism এবং Activism। Passivism-এর অর্থ হচ্ছে সব সময় আত্মপক্ষ বাঁচিয়ে চলা। আর হিন্দুধর্ম তাই করে আসছে; ইহা কখনও অপর জাতিদের ধর্মান্তরিত করেনি। Brother Douglas নামে একজন ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান মিশনারীকে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি ভারতে পাঠান। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "যদুবাবু, অঙ্ক কষেই বলে দেওয়া যায় যে হিন্দুজাতি নিঃশেষ হয়ে যাবে, কারণ আপনারা আপনাদের সম্প্রদায়ে আগন্তুক ব্যক্তিদের স্থান দেন না।" একথা খুবই সত্য যে, যদি ধর্মান্তরিতকরণ না করা হয় এবং হিন্দুধর্ম যদি প্রগতিশীল না হয় তবে একশ-দেড়শ বছরের মধ্যে হিন্দুজাতির বিলুপ্তি ঘটবে। তাই নিবেদিতা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের নবজাগরণ এবং প্রগতিশীলতা। তিনি বুদ্ধকে হিন্দুধর্মের সংস্কারক বলে মনে করতেন, হিন্দুধর্মের বিরোধী কোন পৃথক সম্প্রদায়ের স্রষ্টা বলে মনে করতেন না। বৌদ্ধধর্মের একটা মূল লক্ষ্য ছিল—হিন্দুসমাজ ও তার জীবনধারাকে সংশোধিত করা। বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ইউরোপ, চীন, জাপান এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়েছিল ধর্মান্তরিতকরণের উদ্দেশ্যে এবং সংশোধিত হিন্দুধর্মবিস্তারের জন্য। আমি এখানে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণ অর্থ ছেড়ে ব্যাপক অর্থ ব্যবহার করছি।

বুদ্ধ এবং অশোক উভয়েই ধর্মের দ্বারা মানুষের নৈতিকতা এবং সত্যবাদিতার উপর জোর দিয়েছেন। যুগপ্রয়োজনে প্রতি যুগে একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়—যাকে বলে অবতার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ব্রাহ্মসমাজ ভারতীয় সংস্কারের পুরোধা হতে গিয়ে বঞ্চিত হল এবং দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস এলেন। শিখধর্ম হিন্দুধর্মের ভিতরে থেকে সংস্কারে যত্নবান হল। শিখদের ধর্মপুস্তক 'আদিগ্রন্থে' আমরা দেখতে পাই—তাতে গুরু নানকের উপদেশ রয়েছে পঞ্চাশ ভাগের কম এবং অর্ধেকের বেশী রয়েছে দাদূ কবীর প্রভৃতি হিন্দুসাধকদের উপদেশ। নিবেদিতা সব সময় জোরের সঙ্গেই বলতেন যে, বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুসংস্কারক; তাঁর প্রচারকেরা হিন্দুধর্মের পবিত্র নৈতিক দিকটাই প্রচার করেছেন। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন যে, অপরদের এমন কি খ্রীষ্টানদের কাছেও হিন্দুধর্মের কিছু দেবার আছে। হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা অধিক যুক্তিসিদ্ধ। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে যে, মুক্তি কেবলমাত্র খ্রীষ্টে বিশ্বাসের ভিতর দিয়েই আসবে। আজকাল বহু খ্রীষ্টান বিশ্বাস করে না যে, শয়তান একটা বাস্তব সত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ। শয়তান হচ্ছে প্রতি হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তির রূপক মাত্র। নিবেদিতা বলতে চাইতেন যে, হিন্দুধর্মের মৌলিক তত্ত্বগুলি থেকে—যা আমাদের কোন বিধিবদ্ধ সংকীর্ণ মতবাদকে জোর করে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে না—এ জগৎ বহু কিছু পেতে পারে। পূর্বোক্ত হিন্দুধর্ম কোন ধর্মমত বা মতবাদ নয়, এবং যে-কেউ এমন কি খ্রীষ্টানরাও উহা অভ্যাস করতে পারে। নিবেদিতা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং আচার-পদ্ধতির মৌলিক সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। অতীত ভারতের বস্তুনিচয় এবং চিন্তারাজি উল্লেখ করবার কালে তাঁর জীবন্ত

সহানুভূতি এবং অদ্ভুত বাচনভঙ্গী প্রকাশ পেত।

এর কিছু পরেই বাংলাদেশে ফিরে তিনি Kali the Mother-এর উপর বক্তৃতা শুরু করলেন। আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না যে, সে সময় ঐ বক্তৃতার নাম শুনলেই কলকাতার শিক্ষিত হিন্দুদের মনে কী বিভীষিকার সঞ্চার হত! তাঁদের কালী সম্বন্ধে এক বিকট ধারণা ছিল…। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এবং পণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন অত্যধিক যুক্তিবাদী এবং একটু নাস্তিক গোছের লোক। তিনি বলেছিলেন—কারো কালীঘাটে গিয়ে কালীদর্শন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতার কালী-শীর্ষক বক্তৃতার সভাপতি পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়ল। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এন. এন. ঘোষ প্রথমে রাজী হয়েছিলেন, পরে পিছিয়ে গেলেন। নির্ভীক নিবেদিতা বিনা সভাপতিতে আলবার্ট হলে বক্তৃতা শুরু করলেন। তিনি বললেন: মা কালী তমোনাশিনী, অসুরমর্দিনী। তিনি নৈতিক শক্তি ও সাহসের মূর্ত প্রতীক। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—পরমাত্মা কোন দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা লভ্য নন। এইভাবে নিবেদিতা কালীপূজার ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতের দিগ্‌দর্শন করলেন।

ভারতের বর্তমান অধঃপতন এবং দুর্বলতা দেখে নিবেদিতা দুঃখে কাতর হয়ে পড়তেন। তিনি চাইতেন ভারতীয়েরা জগৎসভায় সাহস ও সম্মানের সঙ্গে নিজেদের স্থান দখল করুক। তারা মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হোক। আমাদের দেশে এমন কতিপয় মহাপুরুষ সব সময়েই থাকবেন, যাঁরা ধ্যানধারণা এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিজেদের যোগসূত্র স্থাপন করবেন। এবং যাঁরা তা পারবেন না তাঁদের উচিত বৌদ্ধিক-জগতে নিত্যনূতন গবেষণা এবং মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করে সমগ্র বিশ্বে দান করা। একমাত্র এই পথেই আমরা বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্য স্থান পেতে পারি। সুতরাং যখনই কেউ কোন ভারতীয় সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা করতে এগিয়ে আসত, নিবেদিতা আনন্দে আটখানা হয়ে যেতেন। ঠিক এই কারণেই তিনি স্যর জে. সি. বোসকে খুব সম্মান করতেন এবং নিজের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করতেন। একজন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেছিলেন যে, ডঃ বোসই প্রথম পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে ভারতের স্থান নির্দিষ্ট করেন; যদিও পরবর্তীকালে রমণ প্রভৃতি মনীষীরা বহু মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। বর্তমান লেখক পারস্যভাষার পাণ্ডুলিপি থেকে ভারতের ইতিহাস-গবেষণার ব্যাপারে নিবেদিতার কাছ থেকে বহু উৎসাহ পেয়েছেন।

নিবেদিতা ভারতের বহু তীর্থস্থান দর্শন করেছেন। তিনি ঐ কালে নিষ্ঠাবান হিন্দু তীর্থযাত্রীদের মত ক্লেশ ও নিয়ম পালন করতেন। তাঁর তীর্থমাহাত্ম্য-কীর্তনের ভঙ্গীটি ছিল সুন্দর ও সাবলীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ—হরিদ্বার ও প্রয়াগ, যেখানে দুটি করে স্রোতস্বিনীর মিলন ঘটেছে। এই পবিত্র সঙ্গমস্থানগুলিতে দাঁড়িয়ে স্বতই মনে হয় যে, যদিও উহাদের ধারাগুলি বিভিন্ন তবুও উহারা একত্র মিলিত হয়েছে এবং একই লক্ষ্যে—সেই সমুদ্রে পৌঁছুবে। সেরূপ আমাদের লক্ষ্য যদি ঈশ্বরানুভূতিই হয় তবে আমাদের সাধনপথ যত রকমেরই হোক না কেন, আমরা শেষে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরেই পৌঁছুব। সেজন্যই তো উত্তর-ভারতের তীর্থগুলি গঙ্গার তীরে এবং দক্ষিণ-ভারতের তীর্থগুলি গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীর তীরে গড়ে উঠেছে। কই,

মাড়োয়ারের মরুভূমিতে তো তীর্থ গড়ে ওঠেনি!

কোন বস্তুর মাহাত্ম্য-নিরূপণে নিবেদিতার অপূর্ব দূরদর্শিতা এবং সন্ধানী শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত। ভারতের অনেক পূজানুষ্ঠান, আচার-নিয়ম এবং চিরাচরিত প্রথাসমূহের অন্তর্নিহিত কারণগুলি আমরা ভুলে গেছি, কিছু আমরা অন্ধের মতো বিশ্বাস করি এবং কিছু আমরা পুরোহিতদের কথা মেনে নেই—কিন্তু ভগিনী ঐগুলিকে স্ব স্ব রঙে রাঙিয়ে, উহাদের গুরুত্ব এবং অভিনবত্ব আরোপ করতেন এবং উহাদের যৌক্তিকতা দেখিয়ে দিতেন। প্রথম তিনি The Web of Indian Life বইখানি লেখেন এবং হিন্দুদের বিভিন্ন প্রথার উপর নবালোকপাত করেন। এই ধরনের তিনি অনেক বই লিখেছিলেন।

ভারতীয় শিল্পের তিনি একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতীয়দের যে-কোন মৌলিক গবেষণায় নিবেদিতার আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। তিনি The Modern Review পত্রিকাতে শিল্পের উপর মন্তব্য লিখতেন এবং শরীর যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (১৯০৮-১১) বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' ছবি যখন The Modern Review-তে প্রকাশিত হল তখন নিবেদিতা খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি শিল্প-সমালোচনা লিখতেন এবং আমাদের তরুণ শিল্পীদের ত্রুটি দেখিয়ে দিতেন। তিনি দক্ষ শিল্প-সমালোচক ছিলেন এবং ইউরোপের শিল্প আগাগোড়া পড়েছিলেন। ভারতীয় শিল্পের ব্যাপারে বেঙ্গল স্কুল তাঁর বহু সাহায্য পেয়েছে। অজন্তার চিত্রাবলী তাঁকে বিহ্বল করে দিত। রাহুল ও যশোধরার ছবিটি তার মধ্যে অন্যতম। কত যুগ পূর্বেকার সেই চরিত্র দুটি যশোধরা ও রাহুল! কিন্তু তাদের চোখ ও মুখের অভিব্যক্তি নিবেদিতার কাছে জীবন্ত বলে মনে হত। অজন্তার প্রাচীর-চিত্রাবলীর তিনি খুব প্রশংসা করতেন এবং বলতেন ওর ভিতর ভারতীয় শিল্পের যথার্থ ছাপ রয়েছে। এলিফাণ্টা গুহার ত্রিমূর্তিটিকে তিনি বলতেন, 'The Synthesis of Hinduism in Stone' অর্থাৎ একখণ্ড প্রস্তরে হিন্দুধর্মের সমন্বয়।

নিবেদিতা রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ভারতের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার চাইতেন। ভারতের মুক্তিফৌজের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত যখন রাজনৈতিক ব্যাপারে বন্দী হন, তখন তাঁর জামিন হবার জন্য কেউই এগিয়ে আসতে সাহস পেল না। সকলে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল নিবেদিতা ডঃ দত্তের জামিন হবার জন্য কোর্টে উপস্থিত। ভারত-দরদী এবং ভারতের স্বাধীনতাকামী নিবেদিতা বলতেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে লাহোরের রণজিৎ সিংহের একত্র মিলন হওয়া দরকার; অর্থাৎ ভারতের রাজনৈতিক পুনরভ্যুত্থান-ক্ষেত্রে বাংলার বুদ্ধিমত্তা এবং পাঞ্জাবের সাহসিকতা পাশাপাশি থাকা দরকার। তিনি জাতীয়তাবাদীদেরও জাতীয়তা-বাদী ছিলেন।

ভারতমাতাকে তিনি নিজের জন্মভূমিরূপেই গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সুন্দর মহান বৈশিষ্ট্যগুলির খুব প্রশংসা করতেন। এ ব্যাপারে লণ্ডনে একবার একটা ঘটনা ঘটে। ভারতে কর্তব্যরত একজন ইংরেজ অফিসারের স্ত্রী একটি সভায় ভারত-সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে বলেন, 'Immorality prevails in the harems of the Indian gentry.' অর্থাৎ ভারতের

ভদ্রসমাজের অন্দর-মহলে অনৈতিকতার ছড়াছড়ি রয়েছে। নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে বক্তার কথার যথার্থতা-প্রমাণের ব্যাপারে প্রশ্ন তুললেন। বক্তা বেগতিক দেখে নিবেদিতার কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন যে তিনি উহা একজন ভারতীয় মিশনারীর কাছে শুনেছেন। নিজে না জেনে একটা জাতির উদ্দেশ্যে এরূপ অর্বাচীনের মত কথা বলায় নিবেদিতা তাঁকে খুব তিরস্কার করলেন।

পূর্বকথিত ঘটনাবলীর মধ্য থেকে আমরা পাই নিবেদিতা কতভাবে না ভারতের পুনরভ্যুত্থানের ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন। আমাদের সংস্কৃতির মূল্যায়ন, প্রগতিশীলতা এবং ধর্মান্তরিতকরণের ভিতর দিয়ে হিন্দুধর্মের সংস্কারের চেষ্টা, গণজীবনের প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং আন্তরিকতালাভের জন্য আহ্বান এবং ভারতীয় শিল্পের মহিমাখ্যাপন প্রভৃতির দ্বারা ভারতের প্রতি বিভিন্নভাবে তিনি তাঁর মহান কর্তব্য সমাপন করে গেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার অকাল প্রয়াণে রামকৃষ্ণ মিশন যোগ্য বাণীমুখর মুখ এবং শক্তিশালী লেখনী হারিয়েছে। আর ভারত হারিয়েছে এমন অনেক কিছু যা এখনও সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর।

কুণ্ঠা, লজ্জা, শঙ্কা

শ্রীকালিদাস রায়

নানা কুবচনে ক্লিন্ন অশুচি কণ্ঠ মোর
তব নাম তায় হে প্রভু গাহিতে কুণ্ঠা পাই।
নানা অপরাধে আবিল মলিন জীবন মোর
মার্জনা তায় হে প্রভু চাহিতে কুণ্ঠা পাই।
নানা চিন্তায় কুটিল চিত্তে শুচিতা নাই
সেথায় তোমায় হে প্রভু ডাকিতে লজ্জা পাই।
যেই শিরে বহি যত কুৎসিত পাপের ভার
তোমার চরণে সে শির রাখিতে লজ্জা পাই।
হিংসায় প্রতিহিংসায় মোর হৃদয়ের মাঝে শান্তি নাই
সে হৃদয়ে তোমা স্মরণ করিতে শঙ্কা পাই।
তোমার রুদ্রমূর্তির কথা ভাবিতে চিত্ত কাঁপিয়া উঠে
তোমারে তাহাতে বরণ করিতে শঙ্কা পাই।

ধর্ম ও সমাজে আনুষ্ঠানিকতা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

আনুষ্ঠানিকতার বিপক্ষে ও সপক্ষে অনন্তকাল ধরেই অনন্ত মতবাদ-আলোচনার প্রচার হয়েছে। আনুষ্ঠানিকতা নিরর্থক আচার-নিয়ম মাত্র মনে হয়েছে কারুর। কারুর মনে হয়েছে অন্যদিক দিয়ে, তাতে সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য আছে, রূপ-রুচিময়তা আছে; অতএব থাকে থাকুক। আবার কেউ ভেবেছেন এবং বলেছেন, রূপ-রুচির দিক দিয়ে নয়, নিরর্থকতার দিক বিচারও নয়, বলেছেন আরো এক গভীর সুন্দর কথা, যে কথাটী হল কথামৃতে ঠাকুরের উক্তি, "তোমরা নৈবেদ্য করবে, ফল বিল্বপত্র বাছবে, পুষ্পপাত্র সাজাবে, চন্দন ঘষবে···মন ভালো থাকবে, মন ভালো হবে ·।"

কেন? তা, ঠাকুর ব্যাখ্যা করে বলেননি, কোনো অনুষ্ঠানে কিছু সত্য থাক বা না থাক করা উচিত, কেননা করলে "লোকসংগ্রহ" (গীতার ভাষায়) হয়—এমন কথা উপদেশ দেননি। বলেননি যে, বিশ্বাস কর বা না কর,—'লোক দেখিয়ে' করে যেয়ো, শুধু আচার-নিয়ম পালন করার মতই করে যেয়ো। এসব কিছুই যুক্তি দেননি। শুধু মিষ্ট স্নেহে—স্মিত হেসে বলেছেন 'মন ভালো থাকবে' অর্থাৎ ভালো কাজ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তোমাদের মনকে ভাল দিকে নিয়ে যাবে। ঠাকুরের কথার টীকা 'টীকাভাষ্য' করি এমন ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু আমি পড়ে আর নানা পূজার আচার-অনুষ্ঠানের জগতে মিশে বারে বারেই উপলব্ধি করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি—ঐ 'মন ভালো থাকার' পরম সত্য তাতে। এবং তার অর্থ গভীর।

দেখেছি আনুষ্ঠানিক কৌলিক পূজাবাড়ি দোল রাস দুর্গোৎসবের দেওয়ালীর দিনে সকল শ্রেণীর সব স্তরের মানুষের মিলে মিশে ঐ 'দেবকর্ম' নৈবেদ্য-সাজানো পুষ্পপাত্র-রচনা চন্দন-ঘষা আদি মঙ্গল কাজ করা, পরম প্রসন্নতায় মিশে যাওয়া। ঠাকুরের উক্তির সত্যতা—'মন ভালো থাকবে'।

এখন বলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পূজা আচার-অনুষ্ঠানের কথা। তাতেও তো দেখি, মানুষ আচার-আনুষ্ঠানিকতাহীন উৎসবে—মাঙ্গলিক উৎসবে ফলফুল, পবিত্র জল, আলো, অন্ধকার, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড়, সাগর, পৃথিবী থেকে আনন্দ গ্রহণ না করে থাকতে পারে না। কে কোন্ পূজায় কোন্ প্রেমে, কোন্ ভালবাসাতে উপকরণ বাদ দিয়ে, অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে পূজা-প্রেম ভালবাসাকে আনন্দময় রূপে গ্রহণ করতে পেরেছে?

সবাই জানেন হিন্দুদের যত আচার-বিচার শুচিতাবোধ বাইরে প্রবলভাবে আছে যেমন দেখা যাবে, তেমনি দেখা যাবে হিন্দুরা সবধর্মসমন্বয়ী জাতি; সর্বগ্রাহী, সর্বধর্মে শ্রদ্ধাবান, সর্বমতে সহিষ্ণু ও সংস্কারমুক্ত তাদের জাতি, স্বভাবে ও মনে। যে বৈশিষ্ট্য অনেক সম্প্রদায়েরই নেই। হয়ত থাকলেও তাঁরা নিজ সম্প্রদায়কে ভয় করে সেটা প্রকাশ করতে পারেন না। অথচ সবাই বলেন হিন্দুরা আনুষ্ঠানিকতাপ্রিয়, আবার নিয়ম মেনে চলা জাত, প্রতিমা-প্রতীক-উপাসক এক বিশাল ধর্মসম্প্রদায়। যদিও আচার-নিয়ম-অনুষ্ঠানহীন ধর্মকর্মের পথের নির্দেশও তাতে কম নেই। আবার ঠাকুরের কথাই

মনে পড়ে, দেখি "তাঁকে লাভ করলে কর্ম (অনুষ্ঠান ?) আপনিই ত্যাগ হয়ে যায়।"

সে কথা থাক। যা আমাদের মনে হচ্ছে, তা হচ্ছে যে, আনুষ্ঠানিকতাটার সবটাই কি দোষের ? মানুষ কি জীবনের কোনো জায়গায় আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিতে পেরেছে ? প্রতি-দিনের মোটা স্থূল প্রয়োজনের আড়াল থেকে তার মানব-মনটী থেকে থেকে প্রয়োজনকে ভুলে গিয়ে সরিয়ে রেখে বিনা-প্রয়োজনের বস্তুকে—আলো বাঁশী গানকে বর্ণে রংএ স্বরে ফুলে গন্ধধূপদীপের সমারোহকে চারদিকে জড় করেছে। কখনো সুরভি সুবাস, কখনো সুন্দর, কখনো দীপাবলীতে প্রদীপে দীপে, কখনো রংএ বর্ণে তার ঘর সাজায়নি, মন ভোলায়নি ? কোন্ জাতি সম্প্রদায় অনুষ্ঠানকে বাদ দিতে পেরেছে তার জীবন থেকে, সমাজ থেকে ? সকল জাতেরই দেখি জন্মোৎসব বিবাহ মিলন-উৎসব নানা প্রয়োজনের উৎসবকে আর ধর্ম-উৎসবকেও, জীবনের 'দশকর্ম' সকল প্রয়োজনীয়কে অপ্রয়োজনীয়ের রংএ রংএ রঞ্জিত করেছে। কথা সুরে কাব্য গান রচনা করেছে। গান গেয়েছে। ধূপে দীপে সুরভিত আলোকিত করেছে। এও তো অনুষ্ঠান। এও তো প্রতীকময়তা মানব-মনের পূজার আকাঙ্ক্ষায়।

এবং এই আনুষ্ঠানিকতাকে বরণ করেনি এমন মানবজাতি নেই। সুসভ্য সভ্য অসভ্য বর্বর সব জাতিই, নিরীশ্বর একেশ্বরবাদী বহু-দেববাদী সকলেই কোনো না কোনো রকমে আনুষ্ঠানিক। স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন, "দেওয়াল চুরি করে না। গরু মিথ্যা কথা বলে না।" আমরা সেই বাক্য অনুসরণ করেই বলতে পারি মানুষ পশু নয়, মানুষ জড় নয়, তার মন আছে, কল্পনা আছে; বিশ্ব-জগৎ-অতিরিক্ত এক আশ্চর্য জগৎ আছে—মনোজগৎ; প্রত্যহের প্রয়োজনকেই সে সবচেয়ে বড় মনে করেনি। এক মহা ও মহান্ অপ্রয়োজনীয়ের জগৎ আছে তার, সেই জগৎ হ'ল রূপরসগন্ধময় ঐশ্বর্যের আনন্দঘন মনোজগৎ—যা বারে বারে পৃথিবীর আকাশের রূপের সাগরে ডুবে যায়, ভেসে যায় সেই কোন্ জগন্নাথের জগন্ময়ের রূপকে দেখার জন্য —আচারে অনুষ্ঠানে পূজায় মিশিয়ে অনুভব করার জন্য। তাই তার ফুল চাই, আলোর প্রদীপ চাই, গান চাই, নৃত্য চাই। তার আনুষ্ঠানিকতা চাই।

দেখি বারে বারে মানব-সমাজে মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। জগতের বিচিত্ররূপ-স্রষ্টাকে, অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে, রূপগুণহীন 'অরূপকে' কখনো সগুণ রূপময় প্রতীকেই আবার নির্গুণ ব্রহ্মরূপেও ধারণা করার কথা তাঁরা বলে গেছেন। বেদ উপনিষদের কাল থেকে আধুনিক কাল অবধি সে রূপ দেখার, অনুভবে উপলব্ধিতে জানার চেষ্টার আজো শেষ হল না। অনামা মুনি ঋষি তপস্বী থেকে বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ চৈতন্য নানক কবীর রামমোহন রামকৃষ্ণ অবধি তা চলে এসেছে। তবু সেই 'অরূপের' রূপও নির্ণয় করা গেল না এবং 'রূপের' মহিমা-বর্ণনারও শেষ হল না।

আমাদের শুধু মনে হচ্ছে, যদি মানুষ জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে আনুষ্ঠানিকতা রাখাতে 'আনুষ্ঠানিক' না হয়, দেবার্চনায় পূজা-অনুষ্ঠানে কেন আনুষ্ঠানিকতা নিন্দিত হবে ?

যাদের ধর্মে কোনো প্রতীক-উপাসনাই নিষিদ্ধ, তাঁদের ধর্মমন্দিরেও দেখি যে-মহামানব ধর্মজিজ্ঞাসা জাগিয়েছিলেন, প্রচার করেছিলেন, তাঁরই বেদনাদগ্ধ ক্রুশবিদ্ধ করুণাময় মূর্তি;

কোথাও জননীর কোলে মাতৃমূর্তির কোলে শিশু দেবপুত্র-মূর্তি।

মানুষ সেখানে ফুল এনেছে পূজায়। প্রদীপ জ্বেলেছে পাদপীঠে। পয়সা এনেছে প্রণামীর। মানুষ যে-কোনো রকমেই নিজেকে কিছু অনুষ্ঠান দিয়ে প্রকাশ করতে চায়। সেখানে সে শুধু ঈশ্বরপুত্র বা মানবপুত্রকে কল্পনাতে ধ্যানই করেনি, নতজানু হয়ে আত্মনিবেদন ও প্রণাম করেছে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মসজিদে কোনো প্রতীক নেই। কিন্তু তাঁদেরও অর্চনা করার উপাসনার সময়ে একটী বিশেষ 'দিক' আছে; আমাদের 'পূর্বাস্য', 'উত্তরাস্য' হয়ে পূজা-অর্চনা করার মত। অনুষ্ঠান নেই; কিন্তু অঙ্গশুদ্ধি আছে—বিশেষভাবে ওঠা, দাঁড়ানো, নতজানু হয়ে বসা, প্রণাম জানানোর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী আছে।

তা ছাড়াও অনুষ্ঠানহীন অনুষ্ঠান আছে; পীর সাহেবদের আস্তানায় তাঁদের কবরখানায়। 'সত্যপীর সিন্নি'দান অর্চনায় হিন্দু মুসলমান দেবতার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে। আধি-ব্যাধি-ত্রিতাপ-দগ্ধ নরনারী হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সেখানে আসেন। আমরাও গিয়েছি পীরসাহেবের কবরস্থলে, 'সাঁই'বাবার ('সাঁই' স্বামী প্রেমানন্দ) আস্তানায় সেখানে 'লোবান' (ধুপ), ময়ূর-পাখার চামর, সিন্নি অর্থাৎ মিষ্টান্ন রেউড়ী, বরফী পট্টবস্ত্রাবৃত কবরের সামনে সকলে রাখেন। লোবান জ্বেলে দেন। সাঁই ফকীর-সাহেব ময়ূর-পাখার চামর তুলিয়ে দেন কবরে. তুলিয়ে সেটী ভক্তদের গায়ে ছুঁইয়ে দেন। নিবেদন-করা প্রসাদ—থালা-ভরা মিষ্টান্ন, বরফী, জিলাপী, রেউড়ী আমরা সকলেই ঘরে নিয়ে আসি; এবং আশ্চর্য, হিন্দুরা তা প্রসাদ বলে গ্রহণ করেনও! ফকীর-সাহেবের উপদেশ শোনেন। ঝাড়ানো নেন আধিব্যাধিতে। কবচ, মাদুলীও তৈরী করিয়ে নেন। আরো দেখি পরম শোকের প্রকাশ তাঁদের মহরমে, সেও তো আনুষ্ঠানিক শোক! শোককারীর পরিচ্ছদের ইমামী রং (সবুজ) পরার বিশেষ বিধি।

বুদ্ধদেব আনুষ্ঠানিকতা, যাগযজ্ঞ করার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধর্মবচন সংক্ষেপে চারটি বচনে ও চারটি 'মুদ্রায়' ব্যক্ত হয়েছে। 'মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা।' সর্বভূতে মৈত্রী, সর্বজীবে করুণা, সবার আনন্দে আনন্দ, কারুর দোষে উপেক্ষা। তখন তাঁদের কোনো মন্দির দেবালয় ছিল না। দেবতাও ছিলেন না। গ্রন্থে গ্রন্থে শিষ্যদের শ্রুতি ও স্মৃতিতে সঞ্চিত উপদেশ-সমষ্টিই ছিল শুধু।

কিন্তু তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর—কতদিন পরে বলা যায় না—তাঁকেই লোকে দেবতা করে নিলেন! মন্দিরে, মঠে, স্তূপে অর্চনা করছেন। সেখানেও ধুপ, দীপ, মালা, ফুল, ঘণ্টাবাদ্য, 'জপচক্র', 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'-মন্ত্র-উচ্চারণ, মালা ফুল ঘণ্টাবাদ্য, নাম গান অনুষ্ঠানের প্রথা রয়েছে! চিত্রে চিত্রে মঠ, গুহা, মন্দির সাজানো হয়েছে। তাঁরই কথাকীর্তি ইতিহাসের চিত্রলেখায়—শিল্প-কারুকাজে বন-অরণ্যময় পাহাড়ের নিভৃত গুহা-মন্দিরে মানুষ তার শিল্পী মনের আনুষ্ঠানিক মানস পূজা চিত্রিত করেছে রূপের অক্ষরে!

এও একরকম নীরব শিল্পকলাময় পূজারই অনুষ্ঠান। শাঁখ ঘণ্টা নাই বাজুক, নৈবেদ্য-সম্ভার নাই সাজাক কেউ, কিন্তু এই মানস পূজার প্রতিমা তো তাঁরই—প্রতীক-উপাসনা—কীর্তি-কাহিনীর আর ইতিহাসের। সঙ্গে সঙ্গে এলো বিরাট বিশাল ধ্যানমূর্তি তাঁরই। বুদ্ধগয়ায় প্রাচীরে প্রাচীরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ মূর্তির শেষ নেই। তিনিই ঈশ্বর, তিনিই বুদ্ধদেব।

বিহার থেকে গান্ধার অতিক্রম করেও সে মূর্তি চীন, জাপান, বর্মায়।

তারপর কতদিন পরে এলেন গুরু নানক। সব মানলেন—রাম হ্যায় ভগবান। আবার 'ঈশ্বর এক' বলে গেলেন। বললেন, তিনি অরূপ—প্রতিমাতে নেই, মন্দিরে নেই। তিনি বিশ্বময়, তিনি জগন্ময়, তিনি মনোময়। নিজেকে বললেন, "নিরঙ্কারী নানক" (নিরাকারী)।

তবু গড়ে উঠল সোনার মন্দির চতুর্থ গুরু রামদাসের আমলেই। সোনার কাজে মীনা-কারে কাজে রূপে সমৃদ্ধ জলাশয় মধ্যবর্তী আশ্চর্য সুন্দর মন্দির। আরও আশ্চর্য সেখানে হল বেদী। তাতে প্রতিমা নয় কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হলেন গ্রন্থাবলী। গুরুদের উপদেশামৃত কথামৃত। 'গ্রন্থসাহেব' নামে।

তিনিই প্রতিমা? তিনিই দেবতা? তিনিই ঈশ্বর? হ্যাঁ, তিনি গুরু এবং গ্রন্থরূপে—গুরুরূপে ঈশ্বর!

তারপর আরম্ভ হল মানুষের মনের ভিতরের ভক্তসভা—সেবক-শিষ্যের পূজার অনুষ্ঠান। স্বর্ণখচিত মন্দির হল। ভোগ এলো কড়া প্রসাদের (মোহনভোগ, হালুয়া)। ফুল, ফুলের মালা সাজানো হল বেদীর উপর, "গ্রন্থ সাহেবের" গায়ের উপর। চামর দিয়ে ব্যজন করা হল। প্রণামী পড়ল থালা ভরে। আর হল অপূর্ব সঙ্গীত দিয়ে স্তুতি অর্চনা অহোরাত্র ধরে। এক গায়কদল চলে যান, আবার নতুন গায়ক এসে গান, ভজনে সঙ্গীতে অন্তরের নৈবেদ্য নিবেদন করে যান। গ্রন্থসাহেবই দেবতার বা ভগবানের প্রতীক হয়েছেন যেন। ঐ গ্রন্থসাহেবকেই ভক্তমণ্ডলী গড় হয়ে প্রণাম করে যায় দলে দলে। 'মানসিক' জানায় আধিব্যাধিতে

তারপর দেখি ব্রাহ্ম-সমাজের অর্চনা-উপাসনার বেদী। সেখানেও মালা-ফুল, ধূপ-সুরভির সুবাস ভরে ওঠে। বেদীর ওপর আচার্য বসেন ধর্মপ্রবক্তা—ব্যাখ্যাকর্তা। দেবতা নন। কিন্তু যেন দেবত্বেরই অংশ, রূপ! দেবতার মতই বিশেষ সম্ভ্রম, পূজা-প্রণামের অধিকারী তিনিও তো সেসময় সেদিনের মত!

কোথায় ঈশ্বর? কোথায় দেবতা? তাঁরা আচার্যরা বাণীময় বাণীরূপ ঈশ্বরকে অনুভব করছেন। তাঁরই বাণীময় প্রকাশ সকলে শুনছেন।

যে ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না; যিনি সর্বব্যাপী তাই অনধিগম্য; যিনি সর্বময় কোনো এক জায়গায় তাঁকে পাই না। তাঁর বাণীময় স্তব করি! আর তাতেই তাঁকে আমাদের সীমার মধ্যে চাই, রূপে-রসে-আনন্দের মাঝে চাই। তাই তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট ফুলে ফলে রংএ রূপে সাজাতে চাই অনুষ্ঠান করে। 'তিনি আছেন' জেনেও জানাতে চাই বার বার—তিনি 'রূপে' আছেন; 'অরূপে' আছেন; 'সীমায়' আছেন; 'অসীমে'ও আছেন। ঠাকুরের উক্তিতে, তিনি সাকার; তিনি নিরাকার; তিনি আরো কি যে কে বলতে পারবে! "একসেরী ঘটীতে কি পাঁচসের দুধ ধরে?" (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে) "মানুষ তাঁকে কি করে বুঝবে?"

রবীন্দ্র-সাহিত্যেও শিব অন্নপূর্ণা হর-গৌরীর ভাবের কত ভাবে যে কত ব্যাখ্যা পাই! সরস্বতী বাণী বীণাপাণির লক্ষ্মী কমলাসনার রূপক ব্যাখ্যাও কম নেই। আনুষ্ঠানিকতা না মানা হোক, কিন্তু আনুষ্ঠানিক যুগযুগান্তের পৌরাণিক রূপ কবির কবিমানস কতরূপে 'রূপায়িত' করেছে, উপমায় তুলনায় নব নব ভঙ্গীতে রূপেতে। কবি পৃথিবীর বিচিত্র রূপের সঙ্গে পুরাণ-ইতিহাসের ও বিচিত্র দেবদেবীর

'রূপক' রূপ দেখেছেন। পরম শ্রদ্ধায় যে কল্পনা বা আদর্শকে সাহিত্যে গ্রহণ করেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন। হরগৌরী লক্ষ্মী সরস্বতী থেকে শ্রীরাধাও ভানু সিংহের পদাবলী 'বৈষ্ণব কবিতাতে,' তাঁর সাহিত্যে নানা জায়গায় সব দেবদেবীই প্রবন্ধ-কাব্যে কত ভাবের উপমা-ঐশ্বর্যে ছড়িয়ে আছেন।

যদিও অনেক সময়ে তাঁর লেখায় পড়ি, অনুষ্ঠানের আচারের প্রাণহীনতার কথা। আবার দেখি, আনুষ্ঠানিকতার রূপও তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তাও বড় কম নয়। 'জাভাযাত্রী'তে কবি এক জায়গায় বলেছেন, 'উৎসবের অন্তর্নিহিত সুন্দর ঐক্যবন্ধনই সমস্ত জাতের লোককে আপনিই সংযত করে রেখেছে'··· ওতেই অন্যত্র দেখি 'এই রকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দ-মিলনটি কি কল্যাণময়!···' এই মিলনের বিচিত্র অবয়ব। বহু লোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্যে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে তো সেইখানেই আসীন দেখি।··· 'আনন্দকে সুন্দরকে নানা অনুষ্ঠানে নানা মূর্তিতে প্রকাশ করা চাই।·· এবারে যাঁর শ্রাদ্ধে আমরা এসেছি তাঁরা দেবত্ব পেয়েছেন বলে আত্মীয়েরা স্থির করেছে তাই এত ঘটা···।··· কেননা আধুনিক কাল তার কাটারী হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব করার জন্য; তার একমাত্র উৎসাহ-উপকরণ বাহুল্যের দিকে।' (জাভাযাত্রী)

আচার-অনুষ্ঠান মনকে নিয়ে যায় তাঁর দিকে। কোন্ পথ দিয়ে, কিসের ভেতর দিয়ে তিনি টেনে নিয়ে যান আমাদের তাঁর কাছে, তা তিনিই জানেন। যা কিছু মনকে তাঁর দিকে টানে, তাই-ই শুভকর।

"ওঁ অব্যাবৃত-ভজনাৎ"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার ভবন-দ্বারে মোর মন করী
বাঁধা থাক, হে ঈশ্বর, দিবস শর্বরী
অনুক্ষণ ভাবনার ভজনা-রজ্জুতে!
আমার হৃদয়-পাত্র ভক্তির মধুতে
তবে তো ভরিবে, প্রভু, কানায় কানায়
তুমি যদি নিশিদিন থাকো চেতনায়।
প্রেমের কাঙাল আমি; সে প্রেম পরম-
যে-প্রেমে রয়েছে পরিতৃপ্তি অনুপম!
আছে সিদ্ধি, অমৃতত্ব! সে-ভালোবাসায়
ধনী হ'লে মন আর কিছু নাহি চায়।
বাতাসেরই মতো চিত্ত কারও বশ নয়।
কৃপা হ'লে তবে তাঁতে সব মন হয়!
তাই তো চরণে তব নিয়েছি শরণ!
এ মন তোমাতে রাখো পতিতপাবন!

মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী সন্তোষানন্দ

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল। পূজ্যপাদ ধীরানন্দ স্বামী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) আমাকে একদিন বললেন পরমারাধ্য রাজা মহারাজের নিকট দীক্ষার প্রার্থনা জানাতে। আমি বললাম যে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণই আমার অভিপ্রায়। তাতে তিনি আর কালবিলম্ব না করে শীঘ্র শীঘ্র দীক্ষা নেবার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের দেশে যাবার উপদেশ দিলেন। বললেন—আমতা পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে যেন তাঁর দেশ জয়রামবাটীতে যাই। প্রস্তাবটি আমার খুবই ভাল লাগলো। আমতা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের দেশ ২৪।২৫ মাইল রাস্তা। এই দীর্ঘ ও অজানা পথ অপরিচিত লোকের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়ার অভিনবত্ব আমাকে খুবই উৎসাহিত করলো। কবে যাবো তার দিন তখনও স্থির হয়নি, এমন সময় একদিন মঠে গেছি। ইতিমধ্যে রায়পুর থেকে এসে এক ভদ্রলোক বোধ হয় মঠেই ছিলেন। তিনি সেখানে সরকারী চাকরি করতেন, জেলার (jailor) ছিলেন। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছিল ষাটের কাছাকাছি। তিনি সরকারী চাকরির নির্দিষ্ট সময় শেষ করে ১০০৲ টাকা মাসিক পেন্সনসহ কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীপুত্র সবই ছিল। ছেলেরাও সব তখন নানা কাজে নিযুক্ত। ভদ্রলোকের সঙ্কল্প—তিনি শেষ জীবন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিরূপে কাটাবেন। যা হোক, তিনি মঠে আসায় কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে, তাকে দীক্ষার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠাবেন। কিন্তু এক অসুবিধা হলো, ভদ্রলোক বাংলা জানেন না। এই রকম যখন অবস্থা তখন পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ পরমারাধ্য মহাপুরুষজীকে আমার জয়রামবাটী যাবার অভিপ্রায় জানিয়ে দিলেন। পূর্বেই বলেছি, আমি সেদিন মঠে গিয়েছিলাম। তখন বিকেল হয়ে গেছে। সহসা একজন এসে আমাকে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর আদেশ জানালেন যে, তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। শুনেই তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন স্বামীজীর ঘরের ঠিক পশ্চিমের ঘরে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি জয়রামবাটী যাবে?" আমি সম্মতি জানাতে বললেন, "বেশ হয়েছে। ঐ রায়পুরীও যাবে। ও তো বাংলা বোঝে না; তুমি সঙ্গে থাকলে কোন অসুবিধা হবে না। তুমি দোভাষীর কাজ করবে।" কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ, ভদ্রলোক কোন্ রাস্তায় যাবেন?" শুনেই মহাপুরুষজী হেসে বললেন, "ওকে বিষ্ণুপুর দিয়ে যেতে হবে।" আমি তো প্রমাদ গুণলাম। কারণ ও-রাস্তায় যেতে হলে যত খরচ লাগবে, তত টাকা আমার ছিল না। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ নিজেই আমার চিন্তাগুলি দেখতে পেলেন, বলে উঠলেন, "আরে, তাতো বটেই। তুমি স্টুডেণ্ট। কোথায় পাবে টাকা? তোমার খরচা তাকে দিতে হবে। ও এমন সুবিধা কোথায় পাবে? তুমি তাকে বলগে যে তোমার খরচা তাকেই দিতে হবে।" আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মহাপুরুষ মহারাজ সন্ন্যাসী; তিনি যে কথা নির্বিকারে বলতে পারেন, আমি তা কি করে বলি? আমি তখন যুবক, পড়ি। আমার আত্মসম্মান,

চক্ষুলজ্জা সবই যে আছে। পুনরায় তিনি বলে উঠলেন, "তুমি যাও, তাকে গিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" তাই করা গেল। নীচে গিয়ে সে-ভদ্রলোককে বলতেই তিনি মহাপুরুষ মহারাজের নিকট চলে গেলেন; এবং অল্প পরেই ফিরে এসে জানালেন যে, আমি তাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের দেশে গেলে তিনি আনন্দের সঙ্গে আমার খরচ দেবেন; যাবার দিন ঠিক হয়ে গেল; এবং গোমো প্যাসেঞ্জারে যথাসময়ে রওনা হওয়া গেল।

কোয়ালপাড়া পৌঁছে শুনলাম শ্রীশ্রীমা সেখানেই আছেন। শুনে খুবই আনন্দ হলো। কিন্তু পরেই শুনলাম, তাঁর জ্বর। একটু পরেই আমাদের ডাক পড়লো মাকে প্রণাম করবার জন্য। গিয়ে দেখলাম তিনি একটি তক্তাপোশের উপরে শুয়ে আছেন। ঘরে ঢোকা নিষেধ, তাই বারান্দা থেকে চৌকাঠে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। তারপর পূজনীয় বরদা মহারাজের (স্বামী ঈশানানন্দের) সঙ্গে মায়ের বাড়ি জয়রামবাটী থেকে ঘুরে আসা গেল। এসেই কিন্তু শুনলাম, মা আদেশ করেছেন, 'কলকাতা থেকে যে-সব ছেলেরা এসেছে, তারা যেন প্রসাদ পেয়ে সেই দিনই ফিরে যায়।' এদিকে পূজনীয় বরদা মহারাজ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানকার মোহন্ত কেশব মহারাজকে বলতে যে আমি ওখানে থেকে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করব ও পাড়ায় ভিক্ষে করে খাবো। কেশব মহারাজ (স্বামী কেশবানন্দ) বললেন যে, ওখানে থাকলে মায়ের দয়ায় দুটি ভাতের জন্য ভিক্ষে করার দরকার হবে না। কিন্তু মা যে আদেশ করেছেন সকলকে সেইদিনেই ফিরে যেতে। কাজেই ফিরে আসতে হলো, আমারও অবশ্য ফিরে আসাই ছিল অভিপ্রায়, কেবল বরদা মহারাজের কথা রক্ষা করার জন্যই ঐরূপ বলেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে খুব শীঘ্রই একদিন মঠে গেলাম। মহাপুরুষ মহারাজ পূর্বেই আমাদের ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসার সংবাদ শুনেছিলেন। এখন আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমিও যতটা জানতাম সব তাঁকে নিবেদন করে সেইদিনই যে ফিরে এলাম, তাও তাঁকে জানালাম। সব শুনে তিনি বললেন, "আরে, বেশ করেছ, বেশ করেছ।" তাঁর ঐরূপ কথায় উৎসাহিত হয়ে বলতে আরম্ভ করলাম, "মহারাজ, দেখলাম সে-দেশে পুকুরগুলি সব পানায় ভর্তি, লোকগুলো ময়লা-রং, পেটফোলা, মাটি পর্যন্ত কালো ফাটল-ধরা।" আর যায় কোথা! সহসা ধমক দিয়ে উঠলেন, "তুমি কোন্ বিলেত থেকে এসেছ হে? আমাদের বাংলাদেশে সবই এই রকম। লোকগুলো কালো, মাটি কালো! তোমার দেশ কোথায় হে? ছেলের রমক দেখ না, যেন বিলেত থেকে এলেন!" আমি তো ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলাম। আর কিছু করারও উপায় নাই। লোকের বা স্থানের দোষ দেখা বা নিন্দা করা, এই তো লাগে ভাল। সে যে অদোষদর্শী মহর্ষিদের দৃষ্টিতে দোষাবহ, তা জানবো কেমন করে? যা হোক, কিছু পরে তিনি থামলেন; আমি তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাবতে লাগলাম, এঁরা যে কি দেখেন, কি ভাবেন, তা আমাদের বুদ্ধির একেবারেই অগম্য!...

বোধ হয় এর একদিন কি দুদিন পরেই মঠে গেছি। মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "মহারাজ মায়ের খবর সব শুনতে চাচ্ছেন। তাঁকে গিয়ে সব বল।" একথা হচ্ছিল দ্বিতলে তাঁর ঘরে বসে। পূর্বোক্ত কথা

কটি বলেই তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন যেখানে পরমারাধ্য রাজা মহারাজ দ্বিতলের পূর্ব দিকের বারান্দায় একটি আরাম কেদারায় বসেছিলেন, সেইখানে। এর দু-এক দিন আগেই যে আমার কোয়ালপাড়া সম্বন্ধে নিন্দাবাদ শুনে আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, তা এঁর মন থেকে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে, তার চিহ্নমাত্রও নাই! যা হোক, ঐ বারান্দায় উপস্থিত হয়েই বললেন, "রাজা, এই ছেলেটি গিয়েছিল মায়ের দেশে, এর কাছে সব শুনতে পার।" তিনি একবার আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, "আপনিই তো শুনেছেন, ওতেই হবে মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে ফিরে গেলেন, আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এইবার রাজা মহারাজ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রশ্ন করলেন, "মায়ের ওখানে গিয়েছিলি?" আমি বললাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" "তবে চলে এলি কেন? সেখানে থেকে তাঁর সেবা করতে হয়। এমন opportunity কখনও ছাড়ে? দ্যাখ্ দেখি কি করলি? জয়রামবাটী গিয়েছিলি?" বললাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" "কামারপুকুর গিয়েছিলি?" পুনরায় প্রশ্ন করলেন শ্রীশ্রীপ্রভুর মানসপুত্র। উপায় নেই, বলতে হলো, "আজ্ঞে, না।" আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন, "অত দূরে গিয়ে ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন না করে ফিরে এলি? এমনও কখনও করে?" মাথাটি হেট করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না। বুঝতে বাকি রইল না যে কোয়ালপাড়ায় যখন পূজনীয় কেশব মহারাজকে বলেছিলাম যে, আমি ওখানে থেকে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করতে চাই, সেকথা যে আন্তরিক ছিল না, আমার মনের এই জুয়োচুরি যুগাবতারের মানসপুত্র শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের দৃষ্টিতে স্পষ্ট ধরা পড়ে গেছে!

আর একদিনের কথা। কোন্ সাল ঠিক মনে নাই। হয়তো ১৯১৮-১৯ হবে। শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পায়ের কাছে বসে আছি; এমন সময় আর একটি ছেলে তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলো, 'মহারাজ, আমার রাগ হলে একেবারে জ্ঞানহারা হয়ে যাই। তখন আমার মাকে অতি কঠোর ভাষায় গালমন্দ করি। পরে আমার অনুতাপ হয়। কি করি, মহারাজ?' অতি সহানুভূতির সুরে মহাপুরুষজী বলছেন, "মাকে কটূক্তি করা তো ভাল নয়। তবে এটা যে দোষ, তা তুমি যখন বুঝতে পেরেছ, তখন ওটা কেটে যাবে। মনে মনে খুব দৃঢ় সঙ্কল্প করবে যে আর কখনও অমন করবে না। আর যদি না সামলাতে পেরে ঐ রকম করেই ফেল, তবে রাগ থেমে যাবার পর মাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। বলবে, 'মা, আমি রাগের মাথায় সামলাতে না পেরে তোমাকে কটুকথা বলেছি, আমায় ক্ষমা কর।'" ছেলেটি তারপর এক মজার প্রশ্ন করে বসলো, "মহারাজ, শুনেছি স্বামীজী ঠাকুরকে দেখতে পেতেন, আপনারা কি দেখতে পান?"

মহাপুরুষজী জবাব দিচ্ছেন, "হ্যাঁ, দেখতে পেতেন। আমরা তা···অবশ্য আমরা সে···আমরা···দেখ এসব প্রশ্ন করতে নেই।" ছেলেটি আবার প্রশ্ন করলো, "মহারাজ, গুরু তো একজনই থাকবেন, তাঁকে তো আর বদলাতে নেই?" "না গুরু বদলাতে নেই"—বললেন মহাপুরুষজী। ছেলেটি তখন বললো, "মহারাজ, এ জন্মে যিনি আমার গুরু হবেন, জন্মান্তরে তাঁকে আবার চিনবো কি করে?" প্রথম জবাব এলো, "সচ্চিদানন্দই একমাত্র গুরু; আবার কে গুরু?" এ কথা বলেই বললেন, "গুরুকরণ হয়ে গেলে আবার জন্মাবে কেন?" সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করে ছেলেটি বিদায় গ্রহণ করলো।

১৯১৮ সালের ঘটনা; শুনেছি পূজনীয় স্বামী নিবেদানন্দজীর মুখে। তখন বর্তমান স্টুডেন্টস্ হোমের নাম ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। এর আগে পূজনীয় মহাপুরুষজী অনাদি মহারাজকে বলেছিলেন, তিনি যে কাজটি আরম্ভ করেছেন অর্থাৎ ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, তাতে লেগে থাকতে। কিন্তু অনাদি মহারাজের (স্বামী নিবেদানন্দজীর) প্রায়ই মনে হতো ঐ আশ্রম ত্যাগ করে গিয়ে মঠে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। আর ঐ আশ্রমে ফিরবেন না, এই রকম দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে একদিন সকালে তিনি মঠে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর প্রথমেই দেখা হলো শ্রীশ্রীরাজা মহারাজজীর সঙ্গে। তিনি বসেছিলেন মঠবাড়ীর নীচু তলায়, খুব সম্ভবতঃ উঠোনে আমগাছতলায় একটি চেয়ারের উপর। তাঁকে প্রণাম করেই অনাদি মহারাজ বললেন, "আমি মঠে থাকবো।" নিতান্তই অসহায় বালকের মতো যুগাবতার ভগবান রামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র বললেন, "বাবা, আমি তো এখানকার কেউ নই।" হাতজোড় করে উপরের দিকে দেখিয়ে বললেন, "ঐ ওখানে মহাপুরুষ বসে আছেন, তাঁকে গিয়ে বল।" শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের অতি সরল অতুলনীয় বালকভাব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! তাঁকে স্থূল শরীরে দর্শন করার সৌভাগ্য যাঁদের ঘটেছে তাঁরাই এই ব্রজগোপালের বাল-মধুর ভাবের কিছু কিছু আস্বাদ লাভ করেছেন। যা হোক, অনাদি মহারাজ (তখন সুরেন বাবু) তাঁর এই উক্তিকে অলঙ্ঘনীয় আদেশরূপে গ্রহণ করে বিনা বাক্যব্যয়ে উপরে গেলেন পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে। সেখানে তাঁকে প্রণাম করেই নিবেদন করলেন নিজের অভিপ্রায়। শুনেই মহাপুরুষজী অতি স্নেহপূর্ণ বাক্যে বোঝাতে আরম্ভ করলেন অধুনা-সুপরিচিত স্টুডেন্টস্ হোমের স্থাপয়িতা ও বাহককে। তিনি বললেন, "যে কাজ আরম্ভ করেছ, তাতেই লেগে থাক। এতে বহুর কল্যাণ হবে, তোমারও মঙ্গল। এটি স্বামীজীর খুবই অভিপ্রেত কাজ। এতদিন লোকাভাবে আরম্ভ করা যায়নি। এখন যখন ঠাকুরের ইচ্ছায় তুমি এ কাজটি আরম্ভ করেছ, তখন ওতেই লেগে থাক। আর ওটি তোমারও ধাতের উপযোগী কাজ; এতে তোমারও কল্যাণ হবে। তুমি তো আমাদেরই আছ! বেলুড় মঠ কি এই মঠের চতুঃসীমানার মধ্যে আবদ্ধ? তুমি এখানে এলে যে এখানেই থাকতে পারবে তার কি মানে আছে? তোমাকে মাদ্রাজ পাঠাতে পারি, আমেরিকায় পাঠাতে পারি, বা আর কোথায়ও পাঠাতে পারি। এ তো মঠের অতি কাছে কলকাতায় আছ; যখন খুশি আসতে পার। আর মঠে এলে তোমাকে যে কাজ দেওয়া হবে সেটি তোমার উপযোগী নাও হতে পারে। তার চেয়ে নিজের ধাত-মতো একটি কাজ বেছে নিয়েছ, এতে তোমার কল্যাণই হবে। আর আমি বলছি, এ কাজে তোমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের কখনও বাধা ঘটবে না। আর ধর, যদিই বা এতে তোমার spiritual progress (আধ্যাত্মিক উন্নতি) কিছুটা hamper করে (বাধাপ্রাপ্ত হয়), আমি বলছি করবে না, তবুও যদিই বা কিছুটা hamper করে, আমি বলছি করবে না, তবুও স্বামীজীর জন্য কি একটা life sacrifice (জীবন উৎসর্গ) করতে পারবে না?" আবেগ-ভরা কণ্ঠের এই উক্তিতে ভবিষ্যৎ স্বামী নিবেদানন্দজীর সকল সঙ্কল্প ভেসে গেল; বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, "পারবো, মহারাজ।" ইতিমধ্যে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজজী এসে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর ঘরে ঢুকে বলতে আরম্ভ

করলেন, "টেনে নিন না, মশায়; টেনে নিন না! ওর তো সময় হয়েছে।" মৃদুহাস্যে মহাপুরুষজী জবাব দিলেন, "ও একটা ভাল কাজ করছে; অনেক ছেলে মানুষ হবে।" "ও একা মানুষ হলে লাখ মানুষ হবে",—বললেন মঠ ও মিশনের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী। বলেই আবার বললেন, "ওর তো দেখছি দীক্ষা হয় নাই; দীক্ষাটা দিয়ে দিন না!" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "আমি তো দেই না; তুমি দিয়ে থাক, তুমিই দাও।" রাজা মহারাজ বললেন, "দেন না বলেই তো বলছি; অনেক জমিয়েছেন, কিছু খরচ করুন।" এবারও পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "না, ও তুমিই দিয়ে থাক; তুমিই দেবে।" "তা আপনার আদেশ হলেই আমি লেগে যেতে পারি!"—করজোড়ে হাসতে হাসতে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন পরমারাধ্য রাজা মহারাজ। তাঁর কাছ থেকে এর কয়েক দিন পরেই মন্ত্রদীক্ষা লাভ করলেন অনাদি মহারাজ।...

১৯১৮ র বোধ হয় আগস্ট মাসে আমি ছাত্র হিসাবে যোগ দেই এই স্টুডেন্টস্ হোমে। আগেই বলেছি তখন এর নাম ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। আর এটি ছিল একটি দ্বিতল ভাড়া বাড়ীতে; ঠিকানা ১১৯।১, কর্পোরেশন স্ট্রীট (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড)। তখন আমি ছাত্র পড়াতাম। আর আশ্রম চলতো অনাদি মহারাজ যে কোচিং ক্লাস করতেন, তার আয়ে। পূজনীয় ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজের আদেশে আমি ছাত্র পড়িয়ে যে টাকা পেতাম, তা আশ্রমে জমা না দিয়ে জমিয়ে রাখতাম অন্যত্র। সব শুনে পূজনীয় অনাদি মহারাজ (তখনও সুরেনবাবু) বললেন—সব কথা পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে জানিয়ে এ বিষয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করাই শ্রেয়। এর পরে যেদিন মঠে যাই সেদিন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে সব কথা বলে কি করা কর্তব্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "না, ভরত, জ্ঞান তো ঠিক বলে নাই। ও তো গেরস্তদের কথা! তুমি আশ্রমে আছ। যা পেলে এসে আশ্রমে দিয়ে দিলে। তারপরে যা হবার হবে। জ্ঞানের ও-কথা ঠিক না। জ্ঞান ঠিক বলে নাই। না, ও-ঠিক না; তুমি যা পাবে সব আশ্রমে দিয়ে দেবে। জমাতে যাবে কেন? ও-কথা ঠিক না।"

আর একটি ঘটনা; খুব সম্ভবতঃ ১৯১৮ সাল। পরমারাধ্য বাবুরাম মহারাজের ভাণ্ডারার দিন বিকেল। গঙ্গার ধারে লন্ এ একটি ছোট সভাও হয়ে গেছে। অন্যান্য বক্তার মধ্যে স্বামী কমলেশ্বরানন্দও কিছু বললেন। বলতে বলতে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "ললিত বাবুরাম মহারাজের কথা বলতে আরম্ভ করলে আর নিজেকে সামলাতে পারে না।" তারপরেই বলতে আরম্ভ করলেন—বাম হাতটি মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রূ সঙ্কুচিত; যেন প্রত্যেকটি কথার উপর জোর দিতে চাচ্ছেন—"গাজীপুরে স্বামীজীর ভেতর তখন দারুণ বিরহ চলছে। ঠাকুরের অদর্শনে বিরহের জ্বালায় তাঁর ভেতরটা যেন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে! ঠাকুরের অদর্শন তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। বাবুরামদা গিয়ে তাঁকে ওখান থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। স্বামীজীর ভেতরে সেই দারুণ বিরহ চলছে। তিনি বলছেন, 'তুই যা এখান থেকে। তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুর নাই। তিনি নির্বাণ নিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে নিয়েই তো

তোদের সঙ্গে সম্পর্ক। তিনি তো আর নাই। তোদের সকলের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। তুই চলে যা।' বাবুরামদা ভাবছেন যে, পওহারী বাবার পাল্লায় পড়েই স্বামীজী ঐ রকম বলছেন। তাঁকে একবার কোন গতিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারলেই তাঁর এ ভাবটা কেটে যাবে। তাঁকে ওখান থেকে নিয়ে আসবার জন্য তিনি তাই প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু স্বামীজীর ভেতর তখন সেই দারুণ বিরহ চলছে। তাই তিনি বলছেন, 'ঠাকুর আর নাই; তিনি নির্বাণ নিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে নিয়েই তোদের সঙ্গে সম্পর্ক। তিনি তো আর নাই। তোদের সঙ্গেও আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। তুই চলে যা।' কিছুতে স্বামীজীকে টলাতে না পেরে বাবুরামদা কাঁদতে কাঁদতে চলে এলেন। আর সেইদিন রাত্রেই ঠাকুর স্বামীজীকে দর্শন দিলেন, আর তাঁর ভেতরটা শান্তিতে ভরপুর হয়ে গেল। তার পরেই তিনি গাজীপুর থেকে চলে এলেন।" সব শুনে ললিত মহারাজ বললেন, "তবে তো প্রেমেরই জয় হোল।" একটু হেসে মহাপুরুষজী বললেন, "তা তো বটেই।"

*

খুব সম্ভবতঃ ১৯১৯-র স্বামীজীর তিথিপূজা। সকালেই মঠে গেছি। সেদিন স্বামীজীর ঘরের সামনে একজন পাহারায় থাকতে হয়। ঐ কাজের ভার পড়লো আমার ওপরে। স্বামীজীর ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি; একটু পরে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ দয়াঘন-মূর্তি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই হাত নেড়ে নেড়ে হাসিমুখে বলতে আরম্ভ করলেন, "এ রামজীকা মন্দির হ্যাঁয়, আউর ভরত পাহারা হ্যাঁয়। রামজীকা মন্দির হ্যাঁয়, আউর ভরত পাহারা হ্যাঁয়।" বারে বারেই কথাটি বলতে লাগলেন, কত কথাই বলতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বেরুল না। তাঁর প্রতিটি কথায় অহেতুক করুণা বর্ষার বারিধারার মতো ঝরে পড়ছিল নিতান্তই অযাচিত ভাবে আমার শিরে। বাক্‌শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজ ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

খানিক পরে প্রসাদের ঘণ্টা পড়লো। তখন সকাল ন'টা—সাড়ে ন'টা হবে। এ প্রসাদের অর্থ সকলের জলখাবার। একটু পরেই পূজনীয় মহাপুরুষজী তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, বললেন—"প্রসাদের ঘণ্টা পড়লো। তুমি গেলে না?" বললাম, "যাব'খন।" মনে মনে জানি আমার একজন বদলী না এলে যাব না। যা হোক, একটু পরে তিনি আবার এসে হাজির—"কই, তুমি প্রসাদ পেতে গেলে না?" এবার উত্তর দিলাম, "মহারাজ, সে যাওয়া যাবে এখন।" তিনি চলে গেলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন; হাতে একটি বাটি; আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও। স্বামীজীর প্রসাদ।" একটু সঙ্কোচমিশ্রিত হাসিমুখে বললেন, "আমি একটু খেয়েছি; তা স্বামীজীর প্রসাদ, ওতে দোষ হবে না।" দুই হাত পেতে পাত্রটি নিলাম; মনে হোল—'স্বামীজী গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানি না; তবে প্রত্যক্ষ পাচ্ছি আপনার প্রসাদ।' এরপর আরও একদিন প্রসাদ দিয়েছিলেন। কোন্ বছর মনে নেই। তিনি পরমারাধ্য রাজা মহারাজের সঙ্গে দীর্ঘ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ করে ফিরেছেন। একদিন সকালে মঠে গেছি। তাঁকে প্রণাম করতেই বললেন, "দেখ তো, ঐখানে একটা কাপের মধ্যে কি আছে? আমি খানিকটা খেয়েছি; বাকিটা খেয়ে ফেল।" দেখলাম এক

বড় কাপের প্রায় তিনভাগ ভর্তি দুধ আর ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট। বললেন, "এইখানে দাঁড়িয়েই খাও।" আমি একটু ইতস্ততঃ করছিলাম, তাঁর ব্যবহারের জিনিস! কিন্তু কিছুই উপায় রইল না; আবার বললেন, "খাও, খেয়ে কাপ ধুয়ে রেখে যাও।" তাই করলাম। কি যে সুস্বাদ লাগলো, তা আর কি বলবো!...

১৯২০ সাল; বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষায় কিন্তু হলাম অকৃতকার্য। পাস ফেল যাই হোক, আর যে পড়বো না তা আগেই ঠিক করেছিলাম। মঠে তো গেছি। সেখানে গিয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে জিজ্ঞাসা করলেন, "পরীক্ষায় ফেল করেছ?" আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "কিসে ফেল করলে?"—তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন। বললাম, "আজ্ঞে, অঙ্কে।" "তা ওতে আর কি হয়েছে? ওর জন্য মন খারাপ কোরো না, আর একটা বছর তো! এক বছর পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে দাও। ও পাস করে যাবে'খন। পরীক্ষায় পাস ফেল, ও সামান্য একটুতেই হয়ে যায়। ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না, আর একটা বছর পড়। ও সামান্য পরীক্ষা, পাস করে যাবে'খন।" আমি তো পড়লাম মহামুশকিলে; মনে মনে ঠিক করেছি আর পড়বো না। এদিকে এঁর এই দ্বিধাহীন আদেশ। কি করা যায়? সহসা প্রশ্ন করলেন, "কি, পড়বে তো?" "আজ্ঞে, আমার আর পড়ার ইচ্ছা নেই"—জানালাম অবনত মস্তকে। "বেশ, সেই ভাল"—এলো সোৎসাহ উত্তর। "ও যারা চাকরি-বাকরি করবে তাদের জন্য একটা ডিগ্রীর প্রয়োজন। আমাদের একটু ইংরেজী আর একটু সংস্কৃত জানলেই হলো। তাতে তো তুমি পাস করেছ। অঙ্কে আমাদের কি প্রয়োজন? সেই ভাল।" হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল।

এই বছরই একদিন পূজনীয় অনাদি মহারাজ এসে জানালেন যে, সেবার মঠের দুর্গাপূজায় আমি হয়েছি নির্বাচিত পূজক। প্রথমটা তো ভয়ই লাগলো! যা হোক, আর যখন উপায় নেই তখন পূজোর কয়েকদিন আগেই মঠে চলে গেলাম! মঠে প্রচলিত পূজাপদ্ধতি যদ্দুর সম্ভব আয়ত্ত করবার জন্য। একদিন প্রায় সন্ধ্যেবেলা, স্বামীজীর একখানা চটি ইংরেজী বই, বোধ হয় চিকাগো বক্তৃতা, মঠের সামনের পোস্তার উপর পায়চারি করতে করতে পড়ছিলাম। গঙ্গার দিকের বেঞ্চিতেই বসেছিলেন মহাপুরুষ মহারাজ। তিনি একজনকে বললেন, "ও ছোকরাকে ডাকো তো।" কাছে আসতেই বললেন, "এবার কি দুর্গাপূজা হবে ইংরেজীতে?" লজ্জায় মরে গেলাম। যা হোক পূজা আরম্ভ হচ্ছে। আমি বিলক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়েছিলাম; একে মঠের দুর্গাপূজা, তায় সন্ধিপূজা ছিল প্রায় শেষ রাত্রে! শেষ পর্যন্ত পারবো কি না কে জানে? বোধনের জন্য আগে থেকেই একটি বেলের ডাল এনে মঠের ঠাকুরঘরের সামনের বারাণ্ডায় রাখা হয়েছিল। সন্ধ্যারতির পরে সেইখানে যখন চলেছি অধিবাসের জন্য, ঠাকুরের ঘরের দরজায় সিঁড়ির মুখে দেখা হলো মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে। অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি করলেন আশীর্বাদ। আমারও সকল সঙ্কোচ ঘুচে গেল। তাঁরই অমোঘ আশীর্বাদে পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। মহানবমীর দিন হোম ও দক্ষিণান্ত হবার পর গিয়ে খেতে বসা গেল। ক'দিন হবিষ্যির পর আজ সবই খাওয়া যায় ভাণ্ডারী প্রভৃতি সকলেই, বিশেষ করে দেবেন দা, আমাকে ভাল করে খাওয়াবার জন্যে খুবই ব্যস্ত। খাইয়ে হিসেবে কোনকালেই আমার নাম ছিল না। কাজেই প্রথম থেকেই তাঁদের যতই অনুরোধ

জানাই তাঁরাও ততই আমাকে আরও বেশী করে দিতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ ও দেবীর ভোগে যা কিছু উঠেছিল সবই তাঁরা চাচ্ছিলেন আমাকে খাওয়াতে। ক্রমে মাছ ভাজা এলো। সহসা দেবেনদা একটা বেশ বড় পোনামাছ ভাজা এনে ফেলে দিলেন আমার থালার উপর। আমি একেবারে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছি। এত খাওয়া যায় কি করে! তখন জানি ঠাকুরের প্রসাদ কিছু ফেলতে নাই। কিন্তু ও আমার সাধ্যির অতীত। এমন সময় লাঠিটি হাতে করে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে মহাপুরুষজী। বললেন, "খাচ্ছিস্?" পরে তাঁর নজর পড়লো থালার উপরে—"অত ভাজা!" অসহায়ভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, "মহারাজ, বারণ সত্ত্বেও এরা সব দিয়ে দিলেন। এতো তো খেতে পারবো না।" অভয় দিয়ে বললেন, "তুই যা পারিস খা; আর সব পড়ে থাক।" আমিও যেন একটা মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম।

দশমীর দিন সকালে দর্পণ-বিসর্জনের পরেই প্রণাম করলাম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে। তিনি বসেছিলেন মঠের বারাণ্ডায় পশ্চিম দিকের ছোট বেঞ্চিখানার ওপর। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ মণ্ডপস্থ দেবীর মুখের ওপরে। একটু হাসিভরা মুখে বললেন, "মন্তরটি পড়া হলো, আর দেবীর মুখের ভাবও বদলে গেল!" এই ঋষির দৃষ্টি আমরা কোথায় পাবো? আমাদের দৃষ্টিতে ছিল প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে, প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে এবং দর্পণ-বিসর্জনের অন্তে একই মূর্তি। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীর বলার পরেও কোন তফাত দেখতে পাওয়া গেল না। যাই হোক, আশীর্বাদ করলেন খুবই। [ক্রমশঃ]

'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'

শ্রীগুরুদাস দাশ

বিশ্বের ঈশ্বরী যিনি, যিনি মহামায়া,
যিনি সর্ব মনোবৃত্তি, যিনি স্নেহ দয়া,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাঁরে সদা করে ধ্যান,
সেই মাতৃশক্তি করে সবার কল্যাণ।

নানা রূপে নানা ভাবে সবে পূজে যাঁরে,
তাঁর কৃপা বিনা মুক্তি নাহিক সংসারে।
সে-মায়েরই পূজা মোরা করি প্রতিমায়,
হের তাঁরে সর্বভূতে, হের প্রতি মায়।

দক্ষিণেশ্বরে*

ভগিনী নিবেদিতা

[অনুবাদক : অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ]

'যাদের অন্তর তোমাতে সমাহিত, তুমি তাদের পরিপূর্ণ শান্তিতে ঘিরে থাকো।'—ঈশা।

তিনি তো সেই বিরাট শূন্যতায় নেই। এই পৃথিবীর একটি বাড়ীর ছাদে বসে হৃদয় সেই অনন্ত আকাশের বুকের গহনে চেয়ে দেখেছিল, আর মহামৌনের উপলব্ধিতে শিহরিত হয়ে উঠছিল।

তারপর তিনি এলেন, অন্তরের মধ্য থেকে যাঁর বাণী মৃদুমাধুর্যে ধ্বনিত হ'লো, 'সেই নির্জনে চলে এসো, শান্ত হয়ে ব'সো! হয়তো সেইখানেই তুমি তাঁর বাণী শুনতে পাবে।' সেই প্রত্যক্ষ দেবদূত আমার,—যাঁর হাতে রয়েছে শুভ্র লিলির স্তবক, যাঁর চরণতলে বিসর্পিত অগ্নিশিখা, যাঁর দুই চোখে চোখ রাখলে মনে হয় ঝরে পড়ছে এক দুরন্ত জলপ্রপাত—তাঁর অনুসরণ করে এ হৃদয় নানা বিচিত্র পথ পেরিয়ে প্রভুর উদ্যানে এসে পৌছুল। সব শ্রান্তি জুড়িয়ে গেল।

সেই উদ্যানের মাঝখানটিতে জেগে আছে আছে পঞ্চবটী—যার তলায় ঠাকুর ধ্যানে বসতেন, প্রার্থনা করতেন, আর সমাধির আনন্দে ডুবে যেতেন। বিক্ষোভে বেদনায় প্রশ্নসঙ্কুল হৃদয় সেইখানটিতে এসে নৈঃশব্দ্যের সাদর আহ্বান শুনতে পেয়ে অপেক্ষারত।

পাশে কলবাহিনী গঙ্গা। ভরা পালে বিরাট বিরাট নৌকা ছুটে চলেছে। নীচে হাওয়ায় খেলা করছে শুকনো পাতা, ইঁদুরের পায়ের শব্দ হচ্ছে পাতার মর্মরধ্বনিতে। আর উর্ধ্বে পঞ্চবটীর শাখায় পাতায় ঝরে পড়ছে চাঁদের আলোর বন্যা, কম্পমান পত্রপল্লব ও শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে বিন্দু বিন্দু চন্দ্রালোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে বেদীর উপরে।

শুধু কেবল গাছের আর নদীর আর নিঃসঙ্গ নিশাচরদের মৃদুভাষণ শোনা যায়···'ঠাকুর! যাদের সঙ্গে আমি এইখানটিতে আসতাম, তারা আজ অনুপস্থিত। অনেক দূর দেশ থেকে তারা এই স্থানটির কথা মনে করে। আজ আমি তোমার চরণে তাদের স্মৃতি নিবেদন করবো।'

তিনি বললেন, 'বেশ তো। যারা আমার, তারা তো চিরকালই আমার। তাদের সব ভার আমি বহন করি, প্রতিটি পদক্ষেপ আমিই পরিচালিত করি, সবশেষে তাদের বাঞ্ছিত লোকে এনে উপনীত করি। সন্তান আমার! আজ তো একজন নয়, তিনজনই উপস্থিত। একথা নিশ্চিত জেনো।'

'ঠাকুর! যাদের আমি ভালবাসি তারা আজ বেদনার শৃঙ্খলে বন্দী। শঙ্কিত হৃদয়ে তারা পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে। জীবনের স্বাদ একেবারে তিক্ত, তাই একজনের আকাঙ্ক্ষা —মৃত্যু। আর একজনের পক্ষে জীবন এত দুর্বহ যে আমরাই তার সব যন্ত্রণার অবসান

* Kali The Mother গ্রন্থের 'A Visit to Dakshineswar' রচনার অনুবাদ। দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে নিবেদিতার হৃদয়-সম্বন্ধের এক অপূর্ব কাব্যরূপ এই মানস-ভ্রমণকাহিনী।

চাই। ঠাকুর! তোমার কাছে প্রার্থনা, এদের একটু স্বস্তি তুমি অনুভব করতে দাও, নয়তো সেই আলো দাও যে আলোর কাছে কোনো সুখের কামনাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।'

স্মিতহাস্যে তিনি সব শুনছিলেন।

'এমন তো হতে পারে না, ঠাকুর, যে মানুষের জন্য আমরা কিছুই করতে পারবো না। ওরা যারা প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি, মৃত্যুর করাল দৃষ্টির সামনে কম্পমান, আসন্ন প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনায় বিদীর্ণহৃদয়, ওরা যারা বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন পঙ্কশয্যায় শুয়ে থাকে, নিরন্ন, নিরক্ষর, নিপীড়িত—তাদের দুঃখের কোন অংশই আমরা গ্রহণ করতে পারবো না—এ তো হতেই পারে না, ঠাকুর! তুমি তো কখনো একথা বলতে পারো না যে, সংগ্রামের প্রচেষ্টার কোন মূল্যই নেই!'

'কী তোমার প্রয়োজন?'

'যদি কিছুই নাও করতে পারি, তাহলে শুধু ওদের বিপদের অংশভাগী হওয়া। শুধু ওদের ললাটে সান্ত্বনার স্পর্শটুকু রাখা—ওদের দাসী হ'বার অধিকারটুকু পাওয়া, ওরা যখন যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত, তখন ওদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে না করা—শুধু এইটুকুই আমার প্রার্থনা।'

'এই কী সব?'

'না।—সত্যিকার সেবার অধিকার যদি পাই সেই তো পরম আশীর্বাদ। যদি সত্যই কারো সহায়তা করতে পারি, তবে তো পেয়ালা ভরে উঠবে কানায় কানায়। তবু যদি এ অধিকার নাও মেলে, আমাদের সেই নিঃস্বার্থ কর্মের স্বাধীনতা দাও। দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজনের গণ্ডী থেকে আমাদের মুক্ত ক'রো। যেন সর্বস্ব দিতে পারি, উৎসর্গ করতে পারি, আর জীবন-মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন চিত্তে তোমাতেই মগ্ন হয়ে থাকতে পারি।'

দীর্ঘ নীরবতা।

অবশেষে প্রশান্ত অথচ মৃদু ভর্ৎসনায় সেই দিব্যকণ্ঠ ধ্বনিত হ'লো—'ওরে আমার অবুঝ সন্তানেরা! তোদের কী এখনও একথা বলে দিতে হ'বে যে তোদের অন্তরের এই যে ভালোবাসা সেও আমারই ভালোবাসা? যা একান্ত আমারই দান তাই নিয়ে কী তোরা আমারই সাথে দাবীদাওয়ার পালায় নামবি? দুঃখ-বেদনার বন্ধুর পথে আমিই তো সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করি! অভীঃ! অভীঃ! এগিয়ে যা! পথ আপনি দেখা দেবে। আমার ভালোবাসা কী কখনো বিফল হ'তে পারে?···তোর এই ভালোবাসা কী সেই অনন্ত প্রেমেরই মৃদুতম কম্পনমাত্র নয়? মনে রাখিস, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। এ সংগ্রাম হয়তো তোরই কর্মফল। কেমন করে এর শেষ হবে, সেকথা জিজ্ঞাসার তোর কোন অধিকার নেই। তোর ভালোবাসা তো আমার ভালোবাসার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। আসলে এরা একই সত্য।···' কথাগুলি যখন মিলিয়ে গেল, তখন শ্রোতৃহৃদয়ের সামনে মাতৃময় এক মহাবিশ্ব দেখা দিল;—সে এমন এক ভালোবাসা, মানবীমায়েদের ভালোবাসা যার মৃদুতম আভাসমাত্র; দুঃখী অথবা সুখী সব জীবনই তখন বিশ্বজননীর সন্তানদের নিয়ে চিরন্তন খেলার লীলা!

সেইখানটিতে হাত রেখে প্রভু তাঁর ভক্তদের আশীর্বাদ করলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

শ্রীশ্রীমহারাজকে কবে যে প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম তাহা সঠিক মনে নাই। মনে হয় ১৯১৮ সনে। কিছুকাল রাজনৈতিক নির্যাতন ভোগ করিবার পর অসমাপ্ত পাঠ সমাপ্ত করিতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। নিকটে বরাহনগরে এক ভগ্নী থাকিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট যাইতাম ও গঙ্গা পার হইয়া মধ্যে মধ্যে মঠে গিয়া প্রাচীন সাধুগণকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। ইহারই মধ্যে এক দিন বোধ হয় শ্রীশ্রীমহারাজের প্রথম পুণ্য দর্শন পাইয়াছিলাম। সেই দিন আমার সঙ্গে আমার সমবয়সী একটি আত্মীয় বন্ধুও ছিলেন। প্রাচীন সাধুগণকে দিবার জন্য সঙ্গে সামান্য কিছু ফলও লইয়া গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ মঠের গঙ্গার দিকের বারাণ্ডায় একটি বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন। পাশে যতদূর মনে পড়ে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ও নিকটে কয়েকজন অল্পবয়স্ক সাধু—সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীমহারাজের সেবক। আমরা শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া ফলগুলি তাঁহার নিকট রাখিবামাত্র তিনি জনৈক সেবককে ঐসকল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য লইয়া যাইতে বলিলেন। আমরা একটু অবাক হইলাম, কেননা পূর্বে কোন প্রাচীন সাধুকে এইরূপ কিছু দিলে তিনি উহা পৃথক করিয়া রাখিয়া দিতে বলিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে উহা আর পাঠাইতেন না। শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট উহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। তখন কারণ কিছু বুঝি নাই। পরে শুনিয়াছিলাম তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র। পিতাপুত্রের অভেদজ্ঞানে হয়ত তিনি এইরূপ আচরণ করিয়া থাকিবেন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীমহারাজের আর একটি আচরণে আমি আরও বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি আমার সঙ্গী যুবক-বন্ধুটিকে তাহার নাম, ধাম ও অন্যান্য পরিচয় অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আমার দিকে তাকাইয়াই 'তোকে তো চিনি' বলিলেন, অন্য কথা জিজ্ঞাসাই করিলেন না। অবাক হইলাম, কেননা ঐদিনই তো আমি প্রথম আসিয়াছি! পরে শুনিয়াছি, ভবিষ্যতে তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন এরূপ অপর কাহাকেও কাহাকেও তিনি এইভাবেই সম্বোধন করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে শরীর সারাইবার জন্য আমায় ৺কাশী যাইতে হইল। সেখানে হঠাৎ আমার পুরানো দুইটি বন্ধুর সহিত দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখা। তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে সেখানের রামকৃষ্ণ মিশনে যাইতে হইল ও তাঁহাদেরই আগ্রহে সেখানে পরমপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর (হরি মহারাজের) দর্শন পাইলাম।

ধর্মবিষয়ে আমি তখন অতিশয় অজ্ঞ ও সংশয়-বাদী। ধর্মের তত্ত্বাদি জানিবার জন্যই দর্শন-শাস্ত্র লইয়া পড়িতেছিলাম। কিন্তু কলেজাদিতে পাশ্চাত্য দর্শন যতই পড়িতে লাগিলাম ততই মনে হইল, ভগবান শুধু তর্কযুক্তির বিষয়, তাঁহাকে কেহ কখনও দর্শন করেন নাই; দেখিতাম, কোন দার্শনিক সুচিন্তিত যুক্তিবলে ভগবানের অস্তিত্ব স্থাপন করিতেছেন, আবার অপর একজন দার্শনিক অনুরূপ যুক্তি দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়া দিতেছেন। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইত ভগবান কখনই দর্শনগম্য নহেন, তিনি তর্কযুক্তিরই বিষয়। তবে

তাঁহাকে চিন্তা করিলে মনে কিছু নৈতিক শক্তি আসিতে পারে, এই মাত্র।

মনের এইরূপ সংশয়াকুল অবস্থায় পূজ্যপাদ হরি মহারাজের দর্শন পাইলাম। তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে মনের সংশয় ধীরে ধীরে দূর হইতে লাগিল। এখন মনে হইতে লাগিল ভগবান শুধু তর্কযুক্তির বিষয় নন। উপযুক্ত সাধনভজনের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করাও সম্ভব। তাঁহাকে অনেকে দর্শন করিয়াছেন। সাধন-ভজন ও সদ্‌গুরুর কৃপা হইলে আমরাও তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব। পূজ্যপাদ হরি মহারাজকে একদিন উহা নিবেদন করিলাম, এবং দীক্ষা দিয়া তিনি যাহাতে আমাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন তজ্জন্য মনের আকূতি জানাইলাম। কিন্তু তিনি গম্ভীর হইয়া স্মিত-হাস্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "আমরা তো কাহাকেও দীক্ষা দিই না।" অত্যন্ত বিষণ্ণ ও হতচিত্ত হইয়া সেখানেই বসিয়া রহিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি পরক্ষণেই কৃপাপূর্বক বলিলেন, "তোমাকে আমরা এমন একজনের নিকট পাঠাইব, যিনি আধ্যাত্মিকতায় আমাদের সকলের অপেক্ষা অনেক উচ্চে।"

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। পাঠ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা মন হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তবুও পূজ্যপাদ হরি মহারাজের আদেশে পাঠ সমাপ্ত করিতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং তাঁহারই নির্দেশে একদিন সকালে বাগবাজার বলরাম-মন্দিরে গিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিলাম। দেখিলাম সিঁড়ির পাশে একটি ছোট ঘরে একটি ক্ষুদ্র তক্তাপোশের উপর শ্রীশ্রীমহারাজ বসিয়া আছেন। তাঁহার সামনে অল্প কয়েকজন ভক্ত। শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া আমিও তাঁহাদের পাশে বসিলাম। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে। অবাক হইয়া শুনিলাম উঁহাদেরই দু'জন ভক্ত শ্রীশ্রীমহারাজের সামনেই উত্তেজিতভাবে যুদ্ধের অগ্রগতির সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন। একজন জার্মানদের পক্ষ লইয়াছেন, অপরজন ইংরেজদের। মহারাজ স্মিতহাস্যে তাঁহার গড়গড়ায় টান দিতে দিতে মাঝে মাঝে তাঁহাদের আলোচনায় যোগ দিতেছেন।

প্রায় আধঘণ্টা সময় এইরূপে কাটিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, "এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি? ইহার কাছেই কি পূজনীয় হরি মহারাজ আমাকে পাঠাইয়াছেন? ইনি কি করিয়া তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতায় বড় হইলেন!" জানি না আমার মনের কথা শ্রীশ্রীমহারাজ বুঝিলেন কি না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম সেই ক্ষুদ্র ঘরের আবহাওয়া ইতোমধ্যেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। ভক্তগণও আর কোন বাক্যালাপ না করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের কথা নিবেদন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িয়া রাস্তার দিকের সরু বারাণ্ডায় গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্বের মূর্তি আর নাই। আমি চেষ্টা করিয়াও আর তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, কোন্ এক অজ্ঞাত ভয় ও বিস্ময় যেন আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে! এইভাবে কিছুক্ষণ গেল। হঠাৎ বোধহয় কৃপা করিয়াই মহারাজ আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। আমিও ভয়-মিশ্রিত বিস্ময়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মহারাজ! পূজনীয় হরি মহারাজ আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

আর কোন কথাই আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। মহারাজ সস্নেহে আমার দিকে তাকাইয়া শুধু বলিলেন, "বাবা, ভগবানই একমাত্র সত্য।" জানি না কি ভাবে তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি মনে অনেক শান্তি লইয়া আমার পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

পাঠ আর সমাপ্ত হইল না। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পরম কৃপায় কয়েকমাস পরে মঠে যোগদান করিলাম। আমার ন্যায় আরও কয়েকজন যুবক সেই সময় মঠে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পরম স্নেহে আমরা বর্ধিত হইতে লাগিলাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) মাঝে মাঝে মঠে আসিতেন। পূজনীয় অভেদানন্দ মহারাজও দীর্ঘ ২৫ বৎসর আমেরিকা-প্রবাসের পর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ইঁহাদের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মঠ তখন ভরপুর। আমাদের আর কিছু চাহিবার আছে বলিয়া তখন মনে হইত না। ইঁহাদের আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া যথাসাধ্য আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে একদিন একজন সাধু ত্রস্তব্যস্তভাবে আসিয়া বলিলেন, "ওহে, শুনেছ মহারাজ আসছেন? এইবার তোমরা মঠের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্কের দর্শন পাইবে।" তাঁহার কথার অর্থ তখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। মহারাজকে ইতঃপূর্বে দুইবার তো দেখিয়াছি। সুতরাং তাঁহা হইতে আর নূতন কি পাইব বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখিলাম নানাদিক হইতে সাধু ও ভক্তগণ আসিয়া মঠে সমাগত হইতেছেন। তাঁহাদের সকলের মুখেই এক কথা—'মহারাজ আসিতেছেন।' তাঁহার নিকট হইতে না জানি তাঁহারা কি মহারত্নের সন্ধান পাইবেন!

যথাসময়ে মহারাজ আসিয়া পৌছিলেন। সত্যসত্যই দেখিলাম মঠের আবহাওয়া একেবারে বদলাইয়া গেল। পূর্বে উহা স্বর্গীয় ছিল, এখন উহা অধিকতর দিব্যভাবপূর্ণ হইল। কতক্ষণে মহারাজের দর্শন পাইবেন, কতক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে দুই-একটি কথা শুনিতে পাইবেন, ইহার জন্য সকলেই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। শুধু সাধু বা ভক্ত নন, নানা দিক হইতে শিল্পী, গুণিগণও মঠে সমবেত হইতে লাগিলেন। আমরা নবাগত ব্রহ্মচারীরা তখনও ইহার অর্থ সম্যক বুঝিতে পারি নাই।

এই সময়ে দেখিতাম অতি প্রত্যুষে মহারাজ শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁহার নিত্যকর্মাদি সমাপন করিয়া মঠের দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারাণ্ডায় একটি easy-chair-এ (আরাম-কেদারায়) আসিয়া বসিতেন। আমরা নবাগত ব্রহ্মচারীরা তৎপূর্বেই সেখানে আসিয়া দুই শ্রেণীতে বসিয়া জপ-ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতাম। তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না। তবুও তাঁহার উপস্থিতিতেই আমাদের ধ্যান-জপ জমিয়া যাইত। অধিকাংশ সময় তিনি তাঁহার সেই 'পাখীর ডিমে-তা-দেওয়া' আনমনা দৃষ্টি লইয়া স্থিরভাবে চেয়ারে বসিয়া থাকিতেন, কখনো কখনো বা আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে করিতে আমাদের উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে পাদচারণা করিতেন। দীর্ঘসময় এইভাবে কাটিয়া যাইত। সূর্যোদয় হইলে প্রথমে শ্রীশ্রীমহারাজের গুরুভ্রাতাগণ ও পরে মঠের অন্যান্য প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাদের জপধ্যানাদি সারিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতে আসিতেন। দেখিতাম পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও অভেদানন্দ মহারাজ ভূমিষ্ঠ হইয়া 'সুপ্রভাত' বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ সাষ্টাঙ্গ হইয়া ও পূজনীয় মহা-

পুরুষ মহারাজ তাঁহার সন্ত্যধ্যানোত্থিত উন্মনা চক্ষু দুইটি লইয়া হাতজোড় করিয়া 'সুপ্রভাত মহারাজ, সুপ্রভাত' বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। মহারাজ প্রত্যেককেই 'সুপ্রভাত' বলিয়া প্রণামের প্রত্যুত্তর দিতেছেন। শুধু মহাপুরুষ মহারাজের বেলায় 'সুপ্রভাত তারকদা, সুপ্রভাত' ইত্যাদি বলিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ১০।১২ বৎসরের বড় বলিয়াই বোধহয় এইরূপ করিতেন।

ইহার পর অন্যান্য সাধু ও ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। তিনিও তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও সহিত দু'একটি কথা বলিয়া, কাহারও সহিত বা একটু ফষ্টিনষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন। কিন্তু দেখিতাম সকলের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইতেছে।

সকালে কাজের ঘণ্টা পড়িলে আমরা সকলে নিজ নিজ কাজে চলিয়া যাইতাম। মহারাজও সামান্য কিছু জলখাবার খাইয়া মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বেড়াইতে যাইতেন। তাঁহাকে এ সময় যে মূর্তিতে দেখিয়াছি তাহা কখনও ভুলিবার নয়। দেখিতাম মহারাজ ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া চলিয়াছেন, তাঁহার সেবক তাঁহার মাথায় একটি ছাতা ধরিয়া অতি দ্রুতপদে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। কেন জানিনা, তখন মনে হইত মহারাজের শরীর যেন দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, চলিবার সময় তাঁহার চরণ যেন ভূমি স্পর্শ করিতেছে না! তাঁহার এ মূর্তি যখনই দেখিবার সৌভাগ্য হইত তখনই একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতাম।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর আবার আমরা মহারাজের নিকট মিলিত হইতাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, অভেদানন্দ মহারাজ, বিজ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি মহারাজের গুরুভ্রাতাগণ, সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) প্রভৃতি স্বামীজীর সাক্ষাৎ শিষ্যগণ ও অন্যান্য প্রাচীন মহারাজগণ যাঁহারাই তখন মঠে থাকিতেন সকলেই আসিয়া মহারাজের নিকট আমাদের সহিত মিলিত হইতেন। কেহ বা চেয়ারে বসিতেন, কেহ বা আমাদের সহিতই মেঝেতে বসিয়া যাইতেন। কিছুক্ষণ সকলে চুপ করিয়া থাকিবার পর, মহারাজ আমাদের বলিতেন, "তোদের কার কি প্রশ্ন আছে কর্, না হয় পেসনকেই (হরিপ্রসন্ন মহারাজ বা বিজ্ঞান মহারাজ—মহারাজ তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন) কর্।" আমাদের মুখে প্রায়ই কোন প্রশ্ন জোগাইত না, তখন মহারাজ নিজেই আমাদের হইয়া বিজ্ঞান মহারাজকে প্রশ্ন করিতেন। দেখিতাম ছোটছেলে মাষ্টারের নিকট পড়া দিবার সময় যেমন ভয়ে জড়সড় হয়, বিজ্ঞান মহারাজও সেইরূপ অতি সংকোচের সহিত মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। পরে এই প্রশ্নই আবার অন্যান্য মহারাজগণকে করা হইত। তাঁহারাও নিজ নিজ ভাবানুযায়ী উহার যথাযথ উত্তর দিতেন। প্রত্যেকেরই উত্তর অতি সুন্দর বলিয়া মনে হইত এবং আমাদের নিকট একটি নূতন আলোকপাত করিত। কিন্তু সর্বশেষে মহারাজ যখন উহার উত্তর দিতেন, তখন মনে হইত ইহাই তো উহার শেষ উত্তর—ইহা না হইলে উহা তো অপূর্ণ থাকিয়া যাইত।

এইরূপে একদিন মহারাজ বলিলেন, "তোরা প্রশ্ন কর্ তো, ভগবানকে দর্শন করিলে তাহার অবস্থা কিরূপ হয়।" ঐ ভাবে প্রশ্নটি সকলের নিকট ঘুরিল। সকলেই অতি চমৎকার উত্তর দিলেন। কিন্তু পরিশেষে মহারাজ যখন বলিলেন, "কেন, উপনিষদের সেই শ্লোকটি বল্ না—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"—তাঁহাকে দর্শন করিলে আমাদের হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া যায়, সর্বসংশয় দূর হয়, সকল কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন মনে হইল—ইহাই তো ঠিক উত্তর, ভগবদ্দর্শন হইলে এইরূপই তো হইবার কথা।

(ক্রমশঃ)

বস্তুকণা

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর বিশ্বরঞ্জন নাগ

বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা পরমাণুর কেন্দ্রীন-গুলির নিজস্বতার গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি। তেজষ্ক্রিয়তার আবিষ্কারের পরে এই নিজস্বতার গণ্ডী ভেঙ্গে যায়। কতগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হয় যাদের কেন্দ্রীনগুলি নিজে নিজেই রূপ পরিবর্তন ক'রে এক পদার্থের কেন্দ্রীন থেকে অন্য পদার্থের কেন্দ্রীনে পরিণত হয়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রেডিয়াম। তেজষ্ক্রিয়-পরিবর্তনের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই ধরনের পদার্থের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ও আলফা-কণা, যা মূলতঃ হিলীয়ামের কেন্দ্রীন, স্বাভাবিকভাবেই বিকীর্ণ হয় এবং এই বিকিরণের ফলে পরমাণুগুলির কেন্দ্রীনের রূপ পরিবর্তিত হয়। স্বভাবতই মনে হয় পদার্থগুলির কেন্দ্রীনেরও বিশেষ গঠন আছে। বিরানব্বইটি কেন্দ্রীন সম্পূর্ণভাবে আলাদা নয়, বরং ভাবা উচিত কোন সাধারণ কণার সমন্বয়েই বিভিন্ন কেন্দ্রীন গঠিত। মনে করা যেতে পারে যে, সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হাইড্রোজেনের পরমাণুর কেন্দ্রীন বা প্রোটন এই সাধারণ কণা। বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটনের সমন্বয়েই বিভিন্ন কেন্দ্রীন গঠিত। কিন্তু তড়িতের পরিমাণ ও ভরের সামঞ্জস্য বুঝতে হলে এ সিদ্ধান্তও করতে হয় যে, কেন্দ্রীনে প্রোটনের সঙ্গে কিছু ইলেকট্রনও যুক্ত থাকে। যেমন ধরা যাক হিলীয়ামের কেন্দ্রীন-এর ভর প্রায় চারটি প্রোটনের সমান, কিন্তু তড়িতের পরিমাণ দুটি প্রোটনের তড়িতের পরিমাণের সমান। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, হিলীয়ামের কেন্দ্রে চারটি প্রোটনের সঙ্গে দুটি ইলেকট্রনও আছে তাহলে এই ভর ও তড়িতের পরিমাণের সামঞ্জস্য হয়। তেজষ্ক্রিয়-পদার্থ নিয়ে পরীক্ষার পরে তাই সিদ্ধান্ত হয় যে, পদার্থের মূল স্বরূপ হ'ল দুটি বস্তুকণা—ইলেকট্রন ও প্রোটন। বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটন ও ইলেকট্রনের মিলনে বিভিন্ন কেন্দ্রীন ও বিভিন্ন পরমাণু গঠিত। তাই বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানীরা বস্তুজগতে যে-ঐক্যের সন্ধান করছিলেন, ইলেকট্রন ও প্রোটনে সেই ঐক্যের সাক্ষাৎ মিলল। অতি বিচিত্র বস্তুজগতের মূল স্বরূপ হ'ল ইলেকট্রন ও প্রোটন। এদেরই বিভিন্ন সংখ্যার মিলনে বস্তু-জগতের এই বৈচিত্র্য।

কালক্রমে কেন্দ্রীনের গুণাগুণ নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীনকে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমষ্টি ধরে নিলে তড়িতের পরিমাণ ও ভরের বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু অন্যান্য কতগুলি গুণের ব্যাখ্যা হয় না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য হাইসেনবার্গ অনুমান করেন যে, কেন্দ্রীনে কোন ইলেকট্রন নেই, আছে তৃতীয় এক ধরনের কণা, যার ভর প্রোটনের কাছাকাছি, কিন্তু এই কণাটিতে কোন তড়িৎ নেই। এভাবে কেন্দ্রীনের সব গুণাগুণ বুঝতে গিয়ে কণাতত্ত্বে জটিলতাকে প্রশ্রয় দিতে হ'ল এবং এই নূতন কণাটির নাম দেওয়া হ'ল নিউট্রন। অল্পকালের মধ্যেই হাইসেনবার্গের অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। চাডউইক বেরিলিয়ামের তেজষ্ক্রিয়-রশ্মির বিশ্লেষণ করে নিউট্রনের অস্তিত্বের সন্ধান পান। নিউট্রন আবিষ্কৃত হ'লে বিজ্ঞানীদের কাছে পদার্থের মূল স্বরূপ সম্পর্কে যে

ধারণাটি স্বীকৃত হয় তা হ'ল এই যে—বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বস্তুর গঠনের মূলে আছে তিন ধরনের বস্তুকণা। বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটন ও নিউট্রনের মিলনে বিভিন্ন ধরনের পরমাণুর কেন্দ্রীন তৈরী হয়। কোন কেন্দ্রীনের রাসায়নিক স্বকীয়তা আসে প্রোটনের সংখ্যা থেকে। যেমন কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন থাকলে পদার্থটির রাসায়নিক গুণাগুণ হবে হাই-ড্রোজেনের মত, ছুটি থাকলে হিলীয়ামের মত, ছটি থাকলে কার্বনের মত। সাধারণতঃ কোন কেন্দ্রীনে প্রোটনগুলির সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যার নিউট্রন যুক্ত থাকে। ছুটি প্রোটনের সঙ্গে ছুটি, যেমন হিলীয়ামের কেন্দ্রীনে ; বা ছটির সঙ্গে ছটি, যেমন কার্বনের কেন্দ্রীনে। কিন্তু কোন কোন পদার্থের কেন্দ্রীনে বিভিন্ন সংখ্যার নিউট্রন থাকতে পারে। এই রকম কার্বন, নিয়ন, ক্লোরিন, ইউরেনিয়াম এমনি অনেক পদার্থেই হতে দেখা যায়। নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্যে এই পদার্থগুলির পারমাণবিক ভরের তারতম্য হয়, কিন্তু প্রোটনের সংখ্যা এক থাকায় রাসায়নিক গুণ একই থাকে। একই রাসায়নিক গুণযুক্ত ভিন্ন পারমাণবিক ভরের পদার্থ বা আইসোটোপ (Isotope) এভাবেই উদ্ভূত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রীনের প্রোটনের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে ততক্ষণ পদার্থটি তার স্বকীয় সত্তা বজায় রাখে, কিন্তু কোনভাবে প্রোটনের সংখ্যার পরিবর্তন হলে পদার্থটির স্বরূপ পরি-বর্তিত হয়ে অন্য পদার্থের রূপ নেয়। তেজ-স্ক্রিয়ায় এমনি ধরনের পরিবর্তন হয়। প্রোটন ও নিউট্রনের সম্মিলনে তৈরী কেন্দ্রীনের চার-পাশে প্রোটনের সমানসংখ্যক ছড়িয়ে-থাকা ইলেকট্রন নিয়েই পদার্থগুলির পরমাণু সম্পূর্ণ হয়। বিচিত্র বিশ্বের বৈচিত্র্য যেমন আসে বিরানব্বইটি পরমাণুর মিলনের বিভিন্নতা থেকে, তেমনি বিভিন্ন পরমাণুর সৃষ্টি হয় কেন্দ্রীনে বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটনের সমাবেশ থেকে। নিউট্রনগুলি দেয় কেন্দ্রীনের স্থায়িত্ব আর ইলেকট্রনগুলি দেয় পরমাণুগুলির বৈদ্যুতিক নিরপেক্ষতা ও অন্য পরমাণুর সঙ্গে মিলন-ক্ষমতা।

কণাতত্ত্বে পরমাণুর এই সরল চিত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রথম সমস্যা দাঁড়ালো কেন্দ্রীনের স্থায়িত্ব নিয়ে। কেন্দ্রীনে যদি শুধুমাত্র প্রোটন ও নিউট্রনই থাকে তাহলে কেন্দ্রীনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয় আসে, কেননা প্রোটনের একই ধরনের তড়িৎজনিত বিকর্ষণীশক্তির ফলে ছড়িয়ে পড়ার কথা। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য এলো নূতন অনুমান। অনুমানটি করেন ইউকাওয়া। তিনি বলেন প্রোটন ও নিউট্রন সম্পূর্ণভাবে আলাদা ছুটি কণা নয়। তৃতীয় একটি কণার মাধ্যমে এরা রূপ পালটিয়ে প্রোটন থেকে নিউট্রনে বা নিউট্রন থেকে প্রোটনে পরিবর্তিত হতে পারে। কেন্দ্রীনের নিউট্রন ও প্রোটনকে তাই ভাবা উচিত নিউক্লিয়ন বলে। নিউক্লিয়ন এই নূতন কণাটির অবস্থানভেদে কখনও প্রোটন, কখনও নিউট্রন-রূপে দেখা দেয়। অবশ্য কেন্দ্রীনের বাইরে যদি কোন নিউক্লিয়ন প্রোটনরূপে বেরিয়ে আসে তাহলে তার স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু যদি নিউট্রনরূপে বেরিয়ে আসে তাহলে স্বল্প-কালের মধ্যেই প্রোটন ও এই তৃতীয় কণায় পরিণত হয়ে যায়। কেন্দ্রীনে নিউট্রন ও প্রোটনের স্বতঃ রূপ-পরিবর্তন থেকেই স্থায়িত্ব আসে। তৃতীয় কণাটি যেন হাইফেনের মত নিউট্রন ও প্রোটনগুলিকে কেন্দ্রীনে ধরে রাখে। ইউকাওয়া হিসাব কষে তৃতীয় কণাটির ভর ও তড়িৎগুণ নির্ধারণ করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই কণাটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং এর

নাম হয় মেসন। কেন্দ্রীনের এই মেসন ছাড়াও আরও কয়েক রকমের মেসন পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে কণাতত্ত্বে কণার সংখ্যা তিন থেকে অনেক বেড়ে যায়।

বস্তুকণার স্বরূপ অনুধাবনের পথে আর একটি জটিলতার সৃষ্টি হয় গাণিতিক পর্যালোচনা থেকে। ইলেকট্রনের স্বরূপ নিয়ে বিশেষ গবেষণা করে ডিরাক সিদ্ধান্ত করেন যে, ইলেকট্রনের সমান ভরের কিন্তু বিপরীতধর্মী তড়িৎযুক্ত আর একটি কণা থাকা উচিত। সিদ্ধান্তটি ছিল নিতান্তই গাণিতিক। কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মিতে এই কণাটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং কণাটির নাম হয় পজিট্রন। পজিট্রনের আবিষ্কার বস্তুকণার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করে। পজিট্রন শুধুমাত্র একটি নূতন কণা নয়, এটি হ'ল সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কণা। একে ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কণা বলে ভাবা উচিত বা একে ইলেকট্রনের প্রতিকণা বলা যেতে পারে। পজিট্রন ও ইলেকট্রনের বিপরীতধর্মিতার ফলে যদি কখনও একটি পজিট্রন ও ইলেকট্রন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন এদের বস্তুস্বরূপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এদের মধ্যে যে শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে তা আবার শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আবার শক্তিকণা খুব জোরালো হলেও তা থেকে একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রন জন্ম নিতে পারে। পজিট্রনের আবিষ্কারে তাই বস্তুজগৎ ও শক্তির স্বরূপের সমাত্মকতা অতি পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। দেখা গেল যে কণাগুলি শক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অন্য কোন প্রকৃতির বিকাশ বস্তুকণারূপে প্রতিভাত হলেও আসলে তারাও শক্তিকণা থেকে উদ্ভূত।

পজিট্রন যেমন ইলেকট্রনের প্রতিকণা, তেমনি সব কণারই প্রতিকণা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রোটনের প্রতিকণা হ'ল অ্যান্টি-প্রোটন, যার গুণাগুণ সব দিক দিয়ে প্রোটনের মত, কিন্তু এর তড়িৎগুণ ঋণাত্মক। নিউটনের প্রতিকণা হ'ল অ্যান্টি-নিউট্রন। এদের মধ্যে আছে একটি যুক্তগুণের বৈপরীত্য। যতরকমের কণা আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সবারই প্রতিকণাও আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই প্রতিকণা দিয়ে তৈরী জগৎও কল্পনা করেছেন, যাকে বলা হয় প্রতিজগৎ। আমাদের জগৎ যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন দিয়ে তৈরী, প্রতিজগৎ তেমনি পজিট্রন অ্যান্টি প্রোটন ও অ্যান্টি-নিউট্রন দিয়ে তৈরী। যদি এমনি প্রতিজগতের অস্তিত্ব কোথাও থাকে এবং আমাদের জগতের সঙ্গে কখনও তার সংঘর্ষ হয়, তাহলে এই বস্তুজগৎ সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়বে। আবার প্রতিকণার অস্তিত্ব থেকে এই জগতের মূল স্বরূপের একটি সহজ চিত্রও দাঁড় করানো যায়। ভাবা যেতে পারে কোনও আদিকালে এই বিশ্বের প্রকাশ ছিল শুধুমাত্র শক্তিরূপে। কোন এক সময়ে এই শক্তি নিজের খেয়ালে পরিবর্তিত হয়ে কণা ও প্রতিকণায় রূপান্তরিত হয়। প্রতিকণাগুলির স্থায়িত্ব কম বলে কালের গতিতে তারা হারিয়ে গেছে, রয়ে গেছে কণাগুলি। সেই কণাগুলি বিভিন্নভাবে মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছে দৃশ্যমান জগৎ।

বস্তুকণার মাধ্যমে বিশ্বকে বুঝতে হলে আজ অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। যে বিভিন্ন রকমের বস্তুকণা আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের গুণাগুণ বাহ্য জগতের সঙ্গে আপাতবিরোধী। যদিও সাধারণ বস্তুকণার মত গতিহীন অবস্থায়ও এদের ভর আছে, কিন্তু এদের আয়তন ও অবস্থান কখনও নির্দিষ্ট করা যায় না। অসংখ্য এদের স্বরূপ, বৈচিত্র্যেরও শেষ নেই। এক

স্বরূপ থেকে প্রতিনিয়ত অন্য স্বরূপে এরা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনগুলিও নির্ধারিত হয় এদের নানা রকম অদ্ভুত গুণ দ্বারা, যার সঙ্গে বস্তুজগতের সাধারণ গুণাগুণের কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুকণার বিজ্ঞানীরা যে ভাষায় এদের স্বরূপ নিয়ে পর্যালোচনা করেন, আমাদের পরিচিত ধ্যানধারণার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। যে সরলতার আশায় বিজ্ঞানীরা বস্তুকণার স্বরূপ নিয়ে পর্যালোচনা আরম্ভ করেন, সে-সরলতা ক্রমান্বয়েই নূতন জটিলতায় হারিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা এখনও আশা ছাড়েননি এবং প্রচেষ্টা চলছে বস্তুকণার আপাত-বৈচিত্র্যের জট ছাড়িয়ে ঐক্যসূত্রটি খুঁজে বার করার।

কণাতত্ত্ব খুব জটিল অবস্থায় থাকলেও একটি পরম সত্য কিন্তু আজ বিজ্ঞানীদের আয়ত্তে এসেছে। "বস্তুজগতের মূল স্বরূপ কি?"—এর উত্তরে আজ এক কথায় বলা যেতে পারে যে, এর মূল স্বরূপ হ'ল শক্তি। শক্তিই কণা ও প্রতিকণায় রূপান্তরিত হয়ে কণার মাধ্যমে বহুজগৎ সৃষ্টি করছে। শক্তি যেমন আলো, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত, তেমনি আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনরূপেও প্রকাশিত। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত দার্শনিকদের সিদ্ধান্তের মতই। দার্শনিকরা যাকে সৃষ্টিকর্তা বলেন, তাঁকে শক্তির ঘনীভূত রূপ ধরে নিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে কোন সাধারণ বিভেদ থাকে না। অবশ্য দার্শনিকরা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, এই ঘনীভূত শক্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক চেতন সত্তা, চেতন ঘনীভূত শক্তিই সৃষ্টির আদি এবং সূক্ষ্মভাবে চরাচরে ছড়িয়ে আছে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চৈতন্যকে জানবার কোন উপায় বিজ্ঞানীদের জানা না থাকায় দর্শনের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিজ্ঞানের কোন বক্তব্য নেই।

ভগিনী নিবেদিতা শতবার্ষিকী

(গান)

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

কে তুমি আসিলে প্রতীচ্য হইতে পুজিতে ভারত আজ।
করিলে মায়ের সেবা (তব) জীবনের একমাত্র কাজ॥
গুরুপদে করি আত্মসমর্পণ
(ত্যাগ-) তিতিক্ষার ব্রত করিলে বরণ
দেখালে অপূর্ব আদর্শ জগতে ধরি সন্ন্যাসিনী-সাজ॥
জাগাতে সুপ্ত ভারতে তখন করেছিলে আত্মজীবন পণ।
এনেছিলে এক অতুল শক্তি জাগায়ে ভারত-সমাজ॥
বিবেকানন্দের মানস-কন্যা
আনিলে দেশে সেবার বন্যা
সার্থক করিলে নাম নিবেদিতা পরিহরি ভয় মান লাজ॥

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ

ডক্টর দীপককুমার বড়ুয়া

গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর যে অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। সেই মহান্ পুরুষের ব্যক্তিত্বে এবং সমুন্নত মহিমায় গান্ধীজী অভিভূত হয়েছিলেন। বুদ্ধপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "পৃথিবীতে যদি এমন কোন আদর্শবাদী শিক্ষক, ধর্মোপদেষ্টা বা ধর্মপ্রচারক থেকে থাকেন, যে উপদেষ্টা কার্যকারণসম্বন্ধ ও কর্মফলের চিরন্তনী নিয়মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তবে তিনি হলেন গৌতম বুদ্ধ।" ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি নিঃশেষে বর্জন করে বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সাথে শান্তি ও সুখের অংশ ভাগ করে নিতে। পৃথিবীর যে সব মানুষ সত্যের সন্ধানে যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে এসেছেন, যাঁরা সত্য আবিষ্কারের জন্য এবং সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরিমেয় দুঃখ ভোগ করেছেন, ভগবান বুদ্ধ ছিলেন তাঁদেরই একজন। আর তাঁর অহিংসা-নীতির যে প্রতিক্রিয়া তা যুগ যুগ ধরে প্রবহমাণ এবং যতদিন কেটে যাবে ততই তার প্রভাব অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠবে। গান্ধীজী তাই-ই বিশ্বাস করতেন। বুদ্ধদেবের ধর্মীয় আদর্শ শুধুমাত্র এশিয়ার নিজের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্য। তাই মহাত্মাজী এশিয়ার জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের অমৃতময় বাণী পুনরায় নতুন করে উপলব্ধি করে সমগ্র পৃথিবীর উদ্দেশ্যে প্রচার করতে অনুরোধ করেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শ তাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। বুদ্ধদেবের ভাবধারা-সম্পর্কীয় যে উচ্চাঙ্গের অনুভূতি তা তিনি কেবলমাত্র অনুধ্যান করেই ক্ষান্ত থাকেননি—তাকে বাস্তবায়িত করতে সব সময় প্রস্তুত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মতো গান্ধীজীও মনে করেন যে, বুদ্ধদেব কোন নূতন ধর্মমত প্রচার করতে আসেননি। গৌতম ছিলেন হিন্দু-ধর্মের একজন অতি উঁচুদরের সংস্কারক যাঁর সংস্কারকার্য ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁর সম-সাময়িক জনসাধারণের উপর এবং অনাগত-কালের সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর তিনি সেই সংস্কারকার্যের প্রচণ্ড প্রভাব কার্যকরী ভাবে রেখে গেছেন। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে "বুদ্ধদেব নিজে ছিলেন একজন আদর্শ ভারতবাসী আর শুধু ভারতবাসীই নন, তিনি ছিলেন হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন পরম ধর্মনিষ্ঠ আদর্শবাদী হিন্দু।" তাঁর সমগ্র জীবনের কার্য-ধারা পর্যালোচনা করে মহাত্মাজী দেখেছেন বুদ্ধদেবের জীবনে এমন কিছু হয়নি যাতে মনে হয় তিনি হিন্দুত্বকে পরিত্যাগ করে নূতন ধর্মমত গ্রহণ করেছেন। কারণ বুদ্ধের উপদেশাবলীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় এবং উল্লেখযোগ্য অংশ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের সেজন্য মনে করেন:

"ভগবান বুদ্ধ অসাধারণ ত্যাগের দ্বারা, অসামান্য বৈরাগ্য-সাধনের দ্বারা এবং জীবনের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার দ্বারা হিন্দুধর্মের উপরে এমন এক ছাপ রেখে গিয়েছেন, হিন্দুধর্মকে এমন-ভাবে প্রভাবিত করেছেন যে, হিন্দুধর্ম এই

মহান্ শিক্ষকের নিকট অপরিসীম ঋণী থাকবে।" প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের যা শ্রেষ্ঠতম, বুদ্ধদেব তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দু আদর্শের যে-সব মহৎ ভাবধারা বেদ ও পুরাণের মধ্যে গুপ্ত ছিল তিনি তা সমসাময়িক জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের মতো তাঁর বাণীও ছিল বহুবিস্তৃত, বহুব্যাপক ও পরমত-সহিষ্ণুতার প্রতীক এবং তাই তাঁর ধর্মমত এত সহজে পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। গান্ধীজী বলেছেন: "আমি নিজেকে যদি বুদ্ধদেবের অনুসরণকারী বলে অভিহিত করি এবং তাতে যদি আমি কোনরকম অশোভন আখ্যাও প্রাপ্ত হই, তবু আমি দাবী করবো, আমি বলবো যে, বুদ্ধের আদর্শ অনুসরণ করে আমি হিন্দু হিসাবে জয়লাভ করেছি। ভগবান বুদ্ধদেব কখনও হিন্দুধর্মকে পরিহার করেননি, উপরন্তু তিনি হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তিকে প্রসারিত করেছিলেন।"

বুদ্ধদেবের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী মনে করেন যে, ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থার ভাব বুদ্ধদেবের মূল আদর্শবাদের যে ভাবধারা তার সম্পূর্ণ বিরোধী অর্থাৎ তিনি যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না, একথা ঠিক নয়। গৌতম নিঃসন্দেহে প্রচলিত ঈশ্বর-বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। নাম-রূপ-গুণ-মণ্ডিত ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি সাধারণভাবে নৈতিক বিধানে আস্থাবান ছিলেন।

গান্ধীজী মনে করতেন, বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ অবদান হল মানব-সমাজের প্রতি তাঁর প্রেম ও ভালবাসার এক মহান নীতি। মানুষ যত হীন, নীচ, পাপী, ঘৃণ্য হোক, তিনি সকলের প্রতি সমানভাবে ভালবাসার এই উচ্চ আদর্শ প্রচার করে গেছেন। পরমকারুণিক বুদ্ধ করুণার বাণী প্রচার করে ধরণীতলকে কলঙ্কশূন্য করেছেন। তাঁর প্রেম, অপরিমেয় মৈত্রী মানব-সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের মানুষের প্রতি, এমনকি নিম্নতম জীবদের প্রতিও সমানভাবে প্রসারিত ছিল, তাই তিনি মহান করুণাঘন।

জাতিবিভাগ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের উল্লেখ করে গান্ধীজী বলেছেন, গৌতম সমসাময়িক ভারতবর্ষে যে-ধরনের জাতি-বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত ছিল তা একেবারে ভুল এবং ঐ রকম বিভেদের সকল শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন। তথাপি তিনি মনে করেন বুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্মকে পরিত্যাগ করেননি। কেবল জন্মের ভিত্তিতে তিনি শ্রেণীবিভাগ মেনে নেন নি; কারণ তিনি জানতেন বর্ণ যখন জীবন দান করে, জাতিভেদ তাকে হত্যা করে এবং অস্পৃশ্যতা হল জাতিবিভাগের ঘৃণ্যতম অবদান।

বুদ্ধভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত মহাত্মা গান্ধী চিরদিনই ছিলেন ভগবান তথাগতের একজন দীনতম সেবক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হিংসা ও নীচতার মধ্যেও প্রেমের অমৃতবাণীর এক শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। তাই বর্তমান কালে বুদ্ধোপাসনার একান্ত প্রয়োজন। গান্ধীজী নিজের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই দেখিয়েছেন কিভাবে বুদ্ধের উচ্চতম নৈতিক আদর্শ পালন করে জীবনকে সুন্দর এবং মহিমান্বিত করা যায়। এদিক থেকে তাঁকে বুদ্ধের একজন আধুনিক শিষ্য বলে অভিহিত করা যায়।

জৈন সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে পশ্চিমভারত

শ্রীমিহিরমোহন মুখোপাধ্যায়

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ব-ভারতে মগধে একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। দীর্ঘ পরিক্রমায় বৌদ্ধধর্ম সারা ভারতবর্ষ তথা বহির্বিশ্বে প্রসার লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে মাতৃভূমি হইতে বিদায় লয়; প্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যে শুধু সিংহল, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া ও তৎসংলগ্ন স্থানে উহা সীমাবদ্ধপ্রায়। অনুরূপভাবে জৈনধর্ম যদিও ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায় নাই—তবে জন্মস্থান হইতে বিলুপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে একটি বিশেষ ধর্মের প্রতিভু হিসাবে ক্ষীণধারা বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া জৈনধর্ম ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে কি বিরাট ও ব্যাপকভাবে রাজনীতি, সামাজিক জীবন, ধর্ম, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ক্ষুদ্র পরিসরে অতীতের সেই কয়েকটি পৃষ্ঠা স্মরণ করিবার প্রচেষ্টাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষদিকে জৈনধর্ম সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসভূমি মগধ হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমে মালব, উত্তরে মথুরা, এবং দাক্ষিণাত্যে তামিলদেশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহার ভৌগোলিক পরিধি। যদিও ধীরে ধীরে জন্মভূমি মগধে তাহার গৌরব ক্ষীণ হইয়া আসে, কিন্তু অপরপক্ষে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে তাহার বিস্তার ঘটে অত্যন্ত দৃঢ় ও ব্যাপকভাবে। এই দ্রুত উন্নতির মূলে কিছুটা রাজদাক্ষিণ্য ছিল, সে কথা অবিসংবাদিত। কিন্তু বিশেষ করিয়া বণিক ও শ্রেষ্ঠীদের অকৃপণ সাহায্যে ও মধ্যবিত্ত সরলচেতা উপাসকমণ্ডলীর একাগ্রতায় তাহা হইয়াছে পুষ্ট ও সক্ষম।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, জৈনধর্ম তাহার কেন্দ্রবিন্দু হইতে সরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় আসিয়াছে বিরাট পরিবর্তন। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন। শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক শ্রেণী-বিভাগ বা পুরোহিতমণ্ডলীর মধ্যেই নয়, উপাসকদের মধ্যেও এই শ্রেণী-বিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই ব্যাপারে আলোচনীয় শ্রেণীর দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক বিভাগেই নয়, পরোক্ষে কয়েকটি শাখারও উদ্ভব হইয়াছিল। তাই দেখি, দক্ষিণভারতে সংঘ ও গণ। উত্তর-ভারতে কুল, শাখা ও গচ্ছ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরলচেতা সাধারণ উপাসকদের মনে এই শাখাবিভাগ যে সময়বিশেষে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

গুপ্তযুগ ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ অধ্যায়। গুপ্তসম্রাটগণ পরমবৈষ্ণব ভাগবত-মতাবলম্বী হইয়াও অন্য ধর্মের ব্যাপারে তাঁহাদের উদারতা প্রকাশ করিতে কোনভাবেই কুণ্ঠিত হন নাই। তাই একদিকে যখন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিরাট প্রসার হইতে দেখা যায়, অন্যদিকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপ্তিও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য।

শুধুমাত্র রাজানুকূল্যেই যে জৈন সংস্কৃতি পুষ্ট নয়, পরন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছ হইতেও যে বিশেষ আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তকালীন কয়েকটি লিপি হইতে। ৪৩২ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত মথুরা লিপিতে ধর্মপ্রাণা উপাসিকা কর্তৃক জৈনমূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ। স্কন্দগুপ্তের সমকালীন ৪২৬ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরি শিলালেখে জৈন উপাসক কর্তৃক পার্শ্বনাথের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা অথবা ৪৬১ খৃষ্টাব্দের কাহমলিপিতে পাঁচটি জৈনমূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। উল্লিখিত লিপিগুলি সার্থকভাবে প্রমাণ করে যে, সুদূর মথুরা, উদয়গিরি ও পাওয়াতে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতি তাহার প্রাণশক্তি লইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত।

মাতৃভূমি বিহার (মগধ) ও পূবে বঙ্গদেশ তাহাদের পূর্ব গৌরব ধরিয়া রাখিতে না পারিলেও একই সময়ে যে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল, ইহার পরিচয় পাওয়া যায় ৪৭৮ খৃঃ-র পাহাড়পুর লিপিতে। জৈনবিহার-রক্ষাকল্পে এক উপাসক দম্পতি কয়েকটি গ্রাম দান করেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের এই বিহার খুব সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক পাহাড়পুর (বর্তমান রাজসাহী জেলা, পূর্ব পাকিস্তান) স্তূপের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, এই 'বিহার' একদিন বারাণসীর নীরগ্রন্থ গুরু গুহান্দিন ও তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তিনি বারাণসী হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন গুপ্তোত্তর বাংলাদেশে জৈনধর্ম ও সংস্কৃতির বহুল প্রসার ও প্রচার হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ নিহিত আছে সমসাময়িক সাহিত্যে, শিল্পে ও মননে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিশিষ্ট চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায় পশ্চিমে তক্ষশীলা হইতে পূর্বে বিপুল পর্যন্ত তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাহা ছাড়া পূর্বে পুণ্ড্রবর্ধন ও সমতটে দিগম্বর সম্প্রদায়ের নীরগ্রন্থের বহুল প্রচার হয়।

একে অন্যকে লইয়া যে ধর্মনিরপেক্ষ লঘু আলাপ-আলোচনা হইত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বাণের হর্ষচরিতে, 'উলঙ্গ ক্ষপণকে'র উল্লেখে বা দণ্ডির দশকুমারচরিতে অনুরূপ আলোচনায়।

মধ্যযুগের প্রথম পর্বে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমভারতে সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে যে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরাট প্লাবন দেখা দেয়, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় সমকালীন প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষে, শিলালেখে, সাহিত্যে ও শিল্পে। বস্তুতঃ ইহা আগামী গৌরবময় দিনের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

সপ্তম অষ্টম শতকে দিগম্বর সম্প্রদায় গুজরাটের কয়েকটি স্থানে ধীরে ধীরে আধিপত্য-বিস্তারে প্রয়াসী। জিনসেন তাঁহার হরিবংশ পুরাণে (৭৮৩ খৃঃ) শান্তিনাথ মন্দির স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। অষ্টম শতকের শেষদিকে দিগম্বর সম্প্রদায় প্রভাসে তাঁহাদের প্রভাব-বিস্তারে সাফল্য লাভ করেন। জিন চন্দ্রপ্রভার মন্দির বা তাহার কিছু পরে উন্নতপুরে পার্শ্বনাথের মন্দির স্থাপনা সেই সাফল্যের কয়েকটি বিশেষ নিদর্শন।

বলভীর (বর্তমান সৌরাষ্ট্র) ন্যায় রাজস্থানে সেই সময় কোন উন্নত কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিও বুন্দির নিকট কেশর-পুরে পঞ্চম শতকের এক জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া (৬৮৮ খৃঃ) কায়োৎসর্গ-ভঙ্গিমায় দুইটি ধাতু-নির্মিত তীর্থঙ্কর-মূর্তি পাওয়া যায়। সমসাময়িক

সাহিত্যে ও সন্দর্ভে পশ্চিমভারতে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। উদ্যোত্ত সূরী তাঁহার কুবলয়মালায় (৭৭৯ খৃঃ) সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে ভিল্লমল্লে এক জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। হরিভদ্র সূরী (অষ্টম শতাব্দীতে) চিত্রকূট মন্দিরের বিষয় উল্লেখ করেন।

অষ্টম শতাব্দী হইতে রাজন্যবর্গ তথা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিকর্তারা জৈনধর্মের প্রতি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। কয়েকজন নৃপতি স্বেচ্ছায় জৈনধর্ম গ্রহণ করিলেন। চাপোৎকটের অধিপতি বলরাজ এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। দশম শতকে এক অজ্ঞাত রাজবংশের পুরোধা কর্তৃক রাজসিন্ধপুরে 'জিন ভবন'-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। চালুক্য রাজবংশের অধিপতি প্রথম মূলরাজ (৯৪২—৯৫) দিগম্বর সম্প্রদায়-গোষ্ঠীর নিমিত্ত 'মূলবসতিকা-প্রাসাদ' নির্মাণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য বংশধর চামুণ্ডরাজ ও দুর্লভরাজ জৈনধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং প্রথম ভীমদেব (১০২২—৬৪) জৈনধর্মে অটুট বিশ্বাসী ছিলেন।

কেবলমাত্র রাজদাক্ষিণ্যেই নয়, সময়বিশেষে মন্ত্রিবর্গ তথা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের দ্বারা জৈনধর্ম বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। তাহার ইতিহাস নিহিত আছে দিলওয়ারায় আবু পাহাড়ের উপর আদিনাথের মন্দির-পরিকল্পনায় -নিঃসন্দেহে ইহা ভারতীয় স্থাপত্য-শৈলীর এক নূতন দিগ্‌দর্শন। ইহার স্থাপনকর্তা দণ্ডনায়ক বিমলা কেবলমাত্র একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীই ছিলেন না—ধর্মের প্রতি ছিল তাঁহার অটুট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সরল। মন্দিরগাত্রের স্ফটিকের স্বচ্ছতায় সেই সরল মন আজও যেন উদ্ভাসিত। ইতিহাস একদিকে যেমন বিমলা বাসাহীকে অমর করিয়া রাখিয়াছে তাঁহার বিরাট কীর্তির জন্য, অনুরূপভাবে বাস্তুপাল ও তেজপাল ভ্রাতৃদ্বয় সেই তালিকায় পরবর্তী মূল্যবান সংযোজন। বাঘেলা রাজবংশের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে বাস্তুপাল একদিকে যেমন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌, অন্যদিকে কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু শিল্পরসিক হিসাবে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের যুগ্মপ্রচেষ্টায় প্রায় অর্ধশতাধিক জৈন মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। বাস্তুপাল বিহার (১২৩১), গির্নার (গিরিনগর) পর্বতের উপর পার্শ্বনাথের মন্দির, বা প্রভাসের অষ্টাপদ প্রাসাদ সেই তালিকার বিশেষ মূল্যায়ন করে।

একাদশ শতাব্দীতে জৈন সম্প্রদায় শক্তিশালী সংঘে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা নিজেদের আত্মপ্রচেষ্টায় যথেষ্ট সচেতন। রাজকোষের দাক্ষিণ্য বা বিশিষ্ট রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও বণিক বা শ্রেষ্ঠী-গোষ্ঠীর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে এবং সর্বোপরি সহস্র উপাসকবৃন্দের সামান্যতম অর্থসাহায্যেও সেই ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছিল পূর্ণ। রাজকোষ অপেক্ষা সাধারণ উপাসক-গোষ্ঠীর তথা বণিক ও শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠ-পোষকতায় সে তখন পরিপূর্ণ, তাই তাহাদের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিভ্রমণ বা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে গমনাগমন জৈন ধর্ম বা সংস্কৃতিকে কোন এক ভৌগোলিক পরিসীমায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় নাই।

ফলে স্বভাবতই ঘটিয়াছে তাহার প্রসার ও ব্যাপ্তি। সময়বিশেষে কখনও বা পশ্চিম-ভারতে, কোন সময় মধ্যভারতে আবার কখনও বা পূর্বভারতে সে তাহার আধিপত্য-বিস্তারে প্রয়াসী। ঐতিহাসিক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাইতে পারে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে

প্রায় আনুমানিক তিনশতাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পশ্চিমভারতে, বিশেষ করিয়া গুজরাটে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি কি পরিকল্পনায়, মন্দির-গাত্রের ও ভিতরের সূক্ষ্ম কারুকার্যের অলংকরণে ও ব্যঞ্জনায়, শিখরের সু-উন্নত ও বলিষ্ঠ গঠনভঙ্গিমায় শুধু পশ্চিম-ভারতীয় মন্দির-শৈলীর এক বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবেই নয়, পরন্তু ভারতীয় স্থাপত্যকলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসাবেই স্বীকৃত।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাক্-গুপ্ত ভারতবর্ষে সৌরসেনীয় রাজ্য মথুরা জৈন সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল। সেখান হইতেই ধীরে ধীরে পশ্চিম তথা মধ্য, পরে পূর্বভারতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু একথা সকল সময়েই স্মরণযোগ্য যে, যখন শিল্পকলা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিয়াছে, তখনই তাহা স্থানীয় ভাবধারায় তথা পারিপার্শ্বিক সামাজিক বা ধর্মীয় ভাবধারায় কিছুটা নিয়ন্ত্রিত বা কিছুটা পরিবর্তিত। খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাস —সেই একস্থান হইতে অন্যস্থানের রীতিগত তথা সামাজিক অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিপুষ্ট শিল্পচর্চার ইতিহাস। সেখানে গুপ্ত বা প্রাক্গুপ্ত ধারা অনুসৃত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা নিজস্ব শৈলীর দ্বারা একে অন্যের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছে— আবার অপর পক্ষে একে অন্যকে প্রভাবিত করিয়াছে।

মূর্তির গঠনভঙ্গিতে গুপ্তযুগের যে সমস্ত লক্ষণ বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেইগুলির মধ্যে আছে পূর্ণ মুখমণ্ডল, স্থূল নিম্নোষ্ঠ, গড়ানো স্কন্ধ, প্রশস্ত বক্ষদেশ ও দেহের মাংসলতা। সেই লক্ষণগুলি পরবর্তীকালে স্থানবিশেষে কখনও ঋজু, কঠিন বা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আবার সময়বিশেষে সহচরী বা অলংকৃত মূর্তিগুলির মধ্যে শিল্পী-মানসকে কখনও বা প্রচণ্ড আবেগে, সূক্ষ্ম কোমলতায়, কখনও বা ঐশ্বরিক প্রাসাদের দাক্ষিণ্যে পরিতৃপ্ত হইতে দেখা যায়।

ভারতশিল্পে মূর্তিকলার ক্রমবিকাশ সেই সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমসাময়িক হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকলার ন্যায় জৈন শিল্পেও মূর্তিতত্ত্বের চর্চা সমানভাবে হইতে থাকে। তাই দেখা যায় তীর্থঙ্কর হিসাবে চব্বিশজন জিনের মূর্তি পরিকল্পনায় বা শুভমঙ্গল চিহ্নের রূপায়ণে তাহারা তৃপ্ত নয়। বিদ্যাদেবী বা শক্তিস্বরূপিণী মাতৃকাগণ আবির্ভূত হইলেন— শিল্পীর তুলিকায় বা ছেদনীতে মূর্ত হইয়া উঠিল—পার্শ্বদেবতা বা সহচরী মূর্তিগুলি, যক্ষ ও যক্ষিণীদের বিভিন্ন ভঙ্গিমা। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে জৈন চিত্রশিল্পের অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত। রেখা ও রংয়ের সুষম ব্যবহারের বা আঙ্গিকের বিশিষ্টতার স্বাক্ষর নিহিত আছে পশ্চিমভারতে সৃষ্ট জৈনকল্পসূত্র পুস্তকমালায়। শিল্পধারার মান অনুসারে পশ্চিমভারতে সৃষ্ট জৈনশিল্পের সহিত সমসাময়িক মধ্যভারত বা পূর্বভারতে রূপায়িত একই মূর্তির পার্থক্য শিল্পরসিক বা সমালোচকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না।

পট্টাবল্লী, প্রবন্ধ ও লেখমালার মাধ্যমে তৎকালীন জৈনধর্মের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, তাহার ক্রমিক শাখাবিভাগ তথা অন্তর্নিহিত সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক চিন্তাধারণার নয়, পরোক্ষে তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ কবিত্ব ও সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা শুধু সমসাময়িক কালকেই তৃপ্ত করেন নাই, পরন্তু বর্তমান-কালের ভাবধারাকেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত

করিয়াছেন। বিদ্যাধরকুলের হরিভদ্র সূরী, সিলাংক ও সিদ্ধর্ষি (নিবৃত্তিকুল), নান্ন সূরী, প্রত্যুম্ন সূরী. অভয়বেদ ও ধনেশ্বর সূরী (রাজগচ্ছ), জিনেশ্বর সূরী, জিনবল্লভ ও জিতেন্দ্র সূরী (খরতর গচ্ছ), হেমচন্দ্র (পূর্ণতল গচ্ছ) প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষী শুধুমাত্র জৈনধর্মের ধারক ও বাহক হিসাবেই প্রখ্যাত ছিলেন না, পরন্তু তাঁহাদের মানব-হিতকর কার্যকলাপ ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাজগতে যুগান্তর-আনয়নে সক্ষম হইয়াছিল।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় সর্বক্ষেত্রে উন্নত আদর্শ-স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। ধর্ম-মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, পার্থক্য কেবল উপস্থাপনায়—এই তত্ত্বের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হরিভদ্র সূরী (অষ্টম শতকে)। পরবর্তীকালে সেই উদার মতবাদের ধারক ও বাহক হিসাবে হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৭২) কেবলমাত্র সোমনাথ মন্দির পরিদর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধানিবেদনকল্পে শিবমহাদেবের সুমধুর স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় তাহার পরিপূর্ণতা-লাভের পূর্বে দুইটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়—শাসনব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যদিও তাহাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় রাজ্য ও সমাজের প্রতি প্রভাব বিস্তার ও তাহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কঠোর অনুশাসন-অনুধাবনকারী বনবাসী গচ্ছের উপাসকমণ্ডলীর প্রতি তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার হইতে পারে নাই। যাহা হউক জিনেশ্বর সূরীর (১০১৭ খৃঃ) তৎপরতায় পশ্চিমভারতে, বিশেষ করিয়া গুজরাট অঞ্চলে সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। সৎপথে ও সত্যবিশ্বাসে যাহারা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীন মতবাদে বিশ্বাসী, সেই ধর্মপ্রাণ জৈন উপাসক-গোষ্ঠীর স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের বাধা অন্তর্হিত হইয়াছিল।

দিগম্বর সম্প্রদায় প্রতিপক্ষ শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের সহিত পশ্চিমভারতে সহাবস্থানের সুযোগ পায় নাই। ইহারা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়কে অস্বীকার করিয়া সময়বিশেষে তাহাদের অস্তিত্বের অবলুপ্তি-সাধনের চেষ্টায় প্রয়াসী হইয়াছিল, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। যাহা হউক, পশ্চিমভারতের গুজরাট অঞ্চলে তাহাদের আধিপত্য যে ধীরে ধীরে ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে রাজস্থানের পূর্বাঞ্চলে তাহাদের অবস্থিতি যে বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিহার শিল্পকলার মাধ্যমে। তাহা ছাড়া মালবদেশে মথুরায়, মধ্যভারতের কয়েকটি স্থানে বা পূর্বভারতের বঙ্গদেশ ও বিহারে পরিভ্রমণের ইতিহাস—জৈনধর্মের ব্যাপক পরিক্রমার ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পর্যালোচনা বর্তমান আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরের বাহিরে।

ইতিহাসের নিয়ম পরিবর্তনশীলতা। কালের পটপরিবর্তনে বর্তমান রাজনীতিক অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক জীবনে যে পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে পরিবেশে ও ভাবধারায় জৈনধর্ম ধীরে ধীরে পুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং একটি বিশিষ্ট ধর্মের পরিচায়ক হইয়াছিল, আজ তাহা বিলুপ্ত। রাজন্য- ও নৃপতিবর্গের উপস্থিতি যখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ মাত্র- মন্ত্রিবর্গ বা বণিক ও শ্রেষ্ঠী-গোষ্ঠীর সেই রূপ যখন স্মৃতিপটে ও কাহিনীর আবরণে ধূসরিত, সেই পরিপ্রেক্ষিতে জৈনধর্ম আজিও ভারতের কয়েকটি স্থানে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমভারতের গুজরাট ও রাজস্থান অঞ্চলে ফল্গুধারার ন্যায় নীরবে প্রবাহিত--নিষ্ঠাবান সাধারণ উপাসকমণ্ডলীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় ও বর্তমান শ্রেষ্ঠী-গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে।

সমালোচনা

Complete Works of Sister Nivedita: Vol. I [ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলী: প্রথম খণ্ড: মূল ইংরেজী সংস্করণ] প্রকাশক: রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল। ৫, নিবেদিতা লেন, কলকাতা ৩। পরিবেশক: আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা-সম্পাদিত। পৃষ্ঠা ৫১২; মূল্য—১২৲।

ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যশতবর্ষ-উদ্‌যাপনের শুভসূচন। তাঁর সমগ্র রচনাবলী-প্রকাশের সার্থক প্রচেষ্টায়। প্রথম খণ্ডটি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতিপূত প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠা ও সাধনার যোগ্য প্রতীক। বাগবাজারের ছোট্ট গলি বোসপাড়া লেন আজ 'নিবেদিতা লেনে' নামান্তরিত। আর সেই 'লেন' বা 'গলি' থেকেই বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তার ফসল মানবজাতির উদ্দেশে যে চিরন্তন সম্পদ উপহারস্বরূপ তুলে ধরেছে, পৃথিবীর যে-কোন মহানগরের যে-কোন প্রশস্ততম রাজপথও সেই মহত্তম সাধনার চরণ-ধূলি বক্ষে ধারণের গৌরবে ধন্য হতে পারে। অথচ একথা কি আশ্চর্য নয়, এই কলকাতা শহরে আজও নিবেদিতার নাম শুধু একটি লেন বা ছোট্ট গলির সঙ্গেই জড়িত, নিবেদিতা-শতবর্ষ-উৎসব সমগ্র জাতির স্মরণীয় মহোৎসবে পরিণত না হয়ে প্রতিষ্ঠানবিশেষেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ! হয়তো নিবেদিতার ইতিহাস-চেতনায় একশো বছর মহাকালের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র—নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী এই মহিমময়ী ভারতপ্রাণার হৃদয় ও মনীষার আলোকে জীবনের পরমমূল্য উপলব্ধি করবে বলেই প্রথম শতবর্ষ-উদ্‌যাপনের অপ্রতুল আয়োজনও তাঁর কল্যাণদৃষ্টির আশীর্বাদ অবশ্যই পাবে। তবু জাতি হিসেবে তাঁর কাছে আমাদের ঋণশোধের কোন সামগ্রিক প্রচেষ্টা দেখা দিলেও বর্তমান ভারত ভবিষ্যৎ ভারতের উদাহরণস্থল হয়ে থাকতো।

অথচ নিবেদিতার এই রচনাবলীর আদি থেকে অন্ত শুধু একটি শব্দই জপমন্ত্রের মতো ঘুরে ফিরে এসেছে—তাঁর India, তাঁর 'ভারতবর্ষ'। সে ভারত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক মানচিত্রে বিধৃত এবং তারো বাইরে মানবাত্মার শাশ্বত সত্যানুসন্ধানের প্রতীক এক ভাবময় মন্ত্রবীজ। গুরু তাকে ভারতের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে বলেছিলেন, সে আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হয়েছে ভারতাত্মার প্রাণপরিচয়ে। নিবেদিতা-সাহিত্য নবযুগের এই ভারতোপলব্ধির সাহিত্য।

পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্মাশ্রিত জীবনধারায় লালিত নিবেদিতা যেদিন স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে 'লোকে যেমন করে নতুন কোন ভাষা শেখে, অথবা হয়তো বা স্বেচ্ছায় নতুন কোন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে'[১]—ঠিক তেমনি ভাবে কালী-উপাসনার গভীরে প্রবেশ করতে চাইলেন, সেদিন থেকে ভারতীয় মনন ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীরতম সংযোগ সাধিত। সেদিক থেকে তাঁর প্রকাশিত রচনাবলীর (এ পর্যন্ত যার সন্ধান পাওয়া গেছে) সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া উচিত Kali the Mother[২] নামে অপূর্ব কবিত্বময় গ্রন্থটির। যদিচ অজ্ঞাত কোন কারণে এ

১ The Master As I Saw Him: The Swami and Mother Worship অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ২ প্রকাশ—১৯০০।

গ্রন্থের মূল উৎসর্গপত্রটি (To Vireswar—Lord of Heroes)[৩] আলোচ্য গ্রন্থে বর্জিত এবং তার দ্বারা এ গ্রন্থটির তাৎপর্যও অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ, তবু নিবেদিতা-সাহিত্যের 'ভারতবর্ষ' অধ্যায়ের প্রথম সূচনা কালী-অবলম্বনে, একথা সানন্দবিস্ময়ে বার'বার স্মরণীয়। রচনাবলীর সূচনায় যে বহুমূল্য তথ্যপঞ্জী দেওয়া আছে, প্রথম খণ্ডের গ্রন্থবিন্যাস তার সময় অনুসারী হলেই ভালো ছিল।

নিবেদিতার শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর আচার্যদেবের জীবনবেদ—'The Master As I Saw Him'[৪] নিজস্ব বিষয়-গৌরবেই হয়তো এ খণ্ডে প্রথম স্থান লাভ করেছে। এমন একটি গ্রন্থ সাধারণ ভাষায় যাকে 'লেখা' বলে, তার চেয়ে অনেক বড়ো, এ অনেকটা ঔপনিষদিক 'মন্ত্রদর্শন'—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মতো গুরুপরম্পরাসূত্রেই সে দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব!

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত এ গ্রন্থের প্রাথমিক খসড়া থেকে গ্রন্থরচনার যে পটভূমিগত ইতিহাস পাওয়া গেছে, তা নিবেদিতা মানসের বিনীতনম্র উপাসিকাসত্তার উন্মোচন—'Should I tell the story of your life, beloved Master? Alas, I cannot. You satisfied so many, widely diverse, in such widely diverse ways. Who am I, that I should understand it all?...Therefore, I have given up the idea of attempting to write your life, and am content to record the story of my own vision and understanding only. ...yet do I pray that through this broken utterance some word of yours may here and there be heard—some glimpse caught of the greatness of your Heart.' [Comp. Works of Nivedita: Vol. I: পৃঃ ২১০ দ্রষ্টব্য।]

সময়বিশেষে গ্রন্থরচনাই যে সাধনা হয়ে ওঠে তার দুর্লভ উদাহরণের অন্যতম এই নিবেদিতার স্মৃতিচারণ কোথাও মূল বিষয়কে অতিক্রম করে আত্মপ্রাধান্যে মুখর নয়। একমাত্র তাঁকে জানা, তাঁর কথা মনে করা, তাঁরই কথা বলা—'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ', এমনই এক একাগ্র তন্ময়তায় সমগ্র গ্রন্থটি এক নিঃশ্বাসে অনুধাবনযোগ্য।

গুরু সান্নিধ্যে তাঁর জীবনে আর এক প্রেরণা-উৎস হয়ে উঠেছিল দেবতাত্মা হিমালয়। Notes of Some Wanderings With The Swami Vivekananda[৫] গ্রন্থে [স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে] একাধারে হিমালয় ও হিমালয়োপম বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলির চিরকালীন দিনলিপি। আর এ দুই গ্রন্থে মিলে (যতদিন না নিবেদিতার দিনপঞ্জীর সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব) বিবেকানন্দ-জীবনের যে অমূল্য উপকরণ আমরা পেয়েছি, তার জন্য কৃতজ্ঞতার ঋণ আমরা কোনদিনই শোধ করতে পারব না।

তারপর থেকে হিমালয় তাঁর এই মহাশ্বেতা কন্যাকে বারংবার আপনকক্ষে আহ্বান করেছেন। Kedar Nath and Badri Narayan: A Pilgrim's Diary[৬] গ্রন্থাকারে সেই আহ্বানেরই উত্তর। নিবেদিতার তীর্থ-পরিক্রমা ভারততীর্থের প্রাণলোকে যাত্রা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ভ্রমণের চেয়ে জীবনবোধের দীপ্তিই তাঁর এজাতীয় রচনাকে মহিমান্বিত করে।

৩ Kali The Mother: লণ্ডনের Swan Sonnenchein & Co প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

৪ প্রথম প্রকাশ—১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১০।

৫, ৬ ১৯১১ ও ১৯১৩

নিবেদিতা-গ্রন্থাবলীর চারটি অমূল্য উপহারের সঙ্গে বক্তৃতা ও নিবন্ধে মিলিয়ে আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বিবেকানন্দ-বিষয়ক রচনাও এ খণ্ডে সংকলিত। এর মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় বিবেকানন্দ-রচনাবলীর ভূমিকারূপে লেখা Our Master and His Message প্রবন্ধটি বিবেকানন্দ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, 'Studies from An Eastern Home' নামে নিবেদিতার যে গ্রন্থটি তাঁর দেহাবসানের পরে প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় তদানীন্তন 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীর‍্যাটক্লিফ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন যে, বাগ্মী হিসেবেও নিবেদিতা ছিলেন অসাধারণ। সে অসাধারণত্বের কিছু আভাস এ রচনাগুলিতে মিললেও তাঁর কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্বের মন্ত্র-বিদ্যুৎ এঁদের কী অপরিসীম প্রাণশক্তিতে ভরে তুলতো, সেকথা সহজেই অনুমেয়। লেখিকারূপে নিবেদিতার কিছু প্রসঙ্গ আমাদের জানা থাকলেও, তাঁর বাগ্মিতার কথা আমরা সবসময় মনে রাখি না।

মুদ্রণ-সৌকর্যে নিবেদিতা-রচনাবলী ক্রেতা ও পাঠকের নয়নানন্দকর। দুর্লভ কয়েকটি চিত্রে সমৃদ্ধ সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা এই শতবার্ষিকী-সংস্করণটির একটি শোভন বহিরাবরণ স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়। আর জাতীয় প্রয়োজনের কথা মনে রেখে ভগিনী নিবেদিতার সমগ্র রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণ-প্রকাশের দায়িত্বও বর্তমান প্রকাশকদের —কৃতজ্ঞ অন্তরে সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। —প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ছোটদের নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৮৬; মূল্য : ২·০০।

ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণ্য জীবনী রচনা করে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বাংলা সাহিত্যের জীবনীশাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সেই বৃহত্তর জীবনী-অবলম্বনে এই সরল স্বল্পায়তন জীবনীগ্রন্থটি ছোটদের উপযোগী করে লেখা। অবশ্য এখানে 'ছোট' কথাটি আপেক্ষিক। বড়োরাও অনায়াসে এই সংহত জীবনীর দর্পণেই নিবেদিতার বিশাল ব্যক্তিত্বের আভাসিত প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়ে আনন্দিত হবেন। আবার কিশোর-কিশোরীরা পাবে জীবন-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে জীবনগঠনের অমোঘ ও অনিবার্য প্রেরণা।

আত্মপরিচয়ে নিজেকে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'-রূপে প্রকাশ করলেও বিশেষভাবে যে নারীজাতির সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করতে এসেছিলেন, ভারতের সেই নারীসমাজের আদর্শ সম্বন্ধে 'শ্রীরামকৃষ্ণের শেষকথা' শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী নিবেদিতাজীবনের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। তাই শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে লেখা নিবেদিতার অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত পত্রটি এবং তাঁর সামনে উপবিষ্টা নিবেদিতার ছবিটিতে মিলে এ বইটির সূচনা থেকেই যে সশ্রদ্ধ সুশোভন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা লক্ষণীয়। পরবর্তী জীবনে নিবেদিতার শিখাময়ী ব্যক্তিত্ব স্বামীজীর সযত্ন দিকনির্দেশে কেমন করে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে কল্যাণদীপে রূপান্তরিত হলো, তার বিভিন্ন পর্ব থেকে পর্বান্তরে সঞ্চরণে এই ছোট্ট জীবনীটির কৃতিত্ব আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য। পরিশেষে হিমালয়ের বিশাল স্নেহবক্ষে এ যুগের 'উমা হৈমবতী'র পরিনির্বাণ লাভের বর্ণনাটিও স্নিগ্ধ ভাবগাম্ভীর্যে গ্রন্থসমাপ্তির মহৎ অতৃপ্তি মনে জাগিয়ে রাখে।

নিবেদিতা-শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অন্যতম আন্তরিক প্রয়াসরূপে 'ছোটদের নিবেদিতা' ছোটদের এবং বড়োদের সকলের সানন্দ অভিনন্দন লাভ করবে। —প্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠে (১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের ১০২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দজীর গত একবৎসরব্যাপী জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ এটি।

এই উপলক্ষ্যে পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা-পাঠাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময়ে মঠ-প্রাঙ্গণে একটি সাধারণসভা আয়োজিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী। সভার প্রধান অতিথি বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, বেদান্ত-মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ স্বামী অভেদানন্দজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের সুগভীরতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বিত কবি-প্রতিভা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিবার পর সভাপতি মহারাজ বলেন :

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর রচনাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, স্বামীজীর জীবনের ভিত্তি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ, হিন্দুশাস্ত্র ও ভারত। আমরা জানি স্বামী অভেদানন্দের জীবনেরও মূলে ছিল এই তিনটি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভাবধারা প্রচারের জন্য যে কয়জন লীলাসহচরকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই জীবনে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। অভেদানন্দজীর জীবনে এই বৈশিষ্ট্য হইল দর্শনের ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করা। তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন অদ্বৈতভূমিতে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর জগন্মাতার নিকট হইতে 'ভাবমুখে থাক' এই আদেশ পাইয়া যুগপ্রয়োজন সাধনের জন্য সে ভূমি হইতে অবতরণপূর্বক জগতের সঙ্গে একটি নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক রাখিয়া দিয়াছিলেন, স্বামী অভেদানন্দও তেমনি আত্মজ্ঞ হইয়াও জগৎকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন, ভালবাসিয়াছিলেন, 'মিথ্যা' বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। ইহার একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে। বেদান্তের ভিত্তিতে তিনি মায়াবাদকে আপেক্ষিক সত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। চরম সত্তাই সব হইয়া রহিয়াছেন ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—ছাদে ওঠার পর দেখা যায় যাহা দিয়া ছাদ তৈয়ারী, সিঁড়িও তাহা দিয়াই তৈয়ারী। স্বামী অভেদানন্দ চাহিয়াছিলেন ভাবী সমাজের ভিত্তি হইবে এই অদ্বৈতজ্ঞান ভিত্তিক সাম্যবাদ—বৈচিত্র্যের মধ্যে অভেদ-দর্শন।

শাস্ত্রের কথাগুলি লইয়া 'কালাতপস্বী' ধ্যান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের সঙ্গে সেগুলি মিলাইয়া লইয়াছিলেন। সেগুলিই তিনি প্রচার করিয়াছেন আধুনিক মনের উপযোগী করিয়া। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের উন্নতির ভিত্তি হইবে ভারতের নিজস্ব বাণী। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই তিনি সত্যলাভেচ্ছাকে আঁকড়াইয়া চলিতে বলিয়াছেন।

আবেদন

মেদিনীপুর জেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্তসেবা

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মালদহ জেলার লোক খরা-জনিত দুর্ভোগ কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই মেদিনীপুর জেলার লোক গত ২রা সেপ্টেম্বর হইতে প্রবল বৃষ্টিপাত হেতু দারুণ বন্যার কবলে পড়িয়াছে; জেলার একটি বিরাট অংশ জলপ্লাবিত হওয়ায় হাজার হাজার লোক গৃহহীন ও প্রায় অনশনের সম্মুখীন হইয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে রামকৃষ্ণ মিশন এখানে সেবাকার্য স্থরু করিয়াছে—স্থানীয় সহৃদয় জনগণের সহায়তায় কাঁথির একটি স্কুল-গৃহে এক হাজার গৃহহীনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া চারিদিন তাহাদের খাওয়াইবারও ব্যবস্থা করা হয়। পরে ১নং ব্লকের ৩নং ও ৭নং অঞ্চলে, ২নং ব্লকের আলাদারপুট অঞ্চলে, পিংলা থানার রামনগর ২নং অঞ্চলে এবং ৯নং অঞ্চলে এই সেবাকার্য বিস্তৃত হইয়াছে। সদ্য সাহায্যের জন্য 'ক্যাশ ডোল' দিয়া কার্য আরম্ভ করা হয়, পরে সব অঞ্চলেই চাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইতেছে। বহুসংখ্যক ধুতি এবং শাড়ীও বিতরণের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

এই আরব্ধ সেবাকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে মিশন এই অঞ্চলে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। সেবাকার্যটি সুসম্পন্ন করিতে ইহার অনেকগুণ অধিক অর্থের প্রয়োজন।

আর্ত জনগণের সাহায্যার্থে আমরা সহৃদয় জনগণের অকুণ্ঠ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি; পরিস্থিতির গুরুত্বানুসারে অবিলম্বেই এই সাহায্য প্রয়োজন।

এই সেবাকার্যের জন্য প্রেরিত সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে। চেক 'রামকৃষ্ণ মিশন' (RAMAKRISHNA MISSION) এই নামে লিখিবেন।

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫নং ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯
৫। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মেদিনীপুর
৬। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাঁথি, মেদিনীপুর
৭। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, লাইতুমখ্রা, শিলং-৩, আসাম
৮। রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লী-১
৯। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বে-৫২
১০। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, গুজরাট
১১। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ময়লাপুর, মাদ্রাজ-৪

বেলুড় মঠ, হাওড়া
২৬. ৯. ১৯৬৭

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বিহারে, উত্তরপ্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্যে গত আগস্ট মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়ঃ

১। **বিহারে** (ক) হাজারীবাগ জেলায় ইটখোরী, চম্পারণ ও প্রতাপপুর সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ১,২২,১৮৩ কেজি, গুঁড়া দুধ ৯,৪৯৩ পাউণ্ড, ভিটামিন ট্যাবলেট ২,১০০টি, লংক্লথ ৮৫ গজ, ধুতি ১,৮৪৬ খানি, শাড়ী ১,৮৯৬ খানি এবং ৭,১৫১টি শিশুদের পোশাক বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৩০,০৩৯।

(খ) সাঁওতাল পরগণা জেলায় রিখিয়া সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মুঙ্গের জেলায় জামুই, ঝাঝা ও চকাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ৬২,২৬০ কেজি, গুঁড়া দুধ ৮,৯৭৮ পাউণ্ড, ধুতি ও শাড়ী ৩,৮১৯ খানি, কম্বল ও চাদর ৯০১ খানি এবং ৩,০৪২টি শিশুদের পোশাক বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১২,২৫৬।

২। **উত্তরপ্রদেশে** মির্জাপুর জেলায় কানহারা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ২৭,৮৬৩ কেজি, গুঁড়া দুধ ১,৩২৫ কেজি, বিস্কুট ২৯৩ কেজি এবং ৩০,০০০টি ভিটামিন ট্যাবলেট বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৫,১৮৪।

৩। **পশ্চিমবঙ্গে** (ক) পুরুলিয়া জেলায় পারা, হুড়া, ঝাপড়া, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, বালিতোড়া এবং নডিহা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ৩৭,০৭৬ কেজি এবং ধুতি একখানি, শাড়ী একখানি ও ৭১টি শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৪,৮৪১।

(খ) বাঁকুড়া জেলায় হাট-আস্থরিয়া, দধিমুখা, খাণ্ডারী, রামহরিপুর এবং জয়রামবাটী সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭২,১৪৯ কেজি গম ও ৮,৮২৭ কেজি জোয়ার বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১৩,৪৫৩।

(গ) মালদহ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬,৯৬৮ কেজি গম ও ৪৮৯ কেজি বার্লি বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৩,৩৮৪।

সাম্প্রতিক বন্যায় নানা স্থানের জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় বন্যার্তদের জন্য সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। কাঁথি শহরের চারটি বিদ্যালয় ভবনে সমবেত প্রায় এক সহস্র বন্যাপীড়িত নর-নারীকে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে চারদিন খাওয়ানো হয়। এই কার্য দিয়া বন্যার্তসেবা শুরু করিয়া ক্রমশঃ ১নং ব্লকে ৩ ও ৪ নম্বর অঞ্চলে, ৩নং ব্লকে আলাদারপুট অঞ্চলে এবং পিংলা থানায় রামনগর-২ অঞ্চলে ও ৯ নম্বর অঞ্চলে সেবাকার্যের পরিধি বিস্তৃত করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্য-বিবরণী (এপ্রিল ১৯৬৬—মার্চ ১৯৬৭) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পাটনায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে উহা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্তি লাভ করে এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এই কেন্দ্রে অনুসৃত কার্যাবলী

প্রধানত: ত্রিধারায় পরিচালিত হয়: শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ধর্ম।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের ছাত্রাবাসে (কেবল-মাত্র মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য) ২৯ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১৬ জন বিনা-খরচে এবং ৩ জন আংশিক ব্যয় বহন করিয়া থাকিবার সুযোগ লাভ করে। আশ্রমের ৮ জন পরীক্ষার্থীই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত পুস্তকসংখ্যা ৭,৮৬৬; আলোচ্য বর্ষে ১৬৭ খানি পুস্তক নূতন সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ৯টি দৈনিক এবং ৭০ খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১০,৮৮৩; গড়ে পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতি ৬৪'২। গ্রন্থাগারটি জনসাধারণ ও কলেজ-ছাত্রগণের বিশেষ কাজে লাগিতেছে। শ্রীরাম-কৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকাবলী আশ্রম হইতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

আশ্রম কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক উভয়বিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৬৬,৫৮২ (নূতন ৭,১৩০) জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। গত বৎসর চিকিৎসা লাভ করিয়াছিল ৫৮,০৩০ জন রোগী।

এলোপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৭৯,৮৬৪; তন্মধ্যে নূতন রোগী ১০,৪০৩। গত বৎসর চিকিৎসিত হইয়াছিল ৪৬,৪৯৮ জন রোগী।

আলোচ্য বর্ষে উভয় বিভাগেই রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতেও উপযুক্ত চিকিৎসালাভের জন্য দরিদ্র রোগীরা এখানে সমবেত হয়।

আলোচ্য বর্ষে নানাস্থানে ও আশ্রমে ধর্মালোচনার জন্য মোট ২১৭টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি আলোচনা করা হয়। আশ্রমে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উৎসব যথা শিবরাত্রি, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, খৃষ্টজন্মদিন, শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মতিথি প্রভৃতি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে স্থানীয় অন্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে, আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিশুগণকে এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে ফল মিষ্টি প্রভৃতি খাওয়ানো হইয়াছিল।

বিহারে অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষে মুঙ্গের, হাজারীবাগ ও সাঁওতালপরগণা জেলায় মিশনের আর্তসেবাকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (ময়লাপুর) দাতব্য চিকিৎসালয়ের (এপ্রিল, ১৯৬৬—মার্চ, ১৯৬৭) বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে এলোপ্যাথি ও হোমিও-প্যাথি উভয় বিভাগে মোট ১,৫৯,৯০১ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। এলোপ্যাথি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৫৮,১০২, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৫৬,৫৭৯ এবং পুরাতন রোগী ১,০১,৫২৩, হোমিওপ্যাথি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৭৯৯, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৭৮১ এবং পুরাতন রোগী ১,০১৮।

চক্ষুবিভাগে ২০,১০৮, চক্ষু কর্ণ-গল-রোগের চিকিৎসা-বিভাগে ১১,০০২ এবং দন্ত-বিভাগে ৪,১৭৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এক্স-রে বিভাগে ৫০৩ জনের এক্স রে করা হয়। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ৬১২। শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুষ্টির অভাবগ্রস্ত ২১,৭৩১টি শিশুকে নিয়মিতভাবে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। সহৃদয় ও বদান্য জনগণের উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যে দরিদ্র আর্ত জনসাধারণ অধিকতর সেবালাভে সমর্থ হইবে।

দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্ত সোসাইটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

গত ৪ঠা আগস্ট, ১৯৬৭ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথিতে দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় হলিউডে ২০২৭ নর্থ ভাইন স্ট্রীটে নূতন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে হলিউড মন্দিরে বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাবুকো শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ কেন্দ্র হইতে সন্ন্যাসিগণ এবং সান্টা বারবারা কেন্দ্র হইতে প্রব্রাজিকাবৃন্দ সমবেত হইয়াছিলেন।

অনুষ্ঠানসমূহে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ, স্বামী বন্দনানন্দ এবং স্বামী অসক্তানন্দ। পূজা ও যজ্ঞাদির কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন স্বামী বন্দনানন্দ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল সন্ন্যাসী-সন্তানের উদ্দেশে পূজার্ঘ্য প্রদত্ত হয়। পূজান্তে বিরজা-হোমও অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় কেবলমাত্র সন্ন্যাসিগণই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান-শেষে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, বিশাল ভবনটিকে মঠ-বাড়ীতে রূপান্তরিত করিতে সাধুগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন; জলের পাইপ, ইলেকট্রিক লাইন বসানো, কাঠের কাজ প্রভৃতি সবই তাঁহারা নিজেরাই করিয়াছেন।

সিয়েটেল বেদান্ত কেন্দ্রে 'ব্রহ্মানন্দ-হলের' উদ্বোধন

সিয়েটল বেদান্ত কেন্দ্রের ধ্যান-ভবনটি সংস্কৃত ও সুসজ্জিত করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই 'ব্রহ্মানন্দ-হল'-এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই হইতে ৯ই জুলাই পর্যন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ধ্যান-ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও যীশুখৃষ্টের প্রতিকৃতি বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'ওঁকার' প্রতীকটিও আকর্ষণীয়ভাবে স্থাপন করা হইয়াছে। মূল বেদীর নিম্নে একটি পৃথক বেদীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের ধ্যানমূর্তি সংস্থাপিত।

৭ই জুলাই সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে উদ্বোধন-অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ব্রহ্মানন্দ হল শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল।

স্বামী বিবিদিষানন্দ অতিথি অভ্যাগতগণকে স্বাগত জানান এবং অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক স্বস্তিবাচন আবৃত্তি ও সমবেত-কণ্ঠে ভজনের পর পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশেষানন্দ ও স্বামী বিবিদিষানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর বিষয়ে প্রাণস্পর্শী আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানগুলিও

অতি মনোজ্ঞভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। তৃতীয় দিন, ৯ই জুলাই, বেলা ১১টার সময় একটি সাধারণ সভা আহূত হয়। এই সভায় স্বামী অশেষানন্দ 'আধ্যাত্মিক বোধের উদ্বোধন' বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ও ভাবোদ্দীপক ভাষণ দেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

উত্তর ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্ত সোসাইটি : স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র : অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বিভিন্ন আলোচিত বিষয় :

জুন, ১৯৬৬ : মানুষই সব জিনিসের পরিমাপক ; কাল হইতে কালাতীত ; ধর্মের জন্য মানবের অনুসন্ধান ; ঈশ্বরের সঙ্গে চলা।

জুলাই, ৬৬ : মুক্তির অনুসন্ধানে মানুষ ; প্রেম—মানবীয় ও ঐশ্বরিক।

সেপ্টেম্বর, ৬৬ : ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ ; ভক্তির সাধন ; আমাদের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক ভিত্তি।

অক্টোবর, ৬৬ : যোগের মাধ্যমে শান্তি ; চিন্তার সীমান্তের বাহিরে ; প্রেম ও জ্ঞান ; মাতৃভাবে ঈশ্বরচিন্তা ; ব্যক্তিগত ধর্ম।

নভেম্বর, ৬৬ : মানবীয় ও ঐশ্বরিক ভাব ; দেবতা, ঈশ্বর ও আত্মা ; বেদান্ত ও বিশ্বশান্তি ; মানুষের বন্ধন ও মুক্তি।

ডিসেম্বর, ৬৬ : মনের সহিত সংগ্রাম ; কুসংস্কারমুক্ত ধর্ম ; স্বর্গ—এখানে এবং এখনই ; বেদান্ত ও যীশুখৃষ্ট।

জানুয়ারি, ৬৭ : ধর্মের নব দিগন্ত ; ঈশ্বরানুভূতি ; বেদান্ত ও রহস্যবিদ্যা ; নিজেকে জানো এবং দুঃখের পারে যাও।

ফেব্রুআরি, ৬৭ : স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার অধ্যাত্ম-বাণী ; সার্থক জীবন যাপন ; অনন্তের বাণী ; আমার সংস্পর্শে তোমরা পবিত্র হইবে।

মার্চ, ৬৭ : জীবনটি উপাসনায় পরিণত কর ; সাকার হইতে নিরাকারে ; মহান ধর্মাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ ; আলোর পথে আরোহণ।

এপ্রিল, ৬৭ : অতীন্দ্রিয় রাজ্যে সুস্থ অগ্রগতি ; ঈশ্বররূপে মানব ও মানবরূপে ঈশ্বর ; বিশ্বতত্ত্বানুভূতি ; ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে আধ্যাত্মিক জীবন ; মৌনাভ্যাসের আরোগ্য-কারিণী শক্তি।

মে, ৬৭ : আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের জন্য কর্ম ; বিদ্বেষ-জয় ; প্রেম ও স্বাধীনতা ; বুদ্ধের শান্তিপথ।

জুন, ৬৭ : প্রাত্যহিক জীবনে যোগ ; ধর্মানুভূতি ; ভগবৎসান্নিধ্যে ; ব্যক্তি-সত্তার আধ্যাত্মিক উন্নতি।

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি : অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ। এই কেন্দ্রে রবিবারের সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দেওয়া হইয়াছিল :

অক্টোবর, ১৯৬৬ : মহাচার্য শ্রীকৃষ্ণ ; দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বর-সচেতনতার অভ্যাস ; 'যত মত তত পথ' ; ঈশ্বর আমাদের শাশ্বত জননী ; আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান।

নভেম্বর, '৬৬ : অসত্য হইতে সত্যে ; মনের প্রকৃতি ও কার্য ; জীবন-প্রাচুর্য ; জীবন—ইহলোকে এবং পরলোকে।

এপ্রিল, '৬৭ : আধ্যাত্মিক জীবনের তিনটি স্তম্ভ ; নিজের সহিত মানুষের সংগ্রাম ; পথ ও পূর্ণতা ; অবচেতনকে আয়ত্তে রাখা ; অন্ধকার রাত্রি তমসাচ্ছন্ন নয়।

মে, '৬৭ : বেদে সোমযজ্ঞ ; শাঙ্কর-বেদান্তে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির স্থান ; নির্বাণে পুরুষ-কারের স্থান ; বুদ্ধ-মতে প্রবর্তকের ধ্যান।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে বৃহদারণ্যক ও প্রশ্নোপনিষৎ এবং শুক্রবারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আলোচিত হয়।

বিবিধ-সংবাদ

নব বারাকপুরঃ গত ১৬ই জুলাই রবিবার স্থানীয় শক্তিসঙ্ঘে বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক অধিবেশনে বেলুড় মঠের স্বামী জয়ানন্দ মহারাজ বর্তমান ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন।

২০শে আগস্ট রবিবার স্থানীয় জাগৃতি সঙ্ঘে উক্ত পরিষদের মাসিক অধিবেশনে স্বামী অমৃতত্বানন্দ মহারাজ (বেলুড় মঠ) স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় অবদান সম্বন্ধে এক ধারাবাহিক বক্তৃতার সূত্রপাত করেন। এই দিনের ভাষণে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় মতামত বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। উভয় দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্র চন্দ্র মালাকর।

পাঁচ গ্রামঃ ২৮.৮.৬৭ তারিখ পাচগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গীতাপাঠ ও কৃষ্ণমঙ্গল সঙ্গীত-বিচিত্রাদির মাধ্যমে জন্মাষ্টমী-তিথি প্রতিপালিত হইয়াছে।

সভান্তে সমাগত প্রায় ৩।৪ শত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া বসুর দেহত্যাগ

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া বসু, ৭৪ বৎসর বয়সে গত ২১শে ভাদ্র, ১৩৭৪ সন, ইং ৭ই সেপ্টেম্বর, সকাল ১০ ঘটিকার সময় তাঁহার পুত্রের বাগুইহাটি-স্থিত নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গত ৭ বৎসর যাবৎ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের পূত সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

দিব্য বাণী

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥৪।২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ভগবানই হয়েছেন এ-বিশ্বের সবকিছু—কর্তা, কর্ম, কর্মোপকরণ
ইহা জানি তাঁর তরে যাহা কিছু করা যায়, সবই যজ্ঞ, সকলই পূজন।)
অনাসক্ত মন যার, অভিমানশূন্য যেই, জ্ঞানে যার চিত্ত সদা স্থিত,
কর্ম যার ঈশ্বরার্থে—যজ্ঞতরে—কর্মফল হতে মুক্ত থাকে সে সতত ॥২৩
যজ্ঞকালে আহুতির পাত্রটিকে—অর্পণেরে—ব্রহ্ম বলি জানে সে সদাই,
জানে সে ঘৃত-ও ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, সে-ও ব্রহ্ম—ব্রহ্ম ছাড়া কিছু আর নাই।
ব্রহ্মময় সব হেরি—কর্মে ব্রহ্ম জ্ঞান করি—ব্রহ্মত্ব সে লাভ করে তাই ॥২৪
ঈশ্বরার্থে কত জন করে কর্ম কত ভাবে; কেহ করে দেব-আরাধন,
জীব-ব্রহ্ম এক ভাবি কেহ করে ব্রহ্মাগ্নিতে আত্মদানে জ্ঞানের সাধন ॥২৫
কর্ণ আদি ইন্দ্রিয়েরে বিষয় হইতে টানি কেহ করে ইন্দ্রিয়দমন,
শব্দাদি গ্রহণকালে অন্যে ভাবে এ-ও পূজা—ইন্দ্রিয়-অগ্নিতে হবি-দান ॥২৬
সকল ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া, সর্ব প্রাণ-ক্রিয়া কেহ নিরোধ করিয়া স্থির চিতে
আপনার সব কিছু আহুতি প্রদান করে জ্ঞানদীপ্ত সমাধি-অগ্নিতে।
সবই যজ্ঞ; (সবই টানে তাঁরি পানে, মুক্ত করে, দহি পাপ জ্ঞানের বহ্নিতে) ॥২৭

কথাপ্রসঙ্গে

আত্ম-নিবেদন

দেহমনের সীমার পারে আমাদের অস্তিত্বের যে মহিমান্বিত প্রকাশ রহিয়াছে তাহার প্রশান্তিতে অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও অবগাহন না করিলে, তাহাকে অবলম্বন না করিলে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন যে কি জিনিস, তাহা ধারণাই করা যায় না, নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নিবেদিত করা তো দূরের কথা।

এই সত্যটি সুপরিস্ফুট ভগিনী নিবেদিতার জীবনে। তাঁহার আত্মনিবেদন বাহ্যতঃ গুরুর ইচ্ছার নিকট বা ভারতমাতার চরণে হইলেও মূলতঃ উহা বিশ্বমানবকল্যাণেচ্ছার মাধ্যমে শ্রীভগবানে বা পরমজ্ঞানেই সমর্পিত।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ নিবেদিতার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা—উহাই তাঁহার তৎকালীন অস্পষ্ট জীবনাদর্শের পথে শুভ্র আলোক-বর্ষণ করে। স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার ভারতের সেবাকার্যে আত্ম-নিয়োগের সঙ্কল্প এবং আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ ছাড়িয়া ভারতে অগমন ও স্বামীজীর নিকট ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা-লাভ তাঁহাকে জীবনের চরমাদর্শ-লাভের জন্য আত্মনিবেদনের পথে ক্রমশঃ আগাইয়া দিতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনো তাহা ছিল আংশিক মাত্র, সম্পূর্ণ হয় নাই। এই মহাযজ্ঞশিখায় তাঁহার আমিত্বের পূর্ণাহুতি-প্রদানের সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছিল আরো কিছুদিন পরে, যখন তিনি স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, আলমোড়ায় বাস করিতেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনের আদর্শ ছিল ভগবানলাভ। এই আদর্শলাভের নূতন পথ তখন প্রস্তুত করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাবের অনুসরণে—ভগবানই সব হইয়া রহিয়াছেন জানিয়া 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', কর্মকে পূজায় পরিণত করা; ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, "বহু এবং এক যদি যথার্থই সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি, সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। ...তাঁহার (স্বামীজীর) নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই।" ভগবানলাভের জন্য এই পথেরই নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে; ভারতকে কর্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া, ভারতকে কায়মনোবাক্যে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার সেবায় আত্মনিবেদন করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাতেই গুরুর সব চেয়ে প্রিয় কার্য করা হইবে, ভগবানলাভেরও সাধনা ইহা।

পরবর্তীকালের নিবেদিতার জীবন আত্ম-সমর্পণের পরিপূর্ণ বিভায় সমুজ্জ্বল দেখি আমরা—তাঁহার ভারতপ্রেম স্বদেশপ্রেম, উহার বিভা ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশসেবকদের স্বদেশপ্রেমের বিভাকেও যেন ম্লান করিয়া দিতে চায়। ভারতবাসী তাঁহার নিকট স্বদেশবাসী, অতি আপনজন; তিনি তাদেরই একজন হইয়া গিয়া-

ছিলেন শুধু আচরণে নয়, চিন্তায়, সংস্কারে পর্যন্ত। ভারতের সেবায় তিনি জীবনপাত করিয়াছেন ভারতের স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য, ভারতের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের জন্য। রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের নব-জাগরণের জন্য তিনি নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়াছিলেন ভারতবাসীরূপে।

কিন্তু কাজটি কি এতই সহজ ছিল? তাঁহারই সমপর্যায়ের জ্ঞান, বুদ্ধি, তেজস্বিতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং হৃদয়বত্তা সম্পন্ন হইয়া কোন ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ করা যতটা সহজ, কোন বিদেশীর পক্ষে অপর দেশের সেবার জন্য পরোপকারের মনোভাব লইয়া ইহা করা (যদি এতটা কেহ করিতে পারেনও) যতটা সহজ, একজন বিদেশিনীর পক্ষে ভারতকে কায়মনো-বাক্যে স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়া ইহা করা তদপেক্ষা সহস্রগুণে কঠিন—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অসম্ভব। কিন্তু নিবেদিতার ক্ষেত্রে আত্ম-নিবেদন পরিপূর্ণ ছিল বলিয়াই ইহাও সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

এই আত্মনিবেদন কেবল বুদ্ধির সহায়তা লইয়া করা যায় না। পাশ্চাত্যে এতদিন নিবেদিতা যে দৃষ্টিতে জীবনকে, ভালমন্দকে দেখিতে শিখিয়াছেন, তাহা একেবারে ভুলিয়া নূতন দৃষ্টিতে সবকিছু দেখিতে হইবে। জন্মগত যে স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতিপ্রীতি, স্বসমাজপ্রীতি তাহাও ভুলিয়া যাইয়া নূতন দেশকে, নূতন জাতিকে, নূতন সমাজকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এক কথায় এতদিনকার 'জীবন'কে নির্মম হইয়া ত্যাগ করিয়া নবজন্ম লাভ হইবে এই দেহেই। কেবল বুদ্ধি একাজ করাইতে অপারগ। বুদ্ধি যতটা আগাইয়া লইতে পারে, ততদূর তো তিনি আসিয়াছেনই—গুরুর আদেশ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া সব ছাড়িয়া ভারতে আসিয়াছেন ভারতের সেবা করিতে। কিন্তু স্বামীজী যাহা চাহিয়া-ছিলেন, সে আত্মনিবেদনের পথে কতখানি তিনি আগাইয়াছিলেন তখন? ব্রহ্মচর্যদীক্ষা-দানের পরদিবস "স্বামীজী তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'এখন তুমি কোন্ জাতিভুক্তা?' উত্তর শুনিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও পূজার চক্ষে দেখেন; দেখিলেন যে, একজন ভারতীয় রমণীর তাঁহার ইষ্ট-দেবতার প্রতি যে ভাব, ইহারও এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই ভাব।" ইহা খুবই স্বাভাবিক, ইহা দূষণীয় তো নয়ই, বরং সাধারণ অবস্থায় গুণপদবাচ্য। কিন্তু স্বামীজী যাঁহাকে 'ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের একাধারে সেবিকা, বান্ধবী ও মাতা' হইবার জন্য আনিয়াছেন তাঁহাকে মানবতার এই স্তর হইতেও বহু ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। স্বামীজী ভারতকে এত ভালবাসিতেন শুধু জন্মভূমি বলিয়া নয়, পুণ্যভূমি বলিয়া। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সেদিক দিয়া তাঁহার কাছে ভারতও যা, ইংলণ্ডও তাই, আমেরিকাও তাই। ভারতকে তাঁহার এত ভালবাসিবার কারণ, ভারতকে না বাঁচাইয়া রাখিলে আর কোন দেশই জগতে মানবতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না, ভারত যদি মরিয়া যায় "তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে, সমগ্র ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে—অর্থ সে পূজার পুরোহিত, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার পূজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা তাহার বলি" (স্বামী বিবেকানন্দ)। তাই

ভারতের উন্নতির জন্য স্বামীজীর এত প্রচেষ্টা। জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণরূপ যে স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র, সেখান হইতে মনকে উর্ধ্বে উন্নীত না করিলে এরূপ পক্ষপাতিত্বহীন দৃষ্টি লইয়া জগৎকে দেখা, তাহার কল্যাণ-অকল্যাণ বিচার করা যায় না, এভাব লইয়া ভারতের সেবা করা যায় না। কিন্তু এই স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া আনা কি এতই সহজ? কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে আচার্য, আত্মীয় প্রভৃতির প্রতি মমতাবোধ—মনের আর একটি স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র—বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল উচ্চতর আদর্শের আলোকে অর্জুনের কর্মপথ-নির্ধারণের সময়। সেখানেও দেখা যায় যুদ্ধারম্ভের বহু পূর্ব হইতে এই যুদ্ধ লইয়া যুক্তির বহু আদানপ্রদান হইয়াছে কৃষ্ণার্জুনের মধ্যে, যাহার ফল অর্জুনকে রণক্ষেত্র পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, কার্যকালে দেখা গেল এই স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই। রণক্ষেত্রেও বহু যুক্তি দেখানো হইল, তাহাতেও হয় নাই। ইহা বুদ্ধির কাজ নহে। ইহার জন্য সেখানেই শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের অনুভূতিকে উন্নীত করিতে হইয়াছিল মনবুদ্ধির সীমানার পারে—অতীন্দ্রিয় রাজ্যে, তবেই অর্জুন সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'করিষ্যে বচনং তব'। নিবেদিতার বেলাও দেখা যায়, একটি ভারকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া আনিবার জন্য হিমাচলের কোলে বসিয়া স্বামীজী বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। পরে, এক শুভক্ষণে নিবেদিতার মাথায় হাত রাখিয়া স্বামীজী আশীর্বাদ করিলেন। সেই স্পর্শেই নিবেদিতার অনুভূতি উন্নীত হইয়াছিল মনবুদ্ধির অতীত সত্যের রাজ্যে, আর তাহার পর হইতেই নিবেদিতার বুদ্ধি করজোড়ে বলিয়াছিল, 'করিষ্যে বচনং তব।'

এই দিন সত্যানুভূতির কোন্ স্তরে স্বামীজীর কৃপায় নিবেদিতা উন্নীত হইয়াছিলেন, সঠিকভাবে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়, পূর্ণ আত্মনিবেদন কাহাকে বলে নিবেদিতা এই দিন নিঃসংশয়ে তাহা বুঝিয়াছিলেন; ইহার স্বল্প কয়েকদিন পরে একটি পত্রে (মিসেস হ্যামণ্ডকে) তিনি লিখিয়াছেন, "এতদিন ধরিয়া যাহা মহানুভবতা বা নিঃস্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, প্রকৃত অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র শুভ্র জ্যোতির তুলনায় তাহা নিতান্তই হাল্কা ও শুষ্ক অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ সবই আমি উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আশ্চর্য! প্রাথমিক সত্যগুলিকে পরিষ্কাররূপে দেখিতে এত সময় লাগিল!… একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মানসিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন।"

স্বামীজী নিবেদিতাকে যথার্থ 'নিবেদিতায়' পরিণত করিলেন এই আলমোড়ায়। কাজটি আর কিছুই নহে, নিবেদিতার ভাষায়, "একটি মনকে তাহার স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র হইতে সরাইতে হইবে। এর চেয়ে বেশী আর কিছু করা হয় নাই, কখনো কোন ধারণা বা মত জোর করিয়া চাপানো হয় নাই, শুধু একদেশিতা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র।" যেদিন স্বামীজীর স্পর্শে নিবেদিতার হৃদয় 'অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র জ্যোতির' সন্ধান পাইল, তাহার পর হইতেই একদেশিতা শূন্যলীন হইয়াছিল—"এখন হইতে উক্ত শিষ্যা বরাবর স্বামীজীর সর্ববিধ মতামত আপাতদৃষ্টিতে হাজার অসম্ভব বা অপ্রিয় বোধ হইলেও অবাধে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন" (স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে)।

এই 'অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র জ্যোতি', 'অহং'-এর পূর্ণাহুতিপ্রদানের পর হোমানলের জ্যোতি—'যে অনল জ্বলে অবন্ধন শিখা মেলি আর্যবেদীতলে' তাহার জ্যোতি, গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে 'আত্মসংযম-যোগাগ্নি' তাহার দীপ্তি—চির-উদ্ভাসিত ছিল নিবেদিতার চিত্তে। আলমোড়ায় বাসকালে ধ্যানাভ্যাস সহায়ে ইহার শিখাকে উজ্জ্বলতর করিয়া অনির্বাণ রাখিয়াছিলেন তিনি চিরদিন। ইহাই নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' করিয়াছিল, ইহাই তাঁহাকে 'মহাশ্বেতা'র পুণ্যকান্তি দিয়াছিল, ইহাই 'নিবেদিতা'র সর্ববিধ কর্মতৎপরতার, বিপুল বীর্যের, অসীম সাহসিকতা-প্রকাশের পটভূমি। ইহাই ভারতীয়তার, ইহাই বিশ্বজনীনতার প্রাণ। ইহাকে বাদ দিয়া দেখিলে নিবেদিতার কোন ক্ষেত্রের কর্মপ্রচেষ্টার মূল্যায়ন যথাযথ হইবে না; এই হোমানলের দীপ্তিতেই তাঁহার কর্মপ্রেরণা প্রদীপ্ত, ভারতের শিক্ষা, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প সব কিছুকেই তিনি উদ্ভাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন ইহারই পুণ্য দীপ্তিতে। অহমিকাশূন্যতার, পরিপূর্ণ স্বার্থত্যাগের এই দীপ্তি ছাড়া ভারতীয়তার, বিশ্বজনীনতারও সর্ববিধ মূর্তিই প্রাণহীন প্রতিমামাত্র, যত নিপুণভাবেই আমরা সেগুলির কাঠামো গড়িয়া তুলি না কেন, যত গঠননিপুণতা ও বর্ণবিন্যাসদক্ষতাই দেখাই না কেন।

নিঃশেষে আত্মাহুতির এই যজ্ঞানলশিখাই, জ্ঞানালোকই নিবেদিতার চোখের সামনে উদ্ভাসিত করিয়াছিল ভারতমাতার মন্দিরদ্বার, যেখানকার পূজারিণী হইবার জন্য স্বামীজী তাঁহাকে ভারতে আনিয়াছিলেন। দেশ সেখানে গুরুর জন্মভূমি মাত্র নয়, ভগবানের মন্দির; ভারতবর্ষ সেখানে মা, বিশ্বজননী—" 'আমাদের বর্তমান কর্তব্য' বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান,—এমন একটি মন্দির গঠনে সাহায্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি উপাসক উপাসনা করিতে পারে, যে মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু 'ওঁ' এই শব্দব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আর একটি বিরাট মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, যে-মন্দির স্ব-স্বরূপে বিরাজিতা এই দেশমাতৃকা স্বয়ং—এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্মসাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে; সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, যাহা কোন প্রতীকই নয়, যাহা শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে।" এই ভারতমাতার পূজাই নিবেদিতা করিয়াছেন বিবিধ কর্মোপচারে, ইহারই মন্ত্র জপ করিয়াছেন ও তাঁহার বিদ্যালয়ের বালিকাদের জপ করিতে শিখাইয়াছেন—"ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! —মা, মা, মা!" আলমোড়ায় 'অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র জ্যোতিতে' তিনি যে 'অবাঙ্‌-মনসোগোচরম্' সত্তার সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই 'শব্দাতীত' সত্তাকেই দেখিয়াছেন ভারতমাতার মধ্যে; ইহাতে আত্মনিবেদনই ভারতে নিবেদিতার জীবনেতিহাস। এখানে স্বামীজীর ভারতপ্রেম আর নিবেদিতার ভারতপ্রেম একই-জাতীয় জিনিস—উহা বিশ্বপ্রেম, উহা ভগবৎপ্রেম, আপাতদৃষ্টিতে সীমিত মনে হইলেও কোন সীমারেখায় উহা আবদ্ধ নহে।

বিশ্বপ্রেম আত্মনিবেদনেরই প্রেমময় রূপ।

ভগিনী নিবেদিতা*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

আজ আমরা এখানে যাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবানুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি, সেই ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হয়েও ভারতকে তাঁর স্বদেশ করে নিয়েছিলেন, ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যেখানে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই হিমাচলের কোলে তাঁর সমাধিক্ষেত্রের উপর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে যে কথা কয়টি উৎকীর্ণ রয়েছে, আক্ষরিক অর্থেই তা অতি সত্য—"এখানে বিশ্রাম করছেন ভগিনী নিবেদিতা যিনি তাঁর সর্বস্ব ভারতকে অর্পণ করেছেন।"

আয়ার্ল্যাণ্ডে তিনি জন্মেছিলেন, ইংলণ্ডে তিনি প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হন এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষ; কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্ম সারা বিশ্বেরই। তাঁর আদর্শ ও আত্মনিবেদনের ভাব তাঁকে অনন্তের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। তাঁর পিতা-মাতা নিষ্ঠাবান খৃষ্টানদম্পতি ছিলেন; নিবেদিতার জন্মকালেই তাঁর মা তাঁকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। নিবেদিতাও এসেছিলেন স্বার্থত্যাগ- ও সত্যলাভেচ্ছা-গুণভূষিত হয়ে। তাঁর অন্তরে আত্মাহুতির প্রচ্ছন্ন অনল একটি প্রদীপ্ত জীবন-শিখার স্পর্শে প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় ছিল। আর ঠিক এই জিনিসই ঘটেছিল যখন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতার প্রচণ্ড স্বাধীন-প্রকৃতি এবং এই 'হিন্দু যোগীর' ব্যক্তিত্বের প্রবল আকর্ষণের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য সতর্কতা-অবলম্বন সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর মহত্ত্ব ও গরিমায় তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। এর ফল যা হল, পরবর্তীকালে নিজেই তা ব্যক্ত করেছেন তিনি—"এই ব্যক্তির বীর-সত্তার সন্ধান আমি পেয়েছি। স্বদেশবাসীর প্রতি এঁর যে ভালবাসা তার দাস ক'রে রাখতে চাই আমি নিজেকে।"

ভগিনী নিবেদিতা হলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভারতকে প্রদত্ত একটি অতুলনীয় উপহার। এই মনীষিণীকে ভারতে এনে তাঁর মনের ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলে তাঁকে সংস্কৃতি ও সভ্যতায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় করে তুলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—যেন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভূমিতে দৃঢ়বদ্ধমূল একটি বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভূমিতে সেটিকে রোপণ করেছিলেন। এই ক্ষেত্র-পরিবর্তন নিবেদিতার মত বীর-হৃদয়ার পক্ষেও বড় বেদনাদায়ক হয়েছিল, কিন্তু পরিণামে তিনি নিজেকে রূপান্তরিতা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই 'গুরুর' শিষ্যা হয়ে এবং তিনি যেমন চান ঠিক সেইভাবে ভারতের সেবিকা হয়ে চলা—কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু নিবেদিতার মত নারীর কাছে কতখানি আশা করা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ তা জানতেন বলে মোটেই হতাশ হননি তিনি। গুরুর তত্ত্বাবধানে

* গত ২৮শে অক্টোবর, মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত—ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি-প্রদান-সভায় প্রদত্ত মূল ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ। —সঃ

থেকে যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রতি গুরুর যে অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং যিনি তাঁকে নিজ কন্যারূপে গ্রহণ ও তাঁর সঙ্গে তদনুরূপ আচরণ করতেন সেই শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ—এ সব কিছু মিলে আপাত-প্রতীত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। সেই থেকে বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে তিনি নিজেকে ভারতের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতের যুবকগণের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছেন তিনি, ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তাদের আহ্বান করেছেন। ভারতীয় নারীর শিক্ষা- ও উন্নতি-কল্পে তিনি কর্মরত হয়েছেন; চারুশিল্প, শিক্ষা, সমাজ-জীবন, ধর্ম, প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শকে পাশ্চাত্যের নিকট সহজবোধ্য করবার জন্য তিনি বহু বক্তৃতা দিয়েছেন এবং Religion and Dharma, Web of Indian Life, Footfalls of Indian History, Siva and Buddha, Kali the Mother প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভারতের তৎকালীন বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিদের উপরও তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

শিক্ষাকার্যে নিবেদিতার জন্মগত অধিকার ছিল; তার জন্য প্রয়োজনীয় কল্পনাশক্তি ও অন্যান্য গুণে ভূষিত ছিলেন তিনি। ভারতে বালিকাদের শিক্ষার জন্য তিনি একটি স্কুল খুলেছিলেন; তারই সম্বন্ধরূপ বর্তমান 'ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'। তাছাড়া ভারতে 'জাতীয় শিক্ষা' গড়ে তোলার কাজে ভিত্তিস্থাপনে তাঁর সক্রিয় অবদান অনেকখানি।

তাঁর হৃদয় ও বুদ্ধির মহৎ গুণাবলী এবং তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভা তাঁর কাছে টেনে এনেছিল সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি ক্ষেত্রের সমসাময়িক বহু শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের। তাঁদের ভেতর অনেককেই তাঁদের নিজস্ব কর্মে উদ্বুদ্ধ এবং সাহায্যও করেছিলেন তিনি। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তায়, তাঁর অভিনবত্বে, তাঁর করুণায়, তাঁর অভিমানরাহিত্যে মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁর কাছে স্নেহবদ্ধ হয়েছেন, তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়েছেন, তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেছেন অনেকেই। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্যটি হ'ল 'জ্যোতির্ময়ী দেবকন্যা' সহজাত পবিত্রতা এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত গুরুর ও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদই মার্গারেট নোবলকে জ্যোতির্ময়ী দেবকন্যায় পরিণত করেছিল।

ভারতকে যথাসাধ্য সেবা করতে গিয়ে নিবেদিতার এই ধারণা দৃঢ় হয় যে, জাতিকে গড়ে তুলতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। কিন্তু এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সঙ্গে কোনরূপ আপস করা তাঁর মনঃপূত হল না, কারণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে রাজনীতির কোন স্থান ছিল না। কাজেই নিজের এবং সঙ্ঘের উভয়েরই প্রতি সুবিচার হবে জেনে তিনি সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে এলেন; ভাবলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারবেন এখন। সঙ্ঘের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কিন্তু রেখেই দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতাগণ নিবেদিতাকে আগে যেমন স্নেহ-যত্ন করতেন, তাঁর সঙ্ঘত্যাগের পরও সমভাবেই তা করতে লাগলেন; আগের মতোই তাঁদের আপনজন হয়ে রইলেন তিনি। সঙ্ঘের নিরাপত্তার জন্য, শুধু কাজকর্মের দিক থেকে প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, অন্য আর কোন দিক থেকেই নয়। তাঁর এই সঙ্ঘত্যাগের সিদ্ধান্তের পিছনের যথার্থ সংবাদ কিছু রাখতেন না এমন একদল লোক কিন্তু এ বিষয়ে ভুল বুঝেছিলেন। কাজটি তাঁর কাছে অতীব বেদনাদায়ক ছিল

নিঃসন্দেহ ; কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, নিজের কাছে এবং যে গুরুকে তিনি এত ভালবাসেন তাঁর কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হলে অবলম্বন করার দ্বিতীয় কোন পথ আর নাই।

তাঁর রাজনীতি ছিল জবরদস্ত ধরনের ; আবেদন-মূলক নরমপন্থী রাজনীতির পথে চলার মত ধৈর্য তাঁর ছিল না ; সেজন্য স্বদেশী-আন্দোলন তাঁর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল। রাজনীতি বিষয়ে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও বিভিন্নপন্থী রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল ; কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভ করতে হলে ভারতকে সংহত হতেই হবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল সেই ভারত, যে ভারতে "ধর্মের মহান পুনঃ-সংস্থাপন হয়েছে—যখন সমগ্র জাতি একতাবদ্ধ হবে সাধারণ দুর্বলতায় নয়, সাধারণ দুর্ভাগ্য বা দুঃখের কারণে নয়, একতাবদ্ধ হবে একটি মহান···চিরজাগ্রত সাধারণ জাতীয়তাবোধে, সাধারণ পৈতৃক সম্পদে।"

অশেষ দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে নিবেদিতাকে, কঠোর তপস্যার জীবন যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু এর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন তিনি। স্বামীজী তাঁর সামনে ত্যাগের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন এই ব'লে, "অতীতে ত্যাগই ছিল নিয়ম, আর ভবিষ্যতেও যে তাই-ই থাকবে!" গুরু তাঁর সামনে যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, নিবেদিতা তাই গ্রহণ করেছিলেন ; 'Kali the Mother' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "নিজের জন্য কোন করুণার প্রত্যাশা রেখো না, আমি তোমায় সর্বজীবে করুণার আধার করে তুলবো। নিজের অন্ধকারকে তুমি সাহসের সঙ্গে বরণ করে নাও, তাহলে তোমার আলো বহুজনের সুখের কারণ হয়ে উঠবে। তুচ্ছতম কাজটি সযত্নে সম্পন্ন কর, মুছে ফেলো উচ্চমঞ্চের বাসনা।"

ভারতমাতার পূজাবেদীতলে নিবেদিতা যে বিবেকানন্দের অনবদ্য অর্ঘ্য, সেই বিবেকানন্দের নিকট প্রার্থনা করি—এই মহাজীবন যেন দেশের যুবকগণকে দেশমাতৃকার সেবায় উদ্বুদ্ধ করে।

ভগবৎপ্রসঙ্গ*

স্বামী মাধবানন্দ

(বেলুড় মঠ, রবিবার, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৩)

জগতে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবই আছে। এই সুখ-দুঃখ আছে একরকম ভালর জন্যই। ভগবানকে মানুষ ভুলে যাবে না। আর স্বর্গের মতো শুধু সুখই থাকলে মানুষ তাঁকে মনে রাখত না।

ভগবান ইচ্ছা করলে একসঙ্গে সকল মানুষকে মুক্ত করে দিতে পারেন। তাঁর এত শক্তি! কিন্তু খেলা করার জন্যই হোক আর যেজন্যই হোক তিনি তা করছেন না। এই মহামায়ার খেলা! ঠাকুর বলতেন, তিনি সব ভাবে খেলা করছেন। তিনি সবই দেখছেন। তাঁর অত্যন্ত দয়া। তিনি যেন দয়া করবার জন্যই হাত বাড়িয়ে আছেন। আমাদের দেরী হয় বলে বলি ভগবান কি নিষ্ঠুর! কিন্তু তা নয়। আমাদের মনই ব্যাকুল নয়। সূর্য ওঠার আগে পুব দিকের আকাশ লাল হয়ে ওঠে, তেমনি আমাদের মনে ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা জাগলে তাঁর কৃপা পেতে আর দেরী হয় না। কিন্তু নোঙর ফেলে দাঁড় টানলে কি হবে! সেই গল্প জান তো? এক রাত্রে কতকগুলি লোক খুব নেশা করেছে। তাদের খেয়াল হয়েছে—রাত্রে নৌকা করে বেড়াতে যাবে। ভরা নদী। গভীর রাত। আকাশে তারাগুলি মিটু মিটু করছে। তারা প্রাণ খুলে গান ধরেছে—আর দাঁড়ও টানছে খুব জোর। ক্রমশঃ রাত শেষ হয়ে এল। ভোরের আলো একটু একটু দেখা দিয়েছে। আরও পরিষ্কার হলে দেখে তাদের নৌকা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। কেন এমন হল? নেশার ঘোরও তখন কেটে গেছে। দেখে যে নোঙরটি তোলা হয়নি!

তেমনি আমাদের অহঙ্কারই হল যত অনর্থের মূল। ঠাকুর তাই বললেন, অহঙ্কার ত্যাগ করতে না পারলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না, তিনি ভার লন না। এই 'আমি' 'আমার' জন্য আরও অনেক জাগতিক কামনা-বাসনা এসে পড়ে। তাই তাঁকে পাই না। আর এই কামনা-বাসনাগুলি পূরণ করার জন্য আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। তিনি যেগুলি পূরণ করা প্রয়োজন মনে করেন, সেগুলিই দেন। ছেলে আবদার করে বিষ চাইলে মা কি দেবেন? কখনই না। সেজন্য তাঁর কাছে বড় জিনিস চাইতে হয়। ভক্তি বিশ্বাসই হল আসল। আর 'অহং' তো সহজে যাবে না—কাজেই তাঁরই দাস হয়ে থাকুক। ঠাকুর এই 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি'র কথাই বার বার বলে গেলেন।

তাঁর কাছেই বলতে হয়—প্রভু, তুমি তো আমাদের মন দেখছো, তুমি দয়া করে আমাদের হাত ধরে টেনে নাও। এভাবে কাজ কর, কাজ ছেড় না। তাঁর কাজ তিনি করবেন। এটি বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাও।

(বেলুড় মঠ, সোমবার, ২৯শে এপ্রিল ১৯৬৩)

পাহাড় চড়াই করতে গেলে লাঠির সাহায্য নিতে হয়। তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করতে গেলে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া চাই। সে সাহায্য আসবে কিছু সাধনভজন

* প্রসঙ্গের অনুলিখন

করার পর। পাঁচ হাজার দশ হাজার জপ করলেই হল না। শিশুর মতো সরল হওয়া চাই, আন্তরিক হওয়া চাই। একটু টান থাকা দরকার। হরি মহারাজ বলতেন, সাধন ভজন তপস্যা যা কিছু ডানায় ব্যথা হওয়ার জন্য। ঠাকুর সেই মাস্তলের পাখীর উদাহরণ দিয়েছেন। একটি পাখী জাহাজের মাস্তলের উপর বসেছিল। জাহাজ কখন ছেড়ে গেছে সে খেয়াল করেনি। সমুদ্রের ভেতর বহুদূর আসার পর তার মনে হল—কোথায় আমি এলাম! তখন সে তীরের দিকে উড়ে গেল। কিন্তু কূল-কিনারা কিছু না পেয়ে ফিরে এল। কিছু পরে আবার অন্য দিকে উড়ে গিয়েও কিছু দেখতে না পেয়ে মাস্তলে ফিরে এল। এমনি ভাবে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারদিকে ঘুরে কোথাও এতটুকু আশ্রয় না পেয়ে শেষে মাস্তলেই আশ্রয় নিল।

তেমনি সাধন-ভজন ঠিক ঠিক করলে আমরা বুঝতে পারব—তাঁর সাহায্য বা কৃপা ছাড়া কোন উপায় নেই। জগতে দুঃখ-কষ্ট থাকবেই। এই দুঃখ-কষ্টের অনলে তিনি পুড়িয়ে তোমাদের মনকে খাঁটি করে নেবেন। সময় সময় মনে হয়—এত অশান্তি, মনের এত আবর্জনা কেমন করে দূর হবে? তা নয়। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যেমন একটি দেশলাই-এর কাঠিতে মুহূর্তমধ্যে সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনি তাঁর কৃপা হলে মনের সকল আবর্জনা, জঞ্জাল, অশান্তি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে।

সংসার বড় পিচ্ছিল জায়গা। সংসারে থাকতে হবে, কিন্তু সংসার যেন ভেতরে না ঢোকে। পদ্মপাতা জলে থাকে, কিন্তু জল তার ওপরে থাকতে পারে না। নৌকা জলের ওপরেই চলে, কিন্তু নৌকার ভেতরে জল ঢুকলেই বিপদ। সংসারের এই সুখ-দুঃখ সবই ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র তিনিই সত্য। এটি মনে রেখে সংসার করলে, কর্তব্য-বুদ্ধিতে সব কাজ করে গেলে সাংসারিকতা বা আসক্তি ঢুকতে পারবে না। মনের প্রশান্তি নষ্ট হবে না।

তিনি আমাদের নিয়ে খেলা করছেন কেন জানি না। ধৈর্য ধরে ডেকে যাও। তাঁকে যে যত আপনার করে নিতে পারবে তার তত শীঘ্র হবে। সংসারে নানা কাজে তোমাদের রেখেছেন—যেন পরীক্ষা নিচ্ছেন। হতাশ হবে না। পথ চলতে সুরু কর। দূরত্ব ক্রমেই কমে আসবে। উই পোকা কত ছোট, কিন্তু তিলে তিলে বাড়িয়ে কত বড় উইঢিপি তৈরী করে ফেলে!

(বেলুড় মঠ, মে, ১৯৬৩)

বিষয়ভোগের ইচ্ছা যাদের আছে তারাই বলে ভগবান নেই। মায়া দুরকম—একটিতে বাঁধন কাটে, অপরটিতে বাঁধন খোলে। ঠাকুর বললেন, বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া। বিদ্যা-মায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য এই সব হয়। এতে সংসারের বন্ধন ক্ষয় হয়ে যায়। আর অবিদ্যামায়া আশ্রয় করলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ও যত সব ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস উপস্থিত হয়, এতে ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারের বন্ধনও ক্রমশঃ দৃঢ় হয়ে উঠে।

এই মায়াতে আবদ্ধ হয়ে মানুষ মনে করে বিষয়েই আসল সুখ বা আনন্দ। কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ে, তবু খেতে ছাড়ে না। পুকুরে জাল ফেললে কিছু মাছ লাফিয়ে পালিয়ে যায় আর কিছু মাছ পাঁকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। জেলে তাদেরই হিড়্ হিড়্ করে টেনে তোলে শেষে মৃত্যু। তেমনি মানুষেরও অবস্থা।

তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার জো নেই। গাছের পাতাটি পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা ছাড়া নড়ে না। ঠাকুর মানুষের রূপ ধরে ভক্ত সেজে কত তপস্যা করে গেলেন! এ শুধু আমাদের জন্য। সবই তাঁর পরীক্ষিত জিনিস। ধর্মের কথা তিনি এত সহজ করে বুঝিয়ে গেলেন যে, ছোট্ট ছেলেও বুঝতে পারে। এ রকম আর কোথাও দেখা যায় না। এক Christ-এর কাছে কিছু পাওয়া যায়। ঠাকুর আন্তরিক ব্যাকুলতা ও বিশ্বাসের উপর খুব জোর দিয়েছেন। সরল বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়। ছোট-ছেলের সরল বিশ্বাসে ভগবান তার হাতে খেয়ে গেলেন—এ কাহিনী শোনা যায়।

সমুদ্রে স্নান করতে গেলে জানতে হয় কি-ভাবে ঢেউয়ের মধ্যে ডুব দিতে হয়। জোয়ারের সময় সাঁতার দেওয়া শক্ত। ভাঁটার সময়ও উলটো দিকে সাঁতারকাটা শক্ত। যারা ভাল সাঁতার জানে তারা কিন্তু সবই পারে। তাদের কাছে শিখে নিতে হয়। আর জান তো? নদীর এপার থেকে ওপারে যেতে হলে সাঁতরে বা নৌকা করে যেতে হয়—একেবারে সোজা যাওয়া যায় না, angle করে (বাঁকা ভাবে) যেতে হয়। তেমনি ভগবানকে আশ্রয় করে, কিরূপ কৌশল করে সংসার করতে হয়, ঠাকুর কত সহজ সরল ভাবে তা বলে গেলেন! চোখে আঙ্গুল দিয়ে কত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিলেন! ভগবানকে আশ্রয় করে চললে বিপদের সম্ভাবনা কম। সংসারে দুঃখ-কষ্ট দেখে মানুষের মনে বৈরাগ্য আসে।

নিজেকে কখনও ছোট বা দুর্বল মনে করো না। ছোটছেলের আবদার করার মতো তাঁকেই সব জানাও। দেরী হলে হতাশ হবে না, ভয় পাবে না। মা বলেছেন, আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, তা হলে আমাকেই তো তুলে পরিষ্কার করতে হবে। ভগবানকে আশ্রয় করে থাকলে তলিয়ে যায় না। একদিন না একদিন দর্শন লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আন্তরিক টান হলে তিনি দেখা দেবেনই, দেখা না দিয়ে পারবেন না। যেমন জলে চুবিয়ে ধরলে একটু বাতাস পাবার জন্য মানুষ অস্থির হয়ে উঠে, তেমনি আগ্রহ ও ব্যাকুলতা হলে তাঁর দর্শন মিলবেই।

পার ক'রে দাও

শ্রীসুকুমার মণ্ডল

এ দ্বীপেতে বেচাকেনা শেষ।
সর্বস্বান্ত আমি এক বিদেশী বণিক
শূন্যহাতে আসিয়াছি তোমার বন্দরে,
পারানি কিছুই নাই,
কৃপা ক'রে মাঝি তুমি দাও পার ক'রে।

পণ্যের সম্ভার নিয়ে একদিন এই ঘাটে
বেঁধেছিনু তরী,
আশা ছিল বেসাতির শেষে
আবার ভাসিয়া যাব অন্য কোন দেশে
হীরা মুক্তা মানিকেতে নৌকাখানি ভরি
গর্বভরে;
সে তো স্বপ্ন আজ,—
আমার সোনার তরী লুটেছে তস্করে।

ধনমদে মত্ত হ'য়ে কোনদিন খুঁজিনি তোমারে।
আজ আমি কৃপাপ্রার্থী মুমূর্ষু নাবিক;
ক্ষমা কি পাবো না?—
যেতে কি পাবো না সেই অজানা বন্দরে?

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

এইরূপ সকালে বিকালে শ্রীশ্রীমহারাজের চরণপ্রান্তে বসিয়া আনন্দে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন একটি বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। স্বামী শুদ্ধানন্দজী তখন মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক, বেলুড় মঠের কিছু কিছু কাজও তিনি দেখিতেন। তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত, নিরভিমান ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং আমাদের সকল কাজে আন্তরিক উৎসাহ দিতেন। কিন্তু কেন জানি না সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমরা সকলে মহারাজের অমৃতোপম কথা শুনিতেছি, তিনি মঠের কর্মপরিচালক আর একজন সাধুকে লইয়া হঠাৎ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, "মহারাজ, আপনার নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে।" মহারাজ অন্তর্দ্রষ্টা, তাঁহার ভাব দেখিয়া তিনি সবই বুঝিতে পারিলেন ও বলিলেন, "বল সুধীর (শুদ্ধানন্দ মঃ), তোমার কি বলবার আছে?" তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, এই সকল ছেলেরা আপনার নিকট সকালে বিকালে বসিয়া আপনার উপদেশ শুনিতেছে। অথচ মঠের কাজকর্ম করিতে বলিলে ইহারা প্রায় কেহই কিছু করে না। এইভাবে চলিলে আমাদের পক্ষে মঠের কাজ চালানো মুশকিল হইবে। মহারাজ, তাই আমাদিগকে অনুমতি দিন যে, যাহারা এইরূপ কাজ করিতে চাহে না, তাহাদিগকে আমরা মঠ হইতে বাহির করিয়া দিব।" মহারাজ এতক্ষণ কোন উত্তর দেন নাই। কিছু পরে তিনি (সুধীর মঃ) যখন বলিলেন, "আর মহারাজ, আমরা বাহির করিয়া দিলে উহারা যেন আপনার এখানেও কোন স্থান না পায়", তখন মহারাজের যেন ধৈর্যচ্যুতি হইল। তিনি একটু উত্তেজিতভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি বলছো, সুধীর? তোমাদের কেবল কাজ আর কাজ, এইসব ছেলে যাহার জন্য ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, যাহার জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার কতদূর কি হইল—তোমরা কি কখনো ইহাদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা কর? কখনো কি খোঁজ লও, ইহারা কে কতটুকু বসে, কতটুকু ধ্যানজপ করে? আমি তো দেখিতেছি ইহারা প্রায় কেহই কিছুই করে না। কেহ বা একটু আরাত্রিকে যায়, আবার কেহ বা তাহাও যায় না। এজন্যই তো আমি ইহাদিগকে লইয়া বসি।... কোথায় তোমরা তোমাদের পূর্ব সাধন-ভজনের অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহাদিগকে এ বিষয়ে একটু সাহায্য করিবে, না কেবল কাজ আর কাজ।" এমন সময়ে একজন প্রাচীনতম মহারাজ একটু ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, "ইহারা তো সবই জানে, আমাদের নিকট কি আর শিখিবে?" শুনিয়া মহারাজ আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কি বল,—ভাই, ইহারা কতটুকু জানে? এই তো সবে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আসিল। তোমরা যদি ইহাদিগকে কিছু না দাও, উহারা কোথা হইতে শিখিবে? দেখ —ভাই, কিছু পাইতে গেলে কিছু দিতে হয়। এই দেখ না, দলে দলে ছেলেরা হরি ভাই-এর (তুরীয়ানন্দজীর) সেবার জন্য কাশী ছুটিতেছে, আর এখানে আমরা একটি সেবক পাইতেছি না। তাহারা সেখানে

কিছু পায়, তাই যাইতেছে আর আমরা এখানে তাহাদিগকে কিছুই দিতে পারিতেছি না।"

পরে সুধীর মহারাজের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আর সুধীর, তুমি ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অনুমতি চাহিতেছ, তাহা তোমরা করিতে পার। কিন্তু আমার দরজা ইহাদের জন্য সর্বদা খোলা থাকিবে, আমি কাহাকেও তাড়াইয়া দিতে পারিব না। তোমরা কেবল কাজ কাজ বল, কিন্তু আমি তো দেখিতেছি এখন আমাদের এমন কয়েকজন সাধুর প্রয়োজন, যাহারা শুধু ধ্যান-জপ লইয়াই থাকিবে।"

* * *

আমরা মহারাজের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তাঁহার অপরিসীম দয়া, আমাদের কল্যাণের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও আনন্দে আপ্লুত হইলাম।

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাদিগকে পিতার অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি নবাগত আমাদিগের কয়েকজনকে একদিন মহারাজের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই ছেলেরা নূতন আসিয়াছে। ইহারা তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইতে চায়; ইহারা সকলেই ভাল ছেলে। তুমি দীক্ষা দিলে ইহারা কৃতার্থ হইবে।" কিন্তু মহারাজ তখন সে কথার কোনই উত্তর দিলেন না। পরে অন্য সময়ে যখন আমরা তাঁহার কাছে বসিয়া আছি তখন হঠাৎ বলিলেন, "তোরা দীক্ষা চাস্। তা বাবা, আগে জঙ্গল পরিষ্কার কর্। শম, দম, উপরতি আদি শিক্ষা কর্। তারপর দীক্ষার কথা বলিস্। জঙ্গলে বীজ ফেলিয়া কি হইবে!"

কিন্তু মহারাজ অতি কৃপাপরবশ হইয়া এ-যাত্রা আমাদের কয়েকজনকে ব্রহ্মচর্য দিলেন। ব্রহ্মচর্যের পরের দিন যখন আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি, তখন অতি স্নেহপূর্ণ চক্ষে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্, কালী (কালী মহারাজ, স্বামী অভেদানন্দ) বলছে যে, তোদের ব্রহ্মচর্যের পর তিন দিন তোরা ভিক্ষা করে খা। এ তো ভাল কথা, কি বলিস্?" আমরা মহারাজের অন্তরের কোমলতার কথা বুঝিতে পারিলাম ও বলিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, নিশ্চয়ই আমরা তিনদিন ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

কালী মহারাজ দীর্ঘ ২৫ বৎসর পর দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের সাধন-ভজনের সময় তাঁহারা কত কঠোরতা করিয়াছেন! কতদিন অর্ধাশনে, অনশনে বা সামান্য ভিক্ষায় তাঁহাদের দিন কাটাইতে হইয়াছে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া এ কথা আমাদিগকে ও পূজনীয় মহারাজদিগকে প্রায়ই বলিতেন এবং আমরাও আমাদের বর্তমান সাধন-ভজনের সময় ঐরূপ কিছু কঠোরতা কেন করিব না—ইহা লইয়া পূজনীয় মহারাজের সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। কিন্তু আমাদের শরীর ও মন যে উহার অনুকূলে নহে, দেশের হাওয়াও যে বর্তমানে অনেক বদলাইয়াছে—বহুদিন প্রবাসে থাকায় এ কথা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না। অন্যান্য প্রাচীন মহারাজগণ ইহা বুঝিতেন এবং আমাদিগকে ঐরূপ কঠোরতা করিতে নিষেধ করিতেন।

যাহা হউক, যথাসময়ে আমরা ভিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে যাইতেছি, এমন সময়ে পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজের একজন সেবক আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ এখনই তোমাদের সকলকে (নূতন ব্রহ্মচারীদের) ডাকিতেছেন।"

আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি পূর্ববৎ সস্নেহে বলিলেন, "তোরা ভিক্ষা করতে যাচ্ছিস্ তো?" আমরা বলিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ।" তদুত্তরে তিনি কোমল হইতে আরও কোমল হইয়া বলিলেন, "দেখ্, তোদের ভিক্ষার জন্য সূয্যি (সূর্য মহারাজ, স্বামী নির্বাণানন্দ, মহারাজের সেবক) আজ এই পাঁচ টাকা দিয়েছে। তোরা এই দিয়েই আজ বাজার হতে চাল প্রভৃতি কিনে নিয়ে আয় এবং মঠে এক গাছের নীচে বসে রান্না করে খা। তা হলেই তোদের ভিক্ষার কাজ হবে।"

আমরা মহারাজের অন্তরের কথা বুঝিলাম এবং সেইরূপ বাজার হইতে চাউল প্রভৃতি আনিয়া সেইদিন ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করিয়া খাইলাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজও সেইদিন আমাদের নিকট আসিয়া 'ভিক্ষান্ন পবিত্রান্ন' বলিয়া আমাদের নিকট হইতে উহার কিছু চাহিয়া খাইলেন। পরের দুই দিন, যতদূর মনে পড়ে, আমাদের ভিক্ষার ব্যাপার ঐরূপেই সমাধা হইয়াছিল। বাহিরে একদিনও যাইতে হয় নাই। এরূপ মাতৃবৎ কোমল অন্তঃকরণ লইয়া মহারাজ আমাদিগকে পরিচালিত করিতেন।

এ বৎসর আমাদিগের কাহারও আর দীক্ষা হইল না। পর বৎসর ১৯২১ সালে মহারাজ ৺কাশী যাইবার পথে কয়েকদিনের জন্য মঠে আসিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছিলাম কাশীর উভয় আশ্রমের মধ্যে কি লইয়া বহুদিন হইল একটা গোলমাল চলিতেছে, মঠ-মিশনের সেক্রেটারী পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) বহু চেষ্টা করিয়াও উহা মিটাইতে পারেন নাই। তাই তিনি ভুবনেশ্বরে গিয়া শ্রীশ্রীমহারাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া ঐ কাজের জন্য ৺কাশী লইয়া যাইতেছেন।

যথাসময়ে মহারাজ ৺কাশী রওনা হইয়া গেলেন, কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম, ঐ বিষয়ে তিনি কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, শুধু তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভায় সেখানকার উভয় আশ্রম আলোকিত করিয়া বসিলেন। সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সকালে বিকালে এবং সময় পাইলেই অন্য সময়েও তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক সঙ্গ ও আলাপনে নিজদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সকল গোলমাল, ভেদ-বিবাদ মিটিয়া গেল। সেখানে যাঁহারা কর্মযোগী—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বামীজীর শিষ্যও ছিলেন—যাঁহারা কখনও সন্ন্যাস লইবেন না বলিয়া স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহারাও একে একে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। আর যাঁহারা কর্মকে সাধন-ভজনের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাও স্বামীজীর প্রবর্তিত নিষ্কাম কর্মের মর্ম বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে আপনাদিগকে তাহাতে নিবেদিত করিলেন। মহারাজের আধ্যাত্মিক প্রভাবে শুধু আমাদের আশ্রম-দুটি নয়, সমগ্র কাশীধাম আনন্দে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এই সময়ে ৺কাশী অদ্বৈত আশ্রম হইতে জনৈক সাধু তাঁহার এক গুরুভ্রাতাকে ঐ বিষয় লিখিয়া জানাইলেন। তিনি আনন্দে ভরপুর হইয়া ঐ চিঠিখানি লইয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে উহার মর্ম নিবেদন করিলেন। আমরা দেখিলাম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ঐ চিঠিখানি তাঁহার হাত হইতে চাহিয়া লইলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাহা হইবে না? তাহা হইবে না? যাঁহাকে চকিতে দর্শন করিলে আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া যায়, তাঁহাকে যিনি সতত দর্শন করিতেছেন, তাঁহার উপস্থিতিতে ঐরূপ হইবে না! ঐরূপ হইবে

না। লিখিয়া দাও শ্রীশ্রীমহারাজের ঐ পুণ্যসঙ্গ হইতে কেহ যেন বিচ্যুত না হয়। সকলকে প্রাণভরিয়া তাঁহার এই পুণ্যসঙ্গ উপভোগ করিতে বল।”

আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলাম। বুঝিলাম ইঁহারাই ইঁহাদের পরস্পরকে বুঝিতে সক্ষম। আমরা আর কতটুকু বুঝিতে পারি!

যথাসময়ে ৺কাশীকে আনন্দরসে ভরপুর করিয়া মহারাজ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি খুবই উদার। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, “তারকদা, এবার আমি ইহাদের (আমাদের দেখাইয়া) দীক্ষা দিব ঠিক করিয়াছি। তবে এবার আর খালিহাতে হইবে না। প্রত্যেককে ১০১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিতে হইবে। কি বলেন?” মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের রহস্য বুঝিতেন। তিনিও মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “ঠিকই তো। খালিহাতে কেন দিবে? উহারা ঐ ১০১৲ টাকা জোগাড় করুক।” তাঁহারা উভয়েই জানিতেন, আমারাও জানিতাম, উহা জোগাড় করা আমাদের কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

যথাসময়ে আমাদের দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষান্তে আমরা মহারাজকে প্রণাম করিলাম। কিন্তু ১০১৲ টাকা প্রণামী দিয়া নহে, সামান্য কিছু ফুল ফল দিয়া, যাহা শ্রীশ্রীমহারাজই নিজ হাতে আমাদের তুলিয়া দিয়াছিলেন।

আমরা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেলাম। তাঁহার স্নেহময় দৃষ্টিতে, তাঁহার দিব্য স্পর্শে আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল। কিন্তু তখন আমরা ভাবিতে পারি নাই যে, এই আনন্দ এক ভবিষ্যৎ মহানিরানন্দের সূচনা করিতেছে। শ্রীশ্রীমহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। নির্বিচারে তাঁহার শেষ স্নেহকণাটুকু দিয়া তিনি আমাদের সকলকে ধন্য করিতেছেন।

ইহার কিছুদিন পর ব্যক্তিগত কাজে আমাকে একটু পূর্বাশ্রমে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে একদিন একাকী বসিয়া আছি, হঠাৎ শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীমুখখানি আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল ইনিই আমার সর্বাপেক্ষা আপন, আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, আমার গুরু, আমার ইষ্ট, আমার জীবনের একমাত্র পথপ্রদর্শক। খুবসম্ভব ইহারই পরদিন মঠ হইতে আমার এক বন্ধুর চিঠি পাইলাম—‘মহারাজ কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন। শীঘ্র চলিয়া আইস।’ আমি কিছু-মাত্র বিলম্ব না করিয়া তার পরদিনই চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম সমস্ত মঠ নীরব, নিথর। সকলেই যেন কি এক মহা অশুভের আশঙ্কা করিতেছেন। বাগবাজার বলরাম মন্দিরে মহারাজ অসুস্থ হইয়া আছেন। আর দলে দলে সাধুগণ সেখানে তাঁহাকে দর্শন ও সেবা করিতে ছুটিতেছেন। আমরাও সেখানে গিয়া তাঁহার পুণ্য দর্শন পাইলাম। ইহার দু-এক দিন পরে শুনিলাম মহারাজ সেখানে উপস্থিত সকল সাধুকে পূর্বরাত্রে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া দিব্য আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি যে সেই ব্রজের রাখাল, যাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর দিব্যচক্ষে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা করিতে দেখিয়াছিলেন, ভাবমুখে এইকথা তিনি পুনঃ পুনঃ সেদিন সকলকে শুনাইয়াছেন। মহারাজ বুঝিলেন, আমরাও বুঝিলাম—এইবার তাঁহার লীলাসংবরণের দিন আসিয়াছে।

ইহার দুই দিন পরেই ১৯২২-এর ১০ই এপ্রিল তিনি লীলাসংবরণ করিয়া দিব্যধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে মঠে আমরা

কয়েকটি অল্পবয়স্ক সাধু বসিয়া আছি। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "ভাই, মহারাজ চলিয়া গেলেন। আমার কিন্তু, ভাই, মনে হইত তিনি আমাকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন।" তখন আর একজন বলিলেন, "আমারও, ভাই, ঐরূপই মনে হইত (অর্থাৎ তাঁহাকেও মহারাজ সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন)।" আর একজনও অনুরূপ কথা বলিলেন। তখন আমাদের অপেক্ষা কিছু অধিকবয়স্ক একজন সাধু বলিলেন, "দেখ, মহারাজের ভালবাসা ছিল অগাধ সমুদ্রের মতো। উহারই ২।১ বিন্দু জল ছিটাইয়া তিনি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। আর আমরা ভাবিতাম – গোটা সমুদ্রটাই বুঝি আমরা পাইয়া বসিয়াছি। কিন্তু সমুদ্র যে-সমুদ্র সে-সমুদ্রই রহিয়া গিয়াছে।" এইরূপই ছিল তাঁহার কামগন্ধহীন সর্বকল্যাণকারী অফুরন্ত অপূর্ব ভালবাসা।

ইহার বহু বৎসর পরে আমরা কনখলে (হরিদ্বারে) গিয়াছিলাম। সেখানে উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় কল্যাণ মহারাজ, আমরা যাহারা শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মতিথিদিবসে কিছু কিছু বলিতে বলিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ৺কাশী প্রভৃতির কথা উঠিলে আমি একটু হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ খুব চালাক ছিলেন।" ইহাতে কল্যাণ মহারাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি তাঁকে কি বুঝেছ, ছোকরা? তিনি চালাক ছিলেন? স্বামীজী ছিলেন সূর্যের মতো। তাঁর কাছে আমরা কেহই ঘেঁষতে পারতাম না। আর মহারাজ ছিলেন চন্দ্রের মতো। তাঁর স্নিগ্ধ ছায়ায় আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে যেতাম। তাঁর কথা আমরা সকলেই শুনতাম। তিনি শুধু সঙ্ঘকর্তা বলে নন, আমরা প্রত্যেকেই জানতাম তিনি আমাদের যা বলেছেন তা আমাদেরই পরম কল্যাণের জন্য। এজন্যই নির্বিচারে আমরা সকলে তাঁর কথা শুনতাম। তিনি বুদ্ধিমান বা চালাক ব'লে নয়।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া সেদিন আমরা অন্তরের অন্তরে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, ইহাই হইল মহারাজের যথার্থ পরিচয়।

শ্রীশ্রীমহারাজের স্নেহের অভিব্যক্তির কথা এখানে একটু লিখিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—উহা ছিল সাধারণ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি যাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, আমরা দেখিয়াছি, তাহার প্রতি একেবারে উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতেন। সে হয়ত দিনের পর দিন অন্যের সহিত তাহার সামনে বসিয়া আছে। তিনি সেই সকল ব্যক্তির সহিত হয়ত কথা কহিতেছেন বা তাহাদের লইয়া অন্য নানা প্রকারের আনন্দ করিতেছেন, কিন্তু সেই স্নেহ-ভাজনের দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইতেছেন না। হঠাৎ একদিন তাঁহার সেই দিব্য অমৃতবর্ষী চক্ষু লইয়া তিনি তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল আর দিনভর সেই আনন্দের রেশ তাহার হৃদয়ে রহিয়া গেল। আর যদি কৃপা করিয়া তিনি তাহাকে একবার স্পর্শ করিতেন তো সে আনন্দ অন্ততঃ তিনদিন তাহার মনে স্থায়ী হইয়া রহিল! ইহা কোন অতিরঞ্জন বা কল্পনার কথা নয়। উপভোক্তাগণের নিজ মুখে আমরা ইহা শুনিয়াছি এবং উহার দুই-একটু ছিটেফোঁটা আমাদেরও সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

এইরূপই ছিল এ অলৌকিক পুরুষের অলৌকিক ভালবাসা, যাহার কণা পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের অনুধ্যান

স্বামী সন্তোষানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ক্রমে লক্ষ্মীপূজা এলো। পূজক স্বামী রামেশ্বরানন্দ (ভাব মহারাজ); আমি তন্ত্রধারক। আমিও অবশ্য উপবাসী ছিলাম। ঐ দিন সন্ধ্যার পরেই ছিল চন্দ্রগ্রহণ। তাই পূজা খুব শীঘ্র শীঘ্র সেরে নিতে হলো। পূজা শেষ হতে হতেই গ্রহণ লেগে গেল। তাই তখন আর কিছু খাওয়া হলো না। ঐ সময় আমি নিত্যই পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের পা একটু টিপে দিতাম সন্ধ্যার পর। সেদিনও তাই তাঁর কাছে যেতেই বললেন, "আজ পারবে?" আমি বললাম, "পারবো।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "আমি কিন্তু না খেয়ে থাকতে পারবো না। আমার ক্ষিদে পেয়েছে।" বলেই একজনকে আদেশ করলেন তাঁকে কিছু খেতে দেবার জন্যে। সে দিল একটি রাজভোগ। সেটি খেয়েই বললেন, "Superstition! একটা গ্রহের ছায়া পড়েছে আর একটা গ্রহের উপরে। এই তো ব্যাপার। হ্যাঁ, তবে nature-এ এত বড় একটা পরিবর্তন! এতে সহজেই লোকের মন একাগ্র হয়। এ সময় যদি ধ্যান-জপ করে, সে খুব ভাল। যারা পুরশ্চরণ করবে তাদের আজ খুব জুত।" শেষের কথা কটি বলার কারণ যে, সেদিন গ্রহণ একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।...

বছরখানেক হল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হয়ে গেছে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা। নাম হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম্। নামটি দিয়েছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ নিজে। আর স্বামী নির্বেদানন্দও তখন হয়েছেন ব্রহ্মচারী অনাদিচৈতন্য। খুব সম্ভবতঃ ১৯১৯ সালের স্বামীজীর তিথিপূজার সময় তাঁরা কয়েকজন ভুবনেশ্বরে গিয়ে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীস্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে পান ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা। ১৯২০-র ২৪শে ডিসেম্বর এই ছাত্রাবাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। কারণ ঐদিন শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ এসেছিলেন এই আশ্রমে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রামলালদা, ৺ক্ষীরোদ বিদ্যাভূষণ, শৌরেনবাবু ও পূজনীয় সূর্য মহারাজ। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ সকাল দশটা আন্দাজ আশ্রমে এসে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফিরে গেলেন আলিপুরে কোচবিহারের রাজবাটী বেলভেডিয়ার-এ। সেখানে ছিলেন তিনি শৌরেনবাবুর অতিথি

যা হোক, ১৯২১ সালের প্রথমেই এই শিশু-আশ্রমকে হতে হলো এক মহাবিপদের সম্মুখীন। অনাদি মহারাজের হলো জ্বর। ক্রমে ঐ জ্বর পরিণত হলো ভয়ঙ্কর টাইফয়েড-এ। পূজনীয় অনাদি মহারাজ যে ছাত্র পড়াতেন প্রধানতঃ তারই আয়ে আশ্রম চলতো। এর কিছুদিন আগে আর একটি কর্মী আশ্রমে যোগ দিয়ে সাধারণের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে অবশ্য আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তাতে সামান্যই টাকা আসতো। পূজনীয় অনাদি মহারাজ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর ছাত্র পড়ানো হলো বন্ধ। কাজেই তাঁর পড়ানোতে যে টাকা আসতো, তাও বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে ক্রমে তাঁর অসুখ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। ডাক্তার ৺দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিকিৎসা করতেন। তিনি ছিলেন আমেরিকা-ফেরত হোমিওপ্যাথি-

চিকিৎসক। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার ৺দুর্গাপদ ঘোষ এম. বি.।

পূজনীয় অনাদি মহারাজের অসুখ কিন্তু ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে লাগলো। এক সময় তিনি শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "এটা কার?" এরকম সময় একদিন পরম পূজনীয় মহাপুরুষজী এলেন তাঁকে দেখতে। এসেই গিয়ে বিছানার উপরে তাঁর মাথার কাছটিতে বসলেন। জিহ্বায় অত্যন্ত ঘা হওয়ায় অনাদি মহারাজের কথা তখন অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "উঁচু চিন্তা মাথা থেকে সলাতে (সরাতে) পাচ্ছি না। বল (বড়) কষ্ট হচ্ছে।" পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী তাঁর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললেন, "উঁচু চিন্তা এখন থাক্। ও পরে আবার হবে।" পরে এসে বারান্দায় উপবেশন করলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো একটু কিছু প্রসাদ তাঁকে দেব কি না। বেশ জোর দিয়েই বললেন, "হ্যাঁ, দাও।" শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদিত ফলমিষ্টি তাঁকে দেওয়া হলো। তিনি সামান্যই গ্রহণ করলেন এবং অল্প পরেই চলে গেলেন।

এর পর থেকেই পূজনীয় অনাদি মহারাজ আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগলেন। তিনি পরে বলেওছিলেন যে, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহা-পুরুষজীর পূর্বের কথার পর থেকেই অসুখের ভেতর 'উঁচু চিন্তা' চলে যায়। তারপর আর কখনও আগের মতো নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করে 'এটা কার?'—এরূপ প্রশ্ন করেননি।

এরও কযেক বছর আগের দুটি-একটি কথা বলছি। শুনেছি পূজনীয় অনাদি মহারাজের কাছে। বোধ হয় ১৯১৫ কি ১৯১৬ সালে তিনি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ করেন। ঐ-সময় অবশ্য তিনি ছিলেন সুরেনবাবু এবং কোচিং ক্লাস করতেন বলে মঠে সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁকে ডাকতেন 'মাষ্টার' বলে। যা হোক, প্রথম দর্শনের দিনই পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীকে প্রণাম করামাত্র তিনি তাঁকে বললেন, "দেখ, স্বামীজীর 'রাজযোগে'র Introductionটা পড়ে দেখো। খুব rational লেখা।" তখনকার আশ্রমে অবশ্য দু'চারখানা বই ছিল, কিন্তু 'রাজযোগ' ছিল না। আর আশ্রমের খুবই সামান্য আয়ে বই কেনা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু সিদ্ধসংকল্প ঋষির ইচ্ছা অমোঘ, সেদিন অযাচিতভাবে অনাদি মহারাজ কয়েকখানা বই পেলেন, তন্মধ্যে ছিল এক-খানা 'রাজযোগ'। বইগুলি এঁরই ছাত্রদের মারফত পাঠিয়েছিলেন পূজনীয় ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ।

আশ্রমে ফিরে এসে রাজযোগের ভূমিকা শুধু নয়, সমগ্র বইখানাই পড়ে ফেললেন। রাজযোগের ইঙ্গিত অনুসারে সাধন করবার প্রবল আগ্রহও তাঁকে পেয়ে বসলো। সেই থেকে কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের উপদেশ অনুসারে সাধনে রত থাকেন। অনাদি মহারাজ যে কেবল নিজের সাধন-ভজন সম্বন্ধেই শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের উপদেশ গ্রহণ করতেন, তা নয়। আশ্রমের অভ্যন্তরীণ জীবন সম্বন্ধেও সময় সময় তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি অনাদি মহারাজকে বললেন, "দেখ, ছেলেদের একটু পুষ্টিকর খাবার ব্যবস্থা কোরো।" শুনেই পূজনীয় অনাদি মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ মহারাজ, সপ্তাহে একদিন ডিম দেওয়া হয়।" শুনেই তিনি কিন্তু বললেন, "ডাল ভাত হজম করতে পারলেই শরীর গড়ে উঠবে। ডিমটা না দেওয়াই ভাল।"

খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের মতামত পূর্বের উক্তি থেকে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। একদিন ১৯২৩-র গোড়ার দিকে মঠে রাত্রে লুচি-মাংসের ভাণ্ডারা। ভাণ্ডারা দিচ্ছেন পূজনীয় স্বামী প্রকাশানন্দ। কলকাতারও সব আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিমন্ত্রণ হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদও পাওয়া যাবে, রাত্রে মঠেও বাস হবে। বেশ আনন্দের সঙ্গে মঠে গেলাম আমি ও স্বামী নির্বেদানন্দ। এবারই শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজায় অনাদি মহারাজের সন্ন্যাস হয়, নাম হয় স্বামী নির্বেদানন্দ। মঠে গিয়ে কিন্তু যা শুনলাম তাতে তো আমি খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। আমাদের গিয়ে পৌঁছবার একটু আগেই এসেছিলেন স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ। তিনি ছিলেন তখন গদাধর আশ্রমের মোহন্ত। মঠে পৌঁছে তিনি গিয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করা-মাত্রই মহাপুরুষজী জিজ্ঞেস করলেন, "আজ যে এলে?" চন্দ্রেশ্বরানন্দ স্বামী জবাবে বললেন, "এমনি এসেছি।" "কোনো কাজ আছে?" "আজ্ঞে না।" "তবে যে আশ্রম ছেড়ে এলে?" "সেখানে আজ বিশেষ কাজ নেই।" "কোন আগন্তুক যদি আসে?" "যারা আছে তারা দেখবে'খন।" এরপরে মহাপুরুষজী বললেন, "লুচি মাংসের জন্য বুঝি এলে?" স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ ক্রোধভরে উত্তর দিলেন, "আমি লুচি-মাংসের জন্য এসেছি, একথা আমাকে কেউ বলতে পারবে না। আমি এখুনি চলে যেতে পারি।" মহাপুরুষজী বললেন, "যাও, চলে যাও।" আমরা গিয়ে দেখি স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ রাগ করে চলে যাচ্ছেন। শুনলামও সব। কাজেই ভয় হলো খুবই। পূজনীয় মহাপুরুষজীকে প্রণামও করতে হবে এবং মঠে রাত্রিবাসের জন্য তাঁর অনুমতিও চাইতে হবে। যা হোক, খানিক বাদে পূজনীয় অনাদি মহারাজের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে প্রণাম করে বললাম, "মহারাজ, আজ মঠে লুচি-মাংসের ভাণ্ডারা। খবর দিয়েছিলেন, তাই এসেছি। এমনিতে তো আমাদের মঠবাস হয়ই না. এ উপলক্ষে মঠে রাত্রিবাসও হবে।" শুনে বললেন, "তা বেশ। এক রাত্তির তো? ওঁদের কি? আমেরিকা থেকে এলেন, একদিন লুচি-পাঁঠা খাইয়ে চলে গেলেন। তোমাদের এ দেশে পড়ে থাকতে হবে। ডাঁটা-চচ্চড়ি খেয়ে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুঝতে হবে আর কাজ করতে হবে। রাত্রে বেশী খায় গেরস্তরা। তারা রাত্রে বেশী করে খাবে,...। ও-সব তোমাদের জন্য নয়। তবে একরাত একটু বেশী খেলে কিছু যাবে আসবে না।" দয়াময় মহাপুরুষ মহারাজের আদেশ ও উপদেশ পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের খাওয়ারও এক বৈশিষ্ট্য ছিল। দুপুরে সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে একত্র পঙ্গতে বসে খেতেন। ঠাকুরদের ভোগে যা কিছু উঠতো, সবই তাঁকে সাজিয়ে দেওয়া হতো পূজার সময় ঠাকুরদের যে ফল-মিষ্টি নিবেদন করা হতো, তারও কিছু কিছু একটি রেকাবিতে সাজিয়ে তাঁকে দেওয়া হতো। আর দেওয়া হতো একটা বাটিতে খানিকটা নালতে পাতার ঝোল। তিনি কিন্তু সবই একটু একটু চেখে দেখতেন। আলাদা একটা বাটিতে ঠাকুরদের প্রসাদী পায়েসও তাঁকে দেওয়া হতো। তিনি যে-কটি ভাত খাবার তা ঐ নালতে পাতার ঝোল দিয়েই খেতেন। আর সবই একটু একটু চেখে দেখতেন মাত্র। বলতেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে।" কিন্তু কোন ব্যঞ্জনে যদি তরকারির বিসদৃশ সংযোগ ঘটতো, তা মোটেই

তাঁর নজর এড়াতো না। বলে উঠতেন, "এ কি combination হয়েছে? যা তা একটা মিলিয়ে দিলেই হলো?" পরে বাটি থেকে একটু পায়েস নিয়ে দুটি ভাতের সঙ্গে মেখে একটু খেতেন। তারপর সবটুকু পায়েস পাতে ঢেলে যে ভাত থাকতো তার সঙ্গে মেখে ফেলতেন; প্রসাদী ফলমিষ্টির থালা থেকে সন্দেশটি তুলে তাও ঐ ভাতের সঙ্গে মেখে বেশ একটি বড় ডেলা প্রস্তুত করে বলতেন, "বড়দা, এই রইল।" তারপর যখন জয় দিয়ে সাধু-ব্রহ্মচারীরা উঠে পড়তেন তখন বড়দা ঐ ভাতের ডেলাটি নিয়ে দিতেন একটি কুকুরকে। আর কুকুরটা সারাক্ষণ উঠোনে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো, বোধ হয় পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের দিকে তাকিয়ে।

গ্রীষ্মকাল। সেদিন বেশ গরম। সকলের সঙ্গে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীও এসে খেতে বসলেন। পূজনীয় ভাব মহারাজ (স্বামী রামেশ্বরানন্দ) নিজে খেতে না বসে একটি হাত-পাখা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে পূজ্যপাদ মহা-পুরুষজীকে হাওয়া করতে লাগলেন। ক্রমে খাওয়া শেষ হলো। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ প্রসাদী ফলমিষ্টির রেকাবিতে কিছু ফলমিষ্টি সাজিয়ে রেখে হাসতে হাসতে বললেন, "ভাব, এই যে এতক্ষণ হাওয়া করলে, তার মজুরী।" হাসিমুখে ভাব মহারাজ জবাব দিলেন, "অন্য মজুরী চাই না মহারাজ, চাই একটু আশীর্বাদ।" "আরে আশীর্বাদ তো আছেই, এটা নগদ বিদায়।"—বললেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ।

১৯২৩-র ৺বাসন্তীপূজা। হবে ভুবনেশ্বর মঠে। পূজনীয় ভবানী মহারাজ (স্বামী বরদানন্দ) একদিন এসে অনুরোধ জানালেন, ভুবনেশ্বর যেতে হবে ৺বাসন্তীপূজা করবার জন্যে। এই বছরই শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার সময় সন্ন্যাস চেয়েছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয়নি। পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, "এ ambition." কথা একেবারে ঠিক। কিন্তু তখন তা বোঝে কে? যা হোক, আমার অভিমানেও লেগেছিল দারুণ আঘাত। যদিও তিথিপূজার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, তবুও আমার সেই ঘা তখনও শুকোয়-নি। তাই ভবানী মহারাজ যখন এসে অনুরোধ জানালেন ৺বাসন্তীপূজা করতে ভুবনেশ্বর যাবার জন্যে, তখন বেশ ক্রুদ্ধভাবেই সে অনুরোধ উপেক্ষা করলাম। ভবানী মহারাজ অনেক বোঝালেন; কিছুই ফল হলো না, আমি তাঁর কোন কথাই শুনলাম না। তিনি ফিরে গেলেন। দু'-এক দিনের মধ্যেই খবর এলো, পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন। মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই হাসতে হাসতে তিনি বলে উঠলেন, "আরে, ভরত নাকি আমাদের উপর রাগ করেছ? আরে ভরত আমাদের ছেলে, আমাদের সন্তান, আমরাই তার আপনার জন; আমরা যা বলবো, তাই করবে। আমাদের কথা শুনবে না তো আর কার কথা শুনবে? আমরা যা বলবো তাই করবে।"—ইত্যাদি অনেক কথা বলতে লাগলেন। এত মিষ্টি কথা তো কখন শুনিনি! যেন মধুবর্ষণ হলো! সব রাগ অভিমান কোথায় চলে গেল। কে জানে, তিনিই হয়তো আমার অন্তরের ময়লা-মাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন! কি বলবো কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আস্তে আস্তে বললাম, "মহারাজ, শুনেছি ঐ সময় জয়রামবাটীতে মায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠা হবে, সেখানে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে; আবার রাজা মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বর মঠ, সেখানে ৺বাসন্তীপূজা, সেখানেও যেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

এ দোটানায় পড়ে গেছি। এখন কি করবো, আপনি বলে দিন। বেশ প্রসন্নচিত্তে মহাপুরুষজী বললেন, "শরৎ মহারাজ আমাকে বলেছেন মায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠা পেছিয়ে দেবেন। যদি তা না হয়, তবে তুমি জয়রামবাটী যাবে। তা না হলে তোমাকে ছাড়বো না ভুবনেশ্বর যেতে হবে।" আমিও মহানন্দে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে ফিরে এলাম।

৺বাসন্তীপূজা উপলক্ষে মহাপুরুষজীর সঙ্গে একই ট্রেনে ভুবনেশ্বর যাওয়া গেল। ঐ ট্রেনে আরও অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী গিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূজনীয় স্বামী শঙ্করানন্দ ও অম্বিকানন্দ। মঠে পৌঁছেই গেলাম মূর্তি দেখতে। স্থানীয় কারিগরের প্রস্তুত মূল মূর্তিটি আমার মোটেই ভাল লাগলো না। পূজনীয় স্বামী অম্বিকানন্দ প্রভৃতিও মূর্তি অপছন্দ করলেন। কিন্তু নানাকলাবিদ্যা-বিশারদ স্বামী অম্বিকানন্দ লেগে গেলেন সেই মূর্তিটি শোধরাতে। আমি কিন্তু আর দ্বিতীয়বার মূর্তি দেখতে যাইনি। আমাদের যাবার আগে পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল উঠোনে, এজন্যেই তোলা একটি একচালার তলায়। আমাদের যাবার পরে সবাই পরামর্শ করে স্থির করলেন, মঠবাটীর মধ্যের প্রশস্ত হলঘরে পূজা হবে। যা হোক, প্রতিমা অতি সন্তর্পণে তুলে এনে স্থাপন করা হলো হলঘরে। তারপর ষষ্ঠীর দিন সকালে দ্বিতীয়বার সেই মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। স্বামী অম্বিকানন্দ মহারাজের সুদক্ষ হস্তের স্পর্শে এ কী অদ্ভুত পরিবর্তন! সত্যিই এখন মূর্তিটি হয়েছে অতি সুন্দর!

পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল। পূজার মধ্যে একদিন স্থানীয় একজন পণ্ডিত তাঁর স্বরচিত একটি সংস্কৃত-শ্লোক এনে দিলেন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। স্বামী প্রশান্তানন্দ শ্লোকটি পড়ে বললেন যে, পণ্ডিতজীর প্রার্থনা হচ্ছে, তাঁকে একখানা পট্টবস্ত্র প্রদান করা হোক। বলা বাহুল্য, পূজনীয় মহাপুরুষজী পণ্ডিতজীর সেই প্রার্থনা তখনই পূর্ণ করে দিলেন। বোধ হয় একাদশীর দিন রাত্রে তাঁর কাছে কয়েকটি ভক্ত বসেছিলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "এ খুব কঠোর করতে পারে।" শুনেই মহাপুরুষজী বলে উঠলেন, "কি এমন কঠোর করেছে? আমরা এখনও যা করতে পারি, ও কি তা পারবে?"

ভুবনেশ্বর থেকে পুরী হয়ে ফিরে আসা গেল কলকাতায়। সেখান থেকে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠা দর্শন করতে গেলাম জয়রামবাটী। মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। মহা-মহোৎসব লেগে গিয়েছিল, যেন আনন্দের বান ডেকেছিল। এই উপলক্ষে পরমারাধ্য স্বামী সারদানন্দজী কয়েকজনকে সন্ন্যাস দেন, আমিও তাদের মধ্যে একজন। সন্ন্যাসের পরে ফিরে এসেছি স্টুডেণ্টস্ হোমে।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আরও কিছু-কাল পরে ফিরলেন মঠে। মঠে গেছি তাঁকে দর্শন করতে। তিনি বসেছিলেন দোতলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় একটি আরাম কেদারায়। আর তাঁর ডানদিকে আর একটি চেয়ারে বসেছিলেন পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজী। আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে মহাপুরুষ মহারাজ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "এই দেখ, ভরত পুজোর ভয়ে আমাদের ফাঁকি দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিল।" আমি ততক্ষণে তাঁকে প্রণাম করে পূজ্যপাদ অভেদানন্দজীকে প্রণাম করলাম। তিনিও হাসতে হাসতে বললেন, "কি রে, পুজোর ভয়ে

সন্ন্যাস নিলি?" আমি তখন পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজকে বললাম, "না মহারাজ, আপনি বললেই আমি পূজা করবো।" শুনেই সোৎসাহে বলে উঠলেন, "এই তো চাই। মায়ের পূজো করবে না? ভারি তো সন্ন্যাস! এই তো চাই। তখন তাঁরা বলেছিলেন বিধান নেই, ছিল না বিধান"—একথা বলেই নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন, "এখন আমরা বলছি বিধান, হয়ে গেল বিধান।" এ পর্বের শেষ এখানেই হলো না।

সেবারে ৺দুর্গাপূজার সময় পূজনীয় স্বামী ধীরানন্দ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার পুজো কে করবে?" "কেন, ভরত করবে!"—অকুণ্ঠস্বরে উত্তর দিলেন মাতৃগতপ্রাণ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ। পূজনীয় ধীরানন্দজী পড়লেন মহামুশকিলে। সন্ন্যাসী ৺দুর্গাপূজা কি করে করবে? অথচ পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর এরকম সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কথা বলাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি উদ্বোধন বাটীতে এসে সবই নিবেদন করলেন পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর কাছে। তিনি একদিন মঠে এসে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন, "এ আশ্রমেই আর একটি ছেলে আছে ক্ষুদিরাম বলে। সেটিও তো বামুনের ছেলে, তারও দীক্ষা হয়ে গেছে। সেও তো পূজো করতে পারে।" পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, তা ক্ষুদিরামও পারে। তা তাই হবে।"

স্বামী অম্বিকানন্দ ছিলেন সাধনভজনশীল কঠোরী সন্ন্যাসী। মনে হয়, সে সময় তাঁর একটা অবস্থা হয়েছিল, যেন মনটাকে একটু বহির্মুখ করতে পারলেই ভাল হয়। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি এসব কথা বলছিলেন, এমন সময় আমিও সে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। স্বামী অম্বিকানন্দজী বললেন, "একজন বলেছে একদিন গাড়ী করে আমাকে 'জু' গার্ডেনে নিয়ে যাবে। ভাবছি একদিন 'জু' দেখে আসবো।" পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বললেন, "আমি কখনও 'জু' দেখিনি।" "যাবেন, মহারাজ?" সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন স্বামী অম্বিকানন্দ। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বললেন, "নাঃ, কি হবে! তুমিও যেমন। আমি তো কলকাতায় থাকতাম, কোনো দিন গড়ের মাঠ দেখিনি। সেদিন গদাধর আশ্রম থেকে গাড়ী করে ফিরছি, একজন বললে—এই গড়ের মাঠ। আমি চেয়ে দেখলাম। এই যে এতদিন গড়ের মাঠ দেখিনি, তাতেও কোন অভাববোধ ছিল না; আর এখন যে দেখলাম, তাতেও কিছু হলো না। এই তো চাই। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' ব্যস্, এই তো চাই। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'।" কয়েকবার কথাটি বলে নিজের ঘরের যে দরজাটি দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়, সেই দরজাটি দেখিয়ে বলছেন, "ঐটি হলো বেশ জায়গা। ঐখানে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটাও দেখা যায়, আবার বাইরটাও দেখা যায়।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বললেন, "একদিন ঠাকুর বললেন, 'দেখ, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কারুর বেলা তো ওরকম হয় না; তোমার বেলাই এমনটা কেন হলো?' আমি বললাম, 'তা কি জিজ্ঞেস করবেন করুন না।' তিনি বললেন, 'তোমার বাবার নামটি কি?' নামটি বলতেই বলে উঠলেন, 'ও তাই! তুমি তাঁর ছেলে? তিনি এখানে আসতেন গো। আমাকে একটি কবচ দিয়েছিলেন। দেখ তো ঐ তাকের উপরে হাত দিয়ে।' তাকের উপরে হাত দিয়ে একটি কবচ এনে তাঁকে দেখালাম।

বললেন, 'হ্যাঁ, ঐ কবচটি তিনি আমায় দিয়েছিলেন। তাই তো, তাহলে তুমি তো একরকম গুরুপুত্র হোলে। তোমার সেবাটা নেয়া যাবে কি করে?' আমি বললুম, 'তা তিনি যাই হোন্, আমার তো আপনিই সব।' তারপর থেকে তাঁর জন্যে গাড়ু করে জল নিয়ে গেলে বলতেন, 'তাই তো, তুমি নিয়ে এলে? আচ্ছা, আগে একটু হাতে দাও।' তাঁর হাতে একটু জল দিলে সেটুকুও নিজের মাথায় দিয়ে তবে আমাকে ঢেলে দিতে বলতেন।"

আর একদিন, স্বামীজীর সঙ্গে তিনি যে মায়াবতী গিয়েছিলেন, সেই ঘটনার বর্ণনা করেছিলেন—"সে শীতকাল। পাহাড়ের রাস্তা সব বরফে ঢাকা। আমার ঘোড়াটা গেল পালিয়ে। আমাকে সেই বরফের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হলো। অনেক জায়গায় এতখানি করে পা দেবে যাচ্ছিল। সকলেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল। স্বামীজী বললেন, 'গুপ্ত আগে চলে যাক্। ওখানে খবর দিক্ যে আমরা আসছি; যেন গরম জল-টল সব ready করে রাখে।' তাই হলো, গুপ্ত চলে গেল। আবার ছিলেন nervous। গুপ্ত চলে যাবার পরই ভাবতে আরম্ভ করলেন, 'ওকে এই পাহাড়ের রাস্তায় একা একা পাঠালাম। ও যদি রাস্তা ভুল করে বা ওর যদি অন্য কোন বিপদ হয়, তাহলে কি হবে?' স্বামীজীর এই রকম ভাবনা দেখে ঠিক হলো একজন পাহাড়ীকে পাঠানো হবে গুপ্তের খবর আনতে। একজন পাহাড়ীকে পাওয়াও গেল। স্বামীজী তখন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, সে লোকটা যদি দশ টাকা চায়, তাই দিতাম। লোকটা বললে, 'হাম্ এক রুপেয়া লেগা।' আমি কথা শুনে বললাম, 'এক রুপেয়া? থোরা কম্‌তি কর।' স্বামীজী বলে উঠলেন, 'ওদের সঙ্গে আবার দরাদরি কি? ও যা চেয়েছে, তাই দাও।' তাই ঠিক হলো, বললাম, 'আচ্ছা যাও, খবর নিয়ে এসো।' সে বলে, 'রুপেয়া দাও।' আমি বললাম, 'আগে খবর আন, তবে টাকা দেব।' সে বলে, 'এ্যায়সা জারা হায়, জায়েগা কেইছে। ঐ রুপেয়াটো (ট্যাঁক দেখিয়ে) হিয়া রাখ লেগা। ওছিকা গরমছে চলা জায়েগা।' তাকে একটি টাকা দিলাম, সেও রওনা হয়ে গেল। পরদিন সকালে তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা; হাসতে হাসতে বলল, 'ও-স্বামীজী হুঁয়া পৌছ গিয়া আউর সব আচ্ছা হায়।'" তারপরে হাসতে হাসতে বললেন, "মায়াবতী পৌছে সেই বুড়ীকে (অর্থাৎ মিসেস সোভিয়ারকে) বিধবা দেখে আমি ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলেছিলাম।" শ্রোতাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আর স্বামীজী?" "স্বামীজী গম্ভীর"—জবাব দিলেন মহাপুরুষজী। * * *

আর এক দিনের ঘটনা। রামকৃষ্ণপুরের ৺নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ছেলে শ্যামবাবু ছিলেন পরমারাধ্য রাজা মহারাজজীর শিষ্য। তিনি কয়লার ব্যবসা করতেন। আর কোষ্ঠী দেখানো তাঁর একটা বাই ছিল। ৺ললিত মিত্র ছিলেন তাঁর খুব সুহৃদ। তিনি আবার কোষ্ঠীও দেখতেন। ললিতবাবু বললেন যে কোষ্ঠীতে আছে, শ্যামবাবুর ঐ সময় কলেরা হবে, জীবন-সংশয়। শ্যামবাবু খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। যা হোক, তাঁর কোনো অসুখই হলো না। কিন্তু কথা চারদিকে খুব ছড়িয়ে গেল। তিনি একদিন মঠে এসেছেন সকালের দিকে। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আসতে দু'-এক কথার পর মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "আরে শ্যাম, তুমি মহারাজের সন্তান। তোমার ভয় কি? তুমি ঐ সব কোষ্ঠী-ফোষ্ঠী দেখে অত ভয় কর কেন? তুমিও যেমন! তুমি মহারাজের

শিষ্য। তোমার ওসবের দরকার কি? তুমি ও-কোষ্ঠী ফেলে দাও গে যাও।" তারপর নিজের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছেন, "এটা বাপের বড় ছেলে ছিল কিনা, তাই এক কোষ্ঠী করিয়েছিলেন। খুব বড় কোষ্ঠী! আমি ঠাকুরের সন্তান। আমার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? দিলাম একদিন গঙ্গায় ফেলে, গঙ্গার উপর দিয়ে পাক খুলতে খুলতে গেল, অনেক লম্বা! গিরিশবাবু এক সময় কোষ্ঠী নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করতেন। তিনি শুনে বললেন, 'অমন কোষ্ঠীখানা ফেলে দিলেন?' তুমিও ও-কোষ্ঠী ফেলে দাও। কি বল, ফেলে দেবে তো?" শ্যামবাবু আস্তে আস্তে জবাব দিলেন, "আমাদের insurance প্রভৃতি করতে হয়। তাই কোষ্ঠীর দরকার হয়।" তখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "তবে থাক্।"

৺মন্মথনাথ দত্ত ছিলেন আলিপুরের Deputy Superintendent of Police। তিনি এবং তাঁর পত্নী ছিলেন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের খুব ভক্ত। তিনিও তাঁদের স্নেহ করতেন খুবই। তাঁদের কোন সন্তান ছিল না। মঠের সব সাধুদেরই তাঁরা ছিলেন কাকাবাবু, কাকীমা। একদিন কাকীমা তাঁর এক বিধবা বান্ধবীকে নিয়ে গেছেন মঠে, সেখানে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে নিজের বান্ধবীর পরিচয় দিয়ে বললেন, "ইনি বিধবা।" শুনেই মহাপুরুষ মহারাজ বলতে আরম্ভ করলেন, "বেশ, বেশ, বিধবাই ভাল। বেশ, বেশ, বিধবাই ভাল।" তিনি যত এই কথা বলছেন, ততই কাকীমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, কারণ তিনি ছিলেন সধবা। সহসা তাঁর উপর নজর পড়ায় বললেন, "সধবাও ভাল, বিধবাও ভাল।"

এর অল্প কয়েকদিন পরে পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ মঠে এসে এই কথা শুনে একদিন দুপুরে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে হাসতে হাসতে ঢুকে বললেন, "দাদা নাকি বলেছেন—সধবাও ভাল, বিধবাও ভাল।" তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, বিধবারা ভাল। তারাই তো ধর্মটা রেখেছে। পূজার্চনা, বার-ব্রত সব তো তারাই রেখেছে। আর সধবারাও ভাল। তারাই এই মহামায়ার সংসারে জীবদের আনে।" পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ আবার বললেন, "আমি শুনে বললাম, 'তা দাদার মতোই কথা হয়েছে।' এই সেদিন যখন জিজ্ঞেস করলাম—শরীরটা কি রকম আছে, তা বললেন, 'এই এখানে বাত, এখানে সর্দি, এই তো। তবে আত্মা ভাল আছে।'" শুনেই পরমানন্দময় পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বলতে আরম্ভ করলেন, "হ্যাঁ, তাই তো; এই দেখ না (হাঁটুতে হাত দিয়ে) এখানে ব্যথা, ও সর্দি, এই সব।" (তারপর যেরকম করে জন্তু-জানোয়ারকে আদর করে, সেই রকম নিজের দক্ষিণ উরুদেশে চাপর মারতে মারতে) বলতে লাগলেন, "তবে এই শরীরে ভগবানলাভ হয়। ধন্য মানব-শরীর, এই শরীরে ঈশ্বরদর্শন হয়, ধন্য মানব-শরীর।" সমস্ত স্থানটি এক গম্ভীর আবেশে ভরপুর হয়ে গেল! কারুর মুখে কোন কথা নেই! নিজের আনন্দে নিজে বিভোর হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "ধন্য মানব-শরীর, ধন্য মানব-শরীর, এই শরীরে ভগবানলাভ হয়।"

ভগিনী নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

জাতি-তত্ত্বঃ নিবেদিতার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার পরিমাণ কম নয়। তাঁর এই সুবিপুল আলোচনায় মুখ্যস্থান পেয়েছে তাঁর 'জাতি-তত্ত্ব' বা Theory of Nationality। নিপুণ রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞের মতো তিনি জাতি, জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন তাঁর 'Civic And National Ideals'-নামক গ্রন্থে। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার মৌলিকতা আমাদের চমকিত করে, গভীরতা আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের দেশ বলেই 'Civic And National Ideals'-এর মতো উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক রচনা অনাদৃত, অন্য কোন দেশ হলে হয়ত এ গ্রন্থখানি রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হত। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মস্ত বড় ত্রুটি, দৃষ্টির বিভ্রম এবং চিন্তার নৈরাজ্য এখানে সবচেয়ে সুস্পষ্ট। তাই রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের এই অপূর্ব রচনাটির নামও এখনকার ছাত্রছাত্রী কেউ জানে না।

উপরোক্ত গ্রন্থে 'জাতি ও জাতীয়তা'—রাজনীতিশাস্ত্রের এই বহু-আলোচিত বিষয়টির ওপর ভগিনী নিবেদিতা অনেক নূতন আলোকপাত করেছেন। যে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম তার চিত্তলোকে এক বিশেষ আসন অধিকার করেছিল, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসন্ধান করে দেখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সত্যানুসন্ধী ভগিনী নিবেদিতা। জাতীয়তাবাদের গুণাগুণ নিয়ে যে বিভ্রান্তি দেশের সর্বত্র আজ বিরাজ করছে, ভগিনী নিবেদিতার এই বৈজ্ঞানিক আলোচনা তার নিরসনে বহুল পরিমাণে সহায় হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আজ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকেও এরূপ কথা বলতে শোনা যায় যে, জাতীয়তাবাদ আমাদের অনেক অনিষ্ট করেছে। জাতীয়তাবাদ আমাদের অনেক অনিষ্ট করেনি, করেছে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার—একথা অনেকেই ভুলে যান। জাতীয়তাবাদ যে সঙ্কীর্ণতার জনক নয়, বিশ্বের সকল মানুষের সঙ্গে ঐক্যবোধ-জাগরণের পথে যে পরিপন্থী নয়, তা নিবেদিতার আলোচনায় অতি সুস্পষ্ট।

জাতি বা 'নেশন' সম্পর্কে নিবেদিতার গবেষণার ক্ষেত্র হয়েছে 'ভারত', যেখানে বহু বিচিত্র গোষ্ঠীর, বহু বিচিত্র বর্ণের ও ধর্মের এবং বহু বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসমাজের সমাবেশ ঘটেছে। ভারতের মত জাতিগঠনে উপাদান-বৈচিত্র্য অন্য কোন দেশে অন্য কোন জাতির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। সেজন্য নিবেদিতার জাতি সম্বন্ধে ধারণা পাশ্চাত্য ধারণাসকল হতে পৃথক হয়েছে।

জাতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ধারণায়ও বহুল মতানৈক্য রয়েছে। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Burgess-নামক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের সিদ্ধান্তানুসারে একটি জাতি বা 'নেশন' হল "a population of an ethnic unity, inhabiting a territory of a geographic unity." একটি জনসমাজের মধ্যে যদি বংশগত ঐক্য থাকে এবং ভৌগোলিক ঐক্যের পটভূমিকায় যদি এই ঐক্য সংস্থাপিত

হয়, তাহলেই তাকে একটি 'নেশন' বলা যেতে পারে। Ethnic unity বা বংশগত ঐক্য বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করে Burgess বলেছেন যে, এ বিষয়ে ঐক্য বলতে তিনি বুঝেছেন, "a population having a common language and literature, a common tradition or history, a common custom and a common consciousness of rights and wrongs." কিন্তু তাঁর ভাষার ঐক্যের উপর জোর দেওয়ায় অনেকে আপত্তি তুলে বলেছেন যে, ভাষার ঐক্য না থাকলেও একটি জনসমাজ 'জাতি' হয়ে উঠতে পারে, যেমন সুইস্ জাতি। সুইটজারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের তিনটি ভাষা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের একজাতি বলে বিবেচনা করে। এ বিষয়ে সুবিখ্যাত ফরাসী রাজনীতিশাস্ত্রবিৎ রেনানের (Renan) মত অন্যপ্রকার; তাঁর মতে "...it was not community of language and race which makes a people a nation, but the sentiment of a common heritage of memories, whether of achievement and glory or of suffering and sacrifice, together with a desire to live together in the same state and to transmit their heritage to their posterity." সমাজশাস্ত্রবিৎ Novico-এর মতে: "it (a nation) is a cultural and spiritual unity and is the highest product of social evolution." [১] সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে একটি নেশন গঠনের মূলে দু'রকম প্রভাব আছে—একটি স্থানগত, অপরটি ঐতিহ্যগত। এই উভয়প্রকার উপাদানের মধ্যে প্রধান বংশগত ঐক্য (racial unity), ভাষাগত ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ঐক্য এবং স্থানগত ঐক্য। কিন্তু দেখা গেছে ভাষাগত, বংশগত ও ধর্মীয় ঐক্যের অভাবেও একটি জাতি গড়ে উঠতে কোন বাধা নেই। ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি কোন জাতিরও বংশগত ঐক্য নেই। ভাষার ঐক্য সুইটজারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে নেই। ফরাসী, জার্মান ও ইটালিয়ান—এই তিন ভাষায় কথা বলেও সুইটজারল্যাণ্ডের সকল অধিবাসীই সুইস্। ধর্মীয় ঐক্য ইংলণ্ড, জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি কোন দেশেই নেই। এদের সকলেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হলেও এদের মধ্যে প্রোটেস্টাণ্ট এবং ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতবিরোধ সামান্য নয়। সেজন্য বংশগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় ঐক্য সর্বত্র জাতিগঠনে সহায়তা করলেও এসকলের কোন একটি ক্ষেত্রে অনৈক্য জাতি-গঠনে বাধা হয় না। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল জনসাধারণের একত্র বাসের ইচ্ছা। M. Hanser তাই বলেছেন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা—"It is the will of a people to live together and not race or language, which makes a nation." এই একত্র বাসের ইচ্ছার সহায়ক অতীত ঐতিহ্য, অতীত ইতিহাস, একত্র সুখদুঃখ-ভোগের স্মৃতি। অর্থাৎ একই সৌভাগ্য, গৌরব-মহিমা বা দুর্ভাগ্য-ভোগের অংশীদার যারা, তারা ভাষাগত, বর্ণগত বা ধর্মগত ঐক্য না থাকলেও একজাতিত্ববোধের বন্ধন অনুভব করতে পারেন। এজন্য Burns অতি সুন্দর করে বলেছেন, "A common memory and a common ideal—these more than a common blood—make a nation." [২]

কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞাও খাটে না। ভারতে ধর্মবৈচিত্র্য, ভাষাবৈচিত্র্য অন্যান্য

১ পাশ্চাত্য মতের আলোচনায় Garner-এর Political Science and Government-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

২ Burns : Political Ideals—p. 178

অনেক দেশের চেয়ে অনেক বেশী। এ বিষয়ে অনৈক্যই চোখে পড়ে, ঐক্য নয়। এমনকি ঐতিহাসিক স্মৃতিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এক নয়। যথা মুসলমানগণ একদা ছিলেন বিজেতা, হিন্দুগণ বিজিত। বিজেতা ও বিজিতের সুখদুঃখভোগ কখনও এক প্রকার হতে পারে না। রাজা প্রজার ভাগ্যও এক নয়, তারা একই গৌরবমহিমার অংশীদার নয়, একের পক্ষে যা গৌরবের, অপরের পক্ষে তা মর্মান্তিক লজ্জার বিষয়। অভিজ্ঞতার বিভিন্নতায় ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্মৃতিও বিভিন্ন, ইতিহাসও বিভিন্ন। কিন্তু নিবেদিতা তার 'নেশন' সম্পর্কে ধারণা গড়েছেন ভারতকে সম্মুখে রেখে। সেজন্য প্রচলিত পাশ্চাত্য ধারণার সঙ্গে তাঁর 'নেশন' সম্পর্কে ধারণা মেলে না। এ বিষয়ে তাই নিবেদিতার নিজস্ব সংজ্ঞা হল—"Those who having a common region of birth, connect the work, the institution, the ideals, and the purposes of their lives with that region and with their fellows, and those who, doing this, undergo a common economic experience, form a nation."[৩] নিবেদিতার এই সংজ্ঞানুসারে যদি জাতীয় স্মৃতিও এক না হয়, এমনকি জীবনাদর্শের ঐক্যও যদি না থাকে, তা হলেও কিছু এসে যায় না। এ পার্থক্যও প্রথা, আচার, আচরণ, ভাষা, বর্ণ ও ধর্মের পার্থক্যের ন্যায় জাতিগঠনের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। শুধু যদি সকল বৈচিত্র্য সুনিয়ত ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠে থাকে, এবং সকল বিচিত্র প্রথা প্রতিষ্ঠান আদর্শকে সে-স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়, আর যদি বিচিত্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ভাগ্য একই হয়ে থাকে তাহলে সকল বিচিত্রতা সত্ত্বেও একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে।

আমরা প্রায়শই দেখি ভারতের এই বৈচিত্র্য বিদেশীরা বুঝে উঠতে পারেন না। ভারতকে অনেকে সেজন্য প্রায়ই এক নানাজাতির সমাবেশে গঠিত এক উপমহাদেশ বলে বর্ণনা করে থাকেন। Garner প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশীয় রাজনীতিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতারা ভারতের জাতিভেদ, বর্ণবৈচিত্র্য, ধর্মীয় অনৈক্য ভারতের জাতীয়ত্বের পথে বাধা বলে বিবেচনা করেছেন।[৪] এমনকি বহু ভারতীয়ও এ বিষয়ে বিভ্রান্তি অনুভব করেছেন; দেখা যায়, এক ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যাধিকার (Right of self-determination) সমর্থন করেছেন এ কথা ধরে নিয়ে যে, এসকল বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এক ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থান করলেও তারা এক একটি বিভিন্ন জাতি (nationality), রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করলে তারা এক একটি স্বতন্ত্র নেশন হবে।[৫] এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার স্বচ্ছ ও সত্য দৃষ্টি ও মৌলিক বিচার বিশেষ লক্ষণীয়। তাঁর মতে ভারতীয় জাতির বৈচিত্র্যই তার ঐক্যের প্রমাণ বহন করছে, বৈচিত্র্য ছাড়া ঐক্য তো অর্থহীন—"for the fact that we are all different is, in its way, a proof of our unity!"[৬] ভারতের বিচিত্র বিশাল ভাবসম্পদ দেখে তিনি আরও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, বৈচিত্র্যই একটি জাতির শক্তির উৎস। অথচ পাশ্চাত্য মতের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয়েরাও একথা প্রায়ই বলেন, ভারতের এই বৈচিত্র্য

৩ Civic And National Ideals—p. 57

৪ Garner: A Political Science and Govt., p. 117 and 120 and Muir: Nationalism And Internationalism, p. 39.

৫ Dr. Dhirendra Nath Sen: Revolution by Consent.

৬ Civic And National Ideals—p. 47

সংহতির পক্ষে বাধা, তার জাতীয় দৌর্বল্যের কারণ। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার মতে সংহতি-সাধক স্থানের প্রভাবের ফলে এই বৈচিত্র্যই একটি জাতির শক্তির পরিমাণ নিরূপণ করে। তিনি সুস্পষ্ট বলেছেন—"Complexity of elements, when duly subordinated to the nationalising influence of place, is a source of strength, and not weakness to a nation." সুতরাং তাঁর মতে যে জাতির বৈচিত্র্য যত বেশী সে তত নানা সম্পদের অধিকারী, সে তত ঐশ্বর্যবান, জাতিপুঞ্জের মধ্যে তার স্থান তত উচ্চে—"The rank of a nation in humanity is determined by the complexity and potentiality of its component parts."[৭]

সুতরাং নিবেদিতার মতে বৈচিত্র্যেই একটি জাতির শক্তি ও সংহতি নিহিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও অঞ্চলের মধ্যে এক অভিনব ঐক্য দেখতে পেয়েছেন তিনি—"I find an overwhelming aspect of Indian unity in the fact that no single member or province repeats the function of any other.'[৮] একটি জাতি তো একটি যন্ত্র নয়, বরং একটি জাতির সংহতি অনেকটা জৈবিক সংহতির মতো (organic unity)। একটি জীব-দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকলাপ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, একটির কর্ম যেমন অপরের কর্মের পুনরাবৃত্তি নয়, সম্পূর্ণ পৃথক সম্পূর্ণ স্বকীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রত্যেকের কর্ম, একটি জাতির জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর কর্মও সেইরূপ পৃথক ও স্বতন্ত্র ধরনের। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যকলাপই জীবদেহের ঐক্য সম্পাদিত করে। ঠিক সেইরূপ একটি জাতির অঙ্গীভূত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিচিত্র কর্ম ও প্রথাসকল, আচার ও আচরণ একটি জাতীয় জীবনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এক অপূর্ব সমন্বয়-প্রতিভা। যুগে যুগে বহু বিভিন্ন বহিরাগত জনগোষ্ঠীকে তাদের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, ধর্ম, দেবদেবী, প্রথা, প্রতিষ্ঠান আপনার অঙ্গীভূত করে নিয়েছে এবং এভাবে সে তার শক্তি বৃদ্ধিই করেছে। ভারত এই সমন্বয়-প্রতিভায় পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়—বিজিত ভারত বারংবার বিজেতা জাতির ধর্ম, ভাষা প্রভৃতিকে আত্মসাৎ করে নিজ জাতীয় দেহে বিলীন করেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছিলেন, "শক-হুণদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

একটি জাতিগঠনের ব্যাপারে নিবেদিতার মতে তাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন এই সমন্বয়-প্রতিভার। তাঁর পূর্বোক্ত 'Civic And National Ideals'-শীর্ষক গ্রন্থে তিনি নিজেই তাই প্রশ্ন তুলেছেন, "What is required for the manifestation of a strong concious national life? Is love of place, pride of birth or confidence in past culture all sufficient?" এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন—"Neither any, nor yet all of these can ever be enough. In addition there must be the irresistible mind of co-ordination, the instinct of co-operation, the tight-knit discipline of a great brotherhood." এ বিষয়ে ভারতের অদ্বিতীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "... One of the master-facts in Indian history, a fact borne in upon us more deeply with every hour of study, is that India is and always has been a synthesis"[৯] এই

৭ ও ৮ Ibid p. 47

৯ Footfalls of Indian History—P. 16.

অদ্বিতীয় সমন্বয়-প্রতিভাবলেই আমরা দেখতে পাই ভারতে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভাবাদর্শের দৃঢ় ঐক্য সারা ভারতময় প্রতিযুগেই দেখা গেছে। অথচ আঞ্চলিক বৈচিত্র্য কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, প্রতিটি অঞ্চল স্বকীয় বিকাশের পথ কখনও পরিত্যাগ করেনি। তথাপি যুগে যুগে দেখা গেছে যে, একই ভাবের বন্যা সারা দেশে এ-প্রান্ত হতে ও-প্রান্ত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে—"...the same tides have swept the land from end to end. A single impulse has bound province to province at the same period, in architecture, in religion, in ethical striving". ভারতের এই অপূর্ব সুরসংগতিই তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের, জাতীয় শক্তির পরিচয় বহন করছে, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক দৃঢ় ঐক্য সারা দেশের এক লক্ষ্যপথকে নির্দেশ করেছে: "The provincial life has been rich and individual, yet over and above it all India has known how to constitute herself a unity consciously possessed of common hopes and common loves". (ক্রমশঃ)

নিবেদিতা

শ্রীশান্তশীল দাশ

অশিক্ষা কুশিক্ষা আর নানা কুসংস্কার-
জর্জরিত এ ভূমির নিলে সেবাভার
গুরুর আদেশে; চিত্ত দ্বিধাশঙ্কাহীন,
এলে চলে এ ভূমিতে; ব্রত কী কঠিন
পালন করেছ তুমি সারাটি জীবন—
সেবার পরমা মূর্তি, গুরুর চরণ
স্মরণ করেছ নিত্য আর নিরলস
আপন কর্তব্যপথে চলেছ, মানস-
ভূমিতে জাগ্রত মন্ত্র—সর্ব-সেবা-সার
জীব-সেবা—সেই সেবা সাধনা তোমার।
প্রতীচ্য-নন্দিনী তুমি, কার ইচ্ছা বলে
প্রাচ্য-জননীর বুকে এলে তুমি চলে;
সেই জননীর পদে আত্মসমর্পিতা
হলে তুমি, কী সার্থক নাম নিবেদিতা।

'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া'

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ছুটির পালা ফুরোলো। এবার কাজ, কেবল কাজ—যতদিন না আবার আনন্দময়ীর আগমনের আভাসে নীল আকাশে সাদা মেঘের পরিতৃপ্তি বর্ষাশেষের বিজয়কেতন উড়িয়ে দেখা দেবে। আকাশে সাদা মেঘ, মাটিতে শুভ্র কাশ। মনে পড়ে, পূজোর ছুটিতে আসানসোল যাবার পথে এক রাতে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত কাশের বন দেখেছিলুম। মাইলের পর মাইল সেই নীলাভ শুভ্রতার অফুরন্ত মেলা ওই ট্রেনকে কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্নসমুদ্রের তরণী করে তুলেছিল। তারপর আবার দিগন্তবিস্তৃত নীলিমার রাজ্যে আমরা হারিয়ে গেলুম।

আসলে ছুটি মানেই তো হারিয়ে যাওয়া। সেকথা কাজের ভীড়ে মনে থাকে না। ব্যষ্টি বা সমষ্টির প্রয়োজনে আমরা সবাই কর্মরত। এমন কি নতুন নতুন কাজ আমরা সৃষ্টি করে থাকি। উপমা দিয়ে বলতে গেলে, এ দুনিয়ার কর্মী মৌমাছিরা অহর্নিশি এক সংসার-মৌচাক রচনার জন্য খেটে চলেছি। ছুটির শেষের এই কলকাতার দিকে চেয়ে দেখুন। দিনে রাতে কোথাও এর জনতার স্বল্পতা নেই। এর চেয়ে বড় শহরও আছে, সেখানে এর চেয়ে বেশী ভীড়। আর কে না জানে, কাজের যত রকমারি, যত বৈচিত্র্য, ততই সভ্যতার সমৃদ্ধি। সভ্যতা কেবল দিনকেই মুখর করে না, তার রাত্রিও সমান বিনিদ্র।

ওদেশে শুনি সপ্তাহের শনি রবি দুটি দিনই ছুটি। পাঁচদিনের প্রচণ্ড কর্মস্রোতের চেয়ে দুদিনের বিশ্রামের উল্লাস প্রচণ্ডতর হয়ে ওঠে। আর সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহব্যাপী ছুটি যদি থাকে, তাহলে সংবাদপত্রে দুর্ঘটনার খবর বিশেষ স্তম্ভে সগৌরবে স্থান পায়। আমেরিকার ৪ঠা জুলাইয়ের স্বাধীনতা-দিবস সে-দিক থেকে পৃথিবীর সেরা আনন্দের ও অপমৃত্যুর দিন। ভারতবর্ষে ১৫ই আগস্ট সে তুলনায় এখনো সাবালকত্ব অর্জন করেনি। এদেশে জেট এসেছে, কিন্তু গোরুর গাড়ী এখনো প্রধান বাহন। সুতরাং গতির সঙ্গে দুর্গতির অচ্ছেদ্য যোগাযোগ এখনো বহুদূর। তবু যদি শহর-পিছু দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান নেওয়া যায়, তার অঙ্ক কম বেদনা-দায়ক হবে না। তবে, তা ছুটির আনন্দের মাতামাতি নয়, নিছক প্রাত্যহিক ঘটনার অঙ্গস্বরূপ।

কেউ কেউ বলবেন, অস্থার্থ আমরা জীবনকে উপভোগ করতে জানি না। আমাদের জীবনে সে দুরন্ত গতির অভাব, যার ছোঁয়ায় দেশময় বিরাট কলকারখানার উৎপাদন যেমন তীব্রবেগে এগিয়ে যায়, মানুষের জীবনও তেমনি বিপুল উল্লাসে সব কিছু জয় করে নিতে ছোটে। এই ছুটেচলার নেশাই জীবন, মৃত্যু বা দুর্ঘটনা তার ছন্দরক্ষা করে মাত্র। মৃত্যু নয়, জীবনই এই দ্রুত ধাবমান সভ্যতার লক্ষ্য। হয়তো তাই।

এদেশেও পূজোর ছুটি আমাদের, বিশেষ করে বাঙালীদের, ঘর ছেড়ে বাইরে টানে। সামান্য সঙ্গতি থাকলেই কাছের সাঁওতাল পরগনা, বীরভূম, মাইথন, আর একটু দূরভি-লাষীর জন্য দিল্লী, হরিদ্বার, অজন্তা, কন্যা-কুমারিকা। পর্বতপ্রেমিকেরা গরমের দিনেই বেশী উতলা হ'ন, তবু দেবতাত্মা হিমালয় পূজোর ছুটিতেও সমান আকর্ষণীয়।

ছুটির একমাস আগে থেকেই পথে ঘাটে বন্ধুজনের সস্মিত জিজ্ঞাসা—এবারে কোথায়? প্রতিপ্রশ্নও স্বাভাবিক। কাছের কলকাতা মনের কাছে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। দূরের নদী, পর্বত, অরণ্য, নগর, জনতা এক রহস্যময় আহ্বান জাগিয়ে তুলছে রক্তের স্রোতে। কোথায় যাব?

পূর্বে চেরাপুঞ্জী, পশ্চিমে দ্বারকা উত্তরে শ্রীনগর, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা—সমস্ত ভারতবর্ষ নানা প্রান্ত থেকে নিঃশব্দ আহ্বান জানায়—বেরিয়ে এসো, ঘরের কোণ থেকে সমস্ত বিশ্বের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়াও। দেখো, জগৎ কত বড়ো, মানুষ কত আপন, পৃথিবী কেমন সুন্দর!

ঘরে আমি অতিপরিচয়ের দ্বারাই আচ্ছন্ন, ঠিক চোখের উপরেই যা, তাকে দেখতে পাই না, বরং দেখায় সে বিঘ্ন ঘটায়। একটু দূর থেকে দেখায় সমগ্রতা আর সামঞ্জস্য। আবার অতিদূরত্বে অস্পষ্টতা। রোজকার দেখা রাস্তাঘাট, মানুষজন আমাদের মনের আড়ালেই পড়ে থাকে। তাদের জানি বলেই পরিচয়ের আগ্রহ আমাদের সবচেয়ে কম। অথচ আসলে হয়তো খুব কমই জানি।

দূর প্রবাসে মধুসূদন বাংলাদেশ, আশ্বিন মাস, বউকথাকও পাখী, নদীতীরে দ্বাদশ শিবমন্দির, কপোতাক্ষ নদকে যেমন করে স্মৃতির চোখে দেখতে পেয়েছিলেন, তেমন করে কি এদেশে দেখতে পেয়েছেন কোনদিন? কাজকে ফিরে পাবো বলেই দূরে যাওয়া। কাজের চলমানতার জন্যই ছুটির খেয়ালখুশি।

কিন্তু ছুটির অর্থ যদি ছোটাছুটি হয়ে দাঁড়ায়! পশ্চিমদেশের ছুটি তো হৈ-হুল্লোড়ের চরম। আমাদের এ দেশের ছুটিও কি তাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে না! ছুটির পক্ষে পুরীর সমুদ্রতীর, কাশীর বিশ্বনাথমন্দির অথবা কলকাতার বোটানিকাল গার্ডেন—কোন্‌টি আপনি বেছে নেবেন?

অবশ্য প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যেও কেউ কেউ গণতান্ত্রিক আনন্দ পান, জনতা না থাকলে তাঁদের কাছে একঘেয়ে প্রকৃতি-সৌন্দর্য দু'দিনেই দুঃসহ, তৃতীয় দিবসে হাওড়া বা শিয়ালদা'র নিত্যকার হাটবাজারে পৌঁছে তাঁরা নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচেন। আবার এমন লোকও আছেন, জনারণ্যের মাঝখানে থেকেও যাঁরা একলামনের ভুবনটি সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। বিহারীলাল তেমনি এক কবি, যিনি অনায়াসে একথা বলতে পারতেন, 'তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে।'

ওই দুই শ্রেণীর বাইরের লোক যারা, অর্থাৎ আমরা—ভীড় যাদের ভীড় বলেই মনে হয়, অথচ নির্জনে বেশীদিন কাটানো যাদের সাধ বা সাধ্যে কুলোয় না—তাদের জন্য স্বল্পসাধ্য ভ্রমণকেন্দ্রের আয়োজন এদেশে আজও অপ্রচুর। আসলে স্বাদ বদলাবার জন্য আমরা কলকাতার ভীড় থেকে ভ্রমণকারীদের ভীড়ে গিয়ে পড়ি, এখানকার দ্রুতগতি জীবনযাত্রার চেয়েও দ্রুতছন্দে স্বল্পতম সময়ের দেখার তালিকাটি সুবৃহৎ করে ঘরে ফিরে আসি। মনে রাখি না, একঘণ্টা বা একদিন বা দিন তিনেকের চক্কর খাওয়ায় পৃথিবীর কোন জায়গার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তাতে ভ্রমণতালিকাটি দীর্ঘতর হয় মাত্র, ভ্রাম্যমানের সঙ্গে সেই ভ্রমণকেন্দ্রটির প্রাণের যোগ ঘটে না।

য়ুরোপ-আমেরিকার বিত্তবানদের ভ্রমণপঞ্জী তাই পক্ষিদৃষ্টি হিসাবে গ্রহণীয়, প্রাণদৃষ্টি হিসাবে একান্ত পরিহার্য। প্রতিদিনের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকার, মাটির

গন্ধ, জোনাকির বাতি, মন্দিরের ঘণ্টা, রিক্সার ঠুনঠুন, পুকুরের ধারে কলমিলতা, প্রজাপতির উড়ে যাওয়া, ভেসে-আসা গানের কলি, ভাঙা মন্দিরের একপাশে পোড়ামাটির কারুকার্য, যাত্রিবাহী বাসের ভেঁপু, এক ঝাঁক বালিহাঁস, পথ চলতি একদল সাঁওতাল, দূর থেকে মিনারের চূড়া, এঁকে বেঁকে ছুটেচলা পাহাড়ী পথে ঘন হয়ে নেমে-আসা কুয়াশা—কোথায় কখন কেমন করে এক একটি গ্রাম, শহর, তীর্থ বা পাহাড়ী স্টেশন আপনাকে আপন হৃদয়ের কাছে টেনে নেবে, কেউ বলতে পারে না। যেমন কেউ বলতে পারে না কবে কাঞ্চনজঙ্ঘা তার মেঘাবগুণ্ঠন খুলে যোগমূর্তি গিরিশের শুদ্ধ শুভ্র রূপ আপনার চোখের সামনে তুলে ধরবে। কেউ বলতে পারবে না, তার নিজের গ্রাম, নিজের বাড়ী, তার আপনজনদের সে কখনো তেমন করে চোখ মেলে চেয়ে দেখেছে কি না। শুধু তো দূরই নিকট হয় না, আমাদের নিকটতম যা, তাও অনেকসময় সবচেয়ে দূরের হয়ে থাকে।

তাই এবারের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছি আমারই ঘরের বারান্দায়। সামনের বরুণ-গাছটির পাতা পড়ছে। আগত অগ্রাণ। দিগ্বিজয়ীরা এখন ঘরে ফিরবে।

“হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা ফের জাগিয়ে তুলুন। এ ছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্য লাভ করা সম্ভব নয়। ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান আদর্শ নাই; যদি এখানেই তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আর কোথায় তাকে রক্ষা করার আশা করা যেতে পারে? ব্রহ্মচর্যের মধ্যে সমস্ত শক্তি ও মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে।”

—ভগিনী নিবেদিতা

পঞ্চবটীমূলে

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা

ধর্মপ্রবণ হিন্দুজাতি প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ হতেই প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণকে পূজায় পরিণত করে। গাছপালার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। অশ্বত্থগাছও এই সময় থেকেই ভারতবর্ষে উপাসনার বস্তু হিসাবে পূজিত হয়ে আসছে। বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, বিল্ব, অশোক, আমলকী, বকুল, কিংশুক, অর্জুন প্রভৃতি যেগুলি মানবের নানাভাবে উপকারিতা সাধন করে, সেগুলি ধীরে ধীরে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে বিশেষ স্থান অধিকার করে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছে। এভাবে পঞ্চবটী বা পঞ্চবট হিন্দুজীবনে এক বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করে আছে।

ভারতের জ্ঞানগরিমা আশ্রমবাসী আরণ্যকদের করতলগত হয়েছিল। কিন্তু সে অরণ্য গহন বন ছিল না, ছিল ঋষির আশ্রম-তপোবন। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটীবনে, বিভিন্ন ঋষির তপোবন-আশ্রমে পরিভ্রমণ করছেন দেখা যায়। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের উল্লেখ অতি অল্প। অধুনালুপ্ত বহুনদনদীতীরে বৃক্ষলতাগুল্মে আচ্ছাদিত কোমল শষ্পাস্তীর্ণ শ্যামশোভায়, মনোরম পরিবেশযুক্ত তপোবনে, গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন কুটীরপ্রাঙ্গণে, শান্ত আবেষ্টনীতে মুমুক্ষু যোগী ধ্যানসমাহিত হয়ে থাকতেন। কেউ বা ছায়াবহুল পাদপমূলে ব্রহ্মচারিপরিবৃত হয়ে শাস্ত্রব্যাখ্যা করতেন, হোমধেনু ও বৎস অলসনেত্রে একপ্রান্তে রোমন্থনে রত। অগ্নিগৃহে যজ্ঞকুণ্ডে সদাপ্রজ্বলিত অগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করা হত। আশ্রমপালিত মৃগশাবক তৃণাঙ্কুরের আশায় ইতস্ততঃ সঞ্চরমান। উষা-ও সন্ধ্যা-কালীন বেদপাঠ এবং সামগানে গম্ভীর ও উদাত্ত কণ্ঠের আরাবে দিগ্-বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তরুশাখাপল্লব পবিত্র ওঙ্কারধ্বনিতে অনুরণিত। প্রাঙ্গণের বিটপীশাখা ও বল্লীবিতানগুলি প্রদীপ্ত যজ্ঞানলের ধূমে চিহ্নিত। এ সকল তপোবনে পবিত্র সুন্দর পরিবেশে বহু শাস্ত্র এবং ধর্মের বিভিন্ন পথ ও তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। সকল বিদ্যার অধিকারিভেদে ঋষিকুল শিষ্যসম্প্রদায়কে উপদেশ প্রদান করেছেন। বহু বিদ্যা লুপ্ত হলেও চরম এবং পরম জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা শিষ্যপরম্পরায় আজও হিন্দুজাতির তথা সমগ্র মানবগোষ্ঠীর পথ নির্দেশ করে চলেছে।

এমনি এক পরিবেশে চঞ্চলা তটিনী তমসার তীরে বটবৃক্ষের ছায়ায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ঋষি-প্রবর বাল্মীকি শ্রীভগবানকে লাভ করেছেন। শ্রীঠাকুরের কথা—"তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।" মহাভারতে পাণ্ডবদের তীর্থযাত্রাপর্বে এবং বনবাসপর্বে দেখা যায়—যোগপরায়ণ ধ্যানসমাহিত ব্রহ্মজ্ঞ বনবাসী মুনি-ঋষিদের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ হচ্ছে। জ্ঞান-বিদ্যা-তত্ত্ব-আলোচনা ও সাক্ষাৎকার সকলই তপোবন-আশ্রমে সাধিত হত।

পুত্রৈষণা, রাজ্যৈষণা ইত্যাদি সকল এষণা ত্যাগ করে রাজকুমার সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তু হতে গভীর নিশীথে বহুযোজন পথ অতিক্রম করে

অরণ্যে এসে উপনীত হলেন। "প্রত্যুষে তাঁহার দেহকান্তির দ্বারা আশ্রম অভিভূত করিয়া সিদ্ধের ন্যায় সেখানে প্রবেশ করিলেন। সস্ত্রীক তপস্বিগণ যিনি যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই ইন্দ্রপ্রতিম রাজকুমারকে দেখিতে লাগিলেন। কাষ্ঠসংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত বিপ্রগণ সমিধ-পুষ্প ও কুশহস্তে প্রত্যাগত হইয়া তপঃপ্রধান ও বিজ্ঞ হইয়াও তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন, মঠে ফিরিলেন না।

"আশ্রমবাসিগণের বিচিত্র তপশ্চর্যা নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী কুমার স্বর্গাকাঙ্ক্ষী পুণ্যকৃৎ জনপূর্ণ সেই আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সৌম্যমূর্তি কুমার তপোবনে তপোধনগণের নানারূপ তপস্যা নিরীক্ষণ করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া অনুগমনকারী এক তপস্বীকে প্রশ্ন করিলেন। তপোরত সেই দ্বিজ তপোবিশেষ ও বিভিন্ন তপস্যার ফল ক্রমে ক্রমে কহিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জটাবল্কল-চীরবাসযুত তাঁহার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত আশ্রম-বাসী তপোধনগণকে দর্শন করিয়া মার্গস্থিত এক মনোরম মাঙ্গলিক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন।"

অতঃপর বৈশালী হয়ে উরুবিল্ব নামক গ্রামে তিনি উপনীত হলেন। পূত নৈরঞ্জনানদীর তীরে কিছুদিন অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন করায় দেহ অতি দুর্বল ও কৃশ হয়ে পড়ে। এরকম অনুষ্ঠানে বোধিলাভ হয় না দেখে শরীরকে কিছু আহার-দানে সুস্থ করে "বোধির নিমিত্ত দৃঢ়সংকল্প সেই মুনি কেবলমাত্র স্বীয় প্রতিজ্ঞাকে সাক্ষী করিয়া শাদ্বলাস্তীর্ণ ভূতলবিশিষ্ট এক অশ্বত্থমূলে গমন করেন। অনন্তর ধৈর্য ও শমগুণের দ্বারা 'মার'-বল জয় করিয়া সেই ধ্যানকোবিদ পরমার্থবিজিজ্ঞাসু হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। সর্বপ্রকার ধ্যানবিধিতে সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিলেন। অতঃপর যাহা জ্ঞাতব্য তাহা তিনি সম্যকভাবে অবগত হইয়া জগতের সম্মুখে বুদ্ধরূপে বিরাজ-মান হইলেন। তখন দগ্ধ-ইন্ধন অনলের ন্যায় তাঁহার পরম শান্তি লাভ হইয়াছে। তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। শোনা যায় সাত সপ্তাহ তিনি ঐস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।" —('অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত': অনুবাদ—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

বুদ্ধত্বলাভ করার স্থান সেই বোধিবৃক্ষমূল তিনি জীবিত থাকতে কেমন অবস্থায় ছিল তা জানা যায় না। তবে সম্রাট অশোক তথাগতের অর্হত্বলাভের স্থান সন্ধানপূর্বক অশ্বত্থমূল শিলা-নির্মিত করে সংলগ্নস্থানে এক বিরাট মন্দির স্থাপন করেন। বোধিবৃক্ষের মূলে যে প্রজ্ঞা-লাভ হয়েছিল, ধর্মাশোকের প্রচারগুণে সারা-ভারত, মধ্যএসিয়া ও সিংহলে তার প্রসার হয়। সিংহলে শ্রীবুদ্ধের দন্তমন্দির স্থাপিত আছে। সম্রাট অশোক পুত্র বা প্রচারক মহেন্দ্রের দ্বারা মূল বোধিবৃক্ষের যে একটি নবকিশলয় প্রেরণ করেছিলেন সেটি দু'হাজার বছর ধরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিশাল এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের যে বটগাছ তা ৩০০।৪০০ বছরেই যা বিস্তৃতি লাভ করেছে তাতে সিংহলে বোধিবৃক্ষ দু'হাজার বছরে কি বিশালতা লাভ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তবে তাকে নানাভাবে কর্তন করে মূল কাণ্ডকে যথাযথভাবে রাখার চেষ্টা আছে। বোধগয়ার বোধিবৃক্ষকে গৌড়-বঙ্গাধিপ মহারাজ শশাঙ্ক শাখাপ্রশাখা সহ ছেদন করে তার মূলোচ্ছেদ করেন। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ অনুযায়ী হিন্দুরাজার এই কাহিনী জানা যায়। বৌদ্ধ হিউয়েন সাঙ-এর বিবৃতি কতখানি প্রামাণ্য তা ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসুর বিবেচ্য।

ভগবান শঙ্কর অদ্বৈত বেদান্ত ব্যাখ্যা বদরিকাশ্রমের বদরীবৃক্ষের নিম্নে বসে করেছিলেন কি না জানা যায় না। তবে তাঁর আশ্রম তো ঋষিরই তপোবন। ব্রহ্মবিদ্ মনীষিগণ বৃক্ষমূলে বসে জ্ঞানলাভ করেছেন এবং দানও করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যগুলির মধ্যেও দেখা যায় গ্রাম্য-আলাপ-আলোচনাদি নদীতীরে বা পুষ্করিণীঘাটে মনোরম পরিবেশে বৃক্ষবাটিকায় তরুমূলে বসেই হত।

নবদ্বীপচন্দ্র নদীয়ায় গঙ্গাতীরে বসে বা বর্তমানে 'পোড়ামা-তলা' বলে বিখ্যাত অশ্বত্থমূলে বসে শাস্ত্র আলোচনা করতেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে পাণিহাটীতে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে বৈষ্ণব-সম্মিলন করেছিলেন। শান্তপরিবেশযুক্ত সে স্থান আজও ভক্তমাত্রেরই চিত্ত হরণ করে। হালিসহরে ভক্ত রামপ্রসাদ যেস্থানে সিদ্ধ হলেন, সেও এক পঞ্চবটী। দর্শনমাত্রে অনাবিল শান্তিদান পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা—পরম জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বোধি প্রভৃতি যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক—যুগ যুগ ধরে অব্যাহতভাবে চলেছে। কখন কখন মানবের অজ্ঞানপ্রসূত মোহ তাকে পেয়ে বসে, তাতে সে সাময়িকভাবে নিজস্বরূপ মহিমা বিস্মৃত হয় যখন, তখন মানবপ্রেমিক মহান আত্মা দেহধারণ করে তার চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে আসেন। গৌরবোজ্জ্বল উনিশ শতকের যিনি শ্রেষ্ঠ মহামানব, ভক্তদের নিকট যিনি অবতারবরিষ্ঠ বলে প্রসিদ্ধ, তিনিও পঞ্চবটীতেই তাঁর উপাস্যের সাক্ষাৎ বহু রূপে পান বলে জানা যায়।

'বোধিবৃক্ষ' অতীতেও চৈতন্য-সম্পাদনে সাহায্য করেছে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও করবে, যেমন তথাগতের বোধিবৃক্ষ এখনও মানবপ্রেমিক সেই মহাপুরুষের প্রেম, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি স্মরণ করিয়ে উৎসাহিত করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বোধগয়া গিয়ে ভগবান শ্রীবুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে লিখছেন—"দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনও দুষ্কাতের অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল, নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল—আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপ্তশিখার সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে, যিনি নরোত্তম। ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের।"

দক্ষিণেশ্বরের বোধিদ্রুম শত বৎসরের অধিক হল মানুষের প্রেরণালাভে সাহায্য করে চলেছে। এখনও কত শত বৎসর করবে। পঞ্চবটীতরুতলে দাঁড়িয়ে সে কথা মনে হচ্ছিল। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়ে এক এক করে সকল ঘটনা মনের মধ্যে ভেসে চলেছে। "এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া ঠাকুর অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে এখানে সর্বদা পাদচারণা করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বত্থ, নিম, আমলকী ও বিল্ব—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজঃ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্বগায়ে একখানি কুটীর নির্মাণ করাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুটীর এক্ষণে পাকা হইয়াছে।

পঞ্চবটীমধ্যে সাবেককালের একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বত্থ গাছ। দুইটি মিলিয়া যেন একটি হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সাধিক্যবশতঃ বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানা-পক্ষিসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে। পাদপমূল ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকারবেদী-সুশোভিত। এই বেদীর উত্তর-পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন। আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুলা হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন! আর সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই।"

মনে পড়ল 'কথামৃতে' আছে--শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখে বলছেন—"পঞ্চবটীর ঘরে শোবে? পঞ্চবটীর ঘর বলছি এই জন্য, ওখানে অনেক হরিনাম, ঈশ্বরচিন্তা হয়েছে।" "যখন পঞ্চবটীতে পড়ে পড়ে মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, 'মা, আমায় দেখিয়ে দাও কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে!' আরও কত কি তা বলবো!" প্রকৃতি-সৌন্দর্য-প্রিয় গদাধর যে কুলুকুলুনাদিত গঙ্গাতীরবর্তী বটগাছ ও অন্যান্য তরুরাজি-শোভিত মনোহর ভূমিখণ্ডের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হবেন, একথা বলাই বাহুল্য। বিশাল ভারতের ঋষি-সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম তপস্যা হতে আধুনিকতম তপস্যা যুগে যুগে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার মূর্ত বিগ্রহ অনুকূল স্থান নির্বাচন করার জন্যই যেন পঞ্চবটীতে উপনীত হলেন।

এই সেই পঞ্চবটী, যেখানে তিনি কালীমন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন প্রথম আগমন করেন। অগ্রজের অনুরোধে একমাসকাল দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। হৃদয় মুখোপাধ্যায় বলেন—"ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন।"

"মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটী-শোভিত উদ্যান, সুবিশাল দেবালয়ে ভক্তি মানসাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, ধার্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার করিয়া তুলিল এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও সানন্দচিত্তে বাস করিয়া মনের পূর্বোক্ত কিংকর্তব্যভাব দূরপরিহার করিতে সমর্থ হইলেন।"

পূতসলিলা জাহ্নবীতীরে ছায়াসমন্বিত পঞ্চবটী—স্মরণাতীত কালের পবিত্র আশ্রমকাননের স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। বালক গদাধর ঋষিকুমারের মতো পঞ্চবটীস্থিত সকল বৃক্ষলতাগুল্মের মধ্যে কী অজানা আকর্ষণে আপন মনে বিচরণ করেন! কালীমন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় গদাধরের বয়স উনিশ-কুড়ি বৎসর। তৎকালের তাঁর সঙ্গী হৃদয় মুখোপাধ্যায় বলেন—ঠাকুর যে তাকে বিশেষ ভালবাসেন একথা সে বেশ বুঝত, কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝতে পারত না; মধ্যাহ্নে আহারাদির পর ও সায়াহ্নে সন্ধ্যারতির সময় গদাধর কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হতেন, অনেক খুঁজেও সে তাঁর সন্ধান পেত না। দু-এক ঘণ্টা পর তিনি ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—এখানেই ছিলাম। কোন দিন তাঁর সন্ধান করতে করতে তাঁকে পঞ্চবটীর দিক হতে ফিরতে দেখে ভাবত তিনি শৌচাদি করতে গিয়েছিলেন সম্ভবতঃ। পঞ্চবটীতলই যে তাঁর সবসময়ের বিচরণস্থান, ক্রীড়াস্থান এবং

ধ্যান ও উপাসনার স্থান, তা সহজেই অনুমেয়। মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে লোকচক্ষুর অগোচরে জগজ্জননীর উপাসনায় পঞ্চবটীতে ধ্যানস্থ হতেন। মথুরবাবু পঞ্চবটীর নিকট একদিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে দেখেন গদাধর স্বহস্তগঠিত সুন্দর এক দেবভাবসমন্বিত শিবমূর্তির পূজায় তন্ময় হয়ে আছেন। অনুসন্ধানে জানলেন মূর্তিশিল্পে পারদর্শী গদাধর গঙ্গাগর্ভ থেকে মাটি সংগ্রহ করে বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সাহত এই সুন্দর মূর্তি গড়েছেন। সেকাজ যে তিনি তাঁর অতিপ্রিয় পঞ্চবটীতলেই করেছিলেন, তা অনুমান করা যায়। (ক্রমশঃ)

নিবেদন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এনেছ আমায় তুমি তোমার প্রেমের বৃন্দাবনে,
দিয়েছ মন্ত্র তোমার সান্দ্র বাঁশির উচ্ছলনে।
এ-ব্রজের আলোকলোকে
জেগেছে কান্ত কত স্বপ্ন এ-অশান্ত চোখে!—
দুরাশার সেই পুলকে ঠাঁই পেয়েছে প্রাণ চরণে॥

যখনি অশ্রুমেঘে চন্দ্র তারা মিলিয়ে গেছে,
বাদলের মায়ায় ছায়ার ছল দূতেরা দল বেঁধেছে,
সে-ব্যথার দুর্লগনে
নিরাশার কাঁটাবনে
ফুটেছে ফুল অরূপের রূপমৃণালে ক্ষণে ক্ষণে :
দেখেছি অভয় তোমার মূর্তি হৃদয়-সিংহাসনে॥

যখনি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নাথ কালো নিশা,
দিয়েছে তোমার ভালোবাসাই পথে আলোর দিশা।
তাই সুর এ-প্রার্থনার
বিদলি' বেসুর আঁধার
উঠেছে ঝঙ্কারি' আজ অনিন্দিতের আবাহনে :
তোমাকে চাই এ-তনুর প্রতি অণুর নিবেদনে॥

দক্ষিণের দাক্ষিণ্য

অধ্যাপক অমিয় দত্ত

কলকাতার অসহ্য গরমের হাত এড়ানোর জন্যেই যেন শেষ পর্যন্ত আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তিন জনের দল আমাদের, সকলেই পুরুষ। ৬ই জুন রাত্রি দশটা নাগাদ হাওড়া-মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। রাত্রের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটতে লাগলো। অন্ধকারের বুকে পরিচিত স্টেশনগুলোর আলোর চমকানি মনে একটা তুলনা এনে দিচ্ছিল : যেন ঘনকালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। পরিচিত জায়গার ওপর দিয়ে যাচ্ছি বলে কৌতূহলটা এখন তেমন উগ্র নয়। ঘুমিয়ে পড়লাম কিছুক্ষণের মধ্যেই।···

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ধড়-মড় করে উঠে বসলাম। মাথার কাছের অল্প পাওয়ারের নীল রঙের বাল্‌বটা যেন অনেকটা ম্রিয়মাণ। গাড়ীর ভেতরের সব কিছুই অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক বেলা হয়ে গেছে মনে করে আক্ষেপের সঙ্গে বার্থ (berth) থেকে নিচে নেমে এলাম তাড়াতাড়ি। জানালার ধারের সিটে বসে প্রথমেই ঘড়ি দেখলাম। ও হরি! এইমাত্র পাঁচটা বেজেছে!! অথচ কী আলো! কত আলো!! অবাক-বিস্ময়ে জানালার মধ্য দিয়ে মাঠে প্রান্তরে আমার মুগ্ধ দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিলাম। একের পর এক ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। মাঠ-গাছপালা ঘরের ছবি ছোট ছোট পাহাড়ের ছবি—ঢেউ-খেলানো রঙীন ভাসন্ত মেঘ-বুকে নীল আকাশের ছবি। বিশেষ করে পূব আকাশ তখন খুশির আলোর রক্তিম উচ্ছ্বাসে টলমল। প্রভাতের গায়ে-মাথায়-বুকে সে আবির-আলোর গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণে গাড়ীর গতি, হু-হু করে জানালা দিয়ে মিষ্টি বাতাস এসে আছড়ে পড়ছে! ভারী ভালো লাগছিল। সময় হিসেব করে বুঝলাম এখন আমরা উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে ছুটছি। ঠিক এই সময়েই কানের ভেতর দিয়ে প্রাণের তারে ঘা দিল "আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে"—রবীন্দ্র-সংগীতের দু'টো কলি। আহা রে! সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে কে গাইছে এই প্রকৃতির গান—আলোর গান—মুক্তির গান! সুরের অনুসরণ করে দেখলাম কিছু দূরে জানালার ধারেরই একটা আসনে বসে বাইরে-হারিয়ে-যাওয়া ভাসা-ভাসা দৃষ্টির একটা ছেলে গান ধরেছে। তারপর আলাপ জমতে দেরী হ'ল না। বয়স ওর কুড়ি-একুশ। পড়ছে ইঞ্জিনিয়ারিং। যাচ্ছে একটা ট্রেনিংয়ে। আপাততঃ যাবে মাদ্রাজ। সুতরাং হ'য়ে পড়ল আমাদের সঙ্গী। অন্য বন্ধু দুজনের ঘুমও এতক্ষণে ভেঙেছে। আমরা চারজনের একটা 'ফুল টীম' হ'য়ে গেলাম।

উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে ছুটছে গাড়ী। প্রাকৃতিক দৃশ্যের গঠনে অনেকটা বাংলার ছাপ। তবে উড়িষ্যার প্রকৃতিতে স্বাতন্ত্র্য এনেছে ছোট-খাট পাহাড়গুলো। পাথুরে পাহাড়, তাই বেশীর ভাগই ন্যাড়া! কাছে-দূরের পাহাড়গুলোর সঙ্গে আলো-ছায়ার খেলা চলছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বর্ণ-বৈচিত্র্যের। দিগন্তরেখায় বক্রতা-সৃষ্টিকারী দূরের এক-একটা পাহাড় তাই কখনো ধূসর, কখনো ঘনকৃষ্ণ, কখনো বা নীলাভ।

ভুবনেশ্বর পেরিয়ে আমরা খুরদা রোড জংশনও ছাড়িয়ে এলাম। খুরদা রোড থেকেই

পুরীর লাইন আলাদা হয়ে গেছে। পুরী নীল সমুদ্রের দেশ—জগন্নাথদেবের লীলাক্ষেত্র। আমাদের গাড়ী ভিন্ন লাইন ধরলো। বাঁদিকে পড়ে রইলো পুরীর পথ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়ছে বেশ। সকালের মধুর আবহাওয়া কর্পূরের মত উবে গেছে। উত্তপ্ত ঝাঁঝালো বাতাস। গাড়ীর কামরায় ব্লাস্ট ফার্নেসের আভাস। এ গরম কলকাতার ভ্যাপ্‌সা পচা ঘাম বার করা গরম নয়। এ গরম জ্বালাময়। পাখার হাওয়া তো দূরের কথা, মুক্ত প্রকৃতির বাতাস পর্যন্ত গা জ্বালায়। গাড়ীর ভেতর বসে আমাদের মনে হচ্ছিল আমরা ঝলসে যাচ্ছি। এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা। কলকাতার গরমের হাত থেকে নিস্তার পেতে গিয়ে আরো ভয়ঙ্কর গরমের পাল্লায় পড়তে হ'লো বলে ভাগ্যকে দোষারোপ করলাম। এক বন্ধু রসিকতা করে বললো—'ভাইরে, চোরের হাত এড়াতে গিয়ে পড়ে গেলাম কিনা ডাকাতের হাতে?' এরই মধ্যে গাড়ী থামছিল কোন কোন স্টেশনে। 'চা-গরমের' উদাত্ত আমন্ত্রণ কানে বাজছিল আমাদের। অনেকেই সাড়া দিচ্ছিল এই আমন্ত্রণে। আমার বন্ধু দুজনও দিল। আমি বললাম—'করছিস কিরে? এই গরমে—'। আমায় থামিয়ে দিয়ে তারা যুগপৎ বললো—'এ বিষে বিষে বিষক্ষয়।' কিন্তু সহ্য হ'লনা তাদের। মুখে দিয়েই থু-থু করে উঠলো। বিস্বাদ, ধোঁয়া গন্ধ এবং একেবারে বাজে! জানতাম এটা হবে। কারণ কয়েক বছর আগে পুরী থাকার সময় আমারও এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখনই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, উড়িষ্যার সব কিছু ভালো হলেও চা কিন্তু নয়। আর এই গরম!

উষ্ণতার দাপটে সুস্থির থাকতে পারছিলাম না বলে আমরা চারজনে তাস খেলতে বসে গেলাম। দু-একদান খেলা হয়েছে,—এমন সময়েই ঘটল অভাবিত কাণ্ডটা। হঠাৎ কোথা থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো আমাদের গায়ে-মাথায়-ক্লান্তির ওপরে। আহা! আহা! একই সঙ্গে চমকে উঠলাম সকলে। তাসগুলো ফর্‌ফর্ করে উড়তে লাগলো, যেন তাদেরও আনন্দ! কিন্তু কি আশ্চর্য! বাইরে যে এখনো ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর! তাহ'লে বাতাস এমন ঠাণ্ডা ও মধুর কেন? একই সঙ্গে চারজনে ছুটে গেলাম। টেনে খুলে দিলাম সম্পূর্ণ দরজাটা। ঝলকে ঝলকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঠাণ্ডা বাতাস। আমাদের সমস্ত ক্লান্তি গুঁড়ো হ'য়ে হ'য়ে ঝরে পড়তে লাগলো। কিন্তু আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তন কেন? গাড়ীর কণ্ডাকটার বললেন,—'আমরা এখন সমুদ্রের কাছ দিয়ে যাচ্ছি।' কিছুক্ষণ বাদে আমি চীৎকার করে উঠলাম,—'সমুদ্র। সমুদ্র।' কারণ নীল জলের রেখা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু না, ও সমুদ্র নয়—চিল্কা। ভুল ভাঙিয়ে দিলেন এক সহযাত্রী। চিল্কা আগে দেখিনি। এখন দেখলাম। ছোট ছোট পাহাড়গুলোকে বেড় দিয়ে নীলজল ছল্‌ছল্ করছে। সমুদ্রের উদ্দামতা তার নেই। কিন্তু কেমন যেন একপ্রকারের পরিপূর্ণতা আছে। তাই ঢলঢল লাবণ্য নিয়েও স্থির। আলতো ভাবে চিল্কাহ্রদ পাহাড় ও মাটিকে ছুঁয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। অনেকক্ষণ ধরে বাঁদিকে চিল্কাকে রেখে আমাদের গাড়ী ছুটেছিল। আর ঐ চিল্কারই বুক-ছুঁয়ে-আসা স্নিগ্ধ হাওয়া অনেকক্ষণ ধরে আমাদের তাপ-দগ্ধ দেহে-মনে তার মোলায়েম আঙুলের সাহায্যে যেন শান্তি-সুখের বিলি কেটে দিয়েছিল।

দিনের আলো নিবে যাবার আগেই আমরা অন্ধ্রে প্রবেশ করেছিলাম। অন্ধ্রের ভাষা

তেলেগু। উড়িষ্যার প্রতিবেশী রাজ্য অন্ধ্র। অথচ প্রকৃতিতে ওড়িয়ার সঙ্গে তেলেগুর দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু আকৃতি? আকৃতিতে ওড়িয়া ভাষা তেলেগু ভাষার লিপি বা হরফের রূপ পেয়েছে। শুধু তেলেগুই বা কেন? সমস্ত দক্ষিণী ভাষালিপির আদল সম্ভবতঃ ওড়িয়া হরফের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অন্ততঃ অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও মহীশূরে বেড়িয়ে আমাদের তাই মনে হ'য়েছে। এই আকৃতিগত মিলের জন্যেই আমরা কখন যে উড়িষ্যা পেরিয়ে অন্ধ্রের মাটি ছুঁয়েছিলাম তা স্টেশনের নামচিহ্নিত বোর্ডগুলো দেখেও বুঝতে পারিনি। অন্ধ্রের দু-চারটে স্টেশন ছাড়িয়ে যাবার পর কণ্ডাকটারের কাছ থেকেই জানতে পারলাম যে, এখন আমরা অন্ধ্রের বুকে।

গাড়ী ছুটছে। দুদিকে ধু-ধু ফাঁকা মাঠ। একেবারে ফাঁকা বলা ভুল, কারণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে একপায়ে দাঁড়িয়ে মাথা-ছেঁটে-নেওয়া তালের গাছ। পড়ন্ত রোদের আলো তাদের মাথায় সোনার রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। দূরের কোন কোন মাঠও শেষ আলোর অকৃপণ দান বুকে ধরেছে। সেখানেও সোনালী আভা। জনবসতি প্রায় চোখে পড়ছে না। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, এসব মাঠে ধান চাষ হয়। পরে বুঝতে পেরেছি, ধানচালের ক্ষেত্রে এই জন্যেই অন্ধ্র একটি উদ্বৃত্ত-প্রদেশ। এই মাঠ আর তালগাছ, তালগাছ আর মাঠ দেখতে দেখতে সন্ধ্যে এসে হাজির হোল। সব রঙ নিভে গেল। সন্ধ্যে তার ঝাঁপি খুলে অন্ধকারের কালো কাপড়খানা রাত্রিকে উপহার দিয়ে বিদায় নিল। আবছা অন্ধকারে দূরের কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, বাতাস লেগে তালগাছের পাতাগুলো দুলছে; নাকি গাড়ির ঝক্‌ঝক্ আওয়াজের তালে তাল মিলিয়ে মাথা নাড়ছে?

সমস্ত রাত অন্ধ্রের মাটি-ছুঁয়ে-থাকা রেল-লাইনের ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটেছে। পরদিন সকালবেলা আগের দিনের মতই কৌতুহল নিয়ে ছুটে গেছি জানালার ধারে। সেই একই ছবি—মাঠ আর তালগাছের। উঃ! বিস্ময়ের আর অন্ত মিলছিল না,—এত তালগাছ আছে অন্ধ্রে! অন্য গাছ আর তেমন চোখে পড়ছে না। বাংলাদেশের মত অন্ধ্রের মাটি বোধ হয় তেমন উদার-প্রকৃতির নয়, কারণ বাংলাদেশের মাটির বুক জুড়ে হাজারো গাছের মেলা। অথচ অন্ধ্রে গাছ বলতে তো কেবল দেখছি এই তাল। লাইনের ধারে, মাঠের মধ্যে, স্টেশন এলাকার আশে-পাশে যত মাটির ঘরবাড়ী দেখলাম তাদের সবগুলো প্রায় তালপাতায় ছাওয়া। বাংলাদেশের খড়ের ছাউনীওলা ঘরের শিল্পশ্রী কিন্তু এসব ঘরে নেই।

সকাল থেকে মেঘ-মেঘ-ভাব। গতকালের থেকে গরমের জ্বালা তাই কিছু কম। উড়িষ্যা ছাড়ার পর থেকেই চা বিদায় নিয়েছে। তার জায়গায় এসেছে কফি। দক্ষিণ-ভারতের বৈশিষ্ট্য এটা। দক্ষিণীরা কফিপ্রিয়,—আমাদের মত চা-চাতক নয়।

দুপুরের দিকে আমরা অন্ধ্র ছাড়িয়ে মাদ্রাজ ছুঁলাম। তার আগে অন্ধ্র প্রদেশের দুটো বড় শহর-স্টেশন ছাড়িয়ে এসেছি—একটা ওয়ালটেয়ার, অন্যটি বিজয়ওয়াদা। শেষের শহরটি অনেক আধুনিক কেতা-দুরস্ত বলে মনে হয়েছে। বিজয়ওয়াদা অন্ধ্রের বড় একটি শহর এবং শিল্পাঞ্চলও বটে। পাহাড় আছে—নদী আছে। দূর থেকে চোখের দেখায় নয়নাভিরাম বলেই মনে হয়েছে বিজয়-

ওয়াদাকে। ওয়ালটেয়ার সেই তুলনায় পুরনো ও মলিন।

এখন আমরা মাদ্রাজের মধ্যে। অন্ধ্রের সঙ্গে এর যে নিকট সম্পর্ক তা এর প্রকৃতিই সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই একই ধরনের মাঠ আর তালগাছ। তবে আরো যত এগোতে লাগলাম ততই দেখতে পেলাম তালের সঙ্গে নারকেলগাছেরও ছড়াছড়ি। কলা এবং কাজু-বাদামের বনও দু-চারটে চোখে পড়লো।

সন্ধ্যের পর রাত্রি সাড়ে-সাতটা নাগাদ আমাদের গাড়ী আলোঝলমল মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে এসে পৌছালো। রাত্রের আলো-ছায়ার মধ্যে মাদ্রাজ শহরের সঙ্গে আমাদের শুভদৃষ্টি ঘটলো। একটা হোটেলে 'চারমূর্তি' গিয়ে উঠলাম। সেখানে শুধু থাকতে পারা যায়, খাবার ব্যবস্থা কিছু নেই। মাদ্রাজে এই ধরনের হোটেলের সংখ্যা অনেক। তাছাড়া যেসব সরাইখানায় খাবার পাওয়া যায়, তাদের সবগুলোই প্রায় নিরামিষ-ভোজনালয়। তাই আমরা পেটুক বাঙালী চারজন খুঁজে-পেতে স্টেশনের কাছাকাছি 'হোটেল বুহারিয়া'তে সামুদ্রিক মৎস্য-সহযোগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলাম। তারপর রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে মাদ্রাজ শহর ঘুরে বেড়ালাম। আলোকময় পরিচ্ছন্ন মাদ্রাজ শহরকে মায়াপুরী বলে মনে হলো।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে সকলেরই একটু দেরী হলো। বেলা আটটায় আমরা সবাই তৈরী হয়ে সরকারী বাসে চেপে ঐতিহাসিক স্থান মহাবলীপুরমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মাদ্রাজ শহর থেকে মহাবলীপুরমের দূরত্ব দক্ষিণ-পূর্বে মাইল চল্লিশেক হবে। বাস ছুটছে। গতি দ্রুত। প্রশস্ত রাস্তা। মাদ্রাজ শহরের ঘরবাড়ী দোকান বাজার পিছনে পড়ে যাচ্ছে। যতই দেখছি ভাল লাগছে মাদ্রাজকে। কেমন পরিচ্ছন্ন! কলকাতার মত ঘিঞ্জি নয়। বাস জনতার ভীড়ে পিষ্ট ও ক্লিষ্ট নয়। আসনসংখ্যা অনুপাতে আরোহী তোলে। না, এর জন্যে অসুবিধেয় পড়তে হয় না মাদ্রাজবাসীকে। কারণ? বাসের প্রাচুর্য নয়, কলকাতার মত অগণিত আরোহী-জনতার অভাব। কলকাতার তুলনায় মাদ্রাজ শহরের জনসংখ্যা অনেক কম। সেইজন্যে পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা এখনো বজায় রেখে চলতে পারছে শহরটি।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

[অনুবাদ : পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ঃ—লোকে দ্বিবিধ আখ্যাত—
সত্তঃ কাম্য আর যাহা পরম কল্যাণ ;
ক্ষণেতে বিরল প্রেয়ঃ—দুঃখের কারণ—
তারি তরে মূঢ়জন সতত চেষ্টিত।
আত্যন্তিক প্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ ব্রহ্মই বস্তুতঃ—
চরম, নিরতিশয় সুখের নিদান ;
সেবে তায় তত্ত্বজ্ঞানী—কঠোপনিষদে
ষষ্ঠবল্লী মাঝে আছে ইহাই বর্ণিত ॥ ১১

'আত্মা মহাসিন্ধু. তার তরঙ্গ অহং'
ভাবে জ্ঞানী পথে যেতে, বসিয়া আসনে,
'সংবিদের সূত্রে গাঁথা মণি হেন আমি'
বিষয়ের অনুভবে ভাসে তাঁর মনে,
'আত্মার দর্শনে হৃষ্ট আমি' বোধ তাঁর,
'মগন হইনু চিৎসাগরে' শয়নে,
দেহী মাঝে তিনি অন্তর্নিষ্ঠ মুক্তিকামী
আয়ু যাঁর কাটে হেন ভাব-মগ্ন মনে ॥ ১২

নাম-রূপে বিশেষিত নিখিল জগৎ—
বিরাটের ব্যষ্টিরূপ বলিয়া প্রচার।
অন্তঃস্থিত মুখ্যপ্রাণবলে উহা চলে,
সকল পদার্থ হয় গোচর তাঁহার।
কর্তা নহে, ভোক্তা নহে, সর্ব-প্রকাশক
রবি-সম, জ্ঞান আর বিজ্ঞানে ভাস্বর।
প্রত্যক্ষতঃ যে পুরুষ ইহা জানে সদা,
বিশ্বে পরমাত্মা হেন তাঁর ব্যবহার ১৩

নির্বেদজ আর জ্ঞানগর্ভ—বলা হয়
বৈরাগ্য দ্বিবিধ—ইহা জানিবে প্রথম,
গৃহ-বন্ধু-পুত্র-ধন-স্পৃহা দুঃখময়
হেরি হয় চিত্তে তাঁর ইহার জনম।

এ সব বিষয়ে জ্ঞান হ'লে উপদেশে,
অন্যটি উদ্গীর্ণ অন্নে ঘৃণার সমান।
সংযমীর ত্যাগও দুটি—দেহে অভিমান-
ত্যাগ আর গৃহ হ'তে সুদূরে প্রয়াণ ॥ ১৪

সেবে সবে ত্রিজগতে, নহে দুঃখ তরে
সুখ লাগি করে চেষ্টা ইহ নিরন্তর,
দেহে তাই আমি-জ্ঞান, বিষয়-সমূহে
আর জন্মে মম-বোধ—দুই দুঃখকর।
জেনেও তা' দেহে সদা আত্মজ্ঞানবশে
রোগে বা আঘাতে হয় বেদনা-কাতর,
শত্রুনাশে জয়, ভার্যা-পুত্র-অর্থ-নাশে
পরম বিপদ গণে তাহার অন্তর ॥ ১৫

উৎসুক অতিথি সম রহি নিজধামে
যাত্রা তরে সর্ববিধ মমতা পাশরি,
গৃহস্বামী মহাকাশে জলদের প্রায়
দেহগত সুখ-দুঃখ গণ্য নাহি করে,
আসিবার যাহা, তাহা আসিবে, যাইবে
চলি যাহা যাইবার বিষয়সকল—
এই দৃঢ় প্রত্যয়-আশ্রয়ে নিরুদ্যম
রন তিনি দেহাদিরে জানিয়া চঞ্চল ॥ ১৬

সর্প যথা বাহিরে খোলস ছাড়ি ফেলে,
দৃঢ়মনে গৃহ ত্যজি প্রব্রজিত জন
নিবাস ছাড়িয়া যথা পথিক আশ্রয়ে
পথিপার্শ্বে তরুছায়া দেহ-পরিমাণ,
ক্ষুন্নিবৃত্তি মাত্র চায় বৃক্ষচ্যুত ফল,
ভৈক্ষ্যোচিত সব তথা করে উপার্জন,
স্বাত্মারাম তত্ত্বে সুখভরে নিমজ্জিতে
অনায়াসে নিজকায় করে বিসর্জন ॥ ১৭

প্রথমে কামনা জন্মে বুদ্ধির আধারে,
পরে মন লক্ষ্য করে বিবিধ বিষয়,
ইন্দ্রিয়ের মুখে করে সকল গ্রহণ,
না পাইলে তায় ক্রোধ হৃদে উপজয়,
কাম্যবস্তু লাভ হলে রক্ষণ-লালসা
লোভরূপ ধরে —এই ত্রি-বৃত্তি আকার
পতনের হেতু সবাকার ; বুদ্ধিমান
অধ্যাত্ম-বিচারে তিনি করে পরিহার ॥ ১৮

ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিবশে মানবার্থে দান,
ক্ষমা হয় চিরদিন অক্রোধ কথিত,
আস্তিকতা শাস্ত্র আর শ্রদ্ধা ঈশপদে,
এক ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ; চারি বিপরীত
বন্ধনের সেতু। দান আদি এ উপায়-
চতুষ্টয়ে তরে জীব সংসার-সাগর,
শ্রেয় ও অমৃত লভে, স্বর্গে গতি হয়,
জ্যোতির্ময় ব্রহ্মে হয় স্থিতি নিরন্তর ॥ ১৯

দেবতা অতিথিগণে করে অন্নদান—
অমৃত তাহাই, ব্যর্থ অন্ন অন্যথায়,
নিজ তরে করিলে প্রস্তুত -সংসারেতে
প্রসিদ্ধ একথা—উহা মৃত্যুরূপ হয়,
শরীরীর নিজ ভোগে অন্নের প্রয়োগ,
পাপমাত্র তাহে জীব করে উপার্জন ;
বিধিমত পঞ্চপ্রাণে আহুতি বিহনে
ভোজন যে করে সেও মৃতের সমান ॥ ২০

ভোজ বলি লোকে সেই খ্যাত, বুভুক্ষিত
প্রার্থী জনে গৃহাগতে যেবা অন্ন দেয়,
লৌকিক বৈদিক যজ্ঞে পূর্ণ অন্ন পায়,
সে মানব এ সংসারে বৈরিহীন হয়।
অন্নাকাঙ্ক্ষী মিত্র পরিজনে নাহি দেয়
সতত সেবকে, তারে সখা নাহি কয়।
কদর্য সে জন হতে মুখ ফিরাইয়া
নিরন্তর অন্ন তার দূরেতে পলায় ॥ ২১

সর্বজীবে হের ব্রহ্ম, স্তম্ব হতে ব্রহ্মাবধি—
শ্রুতি-বাক্যে সিংহনাদে ইহাই ঘোষিত—
আত্মার অজ্ঞানে হয় জগৎ উদয়,
আত্মজ্ঞানে জগতের লয় সুবিদিত।

অজ্ঞানে আরোপ পরস্পরে—রৌপ্যে শুক্তি,
শুক্তিতে রজতজ্ঞান সদা প্রতিভাসে,
ভ্রমে লীন বিশ্বে ব্রহ্ম, জগৎ বিলীন
ব্রহ্মে তথা—একে অন্য বস্তুর অধ্যাসে ॥২২

আকাশ-কুসুম-প্রায় অসৎ অলীক
আদিতে না ছিল, ছিল ব্রহ্মভিন্ন সৎ ?
ছিল বা এ-দুই হতে পৃথক্ বা কিছু ?
ব্যবহার-গত নাহি ছিল এ জগৎ।
পরে দেখা দিল যথা শুক্তিতে রজত ;
বিরাট বা ব্যোম তার পূর্বে নাহি ছিল।
শুদ্ধ ব্রহ্মে সম্ভবে কি কোন আবরণ ?
পৃথ্বী ছায় কভু মায়াসৃষ্ট কি সলিল ? ২৩

জন্ম-মৃত্যু-রূপ যদি বন্ধন না ছিল,
মোক্ষই বা সেইকালে সম্ভবে কেমনে ?
রাত্রি আর দিবা নাহি ভাস্করে পরশে,
মর্ত্য জীব দুই হেরে দূষিত নয়নে।
প্রাণ-বিরহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম এক ছিল,
তারি মায়াবশে কর্তৃ-নামে দেখা দিল,
তাহা ছাড়া অন্য কিছু নাহি ছিল আর,
অনাদি মায়ায় জীব আকার ধরিল ॥ ২৪

আদিতে বাস্তব ছিল তমঃ বা অজ্ঞান
ভাবরূপে—তাহে গূঢ়, তাই লক্ষ্যাতীত,
নামরূপে পরিচ্ছিন্ন জগতের মূল—
নীর যথা থাকে ক্ষীরে নহে প্রকাশিত।
সৃজনেচ্ছু বিধাতার সঙ্কল্প হইতে,
অনাদি কর্মের স্রোতে জগতে নিহিত
পূর্ব হ'তে অনুস্যূত সক্রিয় সতত,
মনোরূপ বীজ হ'তে হইল প্রতীত ॥ ২৫

এহেন মায়ার হয় বৈশিষ্ট্য চারিটি—
ইহা হয় তরুণ ও সদাই নূতন
অঘটন-ঘটনায় অতি সুচতুর,
ইহার দক্ষতা তাই হয় অনুপম,
আরম্ভে মসৃণ সূক্ষ্ম—শ্রুতিমাত্র লভ্য
আত্মজ্ঞান করে ইহা পরে আচ্ছাদন,
প্রকাশিছে ঈশ্বর ও জীব নিরন্তর—
এই তত্ত্ব—এক বৃক্ষে দুই বিহঙ্গম ॥ ২৬

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

গত ২১শে অক্টোবর রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের গত একবৎসরব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে একটি জনসভা আহূত হয়। সভার কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের ব্যবহৃত দ্রব্য ও তাঁহার জীবন ও আদর্শবিষয়ক চিত্রাদিসমন্বিত একটি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন এবং স্বামী অভেদানন্দজীর একটি আ-বক্ষ মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

সভাপতি মহারাজের ভাষণের পর সভার প্রধান অতিথি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার, ডক্টর হীরালাল চোপরা ও ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী স্বামী অভেদানন্দজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার ভাষণে বলেন, 'স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে উন্নত করিয়াছেন, বিরোধী দলের বাধা সত্ত্বেও দৃঢ়হস্তে সে বাধা সরাইয়া পাশ্চাত্যে আমাদের দেশের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পাশ্চাত্যের বহু ব্যক্তিকে ভারত সম্বন্ধে প্রচারিত বিকৃত ধারণার কবল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া সর্ব-ধর্ম-বিশ্বাসের অবলম্বন-ভূমি বেদান্তের কথা তিনি অতি সহজবোধ্য করিয়া প্রচার করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ-সমাজে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বিজ্ঞান ও যুক্তির সহিত বেদান্তোক্ত সত্যের কোন বিরোধ নাই এবং বেদান্তের আলোচনা মানুষকে নৈতিক শক্তিলাভে ও মার্জিত সমাজব্যবস্থা-সম্পাদনে প্রভূত প্রেরণাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষার উন্নয়নের এবং সমাজব্যবস্থায় মানুষের সমানাধিকারের জন্যও তাঁহার আগ্রহ ছিল প্রচুর।

'আজ সারা জগতে, বিশেষ করিয়া ভারতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। তাঁহার সংবৎসরব্যাপী শতবার্ষিকী-উৎসব-অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবালোকবর্তিকাধারী স্বামী অভেদানন্দজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি-অর্পণ উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন ভাবে মূলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণেরই উদার ভাবরাজি প্রচারিত হইয়াছে; তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীর মাধ্যমে ভারতের অন্তর্গত বিভিন্নধর্মাবলম্বী জনগণ ধর্মমত-উদ্ভূত বিভেদ ভুলিয়া জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে পারিবেন। সকলেই ভগবদ্ভক্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তার বলে বলীয়ান হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ ও জনগণের সেবায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবেন।'

মহাজাতি সদনে ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন কর্তৃক গত ২৮শে অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে একটি জনসভা আহূত হয়।

সভার প্রধান অতিথি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর রমা চৌধুরী, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা নিবেদিতার জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সভাপতির ভাষণে বলেন, নিবেদিতা ভারতে দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিয়া যুবকদের স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মোৎসর্গের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অশেষ গুণ ও প্রতিভার অধিকারিণী, আজন্ম শিক্ষানুরাগিণী। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে চর্চার জন্য তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সমাগম হইত তাঁহার গৃহে। স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ত্যাগ ও তপস্যা-ভিত্তিক জীবনকে তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন ভারতের কল্যাণে, এইসব বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে।

ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের সম্মিলিত স্তোত্র ও সঙ্গীতের পর প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার সময় বলেন যে, স্বামীজীর শিক্ষা, আত্মোৎসর্গের আদর্শে দীক্ষিতা নিবেদিতা ছিলেন নবভারতের সংগঠিকা —ভারতের নবজাগরণের সর্বক্ষেত্রে প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন তিনি। ভারতীয় নারীজাতির উন্নতিকল্পে স্বামীজীর ডাকে তিনিই প্রথম সাড়া দিয়াছিলেন। প্রধান অতিথি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতের যথার্থ ইতিহাসকে দেখিতে শিখাইয়াছিলেন এবং স্বদেশের প্রতি দেশবাসীর চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। ভারতের জাতীয় সংহতির মূল সুরটিকে চিনিয়া আচার্য শঙ্কর, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতই নিবেদিতা জাতিকে সুসংহত করিতে সচেষ্ট ছিলেন সেই সুরেরই মাধ্যমে। ডক্টর রমা চৌধুরী বলেন, আমাদের জাতীয় শিক্ষাচিন্তায় নিবেদিতার দান অনবদ্য। নিবেদিতা বলিয়াছেন, শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বত্রপ্রসারী করিতে হইবে; পরা ও অপরা বিদ্যার সমন্বয় ঘটাইতে হইবে; শিক্ষার মাধ্যমে দেহ মন ও আত্মার বিকাশ সমভাবে হওয়া চাই; চিন্তা অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির সমভাবে বিকাশ চাই। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু কিছু নূতন তথ্য সহযোগে আলোচনা করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সহিত ভগিনী নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদ লইয়া সম্প্রতি বহু লেখক উভয়ের মধ্যে যে তিক্ততা বিবৃত করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘভুক্ত থাকিয়া রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া যায় না, শুধু এই কারণেই তিনি বাহ্যতঃ সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সহিত তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতির বা আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক উহাতে কখনও বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় নাই। সভান্তে প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জনসমাগমে পরিপূর্ণ সভাগৃহে সারাক্ষণ একটি পবিত্র শ্রদ্ধার ভাব বিরাজিত ছিল।

সমালোচনা

গাথা— যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : ভারত প্রকাশ ভবন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪্ টাকা। পৃষ্ঠা ২৬৭ + ৭২।

প্রাচীন যুগের ধর্মসাহিত্যের যেসকল বৃহৎ সঙ্কলন রহিয়াছে, আবেস্তার স্থান ইহাদের মধ্যে অন্যতম। Mazdayasna-ধর্মাবলম্বী দেশগুলি ছাড়াও অন্যান্য দেশে আবেস্তা প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের গ্রীক ঐতিহাসিক Hermippus ইরানদেশীয় ধর্ম সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে ইহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে রোমদেশীয় ঐতিহাসিক Pliny[1] (মৃত্যু খৃষ্টীয় ১ম শতক) তাঁহার 'Natural History'-নামক গ্রন্থে Hermippus-এর রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। Pliny বলিয়াছেন যে, Hermippus ইরানদেশীয় গ্রন্থ হইতে তাহাদের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং জরথুস্ত্র-রচিত দুই লক্ষ ধর্মগাথাও যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। আরবদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Masudi (মৃত্যু ৩৪৬ হিজরী) বলিয়াছেন যে, জরথুস্ত্রীয় ধর্মপুস্তকগুলি ১২০০০ গোচর্মে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। পহ্লবী গ্রন্থে যেসকল প্রাচীন ইরানীয় ভাবধারার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আখামেনীয় (Achaemenian) যুগের আবেস্তা ৮১৫টি অধ্যায়ে সমন্বিত এবং ২১টি নস্ক (Nask) বা খণ্ডে বিভক্ত। গ্রীক্ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের (Alexander)-এর আক্রমণই মূলতঃ আবেস্তা ধর্মসাহিত্যের বিনষ্টির কারণ বলা যায়। আবেস্তার অবশিষ্ট অংশ-সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা হইয়াছিল পার্থীয় (Parthian) বা আশ-কানিয়ান্ (Ashkanian) সম্রাট বল্খাশের (Valkhash or Volagases) সমকালে। সাসানীয় (Sassanian) শাসকগণ ছিলেন গোঁড়া জরথুস্ত্রীয়ধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের শাসনকালেই বিশেষতঃ আরতখ্শীর পাপেকান্ (Artaxshir Papekan)-এর রাজত্বকালে (খৃষ্টীয় ২২৬-২৪১) আবেস্তাকে বর্তমানরূপে রূপায়িত করা হয় এবং ইহা প্রাচীন ইরানের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে পুনরায় স্বীকৃত ও গ্রাহ্য হয়। সাসানীয় যুগের আবেস্তাও খৃষ্টীয় ৭ম শতকের আরব আক্রমণের ফলে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আরবগণের ধর্মান্ধতা এবং মুঘলদের আক্রমণে আবেস্তার অবশিষ্ট অংশটুকুও লুপ্ত হইয়া যায়। সাসানীয় যুগে যে ২১টি নস্ক (Nask) পরিচিত ছিল, তাহা মূল আবেস্তারই অংশবিশেষ এবং পরবর্তীকালে ইহাদের মধ্যে কেবল একটিমাত্র নস্ক (Nask) (Vendidad, Nask XIX) আমরা পূর্ণাঙ্গরূপে পাইয়াছি। বর্তমান আবেস্তা নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত, যথা—ইয়াস্না (Yasna), ভিস্পেরেদ্ (Vispered), ইস্ক্ত (Yasht), মাইনর্ টেক্সট্ (Minor Text), ভেন্দিদাদ্ (Vendidad) এবং হাদোখ্ত নস্কের খণ্ডিত অংশাবশেষ (Fragments from Hadoxt Nask) প্রভৃতি। ইয়াস্নার (Yasna) স্তোত্রমালার বিষয়বস্তু হইতেছে পবিত্র ধর্মানুশাসন। ইহা স্তবগান, উপাসনা এবং জরথুস্ত্রের বাণীসমন্বিত গাথায় পরিপূর্ণ। ভাষাতত্ত্বের বিচারে আবেস্তার অন্যান্য অংশ হইতে এই গাথাগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ভিন্নতর উপভাষা লইয়া গঠিত। ইয়াস্না আবার, 'হা' বা 'হাইতি'

1. Plinius—Historia Naturalis.

(Hā or Hāiti) নামে ৭২টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং 'ইজিস্নে' (Izashne) অনুষ্ঠানে (ধর্মীয় অনুষ্ঠান) পুরোহিত-সম্প্রদায় বা 'মোবিদ'গণ (Mobid) এই গাথাগুলি আবৃত্তি করিতেন। ইয়াস্না (Yasna) তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত।

(ক) ১-২৭ অধ্যায়, অহুর মজ্দার প্রার্থনা; পবিত্রবারি জওত্র (Zaodra) বা জওথ্র এর উৎসর্গ; 'বরেস্ম' (Baresma) অর্থাৎ সোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাষ্ঠের গুচ্ছ, পুরোহিতগণ তাঁহাদের ধর্মাচারের অঙ্গরূপে 'হওম' বা সোম (Haoma) পান করিতেন।

(খ) ২৮-৫৬ অধ্যায়—ইহা গাথা বা ছন্দোবদ্ধ রচনা, জরথুস্ত্রের বাণী এবং উপদেশ।

(গ) ৫২ এবং ৫৫-৭২ অধ্যায়—এইগুলি 'অপরো ইয়স্নো' (Aparo Yasno) বা 'উত্তর ইয়স্না' নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে স্তব ও প্রার্থনা লইয়া গঠিত।

গাথাগুলি সংখ্যায় ৫টি এবং এইগুলি ছন্দানুসারে সজ্জিত এবং প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দ লইয়া ইহাদের প্রত্যেকটির নামকরণ হইয়াছে—যেমন, অহুনবইতি (Ahunavaiti), উশ্‌তবইতি (Ushtavaiti), স্পেন্তমইন্যু (Spentamainyu), বোহু ক্ষথ্র (Vohu Xsadra) এবং বহিস্ত-ইশ্‌তি (Vahishta-Ishti)। এইগুলি ১৭টি স্তোত্রে বিভক্ত (ইয়াস্না ২৮-৩৪, ৪৩-৪৬, ৪৭-৫০, ৫১ এবং ৫৩)। ইহাদের মধ্যে ৩৫-৪২ অধ্যায়গুলি ইয়াস্না হপ্‌তঙ্‌ হাইতির (Yasna Haptanhaiti) অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, এই অংশটি গদ্যে রচিত। গাথাগুলিই আবেস্তার মধ্যে কঠিনতম অংশ। আবেস্তার মূল গ্রন্থটির নির্ভুল পাঠোদ্ধার অত্যন্ত কষ্টকর। কেবল বর্তমানেই গাথাগুলির মর্মোদ্ধার পণ্ডিতবর্গের নিকট যে দুঃসাধ্য কার্য তাহা নহে, ১৫০০ বৎসর পূর্বেও ইহা অনুরূপ সমস্যার বিষয় ছিল। সাসানীয় (Sassanian) যুগে যখন আবেস্তার অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী পহ্লবী ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তখনও আবেস্তার গাথাগুলির অনুবাদ সমানভাবে দুঃসাধ্য কার্য ছিল। ভাষা ও চিন্তাধারার দিক দিয়া প্রাচীন ভারতের বৈদিক সাহিত্যের সহিত গাথাগুলির তুলনা করা চলে। উপরন্তু আবেস্তা সাহিত্যের সহিত বৈদিক শব্দ, বাগ্‌ধারা এবং ভাবধারণার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ধর্ম- ও নীতি-শাস্ত্রের তুলনামূলক আলাপ-আলোচনার জন্য পণ্ডিত-সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। উক্ত বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থাদিও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বর্তমান গ্রন্থটি গাথা বা জরথুস্ত্রের ধর্মীয় সঙ্গীত (Divine Songs of Zarathustra) অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

Bartholomae[2], Hertel[3], Meillet[4], Hartez[5], Haug[6], Spiegel[7], Lommel[8],

---

2. Bartholomae, C—Die Gathas und Heiligen Gebete des altiranischen Volkes—Halle—1879.

Zarathushtras Leben und—hehre-Heideiberg, 1924.

3. Hertel, Johanes—Die Zeit Zoroaster, Leipzig, 1925.

4. Meillet, Antoine—Trois Conferenees sur les Gathas de l' Avesta, Paris, 1925.

5. Harlez, Baron C.de—Livre sacre du Zoroastrisme, Paris, 1881.

6. Haug, Martin—Die funf Gathas des Zarathustras, Leipzig, 1858.

7. Spiegel, Friedrich—Avesta die Heiligen Schrieften der Parsen, Leipzig, 1852—63.

8. Lommel, H.—Gathas des Zarathustra, 1934—35.

Darmesteter[9], Mills[10], Kanga[11], Poure-Daud[12], Tarapcrewalla[13], Khabardar[14], প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত জরথুস্ত্রের গাথার একাধিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে পাইয়াছি। ইহা ব্যতীত Paul Horn[15], Roth, Geldner[16], Hubschmann[17], এবং Geiger[18] প্রভৃতি পণ্ডিতগণের রচনায় গাথাগুলির আংশিক অনুবাদও পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানের বিজ্ঞ লেখক অনুভব করিয়াছেন যে, গাথাগুলির ব্যাখ্যার মাধ্যমে জরথুস্ত্রের ভাবধারা-সমন্বিত প্রাচীন ধর্মসাহিত্য সম্পর্কে তিনি তাঁহার নিজস্ব মতামত প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করিতে পারিবেন। গাথাগুলি সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক চেতনামণ্ডিত। সুতরাং এই ধর্মীয় বাণীগুলি অপার্থিব লোকের সামগ্রী, পার্থিব জগতের বস্তু নহে। গাথাগুলিকে নিজস্ব বিষয়বস্তু অনুসারে বিচার করিতে হইবে। ভারতীয়-ইরাণীয় ধর্মসংস্কৃতির অর্থাৎ নিরাকার-উপাসনার বিশেষ প্রতীক এই গাথাগুলি। আবেস্তার তথাকথিত 'দ্বৈতবাদ' একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে ঈশ্বর অহুরমজদা দুইটি আত্মা (spirit) সৃষ্টি করিয়াছেন—সৎ এবং মন্দ আত্মা (good spirit and evil spirit, Spanta-mainyus and Ayro-mainyus)। এই আত্মাদ্বয় সমানশক্তিসম্পন্ন এবং চিরকালই বিরুদ্ধপ্রকৃতির। এই শাশ্বত বিরুদ্ধতাই সকল ক্রমবিকাশের মূল। জরথুস্ত্র এই তথাকথিত 'দ্বৈতবাদের'ই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্তমান অনুবাদ-গ্রন্থখানি পূর্ববর্তী সাহিত্যকর্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রীয় এবং আমার ধারণা যে, তিনি গাথাদর্শনের একটি প্রাঞ্জল ও বিশ্বস্ত চিত্র-উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছেন।

ইতিপূর্বে অবিভক্ত বঙ্গদেশে জরথুস্ত্রের গাথাগুলি বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করে নাই। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কেবল এই দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন তাহা নহে, উপরন্তু তিনি ইহার সহিত সহজ সরল বঙ্গানুবাদ, অন্বয়, ব্যাকরণগত টীকা, শব্দগত টীকা, ব্যাখ্যামূলক পরিশিষ্টও সংযোজন করিয়াছেন। ইহার ফলে গ্রন্থখানি বাংলাদেশের পণ্ডিত-সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-সমাজের নিকটও বোধগম্য হইবে। জরথুস্ত্রীয় ধর্ম-সাহিত্যের গবেষণায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য এবং বাংলার বিদগ্ধ-সমাজে তিনি একটি বিশেষ আসন লাভের যোগ্য। আমাদের বিশ্বাস, গাথাগুলির ইহাই প্রথম বঙ্গানুবাদ। মাননীয় লেখক ভারতের জরথুস্ত্রধর্মাবলম্বী সমাজের নিকট যে অবদান

9. Darmesteter, James—Le Zend Avesta Paris, 1892—93.

10. Mills, H.—The Gathas of Zarathushtra Leipzig, 1900.

11. Kanga, Ervad, K. E.—Gatha ba maeni, Bombay, 1941.

12. Poure-Daud—Gatha Surudhai-Zartusht, Bombay, 1927

13. Taraporewalla, I. J. S.—The Divine Songs of Zarathushtra, Bombay, 1951.

14. Khabardar, A. F.—New Light on the Gathas of holy Zarathushtra, Bombay, 1951.

15. Horn, Paul—Neupersische Etymologie, Heidelberg.

16. Geldne, Karl F.—Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1885—86.

Studien zum Avesta, Strassburg, 1882.

17. Hubschmann, H.—Ein Zoroastrisches Lied, Munchen, 1872.

Persische Studien, Strassburg, 1895.

18. Geiger, Wilhelm—Zarathushtra in den Gatha; Vaterland und zeit alter des Avesta und seiner Kultur

রাখিলেন, তাহার মূল্য অপরিসীম। তাঁহার এই বৃহৎ এবং মহতী প্রচেষ্টা সকলের নিকট নিঃসন্দেহে প্রশংসিত হইবে।

—**ডক্টর চিন্ময় দত্ত**

অণ্ডাল : শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য। আর. মাধবাচারী-লিখিত ভূমিকাসহ। প্রকাশক— মীরাবাণী প্রচারমন্দির, ডি ৩২।৮, এওরবটতলা, বাংগালীটোলা, বেনারস, ইউ. পি.। মূল্য : ২.০০ টাকা।

'মীরাবাঈ', 'মীরাকহানী' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য দক্ষিণ-ভারতের ভক্ত-সাধিকা অণ্ডালের যে জীবনকথা ও ভক্তিবাদ সম্পর্কে পুস্তক (বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ), রচনা করিয়াছেন, বাংলাদেশের তত্ত্ববাদ ও ভক্তিসাহিত্যে তাহার স্থান বিশেষভাবে স্বীকার করিতে হইবে। বাংলাদেশের বাহিরে বাস করিয়া যিনি বাংলাভাষার সেবা করিতেছেন এবং দক্ষিণভারতের ভক্তিসাধনার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তিনি ভক্ত, সাধক ও ঐতিহ্যবাদী পাঠকের নিকট আন্তরিক সাধুবাদ লাভ করিবেন। বস্তুতঃ ভক্তিশাস্ত্রে ও ভক্তিসাধনায় যে তাঁহার নিগূঢ় অধিকার আছে, তাহা তাঁহার পুস্তিকাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। ভক্তির দুইটি দিক—একটি ইহার তত্ত্বের বা দর্শনের দিক—যাহা মূলতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি, আর একটি দিক—উপলব্ধি, অনুধ্যান ও আত্মনিবেদন। লেখক এই দুই পদ্ধতি—দার্শনিক মননধর্ম ও আস্বাদ্যমান ভক্তিরস, অর্থাৎ intellect ও emotion-এর যুগপৎ সমন্বয় দেখাইয়াছেন তাঁহার এই পুস্তিকা 'অণ্ডাল' শীর্ষক ভক্তজীবনীগ্রন্থে। দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের নানা কারণে সাংস্কৃতিক সংযোগ নিবিড় হইতে পারে নাই। পথের বাধা ও দূরত্ব এবং দ্রাবিড়ভাষার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচয়ের জন্য আর্যসংস্কৃতি ও দ্রাবিড়-সংস্কৃতির আত্মীয়তার বন্ধন অদ্যাপি সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। ইহার ফলে শুধু রাজনৈতিক আকাশেই নহে, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষ ক্রমশই দলাদলির হানিকর প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয়, রাজনৈতিক 'দেবতারা' এ কথাটায় ততটা গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন না। কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ভট্টাচার্যের ন্যায় প্রবীণ লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সেই সাংস্কৃতিক মিলনের জন্য গ্রন্থরচনার দ্বারা যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীর নিকট বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইবেন।

এই পুস্তিকায় তামিলনাদের প্রসিদ্ধ ভক্ত-গোষ্ঠী 'আড়য়ার' (ইংরেজী উচ্চারণে Alwar, Arwar, Azhvar—বাংলায় আলোয়ার, আল্বার, আড়বার ইত্যাদি) এবং সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সাধিকা এবং বিখ্যাত কৃষ্ণপ্রেমিকা অণ্ডাল বা গোদার প্রেমভক্তিপূর্ণ জীবন ও সাধনার ব্যাখ্যা- ও বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে সমগ্র তামিলনাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনধারার অতি চমৎকার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মাত্র ১৩৪ পৃষ্ঠার মধ্যে যে এরূপ একটা বিপুল ব্যাপার সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারে, তাহা সহসা বিশ্বাস হয় না। পনেরটি অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য তামিলনাদের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি, আড়য়ারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, অণ্ডালের জীবন ও ইতিহাস, তাঁহার গোপীভাবে শ্রীরঙ্গনাথের (শ্রীকৃষ্ণ) সেবা, তাঁহার দয়িতারূপে সাধনা এবং অণ্ডাল-রচিত 'তিরুপাবৈ' (অর্থাৎ ভক্তিপ্রেমপদাবলী)-সমূহের অনুবাদ প্রচার করিয়া বাংলা দেশের সহিত দক্ষিণ ভারতের,

শ্রীচৈতন্যের রাগানুগা ভক্তিসাধনার সঙ্গে আলোয়ার-সম্প্রদায়ের দয়িতাভাবের সাধনার একটি অবিনশ্বর অবিস্মরণীয় আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি গৌড়বঙ্গে প্রেম-ভক্তিসাধনা নূতন ব্যাপার নহে। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া প্রেম-রসাশ্রিত ভক্তিসাধনার এক নিগূঢ় পরিচয় পাইয়াছিলেন, রায় রামানন্দের সহিত তাঁহার আলাপাদি (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। লেখক সেই সমস্ত ভক্তি-সাহিত্য ও ভক্তিধর্মের নিগূঢ় কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া অণ্ডাল-সুন্দরীর অপার্থিব প্রেমভক্তির নিঃশ্রেয়স্ গূঢ় রহস্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রেমভক্তির বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা, দ্বৈতাবাদী দর্শনের বিকাশ ও বিস্তার, কৃষ্ণকেন্দ্রিক দয়িতসাধনার মূল বৈশিষ্ট্য এবং আড়য়ার-সম্প্রদায়ের সে-বিষয়ে অবদান সম্পর্কে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অমূল্য বলিয়াই মনে হইবে। বিশেষতঃ তিনি অণ্ডাল, মীরাবাঈ ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিসাধনার আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক নিগূঢ়তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, সাধ্যসাধন-ব্যাপারে যাহার দিঙ্‌নির্দেশ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, চৈতন্যদেবের সহিত সম্পৃক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনা এবং আড়য়ার-সম্প্রদায় ও শ্রীমতী গোদা-অণ্ডালের ভক্তিসাধনার মূল পার্থক্যটি আরও একটু গভীরভাবে বিশ্লেষিত হইলে ভাল হইত। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় সখীসাধনা এবং দক্ষিণভারতীয় দয়িত-দয়িতা-সম্পর্কের প্রেম-সাধনা যে একবস্তু নয়, সে বিষয়ে আরও একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা থাকিলে গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। সে যাহা হউক, যাঁহারা প্রেমরতিমূলক ভক্তিসাধনার নিগূঢ় পরিচয় পাইতে চান, দক্ষিণভারতের সহিত পূর্বভারতের মৈত্রীযোগ দেখিতে চান এবং মধ্যযুগের বাংলার ভক্তিসাধনার সহিত অণ্ডালের ভক্তিসাধনার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত বোমকেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'অণ্ডাল'-শীর্ষক পুস্তিকা একটি অমূল্য উৎস বলিয়া মনে হইবে।

—ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে যথাযোগ্য ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগন্মাতা শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর অর্চনা বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে (৯ই অক্টোবর সপ্তমী হইতে ১২ই অক্টোবর দশমী পর্যন্ত) চারদিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৯ই ও ১০ই অক্টোবর সপ্তমী ও অষ্টমী পূজার দুই দিন আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ থাকায় এবং প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় পূজা ও প্রতিমা দর্শনের জন্য ভক্তসমাগম কম হইয়াছিল। নবমীর দিন দুর্যোগ কাটিয়া যাওয়ায় বহু ভক্ত মঠে আসেন ও জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গা-দেবীর উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। বর্তমান পরিস্থিতিজনিত খাদ্যাভাবের জন্য এবার অন্নপ্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রসমূহে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বালিয়াটী, বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর. রহড়া, শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট, শেলা, (চেরাপুঞ্জী, খাসি হিল)।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২৯শে অক্টোবর. ১৯৬৭, অপরাহ্নে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভা-পতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যবিবরণী পাঠ ও সভার অন্যান্য অনুষ্ঠানান্তে শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের ভাষণের পর সভা শেষ হয়। স্বামী ওঙ্কারানন্দজী প্রতিদিনের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া জীবনকে আধ্যাত্মিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার উপর বিশেষভাবে জোর দেন—এরূপ জীবনই মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের সহায়ক হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতিতে বলা হয়, কিছুদিন হইতে দেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফল সারা ভারতকেই স্পর্শ করিয়াছে; রামকৃষ্ণ মিশনও ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট থাকিতে পারে নাই। কাজেই রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালকমণ্ডলীকে মিশনের কর্মক্ষেত্রের নূতন বিস্তৃতিবিষয়ে খুব সাবধানে অগ্রসর হইতে হইয়াছে; তাঁহারা প্রধানতঃ আরব্ধ কর্মের সুপরিচালনার দিকেই, কর্মের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকর্ষের দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছেন বেশী। অবশ্য কার্যতঃ পূর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের দিকে মিশনের সেবাহস্ত প্রসারিত হইয়াছে।

কার্যবিবরণীর সারানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৮জন সাধু সদস্য এবং ৩জন গৃহস্থ সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৬৭, মার্চ মাসের শেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৬৮ (সাধু ৩৫২, ভক্ত ৩১৬)।

কর্মপ্রসার

বহু অসুবিধাসত্ত্বেও পাকিস্তানে মিশনের কাজ চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। বর্তমানে মিশনের কেবল চারজন সাধু-কর্মী (পাকিস্তানের নাগরিক) সেখানে আছেন। তাঁহারা স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় সেখানে মিশনের কর্ম ও সেবার দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। ভারত-পাকিস্তানের মৈত্রীবৃদ্ধির জন্য মিশন প্রার্থনা করে।

ব্রহ্মদেশের চিত্রও অনুরূপ। রেঙ্গুনে এখন মিশনের একটিমাত্র কেন্দ্রই রহিয়াছে এবং স্থানীয় বন্ধুবর্গ কর্তৃক কোনওপ্রকারে পরিচালিত হইতেছে। সিংহল ফিজি ও মরিশাসে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি স্থানীয় অর্ডিন্যান্সের শর্তাধীনেই পরিচালিত হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে নেফায় আলং-এ একটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। খাসি পাহাড়ে চেরাপুঞ্জী কেন্দ্রের উদ্যোগে আরও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উপজাতিদের মধ্যে মিশনের কাজ ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

স্থানীয় বালক-বালিকাগণের জন্য দেওঘর বিদ্যাপীঠ কর্তৃক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

জামসেদপুর সোসাইটিতে নির্মীয়মাণ নূতন বিজ্ঞানভবনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। বৃন্দাবন সেবাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ-স্মৃতিভবনটি পূর্ব-পরিকল্পনানুসারে বিস্তৃতভাবে নির্মাণ করা হইয়াছে। রহড়া বালকাশ্রমে সিনিয়ার বেসিক স্কুল-গৃহের এবং পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে জুনিয়ার বেসিক স্কুল-গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গিয়াছে এবং রাঁচি টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে অতিথি-ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে।

সেবাকার্য

আসামে কাছাড় জেলায় বন্যার্ত-সেবাকার্য ১৯৬৬-র ২৯শে জুন আরব্ধ হইয়া ডিসেম্বরে শেষ হইয়াছে। এই সেবাকার্যে ৭২,৬৩১'৮৮ টাকা ব্যয়িত হয়। ইহা ছাড়া দানস্বরূপে পাওয়া ৭৪,৫০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য বিতরিত হইয়াছে।

উত্তরপ্রদেশে বান্দা জেলায় এবং বিহারে মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা ও হাজারীবাগ জেলায় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে খরাত্রাণ-সেবাকার্য শুরু করা হয়। বান্দা ব্যতীত উপরি-উক্ত অন্যান্য জেলাগুলিতে আলোচ্য আর্থিক বৎসরের (financial year) পরও সেবাকার্য চালাইয়া যাওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশে বান্দা জেলায় অবস্থার উন্নতি ঘটিলে মার্চ মাসে সেবাকেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং মির্জাপুর জেলার একটি দুর্গম অঞ্চল কানহারায় নূতন কেন্দ্র খোলা হয়। উত্তরপ্রদেশে মার্চ, ১৯৬৭ পর্যন্ত সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫৭,৮১৭'১৩ টাকা, দানস্বরূপ-প্রাপ্ত জিনিসপত্রের মূল্য বাবদ ১৫,১০৫ টাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত। বিহারে এই সময় পর্যন্ত দুর্গত সেবাকার্যে ব্যয় করা হয় ২,৫৬,৯৩৪'০৮ টাকা; ইহার মধ্যে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বাবদ ২৪,০১৪ টাকা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

উভয় সেবাকার্যেই সংস্পৃষ্ট বিভিন্ন রাজ্য সরকারের দপ্তর হইতে এবং প্রধান মন্ত্রীর আর্তত্রাণ তহবিল হইতে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যায়। অর্থ এবং স্বেচ্ছাসেবক উভয় বিষয়েই জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যবিভাগ

প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ছাড়া ১৯৬৭, মার্চ মাসে মিশনের ৭১টি কেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে পূর্ব-

পাকিস্তানে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া; বাকী ৫৮টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রসংখ্যা রাজ্য হিসাবে: পশ্চিমবঙ্গে ২৩, মাদ্রাজে ৮, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, ওড়িষ্যায় ২; দিল্লী, রাজস্থান, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, নেফা ও কেরলে একটি করিয়া। নেফায় আলং-এ নূতন কেন্দ্রটি ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে খোলা হইয়াছে।

মিশনের শাখা-কেন্দ্রগুলির কার্যধারার প্রধানতঃ চারটি বিভাগ: (১) চিকিৎসা, (২) শিক্ষা, (৩) সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার, (৪) গ্রামাঞ্চলে ও দরিদ্রগণের মধ্যে সেবাকার্য।

(১) চিকিৎসা: ভারত ও পাকিস্তানের বহু কেন্দ্রকর্তৃক জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পীড়িত জনসাধারণের সেবাকল্পে অনেকগুলি হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারী পরিচালিত হয়।

বারাণসী, বৃন্দাবন ও কনখল সেবাশ্রম, রাঁচির নিকটবর্তী যক্ষ্মা-হাসপাতাল ও কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান—এইসব ইনডোর হাসপাতাল ছাড়াও বোম্বাই, কানপুর, সালেম ও নিউ দিল্লীর সেবাকেন্দ্রগুলিতে আপৎকালীন ব্যবস্থা ও পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকটি করিয়া শয্যার ব্যবস্থা আছে। নিউ দিল্লীস্থিত চিকিৎসালয়টি টি. বি. রোগীদের জন্য। কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত নার্সিং-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাসপাতাল-গুলিতে মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ৯৬৯; এগুলিতে ১৮,২৪৬ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৫০টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে পুরাতন রোগী-সহ ২৫,৫৪,২৮৫ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

(২) শিক্ষা: আলোচ্য বর্ষে মিশন-পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধারা:

প্রতিষ্ঠান:	স্থান বা সংখ্যা:
মহাবিদ্যালয়	মাদ্রাজ
„	রহড়া
„ (আবাসিক)	বেলুড়
„ „	নরেন্দ্রপুর
আর্টস্ কলেজ (প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়)	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
বি. টি. কলেজ	„
„	বেলুড়
বেসিক ট্রেনিং কলেজ (পোস্টগ্রাজুয়েট)	রহড়া
„ (সিনিয়র)	সরিষা
„ (জুনিয়র)	রহড়া
„ „	সরিষা
„ „	সারগাছি
বেসিক ট্রেনিং স্কুল	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
„	মাদ্রাজ
শারীর শিক্ষা কলেজ	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
গ্রামীণ „ „	„
কৃষি-শিক্ষা বিদ্যালয়	„
সমাজশিক্ষাসংগঠক-শিক্ষণকেন্দ্র	বেলুড়
ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল (পলিটেকনিক)	„
„	বেলঘরিয়া
„	মাদ্রাজ
„	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
পরিষেবিকা-শিক্ষণকেন্দ্র	কলিকাতা (সেবাপ্রতিষ্ঠান)
জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল অথবা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল	১৪
ছাত্রাবাস (কয়েকটি অনাথাশ্রম-সহ)	৭৯
চতুষ্পাঠী	৩
বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৫
উচ্চতর „ „	৭
উচ্চ বা „ „	১২
সিনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়	৩২
জুনিয়র বেসিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১
নিম্ন শ্রেণীর ও অন্যান্য বিদ্যালয়	৯৭
বয়স্ক-শিক্ষা কেন্দ্র অথবা কমিউনিটি সেণ্টার	৩২

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে পরিব্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীত নরেন্দ্রপুর আশ্রমে অন্ধ ছাত্রদের জন্য একটি 'ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি' আছে। কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র (Institute of Culture) কর্তৃক পরিচালিত দিবাছাত্রাবাসে (Day Hostel) ৮০০ জন ছাত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিতেছে; এখানে সাহিত্যাদি ও সংস্কৃতি শিক্ষার এবং বিভিন্ন ভারতীয় ও বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬০,১৭৬, তন্মধ্যে ছাত্র ৪৫,০৬১ এবং ছাত্রী ১৫,১১৫।

(৩) **সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার:** মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে প্রতিফলিত ভারতের সমন্বয়মূলক প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাব-বিস্তারের উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। জনসভা, আলোচনাসভা, পুস্তক-প্রকাশন ও উৎসবাদির মাধ্যমেও ভাব-বিস্তার করা হইয়া থাকে।

(৪) **গ্রামাঞ্চলে কার্য ও দরিদ্রগণের মধ্যে সেবাকার্য:** রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি সবই শহরাঞ্চলে স্থাপিত এবং সেগুলি কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তদেরই জন্য—সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটি ধারণা জন্মিয়াছে; ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না।

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততঃ নয়টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত এবং এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনাধীন বহু উপকেন্দ্রও আছে। এগুলি জনসাধারণের সেবায় নিরত থাকিয়া ১২৮টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছে; তন্মধ্যে ৬টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক, ৩৩টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী; ৪৯টি প্রাথমিক এবং ৩৭টি বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়। ১৩টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২,৩৯,৯৬৭ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে; ৩টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ২৪টি গ্রাম্য কেন্দ্রে কাজ করিয়াছে। ১০১টি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র, ৫টি অডিও-ভিসুয়াল ইউনিট, ৮টি কমিউনিটি সেণ্টার, ৪টি বৃত্তি-শিক্ষা কেন্দ্র, কৃষি-মেলা ইত্যাদি আছে।

ইহা ছাড়া শিলংকেন্দ্রের একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে খাসি পাহাড় এলাকায় নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম জুড়িয়া আলোচ্য সময়ে ১৬,৫৭০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

কামারপুকুর মিশন-কেন্দ্র কর্তৃক একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে।

লক্ষণীয় যে, মিশনের শহরাঞ্চলের চিকিৎসা-কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার সুযোগ পাইতেছে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র ছাত্র অর্থসাহায্য অথবা বিনা-ব্যয়ে থাকিবার ও শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ লাভ করিতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আর্তত্রাণ-সেবাকার্য (Relief) করা হয় এবং এই সেবাকার্যের মাধ্যমে সহস্র সহস্র দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য লাভ করে।

প্রধান কেন্দ্রের কাজ প্রধানতঃ শাখাকেন্দ্র-গুলির পরিচালনা হইলেও এখান হইতে দরিদ্র ছাত্রগণকে ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্যদানও করা হয়।

প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে ২০২টি

দুঃস্থ পরিবারকে ও ২৬৭ জন ছাত্রকে (সিন্ধু উদ্বাস্তুদের লইয়া) আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুইটি বিদ্যালয়, ১৯০টি পরিবার ও ১৯ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। এই সাহায্যের মোট পরিমাণ ৩৩,৯১৮'৬৪ টাকা। কয়েকটি শাখা-কেন্দ্র হইতেও বহু দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দান করা হইয়াছে।

●

সেবাকার্য

১৯৬৭, সেপ্টেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়ঃ

খরাত্রাণ-সেবাকার্য

১। **বিহারে** হাজারীবাগ জেলায় ইট-খোরী, চম্পারণ ও প্রতাপপুর সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে, সাঁওতাল পরগণা জেলায় রিখিয়া এবং মুঙ্গের জেলায় জামুই, ঝাঝা ও চকাই সেবা-কেন্দ্রের মাধ্যমে গম ১,৬৫,১৫৮ কেজি, জোয়ার ৬,২৪৬ কেজি, চাল ৪৩৪ কেজি, গুঁড়া দুধ ২০, ৬৪৭ পাউণ্ড, ভিটামিন ট্যাবলেট ৯,০০০টি, ধুতি ও শাড়ী ১২,৯৯৯ খানি, শিশুদের পোশাক ১২,৮৪৮টি, কম্বল ও চাদর ২৯৮টি, লেপ ৩৮টি, এবং ১৩ খণ্ড লংক্লথ বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪২,১৯৫।

২। **উত্তর প্রদেশে**-মির্জাপুর জেলায় কানহারা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭,৩৬৭ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি-গণের সংখ্যা ৪,৫৭৫।

৩। **পশ্চিমবঙ্গে**—পুরুলিয়া জেলায় পারা, হুড়া, ঝাপড়া, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, বালি-তোড়া ও নডিহা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে, বাঁকুড়া জেলায় হাট-আসুরিয়া, দধিমুখা, খাণ্ডারী, রামহরিপুর ও জয়রামবাটী সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মালদহ কেন্দ্রের মাধ্যমে গম ও জোয়ার ১,২৩,১৩৭ কেজি, চাল ৭,০২৩ কেজি, বার্লি ৩,৫৪৫ কেজি, গুঁড়া দুধ ১,৯১৫ পাউণ্ড, ধুতি ও শাড়ী ৯,১৫৫ খানি, শিশুদের পোশাক ১,৯৩৭টি বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ২৩,৯৬৫।

বন্যার্ত-সেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গে—মেদিনীপুর জেলায় পিংলা, রাইপুর মুকুন্দপুর, পিচাবনী, আলাদারপুট সেবা-কেন্দ্রের মাধ্যমে বন্যার্তদের মধ্যে চাল ৩১,৫৭৭ কেজি, ডাল ৩০ কেজি, ধুতি ও শাড়ী ৬৫৪ খানি এবং নগদ ৩,৫০৫ টাকা বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১০,০১৪।

দাঙ্গাবিধ্বস্তদের সেবা

বিহারে—রাঁচিতে দাঙ্গাবিধ্বস্তদের মধ্যে রাঁচি আশ্রমের উদ্যোগে সেবাকার্য করা হয়। বিতরিত দ্রব্যাদি: গম ২,০১০ কেজি, চাল ৮৪৫ কেজি, ডাল ১১৫ কেজি, গুঁড়া দুধ ৬৮৮ পাউণ্ড, ধুতি ও শাড়ী ৪৪৬ ওবং শিশুদের পরিচ্ছদ ২৪৬টি। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১৭৯০।

ছাত্রের কৃতিত্ব

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠের জনৈক ছাত্র গত মে মাসে গৃহীত পশ্চিম বঙ্গের লাইসেনসিয়েট পরীক্ষায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিবিধ-সংবাদ

শুক্রগ্রহ থেকে পৃথিবীতে প্রথম বেতার-সঙ্কেত

গত ১৮ই অক্টোবর বেলা ১০টার সময় রাশিয়ার মহাকাশ-যান ভেনাস-৪ শুক্রগ্রহের উপর একটি যন্ত্র নামাইয়া দেয়, এবং উহার আট মিনিট পর যন্ত্রটি শুক্রগ্রহ হইতে পৃথিবীতে সংকেতে সংবাদ পাঠাইতে থাকে। মহাকাশ-অভিযানে রাশিয়ার এই সাফল্য আর একটি রেকর্ড সৃষ্টি করিল। এ সময় পৃথিবী হইতে শুক্রগ্রহের দূরত্ব ছিল ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ মাইল।

শুক্রগ্রহ পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হইলেও উহা মেঘাবরণে আবৃত থাকায় পৃথিবী থেকে এতদিন পর্যন্ত তাহার পৃষ্ঠদেশের কোন তথ্যই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। ভেনাস-৪ কর্তৃক প্রেরিত সংবাদে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। জানা গিয়াছে, শুক্রের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চেয়ে ১ থেকে ১৫ গুণ বেশী ঘন এবং তাহা প্রায় সবটাই কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়া গঠিত, শতকরা মাত্র এক থেকে দেড় ভাগ হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস। গ্রহ-পৃষ্ঠের উত্তাপও খুব বেশী, ৫৩০° ডিগ্রী ফারেনহিট পর্যন্ত উঠে। এই পরিবেশে সেখানে কোন জীবের (অন্ততঃ পৃথিবীতে যে ধরনের জীবনের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার) অস্তিত্ব সম্ভব বলে মনে হয় না।

মহাকাশ-অভিযান

মানুষের মহাকাশ-অভিযান সর্বপ্রথম স্থরু হয় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর। এই দিন রাশিয়া মহাকাশে একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে; সেটি পৃথিবী থেকে ১৪০ হইতে ৫৬০ মাইল দূরে থাকিয়া সেদিন প্রতি ৯০ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিয়াছিল। আমেরিকা প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পৃথিবীর প্রথম মহাকাশযাত্রী-প্রাণী সারমেয় লাইকা রাশিয়া হইতে উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহে চড়িয়া পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করে। প্রথম মহাকাশ-যাত্রী মানুষ ইউরী গাগারিন ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে রাশিয়া হইতে উৎক্ষিপ্ত মহাকাশযানে পৃথিবী পরিক্রমা করেন। প্রথম মার্কিন মহাকাশযাত্রী লেঃ কর্ণেল জনগ্লেন মহাকাশে উঠেন ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরের সৌরমণ্ডলে অভিযান স্থরু হয় ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে—রাশিয়া হইতে 'লুনিক-১' উৎক্ষিপ্ত হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার 'লুনিক-৩' চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে, অজানা চন্দ্রপৃষ্ঠের ফটো তোলে। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরিতে লুনা-৯ চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অবতরণ করে। এই বৎসরই জুন মাসে আমেরিকার 'সার্ভেয়ার-১' চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া ১১,৫০০ খানি ছবি গ্রহণ করে।

—রয়টার

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১১৫তম শুভ-জন্মতিথি আগামী ৭ই পৌষ (২৩. ১২. ৬৭) শনিবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

দিব্য বাণী

জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে।
জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৩
তীর্থযজ্ঞতপোদানযোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্বং সর্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১০
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি।
সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১১
অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশহৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকুটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১২

—জগদ্ধাত্রীকল্প

বিজয়দায়িনী তুমি, আনন্দদায়িনী তুমি, চরাচর জগতের মাঝে
আনন্দ যেথায় ফোটে তোমারি প্রকাশ সেথা, আনন্দরূপিণি!
সব আরাধনা ধায় তোমারি চরণে, (সর্ব-দেবতা-রূপিণি)!
নমি সর্বগতে, দুর্গে, জগদ্ধাত্রি, জগৎ-জননি!

তীর্থ যজ্ঞ তপ দান যোগ-আদি সবি তুমি—এ-সবের তুমি যে মা সার!'
তুমিই হয়েছ সব, রয়েছ মা সব ঠাঁই, জগৎ-ব্যাপিনি!
নমি তব পদাম্বুজে জগদ্ধাত্রি, জগৎ-জননি!

দয়ারূপা জননী গো, তোমার নয়নপাতে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে কৃপাকণা,
করুণাগলিত চিতে সবাকার দুখ হর, আপদ-তারিণি!
নমি দুর্গে, নমি দেবি, জগদ্ধাত্রি, জগৎ-জননি!

মহাযোগী মহেশের গহন হৃদয়পুর নিত্যধাম, স্বধাম তোমার—
(মনের) অগম্য তাহা, অসীম অতুলনীয় ভাবান্তঃবাসিনি!
নমি তব পদাম্বুজে জগদ্ধাত্রি, জগৎ-জননি!

কথাপ্রসঙ্গে

জননী সারদাদেবী

স্বামী বিবেকানন্দ জননী সারদাদেবীকে 'জ্যান্ত দুর্গা মা' বলিয়াছেন। সারদাদেবীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁহার চরণযুগলের তুলনা করা হইয়াছে স্থলপদ্মের সঙ্গে, "স্থলপদ্ম-প্রতীকাশ-পাদাম্ভোজসুশোভনাম্"। ইহাও উমার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। কুমারসম্ভবে উমার চরণপাতের অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন কালিদাস—উমা যখন চলিতেন, শুভ্রতুষারমণ্ডিতশির হিমালয়ের বুকে যখন চরণপাত করিতেন, তখন মনে হইত মায়ের রাতুল চরণের স্পর্শে প্রতিপদক্ষেপে মা যেন "স্থলারবিন্দশ্রিয়ম্" ছড়াইয়া চলিয়াছেন।

কালিদাসের কথা কবিকল্পনা হইতে পারে, কিন্তু মহাশক্তির চরণস্পর্শে যে সত্যই পদ্ম ফুটিয়া উঠে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা বলিয়া গিয়াছেন, কুণ্ডলিনীর জাগরণের বর্ণনায়।

লজ্জাপটাবৃতা জননী সারদাদেবীই সেই মহাশক্তি। তিনিই দুর্গা, তিনিই উমা, তিনিই কালী। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আবার 'জগন্ময়ী' 'সর্বস্থা'; তাঁহার নিজেরই কথা: জ্ঞান হলে…শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে—এই তো সোজা কথাটা!

যিনি ব্রহ্ম, যিনি জগন্নিয়ামিকা শক্তি, জগদীশ্বরী, তিনিই কি করিয়া মানুষ হইয়া আসেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক উদ্ধৃত এই কথাই বোধ হয় শেষ কথা, "ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে!" কিন্তু একটি জিনিস আমরা দেখিতে পাই—শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাঁহার চরণে নিজ সাধনার সমস্ত ফলের সহিত জপের মালা সমর্পণ করিয়া অঞ্জলি দিতেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়া যাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার সময় গঙ্গাজল পান করিয়া শুদ্ধ হইতেছেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ কোন দেবমন্দিরে যাইয়া যেমন ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন, যাঁহার গৃহে প্রবেশমাত্র সেরূপ হইতেছেন, তাঁহার শক্তির বিপুলতা আমরা কিছুটা অনুমান করিতে পারি।

কিন্তু আমাদের কাছে তাঁহার শক্তির সর্বোচ্চ পরিচয় তাঁহার স্নেহে, যে মাতৃস্নেহের শক্তিবলে তিনি এই বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। এখানেই তিনি আমাদের সকলেরই মা—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মা কালী—'আনন্দময়ী মা', স্বামী বিবেকানন্দের কাছে 'জ্যান্ত দুর্গা মা', আবার ডাকাত আমজদের কাছেও আমাদের চির-পরিচিত মমতাময়ী মা। আমাদের অতি-পরিচিত মায়ের মতই তাঁহার আচরণ—জয়রাম-বাটীতে কোন ভাল খাবার তৈয়ারী করিয়া দিনের পর দিন রাখিয়া দিতেছেন, যদি ইতিমধ্যে কোন ছেলে আসিয়া পড়ে তো খাইবে; কলিকাতা হইতে কেহ আসিয়াছে, তাহার সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস, দেরী হইলে কষ্ট হইবে, ভোর বেলা মা পাড়ায় ঘুরিতেছেন চায়ের দুধের সন্ধানে; সন্তান মহা অপরাধ করিয়াছে, মায়ের কাছে নালিশ আসিলে বলিতেছেন, 'আমি মা, মায়ের কাছে কি ছেলের কোন অপরাধ হয়?'—শঙ্করাচার্য-কৃত জগজ্জননীর স্তবেরই সমর্থন করিতেছেন, 'যদি ভবতি পুনঃ সর্বদা স'পরাধঃ, সর্বং তৎ কামরূপা ত্রিভুবনজননী ক্ষাময়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা।'

এখানেই তিনি আমাদের জন্য তাঁহার

চরণ স্পর্শ করিবার অধিকার দিয়া গিয়াছেন সকলকেই, অধিকার দিয়া গিয়াছেন পঙ্কিল হৃদয়েও তাঁহার চরণপদ্ম ছোঁয়াইয়া সেখানে 'হৃদারবিন্দ' ফোটাইয়া তুলিবার। হিমগিরি-সদৃশ শুভ্র শান্ত হৃদয়ের তো কথাই নাই, সেখানে তো তাহা ফুটিবেই।

শিক্ষার একটি অবহেলিত দিক

শ্রীশ্রীমায়ের বাল্যকালে শিক্ষালাভ হইয়াছিল বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক সেখানে প্রবেশ করে নাই একেবারেই। ভারতের সমাজের প্রাচীনকাল হইতে আগত নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতিতেই তিনি শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি এখন, তাহার কিছুই তিনি পান নাই বলা চলে—রামায়ণ-মহাভারতাদি পড়িতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে, কিন্তু লিখিতে দেখা যায় নাই। একবার একটি বর্ণপরিচয় আনাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হৃদয় উহা দেখিতে পাইয়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন: মেয়েমানুষ, লেখাপড়া শিখিয়া কি শেষে নাটক-নভেল পড়িবে? পরে লক্ষ্মীদি'র সহিত সামান্য কিছু লেখাপড়া তিনি শিখিয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতে জনসাধারণের মধ্যে সমাজে যেভাবে শিশুদের শিখাইয়া তোলা হইত, যাহা শিখানো হইত, তাহারই মাধ্যমে তিনি এমন কিছু শিখিয়াছিলেন যাহা তাঁহাকে নারীত্বের আদর্শের সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ়া করাইয়াছিল। ধর্মপ্রসঙ্গে তো কথাই নাই, জাগতিক বিষয়েও তাঁহার বুদ্ধির বিকাশ ও ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁহার বুদ্ধির এবং সময়োচিত কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দজী মঠ-মিশনের কার্যে বহুক্ষেত্রে যখন নিজের বিবেচনায় সঠিকভাবে কর্তব্য-নির্ণয়ে সমর্থ হইতেন না, তখন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন; মা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতেন কি করিতে হইবে। রাধুদি ও তাঁহার মা প্রভৃতি পাগলদের এবং নিজের অবুঝ ভাইদের লইয়া যে সংসারটিতে তিনি সুদীর্ঘকাল কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাসে শুধু তাঁহার শক্তিশালী অথচ কোমল ব্যক্তিত্বই নয়, তাঁহার প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও জাগতিক জ্ঞানের বিকাশের স্বাক্ষরও বিদ্যমান।

সন্দেহ নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শিক্ষালাভের এবং সর্বোপরি তাঁহার নিজ ব্যক্তিত্বের অবদানই, তাঁহার অবতারত্বই ইহার মূল ভিত্তি। তবুও বলা যায়, অবতারত্ব অভিনয়মাত্র এবং সে অভিনয়ে মানুষের ভূমিকা নিখুঁতভাবেই অভিনীত হয়। সেদিক হইতে দেখিলেও অভিনয়ের যে পটভূমি এক্ষেত্রে নির্বাচিত এবং বাল্যশিক্ষারূপে যাহা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার গুরুত্ব কমিয়া যায় না একটুও।

কি এমন ছিল সে শিক্ষাপদ্ধতিতে যাহা যুগে যুগে ভারতে মহীয়সী নারী গড়িয়া তুলিয়াছে, সাধারণভাবেও বহু বাধাবিপত্তি, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা সহিয়াও ভারতের নারীত্বের আদর্শকে যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে?

পদ্ধতির মূলে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে ছিল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ সমাজজীবনের সঙ্গে অতি সহজভাবে মিশিয়া যাওয়া কয়েকটি অভ্যাস—বারব্রত প্রভৃতি পালন, তুলসীতলা, দেবালয়াদিতে সকাল-সন্ধ্যায় প্রণাম, রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি। কখনো বা কথকতা ও যাত্রাদিতে যোগদান (যাহার মূল বিষয়বস্তু থাকিত কোন পৌরাণিক কাহিনী)।

সামান্য জিনিস, কিন্তু নরনারী নির্বিশেষে সকলেরই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার মত

শিক্ষায় যাহা প্রাথমিক প্রয়োজন, তাহা লাভ করিবার এত সহজ পদ্ধতি আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। ভগিনী নিবেদিতা শিক্ষা-প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশকে জীবনের আদর্শ বলিয়া জানিবার এবং উহাকে জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের পথ খুঁজিয়া পাইবার এত সহজ পন্থা আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। সামান্য উপবাস, সামান্য অনুষ্ঠান, নিত্য নিয়মিতভাবে ভগবানকে অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্য স্মরণ করা—এই সব নিয়মপালনের প্রভাব ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের, ভগবদ্-বিশ্বাস-বর্ধনের উপর অসীম; ধীর, অথচ ধ্রুব। শিশুমনের উপর প্রায় অলক্ষ্যে মুদ্রিত এই ছাপগুলিই তাহার পরিণত জীবনের চরিত্রের ভিত্তিভূমি হইয়া দাঁড়ায়। আর রামায়ণ-মহাভারতাদিতে গল্প-ইতিহাসাদির মাধ্যমে মানুষের সর্বোচ্চ চিন্তা ও আদর্শগুলি সর্বজন-বোধ্যভাবে পরিবেশনের প্রয়োজনের গুরুত্বও বোঝা যায় টয়েনবীর একটি কথায়: কোন সভ্যতা কত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবে তাহা তাহার মধ্যে কতজন লোক চিন্তার কত উচ্চ শিখরে উঠিল তাহার উপর নির্ভর করে না, করে তাহাদের সেই উচ্চ চিন্তাগুলি সর্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থার উপর

শিক্ষার উন্নয়ন-বিষয়ে আজ আমরা বহুভাবে চিন্তা করিতেছি কিন্তু শিক্ষার এই মূল কথাগুলি লইয়া বিশেষ কিছু ভাবিতেছি না। শিক্ষার্থীদের কি কর্তব্য, কিসে তাহাদের নিজের ও দেশের কল্যাণ, একথা শুধু পড়াইলেই বা শুনাইলেই যে মানুষ সেভাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে না, কার্যকালে স্থিরচিত্তে ভাবিয়া কোন নির্ভুল সিদ্ধান্তগ্রহণের মত মানসিক স্থৈর্যেরও অধিকারী হয় না, ইহা আমরা ভুলিয়াছি। বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতি শিক্ষায় থিওরেটিক্যাল শিক্ষার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার মত মানসিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজন অনিবার্য। একথা বলা বাহুল্য, যাহা বুদ্ধিগত করিলাম জীবনে তাহা ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে সে শিক্ষার কোন মূল্যই নাই; স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, একটি বড় লাইব্রেরীকে এরূপ ব্যক্তির চেয়ে অধিক শিক্ষিত বলা যায়। বিজ্ঞান-শিল্পাদি শিক্ষার মত 'মানুষ' করার শিক্ষাতেও এই হাতে হাতে করার দিকটিতে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবেই যদি আমরা 'মানুষ' চাই, শিক্ষাকে সফল করিতে চাই, বাহিরের মত শিক্ষার্থীর অন্তরটিকেও শিক্ষিত করিতে চাই, বুদ্ধিবৃত্তির সহিত হৃদয়বৃত্তিরও সমান উন্নতিলাভ চাই। অন্তরটি যদি সংস্কৃত না হয়, স্বামীজী বলিয়াছেন, তবে শুধু বাহিরটিকে পালিশ করিয়া লাভ কি? লাভ যে নাই, বরং এদিকটিকে বাদ দিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেও তাহাতে দেশের এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদেরও অকল্যাণকে তাহারা কল্যাণ বলিয়া ভাবিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারে, দেশের চিন্তাশীল কোন মনীষীর কথাই তাহাদের মনে রেখাপাত করে না, ইহাতো আমাদের গভীর বেদনার সহিত আজ অনুভব করিতে হইতেছে। বর্তমান যুগের অসংখ্য বিভ্রান্তিকর জীবনাদর্শের মধ্য হইতে জীবনের কল্যাণ-পথ নির্ভুলরূপে বাছিয়া লওয়ার এবং সাময়িক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত না হইয়া সে পথে চলার মত শক্তিমান হওয়ার জন্য সংযত, উদ্দেশ্য-নিঃসংশয় ও দৃঢ়ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের প্রয়োজন। আর তাহা একদিনে হয় না, প্রথম হইতেই তাহার জন্য প্রয়াসী হইতে হয়।

ভারতের নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতিতে এই দিকটি ছিল। শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত শিক্ষার্থীর 'অন্তর'টির উপর (তাই বলিয়া যেন

না ভাবি যে, অন্যান্য শিক্ষা অবহেলিত হইত)। প্রাচীন গুরুকুল আশ্রমে তাই এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে—যে-বিদ্যার্থী বিদ্যালাভের জন্য গুরুসমীপে আসিয়াছে, তাহাকে প্রথমে বই পড়িতে শেখানো হইতেছে না, এমন কি ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী বিদ্যার্থীকেও ধ্যান-ধারণার উপদেশ দেওয়া হইতেছে না; তাহাকে বলা হইতেছে—'এই গরুগুলি বনে লইয়া যাও, চরাও, পালন কর' বা 'যাও, জমির আলি ভাঙিয়া যেন জল বাহির হইয়া না যায়, তাহা লক্ষ্য রাখ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কর', ইত্যাদি, যাহার সহিত সে যাহা শিখিতে আসিয়াছে আপাতদৃষ্টিতে তাহার কোন সম্পর্কই নাই। কিন্তু ইহাতেই শিক্ষার যাহা বনিয়াদ, 'মানুষে'র জীবনের যাহা বনিয়াদ তাহা প্রস্তুত হইয়া যাইত—শিক্ষার্থীর অন্তরটি গড়িয়া উঠিত, সেবানিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বা ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়া যাইত। ফলে, পরে যে যাহা শিখিত তাহার এবং তাহার জীবন-রূপায়ণের মধ্যকার বাধা ও ব্যবধান কমিয়া আসিত। ভাল-মন্দ-নির্ণয়ের নিজস্ব শক্তি এবং অপরের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকার শক্তি উভয়ই অর্জিত হইত।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে মানবজাতির জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা উভয়ই বাড়িয়াই চলে; সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক সব কিছু ব্যবস্থারই পুনর্বিন্যাস হয় যুগে যুগে। জাগতিক বিষয়ে শিক্ষার পদ্ধতিও তাই কালের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত না করিলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। উহা করিতেই হইবে, বিষয়গতভাবেও। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বাঞ্ছিত ফল-প্রসূতা না দেখিয়া শিক্ষার উন্নয়নের কথা ভাবিতে বসিয়া শুধু এই দিকটিতেই প্রায় সব মনোযোগ দিয়া থাকি আমরা। উহার প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু অন্তরের শিক্ষার দিকটিতে যে নজর দিতেছি না, বড়জোর পাঠ্যপুস্তকের তালিকার মধ্যে কয়েকখানি মহৎব্যক্তির জীবনী প্রভৃতির অন্তর্ভুক্তিই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করিতেছি, ইহা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকে অবহেলারই নামান্তর। কিন্তু কার্যতঃ তাহাও এখনো হইতেছে না। বিদেশ হইতে আমাদের ভাষায় লিখিত ও ও মুদ্রিত হইয়া শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক আসিয়া আমাদের শিশুদের মনে সেখানকার সংস্কৃতির ছাপ ফেলিতেছে, কিন্তু এদেশের সংস্কৃতির বাহক রামায়ণ-মহাভারত-বেদান্তাদির গল্পের বই প্রচুর পরিমাণে শিশুদের হাতে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা আমরা করিয়াছি কতখানি? শিক্ষার এই অবহেলিত দিকটিতে, উচ্চ আদর্শে অনুরাগ এবং সেই সঙ্গে মনুষ্যত্ব-অর্জনের দিকটিতে নজর দেওয়ার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

এই দিকটিতে জ্ঞানের যতদূর উচ্চতায় ও গভীরতায় পৌছিয়া প্রাচীন ভারত যে রত্নভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছে, তাহাতে নূতন আর কিছু যোগ করিবার নাই। স্বামী বিবেকানন্দের লেখার মাধ্যমে (রাজযোগ) এই জ্ঞানের কিছু পরিচয় পাইয়া টলষ্টয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, "এই সত্য, মহোচ্চ, স্বচ্ছ জীবন-সত্য হইতে মানবজাতি বারবার বিপরীত মুখাভিমুখী হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনো উহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই।" মানুষের অন্তরকে, তাহার মনকে, সত্তাকে, প্রত্যক্ষ করিয়া (মনের বাহ্যক্রিয়া-মাত্র দেখিয়া অনুমান করিয়া নয়) এবং সেই স্বচ্ছ সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া ভারতের সত্যদ্রষ্টাগণ মানসিক উন্নতির পদ্ধতিগুলির নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, যেভাবে

কোন বৈজ্ঞানিক জড়প্রকৃতির অন্তর্গত সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার পদ্ধতি-গুলি বলিয়া দেন, প্রাথমিক হইতে সর্বোচ্চ পর্যন্ত সকল স্তরেই। সত্যদ্রষ্টাদের সেই নির্দেশকে ভিত্তি করিয়া ভারতের জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতিগুলি প্রবর্তিত। মূলগতভাবে সেগুলির পরিবর্তন করিবার কিছুই নাই, শুধু যুগোপযোগী পরিবেশে সেগুলিকে মানাইয়া লইতে হইবে এই পর্যন্ত। আধুনিক মনীষীদের শিক্ষা-চিন্তার স্বর্ণহারে সে রত্নগুলিকে খচিত করিয়া লইতে হইবে। সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া সাশ্রুনয়নে বিলাপ করিবার দুর্ভাগ্যক্ষণ যেন সৃষ্টি না করি আমরা, সোনার বাণিজ্যে যেন মণি ডালি না দিই! শিক্ষাক্ষেত্রে বাহ্য-পরিবেশ বদলাইলেও আন্তর পরিবেশটিকে আমাদের অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। নতুবা সবই অর্থহীন হইবে। যেমন প্রাচীন ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের, তপোবনের বাহ্য পরিবেশটি গড়িয়া তুলিলেও সেখানে আন্তর পরিবেশের অভাবে উহা যে ফলপ্রসূ হয় না, আবার শহরের ঘিঞ্জির মধ্যেও এই আন্তর পরিবেশের প্রভাবেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে ঋষির আশ্রমে পরিণত করা যায়, আধুনিক কালে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে অন্তরের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও পদ্ধতি প্রচলিত করিতেই হইবে। প্রথম হইতেই ইহার প্রচলন প্রয়োজন। কিভাবে তাহা করা যায়, গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া সে পদ্ধতি নির্ণয় করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, আজিও শিক্ষার উন্নয়ন-বিষয়ে কার্যপদ্ধতি-নির্ণয়ের সময় আমরা বিদেশের দিকে তাকাইতেছি, অথচ এদেশের আধুনিক যুগের একজন মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ এবিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেছি না। সব দেশেরই চিন্তাধারা চাই, কিন্তু স্বদেশের চিন্তাধারাকে নিষ্ঠাসহকারে পরিত্যাগ করিয়া নহে নিশ্চয়ই।

মনে হয় এবিষয়ে কয়েকটি ব্যবস্থা আমরা এখনই করিতে পারি, যাহা শিক্ষাপদ্ধতিতে আবশ্যিক থাকা একান্ত প্রয়োজন। বালক-বালিকাদের জন্য প্রতিটি শিক্ষায়তনে বয়সানুসারে সময়ের স্বল্পাধিক্য করিয়া নিয়মিত কিছুক্ষণ ভজন ও প্রার্থনার ব্যবস্থা। যুবকযুবতীদের জন্য ইহার সঙ্গে মানুষের সেবা এবং কিছু শ্রমসাধ্য কাজও যোগ করা প্রয়োজন। এককথায়, যুগোপযোগী পরিবেশে খাপ খাওয়াইয়া লইয়া ভারতের জাতীয় শিক্ষার নিজস্বতাকে, "পবিত্রতা, অনাড়ম্বর জীবন, সুনিয়ন্ত্রিত কর্মতৎপরতা ও শান্ত ধ্যান হতে যা কিছু পাওয়া যায় তার সবকিছু"-কে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবাসিক না হইলে হয়তো সব করা সম্ভব নহে, কিন্তু যতটা সম্ভব হয়, চেষ্টা করিতে হইবে। সমস্ত ছাত্রবাসগুলিকে এই-ভাবে এখনই গড়িয়া তোলা যায়।

উচ্চ আদর্শ পরিবেশনের ব্যাপারে স্বামীজী যাহা চাহিয়াছিলেন, সর্বাগ্রে শিশুদের নিকট তাঁহাদের উপযোগী করিয়া রামায়ণ-মহাভারত-বেদান্তাদির গল্পগুলি পরিবেশন করা, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে, পরে ধারণাশক্তির বর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির অন্তর্গত উচ্চ, উচ্চতর ভাবগুলির পরিবেশনের ব্যবস্থার প্রতিও। স্বামীজীর কথায়, চারাগাছকে টানিয়া কেহ বাড়াইতে পারে না; তাহার বর্ধনের উপযোগী সার দিতে হইবে, আর প্রথমাবস্থায় রক্ষার জন্য একটু বেড়া। মনে হয় চলচ্চিত্রকে এবিষয়ে কাজে লাগাইলে উভয়তঃ ফলপ্রসূ হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এদেশে চলচ্চিত্রকে কাজে লাগানোই

হয় না। অথচ মনের উপর ছাপ ফেলিবার কাজে ইহার ক্ষমতা অসীম।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই উচ্চ আদর্শকে গ্রহণ ও জীবনে রূপায়িত করিবার ইচ্ছার অভাব নাই। অভাব —উচ্চভাব পরিবেশনের, অভাব – তাহাদের অন্তরটিকে বিকশিত করিবার পরিবেশের।

ছাত্রজীবন ও রাজনৈতিক আন্দোলন

খুব বেশীদিন নয়, ছাত্র-আন্দোলনের ফলে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়াছিল। এবারেও ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে আবার যেন তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। যেটুকু ক্ষতি ইতিমধ্যে হইয়াছে, তাহা আর বাড়িতে না দিয়া উহা পূরণের জন্যই যেন সমবেতভাবে চেষ্টা করা হয়।

কলিকাতার বহু শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষগণ সমবেতভাবে এ বিষয়ে আবেদন জানাইয়াছেন —রাজনৈতিক কারণে শিক্ষাব্যবস্থা যেন ব্যাহত না হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে ছাত্রগণকে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দূরে রাখিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট, রাজনৈতিক নেতাদের নিকট, ছাত্রগণ ও তাঁহাদের অভিভাবকগণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। সরকারও এ বিষয়ে সজাগ। আমরা আশা করি, শিক্ষাব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার গুরুত্ব সকলেই অনুভব করিবেন এবং সকলের সমবেত চেষ্টা ও শুভেচ্ছায় বিদ্যায়তন-গুলিতে শান্ত পবিত্র পরিবেশ পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। আমরা যেন না ভুলি, দায়িত্ব আমাদের সকলেরই।

বিশেষ করিয়া ছাত্রগণ যেন কখনো না ভুলেন যে, ছাত্রজীবন প্রস্তুতির জীবন। রাজ-নীতি ও জনসেবা করিবার, এমনকি নিজেকে সর্বতোভাবে সে সেবায় উৎসর্গ করিবারও সুযোগ জীবনে বহু আসিবে। বরং যথার্থ দেশপ্রেমিকের, মানবপ্রেমিকের, পরার্থে স্বার্থত্যাগীরই অভাব এখন। এ গুণগুলি সাময়িক উত্তেজনামূলক কোন কার্যের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, সুদীর্ঘকাল নীরবে এ বৃত্তিগুলিকে লালিত ও বর্ধিত করিতে হয়, বিপরীত সহজাত বৃত্তিগুলির সহিত লড়াই করিয়া। তাছাড়া বর্তমান কালের বহুবিধ মতবাদের অরণ্যে যথার্থ কল্যাণকর জীবনপথ খুঁজিয়া বাহির করাও আজ স্থির মননসাপেক্ষ। ছাত্রজীবন তাই কেবল বিদ্যাভ্যাসে, স্বদেশের এবং বিদেশের আধুনিক ও প্রাচীন সর্ববিধ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদগুলির সহিত পরিচিতি ও সেগুলির তুলনামূলক গভীর মননে এবং যাহা কিছু দেহ ও মনকে দুর্বল করে তাহা হইতে দূরে থাকিয়া দেহের ও হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলির পুষ্টিসাধনে যদি ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে তাহাতেই নিজের কল্যাণ করার সঙ্গে দেশেরও শ্রেষ্ঠ সেবা করা হইবে। কারণ সুস্থ সবল দেহ, বজ্রদৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মন, সদসদ্‌নির্ণয়ের নিজস্ব উন্নত সুদূরপ্রসারী উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোক ও লোককল্যাণেচ্ছা লইয়া কৃতবিদ্য হইবার পর ছাত্রগণ যদি কর্মজীবনে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদের দ্বারাই দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। দেশ এখন এরূপ নাগরিকই, এরূপ নেতাই চায়, ছাত্রগণ এরূপ হইয়া উঠিবেন, ইহাই আশা করে। নিজে গভীর চিন্তার শক্তি হারাইয়া অপরের কথায় বিভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল হইলে এবং নিজের ও অপরের বিদ্যালাভের পথেও বাধা সৃষ্টি করিলে তাহাতে লাভ কাহারও হইবে না।

আশা করি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার উত্তর-বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন উৎসবে ছাত্রগণের উদ্দেশে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, ছাত্রগণ তাহা অনুধাবন করিবেন, "তোমরা নিজেদের পড়াশুনায় মনোনিবেশ কর, অন্য কোন কার্যকলাপ যেন তোমাদের অধ্যয়নে ব্যাঘাত না ঘটায়।...পুরাতনই হউক, নূতনই হউক, কোন অযৌক্তিক গোঁড়ামি যেন তোমাদের পথভ্রষ্ট না করে। তোমরা সব কিছু নিজে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে।"

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী জীবানন্দ

কলুষ-নাশিনী মাতা দেবী মন্দাকিনী তুমি
পরমপাবনী,
ছিলে স্থিরা শিবরূপী রামকৃষ্ণ-জটাজালে
ভুবনতারিণী,
জগৎ-কল্যাণে এলে সারদারূপিণী হয়ে
স্নেহ-বিগলিত—
বিশ্বমাতৃহৃদয়ের শান্ত স্নেহ-পারাবার
মৃদু-উদ্বেলিত।
অমিয়নির্ঝররূপা, চিদানন্দময়ী সতী
করুণারূপিণী,
নিত্য প্রশান্তিতে পূর্ণ, করুণা-ক্ষরিত নেত্র,
জ্ঞানস্বরূপিণী
তব মূর্তি ধ্যানমাত্রে হৃদয়েতে মহাবীর্য
জাগে দুর্নিবার,
কণ্ঠে জাগে মাতৃনাম, জাগে চিত্তে সন্তানের
আনন্দ অপার।

'ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু মোর!
আমার আনন্দধাম ঐ তব ক্রোড়!
আমার পাণ্ডিত্য তুমি! আমার বৈভব!
তুমি মোর প্রিয়তম! তুমি মোর সব!
জীবন-যৌবন-খ্যাতি রূপ আর ধন—
জলের বুদ্বুদ সবই! এরা কতক্ষণ?
চিরন্তন তুমি শুধু! বুদ্বুদরাশির
ছলনা তোমারই মায়া! আছ চিরস্থির
চঞ্চলের মাঝখানে! অতিক্রমি তারে!
মানবীয় বাক্য-মন-বুদ্ধির ওপারে!
হৃদয়ের সিংহাসনে রয়েছো আসীন!
পাদপদ্মে লগ্ন রাখো চিত্ত নিশিদিন!
স্বর্ণ-খনি ছেড়ে কাচ খুঁজোনা রে মন!
তিনি সব আনন্দের চির-প্রস্রবণ।

স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

পুরী
৫. ৫. ১৯০৭

ভাই শশী,

তোমার কৃপাপত্র পাইয়া অতি আনন্দিত হইলাম। New York সহরে শ্রীশ্রীপ্রভুর পাকা স্থান হইল অবগত হইয়া আনন্দ হইল, তবে মানুষ—মানহুঁশ চাই ভাই, তা হলেই পাকা, নতুবা সব কাঁচা। আশীর্বাদ কর ভাই যেন শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে ভক্তি হয়, আমি-আমার ভাব যেন দূর হয়ে যায়, এই প্রার্থনা।

যদি ভক্ত আলাসিঙ্গাকে বলে আমার জন্য ২।৪ খানা স্বামীজীর বই পাঠাও পরম বাধিত হইব। একা আছি তাই পড়িতে ইচ্ছা হয়। ডেপুটী অটলবাবু কিছু ভাল বাঙ্গালোরের আঁব চেয়েছিলেন, যদি সুবিধা হয় পাঠাইও।

মহারাজ বোধ হয় আগামী কল্য সোমবার কলিকাতা হতে কোঠার আসিবে, আর এক সপ্তাহ বাদে পুরী আসিতে পারে, রাম এইরূপ লিখেছে। আমার শরীর ভাল আছে। তুমি কেমন আছ লিখিয়া সুখী করিবে। তোমার সঙ্গে কয়েক দিন কি আনন্দে ছিলাম! এখন বুঝিতেছি। তুমি আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। আর সকল ভক্তকে ও রুদ্রকে ভালবাসা ও নমস্কার কহিবে।

ইতি
দাস বাবুরাম

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

৫. ৬. ১৯০৭
পুরী

ভাই শশী,

তোমার দু'খানি কার্ড পেয়েছি। মঠের বাড়ীর কাজ হচ্ছে শুনে মহারাজ বড় খুশী। শ্রীশ্রীপ্রভুর কাজে খুব লেগে যাও, মহারাজের এই বাণী। রুদ্র বেশ আছে শুনে আমরা বড় আনন্দিত। শুনিলাম এবার ওদেশে আঁব ভাল হয় নাই। তুমি সেজন্য ব্যস্ত হইও না। স্বামীজীর মন্দিরও কতকটা হয়েছে, ক্রমশঃ হবে। এন. সুব্বারাও-এর পুত্র-পরিবার আসিবে কবে, সেটা যেন আগে আমরা খবর পাই। তাহলে Station-এ গাড়ী পাঠাই। এখানে রামেদের কেহ নাই। যাইহোক আমরা তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করে দিব। ২।৫ দিন পরে এলে ভাল হয়। এখানে যাঁরা আছেন শীঘ্র তাঁরা যাইবেন।

আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে।

ইতি
দাস বাবুরাম

(৩)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

পুরী
২৭. ১১. ১৯০৭

ভাই শশী,

মঠবাটীর সম্বন্ধে তোমার বিস্তৃত বিবরণ সহ পত্র পাইয়া পরম পুলকিত হইলাম। আমি গত শনিবারে রাজার ইচ্ছায় এখানে এসেছি। বোধহয় আগামী রবিবারের মধ্যেই মহারাজ প্রভৃতি সকলকেই কলিকাতা অভিমুখে যাইতে হইবে। মধ্যে ভুবনেশ্বর ও ভদ্রকে কিছু দিন কাটাইবার ইচ্ছা। এ বাটী ১লা ডিসেম্বর হইতে জয়পুরের মহারাজা ৩ মাসের জন্য ভাড়া লইতেছে।

তুমি কোঠার ঠিকানায় রামের care-এ চিঠি লিখ। সকল দেশে শ্রীশ্রীপ্রভুর স্থান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ইহাপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল সকল দেশে সকল গ্রামে প্রত্যেক গৃহে প্রত্যেক লোকের হৃদয়ে শ্রীশ্রীপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক, প্রত্যেক বালক-বালিকা নরনারী ঠাকুরের ভাবে অনুপ্রাণিত হউক। তাঁর উদারতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, নিষ্ঠা, আচার সকলের আদর্শ হউক—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা ভাই। এ যুগের প্রত্যেক ব্যক্তির ঠাকুরের সেই কথা মন্ত্র হউক—"এগিয়ে যা, এগিয়ে যা"। দক্ষিণদেশে ভাই কেন, সকল দেশেই বড় বড় মন্দিরের ঐশ্বর্যের অভাব নাই ; সম্প্রদায়ে তো দেশ প্লাবিত, কিন্তু আসল বস্তু লাভের জন্য ব্যাকুলতা বৈরাগ্য কই। সে স্থান একদম ফাঁক। ভাই, তুমি আশীর্বাদ কর যেন তোমার মতো শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস একটু আসে—এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ভাই, আমি যেন মোহ-মায়ায় না ডুবি, অহঙ্কার-অভিমানে আবৃত না হই, একঘেয়ে অন্ধকারে না পড়ি—তাঁর ভক্তের কাছে আমার সদা এই মিনতি। কত সাজে, কত ভাবে মোহ যে ফিরচেন, তা কি আর বলিব! তাই কাতর হয়ে জানাচ্ছি—প্রভু, রক্ষা করুন ; প্রভু, রক্ষা করুন। ভাই ভক্ত ভগবান এক, তাই তোমার কাছে নিবেদন—রক্ষা কর ভাই, এ আঁধারে। মহারাজ ভাল আছেন, আমরা ভাল আছি। তোমার শরীর কেমন আছে জানাইয়া বাধিত করিবে। পরমভক্ত গিরিশবাবুর বাটীতে এ পূজায় মা এসেছিলেন, তাই দর্শনে গিয়াছিলাম। যা দেখিলাম, তা তো অত্যদ্ভুত, আশ্চর্য! যত ভক্তের মেলা! গিরিশবাবুর উপমা গিরিশবাবু। প্রায় রাত্তির ২॥টার সময় পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাকে বলরাম বাবুর বাটী হইতে সন্ধিপূজায় আনিবার জন্য পাল্কি ফিরিয়া আসিল। তার ৫ মিনিট পরে ঠিক সন্ধিপূজার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আসিয়া হাজির। আমরা অবাক! গিরিশবাবু আনন্দে অধীর। আবার অন্য দিকে সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অতি ঘৃণ্য আর পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী একসঙ্গে! এও এক অভিনব দৃশ্য। অঘটনঘটন এক গিরিশবাবুর বাটীতেই সম্ভব দেখিলাম। পূজার সময় হইতেই গিরিশবাবু হাঁপানি ও জ্বরে মাসাধিক খুব ভুগিয়া কিছু ভাল আছেন দেখে এসেছি। দেখিলাম কি সহিষ্ণুতা! কি ধৈর্য! আগামীকল্য মঠের জ্ঞান, সালিখার সুরেন, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শাশুড়ী ও তাঁরা একসঙ্গে ৺রামেশ্বর-দর্শনে যাইতেছে। তুমি যে সকল

সুবিধা নিজেই করিয়া দিবে জানিয়া লিখিতেছি, ইহা বাহুল্য মাত্র। সকল ভক্তগণকে আমাদের ভালবাসা প্রীতিসম্ভাষণ নমস্কারাদি জানাইবে ও তুমি জানিবে। ইতি

দাস বাবুরাম

রবিবার দিন ১১।১২টার সময় এরা পৌঁছাইবে। ২।৪ জনের প্রসাদ ঐদিন রাখিয়া দিও। গোঁসাইজীর শাশুড়ীর কোন কষ্ট না হয় দেখিও। ইতি

(৪)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

কলিকাতা

ভাই শশী,   ২৪. ২. ১৯০৮

তোমার ভালবাসাপূর্ণ কার্ড কাল পাইয়াছি। আমি শ্রীশ্রীপ্রভুর উৎসব উপলক্ষে এখানে কয়েক দিন আছি। মহারাজ ও শরৎ ভায়াও এখানে আছে। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী জয়রামবাটীতে আছেন। শান্তি ও রাম কিছুদিন হইল শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছিল। মঠের সকলে ভাল আছে। সকল ভক্ত ভাল আছেন। কাল নবগোপাল বাবুর বাড়িতে মহোৎসব হয়ে গিয়েছে। আমরা সকলে গিয়াছিলাম। ১২।১৩ দিন হইল এ বাটীতে চণ্ডীর গান হচ্ছে। অনেক ভক্ত আসে। শ্রীশ্রীমার এখন কলিকাতা আসিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁর জন্য বাটী হচ্ছে। তুমি আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি—

দাস বাবুরাম

(৫)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

The Math, Belur P.O. (Howrah)

ভাই শশী,   Dated 22.7.1908

তোমার কার্ড পাইয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীমহারাজের চরণে আমার অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইবে। ওদেশের জলবায়ু তাঁর সহ্য হয়েছে এবং তিনি ভাল আছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি এখন কেমন আছ ও মঠের আর সকলে কেমন আছে লিখিয়া সুখী করিবে। বসন্তের প্রেরিত পুস্তক পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তাহাকে আমার ভালবাসা ও স্নেহসম্ভাষণ জানাইবে। শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার মঙ্গল করুন, এইমাত্র প্রার্থনা।

দেবমাতা কেমন আছেন? যোগিন, কৃষ্ণলাল, নীরদ, সৎবন্ধু প্রত্যেককে আমার ভালবাসা জানাইবে। বৈরাগ্যানন্দ এখানে এসেছে, বেশ ছেলে। কদিন তার একটু অসুখ হয়েছে, শীঘ্রই সেরে যাবে। এখানকার সকলে ভাল আছে। এবার ম্যালেরিয়া খুব কম। কেবল বামুনের ভাই গোপীর ম্যালেরিয়া হয়েছে। গোপালদাদা, তারকদাদা প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বোধ হয় আগামী ২১শে অগ্রহায়ণ এখানে আসিবেন।

তাঁর জন্য কলিকাতায় প্রায় ১০,০০০৲ টাকায় বাড়ি তৈয়ারী হয়েছে। খড়েশ্বর কেদারবাবু জায়গা দিয়াছে। কিন্তু সে বেচারার বড় অসুখ - বোধ হয় ক্ষয়কাশ। মহারাজকে বলিও যে তার রোপিত কাঞ্চনগাছে ২।১টি ফুল হয়েছে। কেলেনডিউলা খুব ফুটেছে—বড় বড় গাছ, খুব বাহার। নানাবিধ সাদা ও বকফুল বিস্তর ফুটেছে। তুমি আমার প্রণাম ভালবাসা জানিবে ও মহারাজজীকে ও আর সকলকে জানাইবে। ইতি

দাস বাবুরাম

(৬)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

The Math, P.O. Belur
Howrah,
Sunday, Dated, 20th. Spt. '08.

ভাই শশী,

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি কতদিনে পুরীতে আসিবে? ভাই, আমার এখন ওদেশে যাইতে ইচ্ছা নাই। যখন তুমি পুরী আসিবে সেই সময় যদি একবার মঠ দর্শন করে যাও তবে আমরাও তোমার দর্শনে পুলকিত হই। তোমার প্রেরিত প্রসাদী বস্ত্র পাইয়াছি। Sister দেবমাতা আমায় এক চিঠি লিখিয়াছেন যে, আমার প্রার্থনায় তিনি খুব বল পাইয়াছেন। এখন তিনি কেমন আছেন? তুমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক প্রীতি জানাইবে। তিনি যাঁর কার্যে মন প্রাণ অর্পণ করেছেন, তিনিই সর্বকালে ও সকল অবস্থায় তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। আমার প্রার্থনা কিছুই নয়। তবে ভাই, প্রভুর ভক্তের অসুখ শুনিলে মন চঞ্চল হয়। যাহারা নিজের দেশ বন্ধু-বান্ধব আচার-ব্যবহার সব ত্যাগ করে শ্রীশ্রীপ্রভুর শরণ নিয়েছে তাহাদের রক্ষার ভার তাঁকে নিতেই হবে, নিশ্চয় নিয়েছেন। ভাই, আমি ভক্তের দাসানুদাস চিরদাস যেন হতে পারি, এই তোমাদের নিকট একান্ত প্রার্থনা। তুমি Sisterকে আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কারাদি জানাইবে।

তুমি কেমন আছ? আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিবে। তারকদাদা দার্জিলিং-এ আছেন। ব্রহ্মচারী সকলকে আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানাইবে। মঠের সকলে ভাল আছে। ইতি

দাস বাবুরাম

ভগিনী নিবেদিতার সমাজচিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

নিবেদিতা ভারতে এই সমন্বয়-প্রতিভা, যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করবার প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও বিচার করে দেখে 'নেশন'গঠন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিমত গড়ে তোলেন। তাঁর মতে প্রত্যেক নেশন দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ঠিক যেমন স্তরের পর স্তর, পলির পর পলি জমে জমে অবশেষে অনেকদিন পর একটি শক্ত পাহাড় গড়ে ওঠে, সেই রকম জাতির পর জাতি এক সভ্যতার পলির উপর অপর সভ্যতার পলি জমে, এক সংস্কৃতির স্তরের ওপর অপর সংস্কৃতির স্তর পুঞ্জীভূত হয়ে ক্রমে একটি নেশন রূপ নেয়।[১০] সেজন্য প্রত্যেক নেশনেরই মূলে আছে বহু বিচিত্র উপাদানের সমাবেশ। আধুনিক মার্কিনজাতিও ইংরেজ, জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির সমাবেশে গঠিত। প্রাচীন মিশরীয় জাতির ভিত্তি অনুসন্ধান করলেও এ প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে।

প্রাচীন বা আধুনিক প্রতিটি জাতির মূলে এইরূপ বিচিত্র উপাদান থাকলেও তাদের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যই বৈচিত্র্যের মধ্যে তার ঐক্যের পরিচায়ক। প্রাচীন মিশরীয় জাতি, ভারতীয় জাতি, আধুনিক আমেরিকান জাতি এদের সকলেরই নিজস্ব কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাই এদের প্রত্যেকটিই এক একটি মহান ঐক্যবদ্ধ মহাশক্তিশালী জাতি। এ ঐক্যের স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন নিবেদিতা—"For as surely as the descent of man is a long story of the gradual dominance of the many parts of the animal body by the specialised brain, so surely does the history of the corporate life reveal a similar process of the growing co-ordination of parts in an organic whole". মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন বহুদিন ধরে গড়ে উঠে মস্তিষ্কের পরিচালনাধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, একটি জাতির জীবনও তেমনি ধীরে ধীরে গড়ে উঠে একটি জৈবিক সমন্বিত জীবনে পরিণত হয়।

নিবেদিতার মতে পূর্বোক্ত বিচিত্র উপাদান সহায়ে একটি নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ একটি 'নেশন' গড়ে তোলার কাজে প্রধান প্রভাব স্থানের। বিচিত্র উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে স্থান—"These miracles of human unification are the work of the place. Man only begins by making his home. His home ends by re-making him.[১১] একটি জাতি-গঠনের মূল বিধান (fundamental law of nation-birth)-এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে—"Any country which is geographically distinct has the power to become the cradle of nationality[১২]। জাতীয় ঐতিহ্য যা জাতিকে স্বাতন্ত্র্য দেয়, গৌরব মহিমা দেয়, দেশবাসীর হৃদয়কে

১০ Civic And National Ideals—p. 34-36

১১ Civic and National Ideals, p. 35

১২ Ibid, p. 36-37

উদ্বুদ্ধ করে তারও স্রষ্টা স্থান। এ বিষয়ে নিবেদিতার মত অত্যন্ত দৃঢ়—"Among all the circumstances that go to create that heritage which is to be the opportunity of the people, there is none so determining, so welding, so shaping in its influence as the factor of the land to which their children shall be native".[১৩]

কোন একটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপর স্থানের অপরিসীম প্রভাব সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন Prof. P. Geddes, যাঁর কথা আমরা পূর্বাধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। Geddes তাঁর নগর ও সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা-বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে এ তত্ত্বের বিস্তার করেছেন।[১৪] তাঁর এই তত্ত্ব আজকের দিনে নগর-পরিকল্পনা ও সমাজ-উন্নয়ন-প্রচেষ্টার পথে অপরিহার্যরূপে সহায়ক বলে বিবেচিত। নিবেদিতা এ তত্ত্বের প্রয়োগকে প্রসারিত করেছেন তাঁর জাতিতত্ত্বের বিশ্লেষণে। ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বিবেকানন্দও তাঁর 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ'-সূচক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রচনায়। তাতে তিনি এক-স্থানে বলছেন—"দেখা গেল এক মানব-গোষ্ঠী, তাহাদের উত্তরে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়, দক্ষিণে দক্ষিণাপথের উষ্ণতা, মধ্যে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ সমতল, সীমাহীন অরণ্য-অঞ্চল, আর তাহারই মধ্য দিয়া দুর্বারগতি নদীসমূহ প্রবাহিত। ...ভারতীয় আবহাওয়া এই জাতির প্রতিভাকে উন্নততর লক্ষ্যে চালিত করিয়াছিল। এ দেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু-ফলপ্রদ। সুতরাং জাতির সমষ্টি-মন সহজেই উন্নত চিন্তার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের বৃহত্তর সমস্যাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল এবং সেইগুলিকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ফলে দার্শনিক ও পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়।"[১৫] এখানে বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন কিভাবে জাতীয় চরিত্রের উপর স্থান প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে বিশেষত্ব-মণ্ডিত করে।

বিবেকানন্দকে অনুসরণ করেই বোধ হয় নিবেদিতা ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের এক অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণনার মাধ্যমে ভারতের জাতীয় চরিত্রগঠনে স্থানের প্রভাব নির্দেশ করবার প্রয়াস পেয়েছেন—"Around her (India's) feet the sapphire seas, with snow-clad mountain-heights behind her head, she sits enthroned. And the races that inhabit the area thus shut in, stand out, as sharply defined as herself, against the Mongolians of the North-east and the Semites of the North-west". —নিবেদিতার বহুবর্ণময় অনুপম ভাষায় ব্যাখ্যানুসারে পদতলে নীলসিন্ধুবেষ্টিত, মস্তকে হিমগিরিচূড়ার তুষার-মুকুট-পরিহিত ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এ দেশের অধিবাসীদের চিন্তায়, ধ্যান-ধারণায়, জীবনাদর্শে একটি বিশিষ্ট ডৌল এনে দিয়েছে। সেই বিশিষ্ট ধারাতেই ভারতীয় জাতির জাতিত্ব নিহিত যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়েছে, কালান্তরের প্রক্রিয়া কত কিছুকে ধ্বংস করেছে, বিপুল রূপান্তরের প্রলেপ কত পরিববর্তন এনেছে, কিন্তু ভারতীয় জাতির বিশিষ্ট ভাবধারা আজও অব্যাহত

১৩ Ibid, p. 36-37

১৪ Cities in Evolution, P. Geddes.

১৫ বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৫৮৬-৫৮৭

আছে। জৈন কিংবা মুসলমানগণ বেদ মানেন না, কিন্তু তাঁরাও ভারতের অধ্যাত্মমুখী জীবন-ধারার দ্বারা প্রভাবিত। ভারতের সকল গোষ্ঠী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাবধারা অনুস্যূত হয়ে আছে। এবং ভারতের সমাজ-বিন্যাসে, জন-জীবনযাপনের ধারায়, সকল মানব গোষ্ঠীর জীবন চর্যায় এই ভাবধারার প্রভাব একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছে। বস্তুতঃ বেদ-উপনিষদের উদার মানবিক ভাবধারার পরিমণ্ডল এ দেশের সমগ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে ঘিরে আছে। শ্রেয়- ও প্রেয়বোধের মধ্যে সংগ্রামই যে মানব-জীবন এবং শ্রেয়োলাভই যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য—এ মত সব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই এক। সামাজিক নীতিবিধান এ ধারণার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। সেজন্য উচ্চ-নীচ, হিন্দু, মুসলমান, জৈন যেকোন সম্প্রদায়ের লোক-গোষ্ঠীর জীবনচর্যায় ঐক্য এসেছে। নিবেদিতার অপূর্ব ব্যাখ্যা তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় নিম্নোক্তরূপ—"Neither Jaina nor Mahomedan admits the authority of the Vedas or the Upanishads, but both are affected by the culture derived from them. Both are marked, as strongly as the Hindu, by a high development of domestic affection, by a delicate range of social observation and criticism and by the conscious admission that the whole of life is to be subordinated to the ethical struggle between inclination and conscience".[১৬] বেদ একমাত্র হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র, কিন্তু সকল ভারতীয়ের জীবন-বেদ এক ও অভিন্ন। শাস্ত্রের মন্দিরের দেবতার পার্থক্য, বিশ্বাস আচরণ রীতির পার্থক্য—সকল পার্থক্যকে অতিক্রম করেছে এই অভিন্ন জীবন-দৃষ্টি। সেজন্যই ভারতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী মিলে মিশে একজাতির সৃষ্টি অতি সহজেই সম্পাদন করতে পেরেছে। নিবেদিতার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তির কাছে তাই ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ভেদ-বৈষম্যই বড় হয়ে দেখা দেয়নি, তার এক অখণ্ড মহিমময় জাতিরূপও ধরা দিয়েছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে আমাদের নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা বিভ্রান্ত, নিবেদিতার এই বিশ্লেষণ আমাদের সকল বিভ্রান্তি দূর করতে সহায়তা করে। নিবেদিতা অতি সুন্দর করে দেখিয়েছেন যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও এক—এ ঐক্য পরিলক্ষিত হয় হৃদয়-বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে এবং উচ্চ-নীচ সকল মানুষের মধ্যে সংযম ও বিবেক-নিয়ন্ত্রিত জীবনের অভিব্যক্তিতে। এ দেশের মানুষের মধ্যে শুধু উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শই ছিল না, ছিল জীবনচর্যায় তার বাস্তব রূপায়ণ, ছিল উচ্চ নৈতিক জীবন সর্বস্তরে সর্বপর্যায়ের মানুষের মধ্যে। আজ আমরা সেই উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শও যেমন হারাতে বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক আদর্শ হতেও আমরা বহুলাংশে চ্যুত হয়েছি—কারণ যেখানে এ সকল উচ্চ আদর্শই নেই, সেখানে তার বাস্তব রূপায়ণের কোন প্রশ্নই তো ওঠে না। সামাজিক আদর্শও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একই ধরনের ছিল—যেমন পরিবারে মাতার সম্মান ছিল অতি উচ্চ, গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অতি সম্মানীয় স্থান ছিল, নারীর শুচিতা, পবিত্রতা, ত্যাগ, মহিমামণ্ডিত উচ্চ আদর্শও সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে একই ছিল। এইভাবে অনুসন্ধান করে নিবেদিতা তাঁর অপূর্ব সমীক্ষা 'Unity of Life and Type in India'-তে একের পর এক ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের সূত্র ও অভিজ্ঞানগুলি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। আজকের

১৬ Civic And National Ideals, p. 40

বিভ্রান্ত ভারতীয় জাতি তার নিজ ঐক্য-ও সংহতি-সন্ধানে ব্যাহত। ভগিনী নিবেদিতার এই সমীক্ষা তাই তার পক্ষে বড় প্রয়োজন। দেশের দৃষ্টি আজ এই সকল আলোচনার ওপর নেই। হয়ত সেজন্য আরও ঘোর দুর্দিন আমাদের ঘিরে ফেলবে। কিন্তু যতদিন পরেই হোক, যখনই হোক, যদি জাতি হিসাবে আমাদের বিনাশ না ঘটে যায়, যদি এ জাতির পুনরুজ্জীবন- ও পুনরুত্থান-প্রয়াস আবার কোন দিন সফলতার সঙ্গে করতে হয়, তাহলে এ জাতির ঐক্যসূত্রের সন্ধানে এই সকল চিন্তা আলোচনা সমীক্ষা ও ব্যাখ্যা পুনরুদ্ধারের কঠিন ব্রত আমাদের নিতে হবে, নূতন করে সেদিন আমাদের নিবেদিতাকে, তাঁর সমাজ-চিন্তা-ধারাকে আবিষ্কার করতে হবে।

জৈবিক বিবর্তন-তত্ত্ব :

নিবেদিতার মতে কোন একটি জাতি একটি জীবদেহের অনুরূপ—একথা প্রসঙ্গক্রমে ইতি-পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য রাজনীতিশাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যেও অনুরূপ ধারণা পাওয়া যায়। প্লেটো, সিসিরো থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে John of Salisbury, Marsiglio, Johannes Althusius প্রভৃতি লেখকেরা রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের তুলনা করেছেন। ১৮৫২ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে এ তত্ত্বকে চরমে নিয়ে যান Bluntschli নামক তদানীন্তন খ্যাতনামা লেখক, যাঁর মতে "State is the very image of human organism".[১৭] তবে এ তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন Herbert Spencer তাঁর 'Principles of Sociology'তে। Spencer-এর এ গ্রন্থখানিতে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বলে আজ মনে করা হয়। Spencer-এর লেখার প্রভাব তখন সুবিস্তৃত। নিবেদিতা ও বিবেকানন্দ উভয়েই Spencer-এর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অবশ্য মৌলিক চিন্তায় অনন্যচিন্তাবিদ্ বিবেকানন্দের Spencer-এর সঙ্গে মত-পার্থক্যও ছিল। ছাত্রজীবনে এ বিষয়ে Spencer-এর সঙ্গে তাঁর কিছু পত্রালাপও হয়েছিল বলে জানা যায়। Spencer একটি সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা একটি 'নেশন'কেও জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নেশনের জীবনের বিবর্তন যে জৈবিক, তা যে যান্ত্রিক নয়, এ বিষয়ে নিবেদিতার নিকট বিবেকানন্দ নিজস্ব মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করেছিলেন নিম্নোক্তরূপে: "কোন জাতির উন্নতি যদি 'ক' রেখায় হতে থাকে আর বহিরাগত শক্তির গতি যদি 'খ' রেখায় হয়, তাহলে তৃতীয় মধ্যবর্তী রেখা 'গ' উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ পরিবর্তন জ্যামিতিক। জাতীয় জীবনের বিবর্তন এরূপ নিয়মে ঘটে না, কারণ যে-কোন জাতির জীবন জৈবিক শক্তির (organic forces) বশবর্তী। সেজন্য যে-কোন জাতির জীবনস্রোতকে তার নিজস্ব গতিপথ ধরেই চলতে দিতে হয়, তাতে তার স্বাভাবিক ও স্বয়ংক্রিয় বিকাশ ঘটে। সেজন্য যে-কোন জাতির জীবনকে উন্নতির পথে পরিবর্তিত করতে হলে তাকে তার নিজস্ব গতিপথেই বলাধান করতে হয়।[১৮]

নিবেদিতা 'নেশন'কে একটি জীবদেহ বলেই শুধু মনে করতেন না, তাঁর মতে একটি নেশন মানবদেহের অনুরূপ। বিষয়টি ব্যাখ্যা

১৭ Garner—Political Science and Govt. -p. 215

১৮ বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃ: ৩১১

করে একস্থলে তিনি বলেছেন—"Many persons use the word unity in a way that would seem to imply that the unity of a lobster, with its monotonous repetition of segments and limbs, was more perfect than that of the human body, which is not even alike on its right and left sides. For my own part, I cannot help thinking that the scientific advance of the nineteenth century has enabled us to think with more complexity than this." আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ, রাষ্ট্র বা নেশনকে একটি জীবদেহ বলে মনে করেন না। তাঁরা এরূপ মতের তীব্র সমালোচনা করেছেন। Herbert Spencer নিজেই একথা স্বীকার করেছেন যে, জীবদেহের সঙ্গে সমাজের তুলনা কোন কোন বিষয়ে করা চলে না, কারণ জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাধীন বা স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই, তাদের অস্তিত্ব সমগ্র জীবদেহের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অংশ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সামগ্রিক জীবন ব্যতীত তাদের একটি স্ব স্ব ক্ষেত্র আছে, সম্পূর্ণ নিজস্ব জীবনের ক্ষেত্র আছে। যে-কোন প্রকার যৌথ জীবন সম্বন্ধেই Spencer-এর একথা সত্য। নেশনের জীবনও সেজন্য সম্পূর্ণ একটি জীবদেহ নয়। কিন্তু Spencer এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে, মানুষের যৌথ জীবন একটি জীবদেহ না হলেও, তার বিকাশ জীবদেহের মতো অভ্যন্তরীণ বিকাশ ; এবং এ বিকাশ সামান্য আরম্ভ হতে শুরু হয়ে ক্রমশঃ জটিলতার পথে চলে, ঠিক যেমন Protoplasm হতে আরম্ভ করে একটি জীবদেহ ক্রমশঃ জটিলগঠনসম্পন্ন হয়ে ওঠে।[১৯] আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা এটুকু স্বীকার করেন যে, যে-কোন সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ একটি নেশনের অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তি। বহিঃশক্তিও অবশ্য সে বিকাশকে প্রভাবিত করে। কিন্তু যদি সকল বহিঃশক্তি কোন একসময়ে স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে কোন সমাজদেহের পরিবর্তন বন্ধ থাকবে না, আপন নিয়মেই তা পরিবর্তিত হবে।[২০] এই অভ্যন্তরীণ বিকাশধর্মিতাই জৈব-বিকাশের অভিজ্ঞান। সেজন্য Spencer এবং তাঁর অনুবর্তিগণ, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা কারও মূল বক্তব্য ভ্রান্ত নয়। একটি সমাজ-জীবন বা নেশনের জীবনকে যদি উন্নতির পথে পরিচালিত করতে হয় তাহলে তাকে তার নিজস্ব গতিপথে বলাধান করতে হবে। ভারতে এ তত্ত্বের পরীক্ষা বারবার হয়ে গিয়েছে। বৌদ্ধযুগে ভগবান বুদ্ধ ভারতকে ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে ভারতে শুধু আধ্যাত্মিকতারই পুনরুজ্জীবন ঘটল না, ঘটল তার সর্বাঙ্গীণ অভ্যুত্থান—ধনে সম্পদে শিল্পে, সাহিত্য-কৃতিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায়, শিক্ষাবিস্তারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ব সাংগঠনিক বিন্যাসে। স্বামী বিবেকানন্দ এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বোঝাবার প্রয়াস করেছেন—ত্যাগ ও মুক্তির আদর্শ, সেবাব্রতই ভারতের জাতীয় আদর্শ।[২১] যদি ভবিষ্যতে ভারতকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে হয়, তাহলে তার জাতীয় জীবনের এই মূল আদর্শ—ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে, এবং আর সব কিছু স্বয়ংসাধিত হবে। এর পরীক্ষা আমরা উনিশ শতাব্দীর নব-জাগরণের কালেও দেখেছি। রামমোহন,

১৯ Spencer—Principles Sociology, Vol. I, Part II, Chapters 3 and 4.

২০ এ তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন P. Sorokin তাঁর Social and Cultural Dynamics-এ।

২১ বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃ. ৩১১

শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সকলেই ভারতের জীবনাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়াস করেছিলেন এবং তারপরেই ভারতে এক অভূতপূর্ব নবজীবন দেখা দিয়েছিল, যার ফলেই আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ঘটেছে।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্বন্ধ

নিবেদিতা-প্রমুখদের এই জৈবিক বিবর্তন-তত্ত্বের ফলশ্রুতি হল এই যে, অতীত ঐতিহ্যের পথ ধরেই একটি জাতিকে অগ্রগতির পথে চলতে হয়। অতীতকে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলা মানে বর্তমানের অগ্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করা। স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মতে অতীত জীবন-ধারাকে পুনঃসঞ্জীবিত করাই নূতনের সৃষ্টির পথে প্রথম কাজ। নিবেদিতা এ তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। Comte-এর একটি সুবিখ্যাত উক্তি—"By the past, through the present, to the future" উদ্ধৃত করে নিবেদিতা বলতে চেয়েছেন যে, যে-কোন জাতিকেই অতীতের উপাদান দিয়ে বর্তমানে বসে ভবিষ্যৎ রচনা করতে হয়। একটি জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এদিক দিয়ে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধযুক্ত। সেজন্য এক অর্থে ভবিষ্যৎ হল অতীতের পুনরাবৃত্তি—"The future repeats the past, in new combinations and in relation to changed problems".[২২] কিন্তু তৎসত্ত্বেও নূতন যুগ সম্পূর্ণ নূতনই, তা না হয়ে সে যদি কেবল পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি হত, তা হলে সে জাতির পক্ষে মৃত্যুর সামিল হত—"That age which is discovering nothing new, is already an age of incipient death."[২৩] কিন্তু নূতনের আগমন সত্ত্বেও পুরাতনের অবসান ঘটে না, নূতনের মধ্যেই পুরাতনের পুনরাবর্তন ঘটে। নূতন যুগে পরিবর্তিত অবস্থার দরুন উদ্ভূত সমস্যাসকল সমাধানের প্রয়াসে যেমন একদিকে নূতন চিন্তার উদ্ভব ঘটে, আবার তেমনই পুরাতন সংস্কৃতির নূতন প্রয়োগও ঘটে, তার মধ্যে নূতন আলো, নূতন অর্থ আবিষ্কৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন বিবেকানন্দ পুরাতন বেদান্তধর্মের মধ্যে নূতন যুগোপযোগী নূতন অর্থ আবিষ্কার করলেন দেখা যায়। তাঁর পূর্বে বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদের বাস্তব প্রয়োগ বৈষম্যহীন এক নূতন সমাজ-গঠনের কথা কেউ চিন্তা করেননি। তিনি এ তত্ত্বকে সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনে প্রয়োগ করবার কথা বলেন। বেদান্তের এ অর্থ পূর্ব পূর্ব যুগে অনাবিষ্কৃত ছিল, নূতন যুগে নূতন সাম্য-সমাজ-প্রতিষ্ঠার সন্ধিক্ষণে যুগপ্রয়োজনেই এর এই নূতন অর্থের আবিষ্কার ঘটলো। এর থেকে নিবেদিতা দেখিয়েছেন যে নূতন যুগে পুরাতন সংস্কৃতির এক নবজাগরণ ঘটে; পুরাতন এই নূতন বেশে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ভারতে উনিশ শতকের নব-জাগরণের প্রাক্কালেও ঠিক তাই ঘটেছিল। ঘোর অন্ধকারময় মধ্যযুগের অবসান ঘটলো রামমোহনের আবির্ভাবে। সেইকালে রাম-মোহনের নূতন চিন্তার দিগন্ত আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু তাঁরও আবির্ভাব পুরাতনের গর্ভ হতেই, পুরাতন ধারায় শিক্ষাদীক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন এবং তিনি যা দিয়েছেন তা নূতন হলেও বেদপ্রতিষ্ঠিত ধর্মই। খ্যাতনামা সাহিত্যিক সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মতে রামমোহন ভারতের নব্যন্যায়-চিন্তাধারার ফলশ্রুতি।[২৪] রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মধ্যে সমগ্র পুরাতন সংস্কৃতি আরও পূর্ণতর রূপে নূতন

২২ Civic And National Ideals—p. 3

২৩ " " " "

২৪ মোহিতলাল: বাংলার নবযুগ—রামমোহন অধ্যায়

কলেবর ধারণ করে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠলো। সেই চিরপুরাতন অথচ সম্পূর্ণ নূতন সজীবের প্রাণচাঞ্চল্য জগৎ প্রত্যক্ষ করল বিবেকানন্দের মধ্যে। তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা অতীতকে অতিক্রমে করে বর্তমানে পৌঁচেছি এবং ভবিষ্যতের পথে উত্তরিত হয়েছি। কিভাবে এটি ঘটেছে এ সম্বন্ধে নিবেদিতার বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। তৎপূর্বে শুধু আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। তা হল এই যে, অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সম্পর্কে নিবেদিতার সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ মনীষী এমন কি বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিনও একমত। এ সম্পর্কে লেনিনের অভিমত উল্লেখ করে জনৈক রুশ লেখক মন্তব্য করেছেন, "According to Lenin, Soviet culture is not an invention of experts, but a logical development of cultural heritage which the proletariat received from the previous generations. Lenin relentlessly flayed the so-called proletkuts who spurned the fixed cultural creations of the past solely on the ground that they were produced in a state-owning landlord or bourgeois society. He called them utopians, detatched from real life and said that their 'queer ideas' were capable of doing irreparable damage of the Soviet State and the people." যারা অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিজেদের বিযুক্ত করতে চান, লেনিন তাদের রুশদেশের নূতন সমাজব্যবস্থার শত্রু বলে অভিহিত করেছেন। অতীতকে মুছে ফেলবার যে-কোন প্রয়াস তাই আত্মহত্যার সামিল। এ কথা বোঝা খুব কঠিন নয়। আদি যুগ হতে ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে এসেছি, অতীতে নানা আয়াসে, নানা সাধনায় আমরা বহু সম্পদ লাভ করেছি, সেইসকল সম্পদকে অস্বীকার করার অর্থ হল আবার নূতন করে শুরু করা। এ কি পশ্চাদপসরণ-প্রয়াস নয়? অতীতের আলেখ্য পশুজীবনের স্মৃতিতে থাকে না, কিন্তু মনুষ্য-জীবনের সেইটিই খুব বড় সম্পদ। ইতিহাসের চেয়ে বড় সম্পদ তার আর নেই। অতীত ঐতিহ্যের চেয়ে বড় গৌরবের কিছু নেই। একথা আজ আমাদের স্মরণ রাখা একান্ত কর্তব্য। (ক্রমশঃ)

পঞ্চবটীমূলে

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা

জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার কালীমন্দিরে নিযুক্ত হয়ে ভরণপোষণের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেও কনিষ্ঠের নির্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে উদাসীনতা লক্ষ্য করে চিন্তিত হন। তিনি দেখতেন—"বালক সকাল-সন্ধ্যা যখন তখন একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পাদচারণ করিতেছে; পঞ্চবটীমূলে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, অথবা পঞ্চবটীর চতুর্দিকে তখন যে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহুক্ষণ পরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে।"

দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্বে কামারপুকুরে অবস্থানকালে তিনি নির্জন শ্মশানে অনেক সময় ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। বাল্যকালেই তিনি বুঝেছিলেন, সংসার অনিত্য—দুঃখকষ্টে পূর্ণ—এর অতীত এক নিরাপদ অচ্যুত আনন্দময় পরম ধাম আছে। তিনি সংকল্প করেছিলেন—এই অনিত্য, দুঃখময় অবস্থার অতীত সেই নিত্য পরম অবস্থা লাভ করতে হবে। মথুরবাবুর একান্ত আগ্রহে তিনি শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজা করতে সহসা সম্মত না হলেও ঘটনা-পরম্পরায় পূজকপদে নিযুক্ত হন। পিতৃতুল্য অগ্রজের আকস্মিক মৃত্যু তাঁর শুদ্ধমনে বৈরাগ্য প্রদীপ্ত করে দিল। "দেখা যায় এই সময় হইতেই তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজায় সমধিক মনোনিবেশপূর্বক, মানব তাঁহার দর্শনলাভে বাস্তবিক কৃতার্থ হয় কিনা তদ্বিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।" বৃথা বাক্যালাপে তিলমাত্র সময় অপব্যয় না করে এবং "রাত্রে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইলে লোকসঙ্গ পরিহারপূর্বক পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার ধ্যানে কালযাপন করিতেন।" জগজ্জননীর দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বর্ধিত হয়ে তীব্র ব্যাকুলতায় পরিণত হল। ঈশ্বরানুরাগের অপরিসীম ভাবাবেগে বাহ্যজগৎ ও নিজদেহ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন হলেন। দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে 'মা দেখা দে' বলে পঞ্চবটীমূলে বা গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ষণ করতেন। সে-আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা বোঝা মানবের সাধ্যাতীত। মায়ের সাক্ষাৎ দর্শনলাভের পর এই পঞ্চবটীতলে মাকে কত রূপে দেখেছেন তিনি।

এই সময়েই শাস্ত্রানুযায়ী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন হওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েক খণ্ড মাটির ডেলা ও টাকা হাতে নিয়ে তিনি বিচার করেছিলেন—"আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি এই বিচার করতে করতে গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম।"

ধর্মপ্রবণ হিন্দুজাতির নিকট জগৎ অনিত্য হওয়ায় ইহজীবনের প্রতি তার স্বাভাবিক অনাসক্তি। তার জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল ভোগবিমুখ সরল অনাড়ম্বর জীবন। মুসলমান রাজত্ব যা করতে সক্ষম হয়নি, ইংরেজ রাজত্বে তা সম্ভব হয়েছে। মুসলমানসভ্যতা আমাদের জীবনের নানাদিক প্রভাবান্বিত করলেও মূল সুর নষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু দু'শ বছর ধরে পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাব মেরু-মজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা অনর্থক আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছি—ভোগসর্বস্ব জীবনকে সার্থক বলে মনে করছি। কাম এবং কাঞ্চন বর্তমানকালের পরমার্থ।

"টাকা না থাকলেই সব মাটি"—এই হল আমাদের এখনকার জীবন। পাশাপাশি মনে পড়ল—পঞ্চবটীর সামনে গঙ্গার ধারে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবের মতো উজ্জ্বলকান্তি এক ব্রাহ্মণ যুবক, তাঁর তিরোধানের পরবর্তী শতকের ভারতের জীবনের বিপরীতমুখী গতিকে লক্ষ্য করেই যেন বলছেন—"টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি।" তাঁর এরূপ করার অর্থ মনে আশা জাগায়—আবার ভারত স্বস্থানে ফিরবে, অর্থের যথাযথ ব্যবহার শিখবে, অর্থের মোহ হতে মুক্ত হবে

"ভাবভক্তির প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানাপ্রকার অদ্ভুত বিকার-পরম্পরা ও দর্শনাদি উপস্থিত হইয়াছিল।" সাধনার প্রারম্ভ হতে গাত্রদাহ ক্রমে অসহ্য হওয়ায় কবিরাজী চিকিৎসা হয়। পরে একদিন পঞ্চবটীতে বসে থাকার সময় দেখলেন—আরক্তলোচন ভীষণাকার এক পুরুষ এবং সৌম্যমূর্তি গৈরিক- ও ত্রিশূল-ধারী এক ব্যক্তি তাঁর শরীর থেকে বহির্গত হল। সৌম্যমূর্তি, ভীষণাকারকে সবলে আক্রমণ করে নিহত করতেই ঠাকুরের ছমাসের বিষম গাত্র-দাহ একেবারে প্রশমিত হল।

দাস্যভক্তি-সাধনকালে পঞ্চবটীতে বসে থাকা অবস্থায় একদিন তাঁর অদ্ভুত দর্শন হয়। লোকললামভূতা, নিরুপমা, জ্যোতির্ময়ী এক প্রতিমা প্রসন্নদৃষ্টিপাতে ঠাকুরের দিকে ধীরপদে অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময় এক হনুমান তাঁর পদপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিত হওয়াতে তিনি উপলব্ধি করলেন 'ইনি রামময়-জীবিতা সীতাদেবী'। সীতাদেবী চকিতে ঠাকুরের শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি বিস্ময়ে ও আনন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন।

অবতারবরিষ্ঠ হয়ে উত্তরকালে যিনি বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার বারি সিঞ্চন করবেন—বিভিন্ন ধর্মের মূল সুর যে একই, ইহা যিনি প্রমাণ করবেন তিনি তাঁর ইষ্টদেবীর মনোহর দর্শনাদিলাভে ক্ষান্ত থাকতে কখনই পারেন না। সুতরাং 'যত মত তত পথ' নিজে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন সাধনায় উদ্যোগী হলেন। তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমি নির্দেশ করে বর্তমান সাধন-কুটীরের পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটি অশ্বত্থচারা রোপণ করেন। হৃদয় বট, অশোক, বেল ও আমলকীর চারা ঠাকুরের নির্দেশে রোপণ করেন। তুলসী ও অপরাজিতার চারা দিয়ে সমগ্র স্থানটি বেষ্টন করান। শ্রীঠাকুরের কথা—'পঞ্চবটীতে তুলসী-কানন করেছিলাম জপ-ধ্যান করব বলে। ব্যাকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হল। তার পরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি ব্যাকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে।'

তন্ত্রসাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরের আহ্বানে কালীবাড়ীতে অবস্থান করেন। "ব্রাহ্মণী নিজকণ্ঠগত রঘুবীরশিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবটীতলে রন্ধনে ব্যাপৃতা হইলেন।" ব্রাহ্মণী নিজ ইষ্ট-দেবতাকে ভোগ নিবেদন করার সময় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। ঠাকুরও ঐ সময় অর্ধবাহ্যদশায় পঞ্চবটীতে উপস্থিত হয়ে নিবেদিত অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণী তাঁকে এই অবস্থায় দেখে অতীব তৃপ্ত এবং আনন্দিত হন, তাঁর ঈশ্বরীয় ভাব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। পঞ্চবটীতলে কয়েক দিন ধরে ঠাকুর আধ্যাত্মিক দর্শনাদি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করেন। ব্রাহ্মণীও বিভিন্ন শাস্ত্রোল্লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর সংশয় ছিন্ন করতে লাগলেন। এইভাবে তাঁদের উভয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতিমূলক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গভীর

আলোচনায় পঞ্চবটীতলে 'দিব্যানন্দের প্রবাহ' বইতে লাগল। শ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন তন্ত্রসাধনায় রত হন। স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীতে ব্রাহ্মণীর নির্দেশ অনুযায়ী পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করেন। পঞ্চবটীতলে জপ, পুরশ্চরণ, ধ্যানাদিতে ঠাকুরের সময় অতিবাহিত হতে লাগল। কয়েক মাস দিনরাত কোথা দিয়ে চলে গেল, এই অদ্ভুত সাধকের তার কোনও হুঁশ রইল না। এই সময় তাঁর বিচিত্র দর্শন এবং অনুভূতি হয়েছিল। শ্রীজগন্মাতার মোহিনীমায়া দর্শন করার ইচ্ছা হওয়াতে দেখেন, এক অপূর্ব সুন্দরী নারী গঙ্গা-গর্ভ হতে পঞ্চবটীতে উঠে এসে ঠাকুরের সম্মুখেই সন্তান প্রসব করে, স্নেহময়ী জননীরূপে আদর করে, পরক্ষণে করালবদনা হয়ে শিশুকে গ্রাস করে গঙ্গাগর্ভে মিলিয়ে গেলেন।

তন্ত্রসাধনায় সকল সিদ্ধি তাঁর করতলগত হল। কিন্তু এই অদ্ভুত যোগীর সকল কাজই অদ্ভুত প্রতিপন্ন হয়েছে। এত বড় অসাধারণ যোগৈশ্বর্যশালী মহামানব অনায়াসে অত্যন্ত সহজভাবে সাধনালব্ধ অনুভূতি নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন—বহিঃপ্রকাশ তার কিছুই রইল না। যদিও দু-চারটি যোগজ সিদ্ধির প্রকাশ আমরা জানতে পারি।

এসময়ে তিনি উপলব্ধি করেন—ভবিষ্যতে বহু লোক ধর্মলাভের জন্য তাঁর সমীপাগত হবে। সন ১২৬৭ সালের শেষ হতে ১২৬৯ সালের শেষ পর্যন্ত তিনি তন্ত্রসাধনা করেছিলেন। এই পঞ্চবটীতলে মাত্র একশ বছর পূর্বে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কত অলৌকিক ঘটনা-সংঘাত, দিব্যদর্শন, ভাবসমাধি, ঈশ্বরবিরহ, জড়ের মতো নির্বিকল্প সমাধি, জগজ্জননীর সহিত বাক্যালাপ—মধুর গদ্‌গদ ভাষণ প্রভৃতি একটির পর একটি চিত্র সৃষ্ট হয়েছিল। সাধনাকালে সমস্ত মন একাগ্র থাকায় বাহ্যজগতের জ্ঞান তাঁর থাকত না। পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে সে অবস্থার দু-একটি উল্লেখ বা আভাসমাত্র সাধারণ্যে প্রচারিত। অবশ্য তাঁর সাধনার তীব্রতা ও ঐকান্তিকতা এবং তাঁর ফলাফল অধিকারিভেদে বিভিন্ন অন্তরঙ্গকে জানিয়েছেন।

কালীবাড়ী-প্রতিষ্ঠার সংবাদ ক্রমে ক্রমে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় গঙ্গাসাগর- ও ৺জগন্নাথ দর্শনপ্রয়াসী পথিক সাধুকুল ক্রমে এস্থানে এসে দু-চারদিন করে রানীর আতিথ্য গ্রহণ করতে লাগলেন। দিশাজঙ্গলের সুবিধা থাকায় এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বহু সাধু সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ প্রভৃতি দলে দলে পদার্পণ করতে থাকেন। তাঁরা সকলেই পঞ্চবটীতলেই আসন করতেন। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে জটাধারী নামে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রামমন্ত্রে দীক্ষিত হন। জটাধারী পঞ্চবটীতেই আসন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহটি সাধুর অত্যন্ত প্রিয় বস্তু—প্রাণের জিনিস। ভাবরাজ্যে গভীরতাপ্রাপ্ত জটাধারী তাঁর ইষ্ট-দেবতার দর্শনাদি পেতেন। কিন্তু তাঁর উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়নি তখনও। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসায় তিনি সাধনার চরম অবস্থা লাভ করে এবং 'রামলালা' বিগ্রহটি ঠাকুরের হাতে দিয়ে সজলনয়নে বিদায় নেন। পঞ্চবটীতলায় ঐ ছোট্ট কুটীরে এবং সংলগ্ন স্থানে এক এক সময় এক এক সম্প্রদায়ের সাধুসন্তর আগমন হত শ্রীভগবানের নামকীর্তন, সাধুদের ধ্যানধারণায় দ্বারা তখন পঞ্চবটীতল গম্‌গম্ করত, বোঝা যায়। মনে হয়, পবিত্র ওঙ্কার-ধ্বনি-শ্রবণপ্রি সুরধুনী, যুগযুগান্তর ধরে ভারতের সাধককুলের মুখনিঃসৃত শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম্যে প্রতিধ্বনিত জাহ্নবী পুনরায় সেই নাম শোনার জন্য যেন দক্ষিণেশ্বর গ্রাম বিধৌত করে চলেছেন।

সমস্ত সাধনার চরম হল অদ্বৈত-সাধনা। জগজ্জননীর নির্দেশে অদ্বৈতভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আরোহণ করেন এই পঞ্চবটীতেই। সে এক আশ্চর্য ইতিহাস! বিরলবৃক্ষলতা বর্তমান পঞ্চবটীকে দেখলে সে ইতিহাস বিশ্বাসই হয় না ইতিহাসপূর্ব যুগে, জানি না সে কতকাল আগে, সন্দীপন মুনির আশ্রমে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু, শিষ্য শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মবিদ্যা উপলব্ধি করিয়েছিলেন; তার আনুপূর্বিক তথ্য কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ভগবান শঙ্করের অদ্বৈত-সাধনার ঐতিহাসিক সত্যতা কাহিনীতে পরিণত। তথাগতের বোধিলাভের ঘটনা বৌদ্ধসাহিত্যের মধ্য দিয়ে নির্গলিত হয়ে যতটুকু আমাদের কাছে আসে তা অসম্পূর্ণ। যেমন আমাদের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক আক্রমণে লুপ্ত হয়ে যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত-সাধনার ইতিহাস 'লীলাপ্রসঙ্গে' রাখা আছে—যদিও যথাযথ বিস্তারিত বহু বিবরণ যা সাধারণের বোধগম্য নয় এবং অপ্রকাশ্যতা অলিখিতই রয়ে গেছে।

সাধনার প্রথম হতেই পঞ্চবটীই সব সময়ের শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়স্থান। দিব্যোন্মত্ততায় জগজ্জননীর দর্শন পান। তারপর তাঁর দ্বারা দেবীর বাহ্যপূজা আর সম্ভব নয় দেখে বুদ্ধিমান মথুরামোহন কালীমন্দিরে অন্য পূজকের ব্যবস্থা করেন। সে-ঈশ্বরতন্ময়তার পরিমাণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। হয় সারাদিন-রাত ভাবে প্রেমে গদ্‌গদ, না হয় পঞ্চবটীতে গভীর ধ্যানে মগ্ন। অদ্বৈত-সাধনার পূর্ব পর্যন্ত যা কিছু তাঁর সাধন, সব পঞ্চবটীতেই। কারণ পঞ্চবটী নির্জন স্থান—সাধারণলোক-চক্ষুর অগোচর। কালীমন্দিরের কর্মচারিবৃন্দ এবং সাধারণ স্নানার্থী গ্রামবাসী ভূতপ্রেতের বাসস্থান পঞ্চবটীর আকাট জঙ্গলে সহসা প্রবেশ করতে সাহসী হত না। "ও হ'ল মাথাপাগলা ভট্‌চাজের পাগলামির জায়গা।" সুতরাং ঠাকুরের পক্ষে নির্বিবাদে নিশ্চিন্তচিত্তে পঞ্চবটীতে থাকা সুগম হয়েছিল। এখনকার পঞ্চবটী হলে কিছু করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

যথাসময়ে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরী এসে উপনীত হলেন। নির্বিকল্প-সমাধিমান ব্রহ্মজ্ঞ গুরু অসাধারণ শিষ্যের সুলক্ষণযুক্ত জ্যোতির্ময় ভাবঘনতনু দৃষ্টে নিজ সাধনালব্ধ সত্যবস্তুরক্ষার হিরণ্ময় পাত্ররূপে তাঁকে লাভ করে উল্লসিত হলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী তিনরাত্রি একাদিক্রমে কোথাও বাস করেন না, সেজন্য শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যাদানের পর সত্বর চলে যাবেন সংকল্প করে ঐ পঞ্চবটীতেই আসন বিস্তার করলেন। যথাসময়ে সন্ন্যাস-গ্রহণের যথোপযুক্ত অনুষ্ঠানাদি গোপনে সমাপন করে সাধনকুটীরে গুরু-শিষ্যে অবস্থান করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মমুহূর্তে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করে গুরু শিষ্যকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিলেন। ভারতের তথা সমগ্র জগতের পথনির্দেশ যিনি করবেন তাঁকে ঋষি-সম্প্রদায়-আচরিত সন্ন্যাসের দীক্ষায় দীক্ষিত করলেন এক ব্রহ্মজ্ঞ গুরু। ভবিষ্যৎ ভারত তার গৌরবময় অতীতের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। স্বামীজীর বাণী—"ভারত তার গৌরব পুনরায় ফিরে পাবে"—ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার দৃষ্টিতে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সম্ভবতঃ তা দেখেছিলেন। বিষয়বিমুখ, ত্যাগব্রতী, ভগবদ্ভাবে পূর্ণ মানবপ্রেমিকের দল এই প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখা হতে নিজ নিজ দীপবর্তিকা জ্বালিয়ে নিয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে—সংসারের দুঃখ-জ্বালায় জর্জরিত মানুষকে শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী শোনাবে, আপাতরমণীয়তার মোহে মুগ্ধ

যারা, তাদের দৃষ্টি স্বস্থানে ফিরিয়ে আনবে। সে কোন এক শুভদিনে পরম লগ্নে সেই পুরাকালের মতোই অতি সামান্য এক পর্ণকুটীরেই যে পরম জ্ঞান ও মহাবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, মূক নির্বাক স্থবির পঞ্চবটীই তার একমাত্র সাক্ষী। আরও আশ্চর্যের কথা - মাত্র একদিনেই তাঁকে সমাধিস্থ হতে দেখে গুরু অতীব বিস্মিত হয়েছিলেন। এর পর তিনি এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেছিলেন গুরু-শিষ্যের আলাপ-আলোচনা, শাস্ত্রবিচার যে ঐ পঞ্চবটীতেই প্রতিদিন বহুক্ষণ ধরে চলত তা লীলাপ্রসঙ্গেই উল্লিখিত আছে। তোতাপুরীর পঞ্চবটীই বাসস্থান, সুতরাং তিনি যে সদাসর্বদা সেখানেই কাটাতেন, ধ্যান-ধারণা, সমাধি সবই তাঁর ঐ স্থানেই হত তা বোঝা যায়।

বেদান্তসাধনার পর ইসলামধর্ম-সাধন। তাঁর নিজ মুখের কথা - "বটতলায় ধ্যান করছি, মা দেখালেন—এক বই দুই নাই। সচ্চিদানন্দই নানা রূপ ধরে রয়েছেন, তিনিই জীবজগৎ সমস্ত হয়েছেন।" ইসলামধর্ম-সাধনার গুরু সুফী গোবিন্দ পঞ্চবটীতেই থাকতেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার বলছেন—রানী রাসমণির কালীবাটীতে তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকিরগণেরও সমাদর ছিল এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগী ব্যক্তিদিগের প্রতি এখানে সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন করা হইত।

ঠাকুরের কালীবাড়ীতে থাকাকালে পঞ্চবটীতলা সকল ধর্মসাধনার সাধক, সিদ্ধ, পরমহংস প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল হয়েছিল। বৈরাগ্যবান যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিকের দল কী এক অজ্ঞাত আকর্ষণে দলে দলে আসতেন, ঠাকুরের প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে নিজ নিজ সাধনার পথ সুগম করে নিতেন—ঠাকুরের শ্রীমুখ হতে বিভিন্ন জায়গায় কথাপ্রসঙ্গে সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধর্মের উদারচরিত চিন্তাশীল ভাবুকমাত্রেই তাঁর চিন্তাধারার অংশ গ্রহণ করবেন বলেই বোধ হয় এই পঞ্চবটী বহু ধর্মসাধনার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল তাঁর সময়ে। ভগবান যীশুর ভাবে তিনদিন অনুপ্রাণিত থাকার পর পঞ্চবটীতেই তাঁর দিব্যদর্শন লাভ করেন।

এই আশ্চর্য উদারচরিত মানুষটির মনের প্রসারতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। বিজ্ঞানের প্রভাবে বিরাট পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে, ভবিষ্যতে আরও ছোট হয়ে যাবে—দূরদূরান্তর মানুষের পক্ষে দূরত্ব কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না। বহুদূর-প্রসারিত দৃষ্টির দ্বারা ধামিক, চিন্তাশীল উচ্চহৃদয়, মানবের জাতিগত, ভাষাগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও উন্নত চিন্তার জগতে ঐক্য-সম্পাদনের জন্য মনে হয় পঞ্চবটীকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বধর্ম-সাধনার মঙ্গলঘট স্থাপন করে বিশ্বজননীর উপাসনা করেছেন।

দক্ষিণের দাক্ষিণ্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅমিয় দত্ত

মাদ্রাজ শহর ছাড়িয়ে মহাবলীপুরমের দিকে মাইল কুড়ি-পঁচিশ আসার পর রাস্তা হঠাৎ যেন সমুদ্রের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে তার গা ঘেঁষে সোজা দক্ষিণে ছুট লাগিয়েছে। কালো ফিতের মত পথের বাঁদিকে অনন্তনীল মহাসমুদ্র আর ডানদিকে গ্রামীণ সাধারণ মানুষদের নারকেল-পাতায়-ছাওয়া কুটীর ও ঢেউখেলানো বালির ওপরে কাজু-বাদামের গাছ এবং তাদের ছায়া দেখতে দেখতে এক সময় মহাবলীপুরমে পৌঁছে গেলাম। আগে এর নাম ছিল 'মামল্লপুরম', এটি ঐতিহাসিক নগরী। পহ্লববংশীয় বিখ্যাত রাজা নরসিংহ বর্মন্ সপ্তম শতকে এই নগরীর গোড়াপত্তন করেন। শহরের কিছুই এখন তেমন অবশিষ্ট নেই। সমুদ্রচুম্বিত 'মামল্লপুরম' এখন তার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর সবকিছু খুইয়ে কয়েকটি অমূল্য ভাস্কর্য-চিহ্নকে কেবল বুকে ধরে অস্তিত্ব বজায়ের জন্যে মহাকালের সঙ্গে পাঞ্জা কষে চলেছে।

বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদে গাইডের দল ছেঁকে ধরলো। তাদের একজনকে সঙ্গে নিলাম। খুব চালাক ছেলে। মুখে ভাঙা ইংরেজীর খই ফুটছে। সেই আমাদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালো। দেখলাম একটা গোটা পাহাড় কেটে মহাভারতীয় এবং ধর্মীয় কোন কোন কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'কম্পোজিশন'টির নাম 'গঙ্গাবতরণ', পৃথিবীর বুকে নেমে আসছেন গঙ্গাদেবী জলপ্রপাতের মত রূপ নিয়ে। তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ঔৎসুক্য, উৎসাহ ও উল্লাস নিয়ে চারদিক থেকে ছুটে এসেছে পশু-পাখি দেব-দানব ও মানব। সকলের নিচে আছে দুটো বৃহদাকার হাতী। তাদের একটা কি ঐরাবত? আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সব-কিছুর রূপ দিয়ে মূক পাথরকেও জীবন্ত করে তুলেছেন পহ্লবীয় শিল্পিগণ, এই কম্পোজিশনটিকেই কেউ কেউ 'অর্জুনের তপস্যা' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এর বিষয়-বস্তু প্রথম নাম-করণেরই সমর্থক বলে আমাদের বিশ্বাস।

এরপর চারটে সাইকেল ভাড়া করে আমরা গাইডের সঙ্গে গেলাম কয়েক ফার্লং দূরে অবস্থিত 'পঞ্চপাণ্ডবের রথ' দেখতে। [প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, দক্ষিণভারতের সর্বত্রই দূরত্ব বোঝাতে 'ফার্লং' শব্দটি ব্যবহার করে ;— আমাদের মত 'মাইল' দিয়ে বোঝায় না।] এক একটি রথের এক একটি নাম—যেমন, 'ধর্মরাজ-রথ', 'ভীম-রথ' ইত্যাদি। প্রত্যেকটি রথ একটি বড় আকারের পাথর কেটে নির্মিত। সাধারণ মন্দিরের পুঙ্খানুপুঙ্খ শিল্প-কৌশল এই রথগুলিকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে. এগুলি পল্লব আমলের সুদক্ষ ভাস্করদের স্মৃতিসাক্ষ্য এখনো বহন করে চলেছে।

রথগুলি দেখে আমরা এলাম সমুদ্রের কাছে। এখানে আর একটি দেখবার মত জিনিস আছে ; সেটি 'সমুদ্র-সৈকতের মন্দির'। কালো পাথর কেটে তৈরী এটি। দুই চূড়া-বিশিষ্ট এই মন্দিরের দেবতা হলেন বিষ্ণু। সমুদ্রের সফেন ঢেউ এই মন্দিরের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে। অনেক সময়েই মন্দিরটিকে

সমুদ্রের বুকে ভাসমান বলে মনে হয়। ঢেউ-এর ওঠা-নামার জন্যে কখনো বা আবার মন্দিরটি নাচন্ত বলে ভ্রমও জন্মায়।

মহাবলীপুরমের আর একটা জিনিস ভালো লেগেছে। সেটা হ'ল এখানকার মানুষদের সততা। গাইডের কথা অনুসারে ভাড়া-করা সাইকেলগুলো ফাঁকা রাস্তায় চাবি খোলা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা পাহাড়ের ওপর দ্রষ্টব্য বিষয় দেখে বেড়ালাম। বারবার ভয় হচ্ছিল পাহারাহীন অরক্ষিত সাইকেলগুলোর জন্যে। পরে ফিরে এসে সবগুলোকেই যথাযথ অবস্থায় বহাল-তবিয়তে থাকতে দেখে এখানকার মানুষদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

সন্ধ্যের দিকে ফিরে এলাম মাদ্রাজ শহরে। ছাত্র বন্ধুটি রাত্রের গাড়ীতে বিদায় নিল। আবার আমরা তিনজন হ'য়ে গেলাম।

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে জুড়ে মাদ্রাজ শহরের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালাম। কখনো গাড়ীতে, কখনো পদযাত্রায়। দেখলাম পৌরভবন, স্টেডিয়াম, চিড়িয়াখানা, প্যারীর মিঠাই তৈরীর কারখানা, বিধানসভা-ভবন, বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যারিনা সমুদ্র-সৈকত, এবং ঘর, বাড়ী, অফিস, বাগান ও দোকান। সমস্ত কিছুতেই রুচি ও পরিচ্ছন্নতার ছাপ। বিশেষ করে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় মনে দাগ কেটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাল ইটের তৈরী রঙ-বেরঙের কাঁচ-বসানো গম্বুজওলা বাড়ীগুলো মন্দির ও গীর্জার আদলে যেন নির্মিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবনে ভারতীয় স্থাপত্যের ছাপ। আধুনিক আমেরিকান স্থাপত্য-শিল্পের একঘেয়েমির ঔদ্ধত্য তাকে স্পর্শ করতে পারে-নি। সামনেই সমুদ্র দুলছে। যেন সমুদ্রের সতর্ক প্রহরার সামনে বেড়ে উঠেছে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। পরিবেশ ও রূপের দিক থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর কোন অংশেই মিল নেই। মাদ্রাজের আর একটা বস্তুও মন কেড়েছে। সেটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই কাছাকাছি বড় রাস্তার 'আইল্যাণ্ডে' রাখা দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর তৈরী একটি বিখ্যাত ব্রোঞ্জ মূর্তি: নাম 'শ্রমের জয়'।

এ তো গেল মাদ্রাজের বস্তু দর্শন। এবার মানুষ। আমরা রিক্সাওয়ালা, দোকানদার, হোটেলমালিক থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক পর্যন্ত অনেকের সঙ্গেই আলাপ করেছি। আলাপের মাধ্যম ইংরেজী,—মনে হয়েছে এখানকার শতকরা নব্বইজনই হিন্দী জানে না, এমন কি বোঝেও না। হিন্দীর বিরুদ্ধে এদেশীয়দের তাই এত উত্তাল বিদ্রোহ। আমাদের সঙ্গে যাঁদের আলাপ হ'ল তাঁরা প্রত্যেকেই সদালাপী। বাঙালী ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের অনেকেই অনন্ত আগ্রহ ও কৌতূহল প্রকাশ করলেন। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, বাংলাদেশের মানুষদের মত মাদ্রাজবাসীরাও একটু বেশীকরেই রাজনীতি-সচেতন।

দক্ষিণভারতে সবচেয়ে যেটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হ'ল বরবর্ণিনীদের পুষ্পপ্রীতি। ফুল এদেশী মেয়েদের কাছে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে.—বিশেষ করে মাদ্রাজের মেয়েদের কাছে। রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-বাজারে, বাড়ীতে-রেস্তোরায় সর্বত্রই এদেশী মেয়েদের পুষ্পাভরণা দেখেছি। ছোটমেয়ে থেকে বৃদ্ধা সধবা রমণী পর্যন্ত রঙীন ফুলের মালা তাদের নিত্য কেশ-প্রসাধনের কাজে লাগায়। জানি না, এই পুষ্পপ্রীতি মদ্র রমণীদের হার্দিক সুষমা-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতখানি

সহায়ক ? এখানকার মেয়েদের বৈশিষ্ট্য তাদের চোখ, চুল ও ভ্রূতে। চোখগুলো টানা টানা। কাজল টেনে আরো বড় করে। ঘনকৃষ্ণ তারা। অপর্যাপ্ত পিঠ-ছাপানো গভীর চুলের রাশি। কালো চিকণ চমৎকার ধনুক-ভ্রূ এদের ঐশ্বর্য। রঙ সাধারণতঃ ময়লা। সব মিলিয়ে দেখলে অবশ্য সৌন্দর্য-শ্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা যায় না।

এখানকার পুরুষদের চুল বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি পাকে। কারণ ঘুরে বেড়ানোর সময় অনেক অল্পবয়স্ক পুরুষদের চুলেই রূপোলী রঙের অভাস ঝিকিয়ে উঠতে দেখেছি। এ-দেশীয় পুরুষ ও নারী উভয়েই পরিশ্রমী। শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে ওরা। সকলেই প্রায় নিরামিষাশী, আগের তুলনায় কুসংস্কারকে অনেক বেশী কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সভ্যতার আলোকে মাদ্রাজ এখন ঝকমকে। বহু পুরুষই লুঙ্গির মত কাপড় না পরে প্যান্ট-সার্টে নিজেদের ঢেকেছে। আর অনেক যুবতীকে দেখলাম কাছা দিয়ে কাপড় না পরে বাঙালী মেয়েদের মত সর্বভারতীয় ঢঙে শাড়ী পড়ছে। ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে মদ্রবাসীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুরাগী। চারিত্রিক ও মানস উজ্জ্বলতার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের প্রভাবকে এঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে চলেছেন। রামকৃষ্ণদেব এবং বিবেকানন্দকে এঁরা প্রাণের মন্দিরে বসিয়েছেন,—আমাদের মত কেবল ঘরের দেওয়ালে ছবি-টাঙানোতেই তার সমাপ্তি নয়। ভারতবর্ষের দু-জন মহাপুরুষ নির্বাচন করতে দিলে এরা অবশ্যই বিবেকানন্দকে বাদ দেবেন না। মহারাষ্ট্রের মানুষেরা যেমন বড় মানুষ বলতে বোঝেন শিবাজী ও নেতাজীকে, এখানকার মানুষজন তেমনি মহাপুরুষ হিসেবে ধ্যান করেন বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণের।

মাদ্রাজ দর্শন শেষ। রাত্রে নীলগিরি এক্সপ্রেসে ভীড় ঠেলে হুড়-মুড়িয়ে উঠলাম, এবার আমাদের গন্তব্যস্থল উটাকামণ্ড। সারা-রাত ট্রেনে কাটলো, সকাল সাতটায় পৌছলাম কোয়েমবাটুরে। মাদ্রাজ প্রদেশের অভিজাত নগর কোয়েমবাটুর। সাজানো-গোছানো শহর। শিক্ষিতের সংখ্যা এখানে বেশী।

বেলা সাড়ে নয়টার সময় মেত্তুপালায়িয়াম স্টেশনে নামলাম। কিছুটা দূরে নীলগিরি পর্বতশ্রেণী আকাশ-মাটি ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। মেত্তুপালায়িয়াম পর্যন্ত বড় গাড়ীর গতি, এরপর চেপে বসলাম মিটার গেজে। ঝিক্ ঝিক্ করে নীল রঙের গাড়ী নীলগিরির বুকবেয়ে ক্রমশঃ ওপরে উঠতে লাগলো। এতদিন ভূগোলের ম্যাপে নিলগিরিকে দেখেছি। মাদ্রাজের মধ্য-পশ্চিম জুড়ে এর অবস্থান। আজ স্বচক্ষে দেখলাম নীলগিরিকে। গাছপালায় আপাদমস্তক ঢাকা পর্বতশ্রেণী দূর থেকে নীলরঙের ব্যঞ্জনা আনে, নীলগিরির নাম সার্থক বলেই মনে হ'ল।

মেত্তুপালায়িয়াম থেকে উটাকামণ্ডের দূরত্ব মাইল বত্রিশেক। পাহাড়গুলোর কোল বেড় দিয়ে এই রাস্তা অতিক্রম করতে সময় লাগলো প্রায় সারে চার ঘণ্টা। এই পথে যেতে প্রচুর চা-বাগান চোখে পড়লো। পথ-চলতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দু চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দিয়ে সব কিছুকে অপূর্ব করে তুললো যেন। ক্রমশই মনে এই অনুভূতি জাগতে লাগলো,—আমরা যেন এক জগৎ ছেড়ে শান্তি-স্বর্গের অন্য এক জগতের বাসিন্দা হতে চলেছি। এই পথে যেতে প্রথম সাজানো পাহাড়ী স্টেশনের নাম 'কুন্নুর'। এইখান থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। গরমের জ্বালা-যন্ত্রণা কুন্নুরের দরজায় এসে কড়া নাড়তে সাহস পায়

না কখনো। শীতলতার হাত ধরে এখানকার মানুষদের নিত্য ঘরকন্না।

কুন্নুরের পর নামকরা স্টেশন 'আরভান-কাডু', 'ওয়েলিংটন', 'কেটি' এবং 'লাভডেল'। তারপরই উটাকামণ্ড ওরফে উটি—ভারতবর্ষের দ্বিতীয় কাশ্মীর। গাড়ী থেকে নামবার পরই ঠাণ্ডাটা অনুভব করতে পারলাম। জুন মাসের কলকাতার গরমের কথা মনে পড়তে এখানকার সদ্য-অনুভূত ঠাণ্ডাকে অবিশ্বাস্য ও স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগলো। কোথায় এসেছি আমরা? সম্পূর্ণ অন্য জগৎ। সমতল ভূমি থেকে সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে নীলগিরি পাহাড় তার বুকের ওপর মানুষকে জায়গা করে দিয়েছে থাকার ও খাওয়ার। আলু-ক্ষেতের পর আলুক্ষেত। থাক থাক সিঁড়ির মত সাজানো, চারদিক ঘিরে মাথা-উঁচানো পাহাড়ের সারি। অজস্র ইউক্যালিপটাসের ঠাস-বুনোনে ঘন সবুজের প্রাচুর্য। বাতাসে ইউক্যালিপটাস পাতার মিষ্টি গন্ধ। চারদিকে সবুজ—সবুজ আর সবুজ। তারই মাঝে নানা জাতের রঙবেরঙের ফুলের ছিটে আর লাল টালির ছাওয়া ঘর। এক কথায় অপূর্ব।

সুন্দরী উটি—ছবির শহর উটি—যৌবনবতী নগরী উটি। তার সুদীর্ঘ লেক, তার মনোরম বোটানিক্যাল গার্ডেন, তার ঘাস-কার্পেটে ঢাকা ঘোড়-দৌড়ের মাঠ, তার সুসজ্জিত দোকানপাট, পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট ও আলো-কোজ্জল হোটেল—এই সব-কিছুকে নিয়ে সে লাবণ্যময়ী। তেরদিন আমরা উটিতে ছিলাম। একবারও একঘেয়ে মনে হয়নি। মনে হ'ল, যেন পলক পড়তে না পড়তে দিনগুলো চলে গেল। প্রকৃতির অকৃপণ দানের ছোঁয়ায় যৌবনকে এখানে ফিরে পাওয়া যায়—প্রাণের স্পন্দনকে অনুভব করা যায়। মেঘেদেরও এখানে তাই চঞ্চল দেখলাম। দেখলাম জুনমাসের জলভর্তি ধোঁয়াটে মেঘের দল কখনো পাহাড়ের গা-গড়িয়ে নিচে নামছে, কখনো বা কোথায় কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে উধাও-লোকে যাত্রা করছে।

বাহান্ন হাজার মানুষের দেশ উটি। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল সব আছে। দুধের লিটার বাষট্টি পয়সা। আর আমাদের মতো সমতল-ভূমির মানুষদের কাছে পরমাশ্চর্য ব্যাপার যেটা, সেটা হ'ল এখানকার লেকের সরকারী মাছের দাম একটাকা পঁচিশ পয়সা কে. জি.। ভ্রমণ-কালীন নিরামিষ ভোজনের শোধ এখানে মাছ খেয়ে তুলে নিয়েছি।

উটাকামণ্ড থেকে মহীশূর। দূরত্ব একশো এক মাইল। যাত্রা করলাম বাসে। পশ্চিমে নীলগিরি পাহাড় ডিঙোতে মাইল ত্রিশেক পথ পাড়ি দিতে হ'ল। নাড়ুভক্কমের পর পাহাড়টা যেখানে প্রায় খাড়াই সাত হাজার ফুট নেমে গেছে, সেখানে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। জীবনে ও-ছবি বড় একটা দেখা যায় না। দুদিকের পাহাড়ের খাদে মেঘ আটকে গেছে। তার এদিক-ওদিকে সূর্যের আলো পড়ে রামধনু-রঙীন মায়াপুরী-পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যে হ'লেও অনুভব করলাম, আমরা স্বর্গরাজ্যে এসে পৌঁচেছি।

সন্ধ্যেবেলা পৌঁছলাম মহীশূর শহরে। লাল মাটির দেশ—হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের দেশ মহীশূর। অতীতের রক্তাক্ত বিপ্লবের চিহ্ন যেন এর গাঢ় লাল রঙের মাটির বুকে আঁকা রয়েছে। এই মাটির ফসল হ'ল ভুট্টা আর ধান। এখানকার মানুষজনের অনেকেই ইসলামধর্মে দীক্ষিত। ভাষা এদের কানাড়ী। সামান্য হ'লেও হিন্দী কিছু কিছু

লোক বোঝে। পুরনো শহর বলে এর দিকে এখন অনাদরের দৃষ্টি, তেমন পরিচ্ছন্ন নয়।

পরদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত টুরিস্ট বাসে চেপে এই শহরের দর্শনীয় যা কিছু দেখলাম— আর্ট গ্যালারী, মহারাজার প্রাসাদ, সরকারী সিল্ক কারখানা, চিড়িয়াখানা, ললিতা মহল, পাথরে তৈরী বিশালবপু ষাঁড়, চামুণ্ডী পাহাড়, টিপুর সমাধি, টিপুর দুর্গ, টিপুর গ্রীষ্ম-কালীন কাঠের তৈরী প্রাসাদ, কাবেরীসংগম, বৃন্দাবন গার্ডেন—কোন কিছুই বাদ দিইনি। শ্রীরঙ্গপত্তনম— টিপুর রাজত্বকালের রাজধানী এখন স্তব্ধ, অতীত ইতিহাসের মূক সাক্ষী। এইসব জায়গা মনকে বড় উদাস করে।

পরদিন আবার বাসে উঠলাম, এবার এলাম মহীশূরের রাজধানী চিরবসন্তের দেশ বাঙ্গালোরে। মহীশূর শহর থেকে নব্বই মাইলের পথ। নক্ষত্রের বেগে ছুটে বাস আমাদের পৌঁছে দিল। তারপর দুদিন ধরে আমরা বাঙ্গালোর শহর টহল দিয়ে বেড়িয়েছি। এর বিরাট প্রাকৃতিক উদ্যান লালবাগ দেখে আনন্দ পেয়েছি— ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের সৌন্দর্যশ্রী-সমুদ্ভাসিত সুবিপুল 'বিধান-সৌধ' দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিধানসভা-ভবন। সবচেয়ে গভীর আনন্দ অনুভব করেছি এই বিধান-সৌধের প্রধান ফটকের একদিকে সযত্নে রক্ষিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিরাট আকারের তৈলচিত্র দেখে। এখানকার মানুষেরা যে প্রাদেশিকতার বিষ-বাষ্পের স্পর্শে কাতর নয়, তা তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও আলোচনা করে বুঝেছি। বাঙ্গালোরের 'হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্' কারখানার বিশাল কর্মোদ্যম এবং বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রমনের সুসজ্জিত গবেষণাগার আমাদের গৌরব এবং বিজ্ঞান-চেতনা উদ্বোধনের সহায়ক। সুপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শহরটি বড় হয়ে উঠছে। কলকাতার মত ব্যস্ততার হাওয়ায় এই রাজধানী শহরটিও দোদুল্যমান। এখানকার নারী-পুরুষেরা গোঁড়ামি কাটিয়ে উঠেছে অনেক। আশ্চর্যের কথা, কলকাতার মেয়েরা যা পারেনি, এখানকার মেয়েরা তা ক'রছে। অনেক মহীশূরের মেয়েই এখন বাসের কণ্ডাকটার।

ছুটি ফুরিয়ে এল। এবার বিদায় নেবার পালা। ঘরে ফেরার ডাক। আবার গতানুগতিক জীবন, ফিরতে মন উঠছে না। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ। তার কতটুকু অংশই বা দেখলাম। দক্ষিণভারতের অনেক কিছুই যে বাকি থেকে গেল! কেরলের মাটি ছুঁতেই পারলাম না। সবচেয়ে বেশী করে ডাক দিচ্ছে কন্যাকুমারিকা—বিবেকানন্দ শিলা। মানসচক্ষে তাকে দেখতে পাচ্ছি;—আলোড়িত ও স্তনিত সমুদ্রের মধ্যে তার উদ্ধত অথচ মৌন অটল রূপ। বিবেকানন্দের গোটা চরিত্রের ছাপ যেন তাতে বাঁধা পড়েছে, মনে মনে বললাম- আসবো, আবার আসবো, অদেখাকে দেখবো, অচেনাকে চিনবো, অরূপের রূপের সাক্ষাৎ পাবো। আজ হয়তো সময় নেই, কিন্তু সময় একদিন আসবেই। যে পরমের দর্শন এখন পেলাম না, একদিন সে-ই আমাদের হাত ধরে তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। কারণ পরমকে আবিষ্কার করতে হয় না, সে নিজে থেকেই ধরা দেয়। তাই আর একবার দাক্ষিণাত্যে আসতেই হবে—এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে, দক্ষিণের দাক্ষিণ্য-পুষ্ট পরিপূর্ণ মন-প্রাণ নিয়ে বাংলাদেশের কোলে ফিরে এলাম।

'ধর্মসংস্থাপনার্থায়'

শ্রীগুরুদাস দাশ

ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়। তিনি দুই নন, বহুও নন। তিনি জন্মমৃত্যুরহিত। তবুও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"—গীতা

অর্থাৎ "জন্মহীন এবং অবিনাশিস্বভাব হয়েও এবং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত ভূতনিবহের ঈশ্বর (নিয়ামক) হয়েও আপন বৈষ্ণবী শক্তিকে বশীভূত করে আত্মমায়াবশে আমাকে 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্মসংস্থাপনার্থায়' যুগে যুগে জন্মপরিগ্রহ করতে হয় এই ধরাধামে।"

এঁদেরই আমরা যুগপুরুষ বা অবতার বলে অভিহিত করি। যুগোপযোগী আচার, নিষ্ঠা সব কিছুই এঁদের মধ্যে থাকে; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এঁদের সৎপথাবলম্বিগণের পরিত্রাণ বা পরিরক্ষণ, পাপকারিগণের বিনাশ আর জগতে ধর্মের সম্যক্ সংস্থাপন। তাই অনুশীলন করলে দেখতে পাওয়া যায়, একাধিক যুগপুরুষ বা মহাপুরুষদের জীবনী, বাণী ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে এক অতি অপূর্ব মিল। অথচ তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণীর মধ্যে দেশকালের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যে সাদৃশ্য রয়েছে তারও বহু প্রমাণ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।"

—গীতা, ১২।১৮

—'শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে সমভাবাপন্ন হও।' আবার যিশুখ্রীষ্ট বলেছেন:

"But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you."···

"That ye may be the children of your Father which is in heaven: for He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust."

"Be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect."

— St. Matthew, 6|44-45,48

—'শত্রুকেও ভালোবাস; যাঁরা তোমাকে অভিসম্পাত করেন তাঁদেরকে আশীর্বাদ কর; যারা তোমাকে ঘৃণা করেন তাঁদের তুমি মঙ্গল কর।'

'তোমরা স্বর্গীয় পিতার সন্তান। তিনি সূর্যকে সদসৎ সকলের উপরই উদিত হতে (আলো বিতরণ করতে) বলেন এবং বৃষ্টিকে পাঠান ন্যায়-অন্যায়কারি-নির্বিশেষে জল দান করতে।'

'স্বর্গস্থিত পূর্ণ পিতার মতোই তোমরা পূর্ণ হও।'

তিনি আবার বলছেন—"Him that cometh to Me I will in no wise cast out."

—John, 6|37

—'যিনি আমার শরণ গ্রহণ করেন, আমি কোনক্রমেই তাঁকে ত্যাগ করি না।' এরই মর্মার্থ খুঁজে পাই সর্বশাস্ত্রসার গীতার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"

—গীতা, ৯।৩১

—'(বাহ্য দুরাচারকে পরিত্যাগ করে আন্তরিক সাধু নিশ্চয়ের সাহায্যে) শীঘ্র ধর্মাত্মা-ই হন এবং নিত্য শান্তিকে প্রাপ্ত হন। হে কুন্তীনন্দন, তুমি পরমার্থ শ্রবণ কর। তুমি ইহা নিশ্চিতরূপে জান যে, আমার ভক্ত (যার অন্তরাত্মা আমাতে সমর্পিত হয়েছে, তিনি) কোন অবস্থাতেই নাশপ্রাপ্ত হন না।'

এখানে তাৎপর্য এই যে, যে-কারণে ধর্ম্যামৃতের অনুষ্ঠান করতে করতে সেই পরমেশ্বরের অতীব প্রিয় হওয়া যায়, সেই কারণে যাঁরা পরমেশ্বরের পরমপদ লাভ করতে ইচ্ছা করেন, এইপ্রকার মুমুক্ষু ব্যক্তিগণই সযত্নে এই ধর্ম্যামৃতের অনুষ্ঠান করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন,—"ধ্যান করবে মনে, কোণে আর বনে"…। রামপ্রসাদ বলছেন—

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন, তুই দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে॥"

এই প্রসঙ্গে যিশুখ্রীষ্টও বলছেন,—"When thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret."

—St. Matthew, 6|6

—'প্রার্থনার সময় তুমি তোমার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর, তারপর দরজা বন্ধ করে তুমি তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা জানাও, কারণ তিনি অতি গোপন।'

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

—গীতা, ৯|২২

"যাঁরা অন্য কার্য থেকে বিরত ও অনবরত ধ্যানপরায়ণ হয়ে সদাসর্বদা আমার উপাসনা করেন, সেই (পরমার্থদর্শী) নিত্যাভিযুক্ত (অনবরত আদরের সহিত আমার ধ্যাননিরত) ব্যক্তিগণের 'যোগ' (যাহা নাই এমন অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি) ও 'ক্ষেম' (সেই লব্ধ বস্তুর প্রতিপালন)-এর ব্যবস্থা আমিই সম্পাদন করে থাকি।"

বাইবেল বলছেন,—"Take no thought saying—what shall we eat ? or, what shall we drink ? or, wherewithal shall we be clothed ?

"(For after all these things do the Gentiles seek :) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

"But seek ye first the Kingdom of God, and His righteousness ; and all these things shall be added unto you."

—St. Matthew, 6|31-33

—'কি খাব, কি পান করব, কে পরিধেয় যোগাবে ইত্যাদি বলে চিন্তাযুক্ত হয়ো না। স্বর্গীয় পিতা (বিশেষরূপেই) অবগত আছেন যে, ঐসকল বস্তু মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজন। কিন্তু তুমি সর্বাগ্রে অনুসন্ধান কর ভগবানের রাজ্য এবং তাঁর ন্যায়ধর্ম। তাহলে সবই তোমার প্রাপ্ত হবে।'

"যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

—গীতা, ১২|৬-৭

—শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যাঁরা সমুদয় কর্ম আমাতে সংন্যস্ত করে মৎপর হয়ে অন্যান্য যোগের সাহায্যে আমাকে ধ্যান করেন, উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে আবেশিতচিত্ত সেই উপাসকগণকে আমি শীঘ্রই মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করি।'

"মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥"

—গীতা, ১৮|৫৮

—'আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার প্রসাদে সকল প্রকার বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করবে। আর যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শুন তাহলে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হবে।' যিশুখ্রীষ্ট বললেন,—

"He ihat believeth on the Son hath everlasting life : and he that believeth not the Son shall not see life ; but the wrath of God abideth on him."

—John, 3136

—'ঈশ্বরের পুত্রে যাঁর আস্থা আছে, তিনি অমর জীবন লাভ করেন, আর যাঁর সেই আস্থা নেই, তাঁর জীবন দেখা হয় না; পরন্তু তাঁর উপর ঈশ্বরের কোপই বর্ষিত হয়।'

"And I give unto them eternal life ; and thy shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." —John, 10/28

—'আমি তাঁদেরকে অনন্ত জীবন দান করি; কখনও তাঁরা বিনাশপ্রাপ্ত হবেন না, এমন কি আমার কাছ থেকে তাঁদেরকে ছিনিয়ে নিতে পারে এরূপ সাধ্য কারও নেই।'

"As many as received Him to them gave He power to become the Sons of God." —John, 1/12

—'যাঁরা তাঁকে গ্রহণ করলেন (সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁকেই গ্রহণ করলেন), তাঁদের তিনি দান করলেন তাঁর পুত্র হবার শক্তি (অর্থাৎ মুক্তিলাভের চাবিকাঠি)।' মোক্ষলাভের চরম উপায় নির্ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

—গীতা, ১৮।৬৫-৬৬

ভক্ত শ্রীভগবানের সত্যপ্রতিজ্ঞত্ব উপলব্ধি করে তাঁর উপর সর্বপ্রকারে আত্মসমর্পণরূপ ভক্তি আরোপ করলে মোক্ষরূপ ফল অবশ্যই লাভ করতে পারবে, ভগবানকেই আশ্রয় করবে, তাঁকেই পরমসহায় বলে অবধারণ করবে—এ জন্যই শ্রীভগান বলছেন, 'আমাতে হৃদয় অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ কর, তাহলে আমাকেই পাবে, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি; তুমি আমার প্রিয়। তুমি সর্বপ্রকার ধর্ম (ধর্মাধর্ম) পরিত্যাগ করে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, তুমি শোক করো না; আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব।'

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যখন যেখানেই তিনি এসেছেন, দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন, শুনিয়েছেন অভয়বাণী, তাকে দিয়েছেন পরম আশ্রয় আর তার সামনে তুলে ধরেছেন অমৃতের খনি! কী অপরিসীম করুণা! আমরা তাঁর জন্য কতটুকু ভাবি? বৎসহারা গাভীর মতো তিনিই তো আমাদের পিছু পিছু ছুটছেন! কবে আমরা তাঁর অভিপ্রেত কর্ম করব! কবে আমরা তাঁর প্রিয় হব !!

নিবেদিতা

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

তুলসীতলায় জ্বলে
সন্ধ্যাদীপশিখা,
তার সেই আত্মনিবেদন
পেয়েছিল তোমার মনন।

কালবৈশাখীর মেঘে
দীপ্ত বজ্রালোকে
মুহূর্তের জ্বলন্ত উদ্ভাস,
পেয়েছে সে তোমারি প্রকাশ।

স্তব্ধ শিব-বক্ষোপরে
মৃত্যুরূপা শ্যামা,
জননীর পাদপীঠস্থান,
তোমারি তো হৃদয়শ্মশান।

নিবেদিতা-স্মরণে

শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী

জন্মসূত্রে বিদেশিনী তুমি
তবু তুমি আমাদেরি—
মনে ভ্রম হয় শিবগতপ্রাণা
সতী এলো দেহ ধরি।
শিবের লাগিয়া সতীর যে তপ,
সে তো পুরাণের কথা,
মূরতি ধরিয়া এলো বুঝি নামি
নব নামে—'নিবেদিতা'।
ভারতের সেবাযজ্ঞে যে দিলে
আত্ম-বিসর্জন,
আত্মাহুতির সেই হোম-শিখা
জ্বলিছে অনির্বাণ।
লোকমাতা তুমি—বিবেক-দুহিতা,
সার্থক তব নাম!
নিবেদিতা-পদে নিবেদি' জীবন
ধন্য করি এ প্রাণ।

রত্ন-সঞ্চয়*

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

(১)

ব্যবহারিক জগতে অত্যন্ত প্রিয়জনকেই গোপনীয় ও আধ্যাত্মিক কথা বলা হয়—বাহিরের লোককে বলিলে গোপনীয়ত্ব গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। তাই, প্রভু, যে রচনাগুলি রচনা করাও, তুমিই অন্তরের অন্তস্তলে বসিয়া শুনিতে থাক- প্রকাশ করিয়া বাহিরের লোককে জানাইবার প্রবৃত্তি দিও না।

(২)

কাহারও প্রাণে যেন কষ্ট না দিই—যদি অজ্ঞানে দিয়া থাকি, তুমি অন্তর্যামী, তুমি সবই অবগত আছ। আমাকে শাস্তি দিয়া অপরাধ কাটাইয়া দিও—যদি কেহ না বুঝিয়া অন্যায় করিয়া আমাকে কষ্ট দিয়া থাকে, তাহাকে ক্ষমা করো।

(৩)

দুঃখ-কষ্টের সময় আমাকে যেন তুমি ছাড়া কেহ না দেখে· যদি কেহ দেখে তাহা হইলে তোমার উপর নিভরতা কমিয়া যাইবে, আমার তোমার পথে অগ্রসর হইতে দেরি হইবে। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

(৪)

আঘাতের উপর আঘাত! এই করিয়া জীবনের বন্ধনগুলি চূর্ণ করিয়া দাও—আঘাত পাইলেই তোমাকে বুঝিবার বা তোমার করুণা অনুভব করিবার শক্তিসঞ্চার হয়—না বুঝিয়া যেন মনে না করি অমঙ্গল হইল। হে মঙ্গলময়, তুমি কখনও অমঙ্গল কর না—আমি যেন মনে করি, যেন অনুভব করি তাহার ভিতরই চিরস্থায়ী মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে।

(৫)

প্রকৃতি দুই ভাবে তাহার সংহারলীলা সাধন করে—

(১) ছুরিকাঘাত করিয়া, (২) কৃপা করিয়া। ছুরিকাঘাত স্থূল শরীরকে কষ্ট দেয়, মনের ভিতরে খুব গভীরভাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু কৃপার আঘাত মর্ম স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বহ্নির ন্যায় পোড়াইতে থাকে—বড় জ্বালাময় অনুতাপ!

(৬)

মৃত্যু না থাকিলে জীবনের মাধুর্য কখনই প্রস্ফুটিত হইত না।

(৭)

পুষ্প তোমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অবদান। তাই তুমি ইহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাস—তোমার অর্ঘ্যরূপে নাও। পুষ্প ফোটে সকলকে আনন্দ দিবার জন্য, আপনাকে বলিদান দিয়। বিশ্বকে গন্ধে মধুময় করিয়া তোলে, শুকাইয়া ঝরিয়া যায়- কোন অশান্তি অনুভব করে না।

(৮)

পুষ্প শুকাইয়া ঝরিয়া যায়, কিন্তু বিশ্ববাসীর আনন্দের জন্য রাখিয়া যায় ইহার গন্ধ। মানবকে ত্যাগ শিক্ষা দেয় না কি? বিশ্ববাসীর ত্যাগই শ্রেষ্ঠ—এই শান্তির পথ।

(৯)

শরণাগতি! দিন, মাস, বর্ষ—জন্ম, মৃত্যু আসিবে ও চলিয়া যাইবে। যখনই বিচার বন্ধ হয়—বুদ্ধি ও অভিমান সংগ্রাম করিয়া পরাজিত হয়, তখনই তোমার কৃপায় তোমার খোঁজ করিতে বাধ্য কর; তবে তুমি তাহা তোমার সময়মত করাও—নিয়তি তোমারই ইচ্ছামত সকলকে চালায়। তোমার শরণাগত না হইলে শান্তির কোন উপায় নাই। প্রভু, দয়া করিয়া শরণাগতি দাও।

* Amiel's Journal হইতে

ভারতপ্রেমিকা ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীমতী সুচরিতা সেনগুপ্তা

এ মহান বিশ্বে যে-সকল নরনারী ত্যাগ, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শে বরেণ্য ও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন, ভারতপ্রেমিকা ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের অন্যতম।

সুদূর আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বদেশী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ, উন্নত এক পরিবারের কন্যাই যে একদিন ভারত-কল্যাণার্থে উৎসর্গিতা হয়ে জগতে আদর্শ স্থাপন করবেন, একথা সেদিন কেউ জানত না। জেনেছিলেন শুধু একজন। জহরী জহর চিনেছিলেন। সে জহরী জগৎপূজ্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। সত্যানুসন্ধিৎসু, প্রতিভাময়ী, সংশয়ব্যাকুলা একটি নারীর সুপ্ত-প্রাণকে জাগ্রত করতে, প্রেরণায় উদ্দীপিত করতে তিনি মহা আহ্বান জানিয়েছিলেন: 'হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো। তোমার মধ্যে জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে। তোমার নিদ্রা সাজে না।' এ আহ্বান মার্গারেটের মনে প্রাণে মহাশক্তি সঞ্চারিত করেছিল। ঈপ্সিত যাত্রা-পথের মহৎনির্দেশ পেয়ে পথপ্রদর্শককে গুরুরূপে মনে মনে সে মুহূর্তেই বরণ করে নিয়েছিলেন।

মার্গারেটের ধ্যানের জগৎ ভারতভূমি। গুরুর দেশই তাঁর সাধনার পীঠস্থান। কিছুকাল ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর একদিন তিনি ভারতের মাটিতে এসে নামলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ, ভিন্ন ধর্ম রীতি নীতি, ভিন্ন আচার-ব্যবহার ভাষা ও সংস্কার বিদেশিনী মার্গারেটকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। তাঁর মানস চিন্তার কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষকে কাছে পেয়েছেন। এই তো তাঁর পরম পাওয়া, পরিতৃপ্তি, আনন্দ।

এক শুভ মুহূর্তে দীক্ষাদানের পর বিবেকানন্দ মার্গারেটের নতুন নাম দিলেন 'নিবেদিতা'। জানিয়ে দিলেন—"ভারতকে ভালবাসতে হলে আগে তোমাকে হতে হবে ভারতীয় নারী।" বললেন—"ভারতের জন্য এখানকার নারীসমাজে একটি শক্তিমতী নারীর প্রয়োজন। তুমিই সেই যোগ্য সিংহীসম মহিলা। তুমিই একাজ পারবে।"

নারী-প্রাণ স্বভাবতই কোমল এবং স্নেহপূর্ণ। নিবেদিতার হৃদয় দয়া, স্নেহ, তেজ, নির্ভীকতা ত্যাগ, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণ-রাশিতে ছিল পরিপূর্ণ। বিবেকানন্দের অভয় বাণী, অনুপ্রেরণা এবং আশীর্বাদ আর নিবেদিতার চারিত্রিক ঐশ্বর্য -এই দুই-এ মিলে যেন অপূর্ব মণিকাঞ্চন সংযোগ হল। এরই উত্তম ফল-স্বরূপ নিবেদিতা এক ভারতীয় নারীতে রূপান্তরিতা হয়েছিলেন।

তাঁকে আমরা দেখেছি সহাস্যমুখে সম্মার্জনীহস্তে ভয়াবহ-প্লেগরোগাক্রান্ত মহা-নগরীর পথে আবর্জনা পরিষ্কার করছেন। কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে কুটিরে প্রবেশ করে মৃতশিশুর শোকাকুলা জননীকে গভীর মমতায় কাছে টেনে নিয়ে অশ্রু মুছিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। মৃত্যুপথ-যাত্রী শিশুর মাতৃসম্বোধনে অভিভূতা, ব্যথাতুরা নিবেদিতা অশ্রু বিসর্জন করছেন। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, নিদ্রামগ্ন মজুরটির যাতে নিদ্রাভঙ্গ না হয় সেদিকে তিনি নিজে সতর্ক থেকে ছাত্রীদেরও সজাগ করে দেন। বিদেশিনী ভগিনী ছিলেন এমনই মমতাময়ী!

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আচার-ব্যবহার

রীতিনীতি ধর্মীয় সংস্কৃতি ইত্যাদিতে -অর্থাৎ জীবনধারার পার্থক্য অনেক। সে দেশের আদর্শের সঙ্গে আমাদের আদর্শের তফাতও কম নয়। বিদেশিনী মার্গারেটের সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে একটি খাঁটি ভারতীয় নারীতে পরিণত হওয়ার মূলে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও শিক্ষা সার্থক প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছিল, একথা অতি সত্য। তেমনি সত্য—নিবেদিতার চরিত্র ছিল বহুগুণ-রাশির একটি সুন্দর সমন্বয়। তাঁর সঙ্গে অল্প পরিচয়ের পরই স্বামীজীর মতো প্রবলব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, সত্যসন্ধানী মহামানব উৎফুল্ল কণ্ঠে বলেছিলেন, "She is the finest flower of my work in England."

তৎকালীন ভারতের নারীসমাজের শিক্ষা-সংস্কারের কাজে নিবেদিতা যে অপূর্ব কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কাছে তখন নারীশিক্ষা মূল্যহীন, অর্থহীন। বরঞ্চ অন্যায় ও দোষাবহ। বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে অদ্ভুত ধৈর্য ও সংযম সহকারে, অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি এ কাজে ধীরে ধীরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হন। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি যেভাবে মেয়েদের শিক্ষাদানের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তা এক মহৎ উদাহরণ। বন্ধ ঘুপচি ঘরের মধ্যে দারুণ গ্রীষ্মের তাপে ও গুমটে ঘেমে নেয়ে উঠতেন। তবু সর্বংসহা, সুখ স্বার্থত্যাগিনী নিবেদিতার সহাস্য মুখখানি সর্বদাই উজ্জ্বল ও মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে থাকত। বিদগ্ধসমাজের, নেতৃস্থানীয় এদেশীয় বিদেশীয় সকলেরই আগমন হত নিবেদিতার ঐ ক্ষুদ্র ঘরটিতে। অনেকে তাঁকে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে স্থানান্তরের উপদেশ ও অনুরোধ করলেও তিনি সেকথায় কর্ণপাত না করে হাসিমুখে উত্তর দিতেন, "This lane has adopted me and I must stay here and nowhere else."

হিন্দু রমণীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরম রমণীয় ও বিনম্র ভাবটি নিবেদিতার চরিত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিল। স্বামীজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি একান্তভাবেই এদেশের ধর্ম, কৃষ্টি, দোষবিমুক্ত সংস্কৃতিকে নিজস্ব বলে গ্রহণ করেন। জপ ধ্যান-ধারণা করতেন নিষ্ঠাভরে। তুলসীতলায় প্রদীপ জেলে প্রণিপাত করা তাঁর প্রাত্যহিক কর্ম ছিল। শ্রীশ্রীসারদামায়ের চরণ স্পর্শ করে এ দেশের মেয়েদের মতো প্রণামও করেছেন ভক্তি সহকারে। শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক জীবনাদর্শ তাঁর ত্যাগপূত জীবনে অত্যুজ্জ্বল মহনীয় দৃষ্টান্ত-স্বরূপও ছিল। শ্রদ্ধাভরে বলেছেন, "To me it has always appeared that she (Sarada Devi) is Sri Ramakrishna's final word as to the ideal of Indian womanhood."—ভারতীয় নারীর আদর্শের পরম ও চরম অভিব্যক্তি ছিলেন শ্রীশ্রীমা। তাঁর সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছিলেন—স্বর্গীয় মাধুর্যের জীবন্ত প্রতিমা। কত শান্ত, নম্র ও কত স্নেহপ্রবণ! তাঁর সরল ও সুসমঞ্জস আচরণ···আমার নিজের ভবিষ্যৎ কার্য-সম্ভাবনাকেও যতখানি সফল করে তুলেছে ততখানি আর কিছুতেই সম্ভব হতে পারত না।

ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা ছিল তাঁর কাছে বড় পবিত্র, যেন একান্ত নিজস্ব। তার ভাল মন্দ দুই দিক বিচার করে সর্বদাই ভালটুকু গ্রহণ করেছেন। অতিসূক্ষ্ম ও উদার দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে এ দেশের অস্পৃশ্যতা, জাতিবিচার ইত্যাদি নানা কুসংস্কারের মূল অনুসন্ধান করেছেন। "এ দেশের প্রত্যেকটি আচার-

অনুষ্ঠানের মধ্যে, শত বাধানিষেধের অন্তরালে কোন যুক্তিসঙ্গত কার্য-কারণ-সম্পর্ক আছে কিনা সেটি আবিষ্কার করতেই সচেষ্ট হতেন নিবেদিতা। লোকাচারের গোঁড়ামি বাহ্যতঃ যত উৎকট বলেই প্রতিভাত হোক, তার পশ্চাতেও যে একটি বহুযুগ-আশ্রিত অপরিহার্য-প্রায় সংস্কারবোধ কাজ করে, সেটি তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হতেন।" পূতসলিলা গঙ্গার পবিত্রতার ধর্মীয় ব্যাখ্যা করতে করতে অভিভূত হতেন।

এদেশের পারিবারিক ধারার নিগূঢ় বিশ্লেষণও করেছেন অপরূপ স্নেহ মমতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। বাঙলা 'ঝি' শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। পরিচারিকাও এদেশের পরিবারের কন্যারূপে আদৃতা! 'গোধূলি' শব্দটির নিগূঢ় তথ্য ও ধ্বনিব্যঞ্জনা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন বহু প্রবন্ধে। তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে ভারতের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ভাষা পর্যন্ত। ভারতের সব কিছুই তাঁর কাছে প্রিয়।

প্রিয় যে, সে প্রিয়ের অতি অবহেলা বা ত্রুটি সহ্য করতে পারে না। ভারতের প্রিয় ভগিনী নিবেদিতাও পারতেন না। ইংরেজী 'line' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ছাত্রীরা বলতে না পারায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—"হায়, তোমরা নিজের মাতৃভাষা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছ!" অবশেষে জনৈকা ছাত্রী অর্থ উদ্ধার করে 'রেখা' বলতে পারায় নিবেদিতা আনন্দ-চঞ্চল কণ্ঠে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো—রেখা! রেখা!"

ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্য দিয়েও মেয়েদের সহজাত স্নেহকোমলতা বা ত্যাগস্বীকার প্রকাশ পেতে দেখলে তিনি খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠতেন। তাঁর একটি কিশোরী ছাত্রী সকলের মধ্যে খাদ্যবণ্টনের পর নিজের জন্য অবশিষ্ট কিছু রাখেনি দেখে প্রথমতঃ বিস্মিত হয়েছিলেন। পরক্ষণেই মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, "এমনি ত্যাগ আর লজ্জা ভারতীয় মেয়েদেরই সহজাত গুণ।"

এমনি ছোট-বড় অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়েই না নিবেদিতা ভারতবর্ষকে চিনেছিলেন, ভারতবাসীর বড় কাছের—বড় আপন হয়েছিলেন। তাঁর 'Web of Indian Life' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি এই পরিচয়েরই নিবিড়তম অন্তরতম নির্মল স্বাক্ষর। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'Nivedita uttered the vital truths about Indian life. She lived and came to know us by becoming one of ourselves'. বলেছিলেন, 'আমাদের সঙ্গে প্রেম-প্রীতিতে একাত্ম হয়ে এই মনস্বিনী নারী আমাদের একান্ত অন্তর-পুরেও প্রবেশ করেছিলেন'

নিবেদিতার মধ্যে আমরা সকল প্রকার উৎকৃষ্ট গুণেরই সমাবেশ দেখেছি। তাঁর চরিত্র যেমন ছিল কোমল স্নেহপূর্ণ মধুর, তেমনি ছিল নির্ভীক তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অতি উজ্জ্বল স্মরণীয় অধ্যায়ে বিশিষ্ট অবদান ছিল তাঁর। আইরিশ বিপ্লবের জ্ঞানসম্পন্না মার্গারেট নোবল এ দেশের বিপ্লবেও নীরব থাকতে পারেননি। ভারতভূমি যে তাঁরই অন্তরাত্মা। স্বামীজীর স্বদেশচেতনা, বীর্যবত্তা এবং তেজস্বিতা নিবেদিতার মনে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে গুপ্তবিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ঋষি অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, সরলাদেবী, বাঘাযতীন, তিলক, গোখেল প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাঁর দেশপ্রেম আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির বিশিষ্ট নেতৃপদ অধিকার করে লিখতেন স্বদেশী আন্দোলনের কথা, জাতীয়তাবাদের মর্মবাণী। রচনায় থাকত শিক্ষাপ্রচারের আলোচনা, ভারতের জনসাধারণের নানাসমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অদ্ভুত কর্মক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়েছেন তখনকার ভারত-জননায়কগণ। লর্ড কার্জনের ভারতবাসীর প্রতি বিদ্রূপ ও মিথ্যাভাষণের যথোচিত প্রতিবাদ পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন তেজস্বিনী ভারতপ্রেমিকা ভগিনী নিবেদিতা। বজ্রনির্ঘোষে প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন—'এ কথা মিথ্যা। সর্বৈব মিথ্যা।' এ প্রসঙ্গে মতিলাল ঘোষ মহাশয় অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেছিলেন, "এই একটিমাত্র ব্যাপারের জন্যই নিবেদিতার কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধনীয়।" নিবেদিতা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নোক্ত উক্তিও মহামূল্যবান এবং বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য: …"ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন, তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমনকি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি না, তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকট করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি না।" কবি গভীর শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেছেন, …"সতী নিবেদিতা দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা যে ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ—ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল; তাহা মোহ ছিল না।"

ভারতের নব জাগরণের হোতা ছিলেন ভারতজননীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর সুযোগ্যা শিষ্যা নিবেদিতাও গুরুর কর্মের, ধর্মের ও মানস চিন্তার প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছেন প্রতিক্ষেত্রে, প্রতিমুহূর্তে। এমনকি ইংলণ্ডে নিজের দেশ পরিভ্রমণের সময়ও তিনি তথাকার নানা পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, সে-সকলই ভারতকে কেন্দ্র করে। "ভারতবর্ষের জীবনদর্শন, পুরাণ, মহাকাব্য তার ইতিহাস, তার সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে।…কি এদেশে, কি বিদেশে উত্তর-বিবেকানন্দ যুগে নিবেদিতার ধ্যানের বস্তু ছিল ভারতবর্ষ, রচনার বিষয় ছিল ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি, কর্মলক্ষ্য ছিল তার শিক্ষা স্বাধীনতা ও নবজাগরণ।"

নিবেদিতার জীবন ছিল সর্বত্যাগিনী তপশ্চারিণীর। ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি সারা বিশ্বের, বিশেষভাবে ভারতের প্রয়োজনে নিবেদিত হয়েছিলেন। নিষ্কাম জীবনের ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য ও পবিত্রতারক্ষার উদ্দেশ্যেই ঐ নাম। ভারতবর্ষকে তিনি প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবেসেছিলেন ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়েছেন: "শ্বাসে শ্বাসে জপ কর নাম—ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা, মা, মা!"

সীতার শুদ্ধ পবিত্রতা, গান্ধারী-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব, ভারতীয় রমণীর ক্ষমা, প্রেম, নিষ্ঠা, নম্রতা, ক্ষত্ররমণীর তেজ, অসীম সাহসিকতা, বলবীর্য নিবেদিতা-চরিত্রের ঐশ্বর্য ছিল। পাথেয় ছিল গীতার উপদেশ—গুরু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥' এ মন্ত্র নিবেদিতার ছিল ধ্যান জ্ঞান জপ তপস্যা। হৃদয় ছিল ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল, প্রেম মাধুর্য ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। তাঁর অন্তর যে মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো—মধুরং, মধুরং, মধুরং, মধুরম্।

কামারপুকুরে আসা

স্বামী বুধানন্দ

গোঘাট, আরামবাগ ছাড়িয়ে তবে কামারপুকুর।

ঘুরে এসো দেশে দেশে, দেখে এসো দুনিয়াটা, হোক না অনেক তাক-লাগানো অভিজ্ঞতা, সব তীর্থাটনের শেষে যখন এসে লুটিয়ে পড়বে শ্রীঅঙ্গনে, মনে হবে, ভাই, কি জানো : যেন একটা কিছু পেয়েছি জীবন্মুক্তির খুব কাছাকাছি।

এসে দেখি ঠাকুর তেমনি বসে আছেন—সাত বছর আগে যেমনটি দেখে গিছলুম—কামারপুকুরে নিজ ঢেঁকিশালের আসনে। ভাবমুখে থাকার মজা এই যে, মুখে আর কিছু বলতে হয় না, ভাবই সব বলে। প্রেমে আড়ষ্ট-ঝংকৃত দেহ। কথা না বলে এমন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-স্বাগত জানাতে আর কেউ জানে না। সব জায়গাতেই তো ছায়া-কায়া হয়ে সঙ্গেই ছিলেন। তবু কামারপুকুরে ঠাকুরকে যেন ঘরোয়া ভাবে পাওয়া যায়। যেন শুধু তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন।

বেলুড় মঠের ঠাকুর যেন দরবারে বসে আছেন। লক্ষ ভক্তের মাঝে তুমি এক ভক্ত। প্রণাম কর, চরণামৃত ধারণ কর। তারপর প্রসাদ নাও সাড়িতে দাঁড়িয়ে। পাওনাটুকু মিলে, উপরিটুকু পাওয়া ভার।

বেলুড় মঠের সেই সব দিন যখন ঠাকুর বাবুরামরূপে প্রেমের আগুন হয়ে "গঙ্গার ধার আলো করে" বেড়াতেন, প্রসাদ নিয়ে ভক্তের পিছু ছুটতেন। সেইসব দিন কি ফিরে আসবে না, ভাই?

কিন্তু কামারপুকুরে, ভাই, তুমি যেন ছোট ছেলেটি। তাই নয় শুধু; ঠাকুরও যেন অল্প বয়সের বয়স্যটি। মুখের ভাবটি এমন, যেন কোন দিন কলকাতা দেখেননি।

শিব-শীর্ষ মন্দিরটি যেন খ'ড়ো ঘরের মর্মর-সখা। হাতে-হাতটি ধরে আম্রছায়ে ধ্যানস্থ।

আর সেই অঙ্গন। বিশ্বপাবনের কত পদস্পর্শ ঐ অঙ্গনে পড়েছে! ঐ মাটিতে আছে অবস্তুর মাঝেকার বস্তু-স্পর্শটি। সে কি রহস্য-কথা—ভাবতে বসলে বিশ্বাস হয় না! সব হয়েও যিনি কিছুতে ধরা দেন না, যিনি অপরিণামী, সেধে এসে কেঁদে গেলেন তোমার জন্যে। ঐ কান্না, বেদ-নিযাস-নির্ঝর বয়ে চলছে মানুষের পতিত জমির ধার দিয়ে। কেউ দেখেছে; কেউ দেখে না।

চন্দ্রামণির ফাই-ফরমাস খাটতে ঐ পা দুখানি কত শতবার ধরিত্রীর বুকে তুলেছে হিল্লোল। ঐ কাব্যকথা আজো মুদ্রিত হয়ে আছে ঐ ধূলিতে। পুরান কবির নব্য-ছন্দ, স্বচ্ছন্দ আসা-যাওয়ার রহস্য-রস, অঙ্গীকার-রক্ষার আগ্ন-স্বাক্ষর সব স্তব্ধ মুখর হয়ে আছে ঐ প্রাঙ্গণে।

এমন কোথায় ফেলবে তুমি পা যেখানে মুক্তি রেখে যাননি লুকিয়ে?

শ্রীঅঙ্গন পেরিয়ে রঘুবীর শীতলা মন্দির। দেশে দেশে দেখে এসো বহু বিরাট মন্দির আর বিপুল বিগ্রহ। রঘুবীর-মন্দিরের মতো শান্ত-

কিশোর কান্ত নশ্বর মন্দির আর দেখতে পাবে না। মন্দিরের নীচু শুভ্র দেহলীতে মাথা লুটালে প্রাণ-মন ভরে যায়। মনে হয় দূরের ভগবান থেকে বহু দূরে, নিভৃতে, এখানে এসেছি আত্মীয়ের কাছে।

আপনার করিয়ে দিতেই এসেছিলেন ঠাকুর, মানবকে ভগবানের কাছে, ভগবানকে মানুষের কাছে, মানুষকে মানুষের কাছে। তাই সাধ্য হয়েও সাধন করে দেখালেন: দেখো, কত কাছে আমি, সব চেয়ে কাছে, সব ছেয়ে কাছে। দূরে সরিয়ে দিয়ে কষ্ট পাচ্ছ কেন, কষ্ট দিচ্ছ কেন? এমন কথাও দিব্যি করে বলেছেন: ···কখনো ভক্ত হয় চুম্বক, আর ভগবান স্থচ। "ভদ্রলোক" হতে পর্যন্ত রাজী হলেন না। ভয়, আপন হওয়ায় যদি কমতি পড়ে!

আমাদের জড়তার উত্তরীয়ে জড়িয়ে আমরা যেন ঠাকুরকে পাথর করে না ফেলি। ঠাকুরকে আমরা বসিয়েছি পাথরের অব্জাসনে। তবু একথা যেন ভুলে না যাই যে, আমাদের ঠাকুর মেঝেতে-বিছানো মাতুরের ওপরে প্রাণের কাছে বসে রস-রঙ্গ করার ঠাকুর।

বাপরে! এমনটি কেমন করে সম্ভব হয়েছিল—এই স্বয়ং-সূর্যের শুকনো ঘাসের ওপরে পা বিছিয়ে বসা? আমাদের স্বভাব যাবে না ম'লে। আমপাতা আমরা গুণবই!

এমনটি হয়, অসম্ভব যখন হন সম্ভব। রস-স্বরূপ রসিয়ে রেখে গেছেন ছোঁয়া দিয়ে প্রতীক-প্রতিমাতে। ভীষণাকে করেছেন শীতলা, রঘুবীরকে কোলের ছেলে, কালী-করালীকে "আমার মা"। শ্মশানে মশানে শবাসনে অনশনে হুতাশন-সাধন নয়, এ তিনটান একটান করে ডাকার সাধন। যিনি সাড়া দিবেন তিনিই ডেকে দেখালেন এমনি করে ডাকলে সাড়া মিলে—আপনার লোক আর এর চেয়ে বেশী কি করে হওয়া চলে!

ঠাকুর সব কিছু কেমন স্নিগ্ধ-ভদ্র করে রেখে গেছেন। এ "দাঁতের আগে মিষ্ট হাসি"-টানার ভদ্রতা নয়। বৈদিক মন্ত্রে ঋষি চোখে-কানে ভদ্র দেখা-শোনার আকুতি জানিয়েছেন। ঐ বৈদিক মন্ত্রার্থ-প্রাপ্তি তন্ত্রের সরায় স্ফটিক-স্বচ্ছ ধারে রেখে গেছেন রঘুবীরের মন্দিরে। এক গণ্ডূষ খেলে মনে হয় আমার মনে-প্রাণে সার এসেছে—কালান্তের সাধন-নির্যাসের ভূমা-ভূতি-বিন্দু।

*

তারপর, আহা ঠাকুরের শয়ন-ঘরটি!

খড়ের ছাউনি—আরণ্যকের অবগুণ্ঠনে ভারতের শাশ্বত আত্ম-স্থিতি কূটস্থ হয়ে আছে শেষ-শয়ান অশেষের যোগ-নিদ্রা, হয়ে আছে যোগ-জাগৃতি—ক্রান্তদর্শনের একান্তে, ছায়া-আলোর উদ্বেল দোলার সৈকতে। মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে: "সাগরের মা" আজো তার (পাঁচকুড়ি আরো কত বয়সের) প্রাণ ঢেলে ঢেলে লেপে। কি বলব, ভাই, এমন ঘর কোথাও দেখিনি—কাঁচ নেই, মোজায়েক নেই, সিমেণ্ট নেই, চুণ নেই, রঙ নেই—তবু কি আভিজাত্য!

মাটির মত সুন্দর যে আর কোন বস্তু নেই—ঠাকুরের শয়ন-ঘরটি দেখলে এ কথাটি প্রাণে গেঁথে যায়। পুষ্প-স্বপ্না মাটির সৌরভ-গাঁথা এখানে নিবিড় শান্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ঘরে ঢুকতে বাঁ দিকে ঐ যে অতটুকুন বারান্দা—বসে পড়, ভাই, বসে পড় ঐ জায়গাটিতে। ধ্যান দিয়ে গড়া ঐ জায়গাটি—অনন্ত এসেছেন সান্তের অতিথি। ভগবান সহজ হয়ে পড়ে আছেন মানুষের দুয়ারে ধন্না দিয়ে।

মানুষ নিরাপত্তা এত খোঁজে, খুঁজে খুঁজে সব আপদ ডেকে আনে। বোঝে না—শান্ত হয়ে ভগবৎ-অঙ্গনে বসতে হয়। সহজকে আমরা কঠিন পথে পেতে চাই— বুদ্ধির আমাদের এত ঔদ্ধত্য। ঠাকুরের শয়নঘরের বারান্দায়, ঘরের কোণটিতে ধ্বনিত হচ্ছে সে কী এক প্রাণ-বাণী : সরল হও, সহজ হও, খাটি হও, মাটির মানুষ হও।

ঠাকুর টাকা-মাটি মাটি-টাকা করলেন কেন? বুঝিয়ে দিলেন অবস্তু নিলে বস্তু খোয়াবে। বস্তু যদি নাও, অবস্তু বলে কিছু নেই। তাঁকে পেলে জানা যায় তিনিই সব হয়েছেন। মা-কে পেলে মায়া হচ্ছে মায়ের আসা, মায়ের ভাষা, মায়ের হাসা।

ঠাকুর কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়ে রেখে গেলেন না কেন? কারণ মাটিই যে সোনা। হয়ে দেখো মাটি, সোনায় তোমার মূল্য ধরে কি না। যদি হতে চাও, পেতে চাও, পুঁতে রাখতে চাও সোনা, সব মাটি করবে। মাটির মানুষ হও—সব পাবে।

উঁচু জমিতে কি কৃপার জল জমে?

নীচু হয়েছিলেন নাগ মহাশয়। একেবারে মাটির মতো। তাতেই হয়েছিলেন অমন মহাশক্তিধর পুরুষ। ঠাকুরের দেহের রোগ টেনে নিতে উদ্যত হয়েছিলেন নিজ দেহে। "তুমি পারবে" বলে ঠাকুর থামলেন। লীলা বানচাল করে দিয়েছিলেন আর কি মাটির মানুষ নাগ মহাশয়! এমন খাঁটিই হয়েছিলেন যে, ঘরের পাশে গঙ্গা হলেন স্ফুরিত তাঁর বাণীর মূল্য দিতে।

ঠাকুরের ঐ বনে-পাওয়া খড়ে ছাওয়া মাটির শয়নঘরে ঢুকেছে আজকের এক ফাজিল ছেলে— ফচকেমি করতে! বিজলি-আলোটির কথা বলছি। ক্ষুদিরামের ঘরের স্বয়ম্প্রভটি, আলো-আঁধারের পারে "বস্তু"টি বড়ই ছন্দ-বিলাসী আধুনিক।

সব কিছুকে সুন্দরে বিন্যাস-চয়নে ধরে দেয় যা, কিছুকেই বাদ দেয় না, তাই ছন্দ। যিনি ধ্যানলীন শান্তং শিবং, তিনিই নটরাজ সুন্দরম্।

কি নেবে, কি ফেলবে? "আমি সব নিই"—প্রভুর নব্য বেদবাক্য। তা না হলে ওজনে কম পড়বে যে! আর তাতেই তো তোমার-আমার ভরসা। এখন ক্ষ্যাপা মায়ের বাউণ্ডুলে ছেলের মতো চোখ পিট পিট করে বলতে পারি : এখন কথা রাখ, বলেছিলে না, —"আমি সব নিই"—এখন ফেলবে কি করে!

সব না নিলে কৃপার অর্থ হয় না। তাঁকে সব নিতে—পালতেই হবে।

নিজেই তো বলেছেন—পাড়ার লোক এসে পালবে নাকি তোমার ছেলেদের?

আর এক দিক আছে। অনেকে ভারিক্কি হয়ে ভাবেন ওজন বাড়াচ্ছেন। পান খাইনে, তাই বড় তপস্বী হয়েছি। মাছ খাইনে, তাই শুদ্ধসত্ত্ব! ঠাকুর একটু হালকা ভাবের আমেজ মিশিয়ে বাণীপূর্তি করলেন।

এইটুকু করেছেন বলেই ঠাকুরের কথা হয়েছে অমৃত। পরন্তু অনেক ধর্ম-শিক্ষকের কথা যেন পাঁচনের মতো—নাক না টিপে গেলার উপায় নেই। ঠাকুরের কড়া কথাও কড়া-ভাজা জিলিপির মতো—মিষ্টি, মচমচে।

আমাকে যে চোখ রাঙাও, আমি করি কি? একপো ঘটি নিয়ে যে সব "কারবার"।

আমাদের এ দুঃখটি ঠাকুরের মতো আর কেউ বোঝেন নি। "হালকা ভাবে"র অঙ্গীকারটি যে আমাদের ত্রস্ত ললাটে প্রভুর নিজ হাতে দেওয়া কৃপার অশ্রু-তিলক।

এইটি ভুল বুঝে আমরা যদি ইতর ব'নে না যাই, আদার ব্যাপারী হয়েও আমরা মহা

সমুদ্রের খোঁজ রাখবার স্পর্ধা করতে পারবো।

"কালোঽস্মি" বলেছেন প্রভু কৃষ্ণাবতারে। শেওলা-পরা "পোদোর" সেই প'ড়ো মন্দিরেই কি শুধু বসে আছেন ভগবান, নেই কি তিনি ঐ বনভোজনে যেখানে ফড়িং-এর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে অশান্ত কিশলয়গুলি? নেই কি তিনি কলকারখানার হট্টগোলে?

ঐ যে বারুদের কারখানার পাশে পঞ্চমুণ্ডীর আসন পেতেছিলেন, তার অর্থ আছে। গঙ্গা-তীরে বাস, কিন্তু আনাগোনা কলকাতায়। এই হল পুরানো কবির আধুনিকতা।

বনানীতে তত্ত্বমসি নয়। হেঁশেল আগলে বসে রইলেন অর্ধ-শতাব্দী ধরে আমাদের মা—ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিতে রেঁধে খাওয়ালেন পরমান্ন। "পিঁপড়ে"র মুখের কাছে সস্নেহে সগৌরবে তুলে ধরলেন অমৃত-কণা। এমনটি আর কে করেছে?

দেব-নন্দিতা অলকানন্দা যদি স্লুইস-গেটের ভেতর দিয়ে এসে আমাদের ধানের ক্ষেতে শস্য ফলায়, তার পাবনী শক্তির কি হানি হয় তাতে?

অন্নপূর্ণা না হয়ে মা কি মোক্ষদ্বার-কপাট-পাটনকরী হতে পারেন?

"ছায়া-কায়া" হয়ে ঠাকুর আছেন তাই দোকানে, দেবালয়ে, কারখানায়, রঙ্গালয়ে, মানুষের সকল জীবিকা-শিক্ষা আর রসায়তনে। সব নিয়েছিলেন বলেই সবাই তাঁকে নিতে পেরেছে।

শুধু ভারতেই নয়। গিয়ে দেখ দেশে দেশে: ঠাকুরকে ওঁরা কি ভালই বাসছে।

নৃত্য, রসিকতা, সমাধি, মশলার বেটুয়া, বার্নিসের চটি, লালপেড়ে ধুতি, পান খেয়ে লাল-করা ঠোঁট: এ কেমনতর অবতার? দেখতে পাও না এ আপনার হওয়ার, আপনার করে নেওয়ার ফিকির? মিশে যাওয়াই শুধু কথা নয়। মিশে গিয়ে উঠিয়ে নেওয়াটি কথা। "পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে"ও কেমন করে হাসতে হয়, সে কৌশল শেখাতেই এ অবতারে এসেছেন তিনি।

আগের যুগে যুদ্ধ করে ধর্মস্থাপন করতে হয়েছিল। এবার হল নেচে, হেসে, কেঁদে, ভালবেসে।

ভগবান কত সহজ হয়ে এসেছেন ভাবতে বসলে মূর্ছা যেতে হয়। আজকের দিনকে পেছনে রেখে বিগত দিনের জন্যে আক্ষেপ করো না: এই যে এসেছেন তাঁকে চোখভরে, প্রাণভরে, জীবনভরে দেখতে হয়। নিজেই বলেছিলেন: "ঘরে আনতে হয়।"

ঘরে চড়াও হয়ে বলছেন: "ঘরে আনতে হয়।" তবু আমাদের চোখ খোলে না। সহজ কেন কঠিন হয়ে আসেননি সে জন্যে তর্ক জড়াই। বিপরীত বুদ্ধি আর কাকে বলে। বগলতলায় কাপড় নিয়ে বেড়ালেন, একটু আব্রু রাখলেন না, তবু বুঝলে না, চিনলে না এ দিগম্বর কে?

রস-স্বরূপ কি বেরসিক হতে পারেন? হাত-পাখা জলে ভিজিয়ে হাওয়া করতে বলায় অশ্বিনীকুমার টিপ্পনী কেটেছিলেন: "আপনার দেখি আবার সখও আছে!" "কেন থাকবেনি সখ," বলেছিলেন তিনি।

ঠাকুরের শয়নঘরে বিজলিবাতি দেখলে পান খেয়ে লালকরা ঠোঁটে ফোটা ঐ হাসির সৌরভটির কথাই মনে পড়ে। "কেন থাকবেনি সখ!"

ভব্যকে নব্যকে যারা সন্দেহের দ্বিধা-কুঞ্চিত দৃষ্টিতে দেখে, তারা ভুলে যায় যে, তিনি সব কিছু হয়েছেন—নিয়েছেন। তিনি যদি সব কিছু হয়ে নিয়ে থাকেন, আমরা বাদ দেবার কে?

এক দর্শন আছে যার আদি-অন্ত কথা: সব

ঠিক হ্যায়! তিনি সব হয়েছেন বলেই "সব ঠিক হ্যায়"। ক্ষুদ্রতার জ্বালা-সমস্যা ক্ষুদ্রতার ওষুধে ঘুচবে না। সংঘাতকে আঘাত করো অভীঃ-ঔদার্যে। ভূমাচ্যুত হয়ে স্বারাজ্যের অধিকারী আস্তানা পেড়েছি ক্ষুদ্রতার খুপড়িতে -ভয় দুঃখ যাবে কি করে? চলবে না, নড়বে না, ভালবাসবে না নূতনকে, অজানাকে করবে না স্বাগত, —দুঃখ তোমাদের যাবে কি করে? আহা! স্বামীজীকে কি ক্রান্ত-কমনীয়-প্রেম-দৃষ্টি দিয়ে গেলেন ঠাকুর! বললেন কিনাঃ আমার মূর্খ ভগবান, লোচ্চা ভগবান। স্বামীজীর কী সর্বগ্রাসী ভক্তি

লোচ্চামি যে করে বেড়াচ্ছে সে ভগবানই, এটি না বুঝলে বিশ্বনাটকের প্রথম অঙ্কও বোঝা চলে না। তা ছাড়া আরো তো রয়ে গেছে কত রহস্য।

অনন্তকে আমরা অজ্ঞানের ক্ষুদ্রতায় বন্দী করার ব্যর্থ প্রয়াস করে ভাবি ধর্মকে আমরা বুঝেছি! ঠাকুর ভেঙে রেখে গেছেন সব আগল-পাঁচিল। সবকে নেবেন বলেই এমনটি করা হয়েছে। লীলাবসানের পূর্বে হীরানন্দের কাছে পায়জামা পরতে চাওয়া হয়েছিল!

এই সখের ঠাকুরকে বুঝতে হলে সবার হাত ধরতে হবে, সবাইকে প্রেম দিতে হবে, প্রাণ দিতে হবে অঞ্জলিভরে সবার পায়ে। যিনি নিজ কুন্তলে মেথরের পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন, তাঁর প্রেমের অন্নে সবার অবার অধিকার। যদি ভাবো ঠাকুরের পাথরের বেদীর খুব কাছে ঠেসে বসেছ বলে তাঁর প্রেমের অন্নে তোমার বেশী অধিকার, ভুল বুঝবে।

*

বেড়াচ্ছেন সবার অন্ন জুগিয়ে। মাণিক রাজার আমবাগানে প্রভুর রঙ্গ-কাননে আজ বসেছে বিদ্যাবন। সাঁওতাল-ছেলেরা মহুয়া-বনের পলাশপথ বেয়ে এসে পৌঁচেছে এই বিদ্যাবনে, শিক্ষায়তনে। চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে নিজে নিলেন না, তবু সারা দেশময় তার ব্যবস্থা করে বেড়াচ্ছেন। কেন? কারণ, খালি পেটে ধর্ম হয় না। ধর্ম করাতে হলে আগে পেটে দিতে হবে ক্ষুধার অন্ন। ক্ষুধা যাদের মেটেনি, ক্ষুরধার বর্গে তারা চলবে কি করে?

পেটে অন্ন পড়লে চালও বদলাবে, বাড়বে সৌষ্ঠব। ঐ যারা খেতে পায় না পড়তে পায় না, লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু শিশু নরনারী যারা পেটে পিঠে এক হয়ে ভ্রাম্যমাণ কঙ্কালের মতো দিশেহারা হয়ে দেশময় ঘুরে বেড়ায়— তাদের কাছে বেদ-বেদান্তের চেয়ে, নৃত্যকলার চেয়ে অন্নের দাম যে অনেক বেশী প্রভুর মতো হৃদয় দিয়ে একথা কেউ অনুভব করেননি— তাই পেটের অন্ন জোগাতে এত তৎপর।

তা না হলে সবই যে হবে সরষে ফুল!

যাদের অন্ন নেই, ক্রমে তারা চোখে কানে ভদ্র দেখাশোনার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এ শক্তিনাশের চেয়ে বড় দুর্গতি মানুষের আর কিছু নেই। তাই সবহারাদের অন্ন পাইয়ে দেওয়ার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। ধর্মক্ষেত্র কামারপুকুরে আজ তাই বহুমুখী নানা বিদ্যায়তনের উদ্গতি।

এরা আগে কলরব করতে শিখুক। তারপর শান্ত হবে। এদের খেতে দাও, পরতে দাও, পড়তে দাও, দাও একটু ভোগবিলাস করতে— অশনে, ব্যসনে, দেহে-মনে এরা জাগুক, এদের হোক অভ্যুদয়।

মৃত্যুর শৃঙ্খলায় এদের ভব্য করে রেখো না। জাগরণের প্রাণপ্রাচুর্যে এদের হতে দাও বে-পরোয়া। জীব যদি সজীবই না হয় শিব হবে কি করে? শিবকে যদি স্বীকার করে থাকো, জীবের ভোগের অন্ন যোগাও।

ঠাকুরের 'জীব শিব' মন্ত্রটিই যুগধর্ম।

কত করুণা করে বলেছেন: ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না। আর তুমি কেন ছুটছ পুতুলঘর ভাঙতে, ছিনিয়ে নিতে রঙীন বেলুন, শিশুর মুখের চুষি আর কিশোর হাতের মুরকির মোয়া?

চাল-কলা বড় কথা নয়। কিন্তু চাল-কলা না জুটলে বড় কথা বলবার জো নেই।

ঠাকুর-স্বামীজীর এ শিক্ষাটি যদি স্বাধীন ভারত মেনে নিত সকাল-বেলায়, আজ দিন-দুপুরে দেশের হত না এত দুঃখ দুর্গতি। এখনো শিখে নাও, মেনে নাও, বেঁচে যাবে। তা না হলে মরে তো আছোই।

ঠাকুর স্বরে নাবলেন না, অথচ দূরেও রইলেন না সরে। ভগবানকে ছোট করা চলে না, হতে হয় না। কণাতেও তিনি বিভু হয়ে আছেন। অণুর অন্তরাত্মায় ঝলমল সহস্র সূর্যকে স্তুতি করলেন কী সুগভীর সমবেদনায়: খালি পেটে ধর্ম হয় না।

পেটের খবরটি আত্মীয়ই শুধু নেন। সাধন-চতুষ্টয়ের কথা বলে মেরুদণ্ড সোজা করে নাসাগ্রে দৃষ্টি রেখে বসে রইলেন না। হেঁশেলে ঢুকে তত্ত্ব করলেন চালডাল আছে কিনা হাঁড়িতে। দরদী না হলে এ খোঁজটা কে করে? এই প্রেমিকের জন্যে এক-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হয়। একেই বলেছেন সাধন।

তুমি যদি বন্দিশালায় থাক, না খেতে দিলে তোমার হবে মুক্তি না মৃত্যু? খেতে দিয়ে তোমার পেশীতে শক্তির জোয়ার বইয়ে দিলে একদিন তুমি আপন দুর্ধর্ষতায় বন্দিশালার পাঁচিল ভেঙে বেরিয়ে আসবে মুক্তির উন্মুক্ত প্রান্তরে।

তার জন্যেই এত ফন্দি-ফিকির, বন্দিশিবিরে নানা হানা। চালকলাবাঁধা বিত্তের ব্যবস্থা।

এমন আসে অনেক ভক্ত হাজারে হাজারে দেশদেশান্তর থেকে যারা চাল-কলার সন্ধানী নয়। তারা আসে সংসারের সঙ দেখে হদ্দ হয়ে সার খুঁজতে। আমগাছটির ছায়ায় একটু বসতে-জুড়োতে। ঠাকুরের নিজের হাতের লাগানো আমগাছের ছায়ায়।

কিছু তারা চায় না চিন্তামণির নাচদুয়ারে। শুধু একটু ভক্তি-প্রসাদ, একটু ভালবাসার শক্তি, একটু সন্মতি, একটু উর্ধ্বগতি। জ্বালা নিয়ে আসে, শান্তি নিয়ে ফিরে যায়; শ্রান্তি নিয়ে আসে, নিয়ে যায় কান্তি; ভ্রান্তি নিয়ে আসে, ফিরে যায় স্মৃতি-ধৃতি নিয়ে। দিশারী কোন দিশেহারাদের কোত্থেকে ধরে নিয়ে আসেন। কুঠির ওপর থেকে ঐ যে বলা হয়েছিল: ওরে, তোদের ছাড়া থাকতে পারিনে, তোরা সব আয়! ভগবানের সে ডাক উদাসী প্রেমিক মানুষের মানস-নগরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, দিন-দুপুরে সাঁঝে রাতে প্রাতে, অনুপ্রেরণা হয়ে ধরে নিয়ে আসে মহাপ্রাপ্তির উর্ধ্ব মার্গে।

দায় কি আর তোমার আমার! যাঁর দয়া তাঁর, যাঁর মায়া তাঁর। তাই কৃপার এত ছড়াছড়ি। একবারটি এসে যাও দেখবে যে, বাসে চড়েও বৈকুণ্ঠে আসা চলে!

কামারপুকুরে একবার এসে গেলে শুধুহাতে কেউ ফিরে যায় না। তবে এসে যাওয়া চাই।

মা বলেছেন ধ্যান করতে না পারো ঠাকুরের ছায়া-কায়ার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেই চলবে। ঠাকুর নিজেই বলেছেন: সবটা মন গুটিয়ে যদি এটির ওপর দিলে, আর বাকি রইল কি? ন্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে মুখের কাছে ধরে দিচ্ছেন—এত আকুতি!

ধ্যান করতে পারিনে—এটাই সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য নয়। এই যে ধেয়ে ধেয়ে ধেয়ে আসেন

আর তবু তাঁকে দিই না আন্তর-স্বীকৃতি—এটাই হল নিদারুণ দুর্ভাগ্য।

কোন কোন ভক্ত এত সেয়ানা যে, চাতালে বসে বসে শুধু চেয়ে থাকে ঠাকুরের দিকে। ভক্তের ভগবানের দিকে ঐ চেয়ে-থাকাটুকু এমনি এক অলিখিত মহাকাব্য যে, পড়ে শেষ করা যায় না। আন্তর-জীবনে কত লঙ্কাকাণ্ড, কত কুরুক্ষেত্রের পর এই চেয়ে-থাকাটুকু পাওয়া গেছে তার ইতিহাস কে জানে! তুচ্ছতার তেপান্তরে ব্যর্থতার চোরা বালিতে আটকে-পড়া অসহায়কে কৃপা-ঘূর্ণি হয়ে উড়িয়ে নিয়ে আসেন মুক্তিহীন অছিলায়। ধরে এনে বসিয়ে রেখে এই যে চেয়ে-থাকাটুকু করিয়ে নেনে, এই হল উত্তম-বৈদ্যের বুকে-হাঁটু-দেওয়ার ব্যাপারটি কিন্তু কি মিষ্টি!

ভূতির খালের শ্মশানের আজ দেখো বিভূতি! ভূত-প্রেতের আড্ডা ছিল যেখানে, যেখানে ছিল শিবার চারণ-ভূমি, শবের শয়স্থান, আজ সেখানে জলাশয়ে জমানো হয়েছে চাষের জল। শ্মশানে এত সাধন করেছিলেন বলেই আমাদের আজ মিলছে চাষের জল। কত ফসল চাও, সোনালী ফসল! নাও না উঠিয়ে। কর-না আবাদ পতিত জমিন, নালায় নালায় জল বইয়ে দাও। রাসায়নিক সারের দরকার নেই। নাও না কত নিবে অমৃতের ধারা—জীবনকে করো উজ্জীবিত। বাঁচো, সমৃদ্ধ হও, আনন্দ করো—নাও না কত নিবে চাষের জল। অনন্তবিহারী গোমুখী থেকে আসছে এ জল, ফুরোবে না কোন কালে। 'কথামৃতের' প্রতিকথা ভূতি-সম্ভবা।

সাধন-ভজন করোনি, তাতে হয়েছে কি? এসে বলোই না ঐ কথাটি। জানেন না নাকি তোমার কয় ছটাকের ফুঁটো ঘটিটি! ঐ কথাটির জন্যেই হয়ে আছেন ব্যাথাতুর প্রাণের দোর গোড়ায়। যেমন তেমন করে একবার এসে যাও।

পবিত্র তিনিই করে নেবেন, তাঁর নাম যে কপাল-মোচন!

ভগবান যখনই জীবকে ডাক দিয়েছেন কখনো বলেননি স্নান করে নয়া কাপড় পর, গঙ্গাজল স্পর্শ করে কপালে ভস্ম মেখে এসো। শুধু বলেছেন: ওরে, ওরে, তোরা সব আয়!

তাই ঝটপট এসে পড়তে হয়। কাপড় সামলাতে দেরি করলে আর বান দেখা হয় না।

পাঁচ-সিকে পাঁচ-আনা তোমার আমার নাই বা থাকল। নেই বলেই তো এসেছি। এসেছি চাইতে। চেয়ে থাকতে, চেয়ে থাকতে মুখের দিকে। আ! সে কী মুখ! দেখেছ চেয়ে? আবার চেয়ে দেখ। আবার, আবার আরাব শুনবে ধ্বনিত হচ্ছে নিস্তব্ধতার, তোমার রিক্ততার মহাশূন্যে, তার পূর্ণতার মহাকাশে।

কত সহজ করে দিয়েছেন! অচিন দেশের আত্মীয় কি-না। বলেছেন, মনটি ভগবানে ফেলে রাখতে হয়। ভাগ্যবান পারে। একটু ভালবাসলেই ভাগ্যবান। শুধু চাওয়াটুকু চাই। টান-টুকু নিতে বলেছেন।

দুর্ভাগা! কিছু-না-করার বিকর্মও করোনি? কুকর্ম-অকর্ম? পাপ—এইসব? কিছু-না-থাকার অর্ঘ্য নিয়েও আসোনি? তবে এসে বলোই না চেঁচিয়ে, জান ফাঁটিয়ে: এবে আমি যাই কোথা!

একদিন এক ভক্ত পঞ্চবটীতে গেয়েছিল একান্তে: "আমি সাধন-ভজন-হীন।" শুনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলেন।

ঐ যে সুরধুনীর তীরে অকিঞ্চনের আর্তির সুরে অশ্রুবিবশ হয়ে চাওয়া—ভগবানের অসহায়তাটুকুর কি এতটুকু সম্মান দিতে নেই, ভাই ?

নৈরাশ্যে তা হলে তোমার কি অধিকার? আকুল হয়ে এসে বলেছেন: ব্যাকুল হতে হয়। ব্যাকুল হতে পারো না ? এসে বলোই না শুধু ঐ কথাটি। বলেছেন: নির্জনে কাঁদতে হয়। কিন্তু কান্না যদি না আসে, করি কি ? তা হলে বলো না এসে সাহারার হাহাকারে: কাঁদতে বলেছো। শুধু দুফোটা চোখের জল বই তো নয়। হায়! তাও যে নেই আমার মরু-অন্তরে; এবে আমি যাই কোথা।

দেখবে আচম্বিতে স্ফটিক-স্বচ্ছ ধারার উৎস-মুখ খুলে দিয়েছেন আপন প্রেম-উক্তির অঙ্কুশ হেনে। ঐ করে বেড়াচ্ছেন। অবহেলিত বাগানে লুকানো জলের কলের মুখ খুলে খুলে দেওয়ার ব্যাপৃতি।

সাধন করতে পারো ভালো। না পারো আরো ভালো। ঐ না-পারার ভালোটিতেই বাসা বাঁধো। একটু ভালবাস। ভালবাসাটি দাও। দেখছ না, বকলমা নিতে চেয়ে সেধে বাঁধা পড়ে আছেন। বন্ধনমুক্ত করার কত প্রেম-কৌশল !

দিব্যি দিয়ে বলছেন: কলিতে অন্নগত প্রাণ। দেখেন না না-কি বাসের পিছনে বাদুরের মতো ঝুলে ঝুলে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে লোকে কি কষ্টে অফিসে যায়, দেহময় কি অবসাদ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে! এসে দেখে খুকুর হয়েছে দাস্ত-বমি, কয়লা নেই এককণা ঘরে, আত্মীয় এসেছে বাড়ী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। জানেন না না-কি কয়টি প্রাণীকে ঐ ছোট ঘর দুটিতে থাকতে হয়, হাঁড়ি-কুড়ি, শেলাইর কল, দোলনা, পড়ার বই, জপের মালা, আর কবিরাজী ওষুধের বটিকা নিয়ে? জানেন না না-কি সাড়িতে দাঁড়িয়ে পাঁচ-ভেজাল আহার্য-সংগ্রহের দৈনন্দিন গঞ্জনা ?

সব জানেন, সব দেখছেন। তাই লজ্জায় আর কড়ার-কড়া-গিরি না করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হন্যে হয়ে, দীন হয়ে, কাঙাল হয়ে। উত্তুঙ্গ শিখরে দাঁড়িয়ে তোমায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে উঠে আসতে হুঙ্কার দিচ্ছেন না। তুমি যেখানে যে অবস্থায় আছো সে অবস্থার সঙ্গে মিশে গিয়ে বলছেন: অন্নগত প্রাণীর অতশত করতে হবে না। একটি বার শুধু হরি বলো। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বলছেন একথা।

মানুষের অসক্ততায় এ মর্যাদাদান, ভগবানের ফতুর হয়ে, ফকির হয়ে, দীনের দীন হয়ে সব দেওয়ার সাধনাটুকু তোমার আমার জন্যে করা এই বেদন-যজ্ঞটির তিলক অন্ততঃ ললাটে ধারণ করতে হয় তো ভাই।

তারপর আর ভয় কি ?

বলেছেন কতবার: একবার ভগবানকে আন্তরিক ডাকলে এসে যেতে হবে তাঁর কাছে ডেকেছি কিনা জানিনে। তবু মজা দেখো, নিজেই কত কাছে এসে বলছেন সব শাস্ত্রের বস্তুনির্যাস ঐ কথাটি। যেখানেই থাকো না কেন, ধাপে ধাপে তরতর অবতরণ করে তোমাকে তরিয়ে নেবেনই নেবেন—এই হল অবতার।

জীবের পাপের শক্তি কি প্রভুর পাবনী শক্তির চেয়ে বেশী হতে পারে? তবে হতাশ হয়ে বসে আছ কেন? একটু হাসো খেলো।

অনবধানীর ধর্ম হয় না, অর্থ হয় না। কাম হয় তার কাল। মোক্ষবার্তা তার কাছে যেয়ে পৌঁছায় না। আধিকারিক পুরুষের দেখা যে পাইনি, সেটাই সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য নয়। মন-

মাথার যে সুব্যবহার করিনি, এটাই হল কৃপাচ্যুতি। অচ্যুত অন্তরে নিগূঢ়, কান্তারে তাঁকে খুঁজে বেড়াই।

পানা সরিয়ে গণ্ডূষভরে জল খেতে হয়। আনমনে সব মনে নিগূঢ় রসধারে ডুবে যেতে হয়। পানা সরিয়ে ধরে দু-হাতভরে অঞ্জলি অঞ্জলি অমৃত মুখের কাছে ধরছেন—তবু আমরা খাইনে।

জয়রামবাটী থেকে ভক্তেরা যখন বিদায় নিয়ে যেত, মা গাঁয়ের সীমা অবধি সঙ্গে এসে বলতেন: বাবা, সাবধানে পথ চ'লো! এই হলো মোক্ষদায়িনীর আদিমন্ত্র। একজনকে আরো স্পষ্ট করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন। বাবা, ঠাকুরের দিকে চেয়ে পথ চ'লো!

এই হল ঠাকুরের জ্ঞানাঞ্জন। হলেন বিভু-দিশারী। দিলেন নিশানা—কৃপার সে কি দুবার অভিযান! তাতেও হল না শান্তি। এলেন আবার মা হয়ে চোখে জ্ঞানাঞ্জন দিতে। দেননি শুধু। নিতেও শিখিয়েছেন। আসেননি শুধু, এসে বলেছেন: ওগো এসেছি। চেয়ে দেখো গো, কেমন এসেছি। দিলেই শুধু হয় না, পাইয়ে দেওয়া চাই। তাই কামার-পুকুরের ভিটেতে নুন-ভাত খেয়ে, ঐশ্বর্য আগলে থাকতে বলেছিলেন জগদ্ধাত্রীকে। শ্রান্ত, ভ্রান্ত, জিজ্ঞাসু, পিপাসু সব আসছে, আসবে। পাইয়ে দিতে হবে তাদের সব কিছু।

ঠাকুরের দিকে চেয়ে যারা পথে চলে, ঠিক থাকে তাদের মতি ও গতি, পথ-চ্যুতি হয় না। একদিন তারা পৌছায় পথের শেষে—জ্ঞান-শান্তি-আরামে।

"ঠাকুরের কথা যারা ভাবে তাদের সব দুঃখ দূর হয়।"—বলেছেন মা।

নিজের দিব্যি দিয়ে বারবার-কওয়া কথা ঠাকুরের: "আমার চিন্তা যে করবে, সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।"

এই হল কামারপুকুরে আসা।

গো-ঘাট আরাম-বাগ ছাড়িয়ে তবে কামারপুকুর।

আবেদন

উড়িষ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের বাত্যাত্রাণ-সেবাকার্য

সকলেই অবগত আছেন, ভীষণ বন্যায় উড়িষ্যার কয়েকটি জেলা কী ক্ষতিগ্রস্তই না হইয়াছিল! এ দুর্দশা কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই কটক ও বালেশ্বর জেলা বাত্যার কবলে পড়িয়া পুনরায় নিদারুণ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে; বহু লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। কয়েকটি সংস্থা এবং সরকার পক্ষের লোক আর্তজনগণের দুঃখমোচনে ব্রতী হইয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনও ভুবনেশ্বর হইতে ৭৫ মাইল দূরবর্তী পাটামুণ্ডাইকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া সেবাকার্য শুরু করিয়াছেন। এই সেবাকার্যের পরিধি অনেকগুলি গ্রাম জুড়িয়া সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

ক্ষতির বিপুলতার তুলনায় এই কার্যে প্রচুর অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রীর প্রয়োজন। বলা-বাহুল্য, দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের নিকট সাহায্য পৌছাইয়া দিতে হইবে অবিলম্বে। সহৃদয় জনগণকে এই সেবাকার্যে অবিলম্বে অর্থ ও দ্রব্যাদি সাহায্য করিবার জন্য আমরা আবেদন জানাইতেছি।

এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত যে-কোন ঠিকানায় প্রেরিত অর্থ ও দ্রব্যাদি সাদরে গৃহীত হইবে ('রামকৃষ্ণ মিশন'—এই নামে চেক লিখিবেন):

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪

৩। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯

৫। রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নয়া দিল্লী-১

৬। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই-৫২

৭। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, গুজরাট

৮। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৪

৯। রামকৃষ্ণ মিশন, ভুবনেশ্বর-২, উড়িষ্যা

১০। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী, উড়িষ্যা

১১। রামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসবাগুড়ি, ব্যাঙ্গালোর-১৯

১২। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বাণীবিলাস মহল্লা, মহীশূর-২

১৩। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামসেদপুর-১, বিহার

১৪। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মোরাবাদী, রাঁচি-৮, বিহার

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১৩ই নভেম্বর, ১৯৬৭

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

সমালোচনা

আমাদের নিবেদিতা: শঙ্করীপ্রসাদ বসু-লিখিত ও নিত্যানন্দ ভকত-চিত্রিত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। পৃঃ ৮৬, মূল্য : ছয় টাকা।

ভাবের রঙে ও তুলির রঙে মেশানো, অপরূপ সজ্জায় শোভন প্রসারিত আকৃতির এই নবীন গ্রন্থখানি সববয়সীর মনোহরণের যোগ্য; যদিচ লেখক প্রধানতঃ কিশোর মনের উপযোগী করেই ভগিনী নিবেদিতার অমৃতজীবনকথা পরিবেশনে প্রয়াসী। হয়তো সেই কারণেই সমগ্র বইটির ভাষা এত সরল, অথচ গভীর কবিত্বে মণ্ডিত। পড়া শেষ হ'লে মনে যা জেগে থাকে, তা তথ্য বা বর্ণনা নয়, আসলে তা গুণীর কণ্ঠের তানবিস্তারের মতো অনির্দেশ্য অনুভবের স্মৃতি।

প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার ইংরেজী ও বাংলা জীবনীদুটি এবং সর্বোপরি শ্রীমতী লিজেল রেম'র সুলিখিত জীবনীগ্রন্থ শঙ্করীপ্রসাদকে উপকরণ জুগিয়েছে, সেই সঙ্গে মিলেছে তাঁর নিজের সংগৃহীত তথ্য ও মনন। সব মিলিয়ে নিবেদিতাচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যমণ্ডিত উদাহরণ এ গ্রন্থটি পরবর্তী বিস্তৃততর প্রয়াসের সার্থক ভূমিকা।

নিবেদিতাব্যক্তিত্বের লোকমাতা-স্বরূপটি লেখককে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। জননী সারদাদেবীর বিশ্বমাতৃত্বের পটভূমিতেই নিবেদিতার ভারতবর্ষের আত্মিক উন্মোচন। তাঁর এই লোকমাতা-স্বরূপটিও 'নারীজাতি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষকথা'র জাতীয় অভিব্যঞ্জনা। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের "কালী" নিবেদিতার হৃদয়স্পর্শে আমাদের জাতীয়চিত্তের প্রেরণাশক্তি হয়ে উঠেছিলেন। অধ্যাত্মপ্রেরণার জাতীয়তায় রূপান্তরের এমন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী মেলে না। এদিক থেকে ফ্রান্সের জোয়ান অফ আর্কের কথা নিবেদিতা-শতবর্ষে বিশেষভাবে স্মরণে জাগে। ভারতের ইতিহাসে জোয়ান অফ আর্কের মতোই নিবেদিতাও ভগবৎপ্রেম ও দেশপ্রেমের মহৎ সমন্বয় সাধন করেছেন। আর, নিঃসংশয়ে এদেশের ভাষায় তিনি 'সন্ত'—ওদেশের ভাষায় যা 'saint'।

জাতিগড়ার শিক্ষার ভার নিতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। তাই সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সর্বোপরি অধ্যাত্মসাধনায় সর্বত্র নিবেদিতা আমাদের জাতীয়জীবনবেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান জটিল জীবনবোধের যোগসূত্র-স্থাপনে তাঁর প্রতিভার পরিচয় একদিকে তাঁর কর্মসাধনায় আর একদিকে তাঁর অমর রচনাবলীতে। নিবেদিতাজীবনের এই দুই প্রান্ত থেকেই উপাদান ও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে শঙ্করীপ্রসাদ তাঁর সারস্বত কর্তব্য সুসম্পন্ন করেছেন।

লেখার সাথে রঙের মেলায় শিল্পী নিত্যানন্দ ভকতের কৃতিত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ চিত্রণ ও অলংকরণই নয়নাভিরাম। কয়েকটি ছবি সম্বন্ধে পরবর্তী সংস্করণে আরো অভিনিবেশ বাঞ্ছনীয়।

মুদ্রণকৃতিত্বের দিক থেকে আনন্দ পাবলিশার্সের সাধুবাদ মুক্তকণ্ঠে করণীয়। এমন

আদ্যন্ত-অলঙ্কৃত একটি গ্রন্থের মূল্য বর্তমানে এর চেয়ে কম হতে পারে না। তবে অধিকাংশ দেশবাসীর জন্য একটি সুলভ সংস্করণের কথা আশা করি তাঁরা অবশ্যই ভেবে দেখবেন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হিমালয়তীর্থমালা (পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-সমন্বিত)—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়-গ্রথিত। প্রকাশক: শ্রীস্বর্ণকমল মুখোপাধ্যায়, ১৪নং পঞ্চাননতলা রোড, কলিকাতা-১৯। পৃষ্ঠা ২২৪; মূল্য ৩·৮০।

উত্তরাখণ্ডের যাত্রাপথের বিষয় লইয়া বহু পুস্তক রচিত হইলেও 'হিমালয়তীর্থমালা' পুস্তকখানির কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পাঠক-মাত্রেরই চোখে পড়িবে। তীর্থ-যাত্রীদিগের যাত্রাপথে যাহাতে সুবিধা হয়, সেইদিকে সর্বাধিক দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রন্থখানি রচিত।

কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের এবং এই দুই মহাতীর্থের পথে তীর্থরাজি সম্বন্ধে এমন সব দুর্লভ প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, যাহা সংগ্রহ করিতে হইলে বহু পুস্তক পাঠ করা দরকার হয়। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, অমরনাথ, কৈলাস, মানসসরোবর প্রভৃতি তীর্থের পরিচিতি সুন্দরভাবে দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক তীর্থের যে পৌরাণিক কাহিনী বিদ্যমান তাহা চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত হওয়ায় তথ্যবহুল গ্রন্থ-খানির সরসতা অক্ষুণ্ণ আছে। পরিশিষ্টে প্রদত্ত বাস-রুট ও হাঁটা-পথের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যাত্রী-সাধারণের খুবই কাজে লাগিবে। আমাদের মনে হয়, গ্রন্থখানি নিজ বৈশিষ্ট্যেই হিমালয়তীর্থ-যাত্রীদিগের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিবে ও বহুল-প্রচারিত হইবে।

শ্রীম-দর্শন (প্রথম ভাগ)—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। প্রকাশক: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩৯৮ + ৩৩; মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থকার দীর্ঘকাল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কার মহাভক্ত 'শ্রীম' অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পূত সান্নিধ্যে তাঁহার অমূল্য ভগবৎপ্রসঙ্গ দিনলিপিতে রক্ষা করিয়াছিলেন, 'শ্রীম-দর্শন' তাহারই গ্রন্থরূপ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সন্তানগণের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোকে গীতা উপনিষদ্ ভাগবত পুরাণ ও বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে বলিয়া গ্রন্থখানি যে ভক্তগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে, বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণই তাহা প্রমাণ করে

সমীক্ষাপঞ্চক—ডক্টর শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৩।১।এ, যোগীপাড়া মেন রোড, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ৭৬; মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও একখানি মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ। সুধী গ্রন্থকার অতি নিপুণতার সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ৫৭পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন। আলোচিত অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্টের সময়, শ্রীভট্টজীর সময়, শ্রীহরিব্যাসদেবজীর আবির্ভাবকাল এবং শ্রীগীতগোবিন্দকার কবি জয়দেবের সময় ও তাঁহার নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্তিত্ব। নিম্বার্ক-মতের পোষকতা-ও প্রতিষ্ঠা-কল্পে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে—এই ধারণা হয়তো পাঠকচিত্তে জাগিতে পারে, সেইজন্য ভূমিকায় গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন: 'কেবলমাত্র পরমতখণ্ডনই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু নিরপেক্ষ শাস্ত্রবিচারের দ্বারা সত্যনির্ণয়ের জন্যই এই চেষ্টা।' পাঠকগণের আনন্দবিধান ও সংশয়নিরসন—এই উভয়কার্যেই গ্রন্থখানি সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

গত অক্টোবর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন-অনুষ্ঠিত সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয় :

খরাত্রাণ-সেবাকার্য

১। **বিহারে** — হাজারীবাগ জেলায় প্রতাপপুর সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ৪১,০৮৯ কেজি, জোয়ার ৫৭০ কেজি, চাল ১০০ কেজি, ডাল ৭৫ কেজি, গুঁড়া দুধ ৬,৩৮২ পাউণ্ড, ভিটামিন ট্যাবলেট ১,২০০টি, শিশুদের খাদ্য ৪ টিন, কম্বল ৪,৮৩৪টি, ধুতি ও শাড়ী ৩৩৩ খানি এবং ৪,৮৩৮টি বাসন বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১৩,৯৮৭।

২। **পশ্চিমবঙ্গে**—পুরুলিয়া জেলায় পারা, হুরা, ঝাপড়া, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, বালি-তোড়া ও নডিহা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে, বাঁকুড়া জেলায় হাট-আস্থরিয়া, দধিমুখা, খাণ্ডারী, ও রামহরিপুর সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মালদহ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ৩৮,৪৩৬ কেজি, চাল ৩,৭২৫ কেজি, ভুট্টা ১,৮০০ কেজি, বার্লি ২০ কেজি, গুঁড়া দুধ ৮,৮২৬ পাউণ্ড, ধুতি ও শাড়ী ১০,৫৮০ খানি এবং ১১,৬০৭টি শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২১,৬৫৩।

বন্যার্ত-সেবাকার্য

১। **পশ্চিমবঙ্গে**—মেদিনীপুর জেলায় পিংলা, পিচাবনী, আলাদারপুট, রাইপুর ও ছত্রধরা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে চাল ১,০৫,১০৮ কেজি, গম ২১,৭২৫ কেজি এবং ৬০ খানি ধুতি ও শাড়ী বিতরিত হইয়াছে। সাহায্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২০,০৬১।

২। **উত্তরপ্রদেশে** — দিল্লী কেন্দ্রের মাধ্যমে যমুনানদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সেবায় ১,২০০টি শিশুদের পোশাক, ৪০টি কম্বল, ১০টি লেপ, ৪২টি বাসন এবং নগদ ২,২৫০্ টাকা বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা—১৩৬।

দুর্গতদের সেবা

বিহারে—রাঁচিতে দুর্গতদের মধ্যে রাঁচি আশ্রমের মাধ্যমে গম ৯৬১ কেজি, গুঁড়া দুধ ৮০৭ পাউণ্ড, ভিটামিন ট্যাবলেট ১২,১৮০টি, ধুতি ও শাড়ী ৩৪৩ খানি এবং ২২৮টি শিশুদের পরিচ্ছদ বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৯৫৬।

ঘূর্ণিবাত্যা-পীড়িতদের সেবা

উড়িষ্যায়—কটক জেলায় নভেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ঘূর্ণিবাত্যা-বিধ্বস্তদের মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ১১টি গ্রামে সেবাকার্য শুরু করিয়া ক্রমশঃ কার্যের পরিধি বিস্তৃত করা হইতেছে।

উৎসব-সংবাদ

জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ৯ই অক্টোবর হইতে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত চারদিন এবং ১০ই নভেম্বর হইতে দিবসত্রয় আশ্রম উৎসব-মুখরিত ছিল।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

বেলুড় বিদ্যামন্দির এবং **রহড়া** বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের যে-সকল ছাত্র এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. এবং

বি. এসসি. পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণী ও কয়েকজন ডিস্‌টিংসন লাভ করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে সাধারণ ভাবে এই কেন্দ্রের স্থচনা হয় এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে নিজস্ব স্থানে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করা হইয়াছে। খেতড়ি, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, নীলগিরি, উতাকামণ্ড, কোটাগিরি, কোয়েম্বাতুর, বিজয়ওয়াদা, হায়দরাবাদ, মালাকপেট, গোয়ালিয়র, আগ্রা, সম্বর হ্রদ, ফুলেরা, আলোয়ার, অমৃতসর, বিকানীর, সোনপাট জলন্ধর প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দেওয়া হয়। দিল্লী বিশ্ববিত্যালয়ের বেদান্ত-সমিতিতে এবং অন্যান্য সংস্থায় সাপ্তাহিক ক্লাস করা হয়।

তুলসী-রামায়ণ অবলম্বনে হিন্দীতে ৪৭টি আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, মোট ২৫,৯৫০ জন শ্রোতা যোগদান করেন।

দিল্লী কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, অবৈতনিক যক্ষ্মা-ক্লিনিক ও হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় আছে

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা (শিশুবিভাগসহ) মোট ১৭,৪৮৭ ; আলোচ্য বর্ষে ১,৬৬৮ খানি গ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে। পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১৭,৪১১। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক উপস্থিতি-সংখ্যা ৩৮৩। পাঠাগারে ১৫টি সংবাদপত্র এবং ১১৫টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

গ্রন্থাগারের বিশ্ববিত্যালয়-ছাত্র-বিভাগটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করা হয়। এখানে ২,৪০২ খানি মূল্যবান পুস্তক রাখা হইয়াছে। দৈনিক গড়ে ৮০ জন বিত্যার্থী এখানে পড়াশুনা করে। আলোচ্য সময়ে ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার করিয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৩৬,৬৬২ (নূতন ৭,৬৮৫) জন রোগী চিকিৎসিত হয়।

যক্ষ্মা-ক্লিনিকে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৩৩,৮৪২ (নূতন ১,৮৮০); অন্তর্বিভাগে ২৬৫ জন যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

সারদা মহিলা-সমিতির উত্তোগে প্রতি রবিবার সারদা-মন্দিরে ৬ হইতে ১২ বৎসরের বালকবালিকাদিগকে ভজন, অভিনয়, সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ; তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গড়ে ৪০টি বালক-বালিকা এই ক্লাসে যোগদান করিয়াছিল। সারদা মহিলা-সমিতির সেবা- ও কৃষ্টিমূলক কার্যও প্রশংসনীয়ভাবে অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, গুরু নানক ও আচার্য শঙ্করের জন্মদিন সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আবৃত্তি- ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় ২,২৫৭ জন অংশগ্রহণ করিয়াছিল ; উহাদের মধ্যে সফল প্রতিযোগীদিগকে ১,১১১৲ টাকা মূল্যের ২৩১টি পুরস্কার দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে নারায়ণসেবা-দিবসে আনন্দগ্রাম কুষ্ঠকলোনীর প্রায় ৬৫০ জন রোগীকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো

হইয়াছিল। রোগীদিগকে এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের নূতন কাপড় জামা ইত্যাদি দেওয়া হয়।

ভুবনেশ্বর: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৫—মার্চ ১৯৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কর্তৃক মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে নিত্য পূজাপাঠ, ধ্যান-ধারণা, ভজনাদি এবং সাময়িক উৎসবাদি ও প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথিগুলি বিশেষ পূজা, জীবনী ও বাণী-আলোচনা এবং অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি অবতারগণের জন্মদিনগুলিও পাঠ-আলোচনাদি দ্বারা উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন স্থানে ও মফস্বলে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

আশ্রমিকদের জন্য সুনির্বাচিত পুস্তকাবলী-সমন্বিত একটি গ্রন্থাগার আছে। ইহা ছাড়া জনসাধারণের জন্য একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময় স্থাপন করা হইয়াছে, এই গ্রন্থাগারে স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রগণকে পড়াশুনার সুবিধাদানের জন্য পাঠ্য-পুস্তকাবলী রাখা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৭,৫৮৪। পাঠাগারে ৭টি দৈনিক এবং ৩৩টি সাময়িক পত্রপত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য সময়ে ছাত্রগণ ২২,৬৩০ খানি পাঠ্যপুস্তক পড়িতে লইয়াছিল। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ও প্যাঠাগারের জন্য নূতন ভবন-নির্মাণের পরি-কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

আলোচ্য সময়ে ওড়িয়াভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বিষয়ক গ্রন্থসমূহের কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

মিশনের দাতব্য এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীটি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিচালিত হইতেছে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের দরিদ্র জনসাধারণ এবং তীর্থযাত্রিগণ এই চিকিৎসালয়টির মাধ্যমে উপকৃত হইতেছেন। ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৫,৭৯৩ এবং ২৩,৩৭১। গড়ে দৈনিক প্রায় ৭০ জন রোগী এখানে চিকিৎসা লাভ করে।

বিবেকানন্দ অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় দরিদ্র ছেলেদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৩৪ বৎসর ধরিয়া ইহা শিক্ষাদানকার্যে রত রহিয়াছে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর শতবার্ষিকীর সময় এই বিদ্যালয় মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে। ১৯৬৭, ৩১শে মার্চ উচ্চপ্রাথমিক বিভাগে মোট ছাত্র-ছাত্রী ছিল ২৬৪ জন, তন্মধ্যে ১৯৪ জন বালক ও ৭০ জন বালিকা ; মধ্যইংরেজী বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৫। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ 'বিবেকানন্দ স্কুল বিল্ডিং'-এর উদ্বোধন করেন।

বক্তৃতা সফর

গত ৪.৯.৬৬ হইতে ২৬.১২.৬৬ পর্যন্ত সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ কর্তৃক নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়:

বিষয়	স্থান
বর্তমান ভারতের নির্মাতা স্বামী বিবেকানন্দ	থাই ভারত হল, ব্যাঙ্কক
মহাপুরুষগণের স্মৃতি	সিঙ্গাপুর হল, নরিস রোড
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী	" "
শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণী	শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, সিঙ্গাপুর
মহাপুরুষগণের স্মৃতি	কুয়ালালামপুর
"	মাদ্রাজ মঠ
বেদান্ত ও বিশ্বশান্তি	গভর্ণমেণ্ট কপার প্রজেক্ট, রাজপুতানা

বিষয়	স্থান	বিষয়	স্থান
কর্মযোগ	রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হল, খেতড়ি	যে মহাপুরুষগণকে দেখিয়াছি	রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা	কনখল সেবাশ্রম	পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ	এস. ই. রেলওয়ে হেড অফিস
বেদবাণী ও ইহার রূপায়ণ	রোটারী ক্লাব, হরিদ্বার	মরণের পারে জীবন	৯৭বি, হরিশ মুখার্জি রোড কলিকাতা
শ্রীশ্রীমা এবং মহাপুরুষগণের কথা	হাউজ্‌ খাস, নিউ দিল্লী	নিবেদিতা জয়ন্তী	বাগবাজার, কলিকাতা
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী	রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম "	ভারত ও তাহার আদর্শ	এস. ই. রেলওয়ে হল, শালিমার
স্বামী অভেদানন্দ শতবার্ষিকী	" "		
মহাপুরুষগণের পুণ্যস্মৃতি	" "	শিক্ষা	বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, আরিট, মেদিনীপুর
বর্তমান ছাত্রগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপায়	বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসভা, দিল্লী	পুনর্জন্ম	পাঠচক্র, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা
মহাপুরুষগণের স্মৃতি	নিউ দিল্লী		
স্বামী অখণ্ডানন্দ	"	স্বামী প্রেমানন্দ	রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম আঁটপুর
ভক্তগণের নিকট ধর্মপ্রসঙ্গ	"		
শক্তিপূজা	প্যাটেল নগর, নিউ দিল্লী	মহাপুরুষগণের পুণ্যস্মৃতি	" "
বিজয়া সম্মিলনী	মহাবিদ্যালয়, বারাণসী	পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রমাণ	পাঠচক্র, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা
আমার বিদেশ-ভ্রমণ	সুরফ্রিজ হল, কলিকাতা		

বিবিধ-সংবাদ

ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে গত ২৮শে অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার একাধিক শততম জন্মদিবসে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে আশ্রমের ঠাকুরঘরে সারদা-মন্দিরের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীগণ এবং ছাত্রী-বৃন্দ সমবেত হইয়া মঙ্গলারতি ও ভজনে যোগদান করেন। পরে বিদ্যালয়ের প্রবেশপথের সম্মুখে শ্বেতপদ্ম ও রজনীগন্ধায় সুসজ্জিত ভগিনী নিবেদিতার নূতন প্রতিকৃতির সম্মুখে একশতটি প্রদীপ-প্রজ্জালনের পর শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা ভারতীপ্রাণা (নিবেদিতার ছাত্রী) কর্পূরারতি ও প্রতিকৃতিতে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। বিদ্যালয়-ভবনটির বহির্ভাগও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

সকাল ৭-২৫ মিনিটে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শাস্ত্রপাঠ, স্তব, আবৃত্তি ও ভগিনী নিবেদিতার জীবনীপাঠ ও হোম অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। অনুষ্ঠানান্তে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা-হোমাদির ব্যবস্থা ছিল। সারাদিনই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ উৎসবে সমাগত শত শত নর-নারীর আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ ছিল। সারাদিনব্যাপী যে

আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬টার মহাজাতি সদনে একটি জনসভা আহূত হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ সোসাইটি: ভগিনী নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে, ১৫১ বিবেকানন্দ রোড-স্থিত বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরে ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী (বর্ষব্যাপী) উৎসবের প্রাথমিক অধ্যায়ের উদ্বোধন হয় গত ২৮শে অক্টোবর তারিখ। ঐদিন সকালে স্বামী জীবানন্দজীর পৌরোহিত্যে বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৫টার সময় বিবেকানন্দ সোসাইটির সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সোসাইটির সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। জাতির এই সঙ্কট-মুহূর্তে এই মহীয়সী নারীর জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য তিনি দেশের তরুণসমাজকে আহ্বান জানান। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষাল।

পরদিন রবিবার ২৯শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শতদীপ-প্রজ্বালনের পর শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিচার-পতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও ডঃ রমা চৌধুরী নিবেদিতার জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। উদ্বোধনী ভাষণে বিচারপতি মুখোপাধ্যায় ভগিনী নিবেদিতার মহৎ জীবনের আনুপূর্বিক আলোচনা করিয়া তাঁহার জীবনে স্বামীজীর প্রভাব ও অনুপ্রেরণার কথা সবিস্তার বর্ণনা করেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ মজুমদার নিবেদিতার নানা অবদানের কথা, বিশেষ করিয়া ভারতের মুক্তিসংগ্রামে তাঁহার অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শনিবার ৪ঠা নভেম্বর প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার নেত্রীত্বে। প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে নিবেদিতার জীবনদর্শনে তাঁহার অলৌকিকত্ব ও মানবপ্রেমের মূর্ত মহিমার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভানেত্রীর ভাষণে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা নিবেদিতার জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার বাণী ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাশেষে 'নিবেদন'-এর সৌজন্যে "নিবেদিতা গীতি-আলেখ্য" অনুষ্ঠিত হয়।

রবিবার ৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ডঃ ত্রিগুণা সেন। ডঃ সেন তাঁহার ভাষণে নিবেদিতার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার তাঁহার ভাষণে নিবেদিতার জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। প্রব্রাজিকা আত্ম-প্রাণা তাঁহার ভাষণে নিবেদিতার জীবনে ত্যাগ, নিষ্ঠা, প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব সমাবেশের এক উজ্জ্বল রূপ বর্ণনা করেন। সভাপতির ভাষণে প্রধান বিচারপতি বলেন, নিবেদিতার ভক্তি ও দেশপ্রেম কোন ভারতীয়ের অপেক্ষাও অনেক বেশী।

কার্যবিবরণী

আগরতলা (ত্রিপুরা) গাংগাইল রোড-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সন ১৩৭১-৭৩ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই আশ্রম কর্তৃক নিম্নলিখিত কার্যধারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। (১) শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে নিত্যপূজার্চনা ও সাময়িক উৎসব-অনুষ্ঠান, (২) বিদ্যামন্দির ও ছাত্রাবাস-পরিচালনা, (৩) হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে আর্তসেবা।

১৩৭৪ সালে আশ্রমে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা-মতে শারদীয় দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সপ্তমী পূজার দিন সকালে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

পরলোকে শ্রীদয়াময় মিত্র

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত রীডার শ্রীদয়াময় মিত্র (ভুলু বাবু) গত ২৫শে আগস্ট লক্ষ্ণৌ-এ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা পূজনীয়া যোগীন-মার দৌহিত্র ছিলেন।

ভুলুবাবু ১৮৯৪ সালে মহালয়ার দিন কলিকাতায় তাঁহার পৈতৃক বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালের মধ্যেই তাঁহার পিতামাতা উভয়েরই দেহান্ত হয় এবং তাঁহার ও তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার ভার তাঁহাদের মাতামহী যোগীন-মার উপর পড়ে। ফলতঃ তখন হইতেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও স্বামী সারদানন্দজী কৃপা করিয়া তাঁহাদের ভার গ্রহণ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে একমাস ভুবনেশ্বরে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন।

ভুলুবাবু ১৯১৫ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর নিকটে তাঁহারই ঘরে থাকিতেন। এখানে থাকিয়াই তিনি এম. এ. পাস করেন। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বঙ্কিম স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯২৪ সালে যোগীন-মার দেহত্যাগের পর স্বামী সারদানন্দজী তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে দুই বৎসর পরে পুনরায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়া ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি অধ্যাপনার কাজ করিতে থাকেন। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে তিনি বার্লোগঞ্জে স্বামী অতুলানন্দজী মহারাজের নিকট গিয়া থাকিতেন। ভুলুবাবু স্বল্পভাষী ও নির্বিরোধ লোক ছিলেন। তিনি পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর দেহত্যাগের পর 'উদ্বোধন' পত্রিকায় একটি কবিতা লিখিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধন-পত্রিকায় গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার ৬০৪ পৃঃ, ২য় কঃ, ১৭শ লাইনে 'কাটে' স্থলে 'আঁটে' এবং ৬১৭ পৃঃ, ২য় ক ২২শ ও ২৪শ লাইনে 'ললিত' স্থলে 'পুলিন' পড়িবেন; ৬১১ পৃঃ ২য় কঃ ১৩শ লাইনে 'বেলভেডিয়ার' স্থলে 'উডল্যাণ্ডস্' পড়িবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৮ই মাঘ, (২২. ১. ১৯৬৮) সোমবার, কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৬তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।